সেরা মানিক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

শিখা ঘোষ

বাণী প্রকাশ
এ-১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রকাশক :

এস, এম, আখতার হোসেন

বাণী প্রকাশ

এ ১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রথম প্রকাশ— ১৯৬৫

মুদ্রক :

শ্রীপ্রদ্যোৎ কুমার মান্না

বিশ্বকর্মা প্রেস

২/১এ, আশুতোষ শীল লেন

কলিকাতা-৯

সেরা মানিক
সূচীপত্র

সহরতলী

সেরা মানিক—১

প্রথম পর্ব
এক

এ দিকের সহরতলীর এই অঞ্চলে বড় রাস্তায় বিদ্যুতের আলো আছে, —অনেকটা দূরে দূরে। ছোট গলিতে আলকাতরা মাখানো কাঠের থামের মাথায় আজও টিমটিমে তেলের বাতি জ্বলে। কোন বাড়িতে ভাড়াটে কেরানীবাবুর বৌ অপরিচ্ছন্ন, কিন্তু বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত রান্নাঘরে উনানে ভাতের হাঁড়ি চাপাইয়া চামচ দিয়া কণ্ঠার নীচে ঘামাচি মারেন, রাত্রে খোকা কাঁদিয়া উঠিলে বেড়সুইচ টিপিয়া বদলান তার কাঁথা ; হয়ত ঠিক পিছনেই আরও বড় বাড়ির রীতিমত বড়লোক মালিকের রান্নাঘরে ডিবরি বার বার বাতাসে নিভিয়া যায়, রাত্রে খোকা কাঁদিলে টর্চ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া খোকার মা প্রায় কাঁদিয়া ফেলেন নিজেও।

একটু বেশি রাত্রে আর রাত্রির শেষভাগে ট্রামের আওয়াজ কানে আসে, বন্ধ ঘরের বাহিরে ঝড়ের অন্তিম অবস্থার হা-হুতাশভরা একটা অস্বস্তিকব একটানা আহ্বানের মত। মোটরের হর্ন দূরেও বাজে, কাছেও বাজে, সময় অসময় নাই, —কেবল সময়-বিশেষে বাজে বেশি, সময়-বিশেষে কম। পথের দু'পাশে সচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের, স্বাচ্ছন্দ্য ও দুর্ভোগের, রুচি ও অরুচির, সুন্দর ও কুৎসিতের, পরিচ্ছন্নতা ও নোংরামির, সম্মুখ ও পিছনের, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের (যথা—গৃহ-নির্মাণোপকরণের সমাবেশ) কত যে আশ্চর্য সমন্বয় ও গলাগলি ভাব! নামলেখা গেট, বাগান ও লন, আধুনিক ফ্যাসানের সুদৃশ্য দোতলা বাড়ি, বিচিত্র শাড়ি, সুন্দরী নারী, রেডিওর গান, ইঁট বাহির করা পুরানো একতলা বাড়ি, সামনে সিমেণ্টফাটা রোয়াকে ছেঁড়া ন্যাকড়া, কাগজের টুকরা, আধপোড়া বিড়ি, কোমরে ঘুনসীবাঁধা উলঙ্গ শিশু। পথের এদিকে ছবির মত সাজানো মনিহারী দোকান—সাবান, কেশ তৈল, পাউডার, স্নো, ক্রিমে ঠাসা ; পথেব অপরদিকে নিছক একটা কয়লার আড়ত, খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় হয়, মালিক শ্রীভূষণচন্দ্র নন্দী। তিনটি মহিষের গাড়ি কয়লা আনিয়া আড়তে জমা করে, পুরীষ ও পাঁকের কোমল গভীর স্নেহে দেহের ভার নামাইয়া এই তিনজোড়া মহিষ অবসর সময়টা জাবর কাটে আড়তের ঠিক পিছনে—রাস্তা হইতে অনেকটা চোখে পড়ে, গন্ধও পাওয়া যায় কিছু কিছু। কাছেই 'ডাইমণ্ড র‍্যাষ্টুর‍্যাণ্ট; ফাষ্টকেলাশ চা, রুটি, মাখন, চপ, কাটলেট, ডবল ডিমের মামলেট (মাত্র তিন পয়সা) ইত্যাদি পাইবেন' বলিয়া মালিক রাধানাথ দে স্বহস্তে সাইনবোর্ড লিখিয়া রাখিয়াছে। একরকম গা ঘেঁষিয়াই টিনের চালার নিচে লোচন সাউএর মুড়িচিঁড়ার দোকান, কাঁচবসানো টিনের পাত্রে বাতাসা, দড়িতে ঝুলানো তিলুড়ি, একছড়া চাঁপাকলা...। ছোট স্যাকরাব দোকান, কামারের দোকান, টিনের মগ-বালতি তৈরি, আর ঘটিবাটি ঝালাই করার দোকান, সাইকেল মেরামতের দোকান, এ সবও আছে।

আর কিছু দূরে আছে বড় বড় কারখানা।

হাপরের দড়ি টানিতে টানিতে, তিনু রক্তবর্ণ লোহার পাতে হাতুড়ি পিটাইতে পিটাইতে, বিশু তার অবাধ্য লোহার পাতকে মনোমত আকৃতি দিবার চেষ্টা করিতে করিতে, বেন্দা যখন হাঁপাইয়া পড়ে, তখন বেন্দাই হয়ত চোখ তুলিয়া তাকায় সেইদিকে, যেদিকে আছে বড় বড় কারখানাগুলি। প্রকাণ্ড একটা লাল দালানের লাগাও বিরাট একটি টিনের শেড, আব তিনটি মোটা মোটা চোঙা পরিষ্কার দেখা যায়, অন্যগুলি একটু আড়ালে পাড়িয়াছে। এ কি কাণ্ড, এ্যাঁ? কত বিঘা জমি জুড়িয়া না জানি কারখানাগুলি গড়া হইয়াছে? নিবিড় কালো কি ধোঁয়াটাই উঠিয়া যাইতেছে চোঙাগুলি দিয়া আকাশের দিকে। বেন্দা জানে, বিদ্যুতে

যেমন কাঁচের ভিতরে অবিরাম শিখাহীন আলো জ্বলে, তেমনি অবিরাম কলও চলিতে পারে, সব কল ধোঁয়া ছাড়ে না। কিন্তু ঊর্ধ্ব-মুখী চোঙা দিয়া যে ধোঁয়া বাহির হয়, বেন্দার কাছে তাই কেবল কলকারখানার প্রতীক।

যশোদা যখন একসঙ্গে তিনটি বড় বড় কয়লার উনুনে আঁচ দেয়, তখনও বড় কম ধোঁয়া হয় না। শীতকালে ধোঁয়াটা যেন যশোদার বাড়ি ছাড়িয়া নড়িতে চায় না, যশোদার বাড়ির ছোট উঠানে, ইঁট আর টিনের ছোট-বড় কাঁচা পাকা ঘরগুলির মধ্যে স্থায়ীভাবে আটকাইয়া থাকিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এখন, বৈশাখের প্রথমে, অনেক দূরের সমুদ্র হইতে ফুরফুরে বাতাস আসিয়া সকাল-সন্ধ্যায় খনি-গন্ধী ধোঁয়া উড়াইয়া লইয়া যায়।

এ বাড়িতে অল্প জায়গায় যশোদা অনেকগুলি ঘর তুলিয়াছে, অনেকগুলি মানুষকে থাকিবার জায়গা দিতে হয়। আগে কেবল পাঁচটি ইঁটের ঘর ছিল, তখন উঠানটিও ছিল মস্ত বড়। পশ্চিম কোণে কল আর চৌবাচ্চার কাছে খানিকটা স্থান ছিল বাঁধান, বাকিটা কাঁচা। তারপর দু'টি টিনের ঘর তুলিবার ফলে উঠান তার একরকম অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, আছে কেবল ওই বাঁধান স্থানটুকু। কয়েক বছর কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও উঠানের সঙ্কীর্ণতা যশোদার অভ্যাস হইয়া যায় নাই, মাঝে মাঝে পীড়ন করে। দু'হাত জলভরা প্রকাণ্ড দুটি বালতি ঝুলাইয়া উঠানে দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে মুখ করিয়া সশব্দে তাকে নিঃশ্বাস ফেলিতে দেখা গিয়াছে, ফাঁপর ফাঁপর লাগিলে মানুষ যেমন করে। বোঝা গিয়াছে, ফাঁপর ফাঁপর লাগাটা যশোদার মানসিক. বালতি দু'টি ভারি বলিয়া নয়! এ-রকম দু-চারটি জলভরা বালতির ভারে কাবু হওয়ার মত শরীর যে যশোদার নয়, দেখিলেই সেটা বোঝা যায়। সাধারণ বাঙালীঘরের গোটাকয়েক স্বাস্থ্যবতী যুবতীকে অনায়াসে গড়া চলিত, এতখানি মাল-মসলা দিয়া ভগবান তাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

নিজের বা নিজের ভাই-এর জন্যে আজ এ বেলা যশোদার উনানে আঁচ দিবার দরকার ছিল না, পাড়ায় বৌভাতের নিমন্ত্রণ আছে। কিন্তু আরও যে বিশ-বাইশজন লোক বাড়িতে আছে, তাদের জন্য যশোদাকে রাঁধিতে হইল। এরা সকলেই ভাড়াটে এবং পোষ্য। কারণ, অনেকে নিয়মমত ভাড়াও দেয় না, ভরণপোষণের খরচও দেয় না—দিতে পারে না। এতগুলি লোককে উপবাসী রাখিয়া ভাইকে নিয়া কি নিমন্ত্রণ খাইতে যাওয়া চলে?

সকাল-সকাল যশোদা রান্না শেষ করিয়া ফেলিল। বড় গরম পড়িয়াছে আজ। রাঁধিবার সময় ঘামে যশোদার ভালমতেই স্নান হইয়া গিয়াছিল, রান্না শেষ করিয়াই তবু একবার স্নান করিয়া নিল! শরীরের ঘাম না শুকাইয়া স্নান করিলে অসুখ হয়, এ সব যশোদা মানে না, অত তুচ্ছ কারণে অসুখ হইবে এমন শরীর যশোদার নয়। তা ছাড়া, ঘাম ধুইয়া ফেলার জন্যই স্নান করা, ঘাম শরীরে বসিয়া গেলে আর স্নান করিয়া লাভ কি?

তখন সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করার ব্যস্ততায় সময়মত সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া শাঁখে ফুঁ দেওয়া হয় নাই বলিয়া যশোদার মনটা খুঁত খুঁত করিতে থাকে। শাঁখ বাজাইয়া সামনে ভাইকে দেখিয়া বলে, 'হ্যাঁরে নন্দ, কোথায় থাকিস সারাদিন? বাবুটি সেজে ঘুরে বেড়ালেই তোর দিন কাটবে?'

নন্দকে দেখিলে যশোদার ভাই বলিয়াই মনে হয় না। বাইশ-তেইশ বছর বয়স, অপরিপুষ্ট শরীর, মুখে মেয়েদের মত তেলতেলা ধরনের কোমলতা। পাশে না বাড়ুক, উপরের দিকেও যদি ভালরকম বাড়িয়া উঠিত, তবু আশা করা চলিত, এককালে মোটাসোটা হইয়া যশোদার ভাই হিসাবে মোটামুটি মানানসই হইলেও হইতে পারে ছেলেটা। কিন্তু, এরকম একটা আশা

পোষণ করার সুযোগও সে রাখে নাই। মতি নামে একজন ভাড়াটে আছে যশোদার, বয়স পঞ্চাশের কাছে গিয়াছে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে ভাব করিয়া তাদের সঙ্গে সে পেশাদার রসও পান করে, রসিকতাও করে। একদিন নতুন বন্ধু সুধীরের কানে কানে সে বলিয়াছিল, 'ওই যে, ওরা দু'জন যশোদা আর নন্দ, এক মায়ের পেটের ভাইবোন না হয় হল, কিন্তু বাপ কি ওদের একটা রে দাদা!'

সেইদিন যশোদা ও নন্দের তফাৎটা ভালভাবে খেয়াল করিয়া সুধীরের মনে সত্যই খটকা লাগিয়াছিল যে, কথাটা কি তবে সত্যি নাকি, কে জানে।

নন্দ একগাল হাসিয়া বলিল, 'বৌ দেখতে গিয়েছিলাম দিদি। সুন্দর বৌ হয়েছে—এইটুকু বাচ্চা!'

'সত্যি?'

যশোদা ভাবিতেছিল, যারা বাড়ি ফিরিয়াছে, তাদের ভাত দিয়া বৌ দেখিতে যাইবে কিনা, নন্দর মুখে নতুন বৌ-এর রূপবর্ণনা শোনার পর আর ধৈর্য ধরা গেল না। —'তোর ধনাদাকে ডাক তো, নন্দ!'

ধনঞ্জয় আসিলে যশোদার ঘরখানা যেন ভরাট হয়ে গেল। নন্দের বদলে যশোদার ভাই হইলেই তাকে মানাইত ভাল। মাস দুই আগে ধনঞ্জয় দেশ হইতে চাকরির খোঁজে আসিয়া যশোদার বাড়িতে ডেরা বাঁধিয়াছে। প্রথম দিন সাবান-কাচা লালচে ধুতির উপর গেঁয়ো ধোপার সাফ-করা অতিরিক্ত নীল-লাগানো শার্ট গায়ে দিয়া, বগলে ময়লা সতরঞ্চি মোড়া বিছানা আর রঙচটা টিনের বাক্স হাতে করিয়া সে যখন বাড়িতে ঢুকিয়াছিল, মনে হইয়াছিল, একটা দৈত্য আসিয়াছে। বুড়ো মতি তাকে এখানে আনিয়াছে, মতির সে দেশের লোক।

সেইদিন সুধীরের কানে কানে মতি বলিয়াছিল, 'যশোদা একলাটি থাকে, ওর দুঃখ আর সয় না মাইরি, তাই ধনাকে নিয়ে এলাম। দু'টিতে মানাবে ভাল, অ্যাঁ?' রসিকতা করিয়া মতি নিজে প্রাণপণে হাসে, সেদিনও হাসিয়াছিল। কিন্তু এমন একটা লাগসই রসিকতাও সুধীরের ভাল লাগে নাই দেখিয়া হাসিটা তার থামিয়া গিয়াছিল হঠাৎ।

যশোদা দু'টি কাজের খোঁজ দিয়াছে, কিন্তু একটিও ধনঞ্জয়ের পছন্দ হয় নাই। লোকটার উপর যশোদা সেইজন্য বিশেষ খুশি ছিল না। গরীবের এত বাছবিচার থাকিলে চলিবে কেন, পেটের ভাত যখন তাকে যোগাড় করিতেই হইবে?

ধনঞ্জয় আসিলে যশোদা বলিল, 'একটা উপকার করবে আমার? রেঁধেবেড়ে রেখে দিইছি, সুধীরকে ডেকে দু'জনায় মিলে সবাইকে পরিবেশনটা করবে? এঁটো বাসন তুলব'খন আমি এসে। তিনটে থালা কম পড়বে—তিনজনকে পাতায় দিও, কেমন?'

ধনঞ্জয় রাগে আগুন হইয়া বলিল, 'সবাইকে ভাত বেড়ে দিতে বলছ আমায়? আস্পর্ধা তো কম নয় তোমার! মাইনে করা বামুন নাকি তোমার আমি?'

শুনিয়া যশোদাও রাগিয়া গেল, 'ও বাবা, একটা কাজ করতে বললে এ যে দেখি ফোঁস করে ওঠে! এ কোন্‌দেশী নবাব বাদশা রে বাবা! যাও বাবু তুমি, যাও, বসে বসে বিড়ি টানোগে।'

ধনঞ্জয় গট গট করিয়া চলিয়া গেল। নন্দ বলিল, 'ও বাড়ি থেকে চাঁপার মা, নয় কুমুদ মাসিকে ডেকে আনব, দিদি?'

যশোদা বলিল, 'কেন? ও বাড়ির মানুষকে আবার টানাটানি কি জন্য? এতগুলো মদ্দ পুরুষ রয়েছে এ বাড়িতে, একটা বেলা কেউ ভাত বেড়ে দিতে পারবে না ক'টা মানুষকে?

গলায় দড়ি অমন অকম্মার ধাড়িদের। দূর করে তাড়িয়ে দেব সব-ক'টাকে বাড়ি থেকে! মতি আর সুধীরকে ডাক দিকি।'

মতি আর সুধীরকে বলামাত্র তারা রাজি হইয়া গেল। সুধীর একটু বেঁটে, ঘাড়ে-গর্দানে জড়ানো শক্ত মজবুত শরীর, গুণ্ডার মত দেখিতে। পরিবেশনের ভার পাইয়া অতি মাত্রায় খুশি হইয়া সে বলিল, 'একটু সেজেগুজে বৌ-ভাতে যেও কিন্তু, চাঁদের মা।'

যশোদা বলিল, 'তামাশা রাখো তো বাবু, তুমি। কচি খুকি নাকি যে সাজব-গুজব?'

কচি খুকি না হোক, সাজগোজের সমস্যাটা একটু বিপদে ফেলিয়া দিল বৈকি যশোদাকে। সাজগোজের ধার সত্যই যশোদা ধারে না, সে বয়সও নাই, শখও নাই, বয়স থাকার সময়েও শখ ছিল কিনা সন্দেহ। তবু নিমন্ত্রণবাড়িতে একখানা ভাল কাপড় তো অন্তত পরিয়া যাইতে হইবে? ভাল কাপড় কি ছাই আছে যশোদার! বাক্স খুলিয়া অনেকদিনের পুরানো খানতিনেক রঙিন শাড়ি নাড়াচাড়া করিতে করিতে যশোদা যেন ফাঁপরে পড়িয়া গেল। কোনো বিষয়ে মনস্থির করিতে যশোদার সময় লাগে না, দ্বিধা করিতে হয় না, কোন্ শাড়িখানা পরিবে ঠিক করিতে গিযা তার যেন আজ মাথা ঘুরিয়া গেল। সস্তা দামের শাড়ি, চাকচিক্য নাই, তবু তো রঙিন! রঙিন কাপড় পরা কি তার ঠিক হইবে? কি রকম অদ্ভুত, খাপছাড়া না জানি দেখাইবে তাকে! এমনিই তো যে চেহারা তার।

'কোন্‌টা পরি, বল তো নন্দ?'

'আমি কি জানি?'

বাক্সের তলায় একখানা ফিকে রঙের শাড়ি পাওয়া গেল। যশোদা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। একদিকের আঁচলের কাছে একটু ছেঁড়া আছে। তা হোক।

সত্যপ্রিয় মিলস্ এবং আরও কতকগুলি ব্যবসার মালিক সত্যপ্রিয় এদিকে সহরতলীর একপাশে প্রকাণ্ড বাগান-বাড়িতে বাস করে। সত্যপ্রিয়র প্রচারবিভাগের পরিচালক জ্যোতির্ময়ও এ পাড়াতে বাস করে, যশোদার বাড়ির কাছেই। সম্প্রতি জ্যোতির্ময় অপরাজিতা নামে একটি মেয়েকে হঠাৎ বিবাহ করিয়া বসিয়াছে। এই নতুন বৌটির-ই আজ বৌ-ভাত।

আপিসের অনেককে বলিতে হইয়াছে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে বলিতে হইয়াছে। জ্যোতির্ময়ের বাড়িতে লোক গিজ গিজ করিতেছিল। আয়োজন ভালই হইয়াছে, চাকুরে জামাইকে টাকা মেয়ের বাপ ভালরকমই দিয়াছেন, সুতরাং আয়োজন খারাপ হওয়ার কথা নয়। বৌ দেখিয়া যশোদা খুশি হইতে পারিল না। বৌ বাচ্চাই বটে, পনেরর বেশি বয়স হইবে না। বয়সের চেয়ে ঢের বেশি কচি দেখায়, কারণ শরীরের পুষ্টি হয় নাই। জ্যোতির্ময়ের বয়স ডবলেরও বেশি, এতটুকু মেয়ে কি তার সঙ্গে মানায়?

নিজের ইচ্ছায় নয়, বাড়ির লোকের অনুরোধে নয়, জ্যোতির্ময় নাকি সত্যপ্রিয়কে খুশি করিতে বিবাহ করিয়াছে। সত্যপ্রিয়র একটা মত আছে, বিবাহ না করিলে দায়িত্বজ্ঞান জন্মায় না। দায়িত্বজ্ঞান জন্মায় নাই যার, চাকুরির উন্নতি দূরে থাক, চাকুরিটা বজায় রাখাই কি তার পক্ষে কঠিন নয়? সুতরাং—

একদিন যশোদাকে জ্যোতির্ময় নিজেই এই ধরনের কথা বলিয়াছিল, মেয়ে খোঁজার সময়।

'বিয়ের জন্য কর্তা বড় খোঁচাচ্ছেন, চাঁদের মা। কেবলি বলছেন, এবার একটা বিবাহাদি করে ফেলুন জ্যোতির্ময়বাবু, বিবাহাদি না করলে কি দায়িত্বজ্ঞান জন্মায়, দায়িত্বজ্ঞান না জন্মালে কি—'

যশোদা হাসিয়া বলিয়াছিল, 'তা বিয়ে করুন না, ভাল কথাই তো বলছেন উনি, খোঁটা

ছাড়া কি পুরুষমানুষের চলে?'

'তুমিও ওই দলের, চাঁদের মা? কর্তার মতামত জান না কিনা, তাই বলছ। ওর মতে বিয়ে করতে হলে কি করতে হবে জান, একটি সাত বছরের খুকিকে বিয়ে করতে হবে।'

শেষ পর্যন্ত তাই করিয়াছে নাকি জ্যোতির্ময়? সত্যপ্রিয়কে খুশী করার জন্য একটি খুকিকে বৌ করিয়া আনিয়াছে? যশোদার বড় আপসোস হয়। একটি বড়-সড় মেয়ে হইলে কেমন মানাইত জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে। মনিবকে খুশি করিতে কেউ যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিতে পারে, তাও এমন বেমানান একটি মেয়েকে, যশোদা কল্পনাও করিতে পারে না। তবে হয়তো সত্যপ্রিয় নিছক মনিব নয় জ্যোতির্ময়ের। সে নাকি জ্যোতির্ময়কে খুব স্নেহ করে। সত্যপ্রিয়ের মত ধনীর স্নেহের মূল্য জ্যোতির্ময়ের মত মানুষেরা হয়ত এইভাবেই দেয়। এই সব লেখাপড়াশেখা ভদ্রলোকদের রকমই আলাদা।

জ্যোতির্ময়ের বোন সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন বৌ হয়েছে যশোদাদিদি?'

'তা মন্দ কি!'

সুবর্ণের বিবাহ হয় নাই, কিন্তু এমন সাজাটাই সে সাজিয়াছে যেন বিয়ের কনেটি, আজিকার উৎসবটি যেন তারই বিবাহের ভূমিকা—সাজগোজেই যেখানে যত বর আছে, সকলকে আজ সে আয়ত্ত কবিয়া রাখিবে। আনন্দে ও উত্তেজনায় মেয়েটা ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতে ছিল, যশোদার জবাবে একটু দমিয়া গেল।

'বৌ বুঝি তোমার পছন্দ হয়নি যশোদাদিদি?'

এত বড় মেয়ের ন্যাকামিতে যশোদাব গা জ্বলিয়া যায়। সে বলিল, 'আমার পছন্দ অপছন্দ কি বোন, আমি তো বিয়ে করিনি? তোমার দাদার পছন্দ হলেই হল।'

দিদিব পিছনে আরও একবার বৌ দেখিতে আসিয়া নন্দ হাঁ করিয়া সুবর্ণকে দেখিতেছিল, এবার সে যশোদার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, 'কেন, বৌ তো সুন্দর, আমার খুব পছন্দ হয়েছে।'

যশোদা মুখ ঘুবাইয়া বলিল, 'ফোড়ন না কেটে তুই যা তো এখান থেকে নন্দ, এত বয়স হল তোর, কথা বলতে শিখলি না এখনো?'

অন্যায় কথাটা কি বলিয়াছে বুঝিতে না পারিয়া নন্দ মুখ ভার করিয়া সরিয়া গেল।

বৌকে দেওয়ার জন্য যশোদা একখানা সস্তা রঙিন শাড়ি আনিয়াছিল, শাড়িখানা বৌ-এর হাতে দিতে একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করিয়া সবর্ণও সরিয়া গেল। কেবল সুবর্ণ নয়, আরও অনেকের মনে হইতে লাগিল, বৌ-এর জন্য উপহার আনিয়া এবং এমন সস্তা একখানা শাড়ি বৌ-এর একেবারে হাতে দিয়া, যশোদা সকলকে অপমান করিয়াছে।

একে দু'য়ে আসিয়া সকলে বৌ দ্যাখে। কেউ একখানা বই দেয়, কেউ সিঁদুরের কৌটা, কেউ কিছুই দেয় না। জ্যোতির্ময়ের দিদি আর বৌদিদি মেয়েদের অভ্যর্থনা করেন, পুরুষদের অভ্যর্থনা করেন জ্যোতির্ময়ের কাকা এবং দাদা। জ্যোতির্ময় নিজে একটি মটকার পাঞ্জাবি পরিয়া এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ায়, সহকর্মী আর বন্ধুদের সঙ্গে একটু হাসি-তামাসা করে, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে সদরে গিয়া দাঁড়ায়, রাস্তায় চোখ পাতিয়া রাখে। বড় অন্যমনস্ক মনে হয় জ্যোতির্ময়কে, বড় চঞ্চল মনে হয়।

একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করে, 'সত্যপ্রিয় আসবে নাকি হে?'

জ্যোতির্ময় চমকাইয়া বলে, 'অ্যাঁ? কে, কর্তা? হ্যাঁ, আসবেন।'

ঠিক অবহেলা নয়, স্পষ্ট বোঝা যায়, সত্যপ্রিয়ব আগমনের আশায় অথবা আশঙ্কায়

জ্যোতির্ময় কারও দিকে ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখিতে পারিতেছে না। আপিসের লোকেরা ব্যাপারটা বুঝিতে পারে, অন্য সকলে বুঝিতে না পারিলেও খানিক খানিক অনুমান করিতে পারে।

তারপর সত্যই সত্যপ্রিয় আসিল।

সত্যপ্রিয় এত বড় ধনী, যত না ধন তার আছে, মানুষের কল্পনায় তার পরিমাণটা এত বেশি বাড়িয়া গিয়াছে যে, সাধারণ লোকের বাড়ি সামাজিক নিমন্ত্রণ রাখিতে গেলে, সকলে অতিমাত্রায় ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া পড়ে। এইজন্য এইসব বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার একটি সুন্দর পদ্ধতি তার নিজেকেই ঠিক করিয়া লইতে হইয়াছে। সকলের আদর, অভ্যর্থনা ও ভদ্রতা করিবার ব্যাকুলতাকে লোকটা এমন কৌশলে নিজেই খানিক খানিক পরিচালনা করে, বলিবার নয়। যেখানে প্রতিনিধি পাঠাইয়া কাজ সারা যায়, সেখানে অবশ্য সত্যপ্রিয় কখনও যায় না, সকলকে সামলাইয়া চলিবার হাঙ্গামাও পোহাইতে হয় না।

মস্ত মোটর আসিয়া থামে, সত্যপ্রিয় নামিয়া আসে— খালি হাতে। জ্যোতির্ময়ের বৌ এর মুখ দেখিবার জন্য উপহার একটা সে আনিয়াছে, কিন্তু এত বড়লোক সত্যপ্রিয়, সে কি উপহার হাতে করিয়া নামিতে পারে? উপহার হাতে থাকে ভূষণের, সে সত্যপ্রিয়র আত্মীয়, বন্ধু, চর বা অনুচর একটা কিছু হইবে। মখমলমোড়া দামী সুদৃশ্য একটি বাক্স, দেখিলেই বোঝা যায়, ভিতরে দামী কিছু আছে।

সত্যপ্রিয় নামিবামাত্র কয়েকটি চাপা গলায় উচ্চারিত হয়, 'ঐ যে উনি, ঐ যে উনি'—'কর্তা এসে গেছেন।' জ্যোতির্ময়ের কাকা আর জ্যোতির্ময় অভ্যর্থনা করিবার জন্য আগাইয়া যায়। আর হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া, নিজের আগমনটা সহজ করিয়া দিবার জন্য, নিজে তিনি যে কতদূর নিরহঙ্কারী, সরল,সহজ মানুষ এটা প্রমাণ করার জন্য, সত্যপ্রিয় বলে, 'না, না, আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমারি তো অপরাধ হয়ে গেল, আমাদের জ্যোতির্ময়বাবুর বাড়ির কাজ, প্রথম থেকে এসে আমারি সব দেখাশুনা করা উচিত ছিল—বড় দেরি করে ফেললাম।' তারপর জ্যোতির্ময়ের দিকে চাহিয়া, 'কেমন লাগছে জ্যোতির্ময়বাবু নব-বিবাহের স্বাদ? মা লক্ষ্মীকে দেখতে পাব তো?'

বেশিক্ষণ থাকা তো উচিত হবে না, তাই ধীরে ধীরে সত্যপ্রিয় উপরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, কিন্তু সমস্তক্ষণ হাসিমুখে এদিকে ওদিকে চাহিয়া দ্যাখে, নিরুদ্বেগ শান্তভাবে এর সঙ্গে ওর সঙ্গে কথা বলে, যেন তাড়াহুড়া কিছুই নাই, সে বহুক্ষণ থাকিবে। পিছনে পিছনে উপহার হাতে চলিতে থাকে ভূষণ।

উপরে উঠিয়া নতুন বৌ-এর সামনে দাঁড়াইয়া সানন্দকণ্ঠে সত্যপ্রিয় বলে, 'বাঃ, বাঃ, সুন্দর মুখশ্রী, চমৎকার লাবণ্য। বেঁচে থাক মা, সুখী হও।' বলিয়া ভূষণবাবুর হাত হইতে মখমলমোড়া কেসটি লইয়া অপরাজিতার হাতে দেয়।

এবার প্রত্যাবর্তনের পালা, অথচ ব্যস্ততা দেখাইলে চলিবে না। সুতরাং দূরের একজন পরিচিত ব্যক্তির দিকে চাহিয়া সত্যপ্রিয় উচ্চকণ্ঠে বলে, 'আমাদের জ্যোতির্ময়বাবুর কেমন ঘরটান হয়েছে, দেখেছেন যোগেনবাবু? আর কি আমরা জ্যোতির্ময়বাবুর দেখা পাব? ঘরের টানে চাকরি ছেড়ে আমাদের না ডুবিয়ে দেন!'

পরিহাসের সুরে কথাগুলি বলিতে বলিতে সিঁড়ির দিকে আগাইয়া গিয়া তেমনি নিরুদ্বেগ, অচঞ্চল মন্থরগতিতে অবতরণ।

'কিছু খেতে হবে? আপনি তো জানেন জ্যোতির্ময়বাবু, আমরা সেকেলে বামুন, সন্ধ্যাহ্নিক

না করে কিছু খাই না। যে ভিড় কাজের, কখন বা বাড়ি ফিরি, কখন বা সন্ধ্যাহ্নিক করি। বেশ তো, বেশ তো, সেজন্য কি, পাঠিয়ে দিন না বাড়িতে, কি খাওয়াতে চান। সেকেলে মানুষের খাওয়াও জানেন তো,—যাই পাঠান, দু'চার মণের মিচে যেন না নামে, দেখবেন।' হাসিতে হাসিতে সত্যপ্রিয় গাড়িতে উঠিল, গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

সত্যপ্রিয়র নিমন্ত্রণ রক্ষার এই পদ্ধতির সঙ্গে জ্যোতির্ময়ের পরিচয় আছে, আরও দু' একটি বাড়িতে প্রায় এই রকমভাবেই সত্যপ্রিয়কে সে নিমন্ত্রণ রাখিতে দেখিয়াছে। কিন্তু একটা ব্যাপার সে আগে দ্যাখে নাই, সত্যপ্রিয়র এত দামী উপহার দেওয়া, কর্মচারীর বৌকে। একটু পরেই তার কানে আসিল, সত্যপ্রিয় একটি নেকলেশ দিয়া বৌ দেখিয়াছে। চোখ-ঝলসানো নেকলেশ, হাজার দেড়েকের বেশিই দাম হইবে। বিস্ময়ে, আনন্দে অভিভূত হইয়া জ্যোতির্ময় নিজের চোখে দেখিতে গেল। দেখিয়া আরও বেশি অভিভূত হইয়া গেল। একি আশ্চর্য ব্যাপার!

সুবর্ণ আবার প্রায় আত্মহারা হইয়া বলিল, 'দেখেছ যশোদাদিদি, দেখেছ?'

যশোদা সংক্ষেপে বলিল, 'দেখেছি।'

সোজাসুজি চেনা না থাক, সত্যপ্রিয়র পরিচয় যশোদা কিছু কিছু জানে। এত দামী জিনিসের দাম না তুলিয়া কি সত্যপ্রিয় ছাড়িবে? হয়তো ইতিমধ্যেই কিছু দাম তুলিয়া নিয়াছে। যে খাটুনিটাই জ্যোতির্ময় খাটে, মানুস হইয়া গাধার মত।

সকাল সকাল খাইয়া যশোদা বাড়ি ফিরিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু সেটা সম্ভব হইল না। মেয়েদের খাইতে বসানোর সময় এমনি বিশৃঙ্খলা দেখা গেল চারিদিকে যে, কখন মেয়েদের দেখিয়া শুনিয়া খাওয়ানোর ভারটা যশোদার ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া গেল, সে নিজেই টের পাইল না, যশোদাকে দেখিয়া মেয়েদের মধ্যে ফিস্‌ফাস, গুজগাজের অন্ত ছিল না মাঝে মাঝে হাসাহাসিও চলিতে লাগিল, কোন্ ফাঁকে কোথা হইতে একটা ফাজিল মেয়ে ডাকিয়া বসিল,'ওগো হিড়িম্বা, এদিকে একটু চাটনি।'

এ সব যশোদা গায়ে মাখে না, অভ্যাস আছে। যেদিক হইতে ডাক আসিয়াছিল, সেদিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিমুখে সে বলিল, 'খুকি-পুতুল কি কে চাটনি চাইলে গা? পাঁপড় নেবে?'

অনেক রাত্রে নিজের অন্ধকার ঘুমন্ত পুরীতে ফিরিয়া যশোদার কিন্তু কেমন একটু অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। হিড়িম্বা? হিড়িম্বার মত দেখায় নাকি তাকে ? আলো জ্বালিয়া যশোদা আয়নায়, নিজের মুখখানা একবার দেখিল, কিন্তু এতটুকু আয়নার শুধু নিজের মুখ দেখিয়া কি বোঝা যায়, তাকে হিড়িম্বার মত দেখায় কিনা। আয়নাটি দেয়ালে লটকাইয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া যশোদা এঁটো থালা আর পাতা গুনিয়া দেখিল। একজন খায় নাই। ধনঞ্জয় না কি?

ভাবিতে ভাবিতে ধনঞ্জয় কোথা হইতে সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। বলে, 'শোন বলি চাঁদের মা, কাল ভোরে আমি দেশে ফিরে যাব।'

'বটে নাকি? তা বেশ তো।'

'কত পাবে বল দিকি, পাওনাটা মিটিয়ে দিই তোমার।'

'পাওনা মিটিয়ে দেবার জন্যে না খেয়ে রাত দুটো পর্যন্ত জেগে বসে রয়েছ? মাথা খারাপ নাকি তোমার?'

ধনঞ্জয় একটু দমিয়া যায়, এদিক ওদিক চাহিয়া বলে, 'ভোর ভোর রওনা দেব কিনা,

তুমি আবার এত রাত জাগলে, উঠতে তোমার বেলা হবে কিনা, এইজন্যে।'

'আমার চেয়ে ভোরে উঠবে তুমি ? কখন উঠে উনুনে আঁচ দিই টের পেয়েছ একদিনও?'

ধনঞ্জয় আরও দমিয়া গিয়া বলে, 'রাত জাগলে কিনা—'

'একরাত জাগলে আমরা কাজে ঢিল দিই না, তোমাদের মত নবাব, বাদশা তো নই আমরা? তা, ভাত খেলে না, কি জন্যে ? পরিবেশন করতে বলেছিলাম বলে অপমান হয়েছে বুঝি?'

ধনঞ্জয় চুপ করিয়া থাকে, যশোদা কড়াদৃষ্টিতে তার বিরাট দেহটা দেখিতে দেখিতে অবজ্ঞা-মেশানো কড়া গলায় বলে, 'রোজগার করতে এসে লেজ গুটিয়ে দেশে পালাচ্ছ, ধিক তোমাকে। অত বড় দেহটা রেখেছ কি জন্যে, কাজের নামে যদি শিউরে ওঠ, দুটো পয়সা যদি না উপায় করতে পার? রোগাপ্যাঁটকা এইটুকু-টুকু বাচ্চাগুলো পর্যন্ত চানাচুর, খপ্‌রের কাগজ বেচে পয়সা কামাচ্ছে সহরে, তুমি পারলে না?'

এবার ধনঞ্জয় রাগ করিয়া বলিল, 'তোমার অত মুরুব্বিপনা কি জন্যে শুনি? মানুষকে মান্য করে কথা কইতে না পার, চুপ মেরে থাক।'

যশোদাও রাগ করিয়া বলিল, 'কাজের মুরোদ নেই, তেজ তো আছে দেখি ষোল আনা? যেও তুমি, কাল সকালে দেশে ফিরে, আমার কি!'

পরদিন সকালে ধনঞ্জয় দেশে চলিয়া গেল।

কেবল যশোদার উপর রাগ করিয়া নয়, সহর আর সহরতলী তার সহ্য হইতেছিল না। আরও বেশি হইতেছিল না, চাকরির জন্য চেষ্টা করিতে গেলে যা সব সহ্য করিতে হয়।

দুই

যশোদার বাড়িটি যেখানে, তারই কাছাকাছি শেষ হওয়া উচিত ছিল সহরতলীর। কিন্তু, সহরতলী যেন নিজেকে ডিঙ্গাইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সহর, যেন নিজেকে ছড়াইয়া দিয়াছে দূরে,বহু দূরে— সহরের দিকে পিছন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে ক্রমে ক্রমে পথের, পথের দু'পাশের বাড়ি-ঘর, মাঠ-পুকুর, ঝোপ-ঝাড়ের, পথচারী মানুষের মুখের ভাব ও আলাপের সহুরে ভাবটা কমিয়া আসিতে থাকে বটে, কিন্তু একেবারে লুপ্ত যেন হয় না। ধনঞ্জয় একদিন প্রায় দশ-বার মাইল হাঁটিয়া গিয়াছিল ঝোঁকের মাথায়, যশোদার সঙ্গে ঝগড়া করিবার পরেই যে ঝোঁকটা আসিয়াছিল ; চলিতে চলিতে তার মনে হইয়াছিল, সহরের শেষ চিহ্নটুকু পিছনে ফেলিয়া যাইতে হইলে তিনশ' মাইল তফাতে তার গ্রামের নদীটি পর্যন্ত তাকে হাঁটিতে হইবে, তারপর সাঁতার দিয়া পার হইতে হইবে নদী, নদী যাতে তার দেহলগ্ন শেষ সহুরে ধূলিকণাটি ধুইয়া মুছিয়া লইতে পারে। যশোদার সঙ্গে কলহের পরেই সহরের উপর ধনঞ্জয়ের বিতৃষ্ণা বাড়িয়া যাইত। একটু বসিয়া থাকিতে দেখিলেই যশোদা যে তাকে খোঁচায়, এটাও ধনঞ্জয় সহুরে অমানুষিকতার পর্যায়ে ফেলিয়াছিল। যশোদা যে তার চাকরি জুটাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, দু'টি কাজ যোগাড়ও করিয়া দিয়াছিল, এজন্য ধনঞ্জয় কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা বোধ করে নাই। যাদের দেওয়ার ক্ষমতা আছে, তাদের কাছ হইতে যশোদার ভাড়া আর খাওয়া-খরচ আদায় করিবার কড়াকড়িতেও সে স্তম্ভিত হইয়া যাইত।

যাদের কাজ গিয়াছে, কাজের খোঁজে আসিয়া যারা কাজ পাইতেছে না, তাদের যে যশোদা বিনা পয়সায় থাকিতেও দেয়, খাইতে পরিতেও দেয়, এতটুকু অবহেলা দেখায় না, চেষ্টা করিয়া কাজও জুটাইয়া দেয়, এ দিকটা সে সময় ধনঞ্জয়ের খেয়ালও হইত না, তার শুধু মনে হইত, সহরে মেয়েমানুষ কি ভয়ানক! তবু যশোদার সঙ্গে কলহ করিলে মনটা বড় খারাপ হইয়া যাইত ধনঞ্জয়ের ; যশোদার স্যাঁৎসেঁতে বাড়ির মধ্যে থাকিতেও তার দম আটকাইয়া আসিত, বাড়ির বাহিরে সহরতলীর আবেষ্টনীতেও ফাঁপর ফাঁপর লাগিত।

জ্যোতির্ময়েরও মাঝে মাঝে এ রকম হয়, কারও সঙ্গে কলহ না করিলেও সহরের চেয়েও এখানকার সহরতলীর জীবনের গতি তার যেন মনে হয়, অনেক বেশি ঊর্ধ্বশ্বাসী। কাছাকাছি অনেকগুলি কল-কারখানা থাকার জন্য নয় কেবল, কাছাকাছি অনেকগুলি কলের চাকা ঘুরিতেছে বলিয়াই মানুষের জীবনের গতি বাড়ায় না, কলের চাকার গতিবেগ হাজার মাইল দূরে মানুষের জীবনেও সঞ্চারিত হইতে জানে। দুপুরবেলা বড় রাস্তার গাড়িগুলি যে ভাবে পরস্পরের গতিবেগ সংযত করে, থামিয়া থামিয়া যেভাবে অগ্রসর হয় শ্লথগতিতে, তাতে বরং মনে হওয়ার কথা, জীবনের গতি এখানে কল-কারখানার কল্যাণেই বুঝি মন্থর। কিন্তু জীবনের গতি তো চলাফেরা ; ছুটাছুটি নয়, বিমানে যে বোঁ করিয়া পৃথিবীটা পাক দিয়া আসিল, জীবন হয়তো তার অলস ও শান্ত, ছোট একটি ডিঙ্গি ভাসাইয়া, গা এলাইয়া পৃথিবীটা পাক দিতে জীবনের বেশির ভাগ ব্যয় হইয়া গেলেও হয়তো তার কিছু আসিয়া যায় না। সহরের চেয়ে সহরতলীর মানুষের জীবনীশক্তি বেশি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যের উগ্রতা বেশি, অভাবও বেশি। বাস্তব অভাব, পার্থিব অভাব, রক্ত-মাংসের মানুষের জীবনকে যে অভাব করিয়া দেয় একেবারে অভিশপ্ত। অভাবের তাড়নায় সহরের চেয়ে সহরতলীর সমবেত জীবনীশক্তি অনেক বেশি তাড়াতাড়ি নিজেকে ক্ষয় করিয়া ফেলে। নতুন জীবন সে ক্ষয়ের পূরণ করিয়া চলে ক্রমাগত, সে নতুন জীবন এখানে যত-না সৃষ্টি হয় তার চেয়ে বেশি পরিমাণে আসে বাহির হইতে, নিকট ও দূর হইতে।

ধনঞ্জয় চলিয়া যাওয়ার পর আরও দু'জন বৈশাখ মাসের মধ্যে চলিয়া গেল যশোদার বাড়ি হইতে ; একজন দেশে, আরেকজন স্বর্গে, অথবা নরকে, মৃত্যুর যদি অন্য কোন দেশ থাকে, সেইখানে। সত্যপ্রিয় মিল এবং আর কয়েকটা মিলে বড় রকমের একটা ধর্মঘটের উপক্রম হইয়া থামিয়া গেল। পাড়ায় ছেলেদের 'মডার্ন ক্লাব ও লাইব্রেরী'র প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসব হইয়া গেল, সত্যপ্রিয় আসিয়া একটি স্বলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিল। আমাদের দেশের আগেকার অবস্থার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া কত যে তাতে হা-হুতাশ আর বার তিনেক ইংরাজের সঙ্গে ঝগড়া না করিয়া দেশের প্রকৃত উন্নতির চেষ্টা করিবার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ! 'মডার্ন ক্লাব ও লাইব্রেরী'র পক্ষে প্রবন্ধটি একটু খাপছাড়া হইল বটে, কিন্তু পাঁচশত টাকা দান করিয়া যিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন, তাঁকে নিজের ইচ্ছামত প্রবন্ধ পাঠ করিতে না দিলে তো চলে না। তা ছাড়া মতামত যেমনই হোক, আগাগোড়া দেশের জন্য কি গভীর মমতা প্রবন্ধটিতে প্রকাশ পাইয়াছে! দেশের দুরবস্থার, বিশেষত, যুবকগণের বেকার সমস্যার যে শোচনীয় বর্ণনা আছে, শুনিতে শুনিতে কী গভীর হতাশায় মন ভরিয়া যায়! কেমন একটা প্রেরণা জাগে মনের মধ্যে যে, অন্য চিন্তা চুলোয় পাঠাইয়া হাসিমুখে আদর্শের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার মত বাজে গোঁয়ার্তুমি ভুলিয়া গিয়া, বড় কিছু করা আর বড় কিছু হওয়ার মরীচিকাকে প্রশ্রয় না দিয়া, ভবিষ্যতে যাতে কোনরকমে খাইয়া পরিয়া সুখে থাকা যায়, প্রথম বয়স হইতেই প্রাণপণে সেই চেষ্টা করা কর্তব্য।

নন্দ উৎসবে গিয়াছিল, বাড়ি ফিরিয়াই বলিল, 'একটা চাকরি না হলে আর চলবে না, দিদি।'

রাত তখন দশটা বাজিয়াছে। যশোদা বলিল, 'তুমি যদি চাকরি করবে তো, কেত্তন গেয়ে দিন কাটাবে কে? কাল সকালতক সুবুদ্ধি টিকবে না, টেকে তো, কাল সকালে চাকরির ভাবনা ভাবিস। এখন খেয়ে নিয়ে আমায় ছুটি দে তো, গরমে সিদ্ধ হলাম।'

ভাইকে ভাত বাড়িয়া দিয়া বলিল, 'মতি বুড়ো আর সুধীর এখনো ফেরেনি! জ্বালিয়ে খেলো দুটোতে আমাকে —চাকরাণী পেয়েছ আমায়। কাল যদি না তাড়াই দুটোকে—'

আজ গুমোট দিয়া এমন গরম পড়িয়াছে যে, রাত্রে ঘরের মধ্যে যশোদার ঘুম আসিল না। ঘন্টাখানেক এপাশ-ওপাশ করিয়া আর প্রাণপণে হাত পাখা চালাইয়া সে উঠিয়া গেল ছাতে, ভাবিল, বাকি রাতটা ছাতেই মাদুর পাতিয়া শুইয়া থাকিবে। ছাতে গিয়া দ্যাখে কি, তিলধারণের স্থান নাই। দশ-বারজন মানুষ এলোমেলোভাবে মাদুর আর ছেঁড়া সতরঞ্চি বিছাইয়া সমস্ত ছাতটি দখল করিয়া আছে. কেউ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কেউ বসিয়া টানিতেছে বিড়ি।

দু'চারজন মানুষ হইলে যশোদা হয়তো গ্রাহ্য করিত না, একপাশে মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িত। কিন্তু এতগুলি পুরুষের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া মেয়েমানুষ কি ঘুমাইতে পারে!

মতি আর সুধীর খানিক আগে ফিরিয়া আসিয়াছে, ঘরের ভিতর হইতেই যশোদা স্টো টের পাইযাছিল। কিছু না বিছাইয়াই দু'জনে একপাশে শুইয়া পড়িয়াছে, বোধ হয়, যশোদাকে ছাতে আসিতে দেখিয়া। দু'জনে নেশা করিয়া আসিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু রাত বারোটা বাজিতে না বাজিতে ফিরিয়া আসিয়াছে কেন? কি কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে দু'জনে কে জানে!

আলিসায় বসিয়া একজন বিড়ি টানিতেছিল, বলিল, 'বড় গরম না, চাঁদের মা?'

যশোদা ঠাহর করিয়া দেখিল, তার অন্য বাড়ির ভাড়াটে জগৎ। একটু আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'তুমি এ বাড়িতে ঢুকলে কখন?'

জগৎ বলিল, 'মতি আর সুধীর দরজা খোলার জন্যে ডাকছিল, শুনতে পেয়ে বেরিয়ে এলাম ঘব থেকে। ভাবলাম কি, তোমার এ বাড়ির ছাতে যদি একটুকু হাওয়া পাই, তা শালার হাওয়া কই! ই কি গুমটো গরম গো চাঁদের মা, এ্যাঁ?'

যশোদা কাছে আগাইয়া গেল, 'গরম তো বটে, কিন্তু তোমার কি চোখে ঘুম নেই, রাতদুপুরে বসে বসে বিড়ি টানছ? সকাল সকাল যেতে হবে না কাজে?'

'ঘুম না এলে করব কি বল? ঘরে গরমে সিদ্ধ করে দিল, ছাতে এলাম, তা এখানে যেমনি গরম, তেমনি মশা।'—বিড়িটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কাঁধের কাছে সশব্দে চড় মারিয়া জগৎ মশা মারে ; গরমটা যশোদা নিজেও অনুভব করিতেছে, মশার উৎপাতও যে কম নয়, তারও তো একটা প্রমাণ দেওয়া চাই! আলিসায় ভর দিয়া যশোদা কিন্তু ভাবে যে, কে জানে গরম আর মশা-ই তোমায় জাগিয়ে রেখেছে, না কারুর কথা ভেবে তোমার চোখে ঘুম নেই!

'দেশে মশা নেই তোমাদের ?'

'আছে না? মানুষ টেনে নিয়ে যেতে পারে, এমন মশা।'

'আমায় টেনে নিতে পারবে না, কি বল? তেমন গতর আমার নয়।' বলিয়া আলিসায় ঠেসান দিয়া যশোদা একটু হাসিল। মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ অকারণে নিজের দেহের বিপুলতার কথাটা যশোদার মনে পড়িয়া যায়। ক্ষীণ চাঁদের আলোয় ঘুমন্ত মানুষগুলিকে আবছা দেখা যাইতেছিল। সকলেই ঘুমের মধ্যে অল্প বিস্তর নড়িতেছিল, কেবল মতি আর সুধীর মটকা-

মারিয়া থাকায় দু'জনে হইয়া ছিল কাঠের মূর্তির মত স্থির।

'গতর বড় হলে গরমটা বেশি লাগে, না জগৎ? সবাই ঘুমুচ্ছে দ্যাখো, আমার. গরমে প্রাণটা বেরিয়ে গেল।'

'গরমের জন্যে নয়, গরমটা সত্যি যেন কেমন খারাপ হেথা, গায় সয় না। দেশের গরম এমন নয়।'

যশোদা তা জানে। যাহারা অল্পকাল সহরে আসিয়াছে দেশ ছাড়িয়া, দেশের গরমটা পর্যন্ত তাদের ভাল লাগে। তা না হইলে ধনঞ্জয় অমনভাবে দেশে পলাইয়া যায়?

'আচ্ছা একটা কথা তোমায় শুধোই জগৎ, ঠিক মত জবাব দিও, মনরাখা কথা বোলো না, এ্যাঁ? আমি খুব মোটা, না?'

'মোটা? উঁহু, মোটা তো তুমি নও চাঁদের মা? একটু বাড়ন্ত গড়ন তোমার, বাস্।'

শুনিয়া খুশি হইয়া জগৎকে শুইয়া পড়িতে বলিয়া যশোদা নিচে নামিয়া গেল। ঘরের মধ্যে প্রাণপণে পাখা নাড়িতে নাড়িতে এক সময় ঘুমাইয়াও পড়িল।

সকালে কলতলার কাজ সারিয়া বান্নাঘরে জলের বালতি দু'টি নামাইয়া রাখিয়া যশোদা আবার ছাতে গেল। প্রায় সাতটা বাজে, জ্যোতির্ময়ের দোতলা বাড়ির পাশ কাটাইয়া যশোদার ছাতের অর্ধেকটাতে রোদ আসিয়া পড়িয়াছে। রোদের মধ্যেই এখনও পড়িয়া ঘুমাইতেছে তিনজন—জগৎ, মতি আর সুধীর। জগৎ মন কেমন করায় রাত জাগিয়াছিল, অন্য দু'জন করিয়াছিল নেশা। দরদ অথবা মদ, যে নেশার ফলেই হোক, মানসিক কোমলতা আনিবার কি সুন্দব আরামজনক পরিণাম! যশোদা প্রথমে মতি আর সুধীরকে ঝাঁকানি দিয়া তুলিয়া দিল, তারপর ডাকিয়া তুলিল জগৎকে।

মতি আর সুধীব হাই তুলিয়া, গা হাত মোড়া দিয়া, বিড়ি ধরাইয়া একটু আবাম করিতে যাইতেছিল, যশোদা বলিল, 'তোমরা দু'জন ভাত পাবে না এ বেলা। চানটি করে নিয়েই দৌড়ে কাজে চলে যাও। ছুটতে ছুটতে গেলে, ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারবে।'

দু'জনেই বিড়ি কোমরে গুঁজিয়া উঠিয়া পড়িল। মতি একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, 'ভাত হয়নি যশোদা? খিদেয নাড়ীতে পাক দিচ্ছে।'

যশোদা ছাতে ছড়ানো মাদুর-চাটাইগুলি একটি একটি করিয়া গুটাইয়া তুলিতে ছিল। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া একগাল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'যশোদা কে গো, মতিবাবু মশায়, জিজ্ঞেস করি তোমাকে?'

মতির চুল প্রায় সাদা হইয়া আসিয়াছে, কুলি-মজুরও তাকে ঠিক বলা যায় না, কারণ, সত্যপ্রিয় মিলে গাঁটের উপর আলকাতরা দিযা সঙ্কেত, অক্ষর ও সংখ্যা আঁকিয়া দেওয়া তার কাজ। সে নাম ধরিয়া ডাকিলে যশোদার রাগ করা উচিত নয়, সব সময় রাগ সে করেও না। কিন্তু যশোদার মেজাজ বোঝা ভার। হাসি ও প্রশ্নে মতি কাবু হইয়া পড়ায়, যশোদা নিজেই আবার বলিল, 'আমাকে ডাকছ নাকি যশোদা বলে? কাল একপেট গিলে সাহস বেড়ে গিয়েছে, নয়? সবাই চাঁদের মা বলে, তুমিও না হয় তাই বললে। একবার বলো তো, কেমন শোনায় দেখি?'

মতি ভয়ে ভয়ে বলিল, 'ভাত হয়নি, চাঁদের মা?'

যশোদা বলিল, 'ভাত হবে না কেন, তোমরা এ বেলা পাবে না ভাত। চান করে মাথা ঠাণ্ডা করে নিয়ে ছুটে যাও দিকি কাজে, কাজে না গেলে একটি বেলাও ভাত জুটবে

না মতি।'

কাজ গেলে যে যশোদাই তাকে দু'বেলা ভাত জোগাইবে, যতদিন আবার কাজ না হয়, মতিও তা জানে, যশোদাও জানে। তবে সেটা তর্কের বিষয় নয়, মতি ও সুধীর কথা না বলিয়া নিচে চলিয়া গেল। এখানে বাস করিলে মদ খাওয়া চলিবে না—। এই ধরনের একটা নিয়ম যশোদা করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু নিয়মটা ভাঙ্গিলেই সে যে সব সময় শাস্তির ব্যবস্থা করে, তা নয়। এদের জীবনের সঙ্গে যশোদার পরিচয় আছে, জীবনের যে স্তরে, যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এরা বাস করে, তাও তার অজানা নয়। কঠোর নিয়ম করিলে চলিবে কেন? কে সে নিয়ম মানিয়া চলিবে? কি দরকার সে নিয়ম মানিয়া চলিবার, জীবন যাদের সবদিক দিয়া ফাঁকিতে ভরা? কেবল একটা বিষয়ে সাধু হইলেই কি দিনগুলি ওদের সুখে আর আরামে ভরিয়া উঠিবে! অতিরিক্ত অবিশ্রাম খাটুনি, পেটভরা খাদ্য আর বিরাম ও আরামের অভাব, সমস্তই যাদের বিষের সমান, দু-এক চুমুক বাড়তি বিষ পান করিলে, তাদের কি আসিয়া যায়! কেবল বাড়াবাড়িটা রদ করিবার জন্য যশোদা মাঝে মাঝে রাগ দেখায়, শাস্তি দেয়, তবে শাস্তিটা হয় একটু খাপছাড়া ধরনের, যেন দুরন্ত ছেলেকে শাসন করিতেছে এমনি।

নিচে নামিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া যশোদা ডাক দিল, 'নন্দ, একটু পরিবেশন করবি, আয় দিকি দাদা।'

নন্দ আসিলে ভাত বাড়িতে বাড়িতে যশোদা বলিল, 'কাল তো বলছিলি, চাকরি নইলে চলবে না, আজ যা না একবার জ্যোতিবাবুর আফিসে?'

'কি হবে গিয়ে? কাজ দেবার মতলব ওদের নেই।'

যশোদা রাগ করিয়া বলিল, 'কাজ দেবার মতলব কার থাকে রে ছোঁড়া? কাজ আদায় করে নিতে হয়। যা চেহারাটি করেছ নিজের, ভরসা করে কে তোমাকে কাজে লাগাতে চাইবে? জ্যোতিবাবুকে বলছি গিয়ে আরেকবার, দুপুরবেলা একবার যাস। পয়সা চেয়ে নিয়ে যাস্ ট্রামের।'

নন্দ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া পাঁচটি থালায় যশোদার ভাত বাড়া দেখিতে লাগল। দরজা দিয়া দেখা যায়, খাইতে বসিয়াছে তিনজন, পাঁচ থালা ভাত বাড়িবার দরকার? চাকরির সমস্যার চেয়ে এই সমস্যাটাই যেন নন্দকে পীড়ন করিতে লাগিল বেশি। শেষে থাকিতে না পারিয়া যশোদার ভুল সংশোধনের জন্য বলিল, 'পাঁচ থালা বাড়ছ যে? তিনজন বসেছে মোটে—কেষ্ট, যতীন আর বলাই।'

'যা থালা বাড়ি, তোর তাতে কি? তিনজন বসেছে তো আর কেউ বসতে জানে না?' থালায় ভাজা, আলুসিদ্ধ আর চচ্চড়ি সাজাইয়া দিয়া যশোদা বাহির হইয়া গেল। রান্নাঘরেই যে কথা নন্দকে অনায়াসে বলা চলিত, উঠানে দাঁড়াইয়া সেই কথাগুলি পাড়াশুদ্ধ লোককে শুনাইবার মত জোর গলায় বলিল, 'যার যা লাগে, দিসরে নন্দ, আমি বাজারে গেলাম।' —মতি আবার একটু কানে কম শোনে, ঘণ্টাখানেকের মত যশোদা বাড়ি ছাড়িয়া গিয়াছে না জানিলে তাড়াতাড়ি দু'টি ভাত খাইয়া কাজে যাইবার সাহস বুড়োর হইবে না।

বাজারে যশোদা যায় বটে, এ সময় কোনদিন যায় না। এত সকালে বাজারও ভাল রকম বসে নাই, বাড়িতেও দু'য়ে-চারে উনিশটি মানুষকে ভাত দিবার হাঙ্গামা। নন্দ একা কেন সামলাইতে পারিবে? তবু যশোদা বাড়ির বাহির হইয়া গেল। পেট ভরিয়া দু'টি ভাত-তরকারি খাইতে পাওয়া যাদের জীবনের চরম বিলাসিতা, পেট ভরাইয়া কাজে গেলেও দিনটা অর্ধেক

কাবার হইতে না হইতে যাদের পেটে আবার ক্ষুধার আগুন জ্বলিতে থাকিবে, নিজে ভাত বাড়িয়া তাদের খাওয়ানোর দায়িত্বটা যশোদা হঠাৎ যেন ভুলিয়া গিয়াছে!

যশোদার এ বাড়ির সদর দরজাটি সরু ও স্যাঁতসেঁতে গলিতে, দু পাশে টিন আর খোলার বাড়ি। আর একটি বাড়ি আছে যশোদার, কতগুলি টিনের ঘরের সমষ্টি। গলিটি হাতিতিনেক চওড়া, যশোদার বাড়িদুটির মধ্যে ব্যবধানও হাততিনেক, দু'টি বাড়ির সদর দরজাও প্রায় মুখোমুখি।

ও-বাড়িটাকে যশোদা চিড়িয়াখানা বলে, এই চিড়িয়াখানায় জীবগুলির বাস করিবার ব্যবস্থা প্রধানত স্ত্রী-পুরুষে, জোড়ায় জোড়ায়। মাঝে মাঝে জোড় ভাঙ্গিয়া যায়, যশোদার চেষ্টাতেও আর জোড়া লাগে না, মাঝে মাঝে নতুন জোড়া বাস করিতে আসে, পুরানো জোড়া বিদায় নেয়। জোড় ভাঙিয়া হোক, একসঙ্গে হোক, বিদায় যারা নেয়, হয়তো পাড়াতেই কোন বাড়িতে তাদের দেখা যায়, হয়তো কোনদিন আর তাদের পাত্তাও মেলে না। সহরের চারিদিকেই সহরতলী, একদিকের সহরতলী হইতে আরেকদিকের সহরতলীতে গেলেও দূরদেশে যাওয়ার মতই মানুষ হারাইয়া যায়।

বাড়িটাতে ছেলেমেয়ে আছে এক গাদা—বাহির হইতেই নানা বয়সের ছেলে-মেয়ের হৈ-চৈ হল্লোড় ও কান্না শুনিতে পাওয়া যায়। একখানা ঘর আর রান্নার জন্য আনাচে-কানাচে একটু জায়গা, এই তো রাজ্য এক-একটি ভাড়াটের, এতে রাশি রাশি ছোট-বড় ছেলে-মেয়ে কোথায় গুদামজাত করা থাকে, ভাবিতে সত্যই বিস্ময় বোধ হয়।

আগে, দু'টি বাড়িই যশোদা স্ত্রী-পুরুষনির্বিচারে ভাড়া দিত, ভাড়াটেরা কি করে না করে, সে বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া মাসে মাসে ভাড়াটা পাইলেই খুশি থাকিত। অভিজ্ঞতা জন্মিতে জন্মিতে ক্রমে ক্রমে যশোদার জ্ঞান হইয়াছে যে, সংসারে যত গণ্ডগোলের গোড়া, মেয়েমানুষ। জ্ঞান জন্মিবার পর এ দিকের বাড়িটাকে ঘরোয়া মেস বা হোটেল বা ঐ ধরনের একটা কিছুতে পরিণত করিয়া স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিয়াছে।

বলিয়াছে, 'না বাবু, সুখের চেয়ে আমার স্বস্তি ভাল।'

কোন্‌টা যে তার সুখ ছিল, আর কোন্ স্বস্তিটা যে তার ভাল হইয়াছে, দু'বাড়ির আবহাওয়ার পার্থক্যই সেটা পরিষ্কার ঘোষণা করিয়া দেয়।

এ-বাড়িতে দু'খানা পাকা ঘর সে নিজের দখলে রাখিয়াছে। একটি ঘরে থাকে তার আসবাবপত্র, অন্য ঘরটিতে থাকে সে আর তার ভাই নন্দ। ঘর দু'খানা একটু পিছনের দিকে, মাঝখানে সিঁড়ির নিচে একটা দরজা আছে, সেটা বন্ধ করিলে, বাড়ির সঙ্গে ঘর দু'খানার আর যোগ থাকে না। আগে যশোদা দরজাটা নিয়মমত বন্ধ করিত, আজকাল গ্রাহ্যও করে না। এর দু'টি প্রধান কারণ আছে। প্রথমত, তার গায়ে এত জোর যে, এ বাড়িতে এমন একটিও পুরুষ নাই যে, তার হাতের একটা চড় খাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, দ্বিতীয়ত, নিজে সে যে স্ত্রীলোক, এটা তার সব সময় খেয়ালও থাকে না।

শেষোক্ত কারণটা যশোদার শত্রুও স্বীকার করে। যশোদার সবচেয়ে বড় শত্রু তার ছেলেবেলার সখী কুমুদিনী, পাড়াতেই স্বামী পুত্র, সংসার লইয়া সে বাস করে। যশোদার কথা উঠিলেই তাকে বলিতে শোনা যায়, 'ওটা কি মেয়েমানুষ? ও মেয়েমানুষের বাবা!' আরও অনেক কথা সে বলে, বলিতে বলিতে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। তারই সংজ্ঞা-অনুসারে যশোদা যে মেয়েমানুষ নয়, মেয়েমানুষের বাবা, এ কথাটা ভুলিয়া গিয়া নাক সিঁটকাইয়া তীব্র আবেগের সঙ্গে সে আবার বলে, 'পুরুষের গাদি বাড়িতে, তার সব কটা

হয় মাতাল, নয় গুণ্ডা, মেয়েমানুষ হয়ে কি করে যে ওদের মধ্যে থাকে মাগো!'

একটু খাপছাড়া জীবন-যাপন করে বৈকি যশোদা, একটু অনন্যসাধারণ হয় বৈকি তার রীতিনীতি, চাল-চলন, কিন্তু খুব বেশি বে-মানান যেন তার পক্ষে হয় না। এরকম অবস্থায় অন্য কোন স্ত্রীলোক হয় পুরুষের আশ্রয় খুঁজিত, নয় মানুষের মতবাদ ও নির্দেশের চাপে ধ্বংস হইয়া যাইত, যশোদা কিছুই করে নাই। জীবনযাপন করে সে স্বাধীন, কারও কাছে তার কোন প্রত্যাশা নাই, নিন্দা, প্রশংসা সে গ্রাহ্য করে না। কারও দরদের জন্য কাঁদিয়াও মরে না। বিপদে-আপদে তারই কাছে মানুষ উপকার পায়, পুরুষের কাছে যে কাজ পাওয়া কঠিন, যশোদার কাছে তাই পাওয়া যায়। লম্বা-চওড়া, শক্ত সমর্থ শরীরটাতে তার নারীসুলভ লাবণ্য ও কোমলতার চিরদিন এমন অভাব যে, বয়স যখন আরও কম ছিল, তখনও কোন পুরুষের সঙ্গে তার বৈধ বা অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক থাকিতে পারে, এ কথাটা মনে আনিতেও লোকের কেমন সঙ্কোচবোধ হইত, মনে হইত, না তা হয় না।

একটা গুজব শোনা যায়। দশ-বার বছরের আগেকার কথা, যশোদা যখন সবে ভদ্র-অভদ্র নির্বিশেষে ঘর-ভাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। সত্যপ্রিয়র বাগানবাড়িটা তখন নাকি কেবল ঝোপ-ঝাপে ভরা বাগান ছিল, চারিদিকের প্রাচীর ছিল ভাঙ্গা। বাগানের মধ্যে গাছপালার আড়ালে একটা আখড়া ছিল কুস্তির এবং সেই আখড়ার ওস্তাদ ছিল কেদার নামে একটি মাঝবয়সী লোক। মাথা গিয়া ঠেকিত ঘরের ছাতে, দরজা দিয়া যাতায়াত করিতে হইত পাশ ফিরিয়া, রাস্তায় ষাঁড়কে সরাইয়া সে পথ চলিত। মানুষ যে অমন জোয়ান হয়, তাকে যারা চোখে না দেখিয়াছে, তাদের কি তা বিশ্বাস হয়? রূপকথার রাজপুত্রের মত কোথা হইতে আসিযা দু-একটা বছর এ পাড়ায় বাস করিয়া, পাড়ার ছেলেদের কুস্তি শিখাইয়া, পদক্ষেপে দ'পাশের বাড়ি কাঁপাইয়া পথ দিয়া হাঁটিয়া, কে জানে, আবার সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সে চলিয়া যাওয়াব পর বিশ্বসংসারে যশোদা নাকি আর পুরুষ দেখিতে পায় না, সকলে তার কাছে শিশু। আজও যশোদা তার সেই ভালবাসার লোকটির পথ চাহিয়া আছে।

যশোদা শুনিয়া হাসে,'তা নয়? চেয়ে চেয়ে চোখ ভবে গেল সত্যি। ইবারে যদি না চশমা লি—'

অনেকেই মনে মনে বলে, 'মরণ তোমার, বেহায়া!' কিন্তু দু-চারজন ভাবপ্রবণ যারা আছে, তারা মনে মনে বলে, 'আহা!' ব্যাকুল আগ্রহে তারা যশোদার মুখে একটু বেদনার ছাপ খোঁজে, চোখের দৃষ্টিতে একটু ব্যথার আভাস দেখিতে চায়। কিন্তু হায়রে, যশোদার হাতীর দেহে হাতির প্রাণ, এক মুহূর্তের জন্য যদি তার চোখে মুখে স্বপ্নময় ব্যথিত বেদনার ছাপ দেখা গেল।

বাড়ি দু'টিতে যশোদা যদি কেবল গরীব ভদ্রগৃহস্থদের ভাড়াটে রাখিত, তবে কোন কথা ছিল না। প্রথমে কিছুকাল ঐ রকম ভাড়াটেই যশোদা খুঁজিত, মাল সরকার, ট্রামের কণ্ডাক্টর, প্রেসের কম্পোজিটার এই শ্রেণীর ভাড়াটের নিচে সে নামিত না। তারপর সমস্ত বাছ-বিচার তুলিয়া দিয়াছে। ভদ্রলোকেরা নাকি বড় বেশি ছোটলোক, যারা পুরা ভদ্রলোকও নয়, খাঁটি ছোটলোকও নয়, তারা নাকি একটা অদ্ভুত, অপদার্থ জীব। তার চেয়ে কুলি-মজুরও ভাল। বাবুদের চক্ষুলজ্জা আছে, কুলি-মজুরের ভয-ডর আছে, কিন্তু না-বাবু, না-কুলি-মজুরদের চক্ষুলজ্জাও নাই, ভয়ডরও নাই। সাহসের অভাব হইলে যে ভয়ডর হয়, সে ভয়ডরের কথা যশোদা বলিতেছে না, ও-রকম ভয়ডর এ শ্রেণীব লোকগুলির পুরামাত্রাতেই আছে, সে হিসাবে ওরা সব কেঁচোর মত অপদার্থ জীব, ওদের ভয়ডর নাই ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে, তিল

তিল করিয়া আত্মহত্যা করা সম্বন্ধে আর ওদের উপর যাদের বাঁচিয়া থাকা নির্ভর করে, তিল তিল করিয়া তাদের হত্যা করা সম্বন্ধে। কেমন যেন চালচলন ওদের, কেমন যেন ভাল মন্দ, পাপ-পুণ্যের হিসাব, কোকেনখোরদের মত। মা, বোন যখন খাইতে পায় না, বৌ যখন জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে রান্না করে, পথ্য না দিয়া ছেলেকে কেবল ওষুধ খাওয়াইতে হাসপাতালের ডাক্তার যখন বারণ করিয়া দেন, তখনও সকলের কথা ভুলিয়া গিয়া বাহিরে পুরুষমানুষের স্ফূর্তি করিবার ব্যাপারটা যশোদা বুঝিতে পারে। কিন্তু তখন দুশ্চিন্তায় মুখ পাংশু করিয়া কপাল চাপড়াইতে চাপড়াইতে অদৃষ্টকে গাল দিয়া, চকচকে জুতাটি পরিয়া, চুলে সিঁথি কাটিতে দেখিলে যশোদার রক্তে আগুন ধরিয়া যায়। সাজিতে পার, হাসিতে পার না লক্ষীছাড়া? গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিতে পার না আপনজনের রোগ, দুঃখ, দুর্দশাকে উপেক্ষা করিয়া? তবে তো যশোদার কিছুই বলিবার থাকে না! সর্বাঙ্গে বাবুত্বের অভ্যাসকে আমল দিয়া দোকানঘরের সাইনবোর্ডের মত কেবল মুখে দুর্ভাবনার বিজ্ঞাপন লটকাইয়া আবার কোন্দেশী দরদ দেখানো?

বাজারে যশোদা গেল না, এ বাড়ির সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া ও বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িল। ঢুকিয়াই মনে হইল, একটা যেন নতুন জগতে আসিয়া পড়িয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে বাস করিলে আর সৃষ্টিরক্ষায় মন দিলেই কি তাদের জগৎ এমনভাবে বদলাইয়া যায়? এই সকালবেলাই ছেলে-মেয়ের কলরবে আর স্ত্রী-পুরুষের কলহে বাড়িটা সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। কলতলাতে মেয়েদের মধ্যেই ঝগড়া বেশি। পিছনের ছোট পুকুরটি বুজাইয়া দিবার পর আজকাল উঠানে কলের জন্য রীতিমত মারামারি হয়। চার-পাঁচজন ছাই দিয়া প্রাণপণে বাসন মাজিতেছে, একজন কলসীতে জল ভরিতেছে, দু'জন দাঁড়াইয়া আছে স্থান খালি হইবার প্রতীক্ষায়। আরেকটা কল এ বাড়িতে করিয়া না দিলে চলিবে না। দরখাস্ত যশোদা অনেকদিন আগেই করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু কি যে হইয়াছে তার দরখাস্তের, আর কোন পাত্তাই মিলিতেছে না। তাগিদ দিতে গেলে, প্রকাণ্ড আপিসের এ বলে ওর কাছে যাও, ও বলে তার কাছে যাও, ভাল করিয়া কথার জবাবটাও দিতে চায় না কেউ। একটা জলের কল বসাইবার অনুমতি চাহিয়া এত হাঙ্গামা সহিতে হয়, কে জানে, সহরের জলের দেবতারা এমন উদাসীন কেন!

এ বাড়িতে ঢুকিলেই একটা ভ্যাপসা ধোঁয়াটে দুর্গন্ধ যশোদার নাকে লাগে। একা মানুষ যশোদা, কিন্তু একাই সে তার ও - বাড়িটি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে ; এ বাড়িতে মেয়েমানুষ দু'গণ্ডার কম নয়, কিন্তু নোংরামি কিছুতেই ঘুচিতে চায় না। উঠানের একপাশে একগাদা আবর্জনা জমিয়া আছে, রাস্তার একটা লোমওঠা কুকুর কোন ফাঁকে ভিতরে ঢুকিয়া আবর্জনা ঘাঁটিয়া খাবার খুঁজিতেছে, কারও সেদিকে নজর নাই।

ওদিকের ভিজা রোয়াকে চিৎ হইয়া পড়িয়া পরেশের সাত মাসের ছেলেটা হাত-পা ছুঁড়িয়া চেঁচাইতেছে, তার দিকেও নজর দিবার কারও অবসর নাই। কাছেই তার মা পরেশের বাঁ পায়ের হাঁটুর নিচে মস্ত একটা ঘায়ে মলম লাগাইয়া ময়লা ন্যাকড়া জড়াইয়া দিতেছে। মাসখানেক শয্যাগত থাকিয়া পরেশ এখন খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটিতে পারে। মোটরের ধাক্কা লাগিয়া পড়িয়া গিয়া নাকি ঘা হইয়াছে। কথাটা যশোদা বিশ্বাস করে নাই। বছর দুই আগে ঠিক এইরকম অকস্মাৎ একবার পরেশের একটা হাতও ভাঙ্গিয়াছিল, সহরের অপরদিকের সহরতলীতে প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া একটা বাড়িতে চুরির উদ্দেশ্যে ঢুকিবার জন্য কয়েকমাসের জেলও হইয়াছিল। তারপর এতদিন যশোদার এখানে থাকিয়া নিয়মমত কাজে গিয়া ভালভাবেই সে দিন কাটাইতেছিল ; হঠাৎ আবার চুরি করার ঝোঁক চাপায়, বোধ হয়

এই দুর্দশা হইয়াছে। লোকটার সম্বন্ধে কি যে করিবে, যশোদা ভাবিয়া পায় না। চোরকে বাড়িতে থাকিতে দেওয়া কি উচিত, আরও কতগুলি পরিবার যে বাড়িতে থাকে? চুরি করিতে গিয়াই হাঁটুর নিচে ঘা হইয়াছে এটা নিশ্চিতভাবে না জানিয়া ছেলে বৌশুদ্ধ একটা লোককে তাড়াইয়া দেওয়াও কি উচিত? বিশেষত, একমাস ঘরে বসিয়া থাকার জন্য লোকটার যখন চাকরি নাই?

'তোমার পা কেমন আছে পরেশ?'

সঙ্কোচ ও অপরাধভরা হাসি হাসিয়া পরেশ বলিল, 'একটু ভাল, চাঁদের মা। আর সাতটা দিন, তারপর—'

'নিজে তো ন্যাকড়াটা জড়িয়ে নিতে পার পায়ে? হাতদুটো তো যায়নি তোমার? ছেলেটা চেঁচিয়ে মরল, কোলে নাও না, খোকার মা? কি যে তোমাদের কাণ্ডজ্ঞান, বাছা, বুঝিনে কিছু।'

পরেশ তবু হাসে, আরও বেশি সঙ্কোচ, আরও বেশি অপরাধভরা হাসি। মানুষের কাছে এই একটিমাত্র মুখভঙ্গি পরেশ করিতে জানে, তার বড় বড় টানা চোখদু'টির খাপছাড়া সৌন্দর্যের মত এ মুখভঙ্গি অর্থহীন।

ও দিকের কোণের ঘরে নদেরচাঁদের বৌ অনেকদিন জ্বরে ভুগিতেছে। তার খবরটা জানিবার জন্য যশোদা পা সবে বাড়াইয়াছে, কলতলায় এক কাণ্ড হইয়া গেল। জগতের বোন কালো একটু স্নান করিয়া বাসন মাজিতেছে, কোথা হইতে নদেরচাঁদের মেয়ে চাঁপা আসিয়া তাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিয়া নিজে সেখানে বসিয়া পড়িল।

'আমি আগে বাসন রেখে গেছি।'

কালো মুখ কালো করিয়া বলিল, 'ধাক্কা দিলে কেন? মুখে বলতে পারতে না?'

কালোর স্বাস্থ্য ভালো, চাঁপার মত সে রোগা নয়। কিন্তু সহরতলীতে সে আসিয়াছে অল্পদিন আগে—দেশের গাঁ হইতে, এখনো সহরতলীর সহুরে মেয়েদের সঙ্গে কলতলার যুদ্ধে আটিয়া উঠিতে পারে না। মুখভার করিয়া সে একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। বাসন মাজিতে আরম্ভ করিয়া চাঁপা মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'রাগিস কেন? কত্খন লাগবে এ-কটা বাসন মাজতে?'

ধাক্কাটা যে চাঁপা শুধু আগে বাসন মাজিবার সুযোগ পাওয়ার জন্য দেয় নাই, যশোদা তা জানে। একবার ভাবিল, চাঁপাকে ধমক দেয়, তারপর ভাবিল, কি হইবে ধমক দিয়া? শক্ত-সমর্থ যে মেয়ে মুখ বুজিয়া এমন ধাক্কাটা সহ্য করে, তার হইয়া কিছু করিতেও যশোদার ভাল লাগে না। কালোর উপর চাঁপার বড় দ্বেষ, কোন দোষ নাই কালোর, তবু চাঁপা তাকে দেখিতে পারে না' প্রকারান্তরে দোষ আছে কালোর, চাঁপার সুখের পথে সে কাঁটা হইয়া আছে। চাঁপার মা ক্রমাগত জ্বরে ভোগে, চাঁপার বাবা নদেরচাঁদ নেশার ফাঁদে পড়িয়া অকালে বুড়ো হইয়া পড়িয়াছে, বড় কষ্টে দিন কাটে চাঁপার। এতদিনে একটু সুখের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে চাঁপার। জগৎকে সে কি করিয়া বাগ মানাইয়াছে সেই জানে, বোধ হয়, সেও অল্পদিন সহরে আসিয়াছে বলিয়া সহুরে মেয়েটাকে আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। মাসছয়েক আগে জগতের বৌ মরিয়া গিয়াছিল, তার তিনমাস পরে সকলে জানিয়াছে, চাঁপার সঙ্গে জগতের বিবাহ হইবে।

কোন্কালে বিবাহটা হইয়া যাইত, ও ঘর হইতে জগতের এ ঘরে আসিয়া জগতের রোজগারে ভাগ বসাইয়া আরামে চাঁপা দিন কাটাইতে পারিত, পোড়ারমুখী কালোর জন্য সব আটকাইয়া আছে। কালোর বিবাহ না দিয়া, জগৎ নিজে আবার বিবাহ করিতে পারিতেছে

না। একদিকে বাধা দিতেছে তার আধ-পাগলা মা, অন্যদিকে আটকাইতেছে টাকায়।

'তোর মা কেমন আছে লো, চাঁপা?' যশোদা জিজ্ঞাসা করিল।

'জ্বর নেই গো, যশোদাদিদি।'

চাঁপার মার ঘরে উঁকি দিয়া যশোদা জগতের ঘরে গেল। ঘরের কোণায় ময়লা, ছেঁড়া কাপড়ে নতুন বৌটির মত মস্ত ঘোমটা টানিয়া জগতের মা বসিয়াছিল আর আপনমনে বিড়-বিড় করিয়া বকিতেছিল। বৌ সাজিবার পাগলামিটাই জগতের মার বেশি প্রবল।

দরজার কাছে বসিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে খোলা দরজা দিয়া জগৎ চাহিয়া ছিল কলতলার দিকে। যশোদাকে দেখিয়া দৃষ্টি সরাইয়া নিল, একটু ভিতরের দিকে সরিয়াও বসিল। চাঁপাকেই দেখিতেছিল বোধ হয় এতক্ষণ। সকালবেলা কোথা হইতে একটা কলকেফুল যোগাড় করিয়া খোঁপায় গোঁজায়, জগতের চোখে চাঁপার রূপটা বোধ হয় আজ বাড়িয়া গিয়াছে।

জগৎ বলিল, 'কালোকে কেমন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল, দেখলে চাঁদের মা?'

যশোদা বলিল, 'তুমি তো দেখেছ? তাতেই হবে।'

'কালোর সঙ্গে মোটে বনিবনা নেই চাঁপার।'

'কার সঙ্গে বা আছে? যা স্বভাব মেয়ের।'

চাঁপার নিন্দায় ক্ষুণ্ণ হইয়া জগৎ মুখভার করিয়া থাকে আর তার মুখের দিকে চাহিয়া যশোদা মনে মনে বলে, 'ধিক্ তোমাকে। বোনটাকে অমন করে ঠেলে সরিয়ে দিলে ; একটু কালের জন্যে না হয় একটু তুমি বিরাগ হতে চাঁপার ওপোর?'

ফিরিয়া যাওয়ার সময় যশোদার চোখে পড়ে, তখনও কালো মুখ ভার করিয়া কলতলার একপাশে দাঁড়াইয়া আছে। এ রকম নীরব, দুর্বল অভিমানও যশোদা দু'চোখে দেখিতে পারে না। কার উপর তুই মুখভার করিয়া আছিস ছুঁড়ি, কে তোর মুখভারের মর্যাদা রাখিবে?

নিজের বাড়িতে যশোদা ঢুকিল না, মতি আর সুধীরকে ভাত খাওয়ার জন্য আরও একটু সময় দেওয়া দরকার। গলি ধরিয়া যশোদা আগাইয়া গেল। একটু গেলেই এ পাড়ার রাজপথ, দু'টি গাড়ি পাশাপাশি চলিতে পারে এতখানি চওড়া, পিচঢালা এবং বিদ্যুৎবাহী তারের থাম বসানো। গলির ভিতর হইতে এ রাস্তায় পা দিলেই যশোদার মনে হয়, ভিজা কাপড়ের মত সর্বাঙ্গে ল্যাপটানো অশুচি আবরণ যেন খোলা আলোবাতাসের স্পর্শে খসিয়া গেল। তবে আরাম যশোদার হয় না, খুশিও সে হইতে পারে না। এই রাস্তাটি তৈরি হইয়াছে বলিয়াই তো তার বাড়িদু'টি এমনভাবে আড়ালে পড়িয়াছে, সঙ্কীর্ণ গলির স্থানটুকু বাদ রাখিয়া দু'পাশে এমন ঘিঞ্জিভাবে টিন আর খোলার বাড়ি উঠিয়াছে। বছরদশেক আগে এখানে পথও ছিল না, গলিও ছিল না, দূরে যে রাস্তা দিয়া আজ ট্রাম আসিয়া ঘুরিয়া যায়, সেই রাস্তা পার হইয়া আসিলেই মানুষ ছড়ানো বাড়িগুলির আনাচ-কানাচ দিয়া, কলাবাগান ভেদ করিয়া, পুকুরের পাড় ঘুরিয়া, যেদিকে খুশি চলিতে পারিত। দশ বছরে সহরতলীর সহুরে ভাবটা কি হু হু করিয়াই না বাড়িয়া গিয়াছে।

জ্যোতির্ময়কে নন্দের চাকরির কথাটা মনে করাইয়া দিয়া যশোদা বাড়ি ফিরিবে ভাবিয়াছিল। জ্যোতির্ময়ের বাড়ির পাশ দিয়া যশোদার বাড়ির ছাতে রোদ আসিয়া পড়ে বটে, যাইতে হয় একটু ঘুরিয়া। যাওয়ার সময় চোখে পড়ে সত্যপ্রিয়র বিরাট বাড়ির বিরাটতর বাগানের পিছনদিকের খানিকটা প্রাচীর। এত বড় বাগানের ফুল-ফল আর কৃত্রিম নির্জনতার শোভা একটি পরিবারের কি কাজে লাগে, কে জানে!

জ্যোতির্ময় রান্নাঘরের বারান্দায় খাইতে বসিয়াছিল। খানিক দূরে বসিয়া ভাইয়ের খাওয়া

দেখিতেছে জ্যোতির্ময়ের দিদি, ঘরের মধ্যে গলা সাধিতেছে সুবর্ণ। পরিবেশন করিতেছে বামুন। বিবাহ উপলক্ষে যে সব আত্মীয়স্বজন আসিয়াছিলেন, তাঁরা চলিয়া গিয়াছেন।

'এসো, চাঁদের মা।'

জ্যোতির্ময়ের আহবানটি মিষ্টি। গোলাগাল, তামাটে রঙের মানুষ সে, মুখের চামড়া মসৃণ ও কোমল। দেখিলেই মনে হয়, লোকটি বুঝি তাদেরই একজন, যারা শান্ত ও সহিষ্ণু, ভীরু ও সাবধানী, ভোঁতা ও হিসাবী। কিছুক্ষণ আলাপ করিলেই কিন্তু এ ধারণায় গোল বাধিয়া যায়। মনে হয়, মানুষটা সে চালাক-চতুরও বটে, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, তেজ, অহঙ্কার আর একগুঁয়েমিও যেন আছে। মনটা কোমল, কিন্তু মায়া মমতা যেন বড় কম। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সাময়িক প্রেরণার মত জ্যোতির্ময়ের কথাবার্তা চালচলনের মধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া আসিয়া উঁকি দিয়া আবার কোথায় হারাইয়া যায়, ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না, কেমন একটা অবিশ্বাস ও সন্দেহের ভাব জাগে। অবিশ্বাস ও সন্দেহকে প্রশ্রয় দিতেও কিন্তু ইচ্ছা হয় না। ভয় আর দুর্বলতা, সাহস আর তেজ, বিষাদ আর হাসিখুশি ভাব, ভোঁতা আর ধারালো বুদ্ধি, এলোমেলোভাবে এ সমস্তের ভাসা ভাসা আবির্ভাব অস্থিরচিত্ততার মতই লাগে বটে, কিন্তু এমন একটা সংযম আর আন্তরিকতার প্রচ্ছন্ন আবরণ সব সময় তাকে ঘিরিয়া থাকে যে, অতিরিক্ত উদারতার সঙ্গে তাকে বিচার করিতে বড় ভাল লাগে মানুষের।

'তোমার ভায়ের চাকরি চাঁদের মা? চেষ্টা তো করছি, দেখি কি হয়।'

'নন্দকে আজ একবার পাঠিয়ে দেব আপনার আপিসে?'

'পাঠিয়ে দেবে? তা দিও।' বলিয়া জ্যোতির্ময় এক গ্রাস ভাত গেলে, গিলিয়াই চিন্তিতভাবে বলে, 'আজকেই পাঠাবে? ক'দিন পরে পাঠাতে পার না?'

ভাইএর জন্য চাকরি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে যশোদা, জ্যোতির্ময় যেন একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা করে যশোদার কাছে, দয়া করিয়া যশোদা কি আজ তার ভাইকে আপিসে না পাঠাইয়া পারে না?

যশোদা বলে, 'তা আপনি যদি বলেন—'

জ্যোতির্ময় সঙ্গে সঙ্গে খুশি হইয়া বলে, 'হ্যাঁ, সেই ভাল। আমি এ দিকে কর্তাকে বলে-কয়ে রাখি একটু, তারপর একদিন তোমার ভাইকে নিয়ে যাব, কেমন?'

'বলে-কয়ে রাখবেন তো ঠিক? না, ভুলে যাবেন?'

'ভুলব কেন? আমি সহজে কোন কথা ভুলি না, চাঁদের মা। তুমি যে আগে একদিন বলেছিলে, আমি কি ভুলে গেছি? ভুলিনি। তোমার আসবার কোনো দরকার ছিল না, তোমার ভাই-এর চাকরির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছি, মনে না করিয়ে দিলেও চেষ্টা করতাম।'

কথা শুনিয়া মনে হয়, একটা চাকরি করিয়া দিবার চেষ্টায় জ্যোতির্ময়ের দিনে বিশ্রাম নাই, রাত্রে ঘুম নাই। সেই যে কবে একদিন, যশোদা তাকে এ বিষয়ে অনুরোধ জানাইয়াছিল, তারপর হইতে জ্যোতির্ময় বাঁচিয়াই আছে। এই একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়া, নন্দর একটি চাকরি।

বিরক্তির সঙ্গে যশোদার কৌতুকবোধ হয়, কৌতুকবোধের সঙ্গে একটু দরদও জাগে। নিজের কোন একটা সমস্যা নিয়া বেচারি হয়তো দিবারাত্র ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছে, এখনো হয়তো সেই কথাই ভাবিতেছে, এই সব জমা করা চিন্তা আর উদ্বেগ যশোদার মন রাখার ব্যাকুলতায় কেন্দ্রচ্যুত হইয়া কিছুক্ষণের জন্য নন্দর চাকরির দুর্ভাবনায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অতিমাত্রায় ভঙ্গি নিয়া মানুষ যখন মন্দিরে ঠাকুরকে প্রণাম করিতে যায়, পথের

ধারে ফেলিয়া-রাখা পথবাঁধানোর বাড়তি পাথরটাকে ব্যাকুল আগ্রহে প্রণাম করা তার পক্ষে সম্ভব বৈকি।

যশোদাকে পিঁড়ি পাতিয়া জাঁকিয়া বসিয়া জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে আলাপ জুড়িতে দেখিয়া তার দিদি গম্ভীরমুখে কোথায় উঠিয়া চলিয়া গিয়াছিল, এতক্ষণে একটা কলাইকরা প্লেটে আম কাটিয়া আনিয়া সামনে রাখিল। নাম তার সুধীরা। গাম্ভীর্য ও ধীরতার তার সত্যই তুলনা নাই। যশোদাকে সে পছন্দ করে না, আমলও দেয় না—আমল পাওয়ার জন্য যশোদার কিছুমাত্র চেষ্টা না থাকায় যশোদাকে সে আরও বেশি অপছন্দ করে। এককালে একজন আধাহাকিমের গৃহিণী ছিল, এখন বিধবা হইয়াছে। বিধবা হইয়াছে প্রায় পাঁচ-সাত বছর, কিন্তু গিন্নি-গিন্নি ভাবটা এত বেশি বজায় আছে, বলিবার নয়। বাড়াবাড়িটা বোধ হয় এইজন্য যে, আসল যা ছিল, তার ভিতরটা হইয়া গিয়াছে ফাঁপা, বজায় আছে শুধু ভাবটুকু। ফাঁকিতে ফাঁকিতে সেটা উঠিয়াছে ফাঁপিয়া।

যশোদা বলে, 'নতুন বৌকে দেখছি না, আসেনি বৌ বাপের বাড়ি থেকে?'

পাখা নাড়িয়া আমের মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে মুখ না ফিরাইয়াই সুধীরা সংক্ষেপে বলে, 'এসেছে।'

'ওমা, কবে এল? জানিনি তো!'

'পরশু এসেছে।'

যশোদা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলে, 'ওপরে আছে বুঝি? যাই, চেনা করে আসি।'

সুধীরা অসন্তুষ্ট হইয়া বলে, 'নতুন বৌ-এর সঙ্গে আবার চেনা করবে কি বাছা?'

এ সব বিকারগ্রস্ত মানুষের অপমান যশোদা সহজে গায়ে মাখে না, সে হাসিয়া বলে, 'নতুন বৌ বলেই তো চেনা করা। ভয় নেই গো দিদি, বৌকে তোমাদের চুরি করে নিয়ে পালাব না।'

যশোদা উপরে উঠিতে থাকে, সুধীরা বোনকে ডাক দিয়া বলে, 'সুবর্ণ, ও সুবর্ণ?—ও বাড়ির যশোদা বৌ দেখবে, নিয়ে যা তোর সঙ্গে করে বৌ-এর কাছে।'

যশোদা কতবার এ বাড়িতে আসিয়াছে, পথ চিনিয়া সে কি যাইতে পারিবে না উপরে, দোতলার দু'খানা ঘরে খুঁজিয়া পাইবে না নতুন বৌ অপরাজিতাকে? সাজা-গৃহিণীদের গিন্নিপনার মানে বোঝা সত্যই কঠিন।

বাড়ি ফিরিয়া যশোদা দেখিল, মোটে তিনটি এঁটো থালা পড়িয়া আছে, আরও দু'জন খাইতে বসিয়াছে এবং তাদের জন্য নতুন করিয়া ভাত বাড়িতে নন্দ একেবারে গলদঘর্ম।

'আরে নিষ্কর্মার ঢেঁকি, হাতায় করে হাঁড়ি থেকে ভাত তুলে থালায় দেবে, তাও পার না? পালা তুই, ভাগ্।'

নন্দকে রেহাই দিয়া যশোদা জিজ্ঞাসা করিল, 'কে কে খেয়েছে রে নন্দ?'

নন্দ গড়গড় করিয়া বলিয়া গেল, 'কেষ্ট, বলাই আর যতীন।'

যশোদা একটু আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'মতি আর সুধীর খায়নি? কি হ'ল তবে আর দু'থালা ভাত, বেড়ে যে রেখে গেলাম পাঁচ থালা?'

নন্দ বিব্রত হইয়া এদিক ওদিক তাকায়, 'ওই তো খেয়ে গেল ওরা।'

'কারা? মতি আর সুধীর?'

'হুঁ।'

'এঁটো থালা গেল কই?'

যশোদার জেরায় কাবু হইয়া এবার নন্দ সব বলিয়া ফেলে। মতি আর সুধীরের ভাত খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র সুধীর তাড়াতাড়ি এঁটোকাঠা সাফ করিয়া থালা দু'টি মাজিয়া ধুইয়া রাখিয়া গিয়াছে আর নন্দকে বলিয়া গিয়াছে অনেক করিয়া, সে যেন যশোদাকে না বলে।

'খুব বুদ্ধিমান তো সুধীর!—তুই না বললেও টের পেতে যেন আমার বাকি থাকত।' বলিয়া যশোদা হাসিল।

তারপর গম্ভীর হইয়া ভর্ৎসনার সুরে বলিল, 'পেটের জ্বালায় ওরা না হয় বারণ না মেনে খেয়ে গেল, বলবি না বলে তুই যে আমায় বলে দিলি বড়? ধিক্ তোকে বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসের মান যে রাখে না মানুষের মধ্যে তাকেই বলি সবচেয়ে হীন, চোর-জোচ্চোর ভাল তার চেয়ে।'

এরকম সময়ে যশোদাকে বড়ই দুর্বোধ্য মনে হয়। কি যে তার মনের ভাব, রাগ সে সত্যই করিয়াছে না সবটাই তার ভান, কিছুই বোঝা যায় না। হাসি-তামাশা করা চলে এমন একটা তুচ্ছ ব্যাপারে কথা দিয়া কথা রাখে নাই, তাও যশোদারই জোরালো জেরার ফাঁদে পড়িয়া, এটা কখনও নন্দর এত বড় অপরাধ বলিয়া যশোদা ভাবিতে পারে? মুখ দেখিয়া কথা শুনিয়া মনে হয় কিন্তু তাই সে ভাবিতেছে!

নন্দ ভয়ে ভয়ে বলে, 'তুমি যে জিজ্ঞেস করলে?'

'জিজ্ঞেস করব না? জিজ্ঞেস তো আমি করবই—আমি কি গুণে জানি একজনের কাছে তুমি পিতিজ্ঞে করেছ আমায় কিছু বলবে না? চুপ করে থাকতে পারতে না তুমি?'

'চুপ করে থাকলেও তো তুমি বকতে।'

'বকতাম তো কি হয়েছে? পিতিজ্ঞে রক্ষার জন্যে মুখ বুঁজে একটা বকুনি যদি না সইতে পার, তুমি মানুষ কিসের শুনি?'

এক জায়গায় কাজ করে বটে, তবু মতির সঙ্গে সুধীরের বন্ধুত্ব হওয়াটা সত্যই বড় খাপছাড়া ব্যাপার। মতির চুলে পাক ধরিয়াছে, মানুষটা সে শান্ত, ভীরু এবং একটা মতলববাজ। সুধীরের বয়স ত্রিশেরও কম, বেঁটে চওড়া শরীরটা তার লোহার মত শক্ত, যেমন অশান্ত তেমনি নিষ্ঠুর তার প্রকৃতি এবং পৃথিবীর সকল গোঁয়ারের মত সে বোকা। তবু মতির সঙ্গে সুধীর ভিড়িয়া গিয়াছে, দু'জনে একসঙ্গে হাসি-তামাশা গল্প-গুজব করে, নেশা আর আমোদ করিতে যায়,—দু'টিতে যেন সমবয়সী ইয়ার।

রাস্তায় পা দিয়াই সুধীর এক গাল হাসিয়া বলিল, 'চাঁদের মাকে ফাঁকি দিয়ে কেমন দুজনে পেটপূজাটি সেরে এলাম মতিদা!'

'ফাঁকি না তোর মাথা। আমরা যাতে খাই তাইজন্যে তো ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, তাও বুঝিস না পাঁঠা?'

'বটে নাকি. অ্যাঁ?'

সুধীর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। এমন খাপছাড়া প্যাঁচালো দরদের ব্যাপারগুলি সে ভাল বুঝিতে পারে না। পরের সুখ-দুঃখের কথা যে সংসারে কেউ ভাবে এ ধারণাটা তার কেমন অদ্ভুত ও অসম্ভব মনে হয়, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খাইতে চায় না। তার সমস্ত জীবনটাই একটা একটানা পেষণের ইতিহাস, পরের আশ্রয়ে মানুষ হইয়াছে, পরের

অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অন্ধ স্বার্থপরতা ও ক্ষমাহীন নির্মমতাকে জানিয়াছে সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম, সুস্থ শরীরে খাটিতে পারিলে খাইয়াছে, অসুস্থ শরীরে খাটিতে না পারিলে উপবাস করিয়াছে, ভিক্ষা করিয়াছে, চুরি করিয়াছে, জেলেও গিয়াছে। একবার অনেক কষ্টে কিছু টাকা জমাইয়া বিবাহ করিয়াছিল, দু'মাসের মধ্যে বৌটা একজনের সঙ্গে উধাও হইয়া গিয়াছে। তার আগে এবং পরে যে কয়েকটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে সে বাস করিয়াছে, তারা যেমন তার কাছে প্রাণপণে আদায় করিয়াছে সেও তেমনি তাদের কাছে প্রাণপণে আদায় করিয়াছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যেভাবে হোক নিজের প্রাপ্য আদায় করার সহজ সরল সম্পর্কটা সুধীর বুঝিতে পারে, আর কিছু তার মাথায় ঢোকে না। নিজেও সে চিরদিন নিজের সুখ-দুঃখ ভালমন্দের হিসাব ছাড়া আর কোন হিসাব করে নাই, অন্য কেউ এই হিসাব লইয়া মাথা ঘামাইবে এ আশাও করে নাই। জীবনে যে কারও অকারণ দরদ পায় নাই এজন্য তার তাই কোন আপশোষও নাই। হয়ত কখনও পাইয়াছিল দরদ, হয়ত মানুষকে দরদী করিবার সুযোগ আসিয়াছিল, কিন্তু সে বুঝিতেও পারে নাই কি পাইতেছে, কিসের সুযোগ আসিয়াছে। কেহ তাহাকে কোনদিন বুঝাইয়াও দেয় নাই, বুঝিতেও দেয় নাই।

চলিতে চলিতে নানা কথা মনে হয় সুধীরের। একটি দু'টি করিয়া যশোদার কতকগুলি কাজের কথা মনে পড়ে, আজকের আশ্চর্য ব্যবহারের সঙ্গে যার কেমন যেন একটা মিল আছে। কিছুদিন আগে তার জ্বর হওয়ায় যশোদা তার সেবা করিয়াছিল, খুবই সাধারণ সেবা, মাথাটা ধোয়াইয়া মুছিয়া দেওয়া, জোর করিয়া বার্লি আর ওষুধ খাওয়ানো, আর কিছু নয়, —তবু ও রকম সেবাও কি সুধীরকে কোনদিন কেউ করিয়াছে? মারামারি করায় একবার পঁচিশ টাকা জরিমানা হইয়াছিল সুধীরের, যশোদা জরিমানাটা না দিলে জেলে যাইতে হইত। তারপর দু-এক টাকা করিয়া মাস তিনেকের মধ্যে যশোদা প্রায় দশ বারো টাকা আদায় করিয়া নিয়াছে বটে, কিন্তু যাচিয়া জরিমানার টাকা দিয়া কেউ কি সুধীরকে জেল হইতে বাঁচাইয়াছে?

'সত্যি বলছ মতিদা?'

কি সত্যি বলিয়াছে মতি? অ, যশোদার কথা! সত্য বৈকি, যশোদাকে তো চেনে না সুধীর, ও-সব সে বুঝিবে না। মেজাজটা একটু যা খারাপ যশোদার, চেহারাটাও হাতির মত, কিন্তু সকলের জন্য বড় মায়া যশোদার, অমন মেয়েমানুষ হয়?—'একটা বিড়ি দে তো। গাটা কেমন করচে সুধীর, কালকের নেশাটা এখনো কাটেনি।'

'বিড়ি নেই।'

'দে-না একটা? কেমন ধারা মানুষ যেন তুই সুধীর।'

সুধীর বিরক্ত হইয়া বলিল, 'নেই তো দেব কোথা থেকে? গড়াব?'

একটা বিড়ির জন্যেই দুজনের মধ্যে যেন মনোমালিন্য ঘটিবার উপক্রম হয়। মতি খানিক আগে আর সুধীর খানিক পিছনে চলিতে থাকে।

এত সকালেই বড় রাস্তায় গাড়ি আর মানুষের ভিড় হইতে আরম্ভ করিয়াছে। দশটা এগারটার সময় এ রাস্তায় চলাই দুষ্কর হইয়া পড়ে। ঠেলাগাড়ি, মহিষের গাড়ি, লরি, আর বাসের সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে এমন হইয়া দাঁড়ায় যে থাকিয়া থাকিয়া মোটর গাড়িকেও গরুর গাড়ির সঙ্গে সমান তালে শামুকের গতিতে চলিতে হয়, মাঝে মাঝে জমাট বাঁধিয়া সমস্ত গতিই কিছুক্ষণের জন্যে একেবারে স্থগিত হইয়া যায়। তখন পথের দিকে চাহিলে মনে সংশয়ই জাগে, এ কি সহরতলীর পথ না সহরের কেন্দ্র? সংশয় দূর হয় যখন মনে পড়ে সহরের কেন্দ্র এ রকম অপরিচ্ছন্ন নোংরা নয়, সেখানে পথের ধারে বুদবুদ তোলা

পচা পাঁকে ভরা ছোটখাট খালের মত এ রকম নর্দমা নাই, গেঁয়ো ধরনের আড়ত নাই, এত বড় বড় মিল নাই, এ ধরনের মালবাহী গাড়ি সেখানে এভাবে জড়াজড়ি করে না, সেখানে দামী সুদৃশ্য প্রাইভেট কারের স্রোত কেবল রঙিন বৈদ্যুতিক আলোর ইঙ্গিতে কিম্বা ট্রাম-বাস প্রভৃতি মানবজাতীয় মালবাহী গাড়ি আর মানুষের ভিড়ে গতিহীন হয়, সেখানে পথের ধারে প্রত্যেকটি বাড়ি রাজপুরী, প্রত্যেকটি দোকান শুধু এই বাণীর রূপক যে ধনী ছাড়া পৃথিবীতে মানুষ নাই, থাকা উচিত নয়।

কারখানায় গিয়া মতি সবে খাকি শার্টটা খুলিয়া রাখিয়া আলকাতরার বালতি আর বুরুশটি তুলিয়া লইয়াছে, মাল চালানের কুলিদের সর্দার ভরদ্বাজ আসিয়া বলিল, 'ওই বিশঠো গাঁটমে কাল লিখা নাই কাহে?' ভরদ্বাজ চমৎকার বাঙলা বলিতে পারে, কিন্তু রাগের সময় বলে না।

'সব গাঁটমে তো কালকে আমি লিখেছি?'

'লিখেছো? তোমার মুণ্ডু করিয়েছো। কাল চালান বরবাদ গেলো, কাশীবাবু হামাকে দুষছে। কাম যদি না করবে শালা, চলা যাও না কাম ছোড়কে?'

বুরুশটা ছিনাইয়া মতির গালে আঘাত করিয়া ভরদ্বাজ গজরাইতে গজরাইতে চলিয়া গেল। আঘাত যত না লাগিল মতির, আলকাতরা লাগিল তার চেয়ে অনেক বেশি। সাদা চুল আর কালো গালের রং দেখিয়া আশেপাশে যারা কাজ করিতেছিল তারা হাসিয়া বাঁচে না।

গালের আলকাতরা মুছিতে মুছিতে মতি ভাবিতে থাকে কাশীবাবুর কাছে গিয়া নালিশ জানাইবে কি না। কিন্তু গাঁটে লিখা হয় নাই বলিয়া কাশীবাবু নিজেই যদি চটিয়া থাকেন, নালিশ জানাইয়া লাভ কি হইবে? কাশীবাবু হয়তো অন্য গালে আলকাতরা মাখাইয়া দিবেন।

কিন্তু এই গাঁটগুলি কোথায় ছিল কাল? এখানে যে ছিল না মতির তাতে সন্দেহ নাই, এতকাল সে এ কাজ করিতেছে একেবারে কুড়িটা গাঁট বাদ পড়িবার মত ভুল কি তার হইতে পারে? তা ছাড়া, কালই যদি গাঁটগুলি চালান দিবার এত বেশি দরকার ছিল, আগে এইগুলিতে লিখিবার জন্য তাকে নিশ্চয় বলিয়া দেওয়া হইত—চিরকাল যেমন বলা হইয়াছে। একটু ধাঁধায় পড়িয়া যায় মতি, ব্যাপারটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সে কয়েকটা আলকাতরার দাগ আঁকিয়া দেয় নাই বলিয়া একেবারে চালান বরবাদ হইয়া গেল?

ভাবিতে ভাবিতে সমস্যাটি মতির কাছে জল হইয়া যায়। দোষ তার নয়। হয় কাশীবাবু নয় ভরদ্বাজের গাফিলতিতে কাল গাঁটগুলি চালান দেওয়া হয় নাই এবং চিরদিনের রীতি অনুসারে যারা উপরে থাকে তাদের ঘাড় হইতে পিছলাইয়া দোষটা আসিয়া চাপিয়াছে তার ঘাড়ে। দোষ দিতে ছুতাও তো চাই একটা? কি চালাক কাশীবাবু আর কি শয়তান ভরদ্বাজ ব্যাটা!

গালে আলকাতরা দেওয়ার জন্য একটু রাগ আর একটু দুঃখ মতির হইয়াছিল বৈকি, তবে আঘাত আর অপমান সম্বন্ধে অনুভূতিগুলি তার অনেকটা ভোঁতা হইয়া আসিয়াছে কি না, রাগ দুঃখ অপমান অভিমান খুব সহজেই সে ভুলিয়া যাইতে পারে। এমন কি, আসল ব্যাপারটা বুঝিয়া এবার একটু কৌতুকও মতির বোধ হয়। দোষ ঘাড়ে চাপানোর জন্য এতগুলি লোকের ভিতর হইতে তাকেই বাছিয়া নেওয়া হইয়াছে, এজন্য একটু গর্বও কি মতি বোধ করিতে আরম্ভ করে?

মেঝে হইতে বুরুশটি তুলিয়া বালতির উপর আড়াআড়িভাবে রাখিয়া গাঁটগুলিতে কি অক্ষর আর কি নম্বর লেখা হইবে তার নমুনা আনিতে ভরদ্বাজের কাছেই মতি যাইবে

ভাবিতেছে, সুধীর আসিয়া হাঙ্গামা বাধাইয়া দিল।

প্রথমটা খুব এক চোট হাসিল সুধীর, তারপর ব্যাপারটা শুনিয়া রাগিয়া হইয়া গেল আগুন। খানিক তফাতে কোথা হইতে কি কাজে ভরদ্বাজ কোথায় যাইতেছিল, সুধীর গিয়া তাকে টানিয়া হ্যাঁচড়াইয়া এদিকে নিয়া আসিল, গালাগালি চোটপাট চলিল মিনিটখানেক, তারপর আলকাতরার বালতিটা সুধীর কাৎ করিয়া দিল ভরদ্বাজের মাথার উপর।

একটা হৈ চৈ বাধিয়া গেল। কাশীবাবু ছুটিয়া আসিল এবং গোলমালের মধ্যে কাশীবাবুর গায়েও কি করিয়া আলকাতরা লাগিয়ে গেল খানিকটা! ভরদ্বাজের একজন পার্শ্বচরের সঙ্গে তখন সুধীরের মারামারি চলিতেছে এবং আট দশজন তাদের ছাড়াইবার চেষ্টা করায় মনে হইতেছে মারামারি বুঝি বাধিয়াছে দশ বারজনের মধ্যে। কাশীবাবু কার গালে যেন একটা চড় বসাইয়া দিল। বোধ হয় যাকে সামনে পাইল তারই গালে। ঠিক তার পরেই পিছন দিকে না চাহিয়া একজন দু'পা পিছু হটায় আসিয়া পড়িল একেবারে কাশীবাবুর ঘাড়ে। মনে হইল, একজনের গালে চড় মারার শোধটাই বুঝি আরেকজন নিয়াছে।

গোলমাল থামিবার এক ঘণ্টার মধ্যে মতি, সুধীর এবং আরও আটজন শ্রমিক বরখাস্ত হইয়া গেল। অন্য আটজনের অপরাধ? প্রকাশ্য অপরাধ কারখানার মধ্যে মারামারি করা, যা তারা কেউ করে নাই। ওদের মধ্যে পাঁচজন তো যেখানে গোলমাল চলিতেছিল তার ধারে কাছেও ছিল না। গোলমাল থামিবার পরে তারা আসিয়াছিল, যোগ দিয়াছিল শুধু জটলায়। কিন্তু কিছুদিন আগে সত্যপ্রিয় মিলে যে ধর্মঘট হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সময় এই আটজনের নাম উঠিয়াছিল মিলের পক্ষে অবাঞ্ছিতদের লিস্টে। আজকের গণ্ডগোলের সুযোগে মতি আর সুধীরের সঙ্গে এদেরও কাশীবাবু তাড়াইযা দিল। ওরা মারামারি করে নাই? কাশীবাবু নিজের চোখে ওদের মারামারি করিতে দেখিয়াছে, আলকাতরার জন্য ভবদ্বাজ চোখের পাতা ভাল করিয়া খুলিতে পারিতেছিল না, তবু সে দেখিয়াছে, কাশীবাবুর আবও কত পার্শ্বচরও যে দেখিয়াছে তার হিসাব হয় না।

দশজনের কাজ গেল। কাশীবাবুর কড়া হুকুমে মিলের মধ্যে কর্মব্যস্ততা আবার চরমে উঠিয়া গেল, আর যন্ত্র সমানে কাজ করিতে লাগিল। কি যেন একটা উদ্দেশ্য সাধন কবিতে হইবে কিন্তু হাতে যথেষ্ট সময় নাই, তাই ঊর্ধ্বশ্বাসে কাজ করা। এত ব্যস্ততার মধ্যে একটুও আবেগ নাই, ব্যাকুলতা নাই, নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া কারখানার দিকে ছুটিবার সময় একজনমাত্র মানুষের মধ্যে যতখানি আবেগ আর ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়, এখানে এতগুলি মানুষের সমবেত ব্যস্ততার মধ্যে সেটুকু ভাবোচ্ছ্বাসের ছন্দও নাই।

তবু মানুষ তো যন্ত্রের অধীন নয়, যন্ত্রই মানুষের অধীন, প্রভুত্বটা এখনও ঠিকমত আয়ত্ত হয় নাই মানুষের, এই যা আপশোষ। তাই টিফিনের ছুটির সময় কারখানার প্রাঙ্গণে দশজন বরখাস্ত শ্রমিককে ঘিরিয়া সকলে জটলা করিতে লাগিল, একটু বক্তৃতাও বুঝি করিল দু-একজন। টিফিনের সময় শেষ হওয়ার পরেও থামিল না। মিলের কাজ বন্ধ হইয়া রহিল। কাশীবাবু ভড়কাইয়া গিয়া ক্রমাগত ফোন করিতে লাগিল হেড অফিসে আর সত্যপ্রিয়র কাছে।

কিন্তু কিছুতেই এবার ধর্মঘট ঠেকানো গেল না। যে দশজনকে বরখাস্ত করা হইয়াছে তাদের আবার কাজে না নিলে কেহ কাজ করিবে না। হেড অফিসে ফোনটা সত্যপ্রিয়র কানেই প্রায় লাগান ছিল, সমস্তক্ষণ, মিনিটে মিনিটে খবর যাইতেছিল। মন্তব্য প্রায় কিছুই করিতেছিল না, কেবল শুনিতেছিল। একবার শুধু বলিয়াছিল—'ব্যাখ্যা আপনাকে করতে হবে না কাশীবাবু, যা ঘটেছে তাই শুধু বলে যান। না. এখনও পুলিস ডাকবেন না, আরেকটু

দেখা যাক। ভয় পাবেন না মশায়, পুলিস রেডি হয়েই আছে, ডাকামাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে হাজির হবে। অনাথ পৌঁছয়নি? দেখুন তো।'

অনাথ সত্যপ্রিয়র সেক্রেটারী। কাশীবাবু দেখিয়া আসিয়া জানাইল, 'অনাথবাবু ওদের বোঝাবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু ওরা তাকে কথাই বলতে দিচ্ছে না, হৈ চৈ করছে। একজন একটা ঢিল ছুঁড়েছে অনাথবাবুর দিকে, গায়ে লাগেনি।'

জবাবে সত্যপ্রিয় বলিল, 'আপনি একটি আস্ত গর্দভ কাশীবাবু! ওই দশজনকে দাঙ্গা করার জন্য পুলিসে দিলেই চুকে যেত—বরখাস্ত করে ছেড়ে দিলে ওরা মিলের মধ্যে এসে গোল বাধাবে এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধিও আপনার ঘটে নাই? শুধু বরখাস্তই যদি করবেন, এতকাল করতে পারতেন না! সুযোগের জন্য অপেক্ষা করার কি দরকার ছিল?'

'আজ্ঞে অনাথবাবুকে ফোন করলাম, অনাথবাবু বললেন—'

'অনাথ আপনার মতই গাধা। ডেকে আনুন অনাথকে, বুঝিয়ে আর কিছু হবে না। পুলিসকে খবর দিচ্ছি, পুলিস এলেই মিল খালি করে গেট বন্ধ করে দেবেন।'

সন্ধ্যার পর মতি, সুধীর আর ওই দশজন বরখাস্ত শ্রমিকের সঙ্গে প্রায় শ'দুই শ্রমিক যশোদার বাড়িতে আসিয়া হাজির। উঠানে স্থান হইল ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনের, বাকি সকলে সরু গলিটুকুর মধ্যে গাদাগাদি করিয়া আর গলির মোড়ে রাস্তায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুধীর খুব লাফালাফি করিতেছিল, যশোদার ধমকে থামিয়া গেল। খুন্তি হাতে রান্নাঘরের দবজায় দাঁড়াইয়া প্রথমে যশোদা এ রকম হুড়মুড় করিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়ার জন্য একচোট গালাগালি দিল সকলকে, তারপর মন দিয়া ব্যাপারটা সব শুনিল, তারপর আবার গালাগালি দিয়া বলিল, 'তোমবা সবাই পাঁঠা, এক ফোঁটা বুদ্ধি নেই তোমাদের কারু ঘটে। দল বেঁধে হল্লা করলেই হবে? দু'নম্বর মিলে ছুটে যেতে পারলে না সবাই মিলে, সেখানেও ধর্মঘট করতে পারলে না?'

'তাইতো বটে,—এটা তো খেয়াল হয় নাই কারো। কি করা যায় এখন?'

'কি আবার করবে? পাঁচ-দশজন মিলে খুঁজে খুঁজে বার করগে দু'নম্বরের যতজনকে পার। কাল ভোর না হতে তোমরা সবাই গিয়ে দু'নম্বরে ধর্না দেবে। এবার ভাগো সবাই আমার বাড়ি থেকে, দম আটকে মারবে নাকি?'

বাছিয়া বাছিয়া কয়েকজনকে একটু বসিয়া যাইতে বলিয়া বাকি সকলকে যশোদা বাড়ির বাহির করিয়া দিল। তারপর ওই বাছা বাছা কয়েকজনের সঙ্গে পরামর্শ করিল দু'ঘণ্টা ধরিয়া।

পরদিন দুপুরবেলা ডাক আসিল যশোদার, মিলে মজলিস বসিয়াছে, একবার যাইতে হইবে যশোদাকে। কাশীবাবু নিজে গাড়ি নিয়া আসিয়াছে।

'আমি গিয়ে কি করব?'

'আপনি মাতিয়ে দিয়েছেন ওদের, আপনি না গেলে ওরা কারও কথা শুনবে না।'

যশোদা উদাসভাবে বলিল, 'ওদের দাবি মিটিয়ে দিলেই কথা শুনবে।'

সেই তো সমস্যা দাঁড়াইয়াছে এখন। ইতিমধ্যে শ্রমিকদের দাবি বাড়িয়া গিয়াছে, দশজন বরখাস্ত শ্রমিককে ফিরাইয়া নিলেই আর চলিবে না, আগের বার যে সব দাবি উপলক্ষে ধর্মঘট বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল সেইগুলিও মিটাইয়া দেওয়া চাই।

'আপনার পরামর্শে এটা হয়েছে।'

'আমার পরামর্শ কি ওরা শোনে? শুনলে কি আর এ দুর্দশা হয় ওদের? কত বলি যে কাজকর্মো যখন থাকে, পয়সা জমা দুটো, অসময়ে কাজে লাগবে। কানেও তোলে না কেউ আমার কথা।'

গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া গম্ভীরভাবে যশোদা মাথা নাড়ে, 'কথায় বলে না অভাবে স্বভাব নষ্ট, তাই হয়েছে ওদের। মজুরি হাতে পেলেই আর ছেঁড়া ন্যাকড়াটি পরা চলবে না, নতুন একটি কাপড় কেনা চাই। একটি গামছা কেনা চাই, জলপানি খাওয়া চাই, গায়ে তেল মাখা চাই—'

যশোদা তামাশা করিতেছে কিনা কাশীবাবু ঠিক বুঝিতে পারে না, দ্বিধাভরে বলে, 'তাড়ি খেয়ে খেয়েই ওদের যত দুর্দশা।'

'তাড়ি খেয়ে? তাড়ি না খেলে ওরা বাঁচত? খাওয়ার মধ্যে খায় তো শুধু একটু তাড়ি, নয়তো একটু দিশি, তাও যদি না খাবে, খিদে-তেষ্টা মিটবে কিসে?' শুনিয়া সেই যে কাশীবাবু চুপ করিয়া গেল, আর কথাটি বলিল না।

মিলের সামনে পাঁচ ছ'শ শ্রমিক এলোমেলোভাবে ভিড় করিয়া আছে, যশোদাকে দেখিয়া তাদের কি উৎসাহ। ধর্মঘটের চেয়ে আজ সারাদিন যশোদার কথাটি তারা বেশি আলোচনা করিয়াছে। মুখে মুখে কত কথাই যে রটিয়াছে যশোদার সম্বন্ধে!

মিলের ভিতরে আপিসঘরে বৈঠক বসিয়াছে। বৈঠকে অনাথ, হেড অফিসের আরও দু'জন বড় কর্মচারী এবং শ্রমিক-সমিতির দু'জন প্রতিনিধি আছে। একটি চেয়ারে যশোদাকে বসিতে হইল। এমন অস্বস্তি যশোদা জীবনে কখনও ভোগ করে নাই। তারপর কত কথা আর কত আলোচনাই যে আরম্ভ হইল, যশোদা কিন্তু শুনিল বেশি, কথা বলিল কম।

শ্রমিক-সমিতির একজন প্রতিনিধি অনুযোগ দিয়া বলিল, 'আমাদের না জানিয়ে ধর্মঘট আরম্ভ করা কি আপনার উচিত হয়েছে?'

যশোদা বলিল, 'ধর্মঘট আরম্ভ করার ধ-ও জানি না আমি। সে হোক্, শেষ পর্যন্ত আপনারা তো জেনেছেন?'

কিন্তু এ রকম জানায় তারা খুশি নয়, শ্রমিকেরা ধর্মঘট করিয়াছ বটে, ধর্মঘটটা আসলে যেন যশোদার। এতক্ষণ আলোচনা করিয়া একটা মিটমাট হইয়াছিল, শ্রমিক-সমিতি মীমাংসাটা মানিয়া লইয়াছে, কিন্তু শ্রমিকরা মানিতে চাহিতেছে না। এভাবে ডিসিপ্লিন নষ্ট হইলে—

মীমাংসাটা কি হইয়াছে? দশজনের মধ্যে ন'জন বরখাস্ত শ্রমিককে ফিরাইয়া নেওয়া হইবে, আরও পঁচিশজন নতুন শ্রমিক নিয়া কাজের চাপ কমানো হইবে, কিন্তু কাজের সময় আর মজুরি সম্বন্ধে অন্য যে দাবি করা হইয়াছে, সেগুলি মেটানো হইবে না।

শুনিয়া যশোদা বলিল, 'তবে তো খুব হল!'

তবু এই মীমাংসাই যশোদা মানিয়া নিল, নতুন লোকের সংখ্যাটা কেবল পঁচিশ হইতে চল্লিশে উঠিল এবং ঠিক হইল এর মধ্যে ত্রিশজনকে যশোদা ঠিক করিয়া দিবে। মানিয়া নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। যশোদা জানিত এ ধর্মঘট টিকিবে না, বড় অসময়ে ধর্মঘট আরম্ভ হইয়াছে, ঝোঁকটা কাটিয়া গেলেই অনেকে কাজে যোগ দিতে চাহিবে, অনেকে নিরুপায় হইয়া কাজে যোগ দিবে। যশোদা তো জানে ওদের অবস্থা।

'দশজনের মধ্যে বাদ যাবে কে?'

অনাথ বলিল, 'সুধীর। ওকে নেওয়া চলে না। আমাদেরও তো প্রেস্টিজ আছে একটা।

প্রেস্টিজ মানে—'

যশোদা একটু হাসিল। প্রেস্টিজ শব্দটা এত বেশি কানে আসে!

যশোদা শর্ত মানিয়া নেওয়ামাত্র অনাথ ফোনটা তুলিয়া নিল। সত্যপ্রিয় সংবাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। সত্যপ্রিয় মিলে আসে নাই, কোনদিন এ সব ব্যাপারের ধারে কাছেও সে আসে না, শ্রমিকদের সে বড় ভয় করে। সেই তো মালিক মিলের, উত্তেজিত অবস্থায় সকলে মিলিয়া তাকে যদি আক্রমণ করে, যদি প্রথমে গায়ের জামাকাপড় টুকরো টুকরো করিয়া ছিঁড়িয়া তারপর তার দেহটাকে ছিঁড়িতে আরম্ভ করে ঠিক এইভাবে? এই কল্পনা আর সেই সঙ্গে গভীর একটা আতঙ্ক সত্যপ্রিয়র মনে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধিয়া আছে।

রাত্রে সকলে খাইয়া গেল, সুধীর আসে না। নন্দকে ডাকিয়া পাঠান হইল, তবু আসে না। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া সে ছাতে গিয়া গুম খাইয়া বসিয়া আছে। শেষে যশোদা নিজেই ডাকিতে গেল।

যশোদা কাছে আসিয়া দাঁড়ানোমাত্র, সুধীর গট গট করিয়া নামিয়া গেল নিচে। কিন্তু যশোদা ছাড়িবার মেয়ে নয়, সেও পিছু পিছু ধাওয়া করিয়া সুধীরকে পাকড়াও করিল তার ঘরে।

'ভাত খাবে না?'

সুধীর কথা বলে না, চৌকিতে বসিয়া চুপচাপ দেওয়ালের দিকে চাহিয়া থাকে, যেখানে একটা টিকটিকির লেজ শিকার করিবার উত্তেজনায় এ-পাশ ও-পাশ নড়িতেছিল। সহজ রাগটা সুধীরের হইয়াছে যশোদার উপর! আজ সকালে যে যশোদার দরদের পরিচয়ে তার মাথা প্রায় ঘুরিয়া গিয়াছিল, সেই যশোদাই শেষ পর্যন্ত তার এমন সর্বনাশ করিল!

দশজনের মধ্যে আর সকলকে ফিরাইয়া নেওয়া হইল, বাদ পড়িল শুধু সে। মতির হইয়া সে লড়াই করিতেছে, মতির কাজটা পর্যন্ত বজায় রহিল, বরখাস্ত করা হইল একা তাকে!

'মাথা গরম ক'রো না বাবু ছেলেমানুষের মত। মাথা গরম করে কাজটির মাথা তো খেলে নিজের।' খোঁচা না দিলে সুধীরের মুখ খুলিবে না জানিয়াই যশোদা খোঁচা দিয়া কথা বলে।

সুধীর মুখ ফিরাইয়া বলে, 'আমি খেলাম না, তুমি খেলে?'

'মারামারি করলে তুমি, চাকরি খেলাম আমি? বেশ তো বিচার তোমার বাবু?'

যশোদা হাসে, গলা নামাইয়া গোপন কথা বলার মত সুরে বলে, 'তবে কি জান, শুনে আমি বড খুশি হয়েছি—সত্যি বলছি তোমায়। মতি চুপচাপ সয়ে গেল, কথাটি কইলো না, ছি ছি, ওটা কি মানুষ? ভীরু অপদার্থ ওটা। তোমার সাহস আছে, তুমি তাই রুখে দাঁড়ালে —আর কেউ পরের অপমান গায়ে মেখে নিত অমনি করে?'

শুনিতে শুনিতে বাতাসে মেঘ উড়িয়া যাওয়ার মত সুধীরের মুখের উপর হইতে রাগ দুঃখ অভিমানের ছায়া মিলাইয়া যাইতে থাকে। একটু নরম গলায় সে বলে, 'তুমি বললেই ওরা আমায় র'খত।'

'তাতে লাভটা কি হ'ত বল? এরপর ওখানে আর কাজ করতে পারতে তুমি? ও কাজ গেছে যাক—আমি তোমায় ভাল কাজ জুটিয়ে দেব। বেশি মাইনে, কম খাটুনি। মানুষের মত তেজ আর বুকের পাটা কটা লোকের থাকে? তোমার তা আছে জেনে ভাবলাম তুমি আরও ভাল কাজের যুগ্যি—এই সব ভেবে আর বললাম না তোমায় ফিরিয়ে নিতে।'

বড় শ্রান্তি বোধ হইতেছিল যশোদার। যত বড় শরীর হোক, সহ্যের তো একটা সীমা আছে? ঘরের কাজে যশোদাকে যে সাহায্য করিতে আসে, অসুখ হইয়া তিনদিন সে আসে নাই। ঘরে'বাহিরে কি খাটুনি আর হাঙ্গামাই তাকে পোয়াইতে হইতেছে। তার উপর আবার এই বোকা হাবা ধাড়ি শিশুকে বুঝাইয়া শান্ত করিবার দায়িত্বটা পর্যন্ত তার। চৌকির এক পাশে বসিয়া হাই তুলিয়া যশোদা আবার বলে, 'কাজ গিয়ে শাপে বর হল তোমার।'

সুধীর অভিভূত হইয়া যশোদাকে দেখিতে থাকে, সে দৃষ্টিতে অন্য কারও হয়তো রোমাঞ্চ হইত, যশোদা দেখিয়াও দেখে না। আবার হাই তুলিয়া বলে, 'এবার ভাত খাবে চল—দু'টি খেয়ে নিয়ে রেহাই দাও আমায়।'

সুধীর মিনতি করিয়া বলে, 'একটু বোসো চাঁদের মা, একটু গল্প করি তোমার সঙ্গে।'

'কি বললে? গল্প? বসে বসে গল্প করবো তোমার সঙ্গে? খাবে তো খেয়ে যাও সুধীর, নয় তো উপোসে রাত কাটবে বলে রাখলাম।'

তিন

প্রচারবিভাগটা সত্যপ্রিয়র ব্যবসার উন্নতির নাম করিয়াই খোলা হইয়াছে বটে, বড় বড় বিজ্ঞাপনও দেওয়া হইতেছে সত্য, কিন্তু জ্যোতির্ময়ের আসল কাজ সত্যপ্রিয়র নাম ও মত প্রচার করা। সত্যপ্রিয়ের এমন ব্যবসা নয় যে পেটেন্ট ওষুধের মত তার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়া দেশ ছাইয়া ফেলা প্রয়োজন, সাময়িকপত্রে সত্যপ্রিয়র প্রবন্ধ আব বক্তৃতার রিপোর্ট প্রকাশ করিবার মূল্যস্বরূপ বিজ্ঞাপনগুলির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সত্যপ্রিযর প্রত্যেক প্রবন্ধ আর বক্তৃতায় ভারতবর্ষের শোচনীয় অধঃপতনের জন্য কি হা-হুতাশটাই থাকে আর সমাজ, ধর্ম ও দেশকে সর্বনাশের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কি ব্যাকুলতাটাই প্রকাশ পায় —তবু যে প্রবন্ধ আর বক্তৃতার রিপোর্ট প্রকাশ করিবার জন্য প্রকারান্তবে মূল্যের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে, এই কি দেশের অধঃপতনের একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত নয়! কেবল কি তাই? কতগুলি কাগজ আছে মূল্য দিয়াও তাদের বাগানো যায় না।

'এ সব পাগলামি আমাদের কাগজে ছাপান চলবে না মশায়।'

'ঠিক পাগলামি নয়, একটু খাপছাড়া মতামত আছে মাঝে মাঝে, সেটা মিথ্যা নয়। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি জানেন, লেখাটা না ছাপলে উনি হয়তো চটে যাবেন, বিজ্ঞাপনের কন্ট্রাক্টটা—' একটু হাসে জ্যোতির্ময়—'বোঝেন তো সব? যার যেদিকে খেয়াল চাপে। তা ছাড়া, ওঁর নাম দিয়ে ছাপা হবে, মতামতের দায়িত্ব তো আপনাদের নয়।'

'মতামতের দায়িত্ব না থাক, মতটা প্রচারে দায়িত্ব তো আছে? দেশের জন্য যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন, অর্ধেক জীবন জেলে কাটিয়েছেন, তাঁরা সবাই ভুল করে দেশকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন সর্বনাশের দিকে, আর টাকার গদিতে শুয়ে আপনারা পাগলা জগাই আবিষ্কার করেছেন দেশোদ্ধারের একমাত্র উপায়। দু'জায়গায় লিখেছেন, গভর্নমেন্টের সঙ্গে বিবাদ করা অন্যায়, আরেক জায়গায় লিখেছেন, প্রকৃতির নিয়মে যখন যে জাতি রাজপদে অধিষ্ঠান করে তাদের প্রাপ্য রাজ-সম্মান না দিলে দেশের কখনও উন্নতি হবে না! রাজার জাতিকে রাজ-সম্মান দিতে থাকলে প্রকৃতির নিয়মে আমবা একদিন নিজেরাই রাজার জাত হতে পাবব, নয় তো কোনদিন পারব না—এ সব কোন্ দেশী কথা মশাই?'

'যুক্তিও তো দিয়েছেন।'

'যুক্তি? এমন যুক্তিই আমরা দিতে পারি, শুনবেন? দেওয়ালটা সাদা দেখছেন তো? আপনি ভুল দেখছেন। বিজ্ঞানে বলে, সবগুলি রঙ মিশে সাদা হয়, বিজ্ঞান অবশ্য সত্যকে বিকৃত করে দেখে, আপনি যদি বেদের সপ্তম অধ্যায়টা পাঠ করেন, দেখবেন সেখানে লেখা আছে সমস্তই অস্থায়ী। সুতরাং রঙ মিশে সাদা হয়নি, রঙগুলি অস্থায়ী বলে সাদা দেখায় —চোখের ভুল। এবার দেখতে পাচ্ছেন দেওয়ালের রঙটা লাল? এই নীল হয়ে গেল, এই আবার সবুজ হল, দেখতে দেখতে হলদে হয়ে গেল—'

তামাটে মুখ প্রায় কালো করিয়া জ্যোতির্ময়কে ফিরিতে হইয়াছে। কিন্তু উপায় কি? তবু তাকে চেষ্টা করিতে হয়, চাকরি তো বজায় রাখিতে হইবে!

বন্ধুদের কাছে জ্যোতির্ময় অনুচ্চারিত অভিযোগের জবাব দিবার মত সবিনয়ে বলে, 'ব্যাপারটা কি জান? সকলের হল দলাদলি মাতামাতি নিয়ে কারবার, কর্তার মতামত প্রচলিত মতামতের বিরোধী। তা ছাড়া কর্তা বড়ই তেজস্বী আর স্বাধীনচেতা পুরুষ,— এইজন্য কর্তাকে পছন্দ করে না।'

অপরাধ কার, সে নিজে কেন অপরাধী সাজিয়া থাকে, জ্যোতির্ময় বুঝিতে পারে না। তবুও সত্যপ্রিয়কে যারা মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করে না, সত্যপ্রিয়র মতামত নিয়া হাসাহাসি করে নিজেদের মধ্যে, তাদের কাছে কেমন যেন ছোট মনে হয় নিজেকে।

জ্যোতির্ময়কে সত্যপ্রিয়র সব সময়েই প্রায় দরকার হয়। কেবল আপিসে কাজ করিয়াই তার রেহাই নাই, সকালে ও সন্ধ্যায় প্রায়ই বাগানবাড়িতে ছুটিতে হয়, ছুটির দিনগুলিও অধিকাংশই বাগানবাড়িতে কাটে। হয়তো ঘণ্টাখানেক সত্যপ্রিয় তার সঙ্গে কাজের কথা বলে, বাকি সময়টা অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। তবে অসময়ে খাওয়ার জন্য বাড়িতে জ্যোতির্ময়কে ছুটিতে হয় না, খাওয়াটা সত্যপ্রিয়র ওখানেই হয়। মানুষজনকে খাওয়ানো সম্বন্ধে সত্যপ্রিয় বড়ই উদার। হয়তো সত্যপ্রিয়র ধারণা আছে, মানুষকে দিয়া গুণ গাওয়ানোর একটা সহজ উপায় মানুষকে ঠাসিয়া নুন খাওয়ানো।

চাকরি জ্যোতির্ময়কে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। মুখে সে বলে বটে যে, খাটিতে খাটিতে প্রাণ গেল, এত খাটুনি মানুষের সহ্য হয় না,—বাড়ির চেয়ে আপিসে থাকিতেই সে ভালবাসে, বাড়ির লোকের ভাবনা ভাবার চেয়ে কাজের ভাবনা ভাবাতেই তাব আরাম বোধ হয় বেশি। অনেক বয়সে বিবাহ করিলে লোকে নাকি একটু বৌ-পাগলা হয়, জ্যোতির্ময়েরও হয়তো এ রকম পাগলামি একটু জন্মিয়াছে, কিন্তু সেটা প্রকাশ পায় রাত্রে শয্যাগ্রহণ করিবার সময়, যখন আর কোন কাজ করিবার থাকে না, আর কিছু ভাবিবার থাকে না। আগে বিশ্রাম ছিল শুধু ঘুম, এখন জুটিয়াছে পুতুল নিয়া খেলা করার আমোদ,—অপরিপুষ্ট ও অপরিণত অপরাজিতার বিবর্ণ মুখ ও উৎসুক দৃষ্টি শ্রান্তি দূর করিতে সাহায্য করে। সারাদিন মনের রাশ টানিয়া রাখিবার পর আলগা দেওয়ামাত্র প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় প্রচণ্ডভাবে, মনের একটা সাময়িক বিকারের মত। কি যে সে করে অপরাজিতাকে নিয়া আর কি যে করে না, আদরে সোহাগে দম আটকাইয়া আসে,—শান্ত, সহিষ্ণু ও অন্যমনস্ক মানুষটার আকস্মিক প্রণয়মূলক উন্মত্ততার ভয়ে তার বুকের মধ্যে টিপ টিপ করিতে থাকে। কোনদিন তার মূর্ছা হওয়ার উপক্রম হয়, ফ্যাকাশে মুখে চটচটে ঘাম দেখা দেয়, চোখ স্তিমিত হইয়া আসে। জ্যোতির্ময় খেয়ালও করে না অপরাজিতার মুখে একটি কথা নাই, আধমরা মানুষের মত সে শিথিল হইয়া গিয়াছে। এক গ্লাস জল দিতে বলিলে সে যে নড়িতেছে না সেটা দুষ্টামিও নয়,

অবাধ্যতাও নয়, আলস্যও নয়। আপিসের পিয়ন কথা না শুনিলে জ্যোতির্ময় যেমন বিরক্ত হয়, অপরাজিতার উপর তার তেমনি বিরক্তি জাগে। নেহাৎ ভদ্রলোক বলিয়াই আপিসের পিয়নের মত বৌকে গালাগালি করে না, মৃদু অনুযোগ ও উপদেশ দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়ে।

অপরাজিতার গা এলানো নির্বাক শিথিল ভাবটা জ্যোতির্ময় যে অসুস্থ দেহ-মনের দুর্বলতার লক্ষণ বলিয়া চিনিতে পারে না, হয়তো তার আরও একটা কারণ আছে। মাঝে মাঝে অপরাজিতা ক্ষেপিয়া যায়, কি অফুরন্তই মনে হয় সেদিন তার জীবনীশক্তি। গল গল করিয়া ক্রমাগত কথা বলিয়া যায়, অপরিমিত হাসে, প্রাণহীন জড়বস্তুর মত কেবল সোহাগ গ্রহণ করার বদলে সোহাগের বন্যায় স্বামীকে একেবারে ভাসাইয়া দিবার চেষ্টা করে, এমন লজ্জাহীন বেহায়ার মত আচরণ করে যে, জ্যোতির্ময় প্রায় স্তম্ভিত হইয়া যায়। আবেগের আতিশয্যে কোনদিন নিজের চুল টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করে ; অস্বাভাবিক ফর্সা মুখখানা তাহার দেখায় রক্তবর্ণ, চোখ হইয়া থাকে বিস্ফারিত।

পরিসমাপ্তিটাই জ্যোতির্ময়কে সবচেয়ে বেশি বিব্রত করে। অকারণে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া অপরাজিতা বলিতে থাকে, 'লোকে বৌকে কত ভালবাসে, তুমি আমায় একটুও ভালবাস না।' কিছুতেই কি সে থামে! জ্যোতির্ময় যতই বুঝাইবার চেষ্টা করে যে, অন্য যত স্বামী আছে পৃথিবীতে তাদের সকলের চেয়ে সেই বেশি ভালবাসে তার বৌকে, অপরাজিতা তত বেশি কাঁদে আর তত বেশি অনুযোগ করে।

পরদিন নটা-দশটার আগে কোনমতে অপরাজিতাকে তোলা যায় না, সুবর্ণ গিয়া জাগাইয়া দিলেও তার হাত ছুড়িয়া দিয়া পাশ ফিরিয়া তৎক্ষণাৎ আবার ঘুমাইয়া পড়ে। ঘুম যখন ভাঙ্গে, বুঝিতে যখন পারে, সে কে এবং কোথায় আছে, তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হয়। কোনরকমে সে নিচে যায়, লজ্জায় ভয়ে কাঠ হইয়া থাকে। অন্য সময়, অন্য অবস্থায়, অন্য লোক তার মুখ আর কালিপড়া চোখ দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ হয়তো তাকে বিছানায় ফেরৎ পাঠাইয়া তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিয়া আনিত, কিন্তু এ সময়, এ অবস্থায়, এ বাড়িতে কে অনুমান করিবে অসুখের ঝড়েই একরাত্রে মেয়েটার অবস্থা হইয়াছে দুমড়ানো মোচড়ানো চারার মত? প্রতিদিনকার মত কালও সে নিয়মিত খাইয়া-দাইয়া ঘরে গিয়াছিল, কাল বরং অন্যদিনের চেয়ে তাকে মনে হইয়াছিল একটু বেশি সজীব আর হাসি-খুশি। তা ছাড়া, অনেক রাত্রে তার হাসি আর কথার শব্দও তো বাড়ির লোকের কানে আসিয়াছে কিছু কিছু।

তাই সুধীরা মুখ বাঁকাইয়া শুধু বলে, 'হুঁঃ।' আর সুবর্ণ কেবলি মুচকি মুচকি হাসে, আড়ালে ডাকিয়া নিয়া গত রজনীর ইতিহাস সব না হোক কিছু শুনিবার জন্য কেবলি তোষামোদ করে আর কেবলি ভয় দেখায়, 'না যদি বল বৌদি, আমার বিয়ে হলে একটি কথাও তোমায় বলব না।'

জ্যোতির্ময় কিছু দ্যাখেও না, বলেও না। ঘুম ভাঙ্গিবার পর আর অপরাজিতার দিকে তাকানোর অবসর তার হয় না। কত দায়িত্ব তার, কত দুশ্চিন্তা! মন পড়িয়া থাকে আপিসের দিকে। অপরাজিতা উঠিবার আগেই হয়তো সে বাহির হইয়া যায়।

হেড আপিসটি বেশ বড়, কয়েকটি বিভাগ আছে, শ'চারেক লোক কাজ করে। জ্যোতির্ময়ের আপিস যে ঘরে তার মাঝামাঝি মানুষ-সমান উঁচু কাঠের পার্টিশন তুলিয়া দু'ভাগে ভাগ করিয়া ফেলা হইয়াছে, একভাগে জ্যোতির্ময় বসে, অন্য ভাগে অনাথের বড়

শালা কেষ্টবাবু। কেষ্টবাবুর কাজটা ঠিক কি, এত কাছাকাছি থাকিয়া এতদিনেও জ্যোতির্ময় ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। এককালে স্বদেশী করিতে অনেকগুলি স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ ছিল, সভা-সমিতি ও নেতাদের মজলিসে সব সময়েই প্রায় তাকে দেখা যাইত। কেবল জেলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে এমন কোন বিপজ্জনক সম্ভাবনার সময় আর তার পাত্তা মিলিত না। প্রৌঢ় বয়সে বোধ হয় কতকটা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করার পুরস্কারস্বরূপ আর কতকটা অনাথের খাতিরে এখানে একটা চাকরি পাইয়া এখন একটু আরাম করিতেছে। শ্রোতা পাইলেই নিজেদের গৌরবময় অতীত জীবনের গল্প আরম্ভ করে, সগর্বে বলে, 'ছেড়ে দিয়ে এলাম সাধে? আর সইল না মশায়। ওরা সব ক'টা হামবড়া, কেবল দলাদলি আর নিজে কি করে বড় হবে সেই চেষ্টা। চক্রোত্তিমশায়ের কথাই ঠিক, ওরাই দেশের সর্বনাশ করছে।' শ্রোতা না পাইলে টেবিলের সামনে মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া থাকে, মাঝে মাঝে ফোনটা তুলিয়া নিয়া কথা বলে, আর যখন তখন নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে একে ওকে ডাকিয়া অর্থহীন প্রশ্ন করে এবং উপদেশ ও ধমক দেয়। এই সব পরিশ্রমের কাজ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে সত্যপ্রিয়র দামী মোটর আপিসের সামনে আসিয়া দাঁড়ানোমাত্র তাকে ডাকিয়া দিবার জন্য পিয়ন পাঁচুকে সতর্ক করিয়া দিয়া টেবিলে পা তুলিয়া একটু ঘুমায়।

ঘুমানোর আগে হয়তো জোর গলায় জিজ্ঞাসা করে, 'কি করছেন জ্যোতির্ময়বাবু?'

'প্রুফ দেখছি।'

'চক্রোত্তিমশায়ের নতুন প্রবন্ধটার প্রুফ? সংস্কৃত কোটেশনগুলি ভাল করে মিলিয়ে দেখবেন কিন্তু, অনেক খুঁজেপেতে বার করেছি।'

জ্যোতির্ময় জবাব দেয় না। প্রবন্ধগুলিতে সংস্কৃত সাহিত্যে সত্যপ্রিয়র অগাধ পাণ্ডিত্যের যে পরিচয় থাকে, তার উৎস যে কেষ্টবাবু নয়, কেষ্টবাবু শুধু সত্যপ্রিয়র কোন্ বিষয়ে কি ধরনের শাস্ত্রীয় বাক্য প্রয়োজন জানিয়া নিয়া কয়েকজন আসল পণ্ডিতের কাছ হইতে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া আনে, জ্যোতির্ময়ের তা জানা আছে। তবু মোটামুটি সংস্কৃত জানা থাকায় সংগ্রহের কাজটা কেষ্টবাবু করে এবং করিতে পারে বলিয়া লোকটার উপর জ্যোতির্ময় বড়ই ঈর্ষা বোধ করে।

পিছনের ঘরখানা খাতাপত্রের গুদাম। আপিস-ঘরে ঢুকিলেই জ্যোতির্ময় পুরানো কাগজের সোঁদা গন্ধ পায়—কয়েক বছর নাকে লাগিতে লাগিতে সবদিন গন্ধটা সে আজকার সচেতনভাবে অনুভব করিতে পাবে না, কিন্তু অভ্যস্ত আবেষ্টনীর আরামটা সঙ্গে সঙ্গে বোধ করে। টেবিলের উপর বাঁধান খাতা, ফাইল, কাগজপত্র, অভিধান পর্যায়ের কয়েকটি ইংরাজী, বাংলা বই, কতকগুলি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা, আজকের তারিখের সাত-আটখানা ইংরাজী, বাংলা ছোট বড় সংবাদপত্র, কাগজ চাপার তলে কয়েকটি প্রুফ, কাঁচের দোয়াতদান, ব্লটিং প্যাড, কলিং বেল, পিন কুশন এই সমস্ত খুঁটিনাটির অস্তিত্ব পর্যন্ত যেন চোখের পলকে অনুভব করিযা সে খুশি হইয়া ওঠে।

নিজের রাজ্য পরিদর্শনরত রাজার মতই তৃপ্তিভরা এক অপরূপ গাম্ভীর্য তার গোলগাল মুখখানিতে ফুটিয়া ওঠে। নতুন ও পুরাতন চেয়ারগুলি, এক কোণে বইভরা বুক-সেলফ ও অন্য কোণে বাদামী কাগজে বাঁধানো পাহাড় সমান পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল এ সমস্ত যে তাকে ঘিবিয়া আছে কাজ করিতে করিতেও সে যেন মাঝে মাঝে তা অনুভব করিতে পারে। কাজের সময় এবং অন্য সময়েও, অনুভব করিতে পারে না কেবল পার্টিশনটার ওপাশে কেষ্টবাবুব অস্তিত্ব। বোধ হয় কেষ্টবাবুব উপর তার রাগ আছে বলিয়া।

নন্দকে জ্যোতির্ময় একটি চাকরি দিয়াছে, সত্যপ্রিয় মিলে ধর্মঘটের কিছুদিন পরেই। যশোদার আর ইচ্ছা ছিল না নন্দ এখানে চাকরি করে, ধর্মঘটের সঙ্গে সে যে ভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছিল তারপর তার ভাইকে এখানে চাকরি করিতে দেওয়াটা একটু খারাপ দেখায়। কিন্তু এদিকে ভাইটাও তার দিন দিন বড়ই বখাটে হইয়া যাইতেছে। গানবাজনা করিয়া তাস পিটাইয়া অলস বেকার জীবনযাপন করিতে করিতে অমানুষ হইয়া পড়িতেছে দিন দিন। যশোদার নিজের হাতে মানুষ-করা ছেলে, সেই ছেলের চোখে কি না মাঝে মাঝে ধরা পড়িতেছে ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু চাউনি! বারণ তাই যশোদা করে নাই। সত্যপ্রিয় মিলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া তো তার হয় নাই, এমন আর কি খারাপ দেখাইবে তার ভাই সত্যপ্রিয়র আপিসে সামান্য মাহিনায় কাজ করিলে। বাস্তব জগতের সংস্পর্শে একটু আসুক নন্দ, নরম মনটা তার গলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে, একটু শক্ত হোক।

'একটা ছোটখাট দোকান করে দি, তাই চালা তুই নন্দ, কেমন?'

'না দিদি। চাকরিই করি।'

তা করিবে না? চাকরি ছাড়া আর কিই বা করিবার ক্ষমতা তোমার আছে!

নন্দর কাজটা জ্যোতির্ময়কে সাহায্য করা। সহকারী সে নয়, সাহায্যকারী। নানা ঠিকানায় যে সব চিঠিপত্র পুস্তিকা প্রভৃতি যায় তার উপর ঠিকানা লেখা, কোথায় কি পাঠান হইল সেটা খাতায় টুকিয়া রাখা, যেখানে জ্যোতির্ময়ের নিজে না গেলেও চলে—পিয়ন পাঠান যায় না—সেখানে ছুটাছুটি করা, জ্যোতির্ময়ের প্রয়োজনমত হাতের কাছে এটা ওটা আগাইয়া দেওয়া, এই ধরনের সব ছোট ছোট সাধারণ কাজ। এই কাজ পাইয়া নন্দ কিন্তু ভারি খুশি। সে চাকরি করে কেবল এইজন্যই তার গর্বের সীমা নাই, তার উপর জীবনের হঠাৎ একটা অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কি একটা অজানা রহস্যময় জগতে সে আসিয়া পড়িয়াছে যেখানে চলাফেরা ওঠা বসা কথা বলা চুপ করিয়া থাকা সব কিছুরই নিয়ম নতুন!

এককোণে ছোট একটি টেবিল তার রাজ্য। জ্যোতির্ময়ের টেবিলের তুলনায় তার টেবিলটিকে অবশ্য দেখায় সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যের কাছে জংলি দেশের জমিদারির মত, তবু মোটা মোটা খাতা, দোয়াতদান, ব্লটিংপ্যাড, পিনকুশন এ সব সম্পদপূর্ণ এমন একটি সম্পত্তিই বা নন্দর কবে ছিল। অতি যত্নে নন্দ সব সাজাইয়া গুছাইয়া রাখে, মসৃণ ও সমতল করিয়া লাল নীল পেন্সিলের দু'টি মুখ কাটে, লাল কালির কলম ভুলিয়াও কখনও কালো কালিতে ডুবায় না, খাতার কাগজে লিখিবার সময় ধরিয়া ধরিয়া সাবধানে লেখে, খামে ভরিবার আগে প্রচারপত্রটির সঙ্গে জ্যোতির্ময়ের লিখিত পত্রটি ক্লিপ আঁটিবে না পিন দিয়া আঁটিবে এ কথাটি পর্যন্ত জ্যোতির্ময়কে জিজ্ঞাসা করিয়া নেয়। আর পরম উৎসাহে আপিসের নিয়মকানুন আয়ত্ত করার চেষ্টা করে।

জ্যোতির্ময় গম্ভীরমুখে বলে, 'অনাথবাবু ঘরে এলে উঠে দাঁড়িও।'

নন্দর মুখ ম্লান হইয়া যায়, ভয়ে ভয়ে বলে, 'উনি রাগ করেননি তো? আর কে কে এলে উঠে দাঁড়াব?'

'বলে দেবখ'ন।'

বাড়ি ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। তার শুকনো মুখ দেখিয়া যশোদা মনে মনে রাগ করিয়া ভাবে, সামান্য একটা চাকরির পরিশ্রম পর্যন্ত সইবার ক্ষমতা নেই শরীরে, কেন জন্মেছিলি তুই পৃথিবীতে? ভাইকে সে দুধ খাওয়ায়, কলা খাওয়ায়, সন্দেশ খাওয়ায়,—চাকরির শ্রমে ক্লান্ত শরীরটা যদি ভাল ভাল খাদ্য পাইয়া একটু পুষ্ট হইতে রাজি হয়। সন্ধ্যার সময় যশোদা

রাঁধাবাড়া নিয়া ব্যস্ত থাকে তখন অবসর হয় না, রাত্রে নন্দ চাকরির গল্প করে—সমস্ত দিনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারের বিস্তারিত কাহিনী। নন্দর আনন্দ ও আগ্রহ যশোদাকে পীড়ন করে। শুনিতে মনে তার খটকা লাগে যে, চাকরি করিতে গিয়া বাস্তব জগতের সংস্পর্শে আসিয়া নন্দর মন শক্ত হইবে এ আশা বোধ হয় মিথ্যা। যে জগতে নন্দ মানুষ হইয়াছে সেখানকার বাস্তবতা কি কম কঠোর, কম সর্বগ্রাসী! তাই যদি নন্দকে স্পর্শ করিতে না পারিয়া থাকে, সত্যপ্রিয়র আপিসের বাস্তবতা কি পারিবে? এক একটা ছেলে বোধ হয় এইরকম বর্ম-পরা মন লইয়া জন্মায়, পৃথিবীর ধূলা কাদা সে মনের নাগাল পায় না। পাপ পর্যন্ত তারা করে পুণ্য করার মত নির্দোষ আগ্রহের সঙ্গে। যে সব ছেলের সঙ্গে নন্দ এতকাল আড্ডা দিত, এখনও সকাল সন্ধ্যায় দিতেছে, তাদের কাছে পাকামি শিখিতে কি কিছু তার বাকি আছে? কিন্তু কি কাজে লাগিয়াছে তার ও-সব শিক্ষা? ছেলেমানুষি ঘোচে নাই, মন পাকে নাই, কয়েকটা কেবল বিকার জন্মিয়াছে মনের, কদর্য এবং কুৎসিত। বসিয়া বসিয়া স্বপ্ন দেখার তাতে তার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। খারাপ দিকেও কিছু অভিজ্ঞতা জন্মিয়া নন্দর মনটা যদি একটু শক্ত হইত, শিশু ভিখারী আর কিশোরী মেয়ের মত ভয়, লজ্জা, অভিমান, বিনয়, নির্ভরশীলতা, সঙ্কোচ, স্বপ্ন দেখা এ সব যদি একটু কমিত, বাঁচিয়া থাকাই যে একটা ভীষণ লড়াই এ বিষয়ে সামান্য একটু জ্ঞান জন্মিয়া ভাবপ্রবণতাটা খানিকটা নিস্তেজ হইয়া আসিত, তাতেও বোধ হয় যশোদা খুশি হইত।

একদিন সত্যপ্রিয় মহাসমারোহে বাপের বার্ষিক শ্রাদ্ধের আয়োজন করিয়াছে, রাজ্যের লোককে আহারের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, এক দলকে মধ্যাহ্নে, আরেক দলকে রাত্রে। আপিসের সকলে রাত্রে সত্যপ্রিয়র বাড়ি খাইতে যাইবে। হঠাৎ দুপুরবেলা সত্যপ্রিয় আপিসে আসিয়া হাজির। কেউ স্বপ্নেও ভাবে নাই সেদিন সে আপিসে আসিবে। সকলেই কম বেশি গা এলাইয়া দিয়াছিল—কেরানীরা পর্যন্ত। কেরানীদের সঙ্গে সত্যপ্রিয়র এ রকম কোন সম্পর্কই নাই, তাদের উপর অনেক উপরওয়ালা আছে, অন্য দিন যারা তাদের এক মুহূর্তের জন্য ঘাড় তুলিতে দেয় না। সত্যপ্রিয় না আসিলেও তাদের কাজে ঢিলা পড়িবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু কেবল একজনের কড়াকড়িতে যেখানে নিয়মতান্ত্রিকতা জেলখানার অত্যাচার হইয়া দাঁড়ায়, একটিমাত্র স্ক্রু আঁটা থাকিলে যেখানে সংগঠন খাড়া থাকে, সেই একজনের স্ক্রুতে ঢিলা পড়িলেই নিয়ম শিথিল হয়, সংগঠনে আলগা পড়ে। অন্যদিন সত্যপ্রিয় না আসিলেও কিছু আসিয়া যায় না, তার আসিবার সম্ভাবনাতেই যথারীতি কাজ চলিতে থাকে। কিন্তু আজ সত্যপ্রিয়র আবির্ভাব একরকম অসম্ভব জানা থাকায় কাজে কারও মন নাই, মাষ্টার আসিবে না জানিয়া স্কুলের ছেলেদের যেমন হয় সকলের মনে সেইরকম একটা মুক্তির আনন্দ আসিয়াছে, উপরওয়ালারাও হঠাৎ বিস্ময়কর উদারতার সঙ্গে কেরানীদের অনেকটা রেহাই দিয়াছে, ধমক দিবার পরিশ্রমটুকুও তারা আজ করিতে নারাজ। অনাথ ও আরও তিনজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী সিঁড়ির ঠিক পাশের ঘরে দারোয়ানকে দিয়া দারোয়ানের শিল-নোড়াতেই সিদ্ধি বাটাইতেছে, আপিসের দলাদলিতে এরা অনাথের দল। অন্য ঘরে উপরওয়ালাদের আরেকটি দলের গোপন পরামর্শের আসর বসিয়াছে, আলোচ্য বিষয়—আপিসের কূটনীতি এবং অনাথের প্রতিপত্তি ক্ষয় করিবার উপায় উদ্ভাবন। দুটি ছেলেমানুষ কেরানী বারান্দায় দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতে টানিতে গল্প করিতেছে। কর্মব্যস্ততার গুঞ্জনধ্বনির বদলে আজ আপিস জুড়িয়া উঠিয়াছে গল্পগুজবের চাপা কলরব। কয়েকজন

বৃদ্ধ কর্মচারী শ্রান্ত চোখ বুঁজিয়া ঝিমাইতেছে আর পাঁচুকে যথারীতি সতর্ক করিয়া না দিয়া টেবিলে পা তুলিয়া দিয়া কেষ্টবাবু হইয়া পড়িয়াছে নিদ্রাগত।

সত্যপ্রিয়র দামী মোটরটি নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল, হাতির দাঁতের ছড়িটি হাতে করিয়া সত্যপ্রিয় নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। আপিসের আবহাওয়ায় যেন একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ বহিয়া গেল। কি ভাগ্যে মোটব আসিয়া দাঁড়ানমাত্র পাঁচুর চোখে পড়িয়াছিল, চাপা গলায় অনাথকে খবরটা দিয়াই সে উপরে ছুটিয়া গেল। তারপর চওড়া একটা কাগজের তলে চাপা পড়িয়া গেল শিল-নোড়া, যুবক কেরানী দুটির হাতের সিগারেট পায়ের তলে পিষিয়া গিয়া হাতে দেখা দিল কলম, বৃদ্ধ কর্মচারী ক'জন চমকিয়া সজাগ হইয়া উঠিল, কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া কেষ্টবাবু পরীক্ষা করিতে লাগিল মোটা একটা হিসাবের খাতা ; আপিসটা হঠাৎ হইয়া গেল অস্বাভাবিকরকম স্তব্ধ। সত্যপ্রিয় মৃদু একটু হাসিল। এ রকম নিঃশব্দ পূজায় সে বড় তৃপ্তি পায়। এক-একটি ঘরের সম্মুখ দিয়া সত্যপ্রিয় যায় আর ঘরের ভিতরের কর্মচারীরা তড়াক তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, সত্যপ্রিয় চাহিয়াও দেখে নাই। তবে এ ঘবে ঢুকিবামাত্র পার্টিশনের ওপারে কেষ্টবাবু যে লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে গিয়া চেয়ারটাই উল্টাইয়া দিল, আর এপারে জ্যোতির্ময় ঘাড় গুঁজিয়া লিখিতেই লাগিল, এটা চাহিয়া দেখিল। একটুক্ষণের জন্য মনে হইল, দেওয়াল আর পার্টিশনের শেষপ্রান্তের কয়েক হাত ব্যবধানের মধ্যে দাঁড়াইয়া সত্যপ্রিয় ঠিক করিতে পারিতেছে না কার অংশে পদার্পণ করিবে। এ ধরনের সমস্যায় সত্যই সত্যপ্রিয়র বিরক্তিও জাগে, কৌতুকও বোধ হয়। ব্যাপারটা হাস্যকর বটে, কিন্তু তুচ্ছ নয়। যার অংশে পা দিবে সেটা হইবে তার সম্মান ও পুরস্কার, অন্যজনের পক্ষে যা তিরস্কারের সমান!

'এদিকে আসুন কেষ্টবাবু, দুজনে জ্যোতির্ময়বাবুর অতিথি হওয়া যাক। কি লিখছেন জ্যোতির্ময়বাবু?'

মুখ তুলিয়া দেখিয়া জ্যোতির্ময়ও তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

'বসুন, বসুন। অত ফর্মালিটি করবেন না, এ যুগে এ সব ফর্মালিটি অচল, কি বলেন?'

বলিয়া নিজে সত্যপ্রিয় দাঁড়াইয়া থাকে, বসে না। হাসিমুখে উচ্চারিত সহজ সরল মন্তব্য আর প্রশ্নটি যে তার কত বড় ফাঁদ, সত্যপ্রিয়র কাছে যে অনেকদিন কাজ করে নাই, তার পক্ষে কল্পনা কবা কঠিন। সে দাঁড়াইয়া আছে, শুধু বসিবাব অনুমতি দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই জ্যোতির্ময় বসে কিনা হঠাৎ তাই পরীক্ষা কবিয়া দেখিবার সাধ হইয়াছে সত্যপ্রিয়র। কিন্তু ভক্তি ও সম্মানপ্রদর্শনের পরীক্ষায় জ্যোতির্ময় কখনও ফেল করে না। সে ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল। সত্যপ্রিয়র কথার ফাঁদের জবাবও তার জানা আছে—'আজ্ঞে না, এটা ঠিক ফর্মালিটি নয়, আপিসের সুপিরিয়র অফিসারের সামনে দাঁড়ানই নিয়ম।'

এই কথাগুলি জ্যোতির্ময় উচ্চারণ করিল বটে, কিন্তু বলিল কি শুধু এইটুকু? কেবল সুপিরিয়র অফিসার বলিয়া দাঁড়ায়, আর কোন কাবণ নাই? কত কারণ আছে আবও। সত্যপ্রিয় অসাধারণ মানুষ এ জগতে, তার মত মানুষ আর নাই, তার অতুলনীয় বিদ্যাবুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, কর্মশক্তি, চরিত্রবল, নিষ্ঠা সমস্ত মিলিয়া জ্যোতির্ময়কে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে গদগদ করিয়া দিয়াছে, এইগুলিই আসল কারণ। তবে এ সব কথা মুখে বলিতে নাই, নির্জলা স্তোকবাক্যের মত শোনায়, এ রকম সস্তা মোসাহেবি সত্যপ্রিয়র ভাল লাগে না। না বলিয়াও এই কথাগুলি বলিবার একটা কায়দা আছে, দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে, মুখের ভাবে. চোখের দৃষ্টিতে. বলার ধবনে

কথাগুলি নেপথ্যে থাকিয়াও সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করে। কায়দাটা আয়ত্ত করিতে একটু সময় লাগে, কিন্তু তারপর আর বিশেষ অসুবিধা হয় না। মনের কথা বলা হইয়াছে, সত্যপ্রিয়র শোনাও হইয়াছে, টের পাইয়া তখন বড়ই আনন্দ হয়। সরব পূজাও অবশ্য আছে সত্যপ্রিয়র, কিন্তু নীরব পূজা যখন জানাইয়া দেয় পূজা যথাস্থানে পৌঁছিয়াছে, তখন প্রায় পুলকের শিহরণের সঙ্গেই মনে হয়, দেবতার সঙ্গে যেন রীতিমত একটা সম্পর্কই স্থাপিত হইয়া গেল।

কেষ্টবাবুর পূজাটা প্রধানত সরব, জ্যোতির্ময়ের নীরব পূজার মত মার্জিতও নয়, সরসও নয়। কেষ্টবাবুর ঈর্ষাতুর মুখের দিকে এক নজর চাহিয়া জ্যোতির্ময়ের পূজায় পরিতৃপ্ত দেবতা উপবেশন করে। তারপর অনাথ আসিয়া জোটে। নিজের ঘরে না গিয়া সত্যপ্রিয় জ্যোতির্ময়ের ঘরে গিয়াছে টের পাইয়া আপিস পরিচালনায় যে ক'জন সত্যপ্রিয়র ডান হাত আর বাঁ হাত তারাও আসিয়া জোটে। প্রথমে দাঁড়াইয়া থাকে, বসিতে বলিলে বসে। সত্যপ্রিয় কথা বলে এমনভাবে যেন এ আপিসটির সঙ্গে তার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই, সে কেবল একজন মাননীয় অতিথি, একটু বেড়াইতে আসিয়াছে, গল্পগুজব করিতে আসিয়াছে। বাহিরের লোকের মতই এক সময় সে ভদ্রতার কুশল জিজ্ঞাসা করার মত বলে, 'কাজকর্ম চলছে কেমন আপনাদের, ঠিকভাবে চলছে তো?' বলিয়া মুখটা এ দিকের কাঁধের সান্নিধ্য হইতে ধীরে ধীরে ও দিকের কাঁধের কাছে লইয়া গিয়া নিজেই আবার বলে, 'একটু যেন ঢিল পড়েছে মনে হল। তা হোক, তা হোক, তাই স্বাভাবিক, মাঝে মাঝে হঠাৎ দু'একটা দিন এ রকম ঢিল পড়ে। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্বাস্থ্য বজায় রেখে পাশ্চাত্ত্য প্রথায় কাজ করা বড় কঠিন, মানুষকে একেবারে যন্ত্র বানিয়ে দিচ্ছে দিনকে দিন—স্বাস্থ্য, শান্তি সব রসাতলে গেল।'

এই ভয়টাই সকলের মনে জাগিতেছিল। আজ যখন তার পিতৃশ্রাদ্ধ, কেহ কল্পনা করিবে না সে আপিসে আসিবে, অতএব আজই একবার দেখিয়া আসা যাক কাজকর্ম কেমন চলিতেছে। সকলেই মুখ কাঁচু-মাচু করিয়া ক্লিষ্ট হাসি হাসে। অনাথ বলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু কাজে ঢিল পড়েছে আজ, কারও মন বসছে না কাজে। ও বেলা আপনার ওখানে যাবার কথা ভেবে—'

'এখন ছুটি দিয়ে দিলে কেমন হয় অনাথ?'

জবাব দেওয়ার আগে অনাথ এক মুহূর্তের মধ্যে সত্যপ্রিয়র মুখের ভাবটি অধ্যয়ন করিয়া ফেলে, তারপর দৃঢ়স্বরে বলে, 'আজ্ঞে না, খেতে যাবে রাত্রে, এখন থেকে ছুটি কেন?'

সত্যপ্রিয় সকলের দিকে চাহিয়া বলে, 'দেখলেন আপনারা? আপিসের ওপর এতটুকু জোরও আমার নেই, একদিন হাফ হলিডে দিতে চাইলে দিতে পারি না!'

সত্যই যেন আপিসের উপর সত্যপ্রিয়র কিছুমাত্র জোর নাই, এইরকমভাবে সকলে নিঃশব্দে হাসিল। এভাবে হাসাই নিয়ম, কারণ এটা রসিকতা। 'ইচ্ছে করলে একদিন কেন, যতদিন খুশি আপিস ছুটি দিতে পারেন—' এ ধরনের কোন কথা বলা নিষেধ। কারণ, তাতে দিনকে রাত বলিয়া যে রসিকতা করা হইয়াছে তার জোর কমিয়া যায়। সত্যপ্রিয় সাধারণভাবেই কথা বলিয়া যায়, রাগ করিয়াছে কিনা বোঝা যায় না, কিন্তু আপিসের কাজে শৈথিল্য দেখিয়া যে খুশি হয় নাই, সেটা টের পাইতে কারও বাকি থাকে না। খুশি না হওয়ার মধ্যেই এ ব্যাপারের শেষ নয়, বেতনভোগী কর্মচারীদের সম্বন্ধে অমন নিষ্ক্রিয় খুশি অ-খুশির ধার সত্যপ্রিয় ধারে না। কিছু একটা ঘটিবেই। হয়তো সপ্তাহ কাটিবে, মাস কাটিবে, আজিকার আকস্মিক আপিস-পরিদর্শনের কথা সত্যপ্রিয়র মনে আছে কিনা টেরও পাওয়া যাইবে না। হঠাৎ একদিন কয়েকটা পরিবর্তন, কয়েকটা নূতন নিয়ম বিনা সমারোহে চালু হইয়া যাইবে।

কিন্তু কি পরিবর্তন? কি নিয়ম?

কিছুক্ষণ পরে সত্যপ্রিয় উঠিল। বুক-শেলফের আড়ালে আধ-ঢাকা নন্দর দিকে কখন চোখ পড়িয়াছিল কেউ জানে না, উঠিয়া দাঁড়াইয়াই কিন্তু জিজ্ঞাসা করিল, 'ছেলেটি কে জ্যোতির্ময়বাবু?'

জ্যোতির্ময়ও এই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল, 'একজন হেল্পার নিতে বলেছিলেন, ওই ছেলেটিকে নিয়েছি। নন্দ এদিকে এসো। এঁকে প্রণাম কর।'

ঝুঁকিয়া পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করবার সময় মনে হইল নন্দর শিরদাঁড়াটা বুঝি জামা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিবে, আশীর্বাদ করার ছলে সত্যপ্রিয় আলগোছে তারই উপরে একটু হাত বুলাইয়া দিল। হঠাৎ-জাগা ছেলেমানুষি খেয়ালের হাত হইতে মানুষ হইয়া কে রেহাই পায়? সংযমের জন্য সময় পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

বোধ হয় নিজের এই আকস্মিক ও অকারণ দুর্বলতার কাছে হার মানার জন্যই নন্দর স্বাস্থ্যের শোচনীয় অভাবটা সত্যপ্রিয় ক্ষমা করিয়া ফেলিল। বোধ হয় আপিসের তুচ্ছতম কেরানীটিকেও সে তুচ্ছ করে না, ডান-হাত বাঁ-হাতগুলিকে এটা বুঝাইয়া দিবার জন্যই বিদায় নেওয়া কয়েক মিনিট পিছাইয়াও দিল। নন্দকে জিজ্ঞাসা করিল দু'একটা কথা, উপদেশ ও উৎসাহ দিল যথেষ্ট, সামান্য অবস্থা হইতে মানুষ যে শুধু নিজের চেষ্টাতেই বড় হইতে পারে এই সুপ্রাচীন মিথ্যাটি কয়েকবার কয়েকভাবে নন্দর মাথায় ঢুকাইবার চেষ্টা করিল—সমস্তই স্নেহ ও শুভেচ্ছার সঙ্গে।

তারপর হঠাৎ সে যেন চিরকালের মত বিদায়গ্রহণ করিতেছে, সকলের সঙ্গে এই তার শেষ দেখা এমনি উদাস ব্যথিতকণ্ঠে বলিল, 'আচ্ছা যাওয়া যাক এবার, কাজ করুন আপনারা। যে সমস্যাতে আপনারা আমাকে ফেলে দিলেন মশায়! মাঝে মাঝে দশজনকে ডেকে খাওয়াতে না পারলে তো বাঁচব না মশায়, পয়সা যে রোজগার করছি দু'টো আর কিসে তার সার্থকতা বলুন? কিন্তু আমার বাড়িতে নেমন্তন্ন থাকলেই যদি কাজে ঢিল পড়ে, তবে তো ভাবনার কথা! পয়সাই যে রোজগার হবে না তা হলে, দশজনকে খাওয়াবো কি!'

সে চলিয়া গেলে সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। এ আপিসে সবচেয়ে বেশি মাহিনা পায় বীরেনবাবু নামে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। সত্যপ্রিয়র সম্বন্ধে বেশি মাথা ঘামানোর বদলে কাজের দিকেই তার ঝোঁক বেশি। একরকম তারই চেষ্টায় সত্যপ্রিয়র নতুন একটি ব্যবসায় এবং আপিসের নতুন একটি বিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই গড়িয়া তোলার কাজে সত্যপ্রিয়র সঙ্গে কয়েকবার তার মনোমালিন্যও হইয়া গিয়াছে। সত্যপ্রিয় যে তাকে পছন্দ করে না, তাকে ছাড়া চলিবে না বলিয়াই টিকিয়া আছে, অনেকেই তা জানে। বীরেনবাবু সকলকে আশ্বাস দিয়া বলিল, 'ভয় নেই, কেউ আপনারা জবাই হবেন না। উনি শুধু ওয়ার্নিং দিয়ে গেলেন। উনি কাউকে জবাই করেন না।'

কথাটা সেই রাত্রেই প্রমাণ হইয়া গেল অদ্ভুতভাবে।

সত্যপ্রিয়র প্রকাণ্ড বাড়ির হল, বড় বড় তিনটি ঘর আর উপর ও নিচের লম্বাচওড়া বারান্দায় নিমন্ত্রিতেরা সারি সারি বসিয়া গিয়াছে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলাইয়া স্ফটিকের জপমালা হাতে করিয়া খড়ম পায়ে সত্যপ্রিয় একে একটু হাসি, ওকে দু'টি কথা দিয়া কৃতার্থ করিয়া বিনয় ও ভদ্রতা রক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। পরিবেশন আরম্ভ হওয়ামাত্র হঠাৎ যেন একটা গুরুতর কথা মনে পড়িয়া গেল।

নন্দ সারাক্ষণ ছায়ার মত জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিল, হলঘরের একপ্রান্তে জ্যোতির্ময়ের কাছেই সে খাইতে বসিয়াছে। কাছে গিয়া সত্যপ্রিয় বলিল, 'ছি ছি, এঁকে এখানে বসালে কে? এঁর দিদি শুনলে রাগ করবেন যে! তোমাদের কারও ঘটে এক ফোঁটা বুদ্ধি নেই ভূষণ—সকলকে কুশাসনে বসিয়েছ, পাতায় খাওয়াচ্ছ বলে এঁর বেলাও তাই করবে? কার্পেটের আসন নিয়ে এসো একটা, আর রূপোর থালা, গেলাস, বাটি বার করে দিতে বল।'

পরিবেশন বন্ধ হইয়া রহিল, হলের একদিকে কয়েকহাত জায়গা খালি ছিল, সেইখানে লাল ঘাসের মধ্যে সবুজ বাঘ আঁকা কার্পেটের আসন পাতা হইল, সত্যপ্রিয়র সবিনয় অনুরোধে ভীতসন্ত্রস্ত নন্দ পায়ে পায়ে উঠিয়া গিয়া আসনে বসিল। সামনে ঝকঝকে রূপার থালা দেওয়া হইয়াছে, সাধারণ থালার তিনগুণ তার আকার।

'তুমি শুধু এঁকে পরিবেশন করবে ভূষণ—আর কারো দিকে তোমার তাকাবার দরকার নেই।'

ঘরের শ'দেড়েক মানুষের কারও মুখে কথা নাই। জ্যোতির্ময়ের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিহ্বল নন্দ এদিক ওদিক তাকায়, মনে হয় বুঝি কাঁদিয়াই ফেলিবে। কাল সাহেবী পোশাকে যে সত্যপ্রিয়কে আপিসে আসিতে দেখিয়াছিল, আজ বাড়িতে আধা সাধকের বেশে সত্যপ্রিয়কে চেনা তার পক্ষে যেমন কঠিন, আজ দুপুরে আপিসে নন্দকে স্নেহকোমলকণ্ঠে আশীর্বাদ, উপদেশ ও উৎসাহ দিতে যে দেখিয়াছিল, এখন বাড়িতে সেই নন্দকে এই অপরূপ উপায়ে পীড়নের আনন্দে মশগুল সত্যপ্রিয়কে চেনাও তার পক্ষে কম কঠিন নয়; সকলেই বেতন পায় কাজের বদলে, সকলেই দাস। তাই ঘরভরা মানুষ স্তব্ধ হইয়া এখনকার সত্যপ্রিয়কে চিনিবার চেষ্টা করে।

'দাঁড়িয়ে রইলে কেন, পরিবেশন আরম্ভ কর? আপনারা খান।'

সরিয়া আসিয়া জ্যোতির্ময়কে উদ্দেশ করিয়া সত্যপ্রিয় বলে, 'সত্যি বলছি জ্যোতির্ময়বাবু, ওনার পরিচয় জানতাম না। এই খানিক আগে শুনলাম তাই ত্রুটি হয়ে গেছে, যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে পারিনি।'

জ্যোতির্ময় নীরবে লুচি ভাঙ্গিয়া এক টুকরা লুচি আর কিছু বেগুনভাজা মুখে তোলে। না জানিয়া সত্যই অপরাধ হইয়া গিয়াছে। যার প্ররোচনায় সত্যপ্রিয়র দু'টি মিলে ধর্মঘট হইয়াছিল মাত্র কিছুদিন আগে, তার ভাইকে চাকরিটা দেওয়া উচিত হয় নাই।

সত্যপ্রিয়র সংযম আছে, কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে না—একমাত্র অর্থোপার্জনের বিষয়টি ছাড়া। নন্দর সামনে থালা-বাটিতে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য জমিতে থাকে, নন্দ হাত গুটাইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। কিন্তু সত্যপ্রিয় আর তার দিকে তাকায় না, আর কিছুই তাকে বলে না। আগের মত একে একটু হাসি এবং ওকে দু'টি কথা দিয়া বেতনভোগী অতিথিদের আপ্যায়ন করিতে থাকে।

বাড়ি ফিরিবার সময় জ্যোতির্ময় বলে, 'কাল থেকে তুমি আর আপিসে যেও না ভাই। যদি পারি অন্য কোথাও তোমার একটা চাকরি করে দেব।'

নন্দ চুপ করিয়া থাকে। জ্যোতির্ময় একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলে, 'আমার কোন দোষ নেই বুঝতে পারছ তো? এক মাসের মাইনেটা তোমায় পাইয়ে দেব?'

'মাইনে চাই নে।'

বিছানায় শুইয়া নন্দ আর সেদিন প্রতিদিনকার মত ঘুমানোর আগে খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করে না, চুপচাপ শুইয়া থাকে। নিজের হাতে মানুষ করা ভাই সম্বন্ধে যশোদার অনুভূতি একটু বেশিরকম তীক্ষ্ণ। অন্ধকার ঘরে নন্দর অভ্যস্ত নড়নচড়নের সাড়া না পাইয়া সে ঘরের অন্যপ্রান্তের বিছানা হইতে জিজ্ঞাসা করে, 'ঘুমোলি নন্দ?'

'না ঘুমোইনি।'

নন্দ রাগ করিয়াছে? কি হইল নন্দর?—'কি আবার হল তোর?'

'সকলের সঙ্গে ঝগড়া করবে তুমি, আর চাকরি যাবে আমার। সর্বনাশ করে ছাড়বে তুমি আমার।'

নন্দর উল্টাপাল্টা কথা জোড়া দিয়া ঘটনাটা আগাগোড়া গঠন করিতে যশোদার একটু সময় লাগে। তখন সে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলে, 'আর তুই কি করলি? ঘাড় হেঁট করে খেয়ে এলি পেট পুরে? মরণ হয় না তোর নচ্ছার হারামজাদা ছেলে!'

'খেয়েছি নাকি আমি কিছু?'

'খাসনি? কিছু খাসনি? বসেই বা রইলি কেন অমন অপমানের পর? কার্পেটের আসন আর রূপোর থালাবাটি যখন আনতে বলল, গট গট করে উঠে চলে আসতে পারলি না তুই? বলে আসতে পারলি না, তোমার মত লোকের বাড়িতে আমি—'

উঠিয়া আলো জ্বালিয়া : 'যাক গে, মরুক গে। যা করেছিস, বেশ করেছিস। কি খেতে দি' তোকে এখন আমি! লুচি, পোলাও ফেলে এলি, ঘরে যা আছে তা কি তোর মুখে রুচবে? দাঁড়া, আনিয়ে দিচ্ছি।'

রাত তখন এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। সুধীরকে সঙ্গে নিয়া গিয়া সেই রাত্রে যশোদা তার শত্রু ও সখী কুমুদিনীকে ডাকিয়া তুলিয়া তার স্বামীর সাইকেলে সুধীরকে খাবার আনিতে পাঠাইয়া দিল। কুমুদিনীর স্বামীর টিফিন-ক্যারিয়ারটিও সঙ্গে দিল।

'যত শীগগির পার ফিরে আসবে কিন্তু—জোরে জোরে চালিয়ে যাও।'

এক ঘণ্টা পরে সুধীর আসিল। যশোদার ফরমাসমত সব জিনিস সে পায় নাই, তবে অনেক কিছুই আনিয়াছে। লুচি, তরকারি, ডাল, মাংস, ডিম ভাজা মামলেট, সাতরকম মিষ্টি, দই এবং রাবড়ি। রাগ ও ঝোঁকের মাথায় এত সব খাদ্য যশোদা আনিতে দিয়াছিল বটে, এত রাত্রে নন্দকে সব খাইতে দেওয়ার সাহস তার হইল না।

অর্ধেকের বেশি তুলিয়া রাখিল, বাকিটা ভাগ করিয়া দিল সুধীর আর নন্দকে।

'পেট ভরেনি দিদি।'

'খুব ভরেছে, এবার ওঠ।'

'সন্দেশ দাও আরেকটা।'

'উঁহু, যা খেয়েছ তাতেই তোমার অসুখ হয় কিনা দ্যাখো, আর সন্দেশ খায় না।' ধনঞ্জয়ের কথা যশোদার মনে পড়িতেছিল। সমস্ত খাবারটাই তাকে নির্ভাবনায় দেওয়া চলিত, অসুখের কথা ভাবিতে হইত না। মানুষটা খাওয়ায় ছিল ভীম, হজমশক্তিতে অগস্ত্য। ভাবিতে ভাবিতে যশোদার মনে পড়ে যে, খাইয়া ধনঞ্জয়ের পেট ভরিত কিনা এ কথা তো একদিনও সে তাকে জিজ্ঞাসা করে নাই! এ বাড়ির সকলেই যতক্ষণ ক্ষুধা না মেটে চাহিয়া খায়, এ বিষয়ে যে সঙ্কোচ করিবার কিছু থাকিতে পারে কারও তা মনেও আসে না। কিন্তু ধনঞ্জয়ের মত যে বেশি খায়, একজনে তিন-চারজনের ভাত, তার হয়তো একটু লজ্জা করিত বার বার চাহিয়া খাইতে। মোটামুটি আন্দাজ করিয়াই অবশ্য যশোদা তাকে সব দিত, তবু পরের পেটের

খবর কি আন্দাজে লোকে সঠিক জানিতে পারে?

এত রাত্রে হঠাৎ সব ভাল ভাল খাদ্য আনাইবার কারণটা জানিবার জন্য সুধীর ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কয়েকবার জিজ্ঞাসা করিয়া ভালরকম জবাব পায় নাই। নন্দ শুইয়া পড়িলে যশোদা যখন ঘরে দরজা দিবার উপক্রম করিতেছে, তাকে বাহিরে ডাকিয়া আনিয়া চুপি চুপি সুধীর আরেকবার জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যাপার কি বল তো চাঁদের মা? এত রাত্রে খাবার আনালে, নিজে কিছু খেলে না, আমাদে: খাইয়ে সব তুলে রাখলে?' যশোদা একটু হাসিয়া বলে, 'মাথাটা হঠাৎ বিগড়ে গেল কিনা—'

সুধীর ভয় পাইয়া বলিল, 'মাথার অসুখ আছে নাকি তোমার?'

'নেই? রাতদুপুরে যারা খালি খালি বাজে কথা শুধোয় একবার ছেড়ে দশবার, তাদের মাথাটা ছেঁটে ফেলতে সাধ যায় সুধীর। ভালয় ভালয় শুয়ে পড়গে যাও।'

শুনিয়া সুধীর ক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া গেল। কী অকৃতজ্ঞ যশোদা! এত রাত্রে প্রাণপণে সাইকেল চালাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে খাবারগুলি নিয়া আসিল, এত জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও খাবার আনিবার কারণটা তাকে কিছুতেই খুলিয়া বলিল না। ভাল ভাল জিনিসগুলি পেট পুরিয়া তাকে অবশ্য খাইতে দিয়াছে যশোদা, তবু—

পরদিন সকালে উঠিয়াই নন্দ ছুটিয়া গেল জ্যোতির্ময়ের বাড়ি।

'আমার একমাসের মাইনেটা পাইয়ে দেবেন তো?'

যশোদা নিজের হাতে মানুষ করিয়াছে বটে, কিন্তু কেবল একজন মানুষ তো আরেকজনকে মানুষ করে না, আরও অনেক কিছু করে। দাবিটা অবশ্য নন্দের অন্যায় নয়, নিজের প্রাপ্য সে দাবি করিতে শিখিয়াছে জানিলে যশোদা খুশিই হইবে, কিন্তু এমন সসঙ্কোচে ভিক্ষা চাওয়ার মত দাবি করা কেন? কাল রাত্রেই বেতনের যে টাকা কয়েকটা সে নিবে না বলিয়াছিল, সকাল হইতে সে টাকার উপর এত লোভ কেন, ফস্কাইয়া যাওয়ার এত ভয় কেন?

চার

বর্ষার পরে একদিন ধনঞ্জয় আসিয়া হাজির।

সেইরকম জামাকাপড়, সেই সতরঞ্জিমোড়া বিছানা আর রঙ-চটা টিনের বাক্স, কেবল আগের বারের চেয়ে ধনঞ্জয় নিজে একটু কাবু হইয়া পড়িয়াছে মনে হয়। এই শরীরে সামান্য জোয়ার-ভাটা ধরাই কঠিন, সুতরাং দেখিয়াই যখন টের পাওয়া যায়, ভাটাটা সম্ভবতঃ বেশ একটু জোরালই হইয়াছে।

যশোদা খুশি হইয়া বলিল, 'তুমি কোথা থেকে গো নবাবসায়েব? এসো, এসো। বাড়ির আমার মান্যি বাড়ল।'

ধনঞ্জয় একটা পিঁড়িতে বসিয়া বলিল, 'আবার ফিরে এলাম চাঁদের মা।'

'তা বেশ করেছ, ফিরে আসবে বৈকি। সবাই আসছে, তুমি আসবে না কোন্ দুঃখে?'

বিকালে একটা অবসর পাইয়া কালো আসিয়া যশোদাকে তার দুঃখের কাহিনী শুনাইতেছিল। জগৎ বড় খাবাপ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে তার সঙ্গে। আর সহ্য হয় না। কি রকম ব্যবহার? খাইতে দেয় না? মারে? না, সে সব নয়, ভাল করিয়া কথা বলে না,

বকে, খোঁটা দেয়, আরও কত কি করে! নালিশ শুনিতে যশোদার ভাল লাগে না, বিশেষত এই সব অভিমান আর ভাবপ্রবণতার নালিশ। তবু সে মন দিয়া শুনিবার চেষ্টা করিতেছিল আর কালোর কাঁদ' কাঁদ' মুখ দেখিয়া ভাবিতেছিল এমন নরম মন না হলে আর চাঁপা তোমায় কলতলায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়, তুমি চুপ ক'রে থাকো! ধনঞ্জয় আসিবামাত্র কালোর কথা শুনিতে আর তার কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না। দুঃখের কথা বলিতে না পাইয়া মনের দুঃখে কালো ঘরে ফিরিয়া গেল।

যশোদা ধনঞ্জয়ের খারাপ চেহারা আর সঙ্কোচ লক্ষ্য করিতেছিল, কিন্তু অনর্থক মিষ্টি কথা বলা যশোদার ধাতে নাই।—'কাজ করবার মন করে এসেছো তো এবার, না আবার লেজ গুটিয়ে পালাবে?'

'না, কাজ করব। উপায় কি?'

যশোদাও তো এই কথাই বলিয়া আসিয়াছে চিরকাল, কাজ যখন করিতেই হইবে কাজ না করিয়া উপায় কি? দেশের জন্য মন অবশ্য কাঁদে, সহর আর সহরতলী ভাল অবশ্য লাগে না সকলের, কিন্তু এ সব মন-কাঁদা আর ভাল লাগা-না-লাগাকে প্রশ্রয় দিলে মানুষের চলিবে কেন?

'বেশ, থাকো এখানে, কাজ একটা জুটিয়ে দেব'খন।'

এখানে থাকার কথায় ধনঞ্জয়ের সঙ্কোচ বাড়িয়া যায়, সে উসখুস করিতে থাকে। যশোদা চিন্তিতভাবে বলিতে থাকে যে, কোন্ ঘরে ধনঞ্জয়কে থাকিতে দেওয়া যায়? টিনের ঘরে তার জায়গাটা আবার বে-দখল হইয়া গিয়াছে, সুধীর যে ঘরে থাকে সেখানে একজনের জায়গা হইতে পারে বটে, কিন্তু বড়ই ঘেঁষাঘেঁষি হইবে। তার চেয়ে—'পাকা ঘরে জায়গা আছে. সেখানে থাক না তুমি? ভাড়া কিন্তু একটু বেশি।'

ধনঞ্জয় বিপন্নভাবে ডান হাতের তালুটা হাঁটুতে ঘষিতে ঘষিতে বলে, 'আমি বলছিলাম কি, যদ্দিন কাজকর্ম না জোটে আমি বরং অন্য কোথাও—'

'এখানে থাকবে না? বেশি ভাড়া না দিতে চাও—'

'বেশি ভাড়ার জন্যে নয়। মানে, কি জান চাঁদের মা, সঙ্গে এবার—'

আর কিছু বলিতে হয় না, যশোদা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা অনুমান করিয়া বলে, 'অ! পয়সা-কড়ি সঙ্গে নেই, ট্যাঁক এবার টিক্ টিক্ করছে।'—যশোদা হাসে, 'কোথায় থাকবে তবে বিনি পয়সায় থাকতে দেবে জানাশোনা আছে কেউ?'

ধনঞ্জয় ছেলেমানুষের মত বিব্রত হইয়া পড়ে, গলাটা সাফ করিয়া বলে, 'কাজটা যদ্দিন না হয় একরকম করে—'

যশোদা গম্ভীরমুখে বলে, 'রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দেবে আর কলের জল খেয়ে পেট ভরাবে। তাই করোগে যাও, আমার কাছে এসেছ কেন? আমি কাজ জুটিয়ে দেব, সে পর্যন্ত আমার অন্ন খেতে মানে বাধবে—এমন যদি মানী দুর্যোধন তুমি, রোজগার করতে বেরিয়েছ কেন ঘর থেকে? বৌয়ের আঁচল ধরে বসে থাকলেই পারতে ঘরে!'

ধনঞ্জয় হঠাৎ গরম হইয়া বলিল, 'বৌ কোথা যে বৌয়ের খোঁটা দিচ্ছ!'

যশোদা আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'বৌ নেই তোমার? আরবার যে বললে ছেলেমেয়ে আছে চারটি?'

ছেলেমেয়ে থাকিলেই যে বৌ থাকিবে তার কি মানে আছে? বৌ মরিতে জানে না? কেবল একটি নাকি, দু'টি বৌ মরিয়াছে ধনঞ্জয়ের। চারটি ছেলেমেয়েই তার প্রথম বৌ-এর,

পাঁচ নম্বর সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়া সে বৌ মরিয়া যায় পাঁচ বছর আগে। তারপর ধনঞ্জয় যাকে বিবাহ করিয়াছিল, প্রথম সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়া সেও মরিয়া গিয়াছে আজ প্রায় দু'বছর। সেই হইতে ধনঞ্জয়ের বৈরাগ্য আসিয়াছে, আর সে বিবাহ করিবে না।

'আমার বৌ বাঁচবে না চাঁদের মা, ছেলে-মেয়ে হতে গেলেই মরে যাবে। মোদের গাঁয়ের রাধাচরণ কবরেজ নিজে বলেছে।'

'এক চড়ে মাথাটি ঘুরিয়ে দিতে পারনি তোমাদের গাঁয়ের রাধাচরণ কবরেজের? কথা শোন একবার!'

দেহ বড় হইলে বুদ্ধি নাকি কম হয়। এই হিসাবে ধনঞ্জয়ের একফোঁটা বুদ্ধি থাকাও উচিত নয়। সে যেন তারই প্রমাণ দিবার জন্য বলে, 'না না, কথাটা সত্যি। তবে যদি তোমার মত বড় সড় কাউকে—'

পাকা ঘরে ধনঞ্জয়ের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া রাত্রে রান্নাঘরে তাকে ডাকিয়া যশোদা তার দেশের গল্প শুনিতেছিল। উনানে মস্ত কড়াই চাপাইয়া সে তখন তেল গরম করিতেছে, ডাল সম্ভার দিবে। কি বলিতেছে খেয়াল করিয়াই ধনঞ্জয় সভয়ে থামিয়া গিয়াছিল, কে জানে এবার যশোদা রাগের মাথায় কড়াই-এর গরম তেলটাই তার গায়ে ঢালিয়া দিবে কি না! কিন্তু যশোদা রাগিল না, প্রচণ্ড শব্দে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, 'তাই করো তবে এবার, আমাকেই বিয়ে করে ফেলো।' বলিয়া হাসি আর যশোদার থামে না। জগতে যত মানুষ প্রাপ্য হাসি প্রত্যাখ্যান করিয়া হাসে না, তাদের সকলের ভাগের হাসি যশোদা যেন একাই বে-দখল করিয়াছে। হাসির শব্দে সুধীর আসিয়া রান্নঘরের দরজায় দাঁড়াইল, হাসির দমক কিছুতেই সামলাইতে না পারিয়া কোনমতে কড়াইটা নাড়াইয়া রাখিয়া যশোদা পালাইয়া গেল উঠানে।

উঠানে বড় তাড়াতাড়ি যশোদার হাসি থামিয়া গেল। এতটুকু উঠানে দাঁড়াইয়া প্রাণ ভরিয়া হাসা যশোদার পক্ষে অসম্ভব। এখানে দাঁড়াইলেই যেন চারিদিকের ঘরগুলি সরিয়া সরিয়া আসিয়া তার হাসি-কান্না চাপা দিবার চেষ্টা করে। ঘরে তো এ রকম হয় না! এখানে তবু মাথার উপরে আকাশ আছে, ঘরে শিকবসানো জানালা ছাড়া কোথা এতটুকু ফাঁক নাই। হয়তো ঘরের পক্ষে খাঁচা হওয়াটাই স্বাভাবিক বলিয়া পীড়ন করে না, উঠান ফাঁকা হওয়া উচিত বলিয়া এখানকার সঙ্কীর্ণতা বাগে পাইলেই যশোদার দম আটকাইয়া দিতে চায়।

'বাপরে বাপ—কি হাসাতেই পারে লোকটা। দম আটকে মরলাম হাসতে হাসতে।' বলিয়া আর একটুও না হাসিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া যশোদা আবার উনানে কড়াইটা চাপাইয়া দেয়। ভাবিতে থাকে যে, কি কুক্ষণে বেশি লোককে থাকতে দেবার জন্যে উঠানে ঘর তুলেছিলাম! ঘর থেকে বেরিয়ে একটু হাঁপ ছাড়বার জায়গা নেই। এই কথা ভাবিয়া মনে মনে আপসোস করিতে করিতে চাঁদের কথা মনে পড়িয়া যশোদার বড় কষ্ট হয়। প্রবল বন্যার মত যেভাবে হাসি আসিয়াছিল, সেইভাবে পুত্রশোক ভিতর হইতে ঠেলিয়া উঠিতে থাকে। কিন্তু এমন খাপছাড়া অদ্ভুত সংযম যশোদার যে, হাসি ঠেকাইতে না পারিলেও শোকটা অনায়াসে চাপিয়া রাখিয়া রান্না করিয়া যায়।

ধনঞ্জয়ের সঙ্গে এত হাসাহাসি সুধীরের ভাল লাগে নাই, এক ফাঁকে সে যশোদাকে জিজ্ঞাসা করে, 'ওকে যে দালানঘরে থাকতে দিলে, ভাড়া দিতে পারবে? মতি কি বলছিল জান, ওর একটি কানাকড়ি সম্বল নেই।'

রেলের ইয়ার্ডে যশোদা সুধীরের একটি চাকরি করিয়া দিয়াছে। কাজটি ভাল, আগের

চেয়ে সুধীরের উপার্জন বাড়িয়াছে। সুধীরের গর্ব ও গৌরবের সীমা নাই।

যশোদা বলে, 'তোমার সে কথা ভাববার দরকার? কাজকর্ম হলেই সম্বল হবে।'

সুধীর সবজান্তার মত হাসিয়া বলে, 'হচ্ছে! কাজ করবার মতলব ও সব লোকের থাকে? রোজগার করলেও একটি পয়সা আদায় করতে পারবে ভেবেছো? যদ্দিন পারে থেকে তোমার ঘাড়টি ভেঙে পালাবে।'

যশোদা রাগিয়া বলে, ' পালায় পালাবে, তোমার কি ক্ষতি হবে শুনি? তোমরা বড় বাকি রেখেছ আমার ঘাড় ভাঙতে? কতগুলো টাকা পাব তোমার কাছে একবারটি মনে পড়ে?'

শুনিয়া অপমানে মুখ কালো করিয়া সুধীর সরিয়া যায়। শত্রু অকথ্য গাল দিলেও সুধীরের এ রকম অপমানবোধ হইত না, আপনজনের মত ভাল পরামর্শ দিতে আসিয়া এ রকম অপমান খাইলে মানুষের সহ্য হয়? মনে মনে গর্জাইতে গর্জাইতে সুধীর ভাবে কি, এ মাসের বেতনটা একবার হাতে পাইলে হয়, যশোদার একটি পয়সা বাকি রাখিবে না; কিন্তু এক মাসের বেতনে তো কুলাইবে না! যশোদার কাছে সে যে অনেক টাকা ধারে! যশোদার পাওনাটা অবিলম্বে সংগ্রহ করিয়া তার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার সুখটা অনুভব করিবার আগ্রহে কত মতলবই যে সে মনে মনে ঠাওরাইতে থাকে। মানুষের পাওনা ফাঁকি দিবার মতলব ঠাওরানই যার চিরদিনের অভ্যাস, একেবারে উল্টা ধরনের ভাবনা ভাবিবার সময় তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখে এমন একটা আশ্চর্য দুঃখের ছাপ পড়ে যে, দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়, মনে হয় এইমাত্র লোকটার কোন আপনজন মরিয়া গেল নাকি?

মানুষকে কাজ জুটাইয়া দিতে যশোদা বড় ওস্তাদ। অনেক বছর ধরিয়া ধীরে ধীরে আপনা হইতে অনেকগুলি ছোট বড় কলকারখানার সঙ্গে তার একটা যোগাযোগ গড়িয়া উঠিয়াছে, অনেক কারখানার ম্যানেজার হইতে সর্দার কুলি পর্যন্ত তাকে চেনে—চোখে না দেখিলেও নাম শুনিয়াছে। অনেক শ্রমিকের সঙ্গে যশোদার মুখোমুখি পরিচয় আছে, অনেকে তাকে কেবল দু'একবার চোখে দেখিয়াছে, অনেকে সহকর্মীদের মুখে তার নাম শুনিয়াছে। কার কাজ নাই, কার কাজ চাই, কে কাজের লোক, কে অকেজো, কোথায় কোন কারখানায় কি ধরনের লোক নেওয়া হইতেছে বা হইবে, এ সব খবর ঘরে বসিয়াই এত বেশি পাওয়া যায় যে খাতাপত্রের সাহায্য ছাড়া মনে রাখা অসম্ভব। কিন্তু ও সব হিসাব রাখার বালাই যশোদার নাই, সেটা তার পেশাও নয়। কোন আদর্শ, উদ্দেশ্য বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করে নাই, শ্রমিক-জগতে আপনা হইতে তার একটা স্থান জুটিয়া গিয়াছে, প্রথমে খুবই সঙ্কীর্ণ ছিল, এখন পরিসর বাড়িয়াছে।

কিন্তু নিজের স্থানটির সীমা যশোদা কখনও অতিক্রম করে না, চেষ্টা করিয়া পরিসর বাড়াইবার চেষ্টাও করে না। যাদের সঙ্গে তার সংযোগ আছে, সোজাসুজি পরিচিত না হোক অন্তত পরিচিত কারও মধ্যস্থতায় যাদের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত যোগাযোগ একটা স্থাপিত হইয়াছে অথবা হয়, কেবল তাদের সম্বন্ধে যে সব খবর কানে আসে সেইগুলিই বাছিয়া বাছিয়া মনে রাখে। চেষ্টা করিয়া যে সে মনে রাখে তা নয়, মনে থাকিয়া যায়। হয়তো কানে আসিল ভারতলক্ষ্মী মিলের লুমে কাজ করিবার জন্য কয়েকজন লোক চাই ; সঙ্গে সঙ্গে যশোদার মনে পড়িয়া গেল ভারতলক্ষ্মী মিলের সহকারী ম্যানেজারের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় না থাকিলেও লোকটি তাকে বড় বিশ্বাস করে, আজ পর্যন্ত যত লোককে সে পাঠাইয়াছে

প্রত্যেককে ওখানে নেওয়া হইয়াছে ; সেই সঙ্গে যশোদার আরো মনে পড়িয়া গেল লুমে কাজ করিয়াছে এমন সাতজন বেকারকে সে জানে। তাদের দু'জন একেবারে অপদার্থ, দু'জন সুবিধাজনক নয়, তিনজন ভাল। একটুকরা কাগজ ছিঁড়িয়া পেন্সিল দিয়া যশোদা তখন আঁকা-বাঁকা অক্ষরে সাতজনের নাম লেখে, তিনজনের নামের পর লেখে good, দু'জনের নামের পরে লেখে not good, আর দু'জনের নামের পর লেখে bad ; লিখিয়া not good ও bad চারজনকেও একটু সুযোগ দিবার অনুরোধ করিতে গিয়া যশোদার ইংরাজি জ্ঞানে কুলায় না, চোখ কান বুঁজিয়া বাংলাতেই অনুরোধটা জানায়, তারপর নিজের নাম স্বাক্ষর করে। অনুরোধটা কাকে করিতেছে, কি জন্য করিতেছে, সাতটি নাম ও নামের পাশের মন্তব্যের অর্থ কি এ সব কিছুই কাগজের টুকরাটি পড়িয়া বুঝিবার উপায় থাকে না, কিন্তু ভারতলক্ষ্মী মিলেরই একজন শ্রমিকের সঙ্গে সাতজন কর্মপ্রার্থীকে মিলে পাঠাইয়া দিলে সেখানকার গুজরাটি সহকারী ম্যানেজার জলের মত সমস্ত পরিষ্কার বুঝিয়া ফেলে। কাগজের টুকরাটি যত্ন করিয়া রাখিয়া সাতজনকেই হয়তো কাজে লাগাইয়া দেয়, হয়তো পাঁচজনকে কাজে লাগাইয়া বাকি দু'জনকে ফিরাইয়া দেয়।

যশোদার মতে যারা bad, কাজ না পাইলে অথবা কাজ পাইয়া কিছুদিন পরে বরখাস্ত হইলে তারা যশোদার কাছে নালিশ জানাইতে আসে। যশোদা বলে, 'আমি কি করব? কাজ জানো না, তার ওপর কাজে ফাঁকি দেবে, কে রাখবে তোমাদের? তার চেয়ে এক কাজ কর না তোমরা, অন্য কাজে লেগে যাও। অন্য কাজে হয়তো তোমাদের মন বসবে।'

তারা রাজি হয় না, কিছুতেই রাজি হয় না, রাগ করিয়া যশোদাকে প্রথমে কড়া কড়া কথা বলিয়া গাল দিবার উপক্রম করিয়াই যশোদার মুখ দেখিয়া থামিয়া যায়। তারপর একমাস কাটে, দু'মাস কাটে। মুখ কাঁচু-মাচু করিয়া একদিন তারা আবার আসিয়া দাঁড়ায় যশোদার কাছে। কিছুদিন পরে হয়তো তাদের একজনকে দেখা যায় একটি আপিসের বারান্দায় বুকের কাছে লাল হরফে আপিসের নামের সঙ্কেত-লেখা লম্বা কোট গায়ে চাপাইয়া কলিংবেলের টুং টুং আওয়াজের প্রতীক্ষায় টুলে বসিয়া ঢুলিতেছে, আরেকজনকে দেখা যায় পাড়ারই ডায়মণ্ড রেস্টুরেন্টে (ডবল ডিমের ওমলেট মাত্র ১৫ পয়সা) পাড়ার চা-প্রিয় ছেলে-বুড়োকে চা সরবরাহ করিতেছে। মুখের উপর হইতে একটা পর্দা যেন সরিয়া গিয়াছে দু'জনেরই, জীবন-যাপনে দু'জনেই বেশ মশগুল।

যশোদা কি করিয়া টের পায় ভগবান জানেন, বোধ হয় অনেকদিন এদের সঙ্গে এদেরই একজন হইয়া বাস কবিতেছে বলিয়া, কয়েকজন অলস ও অকর্মণ্যকে কেবল জীবিকা-অর্জনের ভিন্ন পথ ধরাইয়া সে কাজের মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। তার সখী কুমুদিনীর বাড়ির ঠিক পাশে ন'কড়ি ছিল কুঁড়ে, একমাসের বেশি ন'কড়ি কোথাও চাকরিতে টিকিয়া থাকিতে পারিত না, তার ছেলেমেয়ে বৌ-এর সে কি দুর্দশা। একবার যশোদার একখানা শাড়ি মাঝামাঝি ভাগ করিয়া ন'কড়ির বৌ আর মেয়ে তিনদিন ঘরের মধ্যে আটক থাকিবার পর বাহিরে আসিতে পারিয়াছিল। তারপর যশোদা ন'কড়ির তাড়িখানায় চাকরি করিয়া দিয়াছে, এবং জীবনযুদ্ধে এই চাকরির কর্মটা ন'কড়ির গায়ে যেন আঁটিয়া বসিয়া গিয়াছে, কোনোদিন খসিয়া পড়িবে না। আর সম্প্রতি ন'কড়ির বৌ একখানা নতুন ডুরে শাড়ি পরিয়া সমস্ত পাড়া ঘুরিয়া সকলকে দেখাইয়া বেড়াইয়াছে, যশোদাকে পর্যন্ত।

ধনঞ্জয়ের জন্য কাজ জোগাড় করিতে গিয়া যশোদা কিন্তু বিপদে পড়িয়া গেল। একেবারে আনাড়ি মানুষটা, কোন কাজ জানে না, কাজ শিখিবার বয়সও চলিয়া গিয়াছে। গায়ে জোর

আছে, মাথায় মোট বহা আর ঠেলাগাড়ি ঠেলার মত যে সব কাজ শুধু গায়ে জোর থাকিলেই মোটামুটি করা যায়, সে সব কাজও লোকটা করিবে না—অপমান হইবে। সহ্য বোধ হয় হইবে না, প্রকাণ্ড একটা দেহ থাকিলেই তো কষ্ট সহ্য করার শক্তি জন্মায় না। চাষবাসের কাজ জানে, কিন্তু এখানে চাষবাসের কাজ যশোদা কোথায় পাইবে!

'নিজের হাতে চাষ করতে তো? না অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিজে ফোঁপরদালালি করতে?'

'নিজে কিছু করতাম বৈ-কি।'

'কিছু কিছু করতে!'

সেটা যশোদা আগেই টের পাইয়াছিল, মানুষটা একটু আরামপ্রিয় অর্থাৎ সহজ ভাষায় কুঁড়ে। আরামপ্রিয় মানুষ না হইলে রাগ, অভিমান এমন প্রবল হয়, কথায় কথায় বোধ হয় অপমান! নিখুঁত সৃষ্টি ভগবানের কুষ্ঠিতে নাই ভাবিয়া যশোদার বড় আপসোস হয়। কি অপরূপ একটা শরীর! ধরাবাঁধা কাজে অলস কিন্তু বাজে কাজে পরিশ্রম করিতে খুব পটু, পনের মাইল হাঁটিয়া বেড়াইয়া আসে, না বলিতেই বালতি বালতি জল তুলিয়া ছাতে বর্ষার শ্যাওলা সাফ করিয়া দেয়—রাত্রে চিৎ হইয়া শুইয়া শরৎকালের আকাশ দেখিবে! দেহের গড়নটা তাই তার বিকৃত হয় নাই, কেবল ভাল করিয়া খাইতে না পাওয়ার জন্যই বোধ হয় একটু—ধনঞ্জয়ের সর্বাঙ্গে চোখ বুলাইয়া যশোদা আন্দাজ করিবার চেষ্টা করে ভাল করিয়া খাইতে না পাওয়ার জন্য কতটুকু ক্ষতি তার দেহের হইয়াছে, খাওয়া পাইলে আরও কতখানি পরিপুষ্ট দেখাইত তাকে।

কিন্তু কাজ? উপার্জনের ব্যবস্থা? বসাইয়া বসাইয়া লোকটাকে পেট ভরিয়া খাওয়াইলেই ত' চলিবে না, যতই ভাল'লাগুক ওর খাওয়া দেখিতে! অনেক ভাবিয়া যশোদা একদিন বলিল, 'এক কাজ কর তুমি। সুধীরেব সঙ্গে রেলের ইয়ার্ডে যাও, চারদিক ঘুরে ফিরে কাজকর্ম দেখো গিয়ে, তারপব ওখানেই সুবিধামত একটা কাজ তোমাকে জুটিয়ে দেব।'

'কাজ হবে কিনা না জেনে—'

যশোদা জোর দিয়া বলিল, 'হবে। নইলে মিছিমিছি তোমায় পাঠাব, মাথা খারাপ নাকি আমার? কাজ তুমি করতে পারবে কিনা সে হল ভিন্ন কথা।'

ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যশোদা এই সব আলোচনা করে আর সুধীর এদিক হইতে ওদিক যাওয়ার সময় আব ওদিক হইতে এদিক আসার সময় তীব্রদৃষ্টিতে দু'জনকে দেখিয়া যায়। গা জ্বালা করে সুধীরের। না খাইয়া কাজে গেলে ক্ষুধায় সে কষ্ট পাইবে বলিয়া এই যশোদাই কি একদিন তাকে খাওয়ার সুযোগ দিতে ছল করিয়া বাড়ি ছাড়িয়া চলিযা গিয়াছিল? তার জন্য নিশ্চয় নয়, বুড়া মতির জন্য। বুড়ো মানুষকে যশোদা কষ্ট দিতে চায় নাই। তা ছাড়া, দু'বেলা খাইতে দেওয়াব জন্য যশোদা টাকা নেয়, জোর জবরদস্তি করিয়া খাওয়া বন্ধ করিবার তার কি অধিকার আছে, তাতে গোলমাল হইতে পারে। এই সব ভাবিয়াই হয়তো যশোদা সেদিন ও রকম বুদ্ধি আঁটিয়া তাদের খাওয়ার সুযোগ দিয়াছিল, নিজেরও মান বাঁচাইয়াছিল। চালাক তো কম নয় যশোদা। অসুখের সময় সেবা করা? জরিমানার টাকা দেওয়া? এ সমস্তের চমৎকার ব্যাখ্যা সুধীর এখন আবিষ্কার করিতে থাকে। কি আর এমন সেবাটা যশোদা তার করিয়াছিল, ও রকম সে তো অসুখ-বিসুখের সময় সকলেই করে। যাদের কাছে থাকা আর খাওয়ার জন্য টাকা নেয় দু'বেলা রাঁধিয়া তাদের খাওয়ানোর মত অসুখের সময় সেবা করাটাও তো যশোদার সাধারণ কর্তব্য।

জরিমানার টাকাটা যশোদা দিয়াছিল, নিছক তাকে হাতে রাখিবার জন্য। সে কাজের লোক, তার মত কাজের লোক আর ক'টা আছে? সে হাতে থাকিলে ধীরে ধীরে জরিমানার টাকাটাও আদায় হইয়া যাইবে, অন্যদিকেও অনেক সুবিধা হইবে, এই সব হিসাব করিয়াই যশোদা তার সেই উপকারটা করিয়াছিল সন্দেহ নাই। রেলের ইয়ার্ডে তাকে কাজটা জুটাইয়া দিয়া মাঝখান হইতে যশোদা কিছু টাকা মারিয়াছে কিনা তাই বা কে জানে।

সুধীর চিরকাল জানিয়া আসিয়াছে মানুষের চালচলনই এইরকম, এই ধরনের ব্যবহারই মানুষ মানুষের সঙ্গে করিয়া থাকে, অন্য সময় অন্য কারও সঙ্গে হইলে রাগ করার কিছু আছে বলিয়া সে ভাবিতে পারিত না। এখন যশোদার সম্বন্ধে একটির পর একটি পরিবর্তনশীল মানসিক ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া তার যেন ধাঁধা লাগিয়া যাইতে থাকে। অভিনব প্রত্যাশা ও প্রার্থনার মন্দিরে গোঁয়ার-গোবিন্দরা চিরদিন হরিজনের মত ভীরু, সঙ্কোচ আর অস্বস্তিতে মৃতপ্রায়—যতদিন না ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া মনের সুখে মন্দিরটাই ভাঙ্গিয়া চুরমার করিবার সুযোগ পায়।

কাজে যাওয়ার সময় ধনঞ্জয়কে সঙ্গে নিয়া গিয়া চারিদিক দেখাইয়া শুনাইয়া দিবার প্রস্তাবে সে চোখে অন্ধকার দেখে।—'আমার কাজটি ওকে দেবার মতলব করছ বুঝি?'

'তোমার কাজটি ছাড়া জগতে আর কাজ নেই?'

শরৎকাল আসিবার পর অন্যান্য বছরের মতো এবারও চারিদিকে সকলের মধ্যে যশোদা একটা বিস্ময়কর মানসিক উদ্বেগ লক্ষ্য করে। চাঁপা ও কালোর বিবাদ চরমে উঠিয়াছে, ঠেলাঠেলি ও গালাগালির বদলে চাঁপা এখন নিজে কালোর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে আর একদিকে জগৎকে দিয়া তাকে পীড়ন করায়, অন্যদিকে সকলের কাছে তার নামে অকথ্য কুৎসা রটায়। জগৎকে হারানোর ভয়ে ব্যাকুল হইবার কোন কারণ ঘটে নাই, জগৎ নিজেও বরং বিবাহের দিনটি আগাইয়া আনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, তবু চাঁপার দুর্ভাবনার যেন সীমা নাই। তা ছাড়া, মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ অকারণে তার মুখে এমন একটা হতাশার ছাপ দেখা যায় যে, কালোর সম্বন্ধে তার বাড়াবাড়িটা একটু কমানোর জন্য তাকে ধমক দিবে ভাবিয়াও যশোদা ধমক দিতে পারে না।

পরেশকে একদিন পুলিস ধরিয়া নিয়া যায়।

এতকালের মধ্যে এই দ্বিতীয়বার চুরির জন্য যশোদার ভাড়াটে পুলিসের হাতে পড়িল। যশোদার মনটা বড়ই খারাপ হইয়া যায়। পরেশকে চলিয়া যাইতে বলাই উচিত ছিল। আগে কোনদিন চুরি করে নাই বা ভবিষ্যতে সুযোগ পাইলে করিবে না, কিন্তু চুরি করা যে কোনদিন এদের কারও পেশা ছিল না, রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া গোপন অভিযানে বাহির হইবার ত্রাস ও উত্তেজনার স্বাদ যে এরা কেউ পায় নাই, যশোদা তা জানে। পরেশের মত সে সব এরা কেউ পায় নাই, যশোদা তা জানে। পরেশের মত সে সব মানুষের জাতই আলাদা, তাদের চিনিতেও যশোদার বিশেষ কষ্ট হয় না। তবু জানিয়া বুঝিয়াও পরেশের সম্বন্ধে কেন যে মনের দুর্বলতা আসিয়াছিল!

পরেশের বৌকে সে জিজ্ঞাসা করিল, 'এবার তুমি কি করবে?'

পরেশের বৌ বলিল, 'কালীঘাটে আমার বাপের বাড়ি, আমায় যদি কালীঘাটে দিয়ে এসো যশোদাদিদি!'

কালীঘাটে তার বাবার বাড়ির ঠিকানা পরেশের বৌ জানে না, কিন্তু মন্দিরের কাছে গেলে

সেখান হইতে চিনিয়া যাইতে পারিবে। নন্দর সঙ্গে তাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে বলায় পরেশের বৌ আপত্তি করিল, মিনতি করিল, 'না দিদি, পুরুষের সঙ্গে যাব না।

'নন্দ তো ছেলেমানুষ, খোকার মা?'

হোক ছেলেমানুষ, পুরুষমানুষ তো, নন্দর সঙ্গে তাকে যাইতে দেখিলেই তার বাবা সন্দেহ করিবে, পাড়া-প্রতিবেশী সন্দেহ করিবে।

'তুমি আমায় দিয়ে এসো দিদি, পায়ে পড়ি তোমার।'

ধনঞ্জয়কে সঙ্গে করিয়া যশোদা পরেশের বৌকে পরদিন সকালবেলা তার বাপের বাড়ি পৌঁছাইয়া দিল। তারপর গেল মন্দিরে। এতকালে এ অঞ্চলও নাকি সহরতলী ছিল। কবে? যখন এখানে সবে সহরের পত্তন হইয়াছিল, তখন?

ধনঞ্জয় মস্ত বিদ্বান, স্কুলে ইতিহাস পড়িয়া যত শরীর প্রায় তত বড় ঐতিহাসিকে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, 'কলকাতা সহর যখন পত্তন হয়, সেই ইংরেজ আমলে, এটা তখন গাঁ ছিল।'

'সেই ইংরেজ আমল মানে? এটা কোন্ আমল?'

'ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে গো। ঐ যে ভবানীপুর না, যেখানটা এখন আসল সহর, ঐখানটাও আগে সহরতলী ছিল, শ্যাল ডাকত দিনদুপুরে।'

'দ্যুৎ!'

'দ্যুৎ? কেন, দ্যুৎ কেন? তিনটে গাঁ নিয়ে হল কলকাতা সহর, তা হলে একদিন ভবানীপুর কেন চৌরঙ্গীতেও তো শ্যাল ডাকতে পারত অনায়াসে, ওখানটা যখন গাঁ ছিল?'

কথাটা বিবেচনা করিয়া যশোদা বলিল, 'সে হিসাবে সব জায়গাই তো এককালে গাঁ ছিল।'

ধনঞ্জয় করুণার হাসি হাসিয়া বলিল, 'সে কেন হবে? কলকাতা হল বাংলার রাজধানী, ভারতবর্ষের রাজধানী হল দিল্লী। কলকাতার যখন চিহ্নও ছিল না তখনও দিল্লী সহর ছিল। এটা সহর নাকি? এটা হল—এটা হল নরক। বাঙালীরা খুব বজ্জাত কিনা তাই ইংরেজরা তাদের জন্যে এই নরক বানিয়েছে, কলকাতা সহর আছে বলেই তো বাঙালীর এই দুর্দশা। ছেলেগুলো একবার কলকাতা আসে আর বিগড়ে যায়, আমাদের গাঁয়ে কত ছেলে অমন গেছে। একটা বছর তুমি কলকাতা থাক, বাস্ আর গাঁয়ে গিয়ে বাস করতে পারবে না। কলকাতার মত পাজি জায়গা আছে! পেটভরে মানুষ খেতে পর্যন্ত পায় না বাছা তোমাদের কলকাতায়, এ্যাঁ!'

যশোদা ফোঁস করিয়া উঠিল, 'কেন, পেট ভরে খেতে দিই না তোমাকে?'

ধনঞ্জয় লজ্জিত হইয়া বলিল, 'আমার কথা বলছি নাকি? যেমন ধর ওই খাবারের দোকানটা, চার আনার খাবার কেনো, একবারটি মুখে দিতে কুলাবে না।'

'ভারি খাইয়ে তুমি তাই বলছ। এক সের রসগোল্লা খেলে ঢেঁকুর তুলবে।'

যশোদা আর একটু খোঁচাইতেই ধনঞ্জয় রাগ করিয়া তার খাওয়ার শক্তির পরিচয় দিতে স্বীকার হইয়া গেল। পাঁচ টাকার একটা নোট সঙ্গে করিয়া যশোদা বাহির হইয়াছিল, নতুবা সে এ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ধনঞ্জয়কে ক্ষেপাইয়া তুলিত কিনা সন্দেহ। নিজেরও যশোদার ক্ষুধা পাইয়াছিল বৈকি, ভাল খাবার খাইতে তার নিজেরও তলে তলে বেশ একটু লোভ ছিল বৈকি। যশোদা ভাত খায় তার সবচেয়ে জোয়ান ভাড়াটের তিনগুণ, সেইজন্যই সে মাঝে মাঝে রীতিমত সঙ্কোচবোধ করে, প্রাণ ভরিয়া ভাল খাবার খাওয়ার সাধটা তার সাধারণত চাপাই থাকে। আজ ধনঞ্জয়ের সঙ্গে নিশ্চিন্তমনে পেট ভরিয়া খাবার খাইল—ধনঞ্জয়ের খাওয়ার

পরিমাণটা তার চেয়েও বেশি, এইজন্য ধনঞ্জয়ের কাছে বসিয়া খাইতে তার লজ্জা করে না।

দু'জনকে একত্র দেখিলেই লোকের একটু অবাক হইয়া চাহিয়া থাকার কথা, দোকানী সবিস্ময়ে দু'জনের খাওয়া দেখিতে লাগিল। তারপর হাসিয়া ফেলিল।

চোখে পড়ায় ধনঞ্জয় রাগিয়া বলিল, 'হাসি কি জন্যে শুনি?'

যশোদা বলিল, 'আমাদের খাওয়া দেখে হাসছে আর কি।'

দোকানীর হাসি নিভিয়া গিয়াছিল, হাত জোড় করিয়া সে তাড়াতাড়ি বলল, 'আজ্ঞে না গিন্নিমা, খাওয়া দেখে কি হাসতে পারি! আপনারা খাবেন আজ্ঞে, তবে তো আমাদের দুটো পয়সা! আপনাদের দেখে বড় আনন্দ হল কিনা মনে, তাই হাসলাম একটু মনের সুখে। আমার একটি দিদি আছে গিন্নিমা, আমার পিসতুতো দিদি, তেনাও আপনারি মত আজ্ঞা।'

যশোদা বলিল, 'বটে নাকি?'

দোকানী বলিল, 'আজ্ঞা। তবে তেনার বয়েসটা কিছু বেশি হবে, চুলে পাক ধরে গেছে। আমরা যাই, তা তামাসা করে বলেন কি যে গুরুজন আমি, আমায় পেন্নাম কর রসিক। যেই পেন্নম করতে মাটিতে মাথা ঠেকাই, মাথার পরে পা'টি তুলে দেয়। বাস্, সব নড়নচড়ন বন্ধ। পা'টি না সরালে আর মাথাটি সরাবার যো নেই।'

বেশ বুঝা যায় শেষটুকু বাড়ানো ও বানানো গল্প। যত শক্তিমতী পিসতুতো বোনই মাথায় পা রাখুক, মাথা নাড়ানো চলিবে না, এত জোরে পায়ের চাপ দিয়া তামাশা করার শক্তি তার থাকিতে পারে না, কারণ মাথায় ও রকম চাপ পড়িলে ডাক্তার ডাকিবার দরকার হয়। রসিক কেবল রসালো খাবারের দোকান করে নাই, মানুষটাও সে রসিক বটে। যশোদার শুনিতে বেশ মজা লাগিতেছিল।

রসিক বলিল, 'কিন্তু হায় অদেষ্ট! বোনাইটি আমার এই এইটুকুন মনিষ্যি—একটা বাচ্চা ছোকরার সমান। মা কালী আপনাদের কেমন সুন্দর মিল করেছেন দেখে তার কথাটা মনে পড়ল কি না, তাই হাসছিলাম গিন্নিমা।'

অনেক বেলা হইয়াছে গঙ্গার ঘাটে বসিবার আর সময় ছিল না, তবু দু'জনে একটু বসিল। খাওয়াটা বড় বেশি হইয়াছে। অনেক নারী পুরুষ ঘাটে স্নান করিতেছে, লজ্জাটা নারী ও পুরুষ উভয়েরই কম, মানুষের যতটা দরকাব প্রায় ততটুকু—দেখিলে কে বলিবে তারা সহর বা সহরতলীর অধিবাসী, স্নানের সময় অত্যন্ত স্বাভাবিকতার পবিত্রতাটুকু পাওয়ার জন্যই যেন তারা বাড়তি সভ্যতা ত্যাগ করিয়াছে।

'আমি সত্যি হাতির মত দেখতে, না?'

'কই না, তুমি তো মোটা নও।'

'হাতি কি আর মোটা, হাতির চেহাবাই হাতির মত। কোত্থেকে যে হলাম এমন! আমার বাপ-মা তো এমন ছিল না, আমার ভাইটা তো এমন নয়, বোন আছে একটা, সে রীতিমত সুন্দরী—হ্যাঁ, মাইরি বলছি তোমায়। বিশ্বাস হল না?'

ধনঞ্জয় কি একবার যশোদাকে বলিতে গেল, তুমিও রীতিমত সুন্দরী? কথাটা কেমন শোনাইত কে জানে, জীবনে প্রথম একজন মানুষের কাছে কথাটা শুনিতে যশোদার কেমন লাগিত তাই বা কে জানে! কিন্তু ধনঞ্জয় কথাটা জলো করিয়া ফেলিল এইভাবে যে, 'তুমিও তো খুব বেশি খারাপ নও।'

'খুব বেশি না হই-খারাপ তো?'

'কে বললে খারাপ?'

যশোদা হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে, তিনটি যুবতী তৈরি করা চলিত এতগুলি হাড়মাংসের পুতুলের মত। একটু বুঝি বিশ্বাস তার হয় কথাটাতে, বড় সাধ কিনা বিশ্বাস করার। দেখিতে সে খারাপ নয় এ কথা বিশ্বাস করিবার সাধ ছিল না কি যশোদার? হয়তো ছিল, এতদিন খেয়াল করিয়াও খেয়াল করে নাই, খেয়াল করিতে সাহস পায় নাই। ধনঞ্জয় তাকে স্পষ্ট সুন্দরী বলিলে সে বোধ হয় এই খেয়ালখুশির রসালো ফাঁদে পড়িত না, শুনিতে ভাল লাগা আলাদা কথা, সে-মিঠা কথায় কাবু হওয়ার মানুষ যশোদা নয়, কিন্তু ধনঞ্জয় যেভাবে যা বলিয়াছে, সে কথাটা তো সত্য হওয়া আশ্চর্য নয়। তবু উঠিবার আগে ছড়া কাটিয়া রসিকতা করিতে যশোদা ছাড়িল না—

'ছদ্মবেশী ভীমকে পেয়ে কীচক খুশী ভারি,
ছদ্মবেশী ভীমকে পেয়ে কীচক খুশী নারী।'

ধনঞ্জয় রসিকতা না বুঝিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, 'আহা, কীচক তো ভীমকে আর দেখতে পায়নি চোখে, ভেবেছিল দ্রৌপদী বুঝি। আমি তো তোমায় চোখে দেখে বলছি, দেখতে তুমি খারাপ নও।'

যশোদা হাসিয়া বলিল, 'আ মর! এ দেখি কচি খোকার মত অভিমান করে। তুমি কি বাবু কীচক, না আমি সৈরিন্ধ্রী, যে গায়ে লাগল?—নাও ইবারে বাড়ি চল, যা রোদটা উঠেছে।'

এদিকে পাড়ার দু'জন স্ত্রীলোকের উপর রান্নার ভার দিয়া ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যশোদাকে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া সুধীর চোখে অন্ধকার দেখিতে থাকে। কেন গেল যশোদা, কি দরকার ছিল যশোদার যাওয়ার? যদি বা গেল, নন্দ থাকিতে ধনঞ্জয়ের সঙ্গেই বা গেল কেন? সুধীরকে তো সে বলিতে পারিত, আমার সঙ্গে চলো সুধীর। একদিন না হয় সুধীর কাজে যাইত না।

নন্দ কীর্তন শিখিতে যাইতেছিল, তার কাছে সুধীর পরেশের বৌ-এর বিবরণ এবং যশোদার কালীঘাট যাওয়ার প্রয়োজন খুঁটিয়া খুঁটিয়া জানিয়া একটু যেন শান্ত হইল মনটা। যশোদা বাধ্য হইয়া গিয়াছে। হয়তো সুধীরের কাজে যাওয়া হবে না ভাবিয়াই বেকার ধনঞ্জয়কে সঙ্গে নিয়া গিয়াছে। তবু সব কথা একবার তো সে বলিতে পারিত যে, এই দরকারে আমি এখানে যাচ্ছি সুধীর, তোমার কাজ কামাই হবে তাই ধনঞ্জয়কে সঙ্গে নিয়ে গেলাম!...এ ভাবে তাকে জানাইয়া যাওয়ার অর্থই যে তার অনুমতি নিয়া যশোদার কালীঘাটে যাওয়া এবং তার অনুমতি নিয়া যশোদার কোন কাজ করার সঙ্গত বা অসঙ্গত কোন কারণই থাকিতে পারে না, এ সব সুধীরের মাথায় আসে না। অত সব ভাবিবার জানিবার বা বুঝিবার ক্ষমতা তো তার নাই। সে রাগ করিতে জানে, তাই সোজাসুজি যশোদার উপর রাগ করে।

তারপর সে ইয়ার্ডে যায় কাজ করিতে।

ওয়াগনে কুলিরা মাল বোঝাই দেয়, সুধীর সর্দারি করে। মাল তুলিতে একটু সাহায্য করে, কুলিদের তাড়া দেয়, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিড়ি টানে, হঠাৎ ওয়াগনের ভিতরে ঢুকিয়া একটা মাল এদিকে, একটা মাল ওদিকে কয়েক ইঞ্চি সরাইয়া দেয়, থাকিয়া থাকিয়া বস্তাগুলি গোনে আর রাজেনকে জিজ্ঞাসা করে, 'কটা বস্তা যাবে বললেন আজ্ঞে এটাতে?'

রাজেন যশোদার সখী কুমুদিনীর স্বামী, রাজেনকে বলিয়াই যশোদা এখানে সুধীরের কাজ জুটাইয়া দিয়াছে। কুমুদিনী জানিলে অবশ্য যশোদার লোককে কাজ দেওয়ার সাহস রাজেনের

হইত না, কিন্তু কুমুদিনী জানে না। যশোদাকে যে রাজেন পছন্দ করে, ভয় আর খাতিরও করে—সেটা কুমুদিনীর অজ্ঞাতই আছে। আড়ালে যাই বলুক দেখা হইলে কুমুদিনী সখীর মত আলাপ করে যশোদার সঙ্গে, তখন তার কথা শুনিয়া আর মুখের ভাব দেখিয়া কে অনুমান করিবে যশোদাকে সে দু'চোখে দেখিতে পারে না, যশোদার নাম শুনিলেই তার মোটা শরীরের ঢিলা চামড়ায় জ্বালা ধরিয়া যায়! যশোদার কাছে কোন উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা ঘটিলে নির্বিবাদে সেটা আদায় করিয়া নিতেও কুমুদিনীকে কোনদিন কুণ্ঠিত দেখা যায় নাই। উপকার পাওয়ার পরেই যশোদার নিন্দায় কুমুদিনী মুখর হইয়া উঠিলে রাজেন প্রায় নির্বিকারভাবেই স্ত্রীর কথাগুলি শুনিয়া যায়, মাঝে মাঝে সায় দিয়া বিস্ময় ও বিরাগের দু'একটা সংক্ষিপ্ত মন্তব্য হয়তো করে। কাঁচা-পাকা চুলে ঢাকা মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলে, 'ছি ছি, ওকে আর বাড়িতে ঢুকতে দিও না।'

তারপর কাজে যাওয়ার সময় হয়তো যশোদার বাড়িতে একবার উঁকি দিয়া যায়, জীর্ণ-শীর্ণ মুখের চামড়া কৌতুকের হাসিতে কুঁচকাইয়া কুমুদিনীর নিন্দাগুলি সব যশোদাকে শোনায়, বলে, 'শুনলে যশোদা, কি সব বলে তোমার নামে?'

যশোদা কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলে, 'বলুকগে যাক্, মরুকগে যাক্, আজ তো নতুন নয়। ছেলেবেলা থেকে এমনি করে বলছে আমার নামে। তবে কি জান সরকার মশায়, আমার জন্যে ওর সত্যি মায়া আছে। এমনি বলে মুখে, কিন্তু—'

বাড়িতে যতই নিরীহ হইয়া থাক, যশোদার কাছে যতই কৌতুকের হাসি হাসুক, মেজাজ কিন্তু রাজেনের একেবারেই ঠাণ্ডা নয়। সুধীর কয়েকবার বোকার মত প্রশ্ন করিলেই তার মেজাজ গরম হইয়া যায়।

'মনে থাকে না তোর নচ্ছার? ক'বার বলব?'

নাকের মাঝখানে আঁটা চশমার ভিতর দিয়া রাজেন হাতের খাতাটির বাদামী রঙের পাতায় চোখ বুলাইয়া বলে, 'তেইশটা।'

'জায়গা থাক্‌বে।'

'থাকবে তো তোর কি? তোর বাবার ওয়াগন?' নির্দোষ মন্তব্যের জবাবটা একটু কড়া হইয়া গিয়াছে ভাবিয়াই হয়তো রাজেন একটু মৃদু গলায় বলে, 'ছেচল্লিশটা বস্তা দুটো ওয়াগনে যাবে, তেইশ ভাগ হবে না-রে পাঁঠা কোথাকার!'

'অ!' সুধীর তাড়াতাড়ি আর একবার ওয়াগনের ভিতরে গিয়া বস্তাগুলি গুণিয়া ফেলে। আরও কয়েকটি ওয়াগনে একই সময়ে মাল বোঝাই হইতেছিল। চটে মোড়া, কাঠের বাক্সে প্যাক করা, চৌকো গোল ছোট বড় কত মাল ওখানে আসিয়া জমা হইয়াছে, কাছে ও দূরে কত বিভিন্ন তাদের গন্তব্য স্থান। প্রতিদিন রাশি রাশি মাল বাহিরে চলিয়া যায়, কিন্তু সহরের মালভাণ্ডার যেন অফুরন্ত। কথাটা ভাবিতে গেলে মাঝে মাঝে বিব্রত হইয়া সুধীরকে মাথা চুলকাইতে হয়, ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। মাল যে কেবল এখান হইতে বাহিরে চলিয়া যায় তা অবশ্য নয়, ধুঁকিতে ধুঁকিতে ইঞ্জিন যে লম্বা ওয়াগনের সারি বাহির হইতে টানিয়া আনে সেগুলিও মালে বোঝাই থাকে, কিন্তু যে মাল বাহিরে যায় তার সঙ্গে এই সব মালের তফাৎটা অনায়াসেই সুধীর বুঝিতে পারে। একই বস্তা হয়তো ফিরিয়া আসে, ওয়াগনে তুলিবার সময় যে প্যাকিং কেসটির উপর সে পানের পিক্ ফেলিয়াছিল, কয়েক মাস পরে সেই প্যাকিং কেসটিই অন্য এক ওয়াগন হইতে নামানো হয়, কিন্তু তবু সুধীর জানিতে পাবে ভিতবের মাল বদলাইয়া গিয়াছে। কারণ সুধীর এইভাবে মনের মধ্যে যুক্তি

খাড়া করে—যে জিনিস এখান হইতে দুশো তিনশো মাইল দূরে চালান গিয়াছিল সেই জিনিস কিছুকালপরে আবার ফিরিয়া আসিবে কেন? মানুষ তো পাগল নয় মিছিমিছি গাড়িভাড়া গুণিবে!

সুধীরের শ্লথ অপরিণত মস্তিষ্কে এই শহরের মাল আনাগোনার ব্যাপারটার বিরাটত্ব সমুদ্র-দর্শনার্থীর প্রথম সমুদ্র-দর্শনের মত একটা আয়ত্তাতীত বিস্ময় ও আনন্দে চিরদিন স্তম্ভিত ও মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা আছে, ব্যাপক ও বিচিত্র। ভাবিতে গেলে তার মনে হয়, চিরটা জীবন সে বুঝি কেবল এই সহরের আমদানী-রপ্তানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজই করিয়া আসিয়াছে। জেটিতে সে কুলির কাজ করিয়াছে, চোখ মিটমিট করিতে করিতে চাহিয়া দেখিয়াছে, ক্রেনের সাহায্যে মাল ওঠানো নামানোর সশব্দ প্রক্রিয়া, ছোট-বড় স্টীমার আব পানসী নৌকোয় নিজে সে তাড়াহুড়া হৈ-চৈ করিয়া মাল বোঝাই দিযাছে, মাল নামাইয়া নিয়াছে, সহরতলীর খালগুলির দু'পাশে গুদাম ও আড়তে কাজ করিবার সময় নৌকায় ধীরে-সুস্থে মাল আনা-নেওয়া দেখিয়াছে ; বেলের ইয়ার্ডে কাজ করার সময় দেখিয়াছে, মালগাড়ির আশ্রয়ে মালের দুমুখী স্রোত আর কাজের অবসরে সহরতলীর প্রধান পথের ধারে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে, মালবোঝাই লরি ও গরু-মহিষের গাড়ির আনাগোনা, ঝাঁকা ও মোট মাথায় মানুষের যাতায়াত। বিদেশে কি যায় বিদেশ হইতে কি আসে, মফঃস্বলে কি যায়, মফঃস্বল হইতে কি আসে সে সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট আবছা ধাবণা সুধীরের আছে। ধাবণাটি লইয়া সময়ে অসময়ে সে মনে মনে খেলা করে, সৃষ্টি করে অর্থহীন, অবাস্তব কতকগুলি সমস্যা এবং ভাবিতে ভাবিত বিফল ও বিরক্ত হইয়া ওঠে। কত সমস্যাই যে মনে জাগে সুধীরের! নদীটা যদি হঠাৎ মজিয়া যায়, জাহাজ স্টীমার নৌকার আনাগোনা যদি হইয়া যায় বন্ধ, কি হয় তাহা হইলে? রেল কোম্পানী যদি হাঙ্গামা সহিতে নারাজ হইয়া একদিন বলিয়া বসে, 'ধুত্তোব' এবং বলিয়া রেলগাড়ির চলাচল বন্ধ করিয়া দেয়, কি হয় তাহা হইলে? বাজার-গাড়িতে, লবিতে, মানুষের মাথায় সহরে মাছ, তরকারি আসা বন্ধ হয়, সহবের লোকের মাছ, তরকারি সংগ্রহ করিবাব কি উপায় হইতে পারে? এই রকম আরও কত দুর্ভাবনাই আসে সুধীবের মাথায়। পচা জিনিস সম্বন্ধে মাছি যতটুকু জানে ব্যবসা-বাণিজ্যেব সঙ্গে এতকাল এতভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বেচারী ব্যাপারটা ততটুকুও বোঝে না কিনা।

কাজে ফাঁকি দিলে যতটা না হয় সুধীরকে চিন্তিত দেখিলে রাজেন রাগিয়া আগুন হইয়া যায়।

'তুই বড় বজ্জাত সুধীর, এক নম্বর বজ্জাত।'

এত গরমে ক্রমাগত গালাগালি কাঁহাতক মানুষের সহ্য হয়? সুধীরের বক্ত আর মাথা একসঙ্গে গরম হইয়া ওঠে। মনে মনে রাজেনকে অকথ্য গালাগালি দিতে দিতে ওয়াগনের দবজা বন্ধ করিতে যায়। দরজা সিলমোহর করিতে হইবে, খড়ি দিয়া ওয়াগনের গায়ে সঙ্কেত ও নির্দেশ লিখিতে হইবে, তারপর সরাইয়া দিতে হইবে পাশের লাইনে। প্রথম কাজ দু'টি অন্য লোকের, শেষ কাজটা করিতে হইবে সুধীরকে। দরজা বন্ধ করিয়া সুধীর তীব্র দৃষ্টিতে রাজেনকে দেখিতে থাকে—শুকনো মোচার মত শীর্ণ মুখ তুলিয়া রাজেন তার দিকে চাহিলেই সে মুখ ফিরাইয়া নিবে, সেটুকু বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সুধীরের আছে, কিন্তু যশোদার উপর নিরুপায় ক্রোধের জ্বালায় পেট ভরিয়া সুধীর খাইতে পারে নাই, তার চেয়ে তার রাগের বড় প্রমাণ বোধ হয় আর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু কাজে আসিয়া সুধীর তার অতীত

ও বর্তমান জীবনের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই সব কথাই ভাবে। কাজ যারা করে তাদের জীবনে এই জন্যই কি রোমান্স থাকে না?

কাজে সুধীর ফাঁকি দেয় না, কিন্তু তাকে ফাঁকে চিন্তিতমুখে বিড়ি টানিতে দেখিলে রাজেন বড় রাগিয়া যায়। নিজের জানা একটি লোক ছিল রাজেনের, এই কাজটা সে তাকে জুটাইয়া দিবে ভাবিয়াছিল, যশোদার অনুরোধে সুধীরকে কাজটা জুটাইয়া দিতে হওয়ায় সুধীরের উপরেই তার মেজাজটা একটু বিগড়াইয়া আছে।

'এক নম্বর ফাঁকিবাজ তুমি সুধীর—এক নম্বর বজ্জাত।'

সুধীরের রক্ত আর মাথা একসঙ্গে গরম হইয়া উঠে। পেটটাও বুঝি তার ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, মাঝ-দুপুর পার হইয়া গিয়াছে। চোখ তুলিয়া চাহিয়া দ্যাখে, ধনঞ্জয় কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বিড়ির ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে রাজেনের গালাগালিতেই বোধ হয় আমোদ পাইয়া মুখে হাসিও ফুটাইয়াছে। শুকনো মোচার মত শীর্ণকায় রাজেনের উপর যে রাগটা হইয়াছিল, সে রাগটা সুধীরের [illegible] গিয়া পড়ে দৈত্যের মত বিশাল-দেহ মানুষটার উপর। মনে মনে রাজেনের বদলে ধনঞ্জয়কে অকথ্য গালাগালি দিতে দিতে সে ওয়াগনের আরও কাছে সরিয়া যায়। ধনঞ্জয়কে সুধীর ভয় করে। ভূতপ্রেত দৈত-দানার যে ভয় আচমকা ছোট ছেলেদের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয়, অন্ধকারে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া যে ভয়ে ছোট ছেলে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ফুঁপাইয়া কাঁদে। সেই সঙ্গে হিংসা তো আছেই, গত কয়েকদিনের মধ্যে যে হিংসার তীব্রতা মারাত্মক গোপন রোগের মত ভিতরে ভিতরে একটা দুর্বোধ্য যাতনায় সুধীরকে প্রায় পাগল করিয়া তুলিযাছে।

ধনঞ্জয় কাছে আগাইয়া আসে। 'কালীঘাট গেলাম ভাই যশোদার সঙ্গে—যা মিষ্টিটাই একপেট খাওয়ালে যশোদা। যত বলি আব খাব না, [illegible] খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খাওয়ায়, বলে, এই খাওয়ার ক্ষমতা নিয়ে তোমাব এত গব্বো! আব কটা বসগোল্লা যদি না খাও তুমি, চাবদিকে তোমার নিন্দে রটিয়ে বেড়াব।—বাড়ি এসে ফের বলে কি, নাও চান করে, ভাত খেয়ে নাও চটপট, তারপর সুধীরের সঙ্গে কাজকম্মো দেখবে যাও।'

সুধীর এখান হইতে ওখানে যায়, মাল গোনে, ওয়াগনের দরজা বন্ধ করে, কুলিদের সঙ্গে ঠেলিয়া এ লাইন হইতে ওয়াগন পাশের লাইনে সরাইয়া দেয়। এই সব গোলমালের মধ্যে যে ওয়াগনটির কিছুক্ষণের জন্য নড়িবার কথা ছিল না সেটাকে সুধীর কি ভাবে কখন ঠেলিয়া দেয় আর কি ভাবে ওয়াগনের চাকা ধনঞ্জয়েব একটি পায়েব উপর দিয়া চলিয়া যায় ঠিকমত কেউ বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

হাসপাতালে যশোদার কাছে ধনঞ্জয় বলে, 'সরতে পেলাম কৈ? পাশের লাইনে একটা ইঞ্জিন যাচ্ছিল তাই দেখছি, পাশ থেকে গাড়িটার ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলাম। লাইনের বাইরে পড়েছিলাম গো যশোদা, দুটো পা-ই যদি গুটিয়ে নিতাম তাড়াতাড়ি, হায় হায়! কেমন যেন হকচকিয়ে গেলাম।'

ধনঞ্জয় কাৎরায় আর কাঁদে। এত বড় একটা দৈত্যের মত মানুষের চোখ দিয়া জল পড়িতে দেখিয়া যশোদারও মনে হয়, একমাত্র চাঁদের শোকে দু'একটা দিন সে যা করিয়াছিল, আজ বুঝি তাই করিয়া বসিবে—সোজাসুজি কাঁদিয়া ফেলিবে। তবু সে জোর করে।

'একটা পা গুটিয়ে নিলে, আরেকটা নিলে না কেন?'

তা কি ধনঞ্জয় জানে? অনেক ভাবিয়া সে আন্দাজে বলে, 'পড়বার সময় একটা পায়ে চোট লেগেছিল বলে বোধ হয়।'

সেটা সম্ভব। যশোদা কয়েকবার যে প্রশ্ন করিয়াছে, আবার তাকে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করে, 'কিন্তু গাড়িটা ঠেলে দিলে কে?'

'কে জানে। দু'একজন সুধীরের নাম করছিল, কিন্তু তারাও ঠিক দ্যাখেনি, জোর করে বলতে নারাজ।'

কিন্তু সুধীব ওয়াগনটা ঠেলিয়া দিবে কেন ধনঞ্জয়ের গায়ের উপর? দিলেও ইচ্ছা করিয়া নিশ্চয় দেয় নাই। ভ্রূ কুঁচকাইয়া যশোদা ভাবিতে থাকে, তার মনের মধ্যে এই প্রশ্নটা বার বার জাগিতে থাকে যে, ধনঞ্জয়ের গায়ের উপর সুধীর ইচ্ছা করিয়া ওয়াগনটা ঠেলিয়া দিবে কেন?

নন্দ বড় চমৎকার কীর্তন গাহিতে পারে। ছেলেবেলা হইতেই তার গানের দিকে ঝোঁক, গান শোনার সুযোগ পাইলে সে আর সব ভুলিয়া যাইত। এখনও ভুলিয়া যায়, গান শোনার সময় আর নিজে গাওয়ার সময়। মাইলখানেক দূরে কদমতলার বিখ্যাত কীর্তনীয়া দীননাথ তাকে কীর্তন শিখাইয়াছে। শিক্ষা এখনও শেষ হইয়াছে বলা যায় না, তবে যেটুকু নন্দ শিখিয়াছে সাধারণ লোকের পক্ষে তাই যথেষ্ট, আর কিছু শিখাইবার মত বিদ্যা গুরুরও তার আছে কিনা সন্দেহ। তবু নন্দ এখনও নিয়মিতভাবে শিখিতে যায়, দীননাথ যা শেখায় ব্যাকুল আগ্রহে তাই শেখে, মাঝে মাঝে দু'চার টাকা গুরুদক্ষিণা দেয়। কীর্তন দীননাথের জীবিকার উপায়ও বটে, জীবনের একমাত্র নেশাও বটে, এখন পর্যন্ত নন্দর এটা শুধু নেশা হইয়াই আছে। নন্দর ইচ্ছা শুধু কীর্তন করিয়াই জীবনটা কাটাইয়া দিবে—কীর্তনের মত আর কি আছে জগতে? সোনার মত নাম বলিয়া সুবর্ণ যার নাম, তার কথা অবশ্য আলাদা। তবে নন্দর কল্পনার চিরন্তনী রাধার সঙ্গে ভাবভঙ্গি চালচলন কোনদিক দিয়াই সুবর্ণের মিল নাই বলিয়া নন্দর বড় আপসোস। কথা, সুব, ভাব ও আবেগ এই সব নিয়ে যে কীর্তন, নন্দর মনে সত্যসত্যই তার একটা মূর্তি আছে, কখনও স্পষ্ট দেখিতে পায়, কখনও আবছা হইয়া যায়; সুবর্ণের সঙ্গে কতকটা মিল আছে মূর্তিটির, কিন্তু সে মিল কোন কাজের মিল নয়, তার কোন দাম নাই। নন্দর রূপধরা কীর্তন বিজনে বসিয়া মালা গাঁথে, ফুলগাছের পাতাটি খসিয়া পড়ার শব্দে চকিত হইয়া ওঠে, উৎসুক চোখে চাহিয়া থাকে, চুল আর আঁচল উড়াইয়া যমুনা নামক নদীর তীরে (সহরের কয়েক মাইল উজানে গঙ্গার ধারে নন্দর একটি চেনা স্থানের সঙ্গে যার আশ্চর্য মিল আছে) ছুটিয়া যায়, ধূলায় সোনার অঙ্গ লুটাইয়া কাঁদে, অভিমানে মুখ ভার করিয়া থাকে, আরও কত কি করে। সুবর্ণকে নন্দ কোনদিন এ সব করিতে দেখে নাই।

মাঝে মাঝে এখানে ওখানে দীননাথ দলবলসহ কীর্তন গাহিতে যায়, নন্দও সঙ্গে যায়। কোনদিন গুরু আসর জমায়, কোনদিন শিষ্য। সাধারণ জীবনে নন্দ ভীরু ও লাজুক, চোখ তুলিয়া লোকের সঙ্গে কথা বলিতে পারে না, কিন্তু কীর্তনের আসরে শ্রোতাদের মধ্যে আবেগ, রোমাঞ্চ ও শিহরণ বিতরণ করার সময় তার সবটুকু আড়ষ্ট ভাব কাটিয়া যায়; লজ্জা-ভয়ের চিহ্নও থাকে না। সর্বাঙ্গের ভাবভঙ্গির মধ্যে শব্দে যা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা গেল না, তারই অভিব্যক্তি দিবার চেষ্টাটা যেন আপনা হইতে চলিতে থাকে। কীর্তনের কথায় হঠাৎ রাধিকার লজ্জা পাওয়ার সময় নন্দকে দেখিতে দেখিতে সত্যই মনে হয় ভিজা কাপড়ে পরপুরুষের সামনে পড়িয়া গৃহস্থ বধূ যেন নিজের মধ্যে নিজেই লুকাইতে চাহিতেছে, কাপড়টি এখানে ওখানে একটু টানিয়া না দিলেই নয়, কিন্তু আঁচলের তলা হইতে হাতটি বাহির করিতে যাওয়ায়

হাতটিই তার লজ্জায় অবশ হইয়া গেল, মচকান ডালের মত মরিয়াই গেল নাকি কে জানে!

কোন কোনদিন রাধার বিরহে কৃষ্ণের কি অবস্থা হইয়াছিল আত্মহারা হইয়া সকলকে তাই বুঝাইতে থাকে, শুনিতে শুনিতে দীননাথ কাঁদিয়া ফেলে। নন্দকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলে, 'আমি কি পারি? এমন কিশোর কোমল কণ্ঠ আমি কোথায় পাব? বিরহযাতনায় শ্যামের যখন আমার চেতনা লোপ পেয়ে এসেছে, রাধার নাম নিতে নিতেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলবেন ভেবে অস্ফুটস্বরে বলছেন, রাধা রাধা, তার নিজের মুখে রাধার নাম শুনে দেহে যেন জীবন ফিরে আসছে—তখনকার সেই আকুল মিনতিভরা ডাক আমার এই কর্কশকণ্ঠে আমি কেমন করে ফোটাব গো।'

সত্য সত্যই এমনিভাবে বলে দীননাথ, নাটকের পার্টের মত আগে হইতে যেন মুখস্থ করা ছিল। আসরে যে আবহাওয়াটা তখন সৃষ্টি হইয়া আছে, শ্রোতারা যে রকম মুগ্ধ ও বিভোর হইয়া গিয়াছে, তাতে দীননাথের কথা ও কান্নায় সকলের চোখ সজল হইয়া আসে, অনেকে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চায়, কেউ কেউ কাঁদেও।

বড় আসরে অনেকক্ষণ জমজমাট কীর্তন করিয়া আসিবার পর দু'তিন দিন নন্দ হাসে না, কথা বলে না, খাইতে চায় না, নড়াচড়া করিতে চায় না, প্রাণহীন জড়পিণ্ডের মত শুইয়া বসিয়া সময় কাটায়। যশোদা ভয়ে ভয়ে ভাবে যে, কি জানি কি হইবে, এ রকম প্রচণ্ড ভাবাবেগ আর তার প্রতিক্রিয়া এই রোগ-দুর্বল ছেলেমানুষের কতদিন সহ্য হইবে? নন্দর কীর্তনের মোহ কাটাইতে কত চেষ্টাই যে যশোদা করিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। জোর করিয়া আটকাইয়া রাখিলে দিন দিন নন্দর ভাবপ্রবণতা আর অবরুদ্ধ উত্তেজনার চাঞ্চল্য এমনভাবে বাড়িয়া যাইতে থাকে যে, তাতেও যশোদা ভয় পাইয়া যায়।

এ কি অপদার্থ একটা জন্মিয়াছিল তার ভাই হইয়া? এর চেয়ে কোকেনখোর আফিমখোরেরাও ভাল, তারা কেবল নিজেদেরই সর্বনাশ করে, এ ছোঁড়া আরও কত ছেলে-মেয়েকে গোল্লায় পাঠাইতেছে তার হিসাব নাই।

একদিন সত্যপ্রিয় নন্দর কীর্তন শুনিবার আগ্রহ জানাইয়া অনুরোধ করিয়া পাঠাইল। অনুরোধটা আসিল জ্যোতির্ময়ের মারফতে। সেদিন পিতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে নন্দকে নিয়া একটু নির্দোষ পরিহাস করায় নন্দ যে রাগ করিয়া চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছে, এ কথা জানিয়া সত্যপ্রিয়র নাকি দুঃখের সীমা নাই। নন্দর জায়গায় অবশ্য আরেকজন লোক নেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সত্যপ্রিয় যত শীঘ্র সম্ভব নন্দকে আরেকটি চাকরি দিবে। আগামী রবিবার সত্যপ্রিয়র বাড়িতে একটু খাওয়া-দাওয়া আয়োজন করিয়াছে, ঐদিন নন্দ যদি একটু কীর্তন করে তার বাড়িতে, আর যশোদা যদি দু'টি শাকান্ন গ্রহণ করে, সত্যপ্রিয় বড়ই বাধিত হইবে। বলিলেন, 'মিল আর শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলতে চান।'

সত্যপ্রিয় মিলে আবার একটা ধর্মঘটের গুজব চলিতেছিল, দু'চারজন পাণ্ডা আসিয়া যশোদার সঙ্গে দেখাও করিয়াছে। হঠাৎ নন্দ আর তাকে সত্যপ্রিয়র এতখানি খাতির করার কারণটা অনুমান করিতে যশোদার অবশ্য দেরি হইল না তবু সে রাজি হইয়া গেল! এখন ধর্মঘট করার পক্ষপাতী সে নয়, মিলে কাজ খুব কম, এখন ধর্মঘট করিয়া বিশেষ কিছু লাভ হইবে না। তা ছাড়া, ধর্মঘট হইবে কি-না তাও এখনও ঠিক নাই। এদিকে সত্যপ্রিয়কে শ্রমিকদের অনেকদিনের ন্যায়সঙ্গত দাবির কিছু কিছু অন্তত মিটাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করার যদি সুযোগ পাওয়া যায়, সেটা গ্রহণ করিতে দোষ কি? লাভ হয়তো কিছুই হইবে

না, তবু চেষ্টা করিতে দোষ নাই।

নন্দর কীর্তন করা সম্বন্ধেই কেবল যশোদার মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। অনেক লোকের মধ্যে কীর্তন করিতে গেলেই নন্দর বড় বেশি উত্তেজনা হয়। কিন্তু বাধা দিয়াই বা কি হইবে? এখানে না হোক দু'দিন পরে অন্য একটা বড় আসরে নন্দ কীর্তন করিতে যাইবে—আধমরা হইয়া বাড়ি ফেরার আগে সে হয়তো জানিতেও পারিবে না নন্দ কীর্তন করিতে গিয়াছিল।

উপলক্ষ্য সামান্য, সত্যপ্রিয়র পিতার মাসিক শ্রাদ্ধ। শোনা যায়, জীবনের শেষ দশ বৎসর সত্যপ্রিয়র পিতা ছেলের মুখদর্শন করেন নাই, মুখদর্শন করিবার পর বাঁচিয়া ছিলেন মোটে কয়েকমাস। কেউ কেউ নেহাৎ তামাশা করিয়াই বলে বটে যে, সত্যপ্রিয় নিজের মুখটা না দেখাইলে বুড়া আরও কয়েকটা বছর হয়তো টিকিয়া যাইত। কিন্তু এ সব কথা সত্যপ্রিয়র কানে যায় কিনা সন্দেহ, গেলেও পিতৃহত্যার পাপ মাথায় চাপিয়াছে এ ধরনের খুঁৎখুঁতানির জন্যই সে বার্ষিক বা মাসিক একটা শ্রাদ্ধও বাদ দেয় না, এ কথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

জ্যোতির্ময় এবং তার বাড়ির মেয়েদেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছে। উপলক্ষ্য যত সামান্যই হোক, নিমন্ত্রিতের সংখ্যা শ'তিনেকের নিচে নামিবে না। সত্যপ্রিয়র বাড়িতে কোন উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা এর কম বড় একটা হয় না, কম করা চলে না। লোকে বলিবে কি?

রবিবার সকালে জ্যোতির্ময় অপরাজিতাকে বলিল, 'কীর্তন যদি শুনতে চাও তিনটের আগে যেতে হবে, তা যদি না শোনো তা হলে সন্ধ্যার সময় গেলেই চলবে। আর শোনো, উনি যে নেকলেসটা দিয়েছিলেন বিয়ের সময়, সেটা পরে যেও।'

'আমি যাব?'—অপরাজিতা বিবর্ণমুখে জিজ্ঞাসা করিল।

'যাবে না? ওঁর বাড়ি নেমন্তন্ন, এত কাছে থেকে না গেলে চলবে কেন?'

তবে অবশ্য কোন কথা নাই, না গেলে যখন চলিবেই না তখন যাইতে হইবে বৈকি। 'না, এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম যাব কি না।' গভীর শ্রান্তিতে অপরাজিতার হাই ওঠে, আবার শুইয়া পড়িতে ইচ্ছা হইতেছে।

'নেকলেসটা কিন্তু পরা চলবে না।'

জ্যোতির্ময় একটা হাসিয়া বলিল, 'কেন? সাজবার সাধ নেই? না না, পোরো নেকলেসটা, কর্তা দেখলে খুশি হবেন। চোখে অবশ্য ওঁর পড়বে কি না সন্দেহ, তবু যদি সামনে পড়েন কখনো, প্রণাম করবার সময় পড়তে পারে। সামনে পড়লে প্রণাম কোরো কিন্তু পায়ে হাত দিয়ে।'

'নেকলেসটা কেমন কালো হয়ে গেছে, ও আর পরা যাবে না।'

জ্যোতির্ময় আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'কালো হয়ে গেছে মানে? দেখি।'

অপরাজিতা অপরাধীর মত মখমলের কেসটা বাহির করিয়া আনে। কেসটি তেমনি উজ্জ্বল আছে, কিন্তু নেকলেসটির কেমন যেন জ্যোতি নাই। সোনাটা পিতলের মত দেখাইতেছে, পাথর আর মুক্তাগুলি যেন কাঁচ আর পুঁথি।

'কাউকে দেখাইনি এ্যাদ্দিন, লুকিয়ে রেখেছিলাম। তোমায় বলতেও কেমন—'

জ্যোতির্ময় বিহ্বলের মত চাহিয়াই থাকে। অপরাজিতা আবার বলে, 'আমাদেরি ভুল হয়েছিল, জিনিসটা নকল।'

জ্যোতির্ময় যেন চোখে দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারে না, 'তাই কি হয়, উনি আসল

জিনিস বলে নকল দেবেন।'

'আসল জিনিস বলে তো দেননি।'

জ্যোতির্ময় নেকলেসটা নাড়াচাড়া করিতে থাকে, তার মুখের খানিকটা জ্যোতিও যেন নিভিয়া গিয়াছে।

অপরাজিতা মিনতি করিয়া বলে, 'আচ্ছা, নাইবা গেলাম আমি? শরীরটা একটু—'

শুনিবামাত্র কি রাগটাই যে জ্যোতির্ময়ের হয়! চোখ পাকাইয়া সে বলে, 'বড় ছোট মন তো তোমার? যদি দিয়েই থাকেন একটা নকল জিনিস, তাই বলে ওঁর বাড়ি যাবে না তুমি? মাস গেলে উনি মাইনে দেন বলে দু'বেলা পেট ভরছে সেটা খেয়াল আছে?'

অন্য কেউ হয়তো বলিত যে, একা সত্যপ্রিয় নয়, কাজ করিলে সকলেই মাস গেলে মাহিনা দিয়া থাকে, এটা এমন কিছু সৃষ্টিছাড়া উদারতার পরিচয় নয়। অপরাজিতা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মখমলের কেসটা বন্ধ করিয়া তার হাত দিয়া জ্যোতির্ময় বলিল, 'বাক্সে তুলে রেখে দাও, কেউ যেন না দ্যাখে। কাউকে বোলো না।'

নেকলেসটা নকল বলিয়াই যেন জ্যোতির্ময় রাগ করিয়া বেলা একটা বাজিতে না বাজিতে গাড়ি আনিয়া সকলকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কেবল নিমন্ত্রণ রাখিতে যাওয়া নয়, এখন হইতে রাত্রি দশটা এগারটা পর্যন্ত অপরাজিতাকে সত্যপ্রিয়র বাড়িতে থাকিতে হইবে। যশোদার সরু গলির মুখে গাড়ি দাঁড় করাইয়া তাকে ডাকা হইল, কিন্তু যশোদার এখন গেলে চলিবে না! ও-বেলার রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করিয়া যাইতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় যশোদা যখন সত্যপ্রিয়র বাড়িতে গেল, নিচের হলঘরটিতে নন্দর কীর্তন চলিতেছে। হলঘরটি পুরুষ শ্রোতায় ভরিয়া গিয়াছে, পাশের দু'টি ঘরের বড় বড় চারিটি দরজার কাছে মেয়েদের ভিড়। নন্দর কীর্তন শুনিবার লোভ যশোদার কম নয়, তবু সে না শুনিয়া এড়াইয়া চলিবার চেষ্টাই করে, পাড়ায় কোথাও নন্দর কীর্তন হইলেও সহজে যাইতে চায় না। সে ভাবিয়াছিল এতক্ষণে কীর্তন শেষ হইয়া গিয়াছে। একটি দরজার কাছে মেয়েদের মধ্যে বসিয়া কীর্তন শুনিতে শুনিতে সে ভাবিতে থাকে, আজ তো বিভোর হইয়া নন্দ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কীর্তন করিয়া চলিয়াছে, কাল তার কি অবস্থাটাই না জানি হইবে! কিন্তু বেশিক্ষণ যশোদা এ সব দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিতে পারে না।

নন্দর কীর্তন শুনিতে শুনিতে যশোদারও মানসিক জগৎটা ধীরে ধীরে একেবারে বদলাইয়া যায়। কেমন একটা অস্বস্তিবোধ হয়, বুকের মধ্যে আকুলিবিকুলি করিতে থাকে আর যত সব আবোল-তাবোল খাপছাড়া কথা মনে আসে। নন্দ এদিকে নিজেই রাধা হইয়া তার কৃষ্ণের মত কালো তমালকে কত যে মনের কথা বলে আর যশোদা এদিকে ভাবিতে থাকে যে ধনঞ্জয়টা সত্যই কি নিষ্ঠুর, এ জগতে কেবল সেই পারে যশোদাকে বুকে তুলিয়া লইতে কিন্তু একবার কি সে বলিল, এসো যশোদা, আমার বুকে এসো? 'যাইতে বলিলেই যে চলিয়া যায় সে কেমনধারা প্রেমিক গো!' বলিয়া নন্দ এদিকে যত অনুযোগ করে, যশোদার তত মনে হয়, তাই তো বটে, ঠিক তো, সে কাছে ঘেঁষিতে দেয় না বলিয়া কাছে ঘেঁষিবে না, কেমনধারা মানুষ ধনঞ্জয়?

তারপর এক সময় সুবর্ণের দিকে চোখ পড়ায় যশোদা যেন চেতনা ফিরিয়া পায়, মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া ওঠে। মুখখানা লম্বাটে হইয়া গিয়াছে সুবর্ণের, ছোট একটু হাঁ করিয়া আছে, দু'চোখ বড় বড় করিয়া খোলা, কি একটা রোগের যন্ত্রণায় মেয়েটা যেন মুখ ভেংচি দিয়াছে:

একটু আগে তার নিজের মুখ-ভঙ্গিটা কি রকম হইয়াছিল, কে জানে! আর ধনঞ্জয়ও তো কাটা পা নিয়া পড়িয়া আছে হাসপাতালে।

জোর করিয়া যশোদা বাড়ির কথা ভাবিতে আরম্ভ করে, এ সব পাগলামিকে আর প্রশ্রয় দিবে না। সকাল সকাল সে রান্না সারিয়া রাখিয়া আসিয়াছে, ও বাড়ির নদেরচাঁদের বৌকে পরিবেশন করিতে বলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু খাওয়ার সময় বোধ হয় গোলমাল বাধিবে, যা শয়তান তার বাড়ির লোকগুলি, হৈ চৈ এত ভালবাসে! এ সব কথা ভাবে বটে যশোদা, কিন্তু ভাবিতে যেন ভাল লাগে না, আবেগে ব্যাকুল হওয়ার জন্য মনটা আকুলিবিকুলি করিতে থাকে—ঘরবাড়ি, ভাড়াটে, ডালভাত পরিবেশন এ সমস্তের চিন্তায় রস কৈ, নেশার মত রস?

এদিকে কাশীবাবুর সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে সত্যপ্রিয় জ্যোতির্ময়কে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, যশোদা আসিয়াছে কি না। যশোদার সম্বন্ধে আজ তার আগ্রহের সীমা নাই। কীর্তন শেষ হইবার পর যশোদাকে সঙ্গে করিয়া জ্যোতির্ময় দোতলায় একপ্রান্তে একটি মাঝারি আকারের ঘরে নিয়া গেল। এটি সত্যপ্রিয়র অবসরযাপনের ঘর, একপাশে চৌকির মত সাদাসিদে ছোট একটি খাটে বিছানা, একটি রিভলভিং বুক-সেল্‌ফে কতগুলি বই আর মেঝেতে আসন করিয়া বসিয়া লিখিবার জন্য একটি ডেক্স ছাড়া আর কোন আসবাবের বালাই নাই। একটি চেয়ারও চোখে পড়ে না। বাড়ির অন্যান্য অংশে গৃহস্বামীর ঐশ্বর্যের নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন দুই চোখ ভরিয়া দেখিতে দেখিতে এ ঘরে আসিয়া ঢুকিলে মনে হয়, এখানে বুঝি কোন সংসারবিরাগী নিস্পৃহ সন্ন্যাসী বাস করে। সত্যপ্রিয়র বেশ আর ঝক্‌ঝকে মেঝেতে তার বসিবার ভঙ্গি দেখিয়া কথাটা আরও বেশি করিয়া মনে হয়।

সত্যপ্রিয়র বেশ দেখিয়া জ্যোতির্ময় পর্যন্ত আজ একটু অবাক হইয়া গেল। যশোদাকে ডাকিয়া আনিতে যাওয়ার সময় সত্যপ্রিয়র পরনে সাদা কাপড় ছিল, গায়ে জামা ছিল—দূরে কোথায় অসময়ে বাদলা দেখা দেওয়ায় সহরতলীতে শীতের আমেজ টের পাওয়া যাইতেছিল। এখন কিন্তু খালি গায়ে হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া সত্যপ্রিয় মেঝেতে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়াছে, পরনের কাপড়খানা গবদের। কাঁধে মোটা পৈতা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, বাহুতে অনেকগুলি কবচ ও তাবিজ, কব্জির কাছে স্ফটিকের জয়মালা জড়ানো। মনটা হঠাৎ যেন কেমন করিয়া উঠিল জ্যোতির্ময়ের, সত্যপ্রিয় কি দর্শক অনুসারে বেশ বদলায়? সত্যপ্রিয়কে নানা বেশে সে দেখিয়াছে, কোনদিন হ্যাটকোটপরা খাঁটি সাহেবি পোশাক, কোনদিন মাথায় টুপি, গায়ে লম্বা কোট—খানিকটা পশ্চিম ভারতীয়ের পোশাক, কোনদিন মটকার পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি, কাঁধে ভাঁজ-করা চাদর—বাঙালী পোশাক, কোনদিন মাঝে মাঝে সত্যপ্রিয়র বেশে মুসলমান ভদ্রলোকের বেশের একটু ধাঁচ যে কি করিয়া আমদানী হয় জ্যোতির্ময় বলিতে পারে না। আজ হঠাৎ জ্যোতির্ময়ের মনে পড়িয়া গেল, যতবার সত্যপ্রিয়কে সে ভিন্ন ভিন্ন পোশাকে দেখিয়াছে তার প্রত্যেকবার বিশেষ প্রয়োজনে হয় ভিন্নদেশীয় কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি তার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবার অথবা তার নিজের গিয়া দেখা করিবার কথা ছিল।

ঘরের রিক্ততা ও সত্যপ্রিয়র বেশ যশোদাকেও একটু কাবু করিয়া ফেলিয়াছিল। মানুষটাকে প্রণাম করিবার কোন সঙ্কল্পই তার ছিল না, কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া প্রৌঢ় ও সাধুবেশধারী ব্রাহ্মণকে সে একেবারে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া ফেলিল, কারও বলিয়া দিবার দরকার হইল না—যশোদা, ইনিই তিনি, এঁকে পরিণাম' কর। দেখিয়া জ্যোতির্ময় ভাবিতে থাকে, এইজন্যই কি সত্যপ্রিয় তাড়াতাড়ি বেশ বদলাইয়াছে, যশোদার মনে শ্রদ্ধা জাগাইবার জন্য? একটু পিছাইয়া আসিয়া মেঝেতে হাতের ভর দিয়া একটা কাৎ হইয়া যশোদা সসম্ভ্রমে বসে

আর জ্যোতির্ময় মনের মধ্যে নকল নেকলেসের দীপ জ্বালিয়া নতুন দৃষ্টিতে সত্যপ্রিয়কে দেখিতে থাকে! এ কি সম্ভব? মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী দেখা করিতে আসিবে বলিয়া সত্যপ্রিয় ইচ্ছা করিয়া বেশের খানিকটা বাঙালীত্ব লোপ করিয়া দেয়, পুরোপুরি মাড়োয়ারি সাজে না, সেটা মাড়োয়ারিরও দৃষ্টিকটু হইবে বলিয়া? কেবল এইটুকু বেশ পরিবর্তন করে যার অলক্ষ্য প্রভাব আগন্তুকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হইতে তাকে সাহায্য করিবে, অজ্ঞাতসারে তার দৃষ্টিকে তৃপ্তি দিবে?

'আপনিও বসুন জ্যোতির্ময়বাবু।'

জ্যোতির্ময় বসিলে সত্যপ্রিয় বলিল, 'তোমার ভাই বড় সুন্দর কীর্তন করে বাছা, শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছি। কিন্তু—তুমি প্রায় আমার মেয়ের বয়সীই হবে, তোমায় বলতে দোষ নেই —ছেলেটির স্বাস্থ্য ভাল নয়।'

মেয়ের বয়সী না হইলে নন্দর স্বাস্থ্য ভাল নয় এ কথাটা তাকে বলিলে কি দোষ হইত যশোদা বুঝিতে পারে না বটে, কিন্তু খুশি সে হয়।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওর জন্য মাঝে মাঝে বড় ভাবনা হয়।'

'বয়স বাড়লে হয়তো স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। পড়াশোনা কতদুর করেছে?'

'প্রথম পাশের পরীক্ষায় ফেল করেছে।'

'বেশ, বেশ। পাশ করে তো সব রাজা হচ্চে আজকাল। দেশের বেকার সমস্যা যে কি উৎকট হয়ে দাঁড়িয়েছে তা টের প্যাই বাছা আমরা, চাকরির জন্য রোজ দলে দলে ছেলেরা আসছে, তাদের দেখে কি দুঃখই যে হয়! আমার দেশের সোনারচাঁদেরা, দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা, দু'টি অন্নের জন্য তারা হাহাকার করে বেড়াচ্ছে। সকলের আগে এখন আমাদের কি করা দরকার জান বাছা, দেশের বেকার সমস্যা দূর করা। খেতেই যদি না পায় মানুষ তবে সে করবে কি, আগে পেটের ভাতের যোগাড় করে তবে না অন্য কথা?'— কথা বলিতে বলিতে সত্যপ্রিয় যশোদার মুখের ভাব-পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে থাকে, পেটের ভাতের কথাটা যশোদার খুব প্রিয় বুঝিতে পারিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করে, 'কিন্তু দেশকে যারা চালায়, তারা কি তা বুঝতে পারে, না বুঝতে চায়? সব ভেসে চলেছে স্রোতে, নাম চাই, হাততালি চাই। না, না, সবাই ফাঁকিবাজ আমি তা বলছি না বাছা, দেশের জন্য সর্বস্বত্যাগ করেছেন, এ রকম মহৎ লোক কি নেই দেশে, অনেক আছে—কিন্তু বল তো বাছা, তুমিই বল, চোখ-কান বুজে শুধু ত্যাগ করলেই কি কাজ হয়? না খেয়ে যে মরতে বসেছে যথাসর্বস্ব বিক্রি করে, বিলেত থেকে দামী ওষুধ এনে খাওয়ালে সে কি বাঁচে? 'ইংরেজকে তাড়াও,' 'ধর্মঘট কর,' 'স্বাধীনতা চাই'—এই সব বলে বাবুরা চেঁচাচ্ছেন, এদিকে দেশের চাষী-মজুররা খেতে পাচ্ছে না, ছেলেরা সব বেকারযন্ত্রণা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করছে—'

প্রথমটা যশোদা একটু ভড়কাইয়া গিয়াছিল, এখন সামলাইয়া উঠিয়া গম্ভীরমুখে শুনিয়া যায়। মিলের কথা শান্তভাবে আলোচনা করিয়া মিলের শ্রমিকদের সম্বন্ধে কোন অনুরোধ করিয়া যে লাভ হইবে না, বুঝিতে যশোদার আর বাকি থাকে না। ভদ্রলোক ভাবপ্রবণতা আনিয়াছে। আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, এ বর্ম ভেদ করিয়া শ্রমিকদের দুঃখের কাহিনী দিয়া তার মর্মভেদ করার ক্ষমতা কারও নাই। কথা বলিতে বলিতে আবেগের আতিশয্যে কারও মুখ দিয়া যখন থুথু ছুটিতে আরম্ভ করে, পরের কথায় সে তখন কান দেয় না।

একটু আত্মসংবরণ করিয়া সত্যপ্রিয় বলে, 'যাক যাক! দেশের অবস্থা তোমারও অজানা নয়, আমারও অজানা নয়। তোমার ভাইকে একটি চাকরি দিতে হবে, না? ছেলেমানুষ ঝোঁকের

মাথায় কাজটা ছেড়ে দিল, নইলে ওই কাজেই ওর উন্নতি হত। বেশ কাজ করছিল ছেলেটি, না জ্যোতির্ময়বাবু? তা, কয়েকটা মাস যাক এখন, ক'মাস পরে তোমার ভাইকে একটি ভাল চাকরি বোধ হয় দিতে পারব। আমার মিল দুটোতে ক'মাস পরে আগাগোড়া সংস্কার করব ভাবছি, নতুন লোকজন নিয়ে কাজের ভাল ব্যবস্থা করে ফেলব। মিলের লোকেরাও নানারকম দাবিদাওয়া করছে, সে বিষয়েও একটু বিবেচনা করে দেখতে হবে।'

উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছয়টা দরজার একটাব দিকে পা বাড়াইয়া বলে, 'এবার সকলকে খেতে বসানো দরকার, দেখি গিয়ে কি ব্যবস্থা হল। দু'টি শাকান্ন মুখে দিয়ে যেও কিন্তু বাছা।'

সত্যপ্রিয় চলিয়া গেলে জ্যোতির্ময় নেকলেসের কথা, সত্যপ্রিয়র বেশপরিবর্তনের গোপন রহস্যের কথা, সব ভুলিয়া গিয়া প্রায় গদগদকণ্ঠে বলিল, 'দেখলে চাঁদের মা, শুনলে? এমন মানুষ আর দেখেছ?'

যশোদা স্বীকার করিয়া বলিল, 'খানিক খানিক দেখেছি—এমন তুখোড় দেখিনি।'

তারপর যশোদা অন্দরে গেল। তাকে দেখিয়াই সুবর্ণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, 'কী সুন্দর কীর্তন করে তোমার ভাই, যশোদাদিদি! এমন আর জীবনে শুনিনি!'

কত সুদীর্ঘ জীবন সুবর্ণের, কত কীর্তনই সে শুনিয়াছে! সে আর জীবনে কখনও এমনটি শোনে নাই, নন্দর এত বড় সার্টিফিকেট যেন আর হয় না।

'গলাটা মিষ্টি বলে শুনতে ভাল লাগে, নইলে শিখেছে কচু।'

সুবর্ণ উত্তেজিত হইয়া বলে, 'না, না, তুমি জান না যশোদাদিদি, ভাল করে না শিখলে কেউ এমন করে গাইতে পারে? সবাই কি বলছে জান? কীর্তন যে এমন হয় এ্যাদ্দিন কেউ ভাবতেও পারেনি।'

যশোদা একটু হাসে আর মনে মনে বলে, সবাই তো তোমারই মত পণ্ডিত। কীর্তন যে গাহিয়াছে যশোদাই তার দিদি শুনিয়া মেয়েরা কেউ কেউ আসিয়া তার সঙ্গে কথা বলে, কীর্তনের প্রশংসা জানায়। যশোদা প্রতিবাদ করে না, মৃদু একটু হাসিয়া কতকটা কথা বদলানোর উদ্দেশ্যে আর কতকটা মেয়েমানুষের প্রকৃতিগত কৌতূহলের জন্য জিজ্ঞাসা করে, এ মেয়েটি কে, ও বৌটি কে। অল্প সময়ের মধ্যেই অধিকাংশ মেয়ের পরিচয় যশোদার জানা হইয়া যায়। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা আজ খুব কম, কিন্তু সত্যপ্রিয়র অন্দরেই যত নারী বাস করে একটি সাধারণ কাজের বাড়ি ভরাট করিয়া তুলিবার পক্ষে তারাই যথেষ্ট। কেউ বসিয়া থাকে, কেউ ঘুরিয়া বেড়ায়, কোথাও দল বাঁধিয়া কয়েকজন গল্প-গুজব করে। বেশির ভাগ মেয়েকে সুবর্ণ-ই যশোদাকে চিনাইয়া দেয়, কোন্‌টি সত্যপ্রিয়র মেয়ে, কোন্‌টি তার বৌ, কোন্‌টি তার বোন, কোন্‌টি ভাগ্নী অথবা ভাইঝি অথবা দূর-সম্পর্কের আত্মীয়।

সত্যপ্রিয়র অন্দরের কমবয়সী মেয়েদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে সুবর্ণ মন্তব্য করে, 'কি বিচ্ছিরি করে সেজেছে, এমন গেঁয়ো ওরা! গায়ে রাশ রাশ চাপিয়ে দিলেই যেন সাজা হয়।'

যশোদা ভাবে, 'থাকলে তুমিও গায়ে চাপাতে ছাড়তে না। সুবর্ণের মন্তব্য শুনিয়া নয়, আপনা হইতেই এ বাড়ির মেয়েদের সম্বন্ধে যশোদার একটা অস্পষ্ট ধারণা গড়িয়া উঠিতে থাকে। বাড়ির লোকের কাছে বাড়ির কর্তা কতকটা রাজার মত, সেই একজন মানুষের ব্যক্তিত্বের চাপে কারও স্বাভাবিক বিকাশ হয় নাই, সকলেই অল্প বিস্তর বিকার পাইয়াছে। তা ছাড়া আছে বড়লোকের অন্দরমহলের অধিবাসিনী হওয়ার অপরিহার্য পরিণাম। এ বাড়ির মেয়ে হওয়ার অর্থ-ই যে অন্য বাড়ির মেয়ের মত না হওয়া, এটা সকলেই জানে। আশ্রিতা আছে বহু, কারও দাবির জোর বেশি, মানমর্যাদাও বেশি, কারও দাবির জোর কম, মানমর্যাদাও

কম এবং এই হিসাবমত এ ওর মন জোগাইয়া চলে, এ ওকে অবজ্ঞা করে, হিংসাটা হইয়া থাকে বিশ্বব্যাপী। আশ্রিতারাই কি বাড়ির মেয়েদের মন বিগড়াইয়া দেয় বেশি, আবহাওয়াটা করিয়া তোলে বেশি বিকৃত? সত্যপ্রিয়র সেজ মেয়ে আর মেয়েটির সমবয়সী পিসতুতো বোনটির আজন্ম একসঙ্গে লালিতপালিত হওয়ার ফলটা কয়েক মিনিট চোখে দেখিয়াই যশোদার তাক লাগিয়া যায়। সেজ মেয়ের কাপড়খানার দাম অনেক বেশি, গয়নাও তার গায়ে অন্য জনের চেয়ে দশগুণ। আজ একটি নতুন দুল পরিয়াছে সেজ মেয়ে।

সেজ মেয়ে (মুখ ভার) : 'সবাই চলে গেলেই তোমার দুল ফিরিয়ে দেব।'

পিসতুতো বোন (ভীতা) : 'কেন ভাই?'

সেজ মেয়ে : 'দিদির কানবালা ধার করে পরতে পারবে বলেই তো যেচে যেচে নিজের বিচ্ছিরি দুল দুটো আমায় পরালে।'

পিসতুতো বোন : 'তুই নিজেই তো চেয়ে নিলি ভাই?'

সেজ মেয়ে : 'কখন চাইলাম?'

পিসতুতো বোন : 'না ঠিক, এমন বোকা আমি।'

সেজ মেয়ে : 'বোকা তুমি নও। দুল দুটো পরলে নিজেকে খুব সুন্দর দেখায় জানো কিনা তাই আমি যেই দুল দুটো নিয়ে এলাম, অমনি ফন্দি এঁটে দিদির কানবালা নিয়ে পরলে, যাতে আরও সুন্দর দেখায়। ফর্সা রঙের অহঙ্কারে ফেটে পড়ছো. বোকা হতে যাবে কোন্ দুঃখে?'

পিসতুতো বোন : 'আমার রঙটা তো ফ্যাকাসে সাদা ভাই, তোর মত দুধে-আলতা তো নয় ভাই? কানবালা খুলে ফেলব?'

বাড়ির একটি বিশেষ শ্রেণীর আশ্রিতাদের সঙ্গে যশোদাকে বসানো হইল, দাসী চাকরাণী নয়, সত্যপ্রিয়র সঙ্গে সত্যই তাদের সম্পর্ক আছে, তারা আত্মীয়া। তবে, সত্যপ্রিয়র মেয়ে আর বৌরা যে যশোদাকে একেবারে খাতির করিল না তা নয়, একটু দূরে দাঁড়াইয়া যশোদা আর যশোদার খাওয়া চাহিয়া দেখিয়া তাদের কি ফিস্ ফিস্ কথা আর চাপা হাসি। সুবর্ণ বোধ হয় অন্য ঘরে খাইতে বসিয়াছিল।

পিসতুতো বোনের সঙ্গে কলহের পর সেজ মেয়ের মনটা ভাল ছিল, কে একজন যশোদার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া ফেলিল। যশোদা তখন বড় বড় লেডিকেনি মুখে তুলিতেছিল। খাওয়া বন্ধ করিয়া সে বলিল, 'এই ছুঁড়ি, এদিকে শোন্।'

মেয়েদের হাসিগল্পের গুঞ্জন থামিয়া গেল, সেজ মেয়ে কয়েক পা' আগাইয়া আসিয়া মুখ লাল করিয়া বলিল, 'তোমার তো আস্পদ্দা কম নয়!'

'তোমারি বা কম কি দিদি? আমায় নেমন্তন্ন করে এনেছ, বয়সে আমি তোমার মা-মাসীর সমান, আমার খাওয়া দেখে কি বলে তুমি হাসলে? এরকম যে হাসতে নেই, ছোটলোকের বাড়ির মেয়েরও সেটুকু শিক্ষে আছে।'

'আমায় তুমি ছোটলোকের মেয়ে বললে! দাঁড়াও, বাবাকে বলে তোমায় মজা দেখাচ্ছি!' সেজ মেয়ে ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

যশোদা খাইয়া উঠিয়া বাড়ির পিছনের বারান্দায় সত্যপ্রিয়র স্ত্রীর কাছে একটু বসিল। রাত প্রায় এগারটা বাজে, জ্যোতির্ময়ের বাড়ির সকলে কোথায় যে উধাও হইয়া গিয়াছে। একসঙ্গে ফেরা যাইত।

সত্যপ্রিয়র স্ত্রী বড় শান্ত ও নিরীহ মানুষ, কিছুক্ষণ আগে তার সঙ্গে দু'একটা কথা বলিয়াই

যশোদা এটা টের পাইয়াছিল। সব সময়েই কেমন যেন ভ্যাবাচেকা লাগিয়া আছে।

'মেয়ে নাকি কি বলেছে আপনাকে?'

'কি আবার বলবে? ছেলেমানুষ, ওর কথার ভারি দাম!'—যশোদা একটু হাসিল।

'আপনি রাগ করবেন না, ছেলেমেয়েগুলো আমার বড় বেয়াড়া। বলুন রাগ করবেন না?' বলিয়া সত্যপ্রিয়র স্ত্রী যশোদার হাত ধরিল। ইস্, এইজন্য সে এখানে একা বসিয়া আছে, বাড়ির গিন্নি সে! ধনীর গৃহিণীতে পরিণত হইতে না পারায়, স্বামী-পুত্র, আত্মীয়স্বজন, দাস-দাসী কারও সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে না পারায় একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া নিজের একটা মানসিক বিকারের অবাস্তব জগতে ভাসিয়া গিয়াছে, সকলের অপরাধে নিজেকে যেখানে সে অপরাধী মনে করে, তার হাত ধরিয়া ক্ষমা চায়।

কিছুক্ষণ পরে সত্যপ্রিয় আসিল।

'খাওয়া হয়েছে? বড় রাত হয়ে গেল। গাড়ি দিয়েছি।'

'গাড়ি কি হবে? এইটুকু পথ হেঁটেই চলে যাব।'

কিন্তু তা হয় না, যশোদা যে সত্যপ্রিয়র অতিথি। পথ যতটুকুই হোক, রাত্রিকাল, স্ত্রীলোক, হাঁটিয়া যাওয়া চলে?

যশোদা জিজ্ঞাসা করিল, 'জ্যোতির্ময়বাবুর বাড়ির সবাই কি চলে গেছে?'

'আধ ঘন্টা আগে। আমিই বললাম জ্যোতির্ময়বাবুকে, একটু পরে তোমাকে পাঠিয়ে দেব তোমার ভায়ের সঙ্গে। গাড়িটা একটু আটকা ছিল। তা তোমার ভাইকে তো কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না যশোদা।'

'সে তবে আগেই চলে গেছে। কেত্তন করলে ওর শরীর বড় দুর্বল লাগে।'

সত্যপ্রিয় নিজেই সঙ্গে করিয়া যশোদাকে গাড়িতে তুলিয়া দিল। বোধ হয় সেদিন নন্দকে যে অপমান করা হইয়াছিল, আজ সুদে আসলে নন্দর দিদিকে সম্মান দিয়া তার ক্ষতিপূরণ হইতেছে। যশোদা ভাবিল, কি মতলব আঁটছ তুমি কে জানে! সত্যপ্রিয়কে একটু বেশি গম্ভীর ও অন্যমনস্ক মনে হইতেছিল। যশোদাকে আরেকদিন আসিবার জন্য অনুরোধ করিল।

'শুনলাম বেয়াদবির জন্য মেয়েকে নাকি ধমক দিয়েছ। আমার কাছে নালিশ করতে এসেছিল, আমিও ধমক দিয়েছি। তবু আমার বাড়িতে আমার মেয়েকে অমন করে বলবার সাহস কারও হতে পারে, ভাবতেও পারিনি যশোদা।'

'ছেলেমানুষের দোষ দেখিয়ে দেব, তাতে আর সাহসের কি আছে!'

সত্যপ্রিয় হঠাৎ যেন বড় সরল হইয়া গিয়াছে, যশোদার সঙ্গে যেন তার অনেকদিনের পরিচয়। ম্লানমুখে একটু হাসিয়া বলিল, 'তুমি জান না যশোদা, আমার চাকরবাকরের দোষ দেখিয়ে দেবার সাহস পর্যন্ত অনেকের হয় না। যাদের কোনদিন একটি পয়সা পাবার ভরসা নেই, যারা চায়ও না একটি পয়সা, তারা পর্যন্ত ভয়ে মরে আমি পাছে চটে যাই।'

এ কথার জবাবে যশোদা কিছু বলিল না। প্রত্যাশা না থাকে, সত্যপ্রিয় চটিলে যে ভয়ের কারণ আছে এটুকু সেও বোঝে। টাকা অনেক কিছু করিতে পারে। তার বাড়ির কাছেই এমন দু'একজন মানুষ বাস করে যাদের হাতে মোটে শ'খানেক টাকা গুঁজিয়া দিলে একদিন এই সত্যপ্রিয়র মাথাটা ফাটাইয়া কয়েক মাস জেল খাটিয়া আসিতে রাজি হইয়া যাইবে। টাকার পরিমাণটা বেশি করিলে একেবারে খুন করিয়া ফাঁসি-কাঠে ঝুলিবার ঝুঁকিটা নিতেও হয়তো রাজি হইয়া যাইতে পারে। এরা সব নিচুস্তরের জীব, কিন্তু উঁচুস্তরেও এমন কত জীব আছে, যারা এদেরই রকমফের, হাতে কিছু টাকা গুঁজিয়া দিলে যারা খুন না করিয়াও মানুষের এমন

সর্বনাশ করিতে পারে, যা খুন করারও বাড়া। এমন শক্তি যে টাকার, সত্যপ্রিয় সেই টাকা গাদা করিয়াছে। প্রত্যাশা যারা করে না, তারাও তাকে ভয় করিবে বৈকি। তা'ছাড়া, প্রত্যাশা করা না করার প্রশ্নই কেবল নয়, গেরুয়া কাপড় দেখিলেই ধর্মভীরু গৃহস্থের যেমন পায়ে লুটাইতে ইচ্ছা হয়, বড়লোককে ভয় আর খাতির করা সেইরকম একটা সংস্কারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে মানুষের।

পরদিন দুপুরবেলা কীর্তনের অবসাদে নন্দ ঝিমাইতেছে, কোথা হইতে সুবর্ণ আসিয়া হাজির।

'একটু কীর্তন গাইবে? একটুখানি?'

উত্তেজনা সে যেন চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে না, চোখে-মুখে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। যশোদা যে ঘরের অন্যদিকে চৌকিতে বসিয়া জামা সেলাই করিতেছিল, তার চোখে পড়িয়াছে কি না সন্দেহ। একটা ঘরে ঢুকিয়া সেই ঘরেই যশোদার মত একটি মানুষকে চোখে না পড়ার মত অবস্থা, আবেগ একটু বেশি রকম উথলাইয়া না উঠিলে হওয়া সম্ভব নয়।

নন্দ মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, 'এমনি তো হয় না, মানে, আয়োজন চাই কিনা অনেক, আর অনেকক্ষণ ধরে না গাইলে—'

এ বাড়িতে সুবর্ণর আসাটাই খাপছাড়া ব্যাপার, তাও এমন অসময়ে। কাল নন্দর কীর্তন শুনিয়া তার কি রকম লাগিয়াছিল নন্দকে জানাইবার জন্য সে ছটফট করিতেছিল, সবুর সয় নাই, নতুবা জানাইবার সুযোগের অভাব তার হইত না, নন্দই হয়তো আজকালের মধ্যে তাদের বাড়ি যাইত।—'কীর্তন যে এমন হয়, আমি সত্যি জানতাম না, কাল শুনতে শুনতে আমার যে কি রকম হচ্ছিল—'

যশোদা মনে মনে বলে, 'রকম দ্যাখো ছুঁড়ির, ও রকম তো তোর সব সময়েই হচ্ছে।' মুখে অবশ্য ভদ্রতা করিতে হয়, এ ধরনের ভাবোচ্ছ্বাসের জন্য গালে চড় কসাইয়া দিবার নিয়ম নাই। বড় জোর গম্ভীরমুখে, কড়া সুরে এদিকে আসিয়া বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করা চলে যে, ব্যাপারখানা কি? কিন্তু তাতে এ সব মেয়ের মাথা ঠাণ্ডা হয়?

'তুমি শুনেছ যশোদাদিদি? কাল শুনেছ কীর্তন? ও, হ্যাঁ, তুমি তো কাল গিয়েছিলে নেমন্তন্ন খেতে। কীর্তন শুনে কাল বাড়ি ফিরে বৌদি কাঁদছিল। ঘরে নয়, সবাই ঘুমোবার পর সিঁড়িতে বসে। আমি জিজ্ঞেস করতে বললে, কীর্তন শুনে এমন মন কেমন করছে ছোট্ ঠাকুরঝি!—বৌদি আমায় ছোট্ ঠাকুরঝি বলে।'

'সবাই ঘুমোবার পর তুমি বুঝি জেগেছিলে?'

'হ্যাঁ, কিছুতেই ঘুম আসছিল না কাল।'

'চান করনি আজ?'

'না, গায়ে জল লাগলেই এমন ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ করে উঠছিল যশোদাদিদি। ঐ যা, আসল কথাই ভুলে গেছি। বৌদি তোমায় একবার যেতে বলেছে, বড্ড দরকার।'

'চলো তবে, এখুনি শুনে আসি দরকারটা কি।'

ছেলেমানুষ, রাত্রে ভাল করিয়া ঘুমায় নাই, জ্বর বোধ হয় আসিয়াছে, চোখ দেখিলে মনে হয়, কোন পাগলা-গারদ হইতে যেন পলাইয়া আসিয়াছে।

তাড়াতাড়ি সেলাই রাখিয়া যশোদা উঠিয়া পড়ে। বাড়ি নিয়া গিয়া সর্বাগ্রে নিজের হাতে লেবু দিয়া বড় এক গ্লাস সরবৎ বানাইয়া মেয়েটাকে খাওয়াইবে, তারপর অন্য কথা।

কিন্তু সুবর্ণ নড়িতে চায় না।—'তুমি যাও না যশোদাদিদি, আমি যাচ্ছি একটু পরে।'

'না, আমার সঙ্গে এসো। এখানে কি করবে তুমি?'

'একটু কীর্তন শুনব।' নন্দর দিকে চাহিয়া মিনতি করিয়া বলে, 'জোরে না গাও, গুন্ গুন্ করে একটু গাও না? সেই যেখানটা গাইতে গাইতে কাল তুমি কাঁদছিলে, সেখানটা।'

যশোদা আর কথা না বলিয়া সোজাসুজি সুবর্ণর ডান হাতের কব্জি চাপিয়া ধরিয়া তাকে একরকম গায়ের জোরে টানিয়াই সঙ্গে নিয়া ঘরের বাহির হইয়া যায়। আর ভদ্রতা করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। কে বলিতে পারে কখন মেয়েটা মেঝেতে চিৎ হইয়া হাত-পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে মুখে ফেনা তুলিতে আরম্ভ করিয়া দিবে? কেবল লেবুর সরবৎ নয়, যাওয়ার সময় দু'পয়সার বরফও কিনিয়া লইয়া যাইতে হইবে কিষেণের দোকান হইতে। সুবর্ণর মাথাটাও ধোয়াইয়া দিবে বাড়ি গিয়াই।

'হাত ছাড় যশোদাদিদি—উঃ রে বাবারে, হাতটা ভেঙ্গে ফেলবে নাকি তুমি আমার?'

বাড়ির বাহির হইয়া যশোদা হাত ছাড়িয়া দিল। চোখ মুছিতে মুছিতে সুবর্ণ তার সঙ্গে চলিল আর বিড়বিড় করিয়া কি যে বলিতে লাগিল অস্ফুটস্বরে সে-ই জানে।

'কেঁদো না সুবর্ণ। রাস্তায় যদি কাঁদো, ঠাস করে গালে চড় কষিয়ে দেব বলে রাখছি।'

শুনিয়া সুবর্ণর কান্না ও বিড়বিড়ানি দুই-ই হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। বরফ কেনার সময় ক্ষীণকণ্ঠে সে একবার জিজ্ঞাসা করিল বটে, 'বরফ কিনছ কেন যশোদাদিদি?'— যশোদা জবাবও দিল না।

জ্যোতির্ময়ের বাড়ি গিয়া গলা নরম করিয়া যশোদা বলিল, 'তোমার যে অসুখ হয়েছে বোন, জ্বর হয়েছে। মাথাটা ধুয়ে দিই এসো, তারপর তুমি শুয়ে পড়গে যাও। বরফ দিয়ে আমি সুন্দর সরবৎ বানিয়ে দিচ্ছি, খেলেই তোমার জ্বর কমে যাবে।'

মিষ্টি কথা শোনামাত্র সুবর্ণ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'আমার অসুখ হয়েছে আর তুমি আমায় এমন করে মারলে যশোদাদিদি! ....'

সুবর্ণর ব্যবস্থা করিয়া জ্যোতির্ময়ের ঘরে বসিয়া ভদ্রলোকের বিজ্ঞাপন দেওয়া খাপছাড়া দরদের কথা যশোদার মনে হইতে থাকে। বেশ সাজান ঘরখানা, আসবাবপত্র একটু বেশিরকম ঠাসা। এক ঘরে খাট, ড্রেসিং টেবিল, লেখাপড়ার জন্য মাঝারি আকারের একটি টেবিল ও চেয়ার, ট্রাঙ্ক, সুটকেস, অর্গ্যান, আলনা ইত্যাদি অনেকগুলি জিনিস ভর্তি করায় নড়াচড়ার স্থানাভাব ঘটিয়াছে। অধিকাংশ আসবাবই জ্যোতির্ময় ভালবাসিয়া কিনিয়া দিয়াছে, অর্গ্যানটি তো মাত্র ক'মাস আগে কেনা।

'ভাল কি গাইতে জানি? তবু কিনে দিলেন।' —অপরাজিতা সলজ্জ আনন্দে যশোদাকে জানায়। সুবর্ণকে কিনিয়া দেওয়ার বদলে স্ত্রীর নামে সঙ্গীত-যন্ত্রটি কেনায় বাড়িতে যে কথা হইয়াছিল, যশোদার কানে তাহা আগেই পৌঁছিয়াছে। জ্যোতির্ময়কে যশোদা মোটামুটি চেনে, তাই এমন সহজ সাংসারিক চালে তার ভুল হওয়ায় সে আশ্চর্য হয় নাই। দু'দিন পরে যে বোন বিবাহ হইয়া শ্বশুরবাড়ি চলিয়া যাইবে, তার নাম করিয়া ওটা কিনিলেই কোন গোল হইত না! কিন্তু সেটা জ্যোতির্ময়ের খেয়াল হয় নাই। বিবাহের সময় যৌতুক হিসাবে অর্গ্যানটি দিতে পারে, এ আশঙ্কা অবশ্য একটু ছিল। কিন্তু সেও তো জ্যোতির্ময়েরই হাত। যার নামেই কেনা হোক মেয়ে দেখিতে আসিলে এই অর্গ্যান বাজাইয়া সুবর্ণকে গান একটু শুনাইতেই হইবে, অর্গ্যানটি কার সম্পত্তি বরপক্ষ যখন সে প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিবে, তখন বলিলেই হইবে এটি জ্যোতির্ময়ের স্ত্রীর জিনিস। তা ছাড়া, বরপক্ষ যদি অর্গ্যান একটা

নাছোড়বান্দা হইয়া দাবি করে, স্ত্রীর নামে কেনা হইয়াছে বলিয়াই এটি দান না করিয়া জ্যোতির্ময় কি পারিবে? আরেকটু সস্তা দামের অন্য একটা অবশ্য —

ভদ্রলোকের অন্দরমহলে আসিলেই যশোদার চুল ধরে আর এই ধরনের চিন্তা মনে গিজ্ গিজ্ করিতে থাকে। তবে অপরাজিতা আজ যে সব কথা বলিতেছিল কানে যাওয়ার পর সে পূর্ণমাত্রায় সচেতন হইয়া উঠিল।

'ও মা, এ সব কি কথা বলছ বৌ?'

বলিবার যে খুব বেশি প্রয়োজন ছিল অপরাজিতার তা নয়, তার চেহারা দেখিয়া মুখচোখ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় ভিতরে কিছু গোলমাল হইয়াছে। কিন্তু অবস্থাটা যে এমন শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেও কি তা অনুমান করিতে পারিয়াছিল?

ভয়ে অপরাজিতার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, 'খুব খারাপ নাকি দিদি?'

যশোদা তাড়াতাড়ি অভয় দিয়া বলিল, 'খারাপের তো কিছুই ছিল না বৌ, শরীরটা এমনি খুব দুর্বল করে ফেলেছে কিনা, তাই যা একটু ভয়। ওনাকে বলনি?'

'কখন বলি?'

তাও তো বটে, উপহারে আসবাবে যে ঘর ভরিয়া দেয়, প্রত্যেক রাত্রি যার পাশে শুইয়া কাটে, এত বড় বিপদের কথাটা তাকে তোলার সুযোগ কোথায়! প্রথমটা যশোদার বড় রাগ হয়, এমন ন্যাকামি করা যাদের স্বভাব চুলোয় যাক তারা, কাজ নাই তাদের কথায় থাকিয়া। কিন্তু অপরাজিতার শীর্ণ বিবর্ণ মুখে ভাসা ভয়ার্ত চোখের চাউনি দেখিয়া আবার গলিয়া যায়।

'তা বললে তো চলবে না বোন। ওনাকে বলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে তো?'

অনেক বুঝাইয়া, অনেক পরামর্শ ও উপদেশ দিয়া যশোদা বাড়ি ফিরিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে যে, বেশি বয়সে বিয়ে করা বৌকে কি লোকে এত বেশি ভালবাসে? এমনভাবে সীমা ছাড়াইয়া যায় সেই ভালবাসা যে, বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া তিল তিল করিয়া মরিতে থাকিলেও খেয়াল পর্যন্ত হব না খাপছাড়া কিছু ঘটিতেছে? সুশ্রী ও কচি মুখখানা আর সুগঠিত ও কোমল দেহখানা দেখিয়া বৌটাব জন্য যদি দরদ জাগিয়া থাকে জ্যোতির্ময়ের বুকে, সে দবদ কেন তাকে এখন বলিয়া দেয় না, সে শ্রীও নাই, সে লাবণ্যও আর নাই? বৌটাও বা এমন হাবা কেন, স্বামীকে অসুখের কথা বলিতে লজ্জা পায়? ভদ্র স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার খেলা এইরকম ভদ্রতা বজায় রাখিয়া চলে নাকি? ভাগ্যে সংসারে সকলে ভদ্র নয়!

হাসপাতাল হইতে ধনঞ্জয় ফিরিয়া আসিয়াছে।

ডান পা'টি হাঁটুর নিচ হইতে বাদ গিয়াছে। এখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, তবে ঘা শুকাইয়া আসিয়াছে। আরও কিছুদিন পরে কাঠের পা লাগানো চলিবে।

'কি পাপে আমার এমন দশা হল যশোদা?'

পাপ? পাপের কথা না ভাবাই ভাল। সবই ভগবানের ইচ্ছা। ভগবান যা করেন মানুষের বুঝিবার উপায় আছে কি কেন করেন? সহ্য করা ছাড়া মানুষের আর উপায় নাই।

'প্রাণে যে বেঁচে গিয়েছ—'

'এর চেয়ে মরাই ভাল ছিল।'

ধনঞ্জয় মরে নাই, আধমরা হইয়া গিয়াছে। এ শরীরে আগে জোয়ার ভাঁটা টের পাওয়া

যাইত না, এখন যেন ভাটার সময় কালীঘাটের কাছে আদি গঙ্গার যে অবস্থা যশোদা অনেকবার দেখিয়া আসিয়াছে সেইরকম হইয়া গিয়াছে ধনঞ্জয়ের চেহারা।

'দেশে খবর দেবে না?'

ধনঞ্জয় ভাবে, অকর্মণ্য হইয়া সে আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়াছে, যশোদা তাই তাড়াতাড়ি দেশে খবর দিয়া তাকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মুখ বাঁকাইয়া সে বলে, 'তাড়াবার জন্য তর সইছে না চাঁদের মা? ধন্য তোমরা সহুরে মানুষ! তুমি বললে সুধীরের সঙ্গে রেলের ইয়ার্ডে কাজ শেখো গে যাও, তোমার জন্য আমার এই সব্বোনাশ হল, আর তুমিই আমাকে—'

ধনঞ্জয়ের চোখে জল আসিয়া পড়ে। এত বড় অপবাদের জবাবে যশোদা শান্তভাবে শুধু জানায় যে তাড়ানো দূরে থাক, ধনঞ্জয় এখন যাইতে চাহিলে যশোদা তাকে যাইতে দিবে না কি? ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক এইখানেই এখন ধনঞ্জয়কে থাকিতে হইবে কিছুকাল, পায়ের ঘা শুকাইয়া যতদিন কাঠের পায়ের ব্যবস্থা না হয়। তারপর সে যদি দেশে যাইতে চায় দেশে চলিয়া যাইবে। আর যদি এখানে কোন কাজকর্ম করিতে চায়, তাও হয়তো যশোদা ঠিক করিয়া দিতে পারিবে।

'কাজ? আর কি আমি কাজ করতে পারব যশোদা?'

'কেন পারবে না? কাঠের পা নিয়ে লোকে রোজগার করে খাচ্ছে না? দেশে খবর দেবার কথা বলছিলাম, কাউকে যদি তুমি দেখতে চাও?'

কে আর আছে দেশে ধনঞ্জয়ের, কাকেই বা সে দেখিতে চাহিবে। এখন আর খবর দিয়া কাজ নাই, ভাল হইয়া রোজগারপাতি করার মত সুদিন যদি কখনও ধনঞ্জয়ের আসে—

'আমার দেনাটাও তখনও আস্তে আস্তে শোধ করে দিতে পারবে।'

যশোদার আর সব ভাল, মিষ্টি করিয়া কথা বলিতেও সে জানে, কেবল মাঝে মাঝে এইরকম এক একটা কথা বলিয়া এমন সে প্রাণে আঘাত দেয় মানুষের! এমন প্রাণে আঘাত পাইলেও যশোদার আশ্রয়ে যশোদার অন্নে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিতে থাকিতে কয়েকদিন পরে যশোদার এই কথা মনে করিয়াই লজ্জাটা যে তার কম হইবে, প্রাণে একটু স্বস্তিবোধ করিবে, এ সব অবশ্য ধনঞ্জয়ের খেয়াল হয় না। সামান্য একটু সাময়িক মনঃকষ্ট দিয়া অনেকদিনের বেশি মনঃকষ্টনিবারণের এ সব উপায়ের সঙ্গে তার পরিচয় নাই—ক'জন মানুষেরই বা থাকে!

সুধীর প্রথমটা ধনঞ্জয়ের কাছে ভেড়ে নাই। ধনঞ্জয় হাসপাতাল হইতে বাড়িতে আসিয়াছে, দু'তিন দিন এটা যেন তার অজানাই রহিয়া গেল। তারপর একদিন সকালবেলা কাজে যাওয়ার আগে মুখে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য আনিয়া আস্তে আস্তে সে ধনঞ্জয়ের ঘরে গেল।

'কেমন আছ ধনা'দা? খাও, বিড়ি খাও একটা।'

ধনঞ্জয় বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছিল সুধীরের দেওয়া বিড়িটা ধরাইয়া সে বলিল, 'বোসো দিকি ভাই এখেনে, তোমাকে একটা কথা সুধোই পষ্ট করে। যা হবার তা তো হ'ল, সব আমার অদৃষ্টের দোষ, গোলমাল-টোলমাল আমি আর করব না, মা কালীর দিব্যি। গাড়িটা কে ঠেলে দিয়েছিল বল দিকিন?'

শুনিতে শুনিতে সুধীরের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতেছিল।—'কে ঠেলে দেবে, কেউ ঠেলে দেয়নি। —বড়বাবু নিজে এসে সবাইকে জিজ্ঞেস করে রিপোর্ট দিলে—'

'সে তো জানি, তুমি নিজে দ্যাখোনি কিছু?'

সুধীর রাগিয়া বলিল, 'কি বললে? আমি দেখেছি? দেখেও চুপ মেরে আছি? আমি-মিথ্যুক? বড়বাবু নিজে এসে—'

হয়তো একটা কলহ বাধিয়া যাইত দু'জনের মধ্যে, যশোদা আসিয়া পড়ায় সেটা আর ঘটিতে পারিল না।

যশোদা রাগ করিয়া সুধীরকে বলিল, 'কাজে যাও তো তুমি। কেমনধারা মানুষ তুমি, রোগা মানুষটার সঙ্গে ঝগড়া করছ? যাও, এখুনি চলে যাও, একটা কথা নয় আর।'

ধনঞ্জয়ের সঙ্গে সুধীরের কলহ হইয়া গেলেও বোধ হয় এর চেয়ে ভাল ছিল। সোজাসুজি কলহবিবাদের ঝাঁঝ কতক্ষণ মানুষের মনে থাকে? যশোদা আসিয়া এমন করিয়া বলায় সুধীরের মনে যে জ্বালা ধরিয়া গেল তার ঝাঁঝ সহজে মিটিবার নয়। তার জন্য দরদ ছিল যশোদার মনে, ধনঞ্জয় আসিয়া সে দরদ গাফ করিয়াছিল। এখনও, ধনঞ্জয়ের ঠ্যাং কাটা যাওয়ার পরেও, এই ধনঞ্জয়কেই যশোদা দরদ করিবে? সে তুচ্ছ হইয়া থাকিবে?

কেন এমন হইল? কেন যশোদা তাকে আর পছন্দ করে না?

যশোদা ধনঞ্জয়ের সেবা করে, তাকে বাটিভরা দুধ খাওয়ায়, না বলিতে দরকার মত তাকে বিড়ি পর্যন্ত কিনিয়া দেয়। অসুখবিসুখে আরও দু' একজনকে এ বাড়িতে সুধীর শয্যাগত হইয়া থাকিতে দেখিয়াছে, সে নিজেও একবার অসুখে ভুগিয়াছিল, তখন যশোদা যেমন সেবা করিয়াছিল ধনঞ্জয়ের সেবা করার সঙ্গে তার আকাশ-পাতাল তফাৎ। অবশ্য সমস্ত কাজ যেন যশোদার কাছে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে, অন্য সকলের সুবিধা-অসুবিধার জন্য তার যেন আগের মত ভাবনা নাই, ধনঞ্জয়ের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করাটাই যেন তার এখন একমাত্র কর্তব্য, সব সময় সে যেন কেবল ধনঞ্জয়ের কথাই ভাবে, ধনঞ্জয়ের ডাক শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকে। অন্তত দেখিয়া শুনিয়া সুধীরের তাই মনে হয়। দেখাশোনাটা সারাদিন চলে না, সুধীরকে কাজে যাইতে হয়। কিন্তু কল্পনা তো আছে সুধীরের কাজে যাওয়ার আগে আর কাজে যাওয়ার পরে সে যতটুকু দেখে আর শোনে, ওয়াগনে মাল বোঝাই দিতে দিতে তারই ভিত্তিতে সে অহর্নিশি যশোদার আত্মবিস্মৃত সেবাযত্নের এমন কল্পনা গড়িয়া তোলে যে সত্য সত্যই সেই অনুপাতে ধনঞ্জয়ের সেবা করিয়া থাকিলে দু'চার দিনের মধ্যে যশোদাও শয্যাগ্রহণ করিত আর তার নিজেরই দরকার হইত সেবার। এই সব দুর্ভাবনায় অন্যমনস্ক হইয়া রাজেনের গালাগালিতে সুধীরের প্রাণান্ত হয়। সুদীর্ঘ সরীসৃপের মত লম্বা মালগাড়ির একপ্রান্তে ইঞ্জিন আসিয়া ঠেকিলে ওয়াগনের ধাক্কায় যে শব্দ ওঠে তাতে সে চমকাইয়া ওঠে। না এর চেয়ে তার একটা পা কাটা গেলে যেন ভাল ছিল! অথবা পা কাটার বদলে ধনঞ্জয় যদি একেবারে মরিয়া যাইত। ধনঞ্জয় অবশ্য এখনও মরিতে পারে,— কিন্তু লোকটার মরা-বাঁচার ভার কি ভগবান সুধীরের হাতে ছাড়িয়া দিবেন একদিন এক মুহূর্তের জন্য, সেদিন তাকে আলগা ওয়াগনটার পাশে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া হঠাৎ সুধীরের মাথায় ওয়াগনটা ঠেলিয়া দিবার বুদ্ধি যেমন যোগাইয়া দিয়াছিলেন?

এই চিন্তাটি মাথায় আসিলে সুধীরের মুখের ভাব এমন হয় যে বকিতে গিয়া রাজেন পর্যন্ত তাকে কিছু বলিতে সাহস পায় না, কথাগুলি গিলিয়া ফেলে।

বাড়ি ছাড়িয়া কাজে আসিতে সুধীরের ভাল লাগে না, নানা ছুতায় সে বাড়িতে বসিয়া থাকিবার চেষ্টা করে। কাজে যাইবে না কেন, কি হইয়াছে সুধীরের? অসুখ হইয়াছে, —পেটব্যথা করিতেছে। বেশ, তবে আর এ বেলা সুধীরের কিছু খাইয়া কাজ নাই।

'তোমার ব্যাপারখানা কিছু ধরতে পারছি না সুধীর। কাজে নাকি ফাঁকি দিচ্ছ আর মেজাজ দেখাচ্ছ, রাজেন বললে। এ তো ভাল কথা নয় ? এ কাজটা যদি যায় তোমার, আর কাজ আমি জুটিয়ে দিতে পারব না বলে রাখছি।'

'না দিলে কাজ জুটিয়ে, কাজ করব না।'

খাইয়া-দাইয়া দেরি করিয়া সুধীর সে দিন কাজে গেল বটে, মাঝরাত্রে ফিরিয়া আসিল মাতাল হইয়া। আসিয়া এমন মাতলামিই সে আরম্ভ করিয়া দিল, শুধু মদ খাইয়া মাতাল হইয়া যেটা কোন মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব নয়। কুড়ি-বাইশজন কুলিমজুরকে বাড়িতে রাখিয়াও যশোদা তার বাড়িকে এতদিন ঠিক বস্তির পর্যায়ে নামিতে দেয় নাই, সুধীর একাই সেই কাজটা করিয়া দিল।

সকলে ভাবিয়াছিল পরদিন যশোদা বোধ হয় তাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে। কিন্তু যশোদা কিছুই বলিল না। বলার খুব বেশি সুযোগও সে পাইল না, কারণ পরদিন কারও কাছে কিছু না বলিয়া সুধীর উধাও হইয়া গেল। ফিরিয়া আসিল তিন দিন পরে।

তখনও যশোদা তাকে কিছুই বলিল না।

ক'দিন বাহিরে ঘুরিয়া আসিয়া সুধীরের বোধ হয় হাওয়া-পরিবর্তনের কাজ হইয়াছিল, সেই সঙ্গে মতেরও বোধ হয় পরিবর্তন ঘটিয়াছিল চোরের মত পলাইয়া গিয়াছিল যশোদার ভয়ে, ফিরিয়া আসিল যেন লাট সাহেব হইয়া। ভয় নাই, অনুতাপ নাই, মুখ ভার করিয়া থাকা নাই, এ জগতে কাউকে সে গ্রাহ্যও করে না। কৈফিয়ৎ হিসাবে নয়, নেহাৎ যেন দয়া করিয়াই যশোদাকে হঠাৎ উধাও হওয়ার কারণটা জানাইয়া দিল।

'মনটা ভাল ছিল না চাঁদের মা, তাই একবার একটু ঘুরে এলাম।'

যশোদা বলিল, 'বেশ করেছ। রাজেনকে বলে দিয়েছি, এবার কিছু বলবে না, আর কিন্তু এ রকম পাগলামি কোরো না কখনো।'

'তোমার জন্যেই তো। তুমি আমার সঙ্গে ও রকম কর কেন?'

যশোদা কথা বলে না। সুধীরের সম্বন্ধে কি করা দরকার এখনও সে ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই।

সুধীর বলিতে থাকে, 'জানো চাঁদের মা, সেই যে সেদিন তুমি মুখে বললে আমি ভাত পাব না, কিন্তু পাছে ভাতটি না খেয়ে যাই তাইজন্যে নিজে তাড়াতাড়ি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে, সেদিন টের পেয়েছি সংসারে টাকা বল, রূপ যৌবন বল, দরদ ছাড়া সুখ নেই মানুষের।'

যশোদা রীতিমত বিব্রত হইয়া বলে, 'অ! সেদিন টের পেয়েছ।'

আবেগের মাথায় সুধীর বলিয়া বসে, 'তুমি বললে তোমার জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি চাঁদের মা।'

'প্রাণ তোমাকে দিতে হবে না, নদেরচাঁদের বৌটা জ্বরে ভুগছে, ওকে একটু ওষুদ এনে দাও দিকি?'

খানিক পরে খবর আনিতে গিয়া যশোদা দেখিল ঔষধ আনা হইয়াছে কিন্তু খাওয়ানো হয় নাই। বিছানায় চাঁপার মা কোঁকাইতেছে, ঘরের কোণে চাঁপা আর সুধীর মশগুল হইয়া আলাপ করিতেছে।

চাঁপা বলিল, 'ওষুধটা ক বার খাওয়াব বুঝে নিচ্ছিলাম দিদি।'

'ওষুদটা খাইয়ে গল্প কর চাঁপা।' বলিয়া যশোদা চলিয়া আসিল।

তারপর হইতে সুধীরকে চাঁপার যেন সর্বদাই দরকার হইতে লাগিল। দু'বেলা ডাকিয়া পাঠায়, নিজে আসিয়া সুধীরের সঙ্গে গুজ্‌গাজ্ ফিসফাস্ করে কি যেন একটা ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছে দু'জন। ও-বাড়িতে গেলেই যশোদা দু'জনকে একসঙ্গে দেখিতে পায়। দু'একবার কালোকেও তাদের সঙ্গে দেখা গেল, তিনজনে হাসিগল্প করিতেছে। কথা বেশি বলিতেছে সুধীর, হাসি চাঁপাই হাসিতেছে বেশি, কালো হাঁ করিয়া শুনিতেছে। যশোদা ওদের এড়াইয়া চলিতে লাগিল, চাঁপা যদি জগৎকে ছাড়িয়া সুধীরের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে যশোদার কিছু বলিবার নাই। নিজের ভাল মন্দ চাঁপা ভাল করিয়াই বোঝে। চাঁপার জন্য সুধীরের দরদ জাগিয়া তার জন্য দরদটা যদি একটু কমে তাহা হইলেই যশোদা এখন বাঁচে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, যশোদাকে উপেক্ষা করার লক্ষণ সুধীরের দেখা গেল না। কয়েকদিনের মধ্যে চাঁপার সম্বন্ধে তার একান্ত উদাসীনতা দেখা গেল, চাঁপা ডাকিলে সব সময় সে যাইতে চায় না। কেবল চাঁপা যখন কালোকে পাঠাইয়া, তাকে বিশেষ দরকারে ডাকিয়া পাঠায়, তখন কালোর সঙ্গে সে মুখ গম্ভীর করিয়া শুনিয়া আসিতে যায় দরকারটা কি এবং গিয়াই ফিরিয়া আসে অল্পক্ষণের মধ্যে। ধীরে ধীরে আবার যেন তার আগেকার অস্থিরতা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। ধনঞ্জয় আর যশোদাকে একসঙ্গে দেখিলেই কোথা হইতে যে আসিয়া উপস্থিত হয়, কিছুতেই আর নড়িতে চায় না। যশোদাকে একা পাইলেই কাছে বসিয়া আবোল-তাবোল গল্প জুড়িয়া দেয়, ধনঞ্জয়ের যত পারে নিন্দা করে, তার জানা একটি স্ত্রীলোকের উপর ধনঞ্জয়ের কি গভীর অনুরাগ ছিল সেই গল্প ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া এমন করিয়া বলে যে কথাটা সত্য না মিথ্যা জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন হয় না।

তারপর একদিন সুধীর বলে কি, 'একটা কথা বলি শোন চাঁদের মা। শুনে রাগ কোরো না কিন্তু। আমার কোন কু-মতলব নেই আগেই বলে রাখছি তোমাকে।'

'তুমি মস্ত সাধুপুরুষ। শুনি কথাটা।'

আর তো সুধীর থাকিতে পারে না যশোদাকে ছাড়া, সে যে পাগল হইয়া গেল যশোদার জন্য তা কি যশোদা দেখিতে পায় না? এমনভাবে আর কতদিন চলিবে? তার চেয়ে এখানকার বাড়ি-ঘর বিক্রয় করিয়া যশোদা চলুক না তার সঙ্গে দূরদেশে, যেখানে তারা দু'জনে ঘর বাঁধিয়া পরম সুখে থাকিতে পারিবে? —'তুমি ভাবছ আমার চেয়ে বয়েস তোমার দু'এক বছর বেশি, চেহারাটা তোমার জবরদস্ত, তোমার জন্য আমার মন কাঁদতে পারে না, বাড়ি বিক্রির টাকার 'পরে আমার লোভ? আগেই তো বলেছি তোমাকে, আমার কোন কু-মতলব নেই। বেশ বাড়িঘর থাক তোমার, এমনিই চল তুমি আমার সঙ্গে, আমিই রোজগার করে তোমায় খাওয়াব।'

কথাটার আকস্মিকতায় যশোদা খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া থাকে, তারপর বলে, 'বটে? ফাজলামির আর পাত্তর পেলে না তুমি, তামশা জুড়েছ আমার সঙ্গে? আস্পদ্দা তো কম নয় তোমার!'

সুধীর ব্যগ্রকণ্ঠে বলে, 'তামশা নয় চাঁদের মা, সত্যি তামশা নয়। মতিদা বলছিল, কেউ কোনদিন তোমায় দরদ দেখায়নি বলে মনটা তোমার বিগড়ে গেছে, কেউ দরদ করলেই ভাব তামশা জুড়েছে। কি করলে তোমার বিশ্বাস হবে বলো, আমি তাই করব। তুমি জান না যশোদা—'

'জানতে চাই না আমি। যাও তুমি, বেরোও আমার বাড়ি থেকে—এখুনি বেরোও, ফের যদি আমার সামনে পড়, কিলিয়ে তোমায় নিকেশ করব।'

কেবল এই কথা কয়েকটি নয়, আরও অনেক কিছু যশোদা অবশ্য তাকে বলিল, যে রকম জোরালো ঝাঁঝালো, অকথ্য কথার ফোড়ন না থাকিলে সুধীরের মত মানুষের পক্ষে বোঝাই কঠিন হয় যে তাকে সত্য সত্যই তিরস্কার করা হইতেছে।

তখন দুপুরবেলা সুধীর সেদিন কাজে যায় নাই। ফতুয়াটা গায়ে দিয়া সুধীর বাহির হইয়া গেল আর সারাটা দিন রাগে যশোদা গরগর করিল। রেল ইয়ার্ডের একটা কুলি, সে কাজটা জুটাইয়া দিয়াছে বলিয়া দু'বেলা দু'টি অন্ন জুটিতেছে, সে কিনা তাকে এমনভাবে অপমান করিতে সাহস পায়! এই কি লাভ হইয়াছে তার কুলিমজুরকে আপন করিতে গিয়া? রাগের প্রথম অবস্থাটা কাটিয়া যাইবার পর বড় দুঃখ হয় যশোদার, একবার চোখে জলও আসিয়া পড়ে। সুধীর কুলিমজুর বলিয়াই যশোদার এতখানি অপমান বা রাগ বা দুঃখ নয়, সুধীরের প্রেমনিবেদনের ভঙ্গিটাই তাকে বড় যন্ত্রণা দিতেছিল। দু'জনে মিলিয়া তারা পলাইয়া যাইবে এ যেন সুধীর প্রার্থনা করে নাই, যশোদাই অনেকদিন হইতে তার পায়ে ধরিয়া সাধিতেছিল, এতদিনে ভাবিয়া চিন্তিয়া সুধীর রাজি হইয়া গিয়াছে। সুধীরের মনের ভাব টের পাইতে যশোদার বাকি ছিল না, ক'দিন হইতে এই সমস্যাটাই সে মনের মধ্যে নাড়াচড়া করিতেছিল, ভাবিতেছিল কি উপায়ে তার এই পাগলামি ঘুচান যায়। একদিন পোষা কুকুরের মত পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া সে তার ভালবাসার কথাটা বলিয়া ফেলিতে পারে, এ ভয়ও যশোদার ছিল। কিন্তু এমনভাবে সোজাসুজি এমন একটা প্রস্তাব তার কাছে করিবার সাহস যে সুধীরের পক্ষে হওয়া সম্ভব, যশোদা তা কল্পনাও করে নাই?

রাত্রে রান্নার শেষে যশোদা দেখিতে পাইল, সুধীর চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ি ঢুকিতেছে। ক্ষমা-টমা সে চাহিবে না, যশোদা তা জানে। ও সব কায়দাদুরস্ত চালচলন এখনও এদের আয়ত্ত হয় নাই। একটু পরে সুধীর আবার চুপি চুপি বাহির হইয়া গেল। দোকানে খাবার কিনিয়া খাইতে গেল বোধ হয়। মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হইয়া যাইতেছিল, পরিষ্কার করিয়া ব্যাপারটা যশোদা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারিতেছিল না। এসব মানুষকে বিচার করা বড় কঠিন। এদের মত একধারে এমন বোকা-হাবা পাকা, বজ্জাত ঝানু শিশু, কোমল, কঠোর, সাহসী, ভীরু, ভাল আর মন্দ জীব আর হয় না। সুধীরের আসল উদ্দেশ্যটা ধরিতে না পারিয়াই যশোদা বড় অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। সুধীর কি সত্যই বিশ্বাস করিয়াছিল যশোদা তার সঙ্গে পলাইয়া যাইতে রাজি হইবে? এ রকম একটা বিশ্বাস তার মনে জন্মিল কিসে? যশোদা ধমক দিলে যার মুখ শুকাইয়া যায়, যশোদার স্নেহ-মমতার জন্য তার ব্যকুলতা জন্মিতে পারে, যশোদার সঙ্গে পীরিত করার শখ হওয়াও তার পক্ষে সম্ভব, কিন্তু এমন একটা ধারণা তার মনে আসে কি করিয়া যে যশোদা তাকে প্রশ্রয় দিবে?

কখন আবার সুধীর আসিয়া ঢুকিয়াছিল যশোদা দেখিতে পায় নাই, পরদিন সকালে ঘরের বাহিরে আসিয়া কলতলায় যশোদাকে দেখিয়াই চোরের মত সুধীর আস্তে আস্তে পলাইয়া যায়। দোষ করিয়া গুরুজনের কাছে ছোট ছেলে যেমন করে। দেখিয়া কে বলিবে এই সেই গোঁয়ারগোবিন্দ সুধীর, মতির হইয়া যে মিলে মারামারি করিয়াছিল, যশোদাকে কাল যে ডাক দিয়া বলিয়াছিল, চলগো যশোদা, আমরা হাত ধরাধরি করে পীরিত করতে যাই।

সারাদিন সুধীরের পাত্তা মিলিল না, সারাদিন যশোদা তারই কথা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। এক রাত্রেই যশোদার মন শান্ত হইয়া গিয়াছে, নিজের ভাবপ্রবণতার মেঘ কাটিয়া যাওয়ার আর সুধীরের মত গৃহসুখে বঞ্চিত অশিক্ষিত বর্বর

দুর্ভাগ্যগুলির জন্য তার স্বাভাবিক মমতা ফিরিয়া আসায়, এবার ধীরে ধীরে সে সুধীরের পাগলামির মানে বুঝিতে পারে। কবে যেন সুধীর প্রথম টের পাইয়াছিল, সংসারে টাকা বল, রূপ-যৌবন বল, দরদ ছাড়া সুখ নাই? যশোদা যেদিন তাকে ভাত খাওয়ার সুযোগ দিতে ছল করিয়া বাড়ির বাহির হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং দরদের দাম কষিতে তাকে শিখাইয়াছে যশোদাই। আর মতি যেন কি বলিয়াছে সুধীরকে? পুরুষের ভালবাসা না পাওয়ায় মনটা বিগড়াইয়া গিয়াছে যশোদার! যশোদার কাছে দরদ চিনিয়া রূপলাবণ্যের অভাবে পুরুষের ভালোবাসা না পাইয়া যশোদা মনে মনে কাঁদিতেছে জানিয়া, সুধীরের পক্ষে এ কথা মনে করা আশ্চর্য কি যে তার মত যোয়ানবয়সী মানুষের ভালবাসা পাইয়া যশোদা একেবারে কৃতার্থ হইয়া যাইবে।

স্বস্তিবোধ করে যশোদা, মুখে একটু হাসিও তার দেখা দেয়। আহা, সুধীর তবে সত্যই দরদ দেখাইতেছিল! হাতির মত যে যশোদাকে কেউ চায় না, তাকে সঙ্গে করিয়া পালাইতে চাহিয়া সেই একটা মস্ত ত্যাগস্বীকার করিতেছিল। তার আসল লোভ যে শ্রীমতী যশোদার উপর, সে-ই রোজগার করিয়া যশোদাকে খাওয়াইবে, এই কথাটার যশোদার বিশ্বাস জম্মানোর জন্য তাই অমন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল সুধীর।

রাত্রে রান্না করিতে করিতে যশোদা ভাবে, না, তার কুলিমজুরেরাই ভাল। এদের যদি আপন না করিবে, আপন হইবে কারা? সত্যপ্রিয়ের মত যারা বড়লোক, অথবা জ্যোতির্ময়ের মত যারা ভদ্রলোক? বড়লোক, ভদ্রলোক আর ছোটলোক, বিগড়াইয়া অবশ্য গিয়াছে সকলেই, তবু অভাবে যারা বিগড়াইয়া গিয়াছে তারা এখনও মানুষ আছে খানিক খানিক। আর এ অবস্থায় জীবন কাটাইয়া খানিক খানিক মানুষ থাকাও কি সহজ গৌরবের কথা! সুধীরের মত একজন করিয়া প্রত্যেক দিন তার সঙ্গে বেয়াদবি করুক, তবুও যশোদা চিরকাল এদেরই ভালবাসিবে।

সারাটা দিন বাহিরে কাটাইয়া রাত্রি প্রায় দশটার সময় সুধীর চুপি চুপি নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিয়াছিল। যশোদা হাঁকিয়া বলিল, 'ও মতি, সুধীরকে ডাকো, ভাত খেয়ে যাক।'

সুধীরকে রান্নাঘরে খাইতে বসাইয়া যশোদা বলিল, 'এবারটি ধরলাম না তোমার কথা, আর কিন্তু ও-সব বোলো না আমায় কোনদিন।'

সুধীর মুখ নিচু করিয়া খাইতে থাকে, যশোদা পিঁড়িটা আরেকটু সরাইয়া আনিয়া মুখোমুখি বসিয়া বলে, 'কাজে যাওনি আজ?'

'না।'

'কাল থেকে যাও।'

রান্নাঘরটি যশোদার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কেবল তিনটি উনানের ধোঁয়ায় দেওয়াল কালিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। ধোঁয়ার সঙ্গে লড়াই করিয়া যশোদা পারে না। দোষটা অবশ্য আসলে ধোঁয়ার নয়, মানুষের পেটের। দু'বেলা ভাত সিদ্ধ করিতে না হইলে তিনটি উনানে দু'বেলা আঁচ দেওয়ারও দরকার হইত না, দেওয়ালে এত কালিও জমিত না।

'ঘর-সংসার করার সাধ হয়ে থাকলে বিয়ে-থা করো একটা? বল তো আমিই না হয় বিয়েটা দিয়ে দিই তোমার একটা মেয়ে ঠিক করে।'

সুধীর মাথা নাড়িয়া চুপচাপ খাইয়া যায়।

যশোদা বলে, 'বেশ তো সাধ না হয়ে থাকে আমার কথা রাখবার জন্যেই বিয়ে কর। তুমি তো বলছিলে আমার জন্য প্রাণ দিতে রাজি আছ। প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বিয়ে করাটা

কি কঠিন নাকি?'

সুধীর চুপচাপ খাইয়া যায়!

'চাঁপাকে যদি তোমার পছন্দ হয়—'

সুধীর মাথা নাড়ে। যশোদা বলে, 'অ! আমি ভাবলাম কি হয়তো বা চাঁপাকে পছন্দ হয়েছে তোমার।'

এবার সুধীর মুখ তুলিয়া বলিল, 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা কেন দিচ্ছ চাঁদের মা?'

সেদিন এই পর্যন্ত। দিন তিনেক চুপচাপ থাকিয়া যশোদা আবার অন্যভাবে কথাটা পাড়িল, 'চাঁপা বড় কষ্টে দিন কাটাচ্ছে, এমন মায়া হয় মেয়েটাকে দেখলে! তুমি যদি বিয়ে করো ওকে, বড্ড খুশি হব আমি।'

'চাঁপাকে ? চাঁপার কি মায়া-মমতা কিছু আছে চাঁদের মা ? ওর চেয়ে কালো ঢের ভালো।'

তারপর যশোদা ঘটকালি করিয়া কালোর সঙ্গে সুধীরের বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিল। বলিল, 'খরচার টাকাটা কিন্তু ফেরৎ দিতে হবে বাবু। দু'টাকা চার টাকা করে দিয়ো ; কিন্তু যদ্দিনে হোক শোধ করে দিতেই হবে। তুমি আমার এমন কিছু সাতপুরুষের কুটুম নও যে, তোমার ঘর-সংসার পাততে গিয়ে আমি ফতুর হব।'

একদিনে দু'টি বিবাহ হইয়া গেল, সুধীরের সঙ্গে কালোর আর জগতের সঙ্গে চাঁপার। ক'দিন পরে সত্যপ্রিয়র ছোটমেয়ের বিবাহ, এখন হইতে গেটে সানাই বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে। যশোদার বাড়িতে দু'টি বিবাহে সানাই বাজিল শুধু এক সন্ধ্যা, উৎসব হইল একটু অভদ্র রকমের, তবে এমন জমজমাট উৎসব হইল বলিবার নয়। রাত বারটার পর মতির তো জ্ঞানই রহিল না। যশোদাকে একধারে কন্যাকর্তা ও বরকর্তার নারীসংস্করণ হইয়া সমস্ত দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে হইল বটে, আমোদ-আহলাদ সেও করিল না কম। সকলের সঙ্গে এক হইয়া সে মিশিয়া গেল। নেশাটা জমিয়া আসিলে মতি একবার তার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়াছিল, হাত ছাড়াইয়া যশোদাকে তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সবাই ভাবিয়াছিল, সে বুঝি রাগ করিয়াছে। ওমা, খানিক পরে এক বাটি দুধ আর একটি চামচ আনিয়া সকলের সামনে জোর করিয়া মতিকে শিশুর মত কোলে শোয়াইয়া যশোদা তাকে তিন চামচ দুধ খাওয়াইয়া ছাড়িল!

পাঁচ

যশোদা বড় ব্যস্ত, একেবারে সময় পায় না। দুটি বিবাহের হাঙ্গামা চুকিতে না চুকিতে সত্যপ্রিয় মিলে জোবালো ধর্মঘটের আয়োজন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সর্বদা যশোদার কাছে লোকজন আসে যায়, তার সঙ্গে পরামর্শ করে, শ্রমিকদলের সভায় গিয়া তাকে বক্তৃতা করিতে বলে। যশোদার পরামর্শের ধরনটা একটু বিচিত্র। খুঁটিয়া খুঁটিয়া সে কেবল প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া যায় অথবা যারা পরামর্শ করিতে আসে তাদের কথা কাটাকাটি মন দিয়া শোনে। তারপর একেবারে মত প্রকাশ করে : 'এখন করলেও চলে অবিশ্যি, কিন্তু কিছুকাল পরে করলেই ভাল হত।'

বক্তৃতা করা সম্বন্ধে হাত জোড় করিয়া বলে, 'ওটি মাপ করতে হবে। আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, অত ভণিতে করে সাজিয়ে গুছিয়ে বলা আমার কম্মো নয়। দু'দশজন এলে, কথাবার্তা

কইলাম, সে আলাদা। ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়, বক্তিমে করব কি গো!'

অপরাজিতার সম্বন্ধে জ্যোতির্ময়কে সতর্ক করিয়া দিবে ভাবিয়াছিল, নানা হাঙ্গামায় যাওয়া হয় নাই। মাঝখানে অপরাজিতা আর একদিন তাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল, সেদিন তার অবস্থা দেখিয়া সত্য সত্যই যশোদার বড় ভাবনা হইয়াছে। একদিন যশোদা জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে দেখা করিতে গেল।

বড় ব্যস্ত জ্যোতির্ময়। সত্যপ্রিয়ের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে প্রীতি-উপহারের পদ্য লিখিতেছে। একটি দু'টি নয় অনেকগুলি। মা-বাবা, মাসি -পিসি, খুড়া-জেঠা, দাদা-দিদি, বৌদি, ভগ্নীপতি ইত্যাদি নানা সম্পর্কের উপযোগী আশীর্বাদে গুরুগম্ভীর অথবা হাসিতামাশায় হাল্কা পদ্য লিখিতে হইবে। প্রত্যেক পদ্যের শেষে ভগবানের কাছে প্রার্থনা থাকিবে যে, নবদম্পতি যেন সুখী হয়। একটু ক্লিষ্ট দেখাইতেছে জ্যোতির্ময়কে, অসুখী মনে হইতেছে। প্রীতি-উপহারের পদ্য লিখিবার পরিশ্রমে নয়, সেই নেকলেসটা যেন পাইয়া বসিয়াছে জ্যোতির্ময়কে, ক্রমাগত পীড়ন করিতেছে। ভাবিয়া সে কিছু ঠিক করিতে পারে না। সত্যপ্রিয় তাকে এমন ভাবে ঠকাইবে কেন? এমন কোন কথা ছিল না যে, কর্মচারীর বৌকে তার হাজার টাকা দামের গহনা দিতেই হইবে, না দিলে লোকে নিন্দা করিবে, তাই বাধ্য হইয়া কোনরকমে সেদিন মানরক্ষা করিতে হইয়াছে! সত্যপ্রিয় অবশ্য বলিয়া দেয় নাই যে, হাজার টাকার দামের নেকলেস দেওয়া হইল, কিন্তু সেদিন নেকলেসটির ঝলমলে রূপ দেখিয়া সেই ধারণাই তো সকলের মনে জাগিয়াছিল। লোকের মনে এ রকম মিথ্যা ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি সত্যপ্রিয়র না থাকিবে, এমন জিনিস সে কেন দিবে প্রথম কয়েকদিন যা চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়, তারপর কয়েক মাসের মধ্যে চাকচিক্য হারাইয়া এমন সস্তা দেখাইতে থাকে? সত্যপ্রিয় ভাল একখানা কাপড় দিতে পারিত, ছোটখাট সোনার কিছু দিতে পারিত, কিছু না দিয়াও পারিত। একেবারে কিছু না দিলে জ্যোতির্ময় একটু ক্ষুণ্ণ হইত সত্য, কিন্তু সে ক্ষোভ এমন উগ্র হইত না, এমন স্থায়ীও হইত না।

সত্যপ্রিয়র দোষস্খলনের জন্য কতভাবেই যে ব্যাপারটা জ্যোতির্ময় বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ভাবিয়াছে, হয়তো সত্যপ্রিয় জানিত না, নিজে তো দোকানে গিয়া সে জিনিসটি কেনে নাই। এত সব খুঁটিনাটি বিষয়ে নজর দিবার তার সময় কোথায়? একেবারে অপরাজিতার হাতে দিবার সময় এক মিনিটের জন্য ছাড়া হয়তো জিনিসটা সত্যপ্রিয় ধরেও নাই, চোখেও দেখে নাই। যে জিনিসটা কিনিয়া আনিয়াছে, শেষ মুহূর্তে যে সত্যপ্রিয়র হাতে জিনিসটা তুলিয়া দিয়াছে, সে-ই হয়তো ঠকাইয়াছে সত্যপ্রিয়কে। ঠকাইয়াছে, কারণ দু'দিন পরে ফাঁকি ধরা পড়িলেও কেউ তো আর সত্যপ্রিয়কে জিজ্ঞাসা করিতে যাইবে না, আপনি আমার বৌকে কত দামের উপহার দিয়েছিলেন?

প্রীতি-উপহারের পদ্য লিখিতে বসিয়া এই সব কথাই জ্যোতির্ময় ভাবিতেছিল, যশোদাকে দেখিয়া খুশি হইয়া বলিল, 'এসো চাঁদের মা। সব সময় আস না কেন বল তো?'

'সব সময় আসব কেন?'

'তা ঠিক। সত্যি বলছি চাঁদের মা, তোমার সঙ্গে কথা বলতে এমন ভাল লাগে, এমন সহজভাবে তুমি কথা বলতে পার। কোন বিষয়ে তোমার ন্যাকামি নেই। মানুষের মন রেখে কথা বলতে প্রাণ বেরিয়ে গেল চাঁদের মা।'

'না বললেই পারেন?'

সেটা যে সম্ভব নয়, যশোদাও খানিক খানিক বোঝে। অন্যভাবে কথা বলিতে জানিলে

তো বলিবে, মানুষের মন রাখিয়া কথা না বলিলে বোঝা হইয়া থাকিতে হয়।

অপরাজিতার কথাটা যশোদা প্রথমে জ্যোতির্ময়ের মন রাখিয়া মোলায়েম করিয়াই বলিবার চেষ্টা করে। কিন্তু জ্যোতির্ময় যেন শুনিয়াও শোনে না, কথাটার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছে মনে হয় না। তখন যশোদা ভদ্রতা ভুলিয়া যায়, এমন সব কথাই শোনায় যে মনে মনে জ্যোতির্ময় রাগিয়া যায়, ভাবে যে কড়া সুরে বলিয়া দিবে কিনা, তার স্ত্রীর ভাবনা যশোদাকে ভাবিতে হইবে না কিন্তু ভদ্রলোক বলিয়া কিছুই সে বলিতে পারে না, চুপচাপ শুনিয়া যায়, মাঝে মাঝে ভয়, বিস্ময় ও দুর্ভাবনা জানাইতে বরং এই ধরণে মন্তব্যই করে, 'সত্যি বলছ? এ সব তো জানতাম না আমি! ইস্, বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে তো!'

'বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিন না?'

'বাপের বাড়ি? তাই তো, বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেই তো হয়! কথাটা তো একেবারেই খেয়াল হয়নি আমার!' বলিতে বলিতে জ্যোতির্ময় অন্যমনস্ক হইয়া যাওয়ার উপক্রম করে, অন্যমনস্ক হইয়া যাওয়ার উপক্রম করিতে করিতে বলে, 'তাই দেব। চক্কোত্তি মশায়ের মেয়ের বিয়ে চুকে গেলেই পাঠিয়ে দেব।'

যশোদা উঠিয়া আসিবে, হঠাৎ জ্যোতির্ময় জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা চাঁদের মা, তোমাকেই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। চক্কোত্তি মশায়কে তো তুমি চেনো, তোমার কি মনে হয় সামান্য কটা টাকার জন্য উনি ছোটলোকমি করতে পারেন?'

যশোদা সঙ্গে সঙ্গে বলিল, 'তা পারেন।'

'পারেন?'—জ্যোতির্ময় যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল।

সত্যপ্রিয়ের মেয়ের বিবাহের তিনদিন আগে সত্যপ্রিয় মিলে ধর্মঘট আরম্ভ হইয়া গেল। কেবল ধর্মঘট নয়, একটু মারামারিও হইয়া গেল। এবার মারামারির সূত্রপাত হইল মতির জন্য। বড় রহস্যময় মারামারি। পরদিন ধর্মঘট হইবে, কাজ করিতে হইবে না ভাবিয়া আগের দিন রাত্রে মতি মিলের প্রায় এক মাইল দূরে তার একটি চেনা স্ত্রীলোকের ঘরে নিশ্চিন্তমনে মদ খাইতে গিয়াছিল। একাই গিয়াছিল, কালোকে বিবাহ করিবার পর সুধীর আর মতির সঙ্গে হল্লা করিতে বাহির হয় না। কার যেন একটু রাগ ছিল মতির উপরে, এতদিন গোঁয়ার সুধীরটা সঙ্গে থাকায় মতিকে কিছু বলিতে পারে নাই, সেদিন রাত্রে একা পাইয়া মারিয়া সে মতিকে একেবারে জখম করিয়া দিল। পরদিন সত্যপ্রিয় মিলে গুজব রটিয়া গেল যে, মতি খুন হইয়াছে। মিলের সামনে কয়েক'শ শ্রমিক জমায়েত হইয়াছিল। শ'তিনেক ধর্মঘটে যোগ দেয় নাই, মিলের গেট বন্ধ করিয়া কাশীবাবু তাদের দিয়া কিছু কিছু কাজ চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল। ভিতরের মজুরদের অন্য পথে বাহির হইবার চমৎকার ব্যবস্থা কাশীবাবু করিয়াছিল, কিন্তু তারা দল বাঁধিয়া সদরের গেট দিয়াই আসিল ; কত লোকে কত রকম উস্কানিই যে দিতেছিল!

বাহিরের দলের একজন হাঁকিয়া বলিল, 'তোরা মতিকে মারলি কেন রে?' বলিয়াই সেও যে ভিড়ের মধ্যে কোথায় মিশিয়া গেল!

ভিতরের দলের একজন হাঁকিয়া বলিল, 'তোরাও ওমনিভাবে মরবি!' বলিয়া সেও যে ভিড়ের মধ্যে কোথায় মিশিয়া গেল!

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল মারামারি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং পুলিস আথালি-পিথালি সকলকে পিটাইতেছে। কয়েকজন জখম হইয়া হাসপাতালে গেল, কয়েকজন গ্রেপ্তার হইয়া

হাজতে গেল, মিল অঞ্চল প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িল।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যশোদা যখন হাসপাতালে কয়েকজন আহত শ্রমিকের কাৎরানি শুনিতেছে, সত্যপ্রিয় মিলের মজুরদের মধ্যে খবর রটিয়া গেল যে ধর্মঘট উস্কানির জন্য যশোদার উপর এমন অকথ্য অত্যাচার করা হইয়াছে যে তাহাকে হাসপাতালে যাইতে হইয়াছে। মতি খুন হয় নাই এ খবরটাও পাওয়া গেল।

পরদিন একজন মজুরও সত্যপ্রিয় মিলে কাজ করিতে গেল না। মতির মত যশোদার সম্পর্কে গুজবটাও যে সত্য নয় এটা অবশ্য ক্রমে ক্রমে সকলেই জানিতে পারিল, কিন্তু তখন আর সেজন্য কিছু আসিয়া যায় না, কাল মারামারিটা হইয়া যাওয়ার ফলে সত্যপ্রিয় মিলের মজুরদের মধ্যে মনের মিল হইয়া গিয়াছে।

মারামারির ফলে মনের মিল? মজুরদের মধ্যে ও রকম হয়, ওরা ছোটলোক কিনা। দু'একজন লোক দলের মধ্যে চিড় খাওয়াইয়া দেয়, একজনের মনে হয়তো একটু অভিমান আছে, ধর্মঘটের দাবি উঠাইতে তার পরামর্শটা গ্রাহ্য করা হয় নাই। সে কয়েকজনকে শুনাইয়া বলিল, 'কর্মে নেই ধর্মো ঘটে।' কয়েকজনের মনে হইল, তাই তো বটে, কি দরকার হাঙ্গামায়? কয়েকজনের মনে হইল, একজন যেন বড় বেশি উঠিয়া পড়িয়া লাগিযাছে ধর্মঘটের জন্য, ওর মতলবটা কি ? হিংসা, ভয়, সন্দেহ, দুর্বলতা, অবিশ্বাস, ভুল ধারণা আর আত্মমর্যাদার অভাব তো চিরদিন পুরামাত্রাতেই আছে, তার উপরে একটু কু-পরামর্শ জুটিলে আর দেখিতে হয় না। যে ধর্মঘট করে না সে ভাবে যারা ধর্মঘট করিয়াছে তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? একটু হাতাহাতি মারামারি করিতে পাইলে এই চরম প্রশ্নের মীমাংসাটা তাদের হইয়া যায়, হঠাৎ যেন তাদের তুচ্ছ জীবনে এ ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। কু-পরামর্শদাতারা সময়মত সাবধান না হইলে এইজন্য মারামারির পর মজুরদের মনের মিল হইয়া যায়।

মারামারিতে সুধীর একটু জখম হইয়াছিল। পরদিন সকালে ঘর হইতে তাকে পুলিসে ধরিয়া লইয়া গেল। জগৎকেও তারা খুঁজিতেছিল, কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না।

চাঁপা নির্বিকারচিত্তে বলিল, 'আমি কি জানি তার খবর? রাতে ঘরে ছিল না।'

যশোদা রান্না করিতেছে, ঝড়ের মত কালো ছুটিয়া আসিয়া হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'ও দিদি, পুলিসে ধরে নিল যে?'

যশোদা বলিল, 'নিক্ না। যোয়ান মদ্দ মানুষটাকে পুলিস কি গিলে খাবে? হাঙ্গামা মিটলেই ছেড়ে দেবে দু'দিন পরে।

কালো তা বুঝিতে চায় না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কাঁপে আর ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদে। মেয়েমানুষ সমস্ত গণ্ডগোলের গোড়া, এই মতবাদ খাড়া করিয়া যশোদা যে এ বাড়িতে স্ত্রীলোক থাকিতে দেয় না, এ বাড়িতে ঢুকিয়া কালো যেন যশোদার সেই মতবাদটাই প্রমাণ করিয়া দিতে থাকে। যশোদা শেষে রাগ করিয়া বলিল, ' কেবল কি পীরিত করতে জেনেছিস, বাছা, সংসারে? একটু এদিক ওদিক হলে যদি চোখে আঁধার দেখবি, পীরিতের মানুষটাকে আঁচলে বেঁধে রাখিস্ না কেন?'

এই বলিয়া রাগে আগুন হইয়া যশোদা হন্ হন্ করিয়া হাজির হইল একেবারে গলির মোড়ে, যেখানে কাশীবাবু একটু আড়ালে গা ঢাকা দিয়াছিল।

'সুধীরকে ধরানো হচ্ছে কি জন্যে ? ওরা মারামারি করেছে নিজেদের মধ্যে, আপনার তাতে কি ? এমনিতে পুলিস তো মেরে লোপাট করে দিলে. আপনি আবার বেছে বেছে

এক-একজনার পিছনে লাগছেন কেন?'

সঙ্গে পুলিস ছিল, কাশীবাবু নির্ভয়ে একগাল হাসিয়া বলিল, 'সুধীর তোমার পীরিতের লোক নাকি যশোদা? তা তো জানতাম না! জড়িয়ে ধরার সময় বেড় পায়?'

'বটে রে মুখপোড়া, রসিকতা হচ্ছে ?'—হাত ধরিয়া হ্যাঁচকা টানে কাশীবাবুকে কাছে টানিয়া আনিয়া ঘাড় ধরিয়া মাথাটা নিচু করিয়া যশোদা ভদ্রলোকের মুখখানা জোরে জোরে রাস্তায় ঘষিয়া দিল। কাশীবাবু যখন সোজা হইয়া দাঁড়াইল, মুখের অর্ধেক চামড়া তার উঠিয়া গিয়াছে, দরদর করিয়া রক্ত চোঁয়াইয়া পড়িতেছে।

সুতরাং সুধীরের সঙ্গে যশোদাও হাজতে গেল। ঘণ্টাতিনেক পরে সত্যপ্রিয় স্বয়ং তাকে ছাড়াইয়া আনিল। যশোদার সামনেই মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কাশীবাবুর কাছে হাতজোড় কবিয়া বলিল, 'আপনাকে মিনতি করছি কাশীবাবু আমায় না জানিয়ে দয়া করে কিছু আপনি করতে যাবেন না। দু'দিন একটু ব্যস্ত আছি, দাঙ্গা বাধিয়ে, পুলিস ডেকে এক কাণ্ড করে আপনি বসে আছেন। আমার মিলের লোককে পুলিসে ধরে নিয়ে গেল, আপনি ভাবছেন এতে আমার সম্মান খুব বাড়ল? কে ডাকতে বলেছিল আপনাকে পুলিস? আমার দেশের মানুষ ওরা, দুটি অন্নের জন্য খাটতে এসেছে, খিটিমিটি বাধে নিজেদের মধ্যে তা মিটিয়ে নেব, ওদের না পোষায় ওরা কাজ করবে না, আমার না পোষায় আমি কারখানা তুলে দেব—পুলিস ডাকব কোন্ লজ্জায়?'

যশোদা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। কাশীবাবুর রাস্তায় ঘষা মুখটা বোধ হয় বড় জ্বালা করিতেছিল, মাথার ঠিক ছিল না, সত্যপ্রিয়র তীব্র অনুযোগে থতমত খাইয়া সে বলিয়া বসিল, 'আজ্ঞে আপনি নিজেই তো —'

সত্যপ্রিয় গর্জন করিয়া উঠিল, 'যান, যান, বাড়ি যান আপনি। আপনার মত অপদার্থ লোক রেখেই আমাব সর্বনাশ হবে একদিন।'

কাশীবাবু বিছানায় শুইয়া স্ত্রীর সেবা গ্রহণের জন্য বাড়ি গেল। সত্যপ্রিয় বলিল, 'যশোদা, তিন মাস আমি মিলের কোন ব্যবস্থা বদলাতেও পারব না, নতুন ব্যবস্থা চালাতেও পারব না। আমি যদি বলি তিন মাস পরে আমি নিজে খোঁজখবর নিয়ে ওদের সমস্ত নালিশ আর দাবির ব্যবস্থাও করব, হাঙ্গামাটা তুমি মিটিয়ে দিতে পারবে?'

যশোদা ভাবিয়া বলিল, 'আপনি যদি বলেন—'

'আমি বলছি!'

যশোদা চেষ্টা করিয়া দেখিতে রাজি হইয়া চলিয়া আসিল বটে, মনটা তার খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। এই সময় ধর্মঘট চালাইয়া যা কিছু আদায় করিতে পারা যায়, আদায় কবিয়া লইলেই ভাল হইত। এ সব মতলববাজ লোককে বিশ্বাস আছে? তিন মাসে কত কি করিয়া বসিবে ঠিক আছে কিছু! কিন্তু টাকা সম্বন্ধে যত মতলববাজ লোকই হোক, —ব্যবসাদার মানুষেরা ও রকম একটু হয়, —দেশ সম্বন্ধে একটু মমতা বোধ হয় আছে সত্যপ্রিয়র। পুলিশ সম্বন্ধে যে কথাগুলি সত্যপ্রিয় বলিল, তার মধ্যে একটু আন্তরিকতা আছে বলিয়া মনে হইল না?

বাড়ি ফিরিয়া কালোর খোঁজ করিতে গিয়া যশোদা দেখিল, না খাইয়া ঘরে কপাট দিয়া সে পড়িয়া আছে। যশোদা ডাকিতে সে দরজা খুলিয়া দিল। ঘরের মধ্যে আলো একটু কম, আলো কম বলিয়াই বোধ হয় কি একটা আশ্চর্য কমনীয় রূপ চোখে পড়িল কালোর দুঃখক্লিষ্ট মুখে! ন্যাকামি দেখিয়া রাগ করার বদলে যশোদা যেন একটু আশ্চর্য হইয়া গেল—সময় সময় এমন দেখায় কেন মানুষের মুখ? মুখখানা কচি বলিয়া? ভিতরের কিছু

মুখে ফুটিয়া বাহির হইতেছে? এ রকম আকুল হওয়ার মধ্যে সুখ আছে নাকি কিছু, একটা বিশেষ ধরনের আনন্দ, যশোদা যার স্বাদ জানে না?

যশোদার দেহে সুধীরের বাহুর বেড় না পাওয়ার রসিকতাটা যশোদা ভুলিয়াও ভুলিতে পারিতেছিল না, প্রেমিকের বাহুবন্ধনের জন্য যশোদার কিছুমাত্র মাথাব্যথা নাই, তবু ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে হইতেছিল, কথাটা তো মিথ্যা নয় কাশীবাবুর, দেহটা তার একটু বড়সড় বৈ কি। যেমন ধর এই কালো, এই ছিপছিপে পাতলা মেয়েটাকে সুধীর যেমনভাবে বুকে তুলিয়া লইতে পারে—ঠিক তেমনিভাবে যশোদাকেও বুকে তুলিয়া লইতে একজন বোধহয় পারে — ধনঞ্জয়। কাশীবাবুকে ডাকিয়া আনিয়া ধনঞ্জয়ের চেহারাটি একবার দেখাইয়া দিবে নাকি, একবার বলিয়া দিবে নাকি যে, আপনার মত বামনাবতার সবাই নয়, মশায়, হাঁ দেখুন চেয়ে? হাতে অবশ্য প্রমাণ করিয়া দেওয়া চলিবে না যে যশোদাকে বেড় দিবার পক্ষে ধনঞ্জয়ের বাহু দুটি লম্বা—

কিন্তু ধনঞ্জয়ের পা কাটা গিয়াছে। আর কি এখন মানুষকে ডাকিয়া গর্বের সঙ্গে তাকে দেখানো চলে?

অপরাধটা যেন কালোর এমনিভাবে হঠাৎ বেচারা কালোর উপরে রাগ করিয়া সে বলিল, 'না খেয়ে পড়ে আছিস যে ছুঁড়ি? একটা দিনের জন্য তোকে ছেড়ে যেতে পারে না সে মানুষটা?'

কালো সাগ্রহে বলিল, 'একটা দিন দিদি? কাল আসবে?'

'আজকেই হয়ত আসবে। যা, নেয়ে খাবি যা।'

সত্যপ্রিয়র বাগানবাড়িতে সত্যপ্রিয়ের একটি মেয়ের বিবাহ, কিন্তু মনে হয় সমস্ত সহরতলীতে যেন রাশি রাশি মেয়ের বিবাহ হইতেছে। যশোদার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সত্যপ্রিয়র মোটরে আসিয়া যশোদার গলির সামনে মোটর দাঁড় করাইয়া জ্যোতির্ময় অনাথ আর দু'জনে তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছিল।

গাড়ি নিয়া নিমন্ত্রণ করিতে যাওয়ার কথায় জ্যোতির্ময় বলিয়াছিল, 'আজ্ঞে, গাড়ীর দরকার নেই, বাড়ি ফেরার পথে আমি বলে যাব।' শুনিয়া হঠাৎ এমন একটা অদ্ভুত রকমের উদাস ভাব সত্যপ্রিয়র মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল বলিবার নয়। জ্যোতির্ময় তাড়াতাড়ি ত্রুটি সংশোধন করিয়া বলিয়াছিল, 'আজ্ঞে, গাড়ি নিয়েই যাই তবে, তাড়াতাড়ি হবে।'

সত্যপ্রিয় বলিয়াছিল, 'না না. তাড়াহুড়ো করবেন না। বাড়িতে ঢুকেই বললেন, তোমার নেমন্তন্ন. আর বলেই চলে এলেন, এতে অপমান করা হয় মানুষের । বসে কিছুক্ষণ আলাপ পরিচয় করে বিশেষভাবে অনুরোধ করে আসবেন, বিয়েতে যেন আসে।'

বিবাহের দিন সন্ধ্যার সময় সত্যপ্রিয়র গাড়িতেই জ্যোতির্ময় বাড়ির সকলকে এবং যশোদা ও নন্দকে বিবাহ-বাড়িতে নিয়া গেল। ধর্মঘট মিটাইয়া দিয়া যশোদা যেন সত্যপ্রিয়কে কিনিয়া ফেলিয়াছে, কি ভাবে তাকে সম্মান দেখাইবে সত্যপ্রিয় ভাবিয়া পাইতেছে না।

যশোদা কিন্তু সংশয়ভাবে নন্দকে বলিয়াছে 'উঁহু, কি যেন মতলব আছে লোকটার। নইলে এমন বাড়াবাড়ি করত না।'

নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথায় অপরাজিতা এবারও বলিয়াছিল, 'আমি যাব?' তারপর রওনা হওয়ার সময়ও সে আপত্তি করিয়াছে। বলিয়াছে, 'দ্যাখো, শরীরটা বড় খারাপ লাগছে, ভিড়ের মধ্যে নাই বা গেলাম আমি ?'

'একবারটি চলো লক্ষ্মী। গিয়ে না হয় পাশে চুপটি করে বসে থেকো।'

সকলকে অন্দরের মুখে ছাড়িয়া দিয়া জ্যোতির্ময় এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড হোগলার মণ্ডপ তোলা হইয়াছে, থামগুলি রঙিন কাগজ আর দেবদারু পাতায় ঢাকা, বাহিরের গাছগুলিকে লাল, নীল আলোয় সাজান হইয়াছে। অনেকগুলি জোরালো আলোয় চারিদিক ঝলমল করিতেছে। পান, সিগারেট আর সরবৎ বিতরণ করা হইতেছে হরদম, মাঝে মাঝে গোলাপজলের পিচকারিও মারা হইতেছে। চারিদিকে লোক গিজ গিজ করিতেছে, নানা অবস্থার নানা বয়সের লোক,—বাঙালীই বেশি, অ-বাঙালীও আছে। সকলেই বেশভূষা করিয়াছে প্রাণপণে, কিন্তু গরীবদের দেখিলেই চেনা যায়। কেবল পোষাক ভেদ করা দারিদ্র্য নয়, অনভ্যস্ত উৎসবের আবেষ্টনীতে সকলের দৈনদিন অভ্যস্ত জীবনের পরিচয় বিচিত্র ইঙ্গিতে প্রকাশ হইয়া যাইতেছে। সঙ্কোচ, ভয়, দীনতা, দুঃখ, রোগ, শোক, বিষণ্ণতা। তার নিজের? চার পাঁচজন চেনা মানুষ জিজ্ঞাসা করিয়াছে, মুখ তার শুকনো কেন, তার কি অসুখ করিয়াছে? এতো বড় ভয়ানক কথা যে, একটা নেকলেস তাকে এমন অবস্থায় আনিয়া দিতে পারে যে, তাকে দেখিলে লোকের মনে হয় সে অসুস্থ।

ক্রমাগত গাড়ি আসিয়া নিমন্ত্রিতদের নামাইয়া দিয়া যাইতেছিল। জমিদার, ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী, উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার । তিনজন মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর পরে দু'জন মন্ত্রীর আবির্ভাব ঘটিল,—একজন অন্য প্রদেশের। তারপর কয়েকজন বোম্বাইওয়ালা, পাঞ্জাবী ও য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীর পিছনে আসিল দু'জন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। দু'জনেই ইংরেজ। বোধ হয় এদের অভ্যর্থনা করিবার জন্যই একজন বাঙালী উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এতক্ষণ সত্যপ্রিয়র কাছে দাঁড়াইয়া মোটা একটা সিগার টানিতেছিল। এদের একজনের সঙ্গে জ্যোতির্ময় চাকরির প্রথম দিকে একবার দেখা করিতে গিয়াছিল। নিজে যায় নাই, সত্যপ্রিয় সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। একটু চা পান আর ঘণ্টাখানেক নানা বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। ঠিক যে আলোচনা হইয়াছিল তা নয়, নানা বিষয়ে জ্যোতির্ময়ের মতামত জানিবার জন্য যেন কতকটা জেরাই করা হইয়াছিল জ্যোতির্ময়কে, তবে সে কাজটা ভদ্রলোক করিয়াছিল বড়ই অমায়িকভাবে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আগাগোড়া সত্যপ্রিয় বিশেষ কথা শুনিয়াছিল—যেটা সত্যপ্রিয়র একেবারেই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। যাইহোক, কোন বিষয়ে নিজের কোন মতামত জ্যোতির্ময়ের ছিল কিনা সন্দেহ, ততদিনে সত্যপ্রিয়র মতামতগুলিও সে মোটামুটি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, সুতরাং সত্যপ্রিয়র সামনে বসিয়া ভারতবর্ষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিতে তার বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। সত্যপ্রিয়ও মোটামুটি খুশি হইয়াছিল, কেবল ফিরিবার সময় দু'একটি বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিল, 'আমার কথাগুলি এখনো সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারেননি। যাই হোক, আপনার নিষ্ঠা আছে, ধীরে ধীরে বুঝবেন। আমার কত বছরের চিন্তার ফল, ওকি আর দু'চারদিনে বোঝা যায়।'

তারপর জ্যোতির্ময় আর ইংরেজ ভদ্রলোকটির সংস্পর্শে আসে নাই। কিন্তু সত্যপ্রিয়র যত লেখা ও বক্তৃতা ছাপা হয় সত্যপ্রিয় নিজে যে সেগুলিতে নানারকম মন্তব্য যোগ করিয়া এর কাছে পাঠাইয়া দেয়, কিছুদিন পরে জ্যোতির্ময় তা জানিতে পারিয়াছে।

সেই সঙ্গে একটা বিষয়ে জ্যোতির্ময়ের একটা অস্পষ্ট ধারণাও জন্মিয়াছে। গভর্নমেণ্টের বড় বড় কনট্রাক্ট বাগানোর ব্যাপারে সত্যপ্রিয় যে অসাধারণ ও প্রায় অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, অনেকের কাছেই তা দুর্বোধ্য রহস্যে ঢাকা। কিন্তু জ্যোতির্ময়ের মনে হয়, এই ইংরেজ ভদ্রলোকটির অনুগ্রহেই বোধ হয় সত্যপ্রিয়র এই বিশেষ সৌভাগ্য!

স্পষ্ট ধারণা করিবার উপায় নাই। সত্যপ্রিয়কে ব্যক্তিগতভাবে এতদিন অনুগ্রহ করিবার মত উচ্চপদে তো ভদ্রলোক প্রতিষ্ঠিত নয়। ব্যক্তিগত অনুগ্রহের ব্যাপারও একটা নয়। জোর গলায় যে ঘোষণা করিতেছে যে, আমি দেশকে ভালবাসি, ভারতবর্ষের সকল সমস্যার সমাধান আমি আবিষ্কার করিয়াছি, দেশের অপরিণামদর্শী অন্ধ নেতাদের প্রদর্শিত ভ্রান্ত পথ ত্যাগ করিয়া আমার প্রদর্শিত পথে চলিলে তেত্রিশ বৎসরে ভারত স্বাধীন হইবে, ভারতের ঘরে ঘরে সুখ ও শান্তি বিরাজ করিবে—মাঝে মাঝে সে ইংরেজ বিদ্বেষ আর সোজাসুজি গভর্নমেন্টের সঙ্গে বিরোধ ত্যাগ করিতে বলে বলিয়াই কি তাকে প্রশ্রয় দেওয়ার মত উদারতা গভর্নমেন্টের হয়?

অথবা তা হয়তো নয়?

কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না জ্যোতির্ময় । মনে হয় কোথায় যেন একটা ধাঁধা আছে। দেশপূজ্য, নেতা, স্বদেশী প্রতিষ্ঠান, স্বাধীনতার আন্দোলন সমস্ত কিছুরই বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্যপ্রিয় যেমন করে, গভর্নমেন্টের নিন্দাও তো করে? অবশ্য স্বাধীনতার মন্ত্র-প্রচারকদের সমালোচনার সময় ভাষাটা যেমন তীব্র হয়, এদের প্ররোচনায় দেশের যে সর্বনাশ হইতেছে তার বর্ণনা যেমন রোমাঞ্চকর হয়, গভর্নমেন্টের নিন্দাটা তেমন জমে না। শিক্ষার অব্যবস্থা, নদী নালার সংস্কারের অভাব, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা প্রচারে সহায়তা, ভ্রান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ, এই ধরনের কয়েকটি বিষয়ে গভর্নমেন্টের ভুল দেখাইয়া গভর্নমেন্টকে সতর্ক করিয়া দিয়াই সত্যপ্রিয় ক্ষান্ত হয়। তবু, এ সব তো বিরুদ্ধ সমালোচনা। সত্যপ্রিয় যে সত্য সত্যই দেশকে ভালবাসে, যত খাপছাড়া বা উদ্ভট সে ভালবাসা হোক, তার লেখা ও বক্তৃতায় তার যথেষ্ট পরিচয় থাকে।

দেশের দুরবস্থার যে বর্ণনা লেখায় ও বক্তৃতায় সত্যপ্রিয় দেয়, দেশকে ভাল না বাসিলে কেউ তা পারে? নেতারা যা চায় সত্যপ্রিয়ও তাই চায়,—কেবল তার উপায়টা একটু পৃথক, একটু অভিনব। কদিন আগেও সত্যপ্রিয়র একটি পুস্তক জ্যোতির্ময় প্রকাশ করিয়াছে, তাতে সত্যপ্রিয় স্পষ্টই বলিয়াছে, সর্বাগ্রে ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা চাই, প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীর চেষ্টা করা কর্তব্য —বলিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা কাকে বলে, ধর্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থের সাহায্যে সেটা ব্যাখ্যা করিয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকগুলি সম্ভবত কেষ্টবাবুই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। তা হোক, সেটা বড় কথা নয়, সংস্কৃত শ্লোকের অপার সমুদ্রে ভাড়াটে ডুবুরী নামাইয়া রত্ন উদ্ধার করিলে দোষ হয় না, সেগুলি কাজে লাগাইতে পারাই আসল কথা। ব্যাখ্যার পর সত্যপ্রিয় নির্দেশ করিয়াছে, প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করিবার উপায়। এই উপায় নির্দেশ করাই প্রবন্ধটির প্রধান উদ্দেশ্য, প্রবন্ধটির নামই ছিল, 'তেত্রিশ বৎসরে ভারতের স্বাধীনতালাভের উপায়।' ধর্ম যখন লোপ পায়, সমাজব্যবস্থা বিকৃত হয়, দেশবাসীর দারিদ্র্য, অন্নাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অকালমৃত্যু, বীভৎস রূপ ধারণ করে, দেশহিতৈষীর তখন সর্বপ্রথম কর্তব্য কি? এ সমস্তের মূল কারণ অনুসন্ধান। কারণ না জানিলে প্রতিকার হইবে কিরূপে? শাস্ত্রগ্রন্থ, ধর্মগ্রন্থ, দেশ-বিদেশের হাজার বৎসরের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া সত্যপ্রিয় দেখাইয়াছে, একটিমাত্র কারণে দেশের সর্বাঙ্গীণ দুরবস্থা ঘটে —রাজশক্তির সহিত উদ্দেশ্যহীন বিরোধ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিচালনায় ঈশ্বর কয়েকটি মূলনীতি স্থির করিয়া দিয়াছেন, কেবল সূর্যের সহিত পৃথিবীর সম্পর্ক বিচার করিয়াই সে নীতির মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব, ঐ সকল মূলনীতির একটি হইল—রাজশক্তির সহিত অকারণ কলহ করিলে দেশবাসীর ধর্ম, সমাজ, সুখ-সম্পদ, স্বাস্থ্যশান্তি নষ্ট হইবেই হইবে, কিছুই তাহা ঠেকাইতে পারিবে না। এই নিয়মের দ্বারাই বিশ্বনিয়ন্তা

শক্তির সামঞ্জস্যবিধান করিয়াছেন। এইখানে সত্যপ্রিয় শক্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের মতবাদ ও ভারতীয় ঋষিগণের মতবাদ আলোচনা করিয়া বিজ্ঞানের মতবাদের ভ্রান্তি প্রমাণ করিয়াছে, যদিও সত্যকথা বলিতে কি, আলোচনাটা জ্যোতির্ময় একবিন্দুও বুঝিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের যে অধঃপতন হইয়াছে, ভারতবাসীর যে শোচনীয় দুরবস্থা দেখা দিয়াছে এবং দিন দিন অধঃপতন ও দুরবস্থা ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ ভারতবাসীর রাজশক্তির সহিত বিবাদ। কিন্তু তাই যদি হয়, ভারতবর্ষ কি তবে স্বাধীনতা পাইবে না? স্বাধীনতা পাইতে গেলেই তো রাজশক্তির সহিত ভারতবাসীর বিবাদ বাধিবে—কারণ রাজশক্তি বৈদেশিক? না, তা নয়। সত্যপ্রিয় স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছে, স্বাধীনতা ভারতবাসী অনায়াসে পাইতে পারে, তেত্রিশ বৎসরে পাইতে পারে, যদি ঠিক পথ অনুসরণ করা হয়।

শতাব্দীর পর শতাব্দী রাজশক্তির সহিত ভারতের বিরোধ চলিয়া আসিতেছে, কখনও একরূপে কখনও অন্যরূপে, কখনও প্রবলভাবে, কখনও ক্ষীণভাবে —ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দেয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভারতের অধঃপতন ঘটিতে ঘটিতে ভারত বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সুতরাং মূর্খেরও এখন বোঝা উচিত যে ভারতবাসীর সর্বপ্রথম কর্তব্য রাজশক্তির সহিত সর্বপ্রকার বিরোধ পরিত্যাগ করা। কার্যে, চিন্তায় ও বাক্যে এমন কিছুই প্রশ্রয় পাইবে না যাহা রাজশক্তির পছন্দসই নহে। এমন কি, কেহ যদি ভ্রান্তিবশত রাজশক্তির বিরোধিতা করিয়া দেশের সর্বনাশ করিতে উদ্যত হয়, রাজশক্তি তাকে উপেক্ষা করিলেও দেশবাসীর নিজেরই কর্তব্য হইবে তাকে সংযত করা। একদিনে ইহা হইবে না সত্যপ্রিয় তাহা জানে, সত্যপ্রিয়র পন্থা অনুসরণ করিলে ইহাতে বিশ বৎসর সময় লাগিবে। যে মুহূর্তে ভারতবাসী রাজশক্তির সহিত বিরোধ পরিত্যাগের চেষ্টা আরম্ভ করিবে, সেই মুহূর্ত হইতে ধর্ম ও সমাজের অধোগতি রদ হইয়া দেশবাসীর অন্নকষ্ট, সুখ-শান্তির অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব এ সমস্তের প্রতিকারও আরম্ভ হইবে— বিশ বৎসর পরে দেখা যাইবে, একমাত্র পরাধীনতা ছাড়া ভারতবর্ষের কোন অভাব নাই। ভারতীয় ধর্ম, ভারতীয় সমাজ-বিধান চরম উন্নতি লাভ করায় তখন রাজশক্তিরও পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ করিবে, কারণ, প্রকৃতির নিয়মে ধর্ম ও সমাজ বিধানের অনুরূপ রাজশক্তিই দেশে প্রচলিত থাকিতে পারে ; এইখানে ঋষিগণের বাক্য হইতে সত্যপ্রিয় দেখাইয়াছে, একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আধারহীন শক্তি হয় না, আধার পরিবর্তিত হইলেই শক্তির বাহ্যিক রূপান্তর ঘটিবে, অবশ্য মূল শক্তি চিরদিনই অবিনাশী ও অপরিবর্তনীয়, ইত্যাদি। তেরো বৎসর ভারতবাসী যদি ধর্ম আর সমাজ বিধানের উৎকর্ষ বজায় রাখিতে পারে ভারতের বৈদেশিক রাজশক্তি ভারতীয় রাজশক্তিতে পরিণত হইবে। সুতরাং তেত্রিশ বৎসরে ভারতবর্ষ কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, সর্বপ্রকার স্বাধীনতা লাভ কবিবে। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচার করিয়া, স্বাধীনতার আন্দোলন তুলিয়া নেতৃবর্গ দেশের ধ্বংসের পথটাই পরিষ্কার করিয়া দিতেছে — স্বাধীনতাকে হাজার বৎসর ভবিষ্যতে ঠেলিয়া দিতেছে।

সত্য কথা বলিতে গেলে, সত্যপ্রিয়র প্রবন্ধটি জ্যোতির্ময়ের কাছে কতকটা প্রলাপের মত মনে হইয়াছে, তবু কি যেন আছে প্রবন্ধটিতে যা মনের নীতিধর্মগত অন্ধবিশ্বাসে জন্ম-মৃত্যু-সীমাহীনতা নক্ষত্রলোক-আশ্রয়ী দুর্বোধ্য ও রহস্যময় অনুভূতির জগতে কেমন যেন একটা অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করে। আশার কথা বলা হইয়াছে, 'তবু অকারণ হতাশায় মন ভরিয়া যায়, কার্যের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তবু মনে হয় হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকাই ভাল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা বলিতে বসিয়া প্রাচীন ভারতের স্বর্গের সঙ্গে বর্তমান

ভারতের নরকের তুলনা করিয়া, ধর্ম, ঈশ্বর আর দর্শনের কথা বলিয়া, সত্যপ্রিয় যেন একেবারে মনের ভিত্তি ধরিয়া নাড়া দেয়—আসল বক্তব্য সত্যপ্রিয় কি যুক্তি দিয়া প্রমাণ করিয়াছে সে বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়াই তার কথা মানিয়া লইতে ইচ্ছা হয়। মাঝে মাঝে, বহির্জগতের চিন্তাধারার সঙ্গে হঠাৎ যখন জ্যোতির্ময়ের কোন কারণে একটু সংস্পর্শ ঘটিয়া যায়, তখন দু'একবার তার মনে হইয়াছে, সত্যপ্রিয়র বলিবার যেন কিছুই নাই, সে শুধু ধর্ম, ঈশ্বর, শাস্ত্র, দেশ ও সমাজের দোহাই দিয়া দেশবাসীকে স্বাধীনতার প্রচলিত আন্দোলন বন্ধ করিতে বলিতেছে। এই একটি কথাই বলিবার আছে সত্যপ্রিয়র এবং এই একটি কথাই সে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে।

এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে জ্যোতির্ময় বিবাহের আসরের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। একজন বড়বাজারের বড় ব্যবসায়ী সামনে পড়িল। ভুঁড়ি নাই, বাংলা বলিতে পারে। সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে অনেকদিনের ঘনিষ্ঠতা, কারণ, সত্যপ্রিয় তিনবার তিনটি মুখের গ্রাসে লাখ তিনেক টাকা কাড়িয়া লইয়াছে।

'জোতীরমোয়বাবু যে! কেমোন আছেন! ভাল ত!'—একদৃষ্টে খানিক তফাতে সত্যপ্রিয়র দিকে চাহিয়া থাকে। সাদা ও কালো রাজকর্মচারী ক'জনকে সত্যপ্রিয় বিবাহের আসর দেখাইতেছিল এবং সম্ভবত হিন্দু-বিবাহ-পদ্ধতির অবনতি ও তাহার কুফল ব্যাখ্যা করিতেছিল।—'দেখিয়েছেন জোতীরমোয়বাবু! মেয়ের সাদি দিতে দিতে কেমোন নিজের কাম বাগিয়ে নিয়েছেন। কি চীজ আছেন আপনার সত্যবাবু! কি বলিয়েতেছেন জনিসন সায়েবকে জানেন? হামি জানি! বলিয়েতেছেন—সায়েব, ইয়ংম্যান স্বদেশী করবে আব তোমরা তাদের জেলে ভেজবে, হামারা বাত শুনিয়ে, জেলে কখুনো দিও না, একঠো নরম-গরম মেয়ের সাথে জববদস্ত সাদি দিয়ে দাও, স্বদেশী না করে ইয়ংম্যান তখন সে তিশ রূপেয়ার কেরাণী বনে যাবে।'

জ্যোতির্ময় হাসিয়া বলিল, 'তাই নাকি! সত্যপ্রিয়বাবু ও কথা বলছেন আপনি কি করে জানলেন মোহনলালজী?'

'হামি না জানিয়েলে কে জানবে? আমি আর উনি দু'জন তো টেণ্ডার দিয়েলাম—সায়েব হামাকে পুছলো, "মোহনলালজী, দেশকো যত আদমি ইংরেজ রাজকো ভাগাতে চায় তাদের কি করা যায় বলুন তো?" হামি বললাম, "জেলমে পুরে দিন।" বাস, হামি টেণ্ডার না পেলাম।'

জ্যোতির্ময় সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, 'ওঁকে জিজ্ঞাসা করায় উনি কি বললেন?'

'হামারা সামনে কি পুছিয়েছে? ওই অনুমান করে লিন্, না? আপনি সত্যবাবুকে না জানেন? সত্যবাবুর জবান না শুনেন?—হাসিয়ে হাসিয়ে উনি কোতোবার বলিয়েছেন সাধুকে দারু পিলাবে তো মন্দিরমে ঘটা করে পূজা দিয়ে চরণামৃত বোলকে পিলায়ে দেও। দশ রোজ পিলায়ে দিলে সাধু মাতাল হয়ে যাবে, চোরকে সাধু বানাবে তো আসলি সাধু বনে থাকলে চুরির কত সুবিস্তা সমঝিয়ে দিয়ে দশ রোজ ধরে সাধু বানাও—চোর আর চুরি না করবে। সত্যবাবু সায়েবকো এসা কুছু বলিয়ে থাকবেন!'

হয়তো তাই হইবে। যে সামান্য একটা নেকলেসের ব্যাপারে ছ্যাঁচড়ামি না করিয়া পারে না—

তারপর একসময় কোনরকমে লুচি, পোলাও, কিছু পেটে পুরিয়া মণ্ডপের থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া জ্যোতির্ময় নানা রঙের শাড়ি-পরা একদল ছোট ছোট চঞ্চল মেয়ের মহোল্লাসে প্রীতি-উপহারের সংগৃহীত কাগজ ভাগাভাগি করা দেখিতেছে, সত্যপ্রিয়র বড় ছেলে মহীতোষ

আসিয়া তাকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

'কি হয়েছে মহী?'

'বৌদি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

অপরাজিতা? অপরাজিতার আবার কি অসুখ হইল? অন্দরে মেয়েদের ভিড়, একটা ঘরে বাসর বসিয়াছে, বারান্দা ও দু'তিনটি ঘরে খাওয়া চলিতেছে, শাড়ির বর্ণ-বৈচিত্র্যে চোখ ঝলসিয়া যায়। কিছু না জানিয়াও জ্যোতির্ময় বুঝিতে পারিল এদের একজনও অপরাজিতা নয়। বাড়ির প্রায় পিছনে কোণের দিকের ছোট একটি ঘরের সামনে স্বয়ং সত্যপ্রিয় দাঁড়াইয়া ছিল। আর একটু তফাতে তিন-চারজন মেয়ের কাছে দাঁড়াইয়া সুবর্ণ নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল। জ্যোতির্ময়কে দেখিবামাত্র এতক্ষণের চাপা রাগ ও বিরক্তির বশে সত্যপ্রিয় বলিয়া ফেলিল, 'আপনার মাথায় গোবর ভরা জ্যোতির্ময়বাবু! বৌমাকে এ অবস্থায় কি বলে নিয়ে এলেন?'

মাথায় যে জ্যোতির্ময়ের সত্যসত্যই গোবর ভরা তার প্রায় আরও একটা প্রমাণ দিয়া সে বলিল, 'আপনি যে আনতে বললেন?'

সত্যপ্রিয় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জ্যোতির্ময়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না। মহীতোষকে একখানা গাড়ি একেবারে বাড়ির পিছনে আনিয়া লাগাইতে বলিয়া দিল। গাড়ি যেন বড় হয়, একজনকে যেন শোয়ানো চলে গাড়িতে।

মহীতোষ বলিল, 'অ্যাম্বুল্যান্সের জন্য ফোন করে দিলে হয় না?'

সত্যপ্রিয় যেন শুনিতে পাইল না এমনি ভাবে সরিয়া গিয়া বারান্দায় রেলিঙে ঝুঁকিয়া একটু চাহিয়া রহিল, তারপর ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াই রাগ করিয়া বলিল, 'দাঁড়িয়ে রইলি যে মহী?'

'এই যে, যাই।'—চোখের পলকে মহীতোষ অদৃশ্য হইয়া গেল।

জ্যোতির্ময় সুবর্ণের কাছে সরিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলি, 'কি হয়েছে রে সুবর্ণ?'

সুবর্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'বৌদি হঠাৎ মুচ্ছো গিয়ে গোঙাতে লাগল, আর—'

এবার সত্যপ্রিয় ডাকিয়া বলিল, 'ভয় পাবেন না জ্যোতির্ময়বাবু। দু'জন ডাক্তার পরীক্ষা করছেন, দেখি তাঁরা কি বলেন। যশোদাও ভেতরে আছে।'

মিনিট পনের পরে দরজা খুলি ডাক্তার দু'জন বাহির হইয়া আসিল, যশোদাও সঙ্গে আসিল, দু'জন ডাক্তারকে জ্যোতির্ময় চেনে, দু'জনেই নাম-করা চিকিৎসক, একজন সহরের, একজন সহরতলীর। এমন কত ডাক্তার আজ সত্যপ্রিয়র কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছে।

ডাক্তার দু'জন মুখ খুলিবার আগেই সত্যপ্রিয় বলিল, 'একটু সুস্থ হয়েছেন তো এখন? যাক্ বাঁচা গেল। বিয়েবাড়িতে একটা বিপদ-আপদ ঘটলে বাড়ির কর্তার বুকের মধ্যে কেমন করে, আপনারা কি বুঝবেন! সামান্য একটু কিছু ঘটল তো সব কাজ পণ্ড হতে বসল। যাই হোক্ ভগবানের দয়ার সুস্থ যখন হয়েছেন, গাড়ি করে এবার ওঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দি, কি বলেন? বাড়ি কাছেই, পাঁচ মিনিটের পথ। ইনি মেয়েটির স্বামী।'

ডাক্তার দু'জনের মধ্যে যার বয়স কম সে একটু ইতস্তত করিতে লাগিল। জ্যোতির্ময়ের দিকে এক নজর চাহিয়া সে হঠাৎ বলিল, 'আমি বলছিলাম কি—'

পরম ধৈর্যের ভঙ্গিতে তার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, 'বলুন? বলুন আপনি কি বলছেন?'

ডাক্তার ঢোঁক গিলিয়া বলিল, 'বাড়ি কাছে হলে আর ভাল একখানা গাড়ি পেলে নেওয়া

চলে বৈকি।'

সত্যপ্রিয় বলিল, 'তা ছাড়া আপনি যখন সঙ্গে যাচ্ছেন, তখন আর ভয়ের কি থাকতে পারে?'

সুতরাং আর কারও কিছু বলিবার রহিল না, কেবল যশোদা একবার বলিল, 'আজ রাতে ঠাঁইনাড়া করা কি ভাল হবে ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তার কি জবাব দিল ভালমত বোঝা গেল না। সিঁড়ি দিয়া নামাইয়া গাড়ি পর্যন্ত নেওয়ার জন্য স্ট্রেচারের মত একটা কিছুর ব্যবস্থার কথা ডাক্তার উল্লেখ করিলে যশোদা বলিল, 'থাক্, থাক্, এঁদের আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই। আমিই নিয়ে যাচ্ছি ওকে কোলে করে, তাতে ঝাঁকুনিও কম লাগবে।'

শিশুর মত অপরাজিতার শরীরটা দু'হাতে অবলীলাক্রমে বুকের কাছে তুলিয়া নিয়া যশোদা নিচে নামিয়া গেল। তাকে বুকে ধরিয়া রাখিয়াই নিজে সে গাড়িতে উঠিয়া বসিল। ডাক্তার ভিতরে আসিল, জ্যোতির্ময় আর সুবর্ণ সামনে বসিল।

যশোদা ডাক্তারকে বলিল, 'এইভাবেই রাখলাম, আবার নামতে হবে তো। বারবার তোলা-নামার চেয়ে একভাবে থাকাই ভাল। কি বলেন?'

ডাক্তার সংক্ষেপে বলিল, 'হ্যাঁ।'

দক্ষিণের গেট দিয়া গাড়ি রাস্তায় পড়িতেই যশোদা কারও সঙ্গে পরামর্শও করিল না, কারও অনুমতি চাহিল না, চালককে সোজা হাসপাতালে যাইতে হুকুম দিয়া দিল। জ্যোতির্ময় চমকাইয়া উঠিল, সুবর্ণ অস্ফুট একটা শব্দ করিয়া আবার কাঁদিয়া ফেলিল, ডাক্তার চুপ করিয়া রহিল।

যশোদার গা বোধ হয় বড় বেশীরকম জ্বালা করিতেছিল, ডাক্তারের লজ্জিত নীরবতাও তাকে থামাইয়া রাখিতে পারিল না, একটু পরে আবার বলিল, 'হাসপাতালে না গিয়ে কি করি বলুন? আপনাদের মত ডাক্তারের ভরসায় বাড়ি নিয়ে যেতে সাহস হল না।'

ডাক্তার এবারও কিছু বলিল না।

এমার্জেন্সী ওয়ার্ডের একটা ঘরে অপরাজিতার মরণ রদ করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে, বাহিরে একটা কাঠের বেঞ্চে বসিয়া থাকে জ্যোতির্ময়, যশোদা আর সুবর্ণ। প্রিয়জনকে হাসপাতালে দিবার একটা অযৌক্তিক অসুবিধা আছে, নিজেদের কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই, জানা থাকিলেও নিজেদের কিছু করা হইল না ভাবিয়া বড় কষ্ট হয়। একজন মরিতেছে আর এমন নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা! এ যেন এক ধরনের অপরাধ।

রাত তিনটার সময় ডাক্তার জানাইল, এখন তারা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যাইতে পারে। না, ঠিক নিশ্চিন্ত মনে নয়, আর ভয় নাই এমন কথা ডাক্তার বলিতে পারে না, তবে এখনকার মত বিপদটা কাটিয়া গিয়াছে। অপরাজিতা যদি নেহাৎ মরেই তবে তার মরিতে অন্ততঃ দু-একটা দিন সময় লাগিবে। এমন রূঢ়ভাবে যে ডাক্তার খবরটা জানাইল তা নয়, তার কথার মোটামুটি অর্থ-টা এই।

যশোদার সঙ্গে সুবর্ণকে বাড়ি পাঠাইয়া দিয়া জ্যোতির্ময় একাই হাসপাতালে বসিয়া রহিল। অপরাজিতাকে সে কি খুব ভালবাসে? অপরাজিতা মরিয়া গেলে খুব কষ্ট হইবে তার? উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া আর রাত্রি জাগরণের অবসাদের জন্য বোধ হয় মনটা ভোঁতা হইয়া গিয়াছে, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

হাসপাতাল হইতে সে যখন বাহির হইল, রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। রাস্তার আলো নেভে নাই, কিন্তু চারিদিকে দিনের আলোর আবির্ভাবের আবছা সঙ্কেত টের পাওয়া যায়। ট্রাম ও বাস চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু জ্যোতির্ময় হাঁটিতে আরম্ভ করিল। সমস্ত রাত জাগিয়া থাকার পর সহর ও সহরতলীর জাগরণ আরম্ভ হইবার সময়টা এই পথ দিয়া হাঁটিতে ভাল লাগিতেছিল। কয়েক ঘণ্টা পরে মানুষ ও গাড়ি-ঘোড়ার কি ভিড়টাই এই পথে আরম্ভ হইবে! সহরতলী হইতে সহরের দিকেই মানুষ চলিতে আরম্ভ করিবে বেশি, বিকালের দিকে যেন স্রোতটা ফিরিয়া আসিবে সহর হইতে সহরতলীর দিকে।

পথটা এলোমেলোভাবে বহুদূর বিস্তৃত সারি-সারি রেললাইন ডিঙ্গাইয়া গিয়াছে। ব্রিজের উপর রেলিঙে ভর দিয়া জ্যোতির্ময় একটু দাঁড়াইল। ওয়াগন বাছাই করিবার জন্য ইস্পাতের রেখার দুর্বোধ্য আর জটিল রেখাচিত্র দিয়াই সহর ও সহরতলীকে যেন ভাগ করা হইয়াছে। উঁচু থামের উপর হইতে এদিকে ওদিকে জোরালো আলো ফেলিয়া কোন কোন লাইনের কিছু কিছু অংশ আলোকিত করা হইয়াছে, বাকীটা আবছা আলো-অন্ধকারে ঢাকা। ব্রিজের দু'পাশে বহুদূর পর্যন্ত অসংখ্য ওয়াগন বিশৃঙ্খলভাবে দাঁড়াইয়া আছে। কয়েকটা ওয়াগন ইঞ্জিনের ঠেলা খাইয়া আপনা-আপনি একদিকে আগাইয়া চলিয়াছে, লিভার ঠেলিয়া ঠেলিয়া সেগুলিকে সরাইয়া দেওয়া হইতেছে এক লাইন হইতে আরেক লাইনে। দু'দিকে কাছে ও দূরে থামের মাথায় বসানো সিগন্যালের অনেকগুলি লাল-নীল আলো, মানুষের হাতের সঞ্চরণশীল আলোর নড়িয়া নড়িয়া দূরের মানুষকে দুর্বোধ্য ইঙ্গিত করা, কতবার জ্যোতির্ময় এই ব্রিজের উপর দিয়া দিনে ও রাত্রে যাতায়াত করিয়াছে, কিন্তু কোনদিন খেয়ালও করে নাই ব্রিজের দু'পাশে নগরের এমন একটা রূপ বিছানো রহিয়াছে। অপরাজিতাকে সে যে বিবাহ করিয়াছে, এতকাল' এক বিছানায় রাত কাটাইয়াছে, অপরাজিতার মধ্যে নিজের এক প্রতিনিধিকে আনিয়া দিয়াছে, তাও কি এতকাল সে খেয়াল করিয়াছিল?

অপরাজিতা যদি মরিয়া যায়!

কি হইবে অপরাজিতা মরিয়া গেলে? ব্রিজের দু'দিকে রেললাইনগুলি এমনিভাবেই পাতা থাকিবে, ইঞ্জিনের হুস্ হুস্ আর ওয়াগনে ওয়াগনে ঠোকাঠুকির এমনি শব্দ উঠিবে, থামের মাথার জোরালো আলো, সিগন্যালের লাল-নীল আলো, লণ্ঠন নাড়িয়া মানুষের সঙ্কেত কিছুই বদলাইবে না।

বাড়ি ফেরার পথে যশোদার সঙ্গে দেখা করিয়া গেল। যশোদা উনানে আঁচ দিয়াছে, আঁচ প্রায় ধরিয়া আসিল।

'কাল চাকরীতে বিজাইন দেব চাঁদের মা।'

'বেশ তো, রিজাইন দেওয়া তো পালাবে না! বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়বেন যান।'

অপরাজিতা বাঁচিবে না আশঙ্কা করিয়াই সত্যপ্রিয় একটু ব্যস্ত হইয়া তাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিল। কেবল অমঙ্গলের ভয় নয়, তার চেয়ে বেশি ভয় ছিল গোলমালের। এত টাকা খরচ করিয়া মেয়ের বিবাহের আয়োজন করিয়াছে, তার মধ্যে এমন একটা উৎপাত কি মানুষের ভাল লাগে? সে রাত্রে অপরাজিতার প্রাণটা বাহির হইবে না জানা থাকিলে হয়ত তাকে সরাইয়া দিবার জন্য অতটা ব্যস্ত হইয়া পড়িত না।

পরদিন বেলা প্রায় এগারটার সময় নিজেই জ্যোতির্ময়ের বাড়ি খবর জানিতে আসিল। এ বড় সহজ সম্মান ও দরদের পরিচয় নয়। জ্যোতির্ময়ের বৈঠকখানায় অল্প দামী কাঠের চেয়ারে বসিবার আগে প্রথম কথা বলিল এই ঃ 'ইস, আপনার চোখ-মুখ যে বসে গেছে

জ্যোতির্ময়বাবু।'

জ্যোতির্ময় বলিল, 'আজ্ঞে না, ও কিছু নয়।'

অপরাজিতার খবর? তার অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, শেষ পর্যন্ত কি হইবে বলা যায় না, সে হাসপাতালেই আছে এবং সম্ভবত কিছুদিন থাকিতে হইবে।

'আপনি কিছুদিন ছুটি নিন জ্যোতির্ময়বাবু।'

ছুটি সম্পর্কে জ্যোতির্ময়ের বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। এ সব বিষয়ে সত্যপ্রিয়র ব্যবস্থা বড় জটিল। ছুটি চাহিলেই দেয়, সময় সময় দরকার মনে করিলে, যেমন আজ জ্যোতির্ময়ের বেলা মনে করিয়াছে, না চাহিলেও নিজে হইতে যাচিয়া ছুটি দিতে চায়। কিন্তু ছুটি যে নেয় শেষ পর্যন্ত তার হয় বিপদ। কাজ আর কাজের দায়িত্ব সত্যপ্রিয় ভাগ করিয়া দিয়াছে, যার যা করার কথা তাকে তা করিতেই হইবে, কাজ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই, কোন কৈফিয়ৎ নাই। সে নিজে হইতে ছুটি নিতে বলিয়াছিল, ছুটিতে থাকার সময় মানুষ কাজ করিতে পারে না, এ যুক্তিটা খুব জোরালো সন্দেহ নাই, কিন্তু জোরালো যুক্তিটা শুনাইবার সুযোগ তো সত্যপ্রিয় কোনমতেই সৃষ্টি করিবে না! কাজ কেন হয় নাই সে কৈফিয়ৎ আজ পর্যন্ত সত্যপ্রিয় কারও কাজে স্পষ্ট ভাষায় দাবী করিয়াছে কি না সন্দেহ, কিন্তু রাগ যে সে করিয়াছে, এ ভাবে যে চলিবে না, কাজের ক্ষতিব সঙ্গে যে চাকরীর ক্ষতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, এই সব কি কৌশলে যেন বরাবর ভাষার চেয়েও স্পষ্ট করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিয়া আসিয়াছে!

জ্যোতির্ময় তাই আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, আপনার নতুন প্রোগ্রামটা চালু করা হচ্ছে, এ সময়—'

সত্যপ্রিয় আবেগভরা কণ্ঠে বলিল, 'না, না, ওসব প্রোগ্রাম-ট্রোগ্রামের কথা নিয়ে আপনি আর এখন মাথা ঘামাবেন না জ্যোতির্ময়বাবু।'

এ সব কথার অর্থও জ্যোতির্ময় জানে। সত্যপ্রিয় সকলকেই এমনিভাবে দরদ জানায়, সকলের প্রতিই এমনি উদারতার পরিচয় দেয়। কিন্তু সত্য সত্যই যদি কোন মূর্খ এই দরদ আর উদারতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বসে, দু'দিন পরে সে আর কোনদিকে কূল দেখিতে পায় না। এ বিষয়ে সত্যপ্রিয়র একটা থিয়োরী আছে। কর্মচারীদের সে এই সব কথা বলে, বন্ধু ও আত্মীয় হিসাবে, কর্মচারী ও উপরওয়ালার সম্পর্কটা তো তাতে বাতিল হইয়া যায় না, মাসান্তে কর্মচারী মাহিনা তো গ্রহণ করে, সুতরাং কাজ সম্পর্কে আত্মীয় বন্ধু হিসাবে সে যা বলে, কাজ সম্পর্কে সে কথাগুলি প্রয়োগ করা কি কর্মচারীদের উচিত? তার মত অবস্থার আব একজন মানুষও কি আছে সামান্য মাহিনার কর্মচারীর সঙ্গে যে এমন সহজভাবে মেলামেশা করে, বিপদে-আপদে সহানুভূতি জানায়, পরামর্শ দেয়? এই মেলামেশার অনুগ্রহটুকু বাড়তি পাওনা মনে করিয়া তাদের কৃতার্থ থাকা উচিত। প্রথম প্রথম যারা বোকামি করিয়া এই সহজ কথাটা বুঝিতে পারে না তাদের সে ক্ষমাও করে, ভবিষ্যতে সাবধান হইবার সুযোগও দেয়। কিন্তু যে পুরা টাকা মাহিনা দেয় সে প্রতিদানে পুবা কাজ চাহিবে. দরদ আর ভালবাসা দেখানোর জন্য মাহিনা দিয়া মানুষ লোক রাখে না—এই সরল সত্যটা যার মাথায় কোন রকমেই ঢোকা যায় না, অগত্যাই সত্যপ্রিয় তাকে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে চরিয়া খাইবার জন্য মুক্তি দেয়।

অবশ্য, এই রকম দরদ ও ভালবাসা সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করে বলিয়াই সকলে হাসি-মুখে দশ ঘণ্টার জায়গায় পনের ঘণ্টার কাজ করে, তিনজনের কাজ একজনে করে।

কিন্তু সত্যপ্রিয় তো করিতে বলে নাই? যার যতক্ষণ ইচ্ছা কাজ করুক না, সত্যপ্রিয়র কি আসিয়া যায়, তার কাজ হইলেই হইল।

জ্যোতির্ময় তাই আবার আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, ছুটির দরকার হলেই আপনাকে বলব। এখন তো হাসপাতালেই রইল, দু'বেলা গিয়ে শুধু দেখে আসা।'

'শ'খানেক টাকা বরঞ্চ আপনি রাখুন, চিকিৎসার জন্য যদি দরকার হয়।'

এ আরেক বিপদ। যার যা প্রাপ্য তার বেশি একটি পয়সা কোনদিন কেউ সত্যপ্রিয়র কাছে পায় নাই, কোনদিন পাইবেও না। সে যে দান করে হিসাব করিলে দেখা যায়, দানের রীতি, নীতি, প্রথা, নিয়ম, সামাজিক ও অন্যবিধ বাধ্যবাধকতা প্রভৃতি হিসাবে সেটাও গ্রহীতার প্রাপ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কর্মচারীদের হাতে টাকা গুঁজিয়া জোর করিয়া সাহায্য করিতেও দু'একবার সত্যপ্রিয়কে দেখা গিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে টাকা সত্যপ্রিয়র ফিরিয়া আসে, কোথাও আসে কাজে, কোথাও আসে বাধ্যবাধকতার প্রয়োজনীয় সম্পর্কটা বজায় থাকাতে, কোথাও আসে প্রতিহিংসায়।

সত্যপ্রিয় চলিয়া গেলে জ্যোতির্ময় স্নান করিতে গেল। খাইয়া আপিস যাইবে। যাওয়ার পথে হাসপাতালে খবর নিয়া যাইবে।

সুবর্ণ বলিল, 'আজকেও আপিস যাবে দাদা?'

'একবার না গেলে চলবে কেন? সকাল সকাল ফিরে আসব।'

'কি দরকার? রাত্রিটাও আপিসে থেকো'—সুবর্ণের মুখ বিবর্ণ, চোখ ফুলিয়া গিয়াছে।

বলিতে বলিতে আবেগে বিবর্ণ মুখে রক্তের সঞ্চার হয়, মাথা ঝাঁকি দিয়া সে আবার বলে, 'বৌদি যেন মরে—মরে, মরে, মরে! ম'রে যেন তোমার হাত থেকে রেহাই পায়।'

সুধীরা চীৎকার করিয়া বলে, 'সুবর্ণ!'

আর জ্যোতির্ময় করে কি, ঠাস্ করিয়া এক চড় বসাইয়া দেয় বিবাহযোগ্যা বোনের গালে, গায়ে যত জোর আছে, তত জোরের সঙ্গে। পাঁচটি আঙ্গুল নয়, সুবর্ণের টুকটুকে গালে তিনটি আঙ্গুলের ছাপ সঙ্গে সঙ্গে এমন স্পষ্টভাবে ফুটিয়া ওঠে যে, ভয় হয় কোনদিন বুঝি এ দাগ আর মুছিয়া যাইবে না।

আপিস যাওয়ার সময় জ্যোতির্ময় একটু ঘুরিয়া যায়, যশোদার বাড়ির গলিটার সামনে দিয়া যাইতে আজ কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল।

দুপুরবেলা সুবর্ণ সুধীরাকে বলিল, 'আর তো এ বাড়িতে আমার থাকা হয় না দিদি।'

সুধীরা বলিল, 'চুপ কর। বকিসনে মেলা।'

সুবর্ণ তখন গেল যশোদার কাছে।

'আর তো আমার ও বাড়িতে থাকা হয় না যশোদাদিদি।'

গালের দাগ দেখিয়া যশোদার বড় মায়া হইয়াছিল, কথা শুনিয়া মনটা বিগড়াইয়া গেল। 'মারবে না? সারারাত জেগে ভয়ে ভাবনায় পাগল হয়ে আছে মানুষটা, তাকে তুমি অমন করে বলতে গেলে কেন?'

কোথাও কি সহানুভূতি নাই? এমন কি কেউ নাই জগতে যে, যুক্তি-তর্ক বিচার বিবেচনা বাদ দিয়া কোন্ অবস্থায় কে তাকে কি জন্য মারিয়াছে, সে কথা ভুলিয়া গিয়া, শুধু গালে চড় খাইয়া গালটা তার ফুলিয়া গিয়াছে বলিয়া ব্যাকুল হয়? জগতে দরদী নাই ভাবিয়া সুবর্ণের যখন কান্না আসিতেছে, দেখা হইল নন্দর সঙ্গে। সুবর্ণের গাল দেখিয়া নন্দ যে ঠিক ব্যাকুল

হইল, তা বলা যায় না, বোধ হয় বিস্ময়েই অভিভূত হইয়া গেল। সুবর্ণের কাছে তাই যথেষ্ট। নন্দকেই তো সে খুঁজিতেছিল। আর কে আছে তার নন্দ ছাড়া?

'এসো তো আমার সঙ্গে।'

এখানে এই সরু গলির মধ্যে দাঁড়াইয়া কি কথা বলা যায়, যে নোংরা চারিদিকে, যে দুর্গন্ধ চারিদিকে, দু'জন মানুষ পাশাপাশি চলিতে গেলে হয় গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগে, নয় দু'পাশে দেওয়ালে গা ঠেকিয়া যায়, তা'ছাড়া যশোদার ভয় আছে, দেখিলেই দু'জনকে সে তফাৎ করিয়া দিবে। বেণী দুলাইয়া সুবর্ণ হন্ হন্ করিয়া চলিতে থাকে, পায়ের স্যাণ্ডেলে শব্দ হয় চট্ চট্। পাড়ার রাস্তায় এমনভাবে সুবর্ণের সঙ্গে চলিতে গিয়া নন্দর মুহূর্তে মুহূর্তে রোমাঞ্চ হয় আর মুহূর্তে হাত-পা যেন আড়ষ্ট হইয়া আসে। চেনা পথের দু'পাশে চেনা ঘরবাড়ি দোকানপাট সব যেন হাজার হাজার চেনা মানুষে ভরিয়া গিয়াছে, সকলে চাহিয়া দেখিতেছে সুবর্ণের চলন আর নন্দের অনুসরণ।

'একটু আস্তে হাঁট না?'

সুবর্ণ থমকিয়া দাঁড়ায়। ঠিক তিনু, বিশু আর বেন্দার কামারশালার সামনে। লোহার পাত গরম হইতেছে, তিনু প্রাণপণে হাপরের দড়ি টানিতেছে, বিশু হাতুড়ি উদ্যত করিয়া আছে, বেন্দা লোহার পাতটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আগুনে গুঁজিয়া ধরিতেছে। সেইখানে দাঁড়াইয়া সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করে, নন্দ কি তবে সুবর্ণের সঙ্গে যাইতে চায় না? তবে না হয় থাক নন্দ, সুবর্ণ একাই যাইবে! যেদিকে দু'চোখ যায় চলিয়া যাইবে! নন্দ ভাবিয়াছিল, সুবর্ণ বুঝি ব্যাকুল হইয়া হাসপাতালে ছুটিয়া যাইতেছে তার বৌদিকে দেখিবার জন্য ; কিন্তু হাসপাতালের পথ তো যেদিকে দু'চোখ যায় চলিয়া যাওয়ার পথ নয়। সুবর্ণের মুখে কড়া রোদ পড়িয়াছে, অভিমানের গাঢ় ছায়া স্পষ্ট করিয়া নন্দকে দেখানোর জন্যই সুবর্ণ যেন মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছে সূর্যের দিকে। রাধার অভিমানের জ্বালায় নন্দ নিজে কত জ্বলিয়াছে, তবু সুবর্ণের অভিমানে সে চিনিতে পারে না। এতক্ষণ পরে হঠাৎ ব্যাকুল হইয়া সে বলে, 'তোমার অসুখ করেছে, সুবর্ণ?'

চেনা মানুষের কথা আর তো নন্দর মনে থাকে না, সেইখান হইতে গলা ফাটাইয়া অনেক দূরের একটা রিক্সাকে ডাকিয়া আনে। রিক্সায় উঠিয়া বসিয়াই সুবর্ণ অবশ্য নন্দর গায়ে গা এলাইয়া মূর্চ্ছা যায়। কিন্তু নন্দ রিক্সাওয়ালাকে বাড়ির দিকে ফিরিয়া যাইতে বলা মাত্র সচেতন হইয়া বলে, 'না না, বাড়ি নয়, ট্রাম রাস্তার দিকে যেতে বলো।'

বাড়ি আর সুবর্ণ ফিরিবে না। নন্দ যদি ফিরিতে চায়, ফিরিয়া যাক। আর যদি সুবর্ণের সঙ্গে যায় নন্দ, অনেক দূরের কোন এক অজানা সহরে চলিয়া যায় সুবর্ণের সঙ্গে, আর নদীর ধারে ছোট একটি ঘর ভাড়া করিয়া দু'জনে বাস করে, আর নন্দ যদি সারাদিন কীর্তন করে, আর নন্দর কীর্তন শুনিতে শুনিতে সুবর্ণ যদি রাঁধাবাড়া ঘরকন্নার কাজ করে—

নন্দর পকেটে আনা পাঁচেক পয়সা ছিল তবে সুবর্ণের হাতে ছিল সোনার চুড়ি, কানে সোনার দুল। সহরের দিকে না গিয়া সহরকে পিছনে ফেলিয়া সহরতলী ডিঙ্গাইয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিলে কি ঘটিত বলা কঠিন। এ দিকের সহরতলী হইতে সহরে যাওয়ার পথে যদি হাসপাতালটা না পড়িত এবং হাসপাতালে যদি অপরাজিতা না থাকিত, আর অপরাজিতার কাছে একবার শেষ বিদায় নেওয়ার সাধটা যদি সুবর্ণের না জাগিত, তাহা হইলেও কি ঘটিত বলা কঠিন। হয়ত কয়েকদিন পরে দু'জনে ফিরিয়া আসিত, হয়ত তাদের ফিরাইয়া আনা হইত এবং বিশ্রী একটা হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়া যাইত। কিন্তু অপরাজিতার খবর লইতে গিয়া

জানা গেল, ঘণ্টাখানেক আগে সেও নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছে, ফিরিয়া সে আর আসিবে না, ফিরাইয়া তাকে আনা যাইবে না। কেবল শরীরটাকে চিতায় তুলিয়া পুড়াইবার হাঙ্গামাটুকু করিতে হইবে।

সুতরাং নন্দ ও সুবর্ণের নিরুদ্দেশ যাত্রা আপনা হইতে বাতিল হইয়া গেল। জ্যোতির্ময় আপিস যায় নাই, আপিস যাওয়ার পথে খবর নেওয়ার জন্য হাসপাতালে ঢুকিয়া হাসপাতালেই আটক হইয়া গিয়াছে। হাসপাতালের নতুন ও পুরাতন দালানের মাঝখানে চারিদিকে চওড়া কাঁকর বিছানো পথের জন্য প্রায় সবুজ দ্বীপের মত দেখিতে ছোট একটু গোলাকার ঘাসে ঢাকা জমি আছে। সবুজ রঙকরা গোটা তিনেক লোহার বেঞ্চিও সেখানে পাতা আছে, রোগীর খবর যারা জানিতে আসে, ইচ্ছা করিলে দরকার মত ওখানে ফাঁকায় বসিয়া বেশি বেশি বাতাস টানিয়া বুকের ধড়ফড়ানি শান্ত করিতে পারে। এখন রোদের বড় তেজ, জ্যোতির্ময় একাই একটা বেঞ্চে চুপচাপ বসিয়াছিল। গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সুবর্ণ তাকে জড়াইয়া ধরিল। সুবর্ণ মরিতে বলিয়াছিল বলিয়াই কি অপরাজিতা মরিয়া গিয়াছে?

জ্যোতির্ময় ধীরে ধীরে তাকে ছাড়াইয়া পাশে বসাইয়া দেয়। বলে, 'এ রকম করে না, ছিঃ! উতলা হতে নেই, মরতে বললে কি মানুষ মরে রে পাগলী? আর তুই তো শুধু মুখে বলেছিলি মনে মনে তো চাইছিলি তোর বৌদি বাঁচুক। কত মা পর্যন্ত কতবার রাগ করে ছেলেমেয়েকে মরতে বলে, মরতে বললেই যদি কেউ মরত—'

মনে হয় জ্যোতির্ময় যেন বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছে। হঠাৎ থামিয়া গিয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে সে বলিল, 'ইস গালটা যে তোর ফুলে গিয়েছে সুবর্ণ! খুব লেগেছিল না? সেই শাড়িটা তোকে কিনে দেব সুবর্ণ।'

কয়েকদিন আগে স্কুলে যাওয়ার জন্য নতুন ফ্যাশানের একটা শাড়ি চাহিয়া সুবর্ণ জ্যোতির্ময়ের ধমক খাইয়াছিল, এদিকে খরচ চলে না, নিত্য নতুন ফ্যাশানের শাড়ি! সেদিন সুবর্ণ ভাবিয়াছিল যে, হুঁ, বৌদিকে তো খুব কিনে দিতে পার, আমায় দেবার বেলাই তোমার খরচ চলে না। গালে চড় মারার ক্ষতিপূরণস্বরূপ জ্যোতির্ময় সেই শাড়িখানা কিনিয়া দিবে শুনিয়া হঠাৎ তার মনে পড়িয়া গেল, অপরাজিতার রাশি রাশি শাড়ি সমস্তই এবার সে পাইবে। মনে পড়ায় সুবর্ণ ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অপরাজিতার শোকে নন্দর কাঁদিবার কথা নয়, মুখখানা ম্লান ও গম্ভীর করিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইত, সুবর্ণকে আকুল হইয়া কাঁদিতে দেখিয়া সেও চোখ মুছিতে লাগিল।

তখন দেখা গেল, জ্যোতির্ময়ের চোখ দিয়াও জল পড়িতেছে। কান্না বোধ হয় ছোঁয়াচে।

ছয়

পাড়ায় চার-পাঁচটি নতুন বাড়ি তৈরি হইতেছে। সহরতলীর পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে কয়েক বছর আগে, দিন দিন পরিবর্তন যেন দ্রুততর হইয়া উঠিতেছে। সহরের লোক সহর ছাড়িয়া সহরতলীতে বাস করিতে আসিতেছে। একি একটা নতুন ফ্যাশন? ভবানীপুর কালীঘাটের মত যেখানে ধনঞ্জয়ের মতে এককালে দিন-দুপুরে শিয়াল ডাকিত, এই সহরতলীকেও সহর ক্রমে ক্রমে গ্রাস করিয়া ফেলিবে? দশ-বার বছর আগে এ অঞ্চল কি ছিল, এখন কি দাঁড়াইয়াছে, ভাবিলে যশোদা অবাক হইয়া যায়। কাছাকাছি যে প্রকাণ্ড একটা সহর আছে,

তখন তাই-বা কে ভাবিতে পারিত? ছড়ানো বাড়ি-ঘর মেটে পথ, ডোবা-পুকুর, বাঁশ-ঝাড় এসব কিছুরই অভাব তখন ছিল না। সত্যপ্রিয়র বাগানবাড়িটা ছিল প্রায় জঙ্গল. বাগানবাড়ির দক্ষিণদিকে কয়েক ঘর গরীব মুসলমানের একটি বস্তি ছিল বছর তিনেক আগে, তারা যে কোথায় উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে, আর জানা যায় না। বোধ হয়, সহরতলীর উত্তর দিকে যে নতুন মুসলমান পল্লীটি গড়িয়া উঠিয়াছে, সেইখানে গিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছে। এ পাড়ায় আগেকার সেই ভাঙ্গা ঘরের বাসিন্দা শ্রমিক শ্রেণীর গরীব মুসলমানদের বদলে এলোমেলো ভাবে কয়েকটি পাকা বাড়িতে কয়েক ঘর ভদ্র মুসলমান পরিবার আসিয়াছে, এরা সকলেই চাকুরিজীবী। পরিষ্কার বেশভূষা করিয়া পরিশ্রমের অভাবে বেঢপ শরীর লইয়া নটা-দশটার সময় প্রত্যেক দিন এদের ট্রামের উদ্দেশ্যে ব্যস্ত হইয়া ছুটিতে দেখিলে সেই অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর মুসলমান পরিবার কয়েকটির জন্য যশোদার কষ্ট হয়।

তবে সহরতলীর ধীরে ধীরে সহরে পরিণত হওয়ার বিরুদ্ধে যশোদার কোন নালিশ নাই, —যদি তার মনের মত সহরে পরিণত হয়। এ বিষয়ে বড় আশ্চর্য ও নিখুঁত কল্পনা আছে যশোদার, তার এই পাড়াকে কেন্দ্র করিয়া এই সহরতলীকে সে বড় সহরটির সঙ্গে সংলগ্ন একটি সুবিন্যস্ত, পরিচ্ছন্ন, সুশ্রী নগররূপে কল্পনা করিতে পারে। সে নগরে পল্লীর সবুজ রূপের বাহুল্য নাই, নগরবাসীর জীবন পল্লীবাসীর জীবনের মত সহজ-সরলও নয়। পল্লীর সঙ্গে যশোদার যথেষ্ট পরিচয় আছে, কিন্তু পল্লীর রূপ তার চোখে পড়ে না, ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল, পচা জলের ডোবা-পুকুর, নোংরা পথঘাট, জীর্ণ ঘরবাড়ি-ক্ষেত-খামারের মন-ভুলানো, চোখ-জুড়ানো শ্রী তার মানস-নয়নে পর্যন্ত অতি বিশ্রী ঠেকে এবং ঘষা পড়ার অভাবে পল্লীবাসীর বুদ্ধিটা একটু ভোঁতা বলিয়াই সহরবাসীর চেয়ে তাদের সরলতা কেন বেশী হইবে যশোদা বুঝিতে পারে না, সঙ্কীর্ণ জগতে একঘেয়ে অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে বলিয়া জীবনটাই বা তাদের সহরবাসীর চেয়ে সহজ হইবে কেন তা যশোদা বুঝিতে পারে না, —পল্লীবাসীরা তো কম গরীব নয়? যশোদার কল্পনার নগর তাই সহররূপী গ্রাম নয়, সহরই বটে। নগরের পথে ট্রাম চলে, পথের দু'পাশে পাঁচ সাততলা বাড়ি থাকে, সিনেমা থাকে, পার্ক থাকে, গলি থাকে, হাজার হাজার মানুষ থাকে, অনেক কিছুই থাকে সহরের। কেবল সেই সঙ্গে সঙ্গে থাকে সামঞ্জস্য, বড় বাড়ির আড়ালে ছোট বাড়ির ফাঁপর লাগে না, গলি ঘুঁজির গোলক ধাঁধা থাকে না, নাকেও লাগে গায়েও ন্যাপটাইয়া যায় এমন ভাপ্সা দুর্গন্ধ কোন গলিতে কোন বাড়িতে পাওয়া যায় না, আর—

আর, সত্যপ্রিয় অবশ্য মোটরে চড়িয়াই বেড়ায় যশোদার নগরে, কিন্তু যশোদা যে কুলী মজুরদের সঙ্গে ঘর করে, তারা পেট ভরিয়া খাইতে পায়, পরিষ্কার জামা-কাপড় পরিতে পায়, দরকার মত স্ত্রী পায়, জীবনটা উপভোগ করাব মত অবসর পায়, —আর? আর কি পায়? মনে মনেও তার আদরের হতভাগাগুলোকে পাওয়াইয়া দেওয়ার ব্যাপারে যশোদা তেমন পটু নয়! কত কিছু কাম্য আছে মানুষের, কত কিছু পাইতে পারে মানুষ, কত কিছু পাইয়াছে মানুষ, কিন্তু এদের দেওয়ার সময় যশোদা যেন সে সমস্তের হদিস পায় না, এদের যেন ধন মান স্বাস্থ্য সুখ তেজ শক্তি জ্ঞান বুদ্ধি রূপ যশ এ সমস্তের সত্যই দাবী থাকিতে নাই! কিন্তু এদের পেটের জ্বালা, রোগ শোক দুঃখ গ্লানি অভাব অভিযোগ মনোবিকার এ সমস্ত ম্যাজিকের মত দূর করিয়া দিবার ক্ষমতা যশোদার কল্পনার আশ্চর্য রকম আছে। এদের দুর্দশা দেখিতে দেখিতে কল্পনা বোধ হয় তার হইয়া গিয়াছে ভোঁতা, তাই অসম্ভব স্বপ্ন দেখিতে পারে না, ভিখারীকে রাজা হওয়ার আশীর্বাদ করিতে যে কেউ তাকে বারণ করে নাই এটা

ভুলিয়া গিয়া শুধু বলিতে পারে, আহা, খোঁড়া পা নিয়ে তুমি এত কষ্ট পাচ্ছ, তোমার কষ্ট কমুক, তোমার দুঃখ দূর হোক।

খোঁড়া ধনঞ্জয়ের কাঠের পা আসিয়াছে। পাড়ায় চাঁদা তুলিয়া আর নিজে কয়েকটা টাকা দিয়া যশোদাই তাকে কৃত্রিম পা'টি কিনিয়া দিয়াছে। যশোদার শত্রু আর ছেলেবেলার সখী কুমুদিনী চার আনা চাঁদা দিয়া বলিয়াছে, 'আর কেন ভাই, এবার মায়া কাটিয়ে বিদেয় দে। লোকে যে নিন্দে করছে ভাই?'

'কেন নিন্দে করছে? কিসের নিন্দে?'

'কচি খুকিটি কিনা, বোঝ না কেন নিন্দে করছে, কিসের নিন্দে!'

যশোদার ন্যাকামিতে ক্ষুব্ধ হইয়া মুখ নাড়া দিলেও কুমুদিনী বুঝাইয়া বলে। বলে যে, মানুষটা যতদিন দু'পায়ে খাড়া ছিল, চেহারা যেমন হোক দশজনের একজন হইয়া বাড়িতে বাস করিত, লোকে হাসিতামাসা করিলেও তেমন কিছু বলিত না—হয়তো ভাবিতও না। কিন্তু এখন পা কাটা যাওয়ার পরেও যশোদা যদি তাকে ঘরে রাখিয়া পোষে, সকলকে অবহেলা করিয়া কেবল তাকে নিয়াই দিনরাত মাতিয়া থাকে, কাঠের পা কিনিয়া দিবার জন্য সকলের কাছে চাঁদা পর্যন্ত আদায় করিতে শুরু করে—

যশোদা ফোঁস করিয়া ওঠে, 'কেন, সেবারে গগ্‌নার পা কাটা গেলে ঘরে রেখে পুষিনি তাকে? কাঠের পা কিনে দিইনি চাঁদা তুলে?'

কুমুদিনী বিজ্ঞের মত বলে, 'সে হল আলাদা কথা।' তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলে, 'যাক্‌গে ভাই যা খুশি করগে ভাই তুই, কলঙ্কে আর ডর কি তোর, বোঝার ওপর শাকের আঁটি বৈ ত নয়। ছেলেবেলা সই পাতিয়েছি, তাইতে বলা, নয় তো আমার কি এলো গেলো।'

সামনাসামনি এমনভাবে কথা কুমুদিনী সচরাচর বলে না। চার আনা চাঁদা দিতে হওয়ায় গায়ে এত জ্বালা ধরিয়াছে না কি তার? কে জানে, হয়তো ধনঞ্জয় আর তাকে নিয়া সত্য সত্যই খুব একচোট আলোচনা, গবেষণা আর নিন্দা চলিতেছে।

তারপর যশোদার কানে আসে, এ কাজে সুধীরের উৎসাহই নাকি সকলের চেয়ে বেশি, সত্য মিথ্যা কত কথাই যে সে রটাইয়া বেড়াইতেছে! এখনও সুধীরের ক্ষোভ থাকিবার কোন কারণ যশোদা ভাবিয়া পায় না। কালোকে নিয়া সে বরং এমন মশগুল হইয়া পড়িয়াছে যে দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, অল্পের জন্য যশোদার হাত হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য অদৃষ্টকে তার ধন্যবাদ দেওয়াই বেশি স্বাভাবিক। সুধীরের যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে,—গ্রীষ্মের তৃষ্ণাতুর পশুর একেবারে শ্রাবণের ধারা-জলে লুটোপুটি করার মত, —দেখিলে হাসিও পায় করুণাও হয়। ছায়ার মত যে যশোদার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত, উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে যশোদার চলাফেরা লক্ষ্য করিত, মুখ দেখিলে মনে হইত এই বুঝি সর্বনাশ ঘটিল, বহুদিনের উপবাসী বাঘের মত এই বুঝি সে ঝাঁপাইয়া পড়ে হুঙ্কার দিয়া যশোদার ঘাড়ে— সেই সুধীর এখন যশোদার ধারে কাছে ভিড়িতে চায় না, কেবলি এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করে, সামনে পড়িলে এদিক ওদিক তাকায় আর কখনো কখনো বোকার মত একটু হাসে, আরও বেশি বোকার মত জিজ্ঞাসা করে, 'কি খবর চাঁদের মা?' চাল-চলন বদলাইয়া গিয়াছে সুধীরের, মেজাজ নরম হইয়াছে, শুকনো বাকলের মত রুক্ষ কঠিন মুখের চামড়ার ভিতর হইতে একটা কোমল আস্তরণের হদিসও যেন পাওয়া যাইতেছে না? একটি কালো সোনার কাঠির ছোঁয়াচে মানুষটার মধ্যে যেন পলকে পলকে পরিবর্তনের ভেলকি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

'নিন্দে করে নাকি বেড়াচ্ছ তুমি আমার?'

সুধীর জবাব দেবার আগেই কালো তাড়াতাড়ি বলে, 'না দিদি না, মিথ্যে লাগিয়েছে তোমার কাছে মানষে।'

যশোদা চোখ পাকাইয়া বলে, 'তুই চুপ কর ছুঁড়ি, তোকে বলিনি আমি। কেঁউ কেঁউ করতিস দু'দিন আগে কুকুর বাচ্চার মত, বড় মুখ ফুটেছে, না?'

সুধীর ক্ষুব্ধ হইয়া বলে, 'গাল দিও না চাঁদের মা।'

কতবার কত কারণে রাগ করিয়াছে যশোদা, এমন কালো মেঘের ছায়া কে কবে তার মুখে ঘনাইয়া আসিতে দেখিয়াছে?—'গাল দেব না?—গাল দিতে বারণ করলে? কথা কইলে যদি না সয়, যাও না চলে এখান থেকে? কে মাথার দিব্যি দিয়েছে থাকতে? পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে গট্‌গট্ করে বেরিয়ে যাও দু'জনে।'

বলিয়া যশোদা নিজেই গট্‌গট্ করিয়া বাহির হইয়া যায়, পরক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে বলে, 'আজ পর্যন্ত একটি পয়সা দিলে না, এমনি করে তো দেনা শোধ হবে না সুধীর। আজকে ভাড়া চুকিয়ে দিও, ও মাসের আর পাঁচটি টাকা দিও দেনার জন্যে। আচ্ছা, পাঁচটা না পার, তিনটে টাকাই দিও।'

তারপর যশোদার রাগটা কমিবার সময় দিয়া রাত্রে কালোকে সুধীর তার কাছে কাঁদাকাটা করিতে পাঠাইয়া দেয়। সুধীর নয়, অনেকেই তার নিন্দা করিতেছে এ খবরটা আবিষ্কার করিয়া যশোদার রাগটা কমিয়া আসায় কালোকে সে বলিয়া দেয় যে, আচ্ছা যা, মাইনে পেলে দিতে বলিস।

এতদিন ধনঞ্জয়কে যশোদা ঘরে ভাত দিয়া আসিয়াছে, আজ বাহিরে আসিয়া, সকলের সঙ্গে বসিয়া খাইবার ডাক পড়িল।

'উঠতে পারি না যে চাঁদের মা?'

'খুব পারবে। চেষ্টাই করে দ্যাখো পার কি না।'

'বড় লাগে চাঁদের মা।'

'পেরথম পেরথম লাগবে না? তাই বলে শুয়ে বসে দিন কাটালে চলবে নাকি, অভ্যাস করতে হবে না চলা ফেরার?'

'উঠলে যে মাথা ঘোরায় চাঁদের মা?'

'পেরথম পেরথম মাথা একটু ঘোরায়।'

আজ যশোদার প্রথম খেয়াল হয় ধনঞ্জয় সত্য সত্যই বড় বেশি আহ্লাদে হইয়া পড়িয়াছে, আদুরে ছেলের মত তার ঘেনঘেনানির অন্ত নাই। নিজের দুরদৃষ্টের কথা ছাড়া মুখে তার কথা শোনা যায় না, পা কাটা যাওয়ার যন্ত্রণায় সে যত না কাতরাইয়াছিল এখন পায়ের ঘা শুকাইয়া আসিবার পর নিজের পোড়া কপালের নিন্দা করিয়া সে যেন তার চেয়ে বেশি কাতরায়। তার কথা বলার ভঙ্গিতে যেন ভিক্ষুকের সকরুণ আবেদন-নিবেদনের ধ্বনি শোনা যায়। এত যে আরামে যশোদা তাকে রাখিয়াছে, এত সেবা যত্ন করিতেছে প্রাণপাত করিয়া, কাছে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার এক ঘেয়ে নালিশ শুনিয়াছে আর আশা ভরসার কথা শুনাইয়াছে, কিছুতেই ধনঞ্জয়ের তৃপ্তি হয় নাই, সহানুভূতির উগ্র পিপাসা কমে নাই। নিজের দুঃখের কথা বলিতে বলিতে সে অহোরাত্রি কাঁদিতে চায়, সেই সঙ্গে কাঁদাইতে চায় পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে। যশোদার কাছে তার যে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এ কথাটিও সে যেন ধীরে ধীরে ভুলিয়া গিয়াছে, যশোদার কাছে এ সব যেন তার পাওনা ছিল। পা কাটিয়া পঙ্গু হওয়ার

জন্য তার এই দাবী জন্মিয়াছে।

ধনঞ্জয় মুখ ভার করিয়া পায়ে কাঠের পা'টি আঁটিতে যায়, যশোদা বলে, 'শুয়ে থেকে থেকে মাথাও কি খারাপ হয়ে গেছে তোমার? এখান থেকে ওখানে গিয়ে খেতে বসবে, ওটা আঁটছে যে?'

ধনঞ্জয় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলে, 'আর পারি না চাঁদের মা, সত্যি বলছি আর পারি না আমি। আমি কেন মরলাম না চাঁদের মা?'

'হয়েছে, এসো এবার।'—নির্বিকারভাবে এই কথা বলিয়া যশোদা আরো বেশি নির্বিকারভাবে চলিয়া যায়। আর প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না মানুষটাকে, এবার হইতে একটু শক্ত হইতে হইবে।

পরদিন সকালে কাশীবাবু আসিয়া হাজির। —'কেমন আছ চাঁদের মা?'

রাস্তায় ঘষিয়া মুখের যেখানে যেখানে চামড়া তুলিয়া দিয়াছিল যশোদা, সেই জায়গাগুলি এখনও সাদাটে হইয়া আছে। মুখখানা কিন্তু হাসি হাসি। পরমাত্মীয় যেন দেখা করিতে আসিয়াছে।

'বসুন। আপনি ভাল তো?'

অনেকক্ষণ বসিয়া কাশীবাবু আজে বাজে গল্প করে, শ্রমিকদের কথা বলে, মিল পরিচালনার কথা বলে—সব অর্থহীন ভাসা ভাসা কথা। এ বাড়ির বাসিন্দা তাবই মিলের শ্রমিকেরা যশোদার বাড়িতে রোয়াকে বসিয়া যশোদার সঙ্গে তাদের ম্যানেজারবাবুকে আলাপ করিতে দেখিয়া একটু অবাক হইয়া যায়,—ভাবে যে, এতদিনে বুঝি সত্য সত্যই তাদের দাবীগুলি সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা হইবে, কাশীবাবু ওই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্যই আসিয়াছে। কাশীবাবু কিন্তু সে আলোচনার ধার দিয়াও যায় না, যশোদা নিজে কথাটা তুলিলে আশ্বাস দিয়া শুধু বলে যে, সত্যপ্রিয় নিজে খোঁজ খবর নিতেছেন, প্রায়ই মিলে আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া যান যথাসময়ে তিনিই সব ব্যবস্থা করিবেন।

ভাসা ভাসাভাবে একটা খবর যশোদার কানে আসিয়াছিল, সত্যপ্রিয় নাকি গভর্নমেণ্টের বড় একটা কণ্ট্রাক্ট পাইয়াছে অথবা শীঘ্রই পাইবে, মিল বড় করা হইবে, উৎপাদন দু'গুণ তিনগুণ বাড়াইয়া ফেলা হইবে। জিজ্ঞাসা করিতে কাশীবাবু একটু থতমত খাইয়া গেল— 'কই না, আমি তো কিছু জানি না? কত গুজব বাজারে রটে।'

একেবারে বিদায় নেওয়ার আগে যশোদার বাড়িতে আসিবার আসল কারণটি কাশীবাবু ব্যক্ত করে। সত্যপ্রিয় তাকে পাঠাইয়া দিয়াছে— অনুতপ্ত ও লজ্জিত সত্যপ্রিয়। সত্যপ্রিয়র মিলে একটি চাকরি খালি আছে, ভাল চাকরি, ষাট টাকা বেতন। নন্দকে এই চাকরিতে ভর্তি করিয়া নেওয়ার জন্য কাশীবাবুর উপর হুকুম আসিয়াছে।

—'কি চোখেই যে চক্কোত্তিমশাই তোমায় দেখেছেন চাঁদের মা। কপাল তোমার ভালো।'

যশোদা উদাসভাবে বলিল, 'কি জানি কপাল ভাল কি মন্দ!'

সত্যপ্রিয়র এ উদারতায় যশোদা একটুও মুগ্ধ হইয়া যায় না। মনটা বরং তার খারাপ হইয়া যায়। ধীরে সুস্থে নন্দকে আগের চাকরিটির মত সাধারণ একটি চাকরি দিলে কোন কথা ছিল না, পঁচিশ টাকার বদলে না হয় বেতনটা এবার ত্রিশ টাকাই হইত। কিন্তু অনুগ্রহের এ-রকম বাড়াবাড়ির একটিমাত্র অর্থ হয়—শ্রমিকদের দাবী মেটানো সম্বন্ধে সত্যপ্রিয় যে কথা দিয়াছিল, সেটা পালন করিবার ইচ্ছা তার নাই। তাই ভাইকে মোটা মাহিনার চাকরি দিয়া

যশোদাকে সে বাঁধিয়া রাখিতে চায়। শ্রমিকদের সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি পালনের সময় পার হইয়া গেলেও যশোদা যাতে গোলমাল না করিয়া চুপ করিয়া থাকে। যশোদার কথায় শ্রমিকেরা ধর্মঘট বন্ধ করিয়াছিল, যশোদা চুপ করিয়া থাকিলে তারাও চুপ করিয়া থাকিবে।

এখন সমস্যা হইল, নন্দকে সে চাকরি করিতে যাইতে দিবে কি না। দু'তিন মাসের বেশি চাকরি নন্দর থাকিবে না, ধর্মঘটের উপক্রম হইলেই আবার তার চাকরিটি খসিয়া যাইবে এবং নন্দর চাকরির খাতিরে ধর্মঘট যশোদা বন্ধ রাখিবে না, স্থগিতও করিবে না, সত্যপ্রিয় যদি কথা না রাখে এবার ধর্মঘট ঘটাইয়া যশোদা এস্‌পার ওস্‌পার একটা কিছু করিয়া তবে ক্ষান্ত হইবে। কিন্তু সত্য সত্যই কি সত্যপ্রিয় মতলব আঁটিয়াছে যশোদাকে হাত করিয়া শ্রমিকদের একেবারে ফাঁকি দিবে? নন্দকে চাকরি করিতে না পাঠাইয়া সত্যপ্রিয়কে চটাইয়া দেওয়া কি সঙ্গত হইবে?

রাত্রে নন্দকে সে জিজ্ঞাসা করে, 'চাকরি করবি নন্দ? নাই বা করলি!'

নন্দ জোর দিয়া বলে, 'না, চাকরি করব। চাকরি ছাড়া আমার চলবে না।'

'কেন চলবে না? দু'তিন মাস পরে আবার তো খেদিয়ে দেবে তোকে—কি এমন রাজা হবি তুই দু'তিন মাস চাকরি করে!'

নন্দ আবার জোর দিয়া বলে, 'খেদিয়ে দেবে কেন? এবার আর খেদিয়ে দেবে না।'

শুনিয়া সন্দিগ্ধভাবে যশোদা জিজ্ঞাসা করে, 'কি করে জানলি তুই?'

'চক্কোত্তিমশাই নিজে বলেছে।'

শুনিয়া আরও বেশি সন্দিগ্ধ হইয়া যশোদা জিজ্ঞাসা করে, 'তুই বুঝি চাকরির জন্যে চক্কোত্তিমশায়ের কাছে গেছিলি নন্দ?'

নন্দ সাড়া দেয় না। রাগে দুঃখে অভিমানে যশোদাও অনেকক্ষণ গুম্ খাইয়া থাকে। অন্ধকার ঘরের দুইপ্রান্তের দু'টি চৌকীতে ভাই-বোনের অস্বাভাবিক নীরবতা অন্ধকারকে যেন কুৎসিত করিয়া দেয়, সরু গলিটার মধ্যেই কেবল যে ভ্যাপ্‌সা গন্ধ চিরস্থায়ী হইয়া আছে, ঘরের মধ্যেও হঠাৎ যেন সেই গন্ধের হদিস্ মেলে—অন্তত তাই মনে হয় যশোদার।

'আমায় একবার বলতেও পারলি না নন্দ? তুই কি কচি খোকা যে, আমি আটকে রাখতাম?'

'চাকরি ছাড়া আমার চলবে না দিদি।'

একটা রহস্যময় ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে দু'জনের মধ্যে। যশোদা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে, জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু জানা যাইবে না, এতকাল পরে নন্দর জীবনে এমন একটা গোপন কিছুর আমদানী হইয়াছে নন্দর যা নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পদ, দিদিকে সে ভাগ দিতে পারিবে না। তাকে ডিঙ্গাইয়া সত্যপ্রিয়ের কাছে চাকরি ভিক্ষা করিতে যাওয়া শুধু চাকরির লোভে নয়—এতক্ষণে নন্দ তাহা হইলে কাঁদ-কাঁদ হইয়া কথা বলিত, এমন তেজের সঙ্গে ঘোষণা করিতে পারিত না যে চাকরি ছাড়া তার চলিবে না, তাই সে চাকরী সংগ্রহ করিয়াছে, যশোদাকে জিজ্ঞাসা করা দরকার মনে করে নাই।

তবু যশোদা জেরা করে। তবু সে জানিতে চায়, চাকরি এত দরকার তার কেন হইল। নন্দ যে কৈফিয়ৎ দেয় তাতে যশোদা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যায়। তার ভাই নন্দ, তার নিজের হাতে মানুষ করা রুগ্ন আর ভাবপ্রবণ অপদার্থ নন্দ, সে কিনা আজ তাকে শোনায় যে, বসিয়া বসিয়া দিন কাটাইলে তো চলিবে না, জীবনে একটু উন্নতির চেষ্টা তো করিতে হইবে তাকে? বুড়া মানুষের মত এই সব কথা বলিয়া আসল কথাটা গোপন করিয়া রাখে

তার কাছে!

বিষাদের স্বাদ যশোদা প্রায় জানেই না, বিষাদ যদি কখনও ঘনাইয়া আসে তার বাহন হয় চাঁদের জন্য শোক। তা খুব বেশি প্রশ্রয় পায় না যশোদার কাছে, পুত্রশোকে কাতর হওয়ার অবসরই বা তার কই? আজ চাঁদের কথা মনেও পড়ে না, তবু গাঢ় বিষাদে তার যেন ঝিম ধরিয়া যায়, ঘুমের বদলে দু'চোখ ভরিয়া আসে, চোখের পাতা খানিকক্ষণ খুলিয়া রাখা, আর খানিকক্ষণ বন্ধ করার উত্তেজিত অবসাদ। আর হ্যাঁ, আজ নিজেকে তার অসহায় মনে হয়, মনে হয় জীবনটা তার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে,—এত কাল কেন বাঁচিয়াছিল যশোদা, ভবিষ্যতে কেন বাঁচিবে?

সকালে নিজেকে একটু অসুস্থ মনে হয়। তবে রাত্রের অনুভূতিগুলি রাত্রেই বিদায় হইয়া গিয়াছে। বিষাদও নাই, নিজেকে অসহায় মনে করাও নাই, জীবনের ব্যর্থতা বা সার্থকতা নিয়া মাথা ঘামানোও নাই। নন্দকে চাকরি দেওয়ার ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝিয়া আসিবার জন্য সোজাসুজি সে গিয়া সত্যপ্রিয়র সঙ্গে দেখা করে।

সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে, 'ষাট টাকা মাইনের চাকরি করবার যুগ্যি ছেলে তো আমার ভাই নয় চক্কোত্তিমশায়, ওকে যে নিচ্ছেন, ও কি পারবে?'

সত্যপ্রিয় মৃদু হাসিয়া বলে, 'তুমি একেবারে চমকে গেছ দেখছি। ভাবছ, কি জানি কি মতলব আছে লোকটার, যেচে এমন একটা চাকরি দেয় কেন ভাইকে। ভাবছ তো? মতলব একটা আছে বৈকি। মিলে নন্দর চাকরী নামমাত্র, আসলে ও চাকরি করবে আমার। বড় সুন্দর কীর্তন করে তোমার ভাই, সেদিন শুনে সবাই প্রশংসা করেছে। মাঝে মাঝে আমার এখানে কীর্তন করবে, এইজন্য ওকে চাকরি দিয়েছি। নিজের পকেট থেকে মাইনে গুণতে হত, তার বদলে মিল থেকে যাতে মাইনেটা পায় আর আমারও কীর্তন শোনা হয়, সেই রকম একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছি।'

যশোদা আশ্চর্য হইয়া বলে, 'কিন্তু মিলও তো আপনার?'

সত্যপ্রিয় তেমনিভাবে মৃদু মৃদু হাসে, 'মিল আমার বটে, কিন্তু মিলের টাকা আলাদা, আমার টাকা আলাদা! কপালের কথা বলো কেন, এতগুলি ব্যবসা আমার, কোন একটা ব্যবসা থেকে পাঁচটি টাকা নিজের জন্য চাইতে পারি না!'—যশোদার মুখ দেখিয়া আবার বলে, 'ওসব বড় গোলমেলে ব্যাপারের কথা, ওসব তুমি বুঝবে না। কোন ব্যবসার শেয়ার-হোল্ডার আছে, কোন ব্যবসার স্লিপিং পার্টনার আছে, কোন ব্যবসায় আমি শুধু ম্যানেজিং এজেন্ট—তাছাড়া, আসল ব্যাপারটি কি জান, লাভ হলে লাভটি নেব, লোকসান হলে আমার গায়ে লাগবে না, এই হল ব্যবসার মূল কথা। কত প্যাঁচ কষতে হয়, কত নিয়ম করতে হয় তার ঠিকানা আছে! নিজে নিয়ম করে নিজে তো ভাঙতে পারি না? আমিই সব, আমারি সব— তবু আমি কেউ নই, আমার কিছুই নয়। বছর বছর ব্যাঙ্কের টাকা যে আমার কি করে হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে, নিজেই ভাল বুঝতে পারি না। এইখানে বোসো তুমি, একটা কাগজে সই করে দিচ্ছি, এক ঘণ্টার মধ্যে লাখ টাকা এসে হাজির হবে তোমার সামনে।'....

বলিতে বলিতে সত্যপ্রিয় রীতিমত উৎসাহিত হইয়া ওঠে, বোঝা যায় টাকার কথা বলিতে তার মজা লাগিতেছে। জীবনে একটি কাজ সে করিয়াছে জীবন দিয়া, এও একটা সাধনা বৈকি। কিন্তু এ সাধনার ফাঁকি যশোদা জানে, একটা সীমায় ঠেকিবার পর এ সাধনা একঘেয়ে হইয়া যায়, সেইখানে সাধনার সমাপ্তি, তারপর কেবল জের টানিয়া চলা। সত্যপ্রিয় এখন তাই করিতেছে। ব্যাঙ্কে টাকা জমানো আর খোলামকুচি জমানোর মধ্যে আর বিশেষ কোন

পার্থক্য এখন নাই। যত বড় পেটুক হোক, কত আর খাইতে পারে মানুষ?—এইভাবে কথাটা যশোদা বিচার করে। বড়লোকের দান সম্বন্ধেও তার তাই বিশেষ কোন শ্রদ্ধা নাই। কোটিপতিরা লাখ টাকার হাসপাতাল স্থাপন না করিলেই বরং সে একটু আশ্চর্য হয়, যেমন আশ্চর্য হয় ময়রার দোকানের পেটুক মালিক যদি অমাবস্যার নিশিপালন না করে।

যশোদাকে অভিভূত হইতে না দেখিয়া সত্যপ্রিয় একটু ক্ষুণ্ণ হয়। নন্দকে চাকরি দিবার কারণটা জানিয়া যশোদা অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরিয়া যায়।

পরদিন কাশীবাবু আবার আসে, আবার বসিয়া বসিয়া গল্প করে, যাওয়ার সময় নন্দকে একেবারে সঙ্গে নিয়া যায়। এবার নন্দ একেবারে চাকরির দলিল নিয়া বাড়ি ফেরে, একমাসের নোটিশ না দিয়া কার ক্ষমতা আছে নন্দকে এবার বরখাস্ত করে? করিলে, একটি মাসের বেতন মাগ্‌না দিতে হইবে, চালাকি নয় নন্দর সঙ্গে!

'কি করতে হবে তোকে?'

'কিছু না দিদি, কাশীবাবুর ঘরে একটা চেয়ারে বসে থাকব আর কাশীবাবু যা বলবেন করব। আজকে শুধু সঙ্গে করে মিলটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলেন। কাল থেকে কাজ আরম্ভ।'

পরদিন নন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, সারাদিনে সে ঘণ্টাখানেক খাতা লিখিয়াছে, দু'বার কাশীবাবুর হুকুমে মিলটা ঘুরিয়া আসিয়াছে, আর একবার গিয়া একটি লোককে কাশীবাবুর কাছে ডাকিয়া আনিয়াছে। বাপ-মা তুলিয়া গালাগালি দিয়া কাশীবাবু লোকটিকে দিয়াছে তাড়াইয়া।

যশোদা বলিল, 'এ আবার কেমন ধারা চাকরি রে বাবা!'

রাত্রে বিতাড়িত লোকটি যশোদার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। তার নাম ভুবন, ধর্মঘটে সে একজন পাণ্ডা ছিল। আসিয়াই সে বলিল, 'বেশ দিদি, বেশ! ভাইকে দিয়ে শেষকালে আমারি ঘাড ভাঙলে?'

'কি বলছ তুমি ভুবন?'

'যেন জান না কিছু, ন্যাকা ঠাকরুণ! আমিও এর শোধ তুলব, সর্বনাশ যদি না করি তোমার আমি—,' গট্ গট্ করিয়া ভুবন চলিয়া গেল। যশোদা ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। ভাবিল, নন্দকে দিয়া কাশীবাবু ডাকাইয়া আনায় বলিয়া সে বুঝি রাগ করিয়াছে। ব্যাপারটা কিন্তু তার মনের মধ্যে খচ খচ করিতে লাগিল। নন্দকে দিয়া কাশীবাবু ডাকাইয়া আনে কেন ভুবনকে? ভুবনকে ডাকিবার লোকের কি তার অভাব ঘটিয়াছিল?

এদিকে সত্যপ্রিয়র মিলে চাকরি যাওয়ার যেন মরশুম পড়িয়া গেল। একদিন যায়, দু'দিন যায়, নন্দ আসিয়া খবর দেয়, সেদিনও সে ভুবনের মত একজনকে ডাকিয়া আনিয়াছিল, কাশীবাবু গালাগালি দিয়া তাকে ছাড়াইয়া দিয়াছেন।

'ব্যাপারটা কি মতি?'

মতি ভয়ে ভয়ে বলিল, 'তাতো জানি না চাঁদের মা।'

সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিতে সেও গম্ভীর মুখে বলিল, 'জানি না।'

যশোদা বলিল, 'তোমাদের কি হয়েছে বল তো? আমাকে যেন সবাই এড়িয়ে এড়িয়ে চলছ ক'দিন থেকে?'

'তোমার এখন কর্তাবাবু, কাশীবাবু, এনাদের সঙ্গে ভাব, আমরা কি তোমার সঙ্গে মিশতে সাহস পাই!'

যশোদা লম্বা করিয়া টানিয়া বলিল, 'ব—টে! বড় লম্বা চওড়া শিখছে দেখছি!'

সুধীর রাগিয়া বলিল, 'যাও যাও, কি আর খেতি করবে তুমি, না হয় কাজ থেকে তাড়াবে। গতর থাকলে ঢের কাজ পাব।'

'কাজ থেকে তাড়াব মানে?'

মানে সুধীর বলিল না, গুম হইয়া রহিল। কালোর মুখখানাও অন্ধকার, একদিন যে কালো সুধীরকে তাড়াতাড়ি হাজত হইতে ফিরাইয়া আনার জন্য যশোদার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়াছিল। একরকম যশোদাই তো সুধীরকে সত্যসত্যই শেষ পর্যন্ত হাজত হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল।

যার চেষ্টায় এখনও হাজতে পচার বদলে পরদিনই সুধীর আসিয়া কালোর মুখে হাসি ফুটাইয়াছিল, আজ তার দিকে কেমন ভাবে চাহিয়া আছে দ্যাখো মেয়েটা, যেন যশোদার মত শত্রু তার আর নাই! আপশোষ করিয়া কি হইবে, মেয়েমানুষ এমনি অকৃতজ্ঞই বটে।

কিন্তু কেবল কালো তো নয়? জগৎ আর মতিরই বা কি হইল?

দু'দিন পরে কাজ গেল জগতের, তার পরদিন মতির।

পায়ে পায়ে কাছে আসিয়া কালো বলিল, 'কাজ থেকে শেষ পর্যন্ত তাড়ালে দিদি? ধন্যি তুমি।'

'কি বলছিস তোরা কালো? ডাক তো জগৎকে আর সুধীরকে।' কিন্তু তারা কেউ আসিল না।

পরদিন মতি বলিল, 'তুমিই কাজ খসালে, এবার থেকে তুমিই তবে খেতে দিও চাঁদের মা!'

যশোদা বলিল, 'এসো তো মতি আমার সঙ্গে।'

মতিকে সঙ্গে করিয়া সে গেল জগতের ঘরে। জগৎ রাগিয়া আগুন হইয়া আছে। কেবল রাগ নয়, কি অবজ্ঞা সেই সঙ্গে—কথাই বলিবে না যশোদার সঙ্গে! অনেক বলিয়া অনেক বুঝাইয়া ব্যাপারটা যশোদা বুঝিতে পারিল। খুবই সহজ একটা চাল দিয়া যশোদাকে সত্যপ্রিয় কুপোকাৎ করিয়াছে। প্রথমে রটিয়াছে এই যে যশোদা ভিড়িয়াছে উপরওয়ালাদের সঙ্গে, যশোদা বিশ্বাসঘাতিনী। প্রমাণ? আগে একবার ধর্মঘট থামাইযাছিল কে সকলের ক্ষতি করিয়া? গতবার ধর্মঘট থামাইয়াছে কে সকলের ক্ষতি করিয়া? সত্যপ্রিয়র সঙ্গে, কাশীবাবুর সঙ্গে এত অন্তরঙ্গতা কিসের যশোদার, দু'বেলা সত্যপ্রিয়র মোটর চাপিয়া কেন সে সত্যপ্রিয়র বাড়ি নিমন্ত্রণ রাখিতে যায়? নন্দর মত একটা ছোঁড়া যে মিলে অমন চাকরি পাইল, এটা কিসের পুরস্কার? এক একটা ছুতা দিয়া একে একে ধর্মঘটের সাত আটজন পাণ্ডাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল এটা কার পরামর্শ?

'আমার পরামর্শ নাকি জগৎ, এ্যাঁ? আমি পরামর্শ দিয়েছি তোমাদের তাড়াবার?'

'কাশীবাবু নিজে বলেছেন।'

শুনিয়া খানিকক্ষণ যশোদা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর বলিল, 'পেটে পেটে এই মতলব ছিল ব্যাটার, তাই তিন মাস ধম্মোঘট বন্ধ রাখতে বলেছিল! সবাইকে ডাক দিকি একবার জগৎ, পিলেটা চমকে দিই হাড়-হাবাতে সত্যপ্রিয় আর কাশীবাবুর।'

কিন্তু কেউ আসিল না! আর কে বিশ্বাস করিবে যশোদাকে? কিছু লাভ হইয়াছে যশোদাকে বিশ্বাস করিয়া? বরং লোকসান হইয়াছে পুরামাত্রায়। যশোদা যদি খারাপ মানুষ নাও হয়, ধরা যাক তার কোনই দোষ নাই, কি দরকার তাকে টানাটানি করিয়া? সাবধান থাকাই ভাল।

শ্রমিক প্রতিষ্ঠান দু'টি হইতেও যশোদা সম্পর্কে সাবধান থাকিবার জন্য সকলকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যশোদা কে যে তার কথায় সকলে ধর্মঘট করিবে আর ধর্মঘট থামাইবে?

যশোদা নন্দকে বলিল, 'কাল থেকে কাজে যাস্ না নন্দ।'

শুনিয়া নন্দ মুষড়িয়া গেল। বড় আরামের চাকরি, ইতিমধ্যে সে পনের টাকা আগাম মাহিনা চাহিবামাত্র পাইয়া গিয়াছে!

দিশেহারা নন্দ পরামর্শ করিতে গেল সুর্বণের সঙ্গে। সুবর্ণ আঁতকাইয়া উঠিয়া বলিল, 'না না, কখ্খনো চাকরি ছেড়ো না তুমি। আমাদের কি উপায় হবে?'

চাকরি না ছাড়িলেও যে তাদের কি উপায় হওয়া সম্ভব নন্দ ভাবিয়া পায় না। তবে সুবর্ণই একদিন এক মিনিটের নোটিশে তাকে বগলদাবা করিয়া উধাও হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, সুবর্ণই আজ মত বদলাইয়া তাড়াতাড়ি জীবনে তার উন্নতি করাইয়া প্রচলিত প্রথায় তাকে বরণ করিতে চায়, সুতরাং নন্দর কিছু বলিবাব থাকিলেও বলিবার উপায় নাই। বলিতে ইচ্ছাও হয় না। অন্য কথা অবশ্য বলিতে ইচ্ছা হয় অনেক, আসরে শত শত মানুষের মধ্যে একা নন্দ একাকিনী সুবর্ণকে যে সব কথা হাসিয়া কাঁদিয়া বলে তার চেয়েও মৌলিক, তার চেয়েও রোমাঞ্চকর রাশি রাশি কথা। মনে হয়, সুবর্ণেরও যেন ওই রকম অনেক কিছু বক্তব্য আছে। তাই, নন্দও একরকম কিছুই বলে না, সুবর্ণও বলে না—জীবনমরণের সমস্যা নিয়া পরামর্শটা পর্যন্ত তাদের এমন সংক্ষিপ্ত হয় বলিবার নয়। শুনিলে অন্য লোকের মনে হওয়া আশ্চর্য নয় যে, কিশোর-কিশোরীর মাসিকপত্রে যে সব ধাঁধা থাকে দু'জনে বুঝি তারই উত্তর বাহির করিতেছে, একজন আরেকজনকে শুনাইতেছে এক একটি সঙ্কেত সূত্র।

সুবর্ণ হয়তো বলে, একশো যদি হ'ত—

নন্দ সায় দেয়। আচমকা তিনটি মোটে শব্দ সুবর্ণ উচ্চারণ করিয়াছে, কিন্তু দু'জনের কাছেই তার অর্থ পরিষ্কার। নন্দর যদি একশ' টাকা বেতন হইত আর নন্দ যদি জ্যোতির্ময়ের মত একটি বাড়ি করিয়া বাস করিত আর মেলামেশা করিত ভদ্রলোকের সঙ্গে অর্থাৎ সোজা কথায় নন্দ যদি জ্যোতির্ময়ের স্তরে ঠেলিয়া তুলিতে পারিত নিজেকে, তবে আর তাদের কোন ভাবনা ছিল না।

একটুক্ষণ চোখে চোখে চাহিয়া থাকিয়া সুবর্ণ হয়তো আবার বলে, দাদার চাকরি গেলেও—

এবারও নন্দ সায় দেয়। জ্যোতির্ময়ের যদি চাকরি যায় এবং আর সে চাকরি না পায় এবং ভয়ানক গরীব হইয়া যশোদার বাড়ির মতই একটা বাড়িতে কায়-ক্লেশে দিন কাটাইতে বাধ্য হয় অর্থাৎ সোজা কথায়, জ্যোতির্ময় যদি নন্দর স্তরে নামিয়া আসে, তাহা হইলেও তাদের কোন ভাবনা ছিল না।

আবার একটু চোখে চোখে চাহিয়া সুবর্ণ হয়তো আবার আরও নিচু গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া বলে, বৌদির কথা তুলে খুব খোঁচাচ্ছি, কিন্তু—

অপরাজিতার কথা তুলিয়া সুবর্ণ জ্যোতির্ময়কে খুব খোঁচাইতেছে, সে যাতে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া গরীব হইয়া যায়। কিন্তু অপরাজিতার স্মৃতির অস্ত্রেও সুবর্ণ তার মর্মভেদ করিতে পারিতেছে না, সমস্ত খোঁচানো ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

দু'জনে প্রায় একসঙ্গে নিশ্বাস ফেলে। নিশ্বাস ফেলিয়া নন্দ হয়তো বলে, যদি না হয়?

সুবর্ণ হয়তো জবাব দেয়, তাহ'লে তাই করব।

অর্থাৎ কিছুতেই যদি কিছু না হয়, তাহা হইলে অগত্যাই দু'জনে তারা হাত ধরাধরি করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবে। এমনিভাবে কথার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ আর মুখের ভাব আর দৃষ্টি বিনিময় দিয়া অনায়াসে তারা পরস্পরের মনের কথা বুঝিতে পারে, কি সৃষ্টি-ছাড়া মনের মিলটাই যে তাদের হইয়াছে! এই রকম আদান-প্রদানের নামই বোধ হয় ভালবাসার ভাষা, কে বলিবে!

যশোদার বারণ না মানিয়া নন্দ চাকরি করিতে যায় আর যশোদা সকলকে জিজ্ঞাসা করে, 'নন্দকে যদি আমি খেদিয়ে দিই, তবে তো তোমরা আমায় বিশ্বাস করবে?'

কিন্তু বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন এখন তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে, যশোদাকে তারা এড়াইয়া চলিতে চায়, যশোদার সঙ্গে মাখামাখি করিয়া বিপন্ন হইবে কে? বলাই নামে একজন শ্রমিক যেদিন বরখাস্ত হইয়াছিল, তার পরদিন সকালে উঠিয়াই ছোঁড়া কাপড়-জামা সতরঞ্চি কম্বল গুটাইয়া বিদায় হইয়া গেল যশোদার বাড়ি হইতে, শোনা গেল তাকে আবার কাজে নেওয়া হইয়াছে। তারপর সাতদিনের মধ্যে যশোদার বাড়ি খালি হইয়া গেল। যশোদার পাওনা গণ্ডা মিটাইয়া দিয়াই গেল সকলে, কাশীবাবু সকলকে দরকার মত আগাম টাকা দিয়াছে। যশোদাকে টাকা না দিয়া যাইতে পারিলে অবশ্য সকলে তাহাই করিত, কিন্তু যশোদাকে ফাঁকি দেওয়া বড কঠিন।

প্রথমে যশোদা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কি করছ তোমরা বুঝতে পারছ? সাধ করে ফাঁদে পা দিচ্ছ? যদ্দিন না মিলের দেনা শোধ হবে টুঁ শব্দটি করতে পারবে না তোমরা, যা বলবে যা করবে মুখটি বুজে মেনে নিতে হবে তোমাদের—বুঝতে পারছ?

বুঝিতে পারিতেছে সকলেই, কিন্তু উপায় কি?

কেবল সত্যপ্রিয়র মিলের নয়, অন্য মিলের যারা যশোদার বাড়িতে ছিল তারাও পলাইয়া গেল। উপর হইতে তাদের উপরেও চাপ পড়িয়াছে। এ বাড়িতে রহিল কেবল মতি আর ধনঞ্জয়, ও বাড়িতে সুধীর আর নদেরচাঁদ। সুধীরকেও চলিয়া যাওয়ার জন্য কালো ক্রমাগত খোঁচাইতেছিল, কিন্তু সে কাজ করে রেলের ইয়ার্ডে, যশোদার দেনা শোধ করিয়া যশোদাকে ত্যাগ করার জন্য কে তাকে আগাম টাকা দিবে? নদেরচাঁদের কাজ ছিল না, মিলে কাজ পাওয়ার সম্ভাবনাও তার নাই।

তিনটি উনানে যশোদার আঁচ পড়ে না। একটি উনান ধরানোর সময় তার মনে হয়, এতবড় উনান ধরাইয়া কি হইবে, মিছামিছি কয়লার অপচয়। ছোট একটি উনান তৈয়ারি করিতে হইবে। অন্য সময় প্রয়োজন হওয়া মাত্র ছোট উনান যশোদার প্রস্তুত হইয়া যাইত, এ রকম সামান্য কাজ ফেলিয়া রাখা যশোদার স্বভাব নয়, কিন্তু এবার ছোট উনানটি যশোদার মনের মধ্যেই জ্বলিতে থাকিল। রান্নাঘরে বড় বড় উনান তিনটির কাছে কাদামাটি দিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি বা উৎসাহ যেন তার নাই।

দ্বিতীয় পর্ব
এক

সহরতলীর রূপান্তর গ্রহণের প্রক্রিয়া দিন-দিন দ্রুততর হইয়া উঠে।

অদ্ভুত ব্যাপার কিছু নয়, তবু আশ্চর্য মনে হয়। মাটির বাসন যেন দেখিতে দেখিতে কৃত্রিম ধাতুতে দাঁড়াইয়া যাইতেছে আর চাকচিক্য বাড়িতেছে প্রতিদিন। কত এব্ড়ো-খেব্ড়ো রাস্তা নতুন পিচের আবরণে গা ঢাকিয়া ঝক্-ঝক্ করিতেছে, কত আঁকাবাঁকা সরু গলি চওড়া আর সিধা হইয়া যাইতেছে, কত অনামী পথের গায়ে আঁটা হইয়া যাইতেছে জমকালো নাম।

চারিদিকে বাড়ি উঠিতেছে অসংখ্য। ফাঁকে ফাঁকে ছড়ানো সেকেলে ধরনের সাদাসিদে একতলা দোতলা অনেক বাড়ি অদৃশ্য হইয়া সেখানে দেখা দিতেছে আধুনিক ফ্যাসানের বাড়ি—শুধু গঠনের মধ্যেই কত কায়দা। এ অঞ্চলে ছোট বড় সব বাড়িরই প্রায় আকার ছিল চারকোণা বাক্সের মত, এখন বাড়িগুলি হইয়াছে ইঁট-কাঠ-চুন-সুরকি-সিমেন্ট-লোহার জ্যামিতি। অস্বাভাবিক রূপলাবণ্যের অপ্রত্যাশিত আঘাতে বাড়িগুলি যেন দৃষ্টিকে পীড়া দেয়। শিল্পী ভাস্কর কি মিস্ত্রীর কাজ আরম্ভ করিয়াছে, তাই তাল সামলানো যাইতেছে না?

দোকানপাটের সংখ্যাও হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে, পুরানো দোকানের চেহারাও বদলাইয়া যাইতেছে। ছোট ছোট কত পুরানো দোকান যে উঠিয়া গেল!—ছোট অপরিচ্ছন্ন ঘরে এলোমেলো ভাবে জিনিস সাজাইয়া এতদিন যাদের কাছে মাল বিক্রি করা চলিত তাদের অনেকেই তো নাই, নতুন যারা আসিয়াছে তারা ছবির মত সাজানো দোকান চায়।

বড় রাস্তায় রাস্তার আলোর সংখ্যা আরো জোর বাড়িয়াছে বটে কিন্তু এখন দু'দিকের দোকানের আলোতেই রাস্তাটি এমন ঝলমল করে যে, রাস্তার আলো রাত বারোটা পর্যন্ত নিভাইয়া রাখিলেও চলে।

বাজারের সংস্কার হইয়াছে। এলোমেলোভাবে যেখানে সেখানে কেউ আর মাছতরকারি বেচিতে বসে না, সন্ধ্যার পর বাজারের অর্ধেকটা এখন আর আবছা অন্ধকারে ঢাকিয়া যায় না। দু'বেলা ধোয়া-মোছার ব্যবস্থা করিয়াও অবশ্য বাজারের নোংরামি আর দুর্গন্ধ এখনও দূর করা যায় নাই, কোনদিন যাইবেও না, তবু কুলীর দেহ ভদ্রলোকের দেহে পরিণত হওয়াব মত, বাজাবে পরিবর্তন যে হইয়াছে, তাতে সন্দেহ নাই।

দলে দলে যেসব নর-নারী আসিয়া এ অঞ্চলের নতুন ধরনের বাড়িগুলিতে নীড় বাঁধিতেছে, সহরতলীর পরিবর্তিত আবেষ্টনী সঙ্গে তাদের চাল-চলন বেশভূষা বেশ খাপ খায়। অনেকে বাস করিতে আসিয়াছে নিজের বাড়িতে, অনেকে আসিয়াছে ভাড়াটে হইয়া। জমির দাম এত বাড়িয়া গিয়াছে যে বড়লোক ছাড়া বাড়ি করিয়া এ-অঞ্চলে বাস করা সম্ভব নয়। প্রথমদিকে যারা জমি কিনিয়া বাড়ি করিয়াছিল অথবা তৈরি বাড়ি কিনিয়াছিল, তারা প্রায় অধিকাংশই না-বড়লোক ধরনের ধনী, বাড়ি করিতেই হয়ত অনেকের জীবনের সঞ্চয় ফুরাইয়া গিয়াছে। তবু এরাই প্রথমে এই সহরতলীকে ফ্যাশনেব্ল সহুরে রূপ দিয়াছে, এ অঞ্চলে বাস করার মর্যাদা ও সুবিধা বাড়াইয়াছে, আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছে। তারপর আসিয়াছে বড় বড় চাকুরে, ব্যবসায়ী, জমিদার—দশগুণ কম দামে পাঁচ কাঠা জমি কিনিতে একদিন যাকে চোখে অন্ধকার দেখিতে হইয়াছিল তার ছোট বাড়িখানার পাশে উঠিয়াছে বাগানঘেরা প্রাসাদ।

অনেক বস্তির চিহ্নও লোপ পাইয়াছে, কেবল যেগুলি বড় রাস্তার অনেক তফাতে ভদ্র পাড়ার পিছনে পড়িয়াছে সেগুলি টিকিয়া আছে,—কোনটা সম্পূর্ণ, কোনটা আংশিক। যশোদার

বাড়ির তিনদিকে নতুন বাড়ি উঠিয়াছে, কেবল কুমুদিনীর বাড়ি যেদিকে সেদিকটা আগে যেমন ছিল তেমনি আছে। রূপান্তরের ঢেউ যশোদার দুটি মুখোমুখি বাড়ি পর্যন্ত আসিয়া ঠেকিয়া গিয়াছে।

যশোদা বাড়ি দুটি বিক্রি করিলে সঙ্গে সঙ্গে এদিকের আট দশখানা বাড়ি পরিবর্তনের স্রোতে ভাসিয়া যাইত। বিক্রি করিবার জন্য এসব বাড়ি আর ফাঁকা জমির মালিকেরা সকলেই উৎসুক হইয়া আছে, এ অঞ্চলে জমির দাম যে এত চড়িতে পারে পাঁচ সাত বছর আগে কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। সব বেচিয়া দিয়া সহরের আরও তফাতে সস্তায় জমি কিনিয়া আবার তারা বাড়ি-ঘর তৈরি করিয়া নিবে, একটা মোটা টাকা হাতে থাকিয়া যাইবে। এখন তাদের ভয় শুধু এই, হঠাৎ জমির দাম না কমিয়া যায়।

কিন্তু যশোদার জন্য কেউ তারা বাড়ি বিক্রি করিতে পারিতেছে না। যে কোম্পানি সমস্ত পাড়াটা চড়া দামে কিনিতে চায়, মাঝখানে যশোদার বাড়ি দু'টি বাদ পড়িলে তারা বেশি দাম দিবে না। সকলেই যদি বেচিতে রাজি হয়, এক কাঠা জমিও বাদ না পড়ে, তবেই যশোদার বাড়ির এপাশের জমির দরটা তাদেরও দেওয়া চলিতে পারে—নয়তো অত দামে ছাড়া-ছাড়া জমি কিনিয়া কোম্পানির কি লাভ হইবে?

এইসব বাড়ির মালিকেরা একত্র হইয়া অনেক পরামর্শ করিয়াছে, যশোদাকে বুঝাইয়াছে, অনুরোধ করিয়াছে, ভয়ও দেখাইয়াছে। কুমুদিনী যে তাকে কত খোঁচাইয়াছে বলিবার নয়। কুমুদিনীব বাড়িটি ছোট, কিন্তু জায়গা অনেক। বাড়ির পিছনে তার একটি ছোট-খাট বাগান আছে, পেয়ারা, লেবু, ডালিম গাছে বাগানটি ঠাসা। অনেকগুলি টাকা হাতে পাওয়ার শখটা কুমুদিনীর চিরদিনই বড় প্রবল। টাকা হাতে পাওয়ার শখটা অবশ্য কারও কম থাকে না, কিন্তু একসঙ্গে মোটা টাকা পাওয়ার জন্য কুমুদিনীর মনটাই বোধহয় সকলের চেয়ে বেশি ছটফট করিতেছে।

তারপর মনের অশান্তি আর সকলের পীড়াপীড়িতে অস্থির হইয়া উঠিয়া বাড়ি বেচিতে যশোদা যদি বা রাজি হইয়াছিল, শেষমুহূর্তে হঠাৎ আবার তার মন বদলাইয়া গেল।

সামান্য একটা উপলক্ষে।

বাড়ি বেচিতে রাজি হওয়া মাত্র যশোদা বলিল, 'তবে আর এ বাড়িতে আমি একটা দিনও থাকবো না। আমি চললাম।'

কুমুদিনী, রাজেন আর ধনঞ্জয় তিনজনেই ব্যাকুল হইয়া বলিল, 'চললে? কোথায় চললে তুমি বলা নেই কওয়া নেই?

যশোদা হাসিল। যশোদার সেই শান্ত কৌতুকভরা হাসি দেখিয়া সকলে স্বস্তি বোধ করিল। না, রাগে দুঃখে বিরক্তিতে মাথা যশোদার বিগড়াইয়া যায় নাই।

—'দু'দিন একটু ঘুরে আসবো।'

রাজেন বলিল, 'কোথায় যাবে?'

যশোদা বলিল, 'চুলোয়। কুঁড়ে পাও, গোয়াল পাও একটা ঠিক করে রেখো দিকি আমার জন্যে—পরশু এসেই জিনিসপত্তর নিয়ে উঠে যাব।'

কুমুদিনী মুখ অন্ধকার করিয়া বলিল, 'হুঁ, জিনিসপত্তর! জিনিসপত্তর বেঁধেছেঁদে রাখতে হবে তো আমাকে?'

'তোকে তো আমি বলিনি সই!'

কারও কাছে মনের কথা ফাঁস না করিয়া যশোদা বাড়ি ছাড়িয়া সহরের এক সস্তা হোটেলে গিয়া উঠিল। কিছুদিন হইতে যশোদা ভাবিতেছিল, রীতিমত একটা হোটেল খুলিয়া নিজের চারিদিকে আবার কতকগুলি মানুষ জড়ো করিয়া অনাত্মীয় মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়াইয়া দিয়া দিন কাটাইবে। কিন্তু দু'টি দিন সেই আদর্শ ও পবিত্র হোটেলে কাটাইয়া সে বুঝিতে পারিল, এই সব কলমপেষা কুলীরা কারো সঙ্গে সুখ-দুঃখের উপভোগ ভাগাভাগি করে না, যেটুকু করে শুধু মৌখিক ভদ্র আলাপে চলতি শব্দের আদান প্রদান। সহানুভূতি কাকে বলে কেউ জানে না, চায় না এবং পায়ও না।

ক্ষুণ্ন-মনে যশোদা তাই ফিরিয়া আসিল। আসিয়া দেখিল, কুমুদিনী সত্যই তার সমস্ত জিনিসপত্র বাঁধিয়া ছাঁদিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। সহরের অন্যপ্রান্তে একটি বাড়িও রাজেন ঠিক করিয়াছে, সকলে মিলিয়া এখন সেখানে গিয়া উঠিবে তারপর যা ব্যবস্থা হয় করা হইবে। যশোদা চলিয়া যাইবে আর তারা এখানে পড়িয়া থাকিবে কুমুদিনীর তা সহ্য করা অসম্ভব। শত্রু যদি চোখের আড়ালেই চলিয়া গেল, দিন তার কাটিবে কি করিয়া?

যশোদা রাজেনকে বলিল, 'তোমাদের যাবার তাড়াতাড়ি কিসের?'

রাজেনের হইয়া কুমুদিনী জবাব দিল, 'তোমারি বা তাড়াতাড়ি কি শুনি?'

যশোদা মুখ ভার করিয়া বলিল, 'আমার কথা আলাদা। একা মানুষ আমি, দু'দিন আগে যাই পরে যাই, কারো কিছু এসে যাবে না! তোমরা কেন মিছিমিছি দু'চার মাস আগে থেকে ঘর ছাড়া হবে?'

কুমুদিনী মুচকিয়া একটু হাসিল। —'আমরাও তো একা মানুষ চাঁদের মা —দু'টি একা মানুষ।'

রাজেন ও কুমুদিনী চলিয়া গেলে বাড়ি ছাড়িয়া যাওয়ার জন্যে প্রস্তত হইয়া যশোদা বাড়ির উনানগুলি ভাঙিয়া দিতে গেল।

যশোদার লাথিতে তার রান্নাঘরের প্রকাণ্ড উনুন তিনটি ভাঙিয়া গেল। বাড়ি ছাড়িয়া যাওয়ার সময় নাকি উনুন ভাঙ্গিয়া দিয়া যাইতে হয়।

মেয়েলি শাস্ত্রের এসব বিধান যশোদা যে বিশেষ মানিয়া চলে তা নয়, তা ছাড়া লাথি দিয়া উনান ভাঙিতে হইবে এমন কোন নির্দেশ এ শাস্ত্রে নাই। তবে, মন ভাঙিয়া গেলে মানুষের পক্ষে উনুন ভাঙিবার জন্য এরকম খাপছাড়া উপায় অবলম্বন করা আশ্চর্য নয়।

উনান ভাঙিল, একটি পা-ও জখম হইল যশোদার। লোহার একটা শিক ডান পায়ের পাতায় এফোঁড়-ওফোঁড় বিঁধিয়া গেল। মন-ভাঙা আবেগে লাথিগুলি যশোদা একটু জোরে জোরেই মারিয়াছিল।

মেঝেতে বসিয়া নিজেই সে টান দিয়া শিক খুলিয়া ফেলিল। তখন আরম্ভ হইল রক্তপাত। কত রক্তই যে ছিল যশোদার প্রকাণ্ড শরীরটাতে, দেখিতে দেখিতে রক্তে মেঝে ভাসিয়া গেল।

বগল-লাঠিতে ভর দিয়া এক পায়ে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ধনঞ্জয় যশোদার কীর্তি দেখিতেছিল, তার দিকে চাহিয়া যশোদা বলিল, 'দেখলে?'

রক্ত দেখিয়া ধনঞ্জয় প্রথমটা থতমত খাইয়া যায়।

পা কাটা যাওয়ার পর কিছুদিন সে সামান্য কারণে উত্তেজিত হইয়া উঠিত, রাগারাগি, চেঁচামেচি করিয়া বাড়ি সরগরম করিয়া তুলিত, কত যে ছেলেমানুষি আর পাগলামি তার আসিয়াছিল হিসাব হয় না। তারপর ধীরে ধীরে সে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। সব সময়েই

প্রায় বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক হইয়া থাকে, অথচ কোন বিষয়ে সে গভীরভাবে চিন্তা করিতেছে তাও মনে হয় না। ডাকিলে চমকাইয়া ওঠে না, ডাক সম্বন্ধে ধীরে ধীরে সচেতন হইয়া ওঠে, সাড়া দিতে একটু সময় লাগে। মস্তিষ্কের ক্রিয়া যেন আজকাল তার একটু শ্লথগতিতে সম্পন্ন হয়। কেমন একটু বোকা-হাবার মত হইয়া পড়িয়াছে মানুষটা।

যশোদার পা জখম হইয়া দরদর করিয়া রক্ত পড়িতেছে এটা খেয়াল করিয়া উঠিতে তার সময় লাগে, কিন্তু তারপর চোখের পলকে ঝিমানো মানুষটা যেন সজীব হইয়া উঠে অতিমাত্রায়। বগলের লাঠি ফেলিয়া দিয়া ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে কাছে আগাইয়া যায়, গায়ের নতুন আলোয়ানটি দিয়া রক্ত মুছিতে মুছিতে ব্যাকুলভাবে বলে, 'ডাক্তার ডেকে আনি?'

আলোয়ানটি কাড়িয়া নিয়া যশোদা বলে, 'ডাক্তার না হাতি ডাকবে। জল আনো এক ঘটি আর খানিকটা ন্যাকড়া।'

ধনঞ্জয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়ে, একপায়ে দুয়ারের কাছে গিয়া বগল-লাঠি তুলিয়া নিতে গিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া যাইবাব উপক্রম করে। যশোদা ডাকিয়া বলে, 'হুটোপুটি করো না বাবু, ধীরে সুস্থে আনো।'

'রক্ত পড়ছে যে গো!'

'কই রক্ত পড়ছে? টিপে ধরে' আছি দেখছো না?'

ধনঞ্জয় জল আর ন্যাকড়া আনিতে যায়, পায়ের পাতার ফুটা টিপিয়া ধরিয়া রাখিয়া যশোদা চাহিয়া থাকে উনানের ভগ্নস্তূপের দিকে। একদিন দু'বেলা এই উনানে বিশ পঁচিশ জনের রান্না করিত যশোদা, কুলী মজুরের মোটা ভাত, যশোদা যাদের আপন করিতে গিয়াছিল। আজ তারা সকলেই তাকে ত্যাগ করিয়াছে, বাড়িতে তার মানুষ নাই। পরের বাড়ির একটা মেয়েকে চুরি করিয়া ভাইটা পর্যন্ত তার কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে।

এদিকে ধনঞ্জয় চেঁচামেচি আরম্ভ করে 'ও চাঁদের মা, ন্যাকড়া যে পাচ্ছি না?'

'ছোট টিনের তোরঙ্গে ছেঁড়া কাপড় আছে একটা, সেইটে নিয়ে এসো।'

নির্দেশ দিয়া যশোদা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। টিনের তোরঙ্গটি যে চাবি বন্ধ আছে, ধনঞ্জয় খুলিতে পারিবে না, একথা তার মনে আছে। তবু সে আর সাড়াশব্দ দেয় না, পায়ের ক্ষত হইতে আঙুলের ছিপি খুলিয়া রক্তপাতের পথটাও মুক্ত করিয়া দেয়। এ একটা সাময়িক মানসিক বিলাস ভাঙা মনের। নিজেকে আঘাত করিতেও সময় বিশেষে মানুষের বড় ভাল লাগে, নিজের লাল রক্তের অপচয়ও ভাল লাগে।

কয়েকবার ডাকাডাকি করিয়া ধনঞ্জয়ও চুপ করিয়া যায়, খানিক পরে জলের ঘটি আর ছেঁড়া কাপড় হাতে আসিয়া যশোদার কাণ্ড দেখিয়া আবার ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

'টিপে ধর, টিপে ধর, শীগগির টিপে ধর।'

যশোদা করুণভাবে একটু হাসিয়া বলে, 'কি করে খুললে বাস্কো?'

'টেনে খুলেছি।'

'তার মানে বাস্কোর তালাটি ভেঙেছো আমার। ধন্য তুমি।'

পায়ে একটা লোহার শিক বিঁধিয়া যাওয়া বাধা হিসাবে গণ্য করিবার মত গুরুতর ব্যাপার কিছু নয়। বাড়ি ছাড়িয়া যাওয়ার আর সব ব্যবস্থাই যখন হইয়া গিয়াছে, বাড়িটা বিক্রয় পর্যন্ত বাকি আছে, কেবল হাতে টাকাটা পাইয়া দলিল রেজেষ্ট্রি করা, ভারি ভারি জিনিসপত্র প্রায় সমস্তই পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে সহরের অপর প্রান্তের আর এক সহরতলীর ভাড়াটে

বাড়িতে, রওনা হওয়ার আয়োজন শেষ, শুধু বাকি আছে গাড়ি ডাকিয়া বাকি জিনিসপত্র নিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসার, তখন পায়ে শিক বেঁধাকে উপলক্ষ্য করিয়া বাঁকিয়া বসার কোন অর্থ হয় না। যে সব কারণে যশোদা এ বাড়ি ছাড়িয়া এদিকের সহরতলী ছাড়িয়া জন্মের মত চলিয়া যাইতেছিল, পা একটু জখম হওয়ায় তার একটিও বাতিল হইয়া যায় নাই। তবু শেষ মুহূর্তে যশোদা ওই ছুতায় যাওয়াটাই বাতিল করিয়া দিল।

ধনঞ্জয় বলিল, 'এ পা নিয়ে যেতে তোমার কষ্ট হবে চাঁদের মা!'

যশোদা চুপ করিয়া রহিল। তার এই গাম্ভীর্য ধনঞ্জয়ের কাছে চিরদিন বড় অস্বস্তিকর। একটু ভয়ে ভয়ে সে বলিল, 'খুব ব্যথা করছে তো?'

যশোদা ফোঁস কবিয়া উঠিল, 'কিসের ব্যথা? আমার আবার ব্যথাবেদনা কিসের শুনি?'

ধনঞ্জয় আরও দমিয়া গেল!—'পায়ের কথা বলছি গো। তোমার ওই পায়ের কথা, যাতে শিক বিঁধেছে। কম লেগেছে তোমার পায়ে!'

'না লাগেনি, একটুও লাগেনি। আমার আবার লাগালাগি কি? মুখপোড়া ভগবান আমায় লোহা দিয়ে গড়েছে জান না?'

ধনঞ্জয় বলিল, 'গাড়ি ডাকি তবে?'

যশোদা বলিল, 'থাক।'

'আজ যাবে না?'

'না।'

ধনঞ্জয় খুশি হইয়া বলিল, 'আমি তো তাই বলছি। তাড়াহুড়োর কি আছে? পায়ের ব্যথাটা কমুক, দু'দিন পরে গেলে চলবে।'

বলিতে বলিতে ধনঞ্জয়ের মুখে ম্যাজিকের মেঘের মত বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। —'তোমার পা দুদিন পরে সেরে যাবে, আমার পা কিন্তু কোনদিন ঠিক হবে না চাঁদের মা।'

অনেকদিন যশোদা ধনঞ্জয়ের মুখে তার কাটা পায়ের জন্য নালিশ শোনে নাই, বিষাদের ছাপটা যদিও চোখে পড়িয়াছে সব সময়েই। হাঁটুর নিচেই ডান পা'টি ধনঞ্জয়ের শেষ হইয়া গিয়াছে, ঘা শুকাইয়া খানিকটা মসৃণ হইয়াছে, বাকিটা হইয়া আছে এবড়ো-খেবড়ো। দেখিলে যশোদার এখনো বেদনা আর বিতৃষ্ণা মেশানো একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়, কতকটা প্রিয়জনের মৃতদেহ দেখিয়া বিব্রত হওয়াব মত।

'আমারও ডান পা'টা জখম হয়েছে, দেখেছ?'

এতক্ষণ খেযাল হয় নাই, এবার খেয়াল করিয়া এই অত্যাশ্চর্য যোগাযোগে ধনঞ্জয়ের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

'হয়তো আমার পা'টাও তোমার মত কেটে বাদ দিতে হবে।'

'না না, তা কি হয়. কি যে বল তুমি চাঁদের মা!'

'হতে পারে তো? পা'টা যদি পেকে ফুলে ওঠে, তারপর পচে গলে যায়, তারপর ডাক্তার করাত দিয়ে কেটে তোমার পায়ের মত ক'রে দেয়, বেশ হয় তাহলে, না?'

কথা শুনিলে আর কথা বলিবার ভঙ্গি দেখিলে মনে হয় যশোদার মনে বুঝি ঘোরতর বিকার আসিয়াছে। পায়ের পাতায় তার যেভাবে আঘাত লাগিয়াছে তাতে পা'টি পাকিয়া ফুলিয়া উঠিতে অবশ্য পারে এবং শেষ পর্যন্ত কাটিয়া পায়ের খানিকটা বাদ দেওয়ার প্রয়োজন

হওয়াও আশ্চর্য নয়, সামান্য আঁচড় লাগিয়াও সময় সময় ওরকম হয়। কিন্তু সেটা যে বেশ হয়, ধনঞ্জয়ের সঙ্গে তারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের একটা সামঞ্জস্য ঘটিবে শুধু এইজন্যই, এরকম ছেলেমানুষী কথা যশোদার মুখে মানায় না। কথাটা সে বলে রীতিমত আবেগের সঙ্গে, যেটা তার পক্ষে আরও বেশি অস্বাভাবিক, সেইজন্য মনে হয় সে যেন তামাশা করিতেছে।

ধনঞ্জয় খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকে।

'আমার সঙ্গে তামাশা করছ চাঁদের মা?'

শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে শান্ত ও গম্ভীর হইয়া যশোদা বলে, 'না, তামাশা করিনি। মনটা ভাল নেই কিনা, তাই কি বলতে কি বলেছি। বাড়ি-ভরা লোক ছিল আমার, তুমি ছাড়া আজ কেউ নেই, কি অদেষ্ট বলত আমার?'

চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়ে যশোদার, আর বিহ্বলের মত তাই দেখিতে থাকে ধনঞ্জয়। যশোদার মুখ সে গম্ভীর হইতে দেখিয়াছে, সহানুভূতিতে কোমল হইতেও দেখিয়াছে, কিন্তু সে মুখে বিষণ্ণতা কি কোনদিন নজরে পড়িয়াছিল তার? যশোদা যে কাঁদিতে পারে, আর দশজন সাধারণ স্ত্রীলোকের মত দুঃখে জল আসিতে পারে তারও চোখে, কেবল ধনঞ্জয় নয়, যশোদাকে যারা চেনে তাদের প্রায় সকলের পক্ষেই এটা কল্পনা করাও কঠিন ছিল।

শূন্য বাড়িতে শূন্য ঘরে খালি তক্তপোষের দুই প্রান্তে দু'জনে বসিয়াছিল। তক্তপোষের বিছানাপত্র গুটাইয়া বাঁধিয়া ফেলা হইয়াছে। ঘরের জিনিসপত্র যশোদা পা জখম হওয়ার আগেই রোয়াকে টানিয়া নিয়া গিয়াছে। ধনঞ্জয় সরিয়া সরিয়া যশোদার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া বসিল, কোঁচার খুঁট দিয়া যশোদার চোখ মুছাইয়া দিল। যশোদার চোখ দিয়া জল পড়া যেমন আশ্চর্য ব্যাপার, ধনঞ্জয়ের কাণ্ডটা তার চেয়ে কম নয়। অন্য সময় এত সাহস ধনঞ্জয়ের হইত না।

মানুষটাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দেওয়ার বদলে যশোদা তার হাত নামাইয়া ধরিয়া রাখিল,. বলিল, 'হয়েছে। কচি খুকি না কি আমি, আদর করে কান্না থামাচ্ছ?'

ধনঞ্জয়ের জন্যই এবার যশোদার মন আরও খারাপ হইয়া যায়। বড় আত্মগ্লানি সে বোধ করে। নিজের উপর রাগ ধরিয়া যায়। ধনঞ্জয় ছেলেমানুষ—বয়সে না হোক মনের দিক দিয়া সত্যই বড় ছেলেমানুষ। অতি তুচ্ছ একটু সাধারণ অন্তরঙ্গতাই যে মানুষটাকে খুশিতে গদগদ করিয়া দেয়, হাতে খেলনা পাওয়া শিশুর মতো, অনেকবার সে তার প্রমাণ পাইয়াছে। কতবার সে ভাবিয়া রাখিয়াছে, লোকটার সঙ্গে কথায় ব্যবহারে একটু দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। কোনমতেই তো কথাটা সে মনে রাখিতে পারে না! সকলে তাকে ত্যাগ করিয়াছে শুধু ধনঞ্জয় ত্যাগ করে নাই, এই ভাবটাই শুধু মনে থাকিয়া যায়। তাকে ত্যাগ করার কারণ যে ধনঞ্জয়ের নাই, উপায়ও নাই এটা যেন খেয়ালও থাকে না।

বেলা অনেক হইয়াছে, কিন্তু এখনো যশোদার উঠানে ভাল করিয়া রোদ আসে নাই। পুবে একটি নতুন তিনতলা বাড়ি উঠিয়াছে, যশোদার বাড়িটি পড়িয়া গিয়াছে আড়ালে। নতুন রাস্তাটির সোহাগে চারিদিকের বাড়ি যেন মাথা তুলিতেছে বর্ষাকালের আগাছার মত। কতটুকু সময়ের মধ্যেই প্রকাণ্ড একটা বাড়ি যে সম্পূর্ণ হইতেছে! কোন কাজেই মানুষের যেন আজকাল আর সময় লাগে না—সহরের মানুষের। নতুন যুগের নতুন মন্ত্রে ম্যাজিকের মত কাজ হইয়া যায়।

ঘরের মধ্যে যশোদার শীত করিতেছিল আর তাকে পীড়ন করিতেছিল ঘরের রিক্ত নগ্নতা। মেঝেতে ছড়ানো পড়িয়া আছে জঞ্জাল, একটুকরা ছেঁড়া কাগজ যশোদা ঘরে জমিতে দিত না, যা কিছু অকেজো, যা কিছু পরিত্যাজ্য সব যশোদা চিরদিন নির্বিকার চিত্তে ফেলিয়া

দিয়াছে,—যদি কাজে লাগে ভাবিয়া ঘরের জঞ্জাল সঞ্চয় করার মত ভীরু সে কোনদিন ছিল না। তবু, দুঃসাহসীর মনের গোপন ভীরুতার মত এত জঞ্জাল যে ঘরের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া ছিল!

শূন্য দেয়ালে শুধু নানা রকম দাগ আর একটি পুরানো বাংলা দেওয়ালপঞ্জি,—জীবনবীমা কোম্পানির বিজ্ঞাপন। দেওয়ালপঞ্জির ছবিটিতে একজোড়া নারী ও পুরুষ ও তাদের গণ্ডাখানেক ছেলেমেয়ের দেহে স্বাস্থ্য ভ'র মুখে আনন্দের হাসি যেন ধরিতেছে না। প্রথমে ছবিটা দেখিলেই যশোদার রাগ হইত, মনে হইত রেষারেষি করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়' দিয়াই মানুষ আজকাল মিথ্যাকে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া তুলিতেছে, সর্বত্র ছড়াইয়া দিতেছে।

অনেক বিষয়ের মত এবিষয়েও যশোদার একটি নিজস্ব মতামত আছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর বিশ্লেষণ অবশ্য যশোদার মতামতের পিছনে নাই, পাণ্ডিত্যের ফেনা সঞ্চয় করিবার সুযোগও তার ঘটে নাই। মুখে ফেনা তুলিয়া জাবরও সে কাটে না, কাজে লাগায় শুধু নিজের উপলব্ধি ও সাধারণ বুদ্ধিকে। প্রচারের আশ্রয়ে মিথ্যা যে পুষ্ট হয় একথা বুঝিতে যশোদার গভীরভাবে ভাবিবার দরকাব হয় নাই। তারপর ধীরে ধীরে চোখে সহিয়া আসিলে ছবিটির বিজ্ঞাপনের ছাপ যশোদার কাছে মুছিয়া গিয়াছে, জীবনবীমা কোম্পানির দেওয়ালপঞ্জির ছবি তার কাছে হইয়া দাঁড়াইয়াছে অজানা শিল্পীর আঁকা একটি অবাস্তব মধুর কল্পনা।

'আগে ঘরদোর ভালো করে সাফ করিয়ে তারপর জিনিসপত্র ঘরে ঢোকাব, কেমন?'

ধনঞ্জয় সায় দিয়া বলিল, 'সেই ভাল। কাকে দিয়ে সাফ করাবে, তুমি তো পারবে না?'

'কেন পারব না? কি হয়েছে আমার?'

'না না, তুমি আজ আর উঠো না চাঁদের মা। বিছানাটা এনে পেতে দিই, শুয়ে থাকো।'

শুইয়া থাকার প্রস্তাবে যশোদা উঠিয়া দাঁড়াইল একপায়ে ভর দিয়া। একটু হাসিয়া বলিল, 'এখানে শীত করছে, রোদে বসি গে চল বাইরে।'

উঠানের একপাশে একটু রোদ আসিয়াছিল, সেইখানে একটা ভাঙা তক্তায় বসিয়াই যশোদা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, নন্দের তো জেল হবে?'

এতবড় গুরুতব বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করায় খুশি হইয়া ধনঞ্জয় বলিল, 'মেয়েটিব বাড়ির লোক যদি গোলমাল করে—'

দিন চারেক আগে সুবর্ণ আর নন্দ উধাও হইয়া গিয়াছে, সুবর্ণের বাড়ির লোকেরা কি করিয়াছে যশোদা কিছুই জানে না। জ্যোতির্ময় একবার আসিয়া জিজ্ঞাসাও করে নাই, তার বোনটিকে সঙ্গে করিয়া যশোদার ভাই কোথায় গিয়াছে, এ খবরটা কি সে রাখে? হয়তো জ্যোতির্ময় পুলিশে খবর দিয়াছে, হয়তো চারিদিকে খোঁজ করাইতেছে, দু'জনের সন্ধান পাইলেই নন্দকে জেলে পাঠাইয়া ছাড়িবে। সুবর্ণের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবে সে-ই জানে। হয়তো দূরে কোন আত্মীয়ের কাছে পাঠাইয়া দিবে, হয়তো কোন বোর্ডিং-এ রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইবে, হয়তো মেয়ের এই কীর্তিকথা গোপন করিয়া চুপি চুপি কারও সঙ্গে বিবাহ দিবে--তারপর যা হবার হোক।

এসব কথাই যশোদা আজ ক'দিন ধরিয়া ভাবিতেছে। নিজেকে সে অনেকবার বলিয়াছে যে, নন্দ জেলে যাক, চুলোয় যাক, যমালয়ে যাক, তার কিছু আসিয়া যায় না: ও নচ্ছারটার

সঙ্গে আর তার কোন সম্পর্কই নাই। তবু মাঝে মাঝে যশোদার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে, একা নন্দই কি দোষী? এই কেলেঙ্কারির জন্য সুবর্ণের কি কোন দোষ নাই? সুবর্ণ ছেলেমানুষ কিন্তু অমন ভাবপ্রবণ, ফাজিল আর পাকা মেয়েকে ভুলাইয়া চুপ করিয়া পালানোর সাহস কি নন্দের হওয় সম্ভব? কাঁচ পোকার আরশোলাকে টানিয়া নিয়া যাওয়ার মত সুবর্ণই নন্দকে টানিয়া নিয়া গিয়াছে, দোষটা চাপাইয়া একা নন্দের ঘাড়ে।

ফিরিয়া আসিলে দু'জনের বিবাহ দেওয়া যায় না? জ্যোতির্ময়ের কাছে গিয়া কথাটা আগে হইতে আলোচনা করিয়া আসিলে হয়তো সে ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজি হইয়া যাইতেও পারে। এ বিবাহ অবশ্য সুখের হইবে না, কিন্তু এই কুৎসিত ব্যাপারের জের টানিয়া চলার চেয়ে সে সুখের অভাবও অনেক ভাল।

'কিন্তু বিয়ে কি হবে?'

ধনঞ্জয় চমকাইয়া উঠিল।—'বিয়ে? কার বিয়ে?'

ধনঞ্জয়ের সেই চমক দেখিয়া, চমকের মানে বুঝিয়া, যশোদার মনের মেঘ ফাঁক হইয়া কোথা হইতে যেন খানিকটা সোনালী রোদ আসিয়া পড়িল।

ধনঞ্জয়ের হাঁটুতে টোকা দিয়া একটু হাসিয়া সে বলিল, 'কেন, তোমার বিয়ে? আমার সঙ্গে?'

এবেলা যশোদা আর রান্নার ব্যবস্থা করিল না। একটু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গিয়া দু'জন লোক ডাকিয়া আনিয়া, নিজেও কোমরে আঁচল জড়াইয়া ঘরদুয়ার ধোয়ামোছা আরম্ভ করিয়া দিল। বেলা তিনটার সময় দইচিঁড়ার ফলারে পেট ভরাইয়া মাটি ছানিয়া রান্না ঘরে তৈরি করিতে বসিল ছোটখাট একটি উনুন।

সব কাজে সাহায্য করিতে গিয়া ধনঞ্জয় সারাদিন আজ যশোদার বকুনি শুনিয়াছে, উনুন তৈরি করিতে দেখিয়া সে অবাক হইয়া বলিল, 'দু'চার দিনের জন্য আবার উনুন পাতছ কেন?'

ইঁটের উপর আড়াআড়িভাবে শিক বসাইতে বসাইতে যশোদা বলিল, 'দু'চার দিন কে বললে? থাকতে হ'লে রেঁধেবেড়ে খেতে হবে তো? না, ফলার করবো রোজ?'

'ক'দিন থাকবে?'

'চিরদিন।'

'এখান থেকে যাবে না?'

'কেন যাব?'

'বাড়ি বেচবে না?'

'কেন বেচব?'

'ওবাড়িতে যে মালপত্র গেছে?'

'আনিয়ে নেব। ওবেলা কেদারকে বললেই হবে। তিনটে গরুর গাড়িতে মাল গেছে, একেবারে একটা লরিতে মাল ফেরৎ আসবে।'

ধনঞ্জয় ব্যাপারটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। যশোদার খেয়ালের আদিঅন্ত পাওয়া ভার। বাড়ি ছাড়িয়া যাওয়া হইবে না শুনিয়া মুখখানা তার বিমর্ষ হইয়া যায়। নন্দ চলিয়া যাওয়ার পর এ বাড়িতে কেবল সে আর যশোদা ক'দিন বাস করিতেছে। প্রথম রাত্রে নন্দ ফিরিবে কি ফিরিবে না একথা কারও জানা ছিল না, কোন কারণে ফিরিতে তার দেরি হইতেছে ভাবিয়া যে যার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, নিশ্চিন্ত মনে প্রতিদিনের মত ঘুমও আসিয়াছিল

দু'জনের। পরদিন যশোদার সই আর শত্রু কুমুদিনী আসিয়া বলিয়াছিল, 'আমি থাকব ভাই তোর কাছে রাত্রে?'

যশোদা রাজি হয় নাই। ধনঞ্জয়ের সঙ্গে একা একবাড়িতে রাত কাটানোর ভয়াবহ পরিণামের কথা বারবার মনে পড়াইয়া দিয়া কুমুদিনী যশোদাকে কাবু করিতে চাহিয়াছিল, যশোদা হাসিমুখে বলিয়াছিল, 'আমার সুনাম দুর্নামে কার কি আসবে যাবে বল্, কে আছে আমার? দুর্নাম হতে বাকিই বা কি আছে বল্? আমার ভাই মন্দ, আমিই বা মন্দ নই কিসে?'

শেষপর্যন্ত রাগ করিয়া গালাগালি আর অভিশাপ দিতে দিতে কুমুদিনী চলিয়া গিয়াছিল।

অনেক ভাবিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মতো কল্পনারাজ্যে অনেকক্ষণ বিচরণ করিয়া সেদিন সন্ধ্যার পর ধনঞ্জয় ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আমি তোমার ঘরে শোব যশোদা? তোমার হয়তো ভয় করবে?'

'ভয় করবে?'—যশোদা অবাক হইয়া গিয়াছিল, 'আমার ভয় কববে একা এক ঘরে শুতে! গোটা বাড়িটাতে আমি যে আজ একা থাকবো গো?'

ধনঞ্জয় আর কথা বলিতে পারে নাই। যশোদাকে বুঝা যায় না, যশোদার খেয়ালের অন্ত পাওয়া যায় না।

যশোদা আবার বলিয়াছিল, 'তুমি শোবে সই-এর বাড়িতে, পুবের ঘরে।'

এই বাড়িতে যশোদার সঙ্গে রাত্রি যাপনের মধ্যে ধনঞ্জয় হয়তো অনেক কিছু রোমাঞ্চকর সম্ভাবনা আবিষ্কার করিতেছিল, কুমুদিনীর বাড়িতে তাকে রাত্রে থাকিতে হইবে শুনিয়া সে মুষড়াইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর রাজেন আসিল। লরিতে চাপাইয়া রাতারাতি মালপত্র ফিরাইয়া আনিবার অনুরোধে সে একটু হাসিল।

'রাত্তিরে হাঙ্গামা করবার দরকার কি চাঁদের-মা? আমি গিয়ে রাত্তিরটা থাকব সেখানে, ভোর ভোর মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ব!'

'কেন, সেখানে রাত কাটাবার তোমার দরকার? হরনাম সিংকে বলোগে' আমার নাম ক'রে, গাড়ি আর লোকজন নিয়ে গিয়ে সে-ই সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে, তুমি শুধু সঙ্গে থাকবে। সকালে ওর গাড়ি পাওয়া যাবে না।'

'কি বকশিস্ দেবে আমাকে?'

'রাত্তিরে আমায় পাহারা দিও।'

রাজেন হাসিমুখে চলিয়া গেল। চিরদিন হাসিমুখেই রাজেন তার কাজ করিয়া দেয়,—কুমুদিনীকে ফাঁকি দিয়া। যশোদার সঙ্গে রাজেন বেশি মেলামেশা করিবে কুমুদিনী এটা পছন্দ করে না, দু'জনকে কথা বলিতে দেখিলে সে রাগিয়া আগুন হইয়া যায়, দু'তিন দিনের জন্য যশোদাকে একেবারে ত্যাগ করে। তারপর নিজেই আবার ভাব করিতে আসে। তীক্ষ্ণ কথা আদান-প্রদানের ভাব। দিনান্তে একবার যশোদার কাছে না আসিলে আর খানিকক্ষণ ঝগড়া করিয়া না গেলে কুমুদিনীর ভাল লাগে না, সারারাত মেজাজ তার এমন গরম হইয়া থাকে যে রাজেনের দুর্ভোগের সীমা থাকে না।

রাজেন বাহির হইয়া যাওয়া মাত্র ধনঞ্জয় ফোঁস করিয়া উঠিল, 'ওকে থাক্‌তে বললে যে তোমার কাছে?'

লণ্ঠনের আলোয় ধনঞ্জয়ের মুখ দেখিয়া যশোদা রাগ করার বদলে শান্ত ভাবেই বলিল, 'মাথা খারাপ না কি তোমার? তামাশা বোঝ না?'

ধনঞ্জয় অবুঝ শিশুর মত আব্দার করিয়া বলিল, 'ওরকম তামাশা আর কোরো না, বুঝলে? বড় খারাপ লাগে শুনলে।'

যশোদা কথা বলিল না। ধনঞ্জয়ের কথা শুনিয়া তারও খারাপ লাগিতেছিল।

দুই

যশোদা বাড়ি বেচিবে না শুনিয়া সবচেয়ে বেশি গোলমাল করিল কুমুদিনী।

একা একা বাড়িতে থাকার জন্য বটে, বাড়ি বিক্রি করিতে অস্বীকার করার জন্যও বটে! প্রথম কারণটা নিয়া সকালবেলা ঘণ্টা দুই ঝগড়া করিয়া ফুঁসিতে ফুঁসিতে বেচারী সবে বাড়ি গিয়া রান্না চাপাইয়াছে, অন্য ব্যাপারটা কানে আসিল। হাঁড়ি নামাইয়া আবার সে ছুটিয়া গেল যশোদার কাছে।

'এটা কি শুনছি চাঁদের-মা সই? বাড়ি নাকি তুই বেচবি না?'

যশোদা উনানে হাঁড়ি চাপাইতেছিল, সংক্ষেপে জানাইল, 'উঁ হুঁ।'

'কেন শুনি? তোর একার জন্য সবাই মরব আমরা? আমরা তোর কি করেছি, নিজের ক্ষতি ক'রেও আমাদের সব্বোনাশ করবি? তুই কি পাগল নাকি চাঁদের-মা সই, মাথা কি তোর খারাপ?'

'মাথা নয়। কপাল খারাপ।'

আরও চটিয়া কত কথাই যে কুমুদিনী বলিয়া যায়। যশোদা বেশির ভাগ সময় চুপচাপ শুনিয়া যায়, মাঝে মাঝে দু'একটা মন্তব্য করে। এইমাত্র ঝাড়া দু'ঘণ্টা ঝগড়া করিয়া গিয়া কুমুদিনী বোধ হয় একটু শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, প্রথমদিকে কথাগুলি তার তেমন ঝাঁঝালো হয় না। তারপর ক্রমে ক্রমে মেজাজ চড়িতে থাকায় সে যশোদার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করিতে আরম্ভ করে। মনে হয়, এতকাল শুধু যশোদার দোষের অফুরন্ত তালিকা মুখস্থ করিয়া সে দিন কাটাইয়াছে, যশোদার মত খারাপ মেয়েমানুষ যে জগতে আর দু'টি নাই এ কথাটা প্রমাণ না করিয়া সে ছাড়িবে না।

শেষে যশোদা বলে, 'এদিকে তুই তো আলাপ করছিস আমার সঙ্গে, আরেকজন যে না খেয়ে কাজে গেল?'

'যাক্। আরেকজনের জন্য তোর অত দরদ কেন শুনি?'

'পীরিতের মানুষটার জন্য দরদ হবে না?'

কুমুদিনী মুখ বাঁকাইয়া বলে, 'তামাশা আর করছো কেন? পীরিত যে তোমাদের ঢের দিন থেকে চলছে, তা কি আর জানিনে আমি।'

যশোদা হাসিয়া বলে, 'কত গণ্ডা লোকের সঙ্গে যে তুই আমার পীরিত ঘটিয়ে দিলি ভাই! কিন্তু আমার এমনি পোড়াকপাল—'

কুমুদিনীর ফোঁস করিয়া একটা অতি কুৎসিত মন্তব্য করিয়া নিজেই একটা থতমত খাইয়া যায়—কথাটা তার নিজের কানেই বীভৎস শোনায়। এতক্ষণ চটে নাই কিন্তু এবার যশোদা চটিয়া উঠিবে ভাবিয়া কুমুদিনীর একটু ভয়ও বুঝি হয়। চিরদিন সে যশোদাকে ভয় করিয়া আসিয়াছে। রাগ না করিয়া যতক্ষণ যশোদা আমল দেয় ততক্ষণই সে ঝগড়া করে, যশোদা রাগ করিলেই তার কান্না শুরু হইয়া যায়। তাড়াতাড়ি সামলাইয়া নিয়া নরম গলায় সে অন্য

কথা জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, কেন বাড়ি বেচবি না বলতে তো দোষ নেই ভাই চাঁদের-মা সই?'

কুমুদিনীর অকথ্য মন্তব্য যশোদা রাগ করিয়াছে কিনা বোঝা যায় না, কেবল মুখখানা তার একটু গম্ভীর দেখায়। একটু ভাবিয়া সে বলে, 'না, বলতে আর দোষ কি? সত্যপ্রিয় কিনে নিচ্ছে তো ঘর-বাড়ি—ওকে আমি বেচব না, লাখ টাকা দিলেও নয়।'

'সত্যপ্রিয়বাবু তো কিনছে না? একটা কোম্পানি থেকে কিনছে।'

'ওটা সত্যপ্রিয়ের কোম্পানি। লোকটা আমার ঘর ভেঙেছে, আমার বদনাম রটিয়েছে, ওকে আমি বাড়ি-ঘর বেচব? সবাই কত ভালবাসত আমায়, এখন একজন আসে দেখিস আমার কাছে? কত করেছি ওদের জন্যে আমি, ওরা আমায় বলছে সত্যপ্রিয়র লোক, সত্যপ্রিয়র টাকা খেয়ে ওদের বন্ধু সেজে ওদের সর্বনাশ করেছি?'

এভাবে কোন বিষয়ে নালিশ করা, অভিমানে এভাবে বিচলিত হওয়া যশোদার স্বভাব নয়। বন্ধুরূপী শত্রু বলিয়া কুলি-মজুরেরা ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া মনটা কি যশোদার এত নরম হইয়া গিয়াছে?

কুমুদিনী একটু ভাবিয়া বলে, 'তা এক দিক দিয়ে তো ভালই হয়েছে ভাই চাঁদের মা সই? কতকগুলো কুলি-মজুরদের পাল্লায় পড়ে যন্ত্রণা পাচ্ছিলে, বেঁচে গেছ। এখন অন্য ভাড়াটে রাখো বাড়িতে,—না না, ভাড়াটে রাখবে কি ক'রে, বাড়ি তো তুমি বেচে দিচ্ছ।' বলিয়া কুমুদিনী একগাল হাসিল।

কিন্তু যশোদার জীবন সে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। যখন তখন যশোদার কাছে ছুটিয়া আসে, মত বদলানোর জন্য ঝগড়া করে, অভিশাপ দেয় আর মিনতি করে, মাঝেমাঝে ধনঞ্জয়কে পর্যন্ত মধ্যস্থ মানে।

ধনঞ্জয় দ্বিধাভরে বলে, 'আমি তো বলছি প্রথম থেকে কিন্তু—'

যশোদা বলে, 'কি মুস্কিল, তোমরা বেচ না তোমাদের ঘর-বাড়ি। আমার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কি? আমায় নিয়ে টানাটানি করছ কেন?'

যশোদার বাড়ি বেচার সঙ্গে তাদের স্বার্থের সম্পর্ক কোথায়, কেবল কুমুদিনী নয় পাড়ার সকলেই অনেকবার কথাটা তাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু যশোদা স্বীকার করে না। সে বলে, সব সত্যপ্রিয়র চাল। সকলে চুপ করিয়া বসিয়া থাক, অন্য ক্রেতা আসুক, যশোদার বাড়িশুদ্ধ কিনিতে পাইলে যে দর সত্যপ্রিয় দিবে বলিয়াছে তার চেয়ে বেশি দর দিয়া তখন কিনিয়া নিবে, যার খুশি বেচিবে, যার খুশি বেচিবে না, সত্যপ্রিয় কথাটি বলিবে না!

'জমির দর চড়ছে দেখছ না দিন দিন? বেচবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছ কেন?'

রাজেনও যশোদার কথায় সায় দেয়—চিরদিন দিয়া আসিতেছে। তবে কুমুদিনীকে জানাইয়া নয়। কুমুদিনীর কাছে সে যশোদার কথার জোরালো প্রতিবাদই করে।

তারপর একদিন দেখা যায়, যশোদার কথাই ঠিক। পেনসনভোগী এক ভদ্রলোক রাজেনের বাড়ির পাশে উমেশ তরফদারের বাড়িটা এবং ওই ভদ্রলোকেরই এক বন্ধু কানাই নন্দীর এগার কাঠা ফাঁকা জমিটুকু কিনিতে রাজি হইয়া গেল—যশোদা বাড়ি বেচিলে সত্যপ্রিয়র কোম্পানি যে দর দিবে বলিয়াছিল সেই দরে। কিন্তু পেনসনভোগী ভদ্রলোক ও তার বন্ধুর আর এখানে বাড়ি বা জমি কেনা হইল না। কোম্পানির লোক আসিয়া সকলকে জানাইয়া দিল, যশোদা যে শত্রুতা করিয়া নিজের বাড়িটা আটকাইয়া রাখিতেছে এটা স্পষ্টই বুঝা

যাইতেছে। একজনের শয়তানিতে সকলে মারা পড়িবে কোম্পানি তা সহ্য করিবে না। যে বেচিতে চায় তার বাড়ি আর জমিই কোম্পানি কিনিয়া নিবে। যে বেচিবে না তার সঙ্গে বুঝাপড়া হইবে পরে।

শুনিয়া যশোদা বলিল, 'বুঝাপড়া? আবার কি বুঝাপড়া করবে ওরা? বুঝাপড়ার দেখছি শেষ নাই ওদের!'

বিনা শর্তে সকলের বাড়ি ও জমি সত্যপ্রিয়ই কিনিয়া নিল। বেচিল না কেবল কুমুদিনী।

এতকাল কয়েক হাজার কাঁচা টাকা হাতে পাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়া, যশোদার সঙ্গে প্রতিদিন ঝগড়া করিয়া, শেষ মুহূর্তে সে বাঁকিয়া বসিল। কৈফিয়ৎ দিল এই ঃ 'আরও দাম চড়ুক, তখন বেচব।'

তারপর কয়েকদিন কুমুদিনী আর যশোদার কাছে আসে না। রাজেনের কাছে খবর পাইয়া যশোদা নিজেই তাকে দেখিতে গেল। কুমুদিনীর সাত বছরের ছেলেটাকে এক হাতে ধরিয়া কাঁধে তুলিয়া বলিল, 'কি হ'ল ভাই কুমুদিনী সই, বাড়ি যে বেচলে না?'

'তুই যে বেচলি না? দাম চড়লে তুই যখন বেচবি, আমিও তখন বেচব।'

'তবে আর তুই বেচেছিস্।'

অনেকদিন পরে আজ যশোদার বড় আমোদ ও আনন্দ বোধ হয়। মানুষকে মানুষ ভালবাসে বৈকি। সকলে না হোক, নাটকীয় ভালবাসা না হোক্, দু'চারজন সত্যই ভালবাসে। কুমুদিনীর অন্তহীন কটু কথায় তার যে একটুও রাগ হয় না, কুমুদিনীকে সে ভালবাসে বলিয়াই তো! তাকে ফেলিয়া একা একা কুমুদিনী যে বাড়ি-ঘর বেচিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে না, কুমুদিনী তাকে ভালবাসে বলিয়াই তো!

তার বেশি আর কি চাই মানুষের?

কুমুদিনীর ঘরভরা ছেলেমেয়েদের কলরব শুনিতে শুনিতে যশোদার বিরাট দেহটি অবসন্ন হইয়া আসে। কারণটা বুঝিতে না পারিয়া সে একটু আশ্চর্য হইয়া যায়। সে তো জানে না মনের মধ্যে গভীর অশান্তির গুরুভার বহিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ মুক্তি পাইলে শুধু মন নয়, শরীরটাও মানুষের আশ্চর্যরকম হাল্কা মনে হয়, শান্তি যেন আসে ঘুমের ছদ্মবেশে। ঘুমের মতই হয়তো অস্থায়ী, তবু এখন যশোদার মনে যে শান্তি আসিয়াছে তার তুলনা হয় না।

ইংরাজি নববর্ষ শুরু শীতকালে। রাজেন পরামর্শ দিল, ইংরাজি নববর্ষের প্রথম দিন আবার হোটেল খুলিলে কেমন হয়? কারখানার কুলিমজুরদের জন্য না হোক, কারখানার বাইরে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা অর্জন করে তাদের জন্য? যশোদারও তো জীবিকা অর্জন করিতে হইবে! বিশেষত ধনঞ্জয়ের মত বিরাটকায় একটি পোষ্য যখন তার জুটিয়াছে।

যশোদা বলিল, 'কিছুদিন যাক।'

রাজেনও সায় দিয়া বলিল, 'আচ্ছা যাক কিছুদিন।'

দিন যায়। নন্দ ও সুবর্ণের কোনো খবর আসে না। কোথায় কি ভাবে ওরা দিন কাটাইতেছে কে জানে। দিন ওদের চলিতেছেই বা কি করিয়া? নন্দ কি রোজগারের কোন উপায় করিতে পারিয়াছে? সুবর্ণের গায়ের গহনা একটি একটি করিয়া স্যাকরার দোকানে যাইতেছে হয়তো! নন্দর মত ছেলে, দু'দিন আগেও দিদি মুখে তুলিয়া না দিলে যে প্রায় খাইতেই জানিত না,

একটা মেয়েকে চুরি করিয়া পালাইয়া এতকাল সে যে কেমন করিয়া ব্যাপারটার জের টানিয়া চলিতেছে, ভাবিলেও যশোদা অবাক হইয়া যায়।

মাঝে মাঝে নন্দর কীর্তন শুনিবার জন্য যশোদার জোরালো ইচ্ছা জাগে। কীর্তন করিলেই নন্দর শরীর খারাপ হয় বলিয়া নন্দর কীর্তন করা যশোদা আগে পছন্দ করিত না, যদিও কীর্তন শুনিতে শুনিতে সকলের মত অনির্বচনীয় ভাবাবেগে সেও চিরদিন এক দুর্বোধ্য ব্যাকুলতা অনুভব করিয়াছে। এখন মাঝে মাঝে তার মনে হয়, নন্দ থাকিলে নিজেই নন্দকে গাহিতে বলিয়া একদিন সে ভাল করিয়া তার কীর্তন শুনিত।

জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে রাস্তায় একদিন যশোদার দেখা হইয়া গেল। একটি নতুন শ্রমিকসমিতির সভায় যোগ দেওয়ার জন্য যশোদাকে একরকম জোর করিয়া ধরিয়া নিয়া যাওয়া হইয়াছিল, যাওয়ার ইচ্ছা তার একেবারেই ছিল না। আবার শ্রমিকদের ব্যাপারে মাথা ঘামাইতে যাইবে, তার কি লজ্জা নাই? পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত তাকে যাইতে হইয়াছিল। সভায় গিয়াই সে টের পাইয়াছিল, তার অনুমানই ঠিক। সমিতিটি খাঁটি শ্রমিক-সমিতি নয়, একজন ভদ্রলোক নিজের স্বার্থের জন্য সমিতি গড়িবার চেষ্টা করিতেছেন।

সভা শেষ হওয়ার আগেই যশোদা চলিয়া আসিয়াছিল—বাঁচিয়া থাকিতেই যারা মরিয়া আছে তাদের ভাল করার নামে ব্যক্তিগত স্বার্থ-সাধনের এসব চেষ্টা সে সহ্য করিতে পারে না।

ফিরিবার সময় তার বাড়ির গলি আর বড় রাস্তার মোড়ের কাছে প্রকাণ্ড তিনতলা নতুন বাড়িটার সামনে দু'জনে মুখোমুখি হইয়া গেল। বড় বাড়িটার নিচের একটা অংশে চায়ের দোকান, জ্যোতির্ময় বোধ হয় চা খাইয়া ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। এত কাছে বাড়ি জ্যোতির্ময়ের, দোকানে তার চা খাওয়ার কি প্রয়োজন হইয়াছে কে জানে! বাড়িতে কি জ্যোতির্ময়ের যাইতে ইচ্ছা হয় না, যে বাড়িতে একদিন তার একটা বৌ আর একটা বোন ছিল, যে বৌটা মরিয়াছে হাসপাতালে আর যে বোনটাকে চুরি করিয়াছে যশোদার ভাই?

কিছুদিন একটানা কঠিন অসুখে ভুগিলে যেমন হয় সে রকম নয়, জ্যোতির্ময় বড় রোগা হইয়া গিয়াছে। যশোদার সঙ্গে কথা না বলিয়াই সে চলিয়া যাইতেছিল, কি ভাবিয়া দাঁড়াইল।

'কোন খবর পাওনি, না?'

যশোদা মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না।'

জ্যোতির্ময় আনমনে কি যেন ভাবিল। পথে মানুষ ও গাড়ি-ঘোড়ার সংখ্যা এত বেশি বাড়িয়া গিয়াছে, পথের দু'দিকের চেহারা এত বেশি বদলাইয়া গিয়াছে যে যশোদার মনে হয়, এ বুঝি তার বাড়ির কাছের সেই পথটি নয়, দূরে অন্য কোথাও আসিয়াছে।

'খবর একটা পাওয়া যাবে চাঁদের-মা, কি বল?'

'তা পাওয়া যাবে বৈকি। আজ হোক কাল হোক, নিজেরাই একটা খবর ওরা পাঠাবে।'

'তোমায় যদি আগে জানায়, আমাকে জানাবে তো সঙ্গে সঙ্গে? আমায় খবর দিতে হয়তো ওদের ভয় হবে।'

'আপনাকে জানাবো বৈকি। কিন্তু ওদের সম্বন্ধে আপনি কি করবেন।'

প্রশ্ন শুনিয়াই জ্যোতির্ময় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, 'সে সব পরে বিবেচনা করা যাবে চাঁদের-মা। নিজের বোনকে তো আর ফাঁসি দেব না আমি?'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অন্যমনে সে কি যেন ভাবিল। তারপর হঠাৎ বলিল, 'একটা

কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি চাঁদের-মা। নন্দ কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে গেছে, এই কথা বলছো তো সবাইকে?'

যশোদা বলিল, 'হ্যাঁ, ওই ধরনের কথাই বলেছি। পাটনায় একটা চাকরি পেয়েছে। জ্ঞান হবার পর এই বোধহয় প্রথম মিছে কথা বললাম জ্যোতিবাবু।'

জ্যোতির্ময় খানিকক্ষণ যেন অবাক হইয়াই যশোদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর কথা বলিল বড় খাপছাড়া।

'বাহাদুরী কোরো না বেশি।'

গট্‌গট্‌ করিয়া সে চলিয়া গেল বাড়ির উল্টা দিকে। গলিতে ঢুকিবার আগে মুখ ফিরাইয়া যশোদা দেখিতে পাইল, আবার সে ফিরিয়া আসিতেছে। আরও কিছু তার বলিবার আছে ভাবিয়া যশোদা একটু দাঁড়াইল, কিন্তু জ্যোতির্ময় তার দিকে চাহিয়াও দেখিল না, সোজা আগাইয়া চলিয়া গেল।

এক মুহূর্ত যশোদা অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কি হইয়াছে জ্যোতির্ময়ের? সে কি পাগল হইয়া যাইতেছে? জ্যোতির্ময়ের মন যে কত দুর্বল যশোদার অজানা ছিল না। তাই তার চেহারা দেখিয়া আর কথাবার্তা চালচলনে মানসিক বিকারের স্পষ্ট লক্ষণ দেখিয়া যশোদা ভয় পাইয়া গেল।

অনেকদিন পরে সত্যপ্রিয়কেও আজ যশোদা দেখিতে পাইল। জ্যোতির্ময় চলিযা যাওয়ার একটু পরেই।

প্রথমে চোখে পড়িল সত্যপ্রিয়র গাড়ি, পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছে। অনেকটা আগাইয়া গিয়া দেখা গেল সত্যপ্রিয়কে। দু'জন সাহেবী পোষাক পরা লোকের সঙ্গে কথা বলিতে সে গাড়ির দিকে ফিরিয়া যাইতেছিল। খুব সম্ভব নতুন কেনা জমি ও বাড়িগুলি দেখিতে ও পাড়ায় আসিয়াছে।

পথের দুই প্রান্ত ধরিয়া দুইজন চলিতেছিল, যশোদা কল্পনাও করে নাই সত্যপ্রিয় তার সঙ্গে কথা বলিবে। পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে সত্যপ্রিয় বলিল, 'কেমন আছ চাঁদের-মা?'

কাছে গেল না, শুধু দাঁড়াইল। যশোদাও পথের অপর প্রান্তে দাঁড়াইয়া পড়িল। শান্ত কণ্ঠে বলিল, 'ভাল আছি। আপনি ভাল তো?'

সত্যপ্রিয়র সঙ্গের লোক দু'জন বিস্মিত চোখে চাহিয়া আছে। একজন সাইকেল আরোহী ঘণ্টা বাজাইয়া চলিয়া গেল। পথের মাঝে এ ভাবে পীড়ন করা কেন? এত করিয়াও কি সত্যপ্রিয়র সাধ মেটে নাই?

'চলে যাচ্ছে একরকম।'

সত্যপ্রিয় চলিতে আরম্ভ করিল। যশোদা একমুহূর্ত নড়িতে পারিল না। তার চোখে হঠাৎ জল আসিয়া পড়ায় পথটা একটু ঝাপ্সা হইয়া গিয়াছিল।

তিন

বাড়ি ঢুকিয়া যশোদা দেখিতে পাইল, নন্দ আর সুবর্ণের বয়সী দু'টি ছেলেমেয়ে ভিতরের বারান্দায় জলচৌকিতে বসিয়া আছে। অল্প দূরে দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া বিড়ি

টানিতেছে ধনঞ্জয়।

যশোদাকে দেখিয়া তিনজনেই চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ধনঞ্জয় তাড়াতাড়ি বলিল, 'এত শীগ্‌গির যে ফিরে এলে চাঁদের-মা?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়া যশোদা পাল্‌টা প্রশ্ন করিল, 'এরা কে?'

'ওরা ঘর ভাড়া নিতে এসেছে। আমি বললাম এখানে ঘর ভাড়া মিলবে না—'

ছেলেটি বলিল, 'রাজেনদা আমাদের বসতে বলে গেছে। কাছেই বাড়ি না রাজেনদা'র?'

যশোদা বলিল, 'হ্যাঁ, কাছেই বাড়ি।'

'রাজেনদা বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসতে গেছে। আমরা থাকলে যদি আপনার অসুবিধে হয়—?'

পরিষ্কার ধব্‌ধবে জামা-কাপড় পরনে, সমস্তই সাদাসিদে সাধারণ, তবু দু'জনের পরিচ্ছদেই যেন মার্জিত রুচি আর সহজ ও স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতার ছাপ আঁকা রহিয়াছে। ছেলেটির বয়স তেইশ-চব্বিশের বেশি হইবে না, মুখখানা মেয়েদের মত কোমল। মেয়েটির বয়স বোধ হয় ষোল বছর, এলোখোঁপায় আটকানো আঁচলটি খসিয়া পড়ি' পড়ি' করিয়াও পড়িতেছে না, সিঁথিতে সূক্ষ্ম সিঁদুরের রেখা। মুখখানা সুশ্রী, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল চপল দু'টি চোখ।

এতক্ষণ সে অবাক হইয়া যশোদার বিরাট দেহটি দেখিতেছিল,—জীবনে বোধ হয় সে এতবড় লম্বা-চওড়া মেয়েমানুষ দেখে নাই। এবার ছেলেটির দিকে চাহিয়া অকারণেই ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, 'তুমি থামো। আমি বুঝিয়ে বলছি।'

তারপর সোজাসুজি যশোদার মুখের দিকে চাহিয়া মেয়েটি বলিল, 'আমরা খারাপ লোক নই, আমাদের বিয়ে হয়েচে।'—

যশোদা বলিল, 'বিয়ে না হলে বুঝি লোক খারাপ হয়?'

মেয়েটি আবার ফিক্ করিয়া হাসিল, 'না, তা বলিনি। আপনি যদি কিছু সন্দেহ করেন, যদি ভাবেন আমরা পালিয়ে এসেছি বাড়ি থেকে, তাই জন্যে আগে থেকে বলে' রাখলাম। আমরা দুজনেই ছেলেমানুষ তো? আমরা এমনি ভাবে এসে ঘরভাড়া নিতে চাইলে আপনার কেন, সব্বারি মনে হতে পারে, ভেতরে কোন গোলমাল আছে নিশ্চয়। আপনিই বলুন, মনে হতে পারে না? গোলমাল অবিশ্যি আছে, তবে ও-ধরনের গোলমাল নয়। আমায় চুরি করার জন্যে ওঁর হাতে একদিন হাতকড়া পড়বে আর আপনাকে নিয়ে পুলিশ টানাটানি করবে, সে ভয় করবেন না। গোলমালটা কি হয়েছে বলছি শুনুন। হয়েছে কি জানেন—'

মুখে যেন খই ফুটিতে থাকে মেয়েটির। যশোদা অবাক হইয়া শুনিয়া যায়। এতটুকু মেয়ে, বিবাহ নাকি হইয়াছে মোটে মাস ছয়েক আগে, কিন্তু কথায় একেবারে পাকা গিন্নি। কি তার মুখের ভঙ্গি, কি ভণিতা, কি ফোড়ন আর ব্যাখ্যা! শুনিতে শুনিতে যশোদার মনে হয়, কার যেন অনুকরণ করিতেছে মেয়েটি, হাত নাড়া, ঠোঁট নাড়া, চোখের পলক ফেলা, রাগ দুঃখ ক্ষোভ বিস্ময় কৌতুক ফুটাইয়া তোলা আর মিলাইয়া দেয়া, সব যেন তার নকল, কথাগুলি সমস্তই শোনা-কথার পুনরাবৃত্তি। কে জানে মা না মাসি না পিসি কে নিজেকে এমনভাবে উজাড় করিয়া মেয়েটির মধ্যে ঢালিয়া দিয়াছে।

গোলমালটা অসাধারণ কিছু নয়, মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে সর্বদাই ঘটিতেছে। দাদার পছন্দ-করা একটি মেয়েকে বাতিল করিয়া অপছন্দ-করা এই মেয়েটিকে বিবাহ করায়, বিবাহে নগদ টাকা নিতে রাজি না হওয়ায় এবং সম্প্রতি একটা কারখানায় পঁচিশ টাকায় প্রায় কুলি-মজুরের কাজ নেওয়ায়, দাদা ভয়ানক চটিয়া গিয়াছে। দাদার স্ত্রীর মতে, মায়ের পেটের

ভাই তো দূরের কথা, শত্রুও মানুষের সঙ্গে এমন শত্রুতা করে না।—

'আসলে, আমার জা-ই যত নষ্টের গোড়া। ক'দিন যা দেখেছি তাতেই বুঝেছি ভাসুর আমার লোক ভাল। আমায় দেখে ভাসুরের পছন্দ হয়েছিল, এক বন্ধুর কাছে বলেছিলেন উনি শুনেছেন, কিন্তু আমার জায়ের রংটা আমার চেয়ে একটু কম ফর্সা কিনা, আর দেখতেও আমার মতো সুন্দর নয় কিনা—তা, তার এখন বয়েস হয়েছে, ছেলে-মেয়ে হয়েছে তিনটি, প্রথম বয়েসে যেমন ছিল এখনও কি তেমনি চেহারা থাকে, রূপ-যৌবন মানুষের দু'দিনে উবে যায়—আমায় দেখেই তাই অপছন্দ হয়ে গেল। তারপর যে মেয়েটিকে নিজে দেখে পছন্দ করল—ওগো, বল না সে দেখতে কেমন ছিল? হাসছ যে? আমার খুব অহঙ্কার হয়েছে ভাবছ বুঝি? না বাপু, আমি ওসব অহঙ্কার বুঝি না, ন্যাকামিপনার ধার ধারি না। সত্যি কথা বলব তাতে দোষ কি, তা সে নিজের সম্বন্ধেই হোক্ আর যার সম্বন্ধেই হোক? আমি তো আর বলিনি. আমি আকাশের পরীর মত সুন্দরী! মোটামুটি দেখতে সুন্দর আমি, এই পর্যন্ত, ব্যাস্! আমার মত সুন্দর মেয়ে গণ্ডা-গণ্ডা গড়াচ্ছে পথে-ঘাটে। তুমিই তো বলেছিলে সে মেয়েটা দেখতে কালো আর চোখ একটু ট্যারা, বলনি? যাক্ গে, যা বলছিলাম, বলি। কি কথায় কি কথা এসে পড়ল। দেখুন তো দিদি, এমনি ক'রে পেছনে লাগলে কেউ কথা কইতে পারে? কি যেন বলছিলাম—হ্যাঁ, সেই হ'লো আমার জায়ের রাগ। এমন ব্যবহার শুরু করলে আমাদের সঙ্গে কি বলব। নগদ টাকা সম্বন্ধে বলতে লাগল, উনি যে নগদ নেন্‌নি সে কি আর অম্‌নি অম্‌নি—নগদ নিলে টাকাটা আমার ভাসুরের হাতে পড়ত আর বেশ বৌ-এর গায়ে গয়না হতো। আমার পিসি,—পিসিই আমায় মানুষ করেছে, বড্ড ভালবাসে আমায়-—পিসি নিজে থেকে আটশো টাকার গয়না বেশি দিয়ে দিল। গয়না যা দেবার কথা ছিল তাতো দিলই, তার উপরে আরও আটশো টাকার গয়না, নগদ টাকার বদ্‌লিতে। ভাসুর তিনশো টাকা মাইনে পান, ও-ক'টা টাকা নগদ পেলেই বা তিনি এমন কি বড়লোক হ'য়ে যেতেন, তিন মাসের মাইনেও নয়! কিন্তু জা' আমার ওই কথা বলে বলে ভাসুরের মন ভাঙাতে লাগল। তারপর ও যেই চাকরিটা নিল,—না নিয়েই বা কি করবে বলুন, ভাল একটা চাকরিও জুটিয়ে দেবে না। এদিকে ঘরে বসে' থাকার জন্যও খোঁচাবে! ভাসুর নয়, আমার জা। হাত খরচের দু'চারটে পয়সা তো মানুষের লাগে? দাদার কাছে চাইলে তিনি বলবেন, আহা বৌদির কাছ থেকে নে না গিয়ে। বৌদির কাছে চাইলে এমন করে মুখ বাঁকাবে! একবার দু'বার চেয়ে শেষে ও আর চাইত না। আমি একটা গহনা দিলাম বেচতে, তাও বেচবে না। এদিকে নস্যি কেনার একটা পয়সা নেই! তখন এই চাকরিটা নিয়ে নিল। কিন্তু আমার জায়ের সে কি রাগ! বলে কি, লোকের কাছে দাদার মাথা হেঁট করবার জন্যে ইচ্ছে ক'রে এই চাকরি নিয়েছে। নইলে এতগুলো পাশ ক'রে কেউ কুলি-মজুরের কাজ নেয়? খেটে খেলে লোকের কাছে মাথা হেঁট হবার কি আছে বলুন তো দিদি? রাত্তিরে আমার জা কি সব পরামর্শ দিল কে জানে, সকালে আমার ভাসুর ওকে বললেন, কি 'হয় এ-কাজ ছেড়ে দাও, নয় আমার বাড়ি থেকে বেরোও।' ফিক্ করিয়া সে আবার হাসিল, 'না, ঠিক ওমনিভাবে বলেননি, তবে, মোট কথাটা দাঁড়াল ওই। আমরাও তাই চলে এলাম।'

ছেলেটির নাম অজিত, মেয়েটির নাম সুব্রতা।

'তোমার ডাক নাম কি বোন? সুব্রতা বলে ডাকতে পারব না।'

'আমার ডাক নাম নেই।'—সুব্রতা হাসে।

অজিত বলে, 'ওর ডাক নাম হ'ল গিয়ে—'

সুব্রতা চোখ পাকাইয়া বলে, 'দ্যাখো, ভাল হবে না কিন্তু!'

অজিত হাসিমুখেই চুপ করিয়া থাকে। তখন সুব্রতা বলে, 'আচ্ছা, বলো। কি আর হবে আজ হোক কাল হোক জানতে তো পাবেন-ই!'

এই সামান্য হাসি-তামাশার ব্যাপারেও মনে হয়, অজিত যেন বৌ-এর বড় বাধ্য। সুব্রতার কৃত্রিম চোখ-পাকানো রাগকে পর্যন্ত সে সম্মান করিয়া চলে। প্রথমটা যশোদার একটু কেমন কেমন লাগিয়াছিল, তারপর দু'একটা দিন যাইতে না যাইতে সে টের পাইয়াছে, এটা দু'জনের একটা ভালবাসার খেলা মাত্র। দু'জনে বড় মজা পায় এ খেলায়। এই বয়সের দু'টি ছেলেমেয়ের মধ্যে, মিলন যাদের হইয়াছে মোটে ছ'মাস আগে, এমন একটা আশ্চর্য মিল আছে মনের যে যেটুকু যশোদা বুঝিতে পারে তাতেই সে অবাক হইয়া যায়। সুব্রতা যদি আব্দার ধরে, আমায় আকাশের চাঁদ পেড়ে দাও,—আদর দিলেই বৌরা সময় অসময়ে যে আব্দার ধরিয়া স্বামীদের মেজাজ বিগড়াইয়া দেয়,—অজিত সঙ্গে সঙ্গে বলে, দিচ্ছি পেড়ে। সুব্রতা জানে অজিত বুঝিবে এটা তার আব্দার, সুব্রতার এই জানা অজিত জানে, অজিতের এই জানাও সুব্রতা জানে, আবার সুব্রতার—দু'জনের জানাজানির এই প্রক্রিয়া যশোদার মনে হয় অন্তহীন আর রহস্যময়, তবু যেন দু'জনের মধ্যেই এর সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা ঘটিয়াছে, সহজ ও শান্ত আনন্দের গভীর অনুভূতিতে।

একেই কি বলে ভালবাসা? মনের মিল?

যশোদা ভাবে।

হিংসার মতো কি যেন একটা মৃদু প্রতিক্রিয়া জাগে যশোদার মনে, ক্ষীণ একটা অস্বস্তি বোধের পীড়ন চলিতে থাকে।

সুব্রতা তার ঘর সাজায়, সকালে আর সন্ধ্যায় অজিত তাকে সাহায্য করে। তিন টাকা ভাড়ায় যশোদা বড় ঘরখানাই তাদের দিয়াছে ; একটি তোরঙ্গ আর দুটি স্যুটকেসে ঘরটা যেন খালিখালি দেখায়। সুব্রতা দেওয়ালে টাঙায় ছবি আর ফোটো, জানালার দেয় পর্দা, অজিতকে দিয়া আল্‌না আনায় আর বেশি-বেশি জামা-কাপড় অকারণে বাহির করিয়া সাজাইয়া রাখে, যশোদার দেওয়া চৌকির পায়া চারটিতে রঙিন কাপড়ের ঢাকনি দেয়, টুকিটাকি আরো কত-কি যে সে করে। আর সেই সঙ্গে করে অজিতের সঙ্গে নানা বিষয়ে পরামর্শ—যশোদার সামনেই। মাঝে মাঝে যশোদারও মতামত জিজ্ঞাসা করে। মাস নয়, বছর নয়, সমস্ত ভবিষ্যতকে সে যেন এই একটি ঘরে আটক করিয়াছে। এই ঘরেই তার যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কোথায় টেবিল পাতিবে, কোন্‌দিকে আলমারি রাখিবে, ক'খানা আর কি ধরনের চেয়ার কিনিবে, এসব কল্পনার আর শেষ থাকে না! যে রেটে সে কল্পনায় আসবাব কিনিতে থাকে, তাতে একবছর পরে এ-ঘরে তিলধারণের স্থান থাকিবে কি করিয়া যশোদা ভাবিয়া পায় না।

কয়েকদিন রাঁধিয়া খাওয়ায় যশোদাই। তারপর একদিন দুপুরে সুব্রতা বলে, 'আমি কোথায় রাঁধব দিদি?'

'আমার রান্না রুচছে না?'

'ওমা, সে কি কথা! সত্যি বলছি দিদি, এমন রান্না জীবনে খাইনি কখনো। আজ যে কুমড়োর ছক্কা খাওয়ালে, ঠিক অমৃতের মত লাগলো! কুমড়োর ছক্কার যে আবার এমন স্বাদ হয়, স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। তবে কি জান দিদি, আমরা হলাম ভাড়াটে, চিরকাল তো

আর তোমার ঘাড়ে খাওয়া উচিত হবে না।'

'আমার ঘাড়ে খাবে কেন বোন? তোমরা খরচা দিও, রান্না একজায়গাতেই হবে। চারটি তো প্রাণী আমরা বাড়িতে, দু'জায়গায় রেঁধে কোন লাভ আছে? মিছেমিছি বেশি খরচ।'

শুনিয়া সুব্রতা খুসি হইয়া তৎক্ষণাৎ এ প্রস্তাবে রাজী হইয়া যায়। যশোদার প্রশংসা করিয়া বলে যে, বাস্তবিক, বয়স না হইলে কি এসব কথা মানুষের মাথায় আসে! কিন্তু একটা বিষয় আপত্তি করে সুব্রতা, সকাল সন্ধ্যায় চা-জলখাবার সম্বন্ধে।

'চা'টা কিন্তু আমি করব দিদি।'

'নিজের হাতে ক'রে খাওয়াতে চাও, না?' বলিয়া যশোদা হাসে।

সুব্রতার সঙ্গে এমনিভাবে আলাপ করে যশোদা, কখনও মা মাসীর মত, কখনও সমবয়সী সখির মত। কিছুক্ষণ আলাপ করিবার পরেই সব গোলমাল হইয়া যায়, সুব্রতার কথা শুনিতে শুনিতে সমবয়সী বন্ধু মনে হয় তাকে, আর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলে খেয়াল হয় যে সে যোল বছরের একটা কচি মেয়ে মাত্র, যে বয়সের মেয়ে যশোদারও থাকিতে পারিত।

এরা যে তার ভাড়াটে একথা যশোদার মনেই থাকিতে চায় না। দু'জনকে তার মনে হয় অতিথি, তার বাড়িতে বেড়াইতে আসিয়াছে ; এদের খাওয়া-দাওয়ার ভাল ব্যবস্থা করা আর সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখার দায়িত্ব যেন তার।

পরদিন সকালে উনুনে আঁচ দিয়া যশোদা সুব্রতাকে ডাকিতে যায়। এ সময় রোজ সুব্রতা রান্নাঘরে উপস্থিত থাকে, আজ তাকে না দেখিয়া যশোদা একটু আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল।

ঘরে গিয়া যশোদা দ্যাখে কি, অজিত ছোট টুলটিতে মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে, চৌকিতে সতরঞ্চির উপর উপুড় হইয়া গুটানো তোষকে মুখ গুঁজিয়া সুব্রতা কাঁদিতেছে।

'কি হল সকাল বেলা 'তোমাদের?'

যশোদার সাড়া পাইয়াই সুব্রতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসে। জলভরা চোখ, ভিজা গাল আর ফুলানো ঠোঁটে কি ছেলেমানুষ আর সুন্দরই তাকে দেখায়! মনে হয় গিন্নিপনার অভ্যাসটাও যেন তার এখনকার মত ঘুচিয়া গিয়াছে। শিশুর মতো যশোদার কাছে সে নালিশ জানায়।

'চায়ের জিনিসপত্র কিনবার পয়সা পর্যন্ত নেই দিদি। বললাম, এমনি মোটা-মোটা চুড়ি ছ'গাছা ক'রে কেউ একহাতে পরে না, দু'গাছা চুড়ি বেচে দিয়ে এস। তা, কিছুতেই বেচবে না। কি হয় বাড়তি চুড়ি বেচলে?'

'চায়ের জিনিসপত্র কেনার জন্য বৌ-এর গয়না বেচব!'—অজিত বলে।

'কেন, বৌ কি পর?'—সুব্রতা বলে।

কঠিন সমস্যা সন্দেহ নাই। বৌ-এর গয়না বেচার সমস্যা যশোদার আগের ভাড়াটেদের মধ্যেও অনেকবার দেখা দিয়াছে, কিন্তু সমস্যাটা তখন দাঁড়াইত ঠিক উল্টো। গয়না বেচিতে স্বামীরাই ছিল উৎসুক, বৌয়েরা ছিল বিরোধী। কলহও ছিল তাদের ভিন্ন ধরনের, কথা কাটাকাটি ছিল যেন গালাগালি আর অভিশাপ, মারামারির ভূমিকার মতো। দু'একটি স্বামী যে বৌকে চড়-চাপড়টা বসাইয়া দিত না, তাও নয়। অতীতে স্বামী-স্ত্রীর যত কলহ সে মধ্যস্থতা করিয়াছে তার সঙ্গে এই নব দম্পতির কলহের পার্থক্যটা এত বেশি স্পষ্ট হইয়া যশোদার কাছে ধরা পড়ে যে, এদের মিল ঘটানোর লাগসই উপায় সে ভাবিয়া পায় না। মিলনের চেয়ে মধুর যে বিরোধ, তার কি প্রতিবিধান আছে?

একরকম জোর করিয়া রান্নাঘরে ধরিয়া নিয়া গিয়া দু'জনকে সে চা আর হালুয়া খাওয়ায়। মন কাঁদিতে থাকে নন্দ আর সুবর্ণের জন্য। হয়তো এমনিভাবে কোথায় কার বাড়িতে একটি

ঘর ভাড়া নিয়া তারা আছে, পয়সার টানাটানির জন্যই হয়তো তাদের প্রথম ঝগড়া বাধিয়াছে এমনিভাবে। প্রথম বয়সের উত্তেজনায় দুঃখকে বরণ করায় সুখ দু'দিনে ঘুচিয়া গিয়া দুর্দশার দুজনের সীমা থাকিবে না, এই কথাই সর্বদা সে ভাবে, কিন্তু আসলে হয়তো এদের মতই দুর্লভ আনন্দে দিনগুলি তাদেরও ভরিয়া আছে! ভাবিতে গিয়া সংশয় জাগে যশোদার। সুবর্ণ তো সুব্রতার মত নয়। সুব্রতার গিন্নিপনা আছে পাকামি নাই, লজ্জাহীনতা আছে বেহায়াপনা নাই, বুদ্ধি আছে কুটিলতা নাই, চপল হাসি মন ভুলানো অস্ত্র নয় সুব্রতার। সুব্রতার মতো সুবর্ণ কি কাউকে আপন করিতে পারে, সুব্রতার মত মনের মিল কি সুবর্ণের সঙ্গেও কারো হয়?

অজিতের চা খাওয়া দেখিতে দেখিতে যশোদা মনে হয়, কে জানে নন্দও তো অজিতের মত নয়। এদের দু'জনের মত নয় বলিয়াই হয়তো ওদের মধ্যে এদের মত মিল হইয়াছে।

যশোদার গম্ভীর মুখ দেখিয়া অজিত আর সুব্রতা ভাবে, তাদের চুড়ি বিক্রীর কথাটাই সে ভাবিতেছে। দু'জনেই যশোদার দিকে তাকায় আর চোখ নামাইয়া নেয়, তারপর প্রায় একসঙ্গেই পরস্পরের দিকে মুখ ফিরানোর ফলে যেই চোখাচোখি হয়, দু'জনের মুখেই মৃদু হাসি ফুটিয়া ওঠে। যশোদার প্রকাণ্ড শরীরটা আজও তাদের চোখে অভ্যস্ত হইয়া যায় নাই, এখনো বিস্ময় আর কৌতুক জাগে।

হাসি দেখিয়া যশোদা বলে, 'বড় ছেলেমানুষ তোমরা।'

দু'জনে ভাবে, এ বুঝি যশোদার শরীর দেখিয়া হাসার জন্য তিরস্কার। লজ্জায় অজিতের চোখ মিট্ মিট্ করে, সুব্রতার গাল দু'টি লাল হইয়া যায়।

যশোদা বলে, 'দুটো চুড়ি বেচবে কি বেচবে না, তাই নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি, কাঁদাকাটা কেন? তেমন দরকার হলে গয়না বেচতে কোন দোষ নেই—বেচাই বরং উচিত। মেয়েমানুষের গয়না তো শুধ্ সখের সামগ্রী নয়, বিপদে আপদে কাজে লাগবে বলেই গয়না গড়ানো, ও হ'ল একধরনের সঞ্চয়। তাই বলে যখন-তখন সামান্য কারণে বেচতে নেই। চায়ের জিনিসপত্র কেনার জন্যে কি আর গয়না বেচা চলে? তবে মনে কর সুবুর'—সুব্রতার একটা অসুখবিসুখ হওয়ার কথাটা যশোদা জিভের ডগায় আসিয়া পড়িয়াছিল, সামলাইয়া নিয়া সে বলে, 'ছেলেপিলে হবে ব'লে টাকার দরকার, তখন তো আর বৌ-এ গয়না বেচব না বললে চলবে না। আমার কাছে ধার নাও ক'টা টাকা, পরে শোধ করে দিও।'

সুব্রতার মুখের লালিমা আরও বেশি গাঢ় হইয়া আসিতেছিল, সে চুপ করিয়া থাকে।

অজিত বলে, 'টাকা ধার করতে কেমন যেন লাগে।'

যশোদা সুব্রতার মুখখানা দেখিতে দেখিতে বলে, 'সে তো ভালই। তবে দিদি ব'লে যখন ডাকো আমায়, নিশ্চয় শোধ ক'রে দেবে জানো মনে মনে, তখন ক'টা দিনের জন্য আমার কাছে নিতে দোষ নেই।'

অজিত কাজে চলিয়া যায়। সুব্রতা রান্নাঘরে আসিয়া যশোদাকে টুকিটাকি কাজে সাহায্য করিবার সুযোগ খোঁজে আর বার বার কি যেন একটা কথা বলিতে গিয়া চুপ করিয়া যায়। রান্না প্রায় সবই হইয়া গিয়াছে। সকাল সকাল রান্না শেষ করা যশোদার চিরদিনের অভ্যাস, ভাড়াটেরা তার ন'টার মধ্যে খাইয়া কাজে বাহির হইয়া যাইত। মাঝখানে বাড়িতে যখন কেউ ছিল না, শুধু সে আর ধনঞ্জয়, তখন রান্না শেষ হইত অনেক বেলায়। অজিত আসিবার পর আবার যশোদা ন'টার মধ্যে সকালের রান্না শেষ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাল যে যশোদার বিশেষ লাগে তা নয়। মস্ত উনুনে কত লোকের রান্না সে একদিন রাঁধিত, বাড়িতে

দু'বেলা যেন চলিত নিমন্ত্রণের হাঙ্গামা, এখন শুধু সিদ্ধ করা চারজনের ভাত।

'জানো দিদি—'

কিন্তু যশোদাকে কথাটা সুব্রতার আর বলা হয় না। রাজেন আসিয়া বসিতে সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। রাজেনের কাছে হঠাৎ তার এত লজ্জার কারণটা কেউ বুঝিতে পারে না।

'ভাড়াটেরা কেমন চাঁদের-মা?'

'মন্দ কি!'

'আরেক জোড়া ভাড়াটে আছে, আনব?'

যশোদা হাসিয়া বলে, 'কেন এক জোড়ায় কলঙ্ক ঠেকানো যাবে না?'

রাজেনও হাসিয়া বলে, 'তা কেন, রোজগারের ব্যবস্থাও তো করতে হবে?'

'এদের মত ভদ্রলোক ভাড়াটে আনবে তো?'

প্রশ্ন শুনিয়া রাজেন উৎকণ্ঠিত ব্যগ্রতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, 'কেন, এদের কি তোমার পছন্দ হচ্ছে না চাঁদের-মা? না তিনটাকা ভাড়ায় একখানা ঘর দিতে হয়েছে ব'লে ভাবছ? আমি কি সেসব না ভেবেই তোমায় ভাড়াটে এনে দিয়েছি! ক'টা মাস অপেক্ষা কর, অজিতের মাইনে ডবল হয়ে যাবে, তখন—'

যশোদা মাথা নাড়িয়া বলে, 'সেজন্য নয়। ভাবছি শেষকালে কি ভদ্রলোক ভাড়াটেই শুধু রাখতে হবে, আমায় যারা দু'চোখে কোনদিন দেখতে পারেনি?'

'আমি কিন্তু মানুষ চাঁদের-মা।'

'মানুষ না ঘোড়া তুমি তা জানিনে, তবে ভদ্রলোক তুমি নও।'

'বি-এ ফেল করেছি, সাতষট্টি টাকায় চাকরি করি, বিয়ে করা বৌ নিয়ে ঘর সংসার করছি—আমি যদি ভদ্রলোক নই, কে তবে ভদ্রলোক শুনি? সত্যপ্রিয়?'

'ও আবার একটা লোক নাকি যে ভদ্র হবে? ও হল মানুষের রূপ ধরা দৈত্য—কিংবা দানোয় পাওয়া মানুষ। চাদ্দিকে হু হু ক'রে বাড়ি তুলে গণ্ডা গণ্ডা ভদ্রলোক এসে বাসা বাঁধছে, ভদ্রলোক কাকে বলে জানো না? চাষা-মজুরকে যারা ঘেন্না করে, বড়লোকের পা চাটে, ন্যাকা ন্যাকা কথা কয়, আধপেটা খেয়ে দামী দামী জামা কাপড় পরে, আরাম চেয়ে চেয়ে ব্যারামে ভোগে, খালি নিজের সুখ খোঁজে, মান অপমান বোধটা থাকে টনটনে কিন্তু যত বড় অপমান হোক দিব্যি সয়ে যায়, কিছু না জেনে সবজান্তা হয়—আর বলব?'

রাজেন মাথা নাড়িয়া বলিল, 'বলতে চাও বল, তবে আর শুনবার দরকার নেই। তোমার যখন ঝোঁক চাপে চাঁদের-মা—'

'মুখে খৈ ফুটতে থাকে, না?'

'ভদ্রলোকের ওপর তোমার এত রাগ কেন যশোদা?'

'ভদ্রলোকেরা কি মানুষ?'

আরেক জোড়া ভাড়াটে আনিবার অনুমতি যশোদা দেয়। এক জোড়া যখন আসিয়াছে, আরও আসুক। মনটা কিন্তু খুঁতখুঁত করিতে থাকে যশোদার। মনে হয়, চলিতে চলিতে সামনে একটা বাধা পাইয়াছে বলিয়া নিজের মনের দুর্বলতার জন্য সে যেন বিপথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। দুপুরবেলা কুমুদিনী আসিয়া বেড়াইয়া গেল, সুব্রতার সঙ্গে ভাবও করিয়া গেল। ইতিমধ্যে যতবার সে আসিয়াছে, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যশোদার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলিয়াই চলিয়া গিয়াছে, বসিতে বলিলেও বসে নাই। আজ প্রায় সমস্ত দুপুর এ বাড়িতে কাটাইয়া গেল।

সুব্রতার কি হইয়াছে কে জানে, সমস্ত দুপুর কুমুদিনী যে এত কথা বলিল তার সঙ্গে, কথায় বা ভাব-ভঙ্গিতে তার এতটুকু গিন্নিপনা দেখা গেল না। কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হইতে লাগিল তাকে।

কুমুদিনী চলিয়া যাওয়ার পর আবার সে উসখুস করিতে থাকে, সকালে রান্নাঘরে যেমন করিয়াছিল।

বলে, 'জানো দিদি, সেই যে বলেছিলে না—?'

যশোদা বলে, 'কি বলেছিলাম?'

'সেই যে, যে জন্য গয়না বেচা চলে?'

কিছুক্ষণ যশোদা বুঝিতেই পারে না, অবাক হইয়া সুব্রতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। তারপর খেয়াল হয়।

'ওমা, সত্যি?' বলিয়া সুব্রতাকে সে বুকে টানিয়া নেয়।

কি হয় তখন যশোদার, প্রথম সন্তান-সম্ভাবনায় উদ্‌ভ্রান্ত পরের একটা মেয়েকে সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া? তীব্র বেদনার সম্ভাবনায় বিরাট দেহের প্রত্যেকটি অণু ভয়ার্ত ঔৎসুক্যে সজাগ হইয়া ওঠে, চাঁদকে প্রসব করার সময় যেমন হইয়াছিল। আলিঙ্গনের চাপে দম আটকাইয়া সুব্রতার প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়ার উপক্রম হয়। জোর তো সোজা নয় যশোদার দু'টি বাহুতে। সুব্রতার অস্ফুট আর্তনাদে সচেতন হইয়া সে তাকে ছাড়িয়া দেয়। ধপ্ করিয়া মেঝেতে বসিয়া জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ক্ষীণস্বরে সুব্রতা বলে, 'আরেকটু হলেই শেষ ক'রে দিয়েছিলে দিদি।'

রাত্রে ধনঞ্জয়কে খাইতে দিয়া সামনে বসিয়া থাকিতে থাকিতে যশোদার মনে হয়, আরেকজন মানুষকে খবরটা শুনাইতে না পারিলে বুকটা তার ফাটিয়া যাইবে।

'জানো, সুবুর ছেলেপিলে হবে।'

বাড়িতে ভাড়াটে আসিবার পর ধনঞ্জয় কেমন মুষড়াইয়া গিয়াছে। ক'দিন চুপচাপ শুধু সকলকে দেখিয়া গিয়াছে, মুখে তার একটি কথা শোনা যায় নাই। যশোদার মুখে সুব্রতার সন্তান-সম্ভাবনার খবরটা শুনিয়া এবিষয়ে সে কিছুই বলে না, অভিমানী বালকের মত নিজের নালিশটা জানাইয়া বসে।

'রাজেনকে তুমি অত খাতির কর কেন চাঁদের-মা?'

সুব্রতার নতুন খাপছাড়া অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা দেখিয়া যশোদা আশ্চর্য হইয়া গেল। কোথায় সে ছিল, কতদূর বিভিন্ন আবেষ্টনীর মধ্যে, হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছে কোথায়। কিন্তু ছোটবড় সব বিষয়ে অনেক ভুল করিলেও এবং নানারকম মুস্কিলে পড়িলেও কখনো তাকে কাবু হইতে দেখা গেল না। নিজেই ভুল সংশোধন করিতে লাগিল, মুস্কিলের আসান করিতে লাগিল। চায়ের সেট আর ওই ধরনের কয়েকটি অভাব মিটানোর জন্য সুব্রতার চুড়ি বিক্রি করার সমস্যা যশোদা সমাধান করিয়া দিয়াছিল। তবে সেটা সাময়িকভাবে কোনরকমে কাজ চালানো গোছের সমাধান। সে সমাধান গ্রহণ করার বদলে সুব্রতা নিজের সমস্যার আরও স্থায়ী ও ব্যাপক মীমাংসা করিয়া ফেলিল। যশোদার কাছে টাকা ধার করাব বদলে দামী চায়ের সেট কেনার মত প্রয়োজনগুলিকেই বাতিল করিয়া দিল!

হাসিমুখে বলিল, 'প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি দিদি কদ্দূর হিসেব ক'রে চলতে

হবে আমাকে।'

একটি এলুমিনিয়ামের কেটলী আর সস্তা কয়েকটি কাপ-ডিশ মাত্র কেনা হইল। আসবাব কিনিয়া ঘর বোঝাই করা তো বন্ধ হইয়া গেলই, যশোদাকে একদিন সুব্রতা জিজ্ঞাসাও করিল, বাড়তি কয়েকটা আসবাব বিক্রি করিয়া ফেলা যায় না?

খরচপত্রও সে হঠাৎ কমাইয়া ফেলিল। যুদ্ধের সম্ভাবনা টের পাওয়া মাত্র বুদ্ধি থাকিলে একটা দেশ যেমন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়, অদূর ভবিষ্যতে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই বাধিবে জানিয়া সুব্রতাও যেন তেমনিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করিতেছে।

সুব্রতার মধ্যে ন্যাকামি নাই। তরুণ মনের স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতা তার মধ্যে যথেষ্টই আছে কিন্তু দাম সে দিতে জানে। বাঁকা আলোয় চকচকে কাঁচকে হীরার মত খাতির করার খেলায় হয়তো সে আনন্দ পায় এবং সে কাঁচের বিনিময়ে কিছু সোনাদানাও অনায়াসে দিয়া বসে, কিন্তু হীরার বদলে কাঁচ পাইয়াছে বলিয়া কখনো আপশোষ করে না। কারণ, কাঁচ যে কাঁচ তা সে জানে, আসলে সে দাম দেয় শুধু আনন্দটুকুর।

যশোদা এটা আশা করে নাই। সুব্রতাকে ভাল লাগিলেও এবং একটু স্নেহ জাগিলেও প্রথমটা তাকে যশোদার মনে হইয়াছিল, তুবড়ির মত উচ্ছ্বাসভরা অকালে পাকা ফাজিল মেয়ে। তারপর ক্রমে ক্রমে যশোদা বুঝিতে পারিয়াছে, কথা বলা ছাড়া আর কোন বিষয়ে সে তুবড়ি-ধর্মী নয়। ঠেকিয়া শেখা অভিজ্ঞতার পরিমাণটা তার অস্বাভাবিক রকমের বেশি নয়, কেবল দেখিয়া শেখা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের স্বভাবসিদ্ধ পটুতার জন্য জ্ঞানের ভাণ্ডারটা বেশিরকম ভরিয়া ওঠায় তাকে একটু পাকা মনে হয়, আসলে মেয়েটা কাঁচাই আছে। মনকে সঙ্কীর্ণ করার অপরাধে নিজেকে অপরাধী করে নাই বলিয়া সাহস ও সরলতা তার একটু বেশি, তাই তাকে মনে হয় ফাজিল।

রাজেনকে যশোদা বলে, 'না, এরা ঠিক ভদ্রলোক নয়।'

'দেখলে তো? এমন ভাড়াটে এনে দিয়েছি, দু'দিনে পছন্দ হয়ে গেল। কি তোমার ভাল লাগে না লাগে, সব জানা আছে চাঁদের-মা!'

যশোদা হাসিয়া বলে, 'মনের মানুষ তুমি, তুমি জানবে না তো কে জানবে?'

কাছে বসিয়া কুমুদিনী মুখ বাঁকায়। ধনঞ্জয় অসহায় দৃষ্টিতে যশোদার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

সুব্রতার সুঠাম দেহ আর সুন্দর মুখখানা দেখিয়া একটা কথা যশোদার বার বার মনে পড়িয়া যায়। বাড়ির লোকের পছন্দ করা কুরূপা মেয়েটির বদলে তাকে বিবাহ করিয়া অজিত যে গোলমাল সৃষ্টি করিয়াছে যশোদাকে প্রথম দিন তাই ব্যাখ্যা করিয়া শোনানোর সময় অজিতকে হাসিতে দেখিয়া সুব্রতা সবিনয়ে ঘোষণা করিয়াছিল, সে সুন্দরী বটে কিন্তু তার মত গণ্ডা গণ্ডা সুন্দরী মেয়ে রাস্তাঘাটে গড়াগড়ি যাইতেছে। সুব্রতার কথা আর ভঙ্গিকে তখন যশোদার মনে হইয়াছিল, একেলে মেয়ের পাকামির প্যাঁচ, ঘষামাজা ন্যাকামি। তারপর যশোদা জানিতে পারিয়াছে মেয়েদের পক্ষে এ বিশ্বাস পোষণ যতই বিস্ময়কর হোক, কথাটায় সুব্রতা সত্য-সত্যই বিশ্বাস করে। তার মত রূপবতী মেয়ের পক্ষে নিজের রূপ সম্বন্ধে এমন একটা ধারণা আন্তরিকতার সহিত পোষণ করা যে সম্ভব, এ অভিজ্ঞতা যশোদার ছিল না। রাম-লক্ষ্মণের মন ভুলানোর প্রতিযোগিতায় সীতা-ঊর্মিলার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এ বিশ্বাস যে সূর্পনখার ছিল, সে তো সে স্ত্রীজাতীয়া জীব বলিয়াই!

স্নেহ করার সঙ্গে সুব্রতাকে যশোদা তাই একটু শ্রদ্ধাও করিতে শিখিয়াছে।

চার

সুব্রতার চরিত্রের আরেকটা দিকও ক্রমে ক্রমে যশোদার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। মেয়েটা খুব মিশুক।

যশোদা আর কুমুদিনীর সঙ্গে ভাব জমিয়াছিল একদিনে, পাড়ার কয়েকটি বাড়ির মেয়েদের সঙ্গেও সে ভাব জমাইয়া ফেলিল কয়েকদিনের মধ্যে। প্রথমে পরিচয় করিতে গেল সবচেয়ে কাছের বাড়ির এবং সম্ভবতঃ ছোটোখাট একটা পরিধির মধ্যে সবচেয়ে গরীব ও অতি-ভদ্র পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে। পরিবারটি অমূল্য নামে একজন বছর পঞ্চাশেক বয়সের রোগজীর্ণ কেরাণী ভদ্রলোকের। যশোদার সঙ্গে এবাড়ির মেয়েদের ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও পরিচয় আছে অনেকদিনের। পরদিনই ও-বাড়ির সাত হইতে চল্লিশ পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের আটজন মেয়ে যশোদার বাড়ি বেড়াইতে আসিল। সাত বছর বয়সের মেয়েটির রঙীন কাপড় পরার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল, যৌবনে পা দিয়া তাড়াতাড়ি দলের তিনটি তরুণী মেয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে যেন তার তর সহিতেছে না।

অনেকদিন আগে অমূল্যর বাড়ির মেয়েরা দু'একবার যশোদার বাড়ি বেড়াইতে আসিয়াছিল। যশোদা তখনও কুলি-মজুরদের বাড়িতে ভাড়াটে রাখিতে আরম্ভ করে নাই। তারপর নানা আপদে-বিপদে মাঝে মাঝে যশোদাকে তারা ডাকিয়াছে বটে, কিন্তু যশোদার বাড়িতে কখনো আসে নাই। আজও তারা যশোদার কাছে আসে নাই, আসিয়াছে সুব্রতার নতুন সংসার দেখিতে।

অমূল্যর স্ত্রী আশাপূর্ণা পান চিবাইতে চিবাইতে বলিল, 'আমরা এলাম। কই, তোমার নতুন ভাড়াটে চাঁদের-মা?'

যশোদা বলিল, 'আমার নতুন ভাড়াটেকে খুঁজছ পাঁচুর মা? এসো, বসবে এসো।'

আশাপূর্ণার পান চিবানো বন্ধ হইয়া গেল। এতকাল কুলি-মজুরের সঙ্গে কারবার করিয়া প্রায় তাদের মত বনিয়া গিয়া এখনো তাকে সমানের মত সম্বোধন করার মত ভদ্রতা যশোদার আছে, সে তা কল্পনাও করে নাই।

কয়েক মাসের মধ্যে দেখা গেল যশোদার বাড়িতে দুপুরবেলা রীতিমত মেয়েদের বৈঠক বসিতে আরম্ভ করিয়াছে। দু'একটি মেয়ে নয়, উকিল, ডাক্তার, মাষ্টার, প্রফেসর, কেরানী, জীবনবীমার এজেন্ট প্রভৃতি অনেক রকম ভদ্রলোকের বাড়ির অনেক মেয়ে। সকলের বাড়ি যে খুব কাছে তাও নয়। বড় রাস্তার ধারের কয়েকটি বাড়িতে পর্যন্ত সুব্রতা তার পরিচয়ের অভিযান আগাইয়া নিয়া গিয়াছে।

হাসি-গল্প গান-বাজনায় যশোদার বাড়ি দুপুরবেলা মুখরিত হইয়া ওঠে। সুব্রতা মোটামুটি গান জানে, একটি হারমোনিয়াম আর একটি সেতার তার সঙ্গেই আসিয়াছিল। তারপর কয়েক জোড়া তাস আসিয়াছে, নগেন ডাক্তারের বাড়ির ক্যারাম বোর্ডটি আসিয়াছে। একটি করিয়া মুখ আর পরচর্চার মালমশলা তো সকলে সঙ্গে করিয়াই আনে।

একটা আড্ডা পাইয়া সকলেই খুশি। সুব্রতা যেন মেয়েদের একটা ছোটখাট ক্লাব সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে। কাজটা পাড়ার যে কোন বাড়ির যে কোন মেয়ে ইচ্ছা করিলেই করিতে পারিত কিন্তু এতদিন কারও খেয়ালও হয় নাই যে মাঝে মাঝে এ-বাড়ি ও-বাড়ি করার বদলে এক জায়গায় সকলে এক সঙ্গে মিলিয়া পাড়াবেড়ানোর সাধ মিটাইবার এরকম একটা সহজ উপায় আছে। অবশ্য নিজের বাড়িতে রোজ এতগুলি মেয়েমানুষের সমাগম সকলের পছন্দ

হইত না। তবে একত্র হইতে চাহিলে কি আর স্থানের অভাব হয়!

প্রথম প্রথম কেউ আসিয়াছিল নিছক ভদ্রতার খাতিরে, কেউ মনের খেয়ালে, কেউ কৌতূহলের বশে। আসিবার আগে কেউ ভাবেও নাই যে, তাদের জন্য তাদের নিয়াই সুব্রতা যশোদার বাড়িতে এমন একটি আকর্ষণ সৃষ্টি করিতেছে।

অল্পদিনে সুব্রতার নামহীন, উদ্দেশ্যহীন, কমিটি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারী হীন মহিলা সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিল। যশোদা রাগ করিবে কি খুশি হইবে বুঝিয়া উঠিবার সময়ও পাইল না। ব্যাপারটা ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবার আগে নিজেই সে সঙ্ঘে যোগ দিয়া বসিল। নানাবয়সী মেয়েদের মধ্যে প্রয়োজনীয় শ্রেণী বিভাগের জন্য সুব্রতাকে যে কৌশল অবলম্বন করিতে হইল, এটা হইল তার ফল।

'গরু আর বাছুর একসঙ্গে বসলে কি জমে দিদি?'

'না দিদি, জমে না।'

'কাল তাহ'লে আমি বিনু, উমি, সাবু এদের আমার ঘরে ডেকে নিয়ে যাব, তুমি বড়দের নিয়ে বসবার ঘরটাতে থাকবে, কেমন?'

সুব্রতা ভাড়া নিয়াছে একটি ঘর, কিন্তু মেয়েদের বসানোর জন্য আরেকটি ঘরকে বসিবার ঘরে পরিণত করিতে তার বাধে নাই। যশোদাকে জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করে নাই।

তারপর যশোদা বয়স্কাদের আসরে ভিড়িয়া গিয়াছে। কেউ মোটা, কেউ রোগা, কেউ দু'য়ের মাঝামাঝি, কিন্তু সকলেই শিথিল। কেউ এখনও সচেতন গর্বের সঙ্গেই ফর্সা চামড়ার স্তিমিত রূপের ঝাঁঝ বিকীর্ণ করিতেছে, রূপের অভাবে আসিয়া-যাওয়ায় বয়সটা পার হইয়া কেউ স্বস্তি বোধ করিতেছে। কারও গায়ে গয়না বেশি, কারও গায়ে কম গয়নার ফ্যাশন গয়নার চেয়ে স্পষ্ট। কারও মুখে পান, কারও মুখে ভাঙ্গা-বাঁকা দাঁতগুলি রোজ সকালে কয়লার গুঁড়ার ঘষামাজা পায় বলিয়া বেশ সাদা।

কয়েকটি মুখ যশোদার অপরিচিত। চারিদিকে অনেক নতুন বাড়ি উঠিয়াছে, অনেক নতুন লোক সহরতলীতে বাস করিতে আসিয়াছে। সুব্রতা হয়তো এতদূর হইতে দু'একজনকে টানিয়া আনিয়াছে, সহরতলীর পুরানো বাসিন্দা হইলে যার মুখ চেনার সুযোগ যশোদার ঘটে নাই। চেনা হোক, অচেনা হোক, যশোদা এদের চেনে। এরা সকলেই মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের গিন্নি। কপালে থাকিলে যশোদা নিজেই হয়তো এতদিনে এদের মত একজন গিন্নি হইয়া দাঁড়াইত।

কিন্তু কোথায় যশোদার চাঁদ? আত্মীয়-স্বজনভরা সংসার? সংসার না থাকিলে কি গিন্নি হওয়া চলে! মজুরদের নিয়া সে সংসার গড়িয়া গিন্নি হইয়া বসিয়াছিল, সত্যপ্রিয় সে সংসারও তার ভাঙ্গিয়া দিযাছে।

যশোদার দুঃখ কষ্ট অভাব অভিযোগ রাগ দ্বেষ হিংসা গ্লানি সব কিছুর উপর চিরদিন স্থায়ী একটা প্রলেপ থাকিত -মজা লাগার। জিভের ঘায়ে মধুমাখা মলমের প্রলেপের মত। সেই প্রলেপের অভাবে যশোদার মনের সবগুলি আঘাতের ক্ষত আজকাল কটকট করে।

যশোদার কিছুই করিবার নাই।

সর্বদা পরের বিপদ ঘাড়ে করা, পরেব সমস্যার মীমাংসা করা, বাঁচিয়া থাকার মর্মান্তিক প্রচেষ্টায় আহত অনেকগুলি অশিক্ষিত ও অমার্জিত বয়স্ক শিশুর সেবায় মসগুল থাকা, সব ঘুচিয়া গিয়াছে। রাজেন তাই তাকে শ্রমিক নেতার কাজে টানিয়া নিয়া গিয়াছে, বাড়িতে ভাড়াটে

আনিয়া দিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। যা নিয়া যশোদা ছেলের শোক ভুলিয়াছিল, আত্মীয় পরিজনের অভাব ভুলিয়াছিল, নিজেকে বিকাশ করার সুযোগ পাইয়াছিল, এসব কৃত্রিম খেলনায় কি সে অভাব মেটে?

অপরের দেখাইয়া দেওয়া আদর্শের দিকে অপরের সৃষ্ট কর্মের নালায় জীবনস্রোতকে বহাইয়া দিবার সাধ যশোদার কোনদিন ছিল না। ওসব তার ধাতে সহ্য হয় না। সে যেমন আর তার যা আছে তেমনি থাকিয়া আর সেই সব নিয়া অনেকগুলি পছন্দসই পরের জীবনের ঘনিষ্ঠ আবেষ্টনীর মধ্যে সে নিজের নিয়মে বাঁচিতে চায়।

ভদ্রলোক নামে যে এক শ্রেণীর মানুষ আছে তাদের পুত্রকন্যা প্রসব করিয়া আর সংসার চালাইয়া মাঝ বয়সেই যেসব গিন্নিদের দেহ, মন, মুখ, এমন কি শাড়ীর আঁচল আর ব্লাউজ সেমিজ পর্যন্ত শিথিল হইয়া গিয়াছে, তাদের সঙ্গে কয়েকটা দুপুর আড্ডা দিয়াই যশোদার হাঁপ ধরিয়া যাওয়া উচিত ছিল। তার বদলে হঠাৎ সে যেন আহত মনের ক্ষতে মিষ্টি মলমের মৃদু একটা স্বাদ অনুভব করিতে লাগিল।

তার বাড়িতে আসিয়া তার ঘরে বসিয়া একেবারে তার চোখের সামনে পাড়ার এতগুলি স্ত্রীলোক নিজেদের শ্যাওলা ধরা জীবন মেলিয়া ধরে আর উপেক্ষা, অবহেলা বা বিতৃষ্ণার বদলে যশোদার মনে জাগে মমতা। অজানা কিছু নয়, নতুন কিছু নয়। যশোদা এদের জানে, এদের জীবনযাত্রার পরিচয়ও রাখে। এদের দূরেও সে রাখিত সেই জন্যই। তবে দূরে রাখিয়া মোটামুটি ধারণা পোষণ করা এক কথা। একঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘনিষ্ঠভাবে বসিয়া অসংখ্য খুঁটিনাটি বিকৃতি আর ব্যর্থতা আবিষ্কার করিয়া মমতা বোধ করার সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য।

কেবল অসুখের সময় গিয়া সেবা করিয়া, বিপদের সময় গিয়া সাহস দিয়া আর উৎসবের সময় গিয়া খাটিয়া আসিয়া যশোদা যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল যে এরাও মানুষ।

চাঁদ মরিয়া যাওয়ার পর সে যেমন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়াছিল, নগেন ডাক্তারের ফর্সা মোটা বৌ অতসী ছেলের শোকে তেমনিভাবে কাঁদিয়াছে।

অতসীর এখনো তিনটি ছেলে আর দু'টি মেয়ে আছে। বড় ছেলে রমেন ডাক্তারি পড়ে। বড় ম্লান মুখখানা ছেলেটার, বড় বিষণ্ন স্তিমিত দৃষ্টি। দেখিলেই যশোদার মনটা কেমন করিয়া ওঠে। ক'দিন আগে দুপুরবেলা কি দরকারে সে মাকে ডাকিতে আসিয়াছিল, তখন তার চোখে যশোদা যেন দেখিতে পাইয়াছিল, একটা চাপা-পড়া লাজুক ভাবপ্রবণ ক্ষুধা।

'বলগে যা, আসছি' বলিয়া ছেলেকে বিদায় দিয়া হাতের তাস নামাইয়া সকলের দিকে চাহিয়া অতসী তৃপ্তির হাসি হাসিয়াছিল,—সগর্বে।—'আর বছর ডাক্তারি পাশ করবে। এক বাড়িতে দুজন ডাক্তার হবে, রুগীকে আর ফিরতে হবে না—একজন বাড়ি না থাক আরেকজন তো থাকবে, কি বলেন? পাশ করেই অবিশ্যি ওনার মত চার টাকা ফি করলে চলবে না, প্রথম দু'চার বছর দু'টাকা ক'রে তারপর পসার বাড়লে চার টাকা। উনি হয়তো তদ্দিনে আট টাকা ফি ক'রে ফেলবেন, এখন থেকেই বলছেন, চার টাকায় আর পোষায় না—'

নন্দর কাছে রমেন কীর্তন শিখিতে আসিত। তখনও তাকে দেখিয়া যশোদার মনে হইত, ডাক্তারি বিদ্যার চাপে ছেলেটা যেন দিন দিন কুঁকড়াইয়া যাইতেছে। দেহতত্ত্ব জিজ্ঞাসু বৈষ্ণবের ছাঁচে ঢালিয়া মানুষ করিয়া ছেলেকে মড়া কাটিতে পাঠানোর জন্য অতসীর গর্ব দেখিয়া একটা দুর্বোধ্য বন্ধনের অনুভূতিতে যশোদাকে ব্যাকুলভাবে একবার জোরে শ্বাস টানিতে হইয়াছিল।

সন্ধ্যার পর যশোদার মনে হইয়াছিল, কেবল রমেন তো নয়। সুন্দরী বড় মেয়েটাকে

আই. সি. এস. বরের উপযোগী লেখাপড়া চালচলন শিখাইয়া তার চেয়ে অশিক্ষিত মাঝ-বয়সী গেঁয়ো রাজার রাণী করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কেবল অতসীও তো নয়। একে একে অন্য গিন্নিদের ছেলেমেয়ের কথাও যশোদার মনে পড়িয়াছিল। মনে হইয়াছিল, এক ধরনের জীবনযাপনের জন্য সকলেই যেন অন্য ধরনের জীবনযাপনের উপযোগী করিয়া ছেলেমেয়েগুলিকে মানুষ করে।

যশোদা বড়ই মমতা বোধ করিয়াছিল, এদিক দিয়া কুলি-মজুরেবাও ভাল। আধমরা পশুর মত জীবন হোক, ছেলেমেয়েগুলি তাদের আধমরা পশুর মত জীবনযাপনের জন্যই জন্ম হইতে তৈরি হয়।

সুকুমার উকিলের স্ত্রী বনলতাও ফর্সা এবং মোটা। সর্বদা পান খায়। সুযোগ পাওয়া মাত্র রোয়াকে দাঁড়াইয়া মুখভরা পান চিবাইতে চিবাইতে চুপি চুপি সে যশোদাকে বলে, 'চার টাকা না চারশো টাকা! যা মুখে আসে বললেই হল। পশার তো ভারি, সারাদিন হাঁ ক'রে বসে থাকে রুগীর জন্য, একটা টাকা দিলেই ছুটে আসবে। চার টাকা কোথায় আদায় করে জানো চাঁদের-মা? অন্য ডাক্তার ডাকবার সময় নেই, এদিকে রুগীর যায় যায় অবস্থা, তখন। আবার বলে আট টাকা করবে! এমন হাসি পায় মাগীর কথা শুনলে।'

হাসিবার জন্যই বোধ হয় যশোদার ঝকঝকে উঠানের একটা কোণ পিক ফেলিয়া ভাসাইয়া দেয়। তিন-চারদিন আগে অতসী তার ডাক্তার স্বামীর ফির সম্পর্কে কথা বলিয়াছিল, যশোদার কাছে সে কথার ফাঁকি ধরাইয়া দেওয়ার জন্য আজ পর্যন্ত বনলতা সযত্নে কথাগুলি মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিয়াছে। এমনি চুপি চুপি আরও কতজনকে বলিয়াছে কে জানে, হয়তো আরও সপ্তাহখানেক ধরিয়া বলিয়াই চলিবে।

যেখানে সেখানে পানের পিক ফেলার স্বভাবের জন্য একটা কড়া কথা বলিতে গিয়া যশোদা চুপ করিয়া গেল। হঠাৎ তার মনে হইয়াছে, বনলতার মাথাটা যেন একটু খারাপ। বাড়িতে যারা আসিতেছে তাদের সকলের মানসিক অবস্থাই কমবেশী অস্বাভাবিক, কিন্তু বনলতার মন যেন স্বাভাবিকতার স্তর পার হইয়া একটু বেশি রকম আগাইয়া গিয়াছে।

অতসীর সঙ্গে বনলতার খুব ভাব, তাস খেলার লড়াই-এ প্রায় রোজই তারা দু'জনে মিলিয়া একটি পক্ষ গঠন করে। বনলতা কথা বলে না অনুরূপার সঙ্গে। অনুরূপা প্রফেসর সুনীল সেনের স্ত্রী। মানুষটা একটু হাবাগোবা ধরনের, বড়ই নিরীহ। যে যা বলে তাই সে মানিয়া নেয়, কারও সঙ্গে ঝগড়া করে না। এবকম গোবেচারা মানুষের সঙ্গে বনলতার কথা বন্ধ করার কারণটা যশোদা কোনমতেই ভাবিয়া পায় না।

এরকম খাপছাড়া যুক্তিহীন ব্যাপার যশোদাকে পীড়া দেয়। কতকটা নিজের বিরক্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যেই সে ভাবে, কারণ যাই থাক, দু'জনের মধ্যে ভাব করাইয়া দিলে দোষ কি?

জিজ্ঞাসা করিতে বনলতা বলে, 'কথা বলব না কেন, বলি তো?'

যশোদা বুঝিতে পারে অনুরূপার সঙ্গে সে যে কথা বলে না তাও বনলতা স্বীকার করিবে না, কথাও বলিবে না। এ চাল যশোদা জানে, তাই বনলতার সঙ্গে সময় নষ্ট না করিয়া সে ধীরে ধীরে অনুরূপার পাশে গিয়া বসে, বনলতা পিক ফেলিতে উঠিয়া গেলে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করে, 'সেন গিন্নির সঙ্গে বুঝি আপনার বনে না?'

অনুরূপা অপরাধীর মত ভয়ে ভয়ে বলে, 'বনবে না কেন, তবে কি জানেন—'

সুব্রতার ঘরে তখন মধুর কণ্ঠে গান আরম্ভ হইয়াছে। অনুরূপার মেয়ে অলকা চমৎকার

গান গায়। বড় রাস্তার কাছাকাছি সামনে ছোট বাগানওয়ালা দোতলা বাড়িটিতে তারা উঠিয়া আসিয়াছে বছরখানেক আগে এবং আসিয়াই অলকা পাড়ার গায়িকাদের খ্যাতি ম্লান করিয়া দিয়াছে।

'আপনার মেয়ে বড় সুন্দর গান গায়', অনুরূপাকে এই কথা বলিবার জন্য যশোদা মুখ খুলিয়াছে, পিক ফেলিয়া আসিয়া পানের পিকের মতই মুখ লাল করিয়া বনলতা উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বলে, 'ওই রে, ছুঁড়ি আবার গান ধরেছে! শুনছেন? ফের প্যানপ্যানানি শুরু করেছে।'

অবিনাশ চাটুয্যের বৌ প্রভা মিনতি করিয়া বলে, 'আহা, একটু শুনতে দিন না?'

বনলতা যেন ক্ষেপিয়া যায়।—'কি শুনবে ভাই? ওকি গান নাকি? মিন মিন ক'রে কাঁদলেই যদি গান হ'ত—'

ইনস্যুরেন্স এজেণ্ট জগদীশের দ্বিতীয়পক্ষের বৌ অমলা হঠাৎ বলিয়া বসে, 'খুকুর চেয়ে তো ভাল গায়।'

বনলতা ধপাস করিয়া বসিয়া পড়ে।—'খুকুর চেয়ে ভাল গায়? এত বড় বড় ওস্তাদ রেখে খুকুকে গান শেখালাম, খুকুর চেয়ে ভাল গায়?'

বনলতা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে। কাঁদিতে কাঁদিতে মেঝেতে শুইয়া পড়িয়া গড়াগড়ি দেয়।

অতসী তীব্র ভর্ৎসনার সুরে অমলাকে বলে, 'ওর পেছনে লাগবার কি দরকার ছিল আপনার?'

এই সব গোলমালের মধ্যে ওঘরে গান বন্ধ হইয়া যায় এবং যশোদা এক গেলাস জল আনিয়া বনলতার তালুতে একটু একটু করিয়া থাপড়াইতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে বনলতা শান্ত হইয়া উঠিয়া বসে।

যশোদা জানে এ শুধু ঈর্ষা আর অহঙ্কারের ব্যাপার নয়, নিজের মেয়ের চেয়ে অন্য একজনের মেয়ে ভাল গান গায় বলিয়া সুস্থ মানুষ এরকম করে না। ভিতরে বিকার আছে আর সেই বিকার এই রকম খাপছাড়া উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

এ ধরনের বিকার শুধু এদের মধ্যেই দেখা যায়, কুলি-মজুরদের বৌ-রা এ হিস্টিরিয়ার ধার ধারে না। অভাবের চাপে আর ঝাঁঝালো নিষ্ঠুর বাস্তবতার তাপে তারা শুকাইয়া যায়, এদের মত পচিতে শুরু করে না।

যশোদার চিন্তিত ভাবকে সুব্রতার মনে হয় গাম্ভীর্য। সন্ধ্যার পর মন খারাপ করিয়া সে জিজ্ঞাসা করে, 'কি ভাবছ দিদি?'

যশোদা প্রথমে বলে, 'ভাবছি? কই, কিছুই তো ভাবছি না ভাই?' তারপর বলে, 'ও, হ্যাঁ, একটা কথা ভাবছি। মেয়েদের গান শেখাবার স্কুলের মত করলে হয় না একটা? ঘরোয়া স্কুলের মত, মাইনে-টাইনের দরকার নেই, দুপুরবেলা পাড়ার মেয়েরা এসে গান শিখে যাবে। যন্ত্রপাতি কিনবার যদি দরকার হয় তখন বরং সকলের কাছ থেকে চাঁদার মত কিছু কিছু নিলেই হবে। কি বল?'

প্রস্তাবটি শুনিয়াই সুব্রতা খুশি হইয়া ওঠে, 'নিশ্চয়, ঠিক্। আমিও ভাবছিলাম ওই রকম কিছু করতে হবে? বসে বসে শুধু গল্প করলে চলবে কেন?'

'তুমি, অলকা আর খুকু গান শেখাবে।'

'অলকা আর খুকু?' সুব্রতার মুখে দুর্ভাবনা ঘনাইয়া আসে, 'তবেই তো মুস্কিল!'

যশোদা হাসিয়া বলে, 'সে আমি ঠিক করে দেব।'

প্রথমে যশোদা গেল প্রফেসর সুনীল সেনের বাড়ি। অনুরূপা তার সব কথাতেই সায় দিয়া গেল, সব প্রস্তাবেই রাজী হইয়া গেল। কেবল অলকা একটু মুখ ভার করিয়া বলিল, 'খুকু আর আমি? ও মেয়েটা বড় হিংসুটে।'

কিন্তু যশোদার কাছে এতটুকু মেয়ে কেন মুখ ভার করিয়া থাকিতে পারিবে, বিশেষতঃ নিজের তাগিদে একটা করার ভার গ্রহণ করিয়া হঠাৎ যখন যশোদার শরীর মন হাল্কা মনে হইতে আরম্ভ করিয়াছে? অলকাকে জয় করিতে তার কয়েক মিনিট সময় মোটে লাগে। খুকু তো ঠিক হিংসুটে নয়, বোকা। তাছাড়া, অলকার গান শুনিয়া গান জানা কোন্ মেয়ের না হিংসা হয়?

'খুকুকে না ডাকলেও তো চলবে না দিদি! সারে-গামা শেখানো, গলা সাধানো, সোজা গান শেখানো এসব তো একজনের করা চাই? এমন গান করো তুমি, তোমায় কি এসবের জন্য বলতে পারি? তোমার সময়ই বা কই? মাঝে মাঝে তুমি গিয়ে দু'একখানা ভাল গান শেখাবে, ব্যাস—!'

তেল মাখাইতেও যশোদা কম পটু নয়, গর্বে আর আনন্দে অলকার মুখখানা তেল মাখানো মুখের মতই চকচক করিতে থাকে।

তখন যশোদা যায় বনলতার বাড়ি, মা ও মেয়েকে বুঝাইয়া বলে,—'আসলে খুকুই আমাদের গান শেখাবে, সব ভার থাকবে খুকুর ওপরে। অলকা মাঝে মাঝে আসে তো আসবে, দু'একখানা গান শিখিয়ে যাবে। মিহি গলা থাকলেই তো গান শেখানো যায় না, গান শেখাতে হলে সুর তাল শেখাতে হয়, নয় দিদি?'

খুকু গদগদ ভাবে বলে, 'আরও কত কি আছে—গান শেখা কি সহজ!'

একটি হারমোনিয়াম, একটি এস্রাজ আর পাঁচ ছ'টি ছাত্র নিয়া যশোদার ঘরোয়া সঙ্গীত বিদ্যালয় আরম্ভ হয়। সকলের যে খুব বেশি উৎসাহ জাগিয়াছে তা নয়, সকলে ভাবিতেছে, যশোদার মতলবটা কি? কিন্তু যশোদা জানে বিনা পয়সায় মেয়েদের গান শেখানোর সুযোগ কেউ ছাড়িবে না, মেয়েদের গানবাজনার চর্চা যারা পছন্দ করে না তারাও নয়। দু'চারদিনের মধ্যে ছোট বড় মেয়ের ভিড়ে তার ঘর ভরিয়া উঠিবে। এই তো সবে শুরু।

সকলেই আজ এক ঘরে। অন্য সকলে এলোমেলো ভাবে যে যেখানে পারে বসিয়াছে, একটি আস্ত পাটি কেবল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে গানের শিক্ষয়িত্রী আব ছাত্রীদের। হারমোনিয়মের একদিকে বসিয়াছে ছাত্রীরা, অন্যদিকে পরস্পরের যতটা পারে তফাতে সরিয়া বসিয়াছে অলকা আর খুকু। কিন্তু এত কাছে বসিয়া, একই কাজ করিতে বসিয়া, পরামর্শ না করিয়া চুপচাপ শুধু বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন? বিশেষতঃ সকলে যখন কি ভাবে গান শেখানো আরম্ভ হয় দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা কবিয়া আছে। তারা যে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে না, তাদের মায়েরাও বলে না, এটা তাই তখনকার মত তাদের ভুলিয়া যাইতে হয়।

প্রথমে অলকা বলে, 'কি শেখানো যায়? গান?'

তখন খুকু বলে, 'গলা কি ক'রে সাধতে হয় শেখালে হ'ত না?'

অলকা বলে, 'গলা তো সাধবেই, একটা সোজাসুজি গান দিয়ে আরম্ভ করলে বোধ হয় ভাল হয়।'

খুকু বলে, 'একেবারে গান দিয়ে আরম্ভ করলে—'

পরামর্শের সুবিধার জন্য নিজেদের অজ্ঞাতসারে তারা পরস্পরের একটু কাছে

সরিয়া আসে।

ছয় সাতটি নানা পর্দায় গলার বেমিল, বেসুরো, হঠাৎ-জাগা, হঠাৎ-থামা আওয়াজে ঘরটা গমগম্ করিতে থাকিলে যশোদা বনলতা আর অনুরূপার মুখের দিকে তাকায়। এই দু'টি জননীর মধ্যে ভাব জমানোর যে তুচ্ছ খেয়াল হইতে এই সুরচর্চার উৎপত্তি হইয়াছে, যশোদা তা ভোলে নাই। সুরচর্চা অবশ্য যশোদা আর থামিতে দিবে না, আরও ব্যাপক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে চর্চা করাইবে, কিন্তু ওদের দু'জনের ভাব হওয়াটা তো দরকার?

হঠাৎ যশোদা উঠিয়া যায়, ঘরের একপ্রান্ত হইতে হাত ধরিয়া অনুরূপাকে অন্যপ্রান্তে বনলতার কাছে টানিয়া আনে, বনলতার পাশে তাকে বসাইয়া দু'জনের হাতে হাত মিলাইয়া দিয়া আবেগ-কম্পিত গলায় বলে, 'আপনাদের দু'টি মেয়েই রত্ন। ওদের জন্যই আমার সাধ মিটল। ওরা যদি আমার মেয়ে হ'ত!'

বনলতা প্রায় কাঁদিয়া ফেলে।—'কত ওস্তাদ রেখে কত চেষ্টায় মেয়েকে আমি গান শিখিয়েছি!'

অনুরূপা বলে, 'আপনার মেয়ে সত্যি শেখার মত করেই শিখেছে।'

বনলতা কাঁদিয়া ফেলে। 'ওর গলাটা যদি তোমার মেয়ের মত মিষ্টি হ'ত ভাই।'

তিন মাসের মধ্যে পথের ওদিকে এবাড়ির মুখোমুখি যশোদার অন্য বাড়িতে একটি রীতিমত সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া গেল। বাড়ির সামনে ছোট একটি কাঠের ফলকে নামটা লিখিয়া টাঙ্গাইয়া দেওয়াও হইল। বাড়িটি যশোদা কোনদিন আর ভাড়া দিবে না ঠিক করিয়াছিল। তবে ভাড়া দেওয়া আর কাজে লাগানোর মধ্যে তফাৎ আছে।

বনলতা একদিন চুপি চুপি যশোদাকে বলে, 'স্কুল তো দিব্যি চলছে চাঁদের-মা। খুকু তো প্রাণ দিয়ে খাটছে তোমার স্কুলের জন্য, এবার ওর জন্য কিছু ব্যবস্থা করে দাও?' বনলতা পান চিবাইতে চিবাইতে হাসে, 'মাইনের কথা বলছি না, অত খাটছে মেয়েটা, হাতখরচ বাবদ কিছু'—তারপর হঠাৎ হাসি বন্ধ করিয়া গম্ভীর হইয়া বলে, 'ওস্তাদ রেখে গান শেখাতে জলের মত টাকা ঢেলেছি কিনা, তাই বলছি।'

তবু যশোদা ভুল করে না যে বনলতার মাথা আসলে সকলের চেয়ে বেশি খারাপ নয়।

পাঁচ

ছেলে বা জামাই কেউ সত্যপ্রিয়ের মনের মত নয়। আত্মীয়-পরিজন কেউ যে তার মনের মত তাও অবশ্য নয়, তবু সেটা কোনরকমে সহ্য হইয়া যায়। বড় ছেলে আর বড় মেয়ের জামাই যে তার অপদার্থ এই আপশোষ মাঝে মাঝে মানুষটাকে একেবারে কাবু করিয়া ফেলে। সকলকে বড় বড় উপদেশ দেয়, মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার মারাত্মক ত্রুটি আবিষ্কার করিয়া সকলকে জানাইয়া দেয়, মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার সহজ সরল পথ কি তাই নিয়া গবেষণা করে, তার ছেলে আর জামাই এমন! না জানি লোকে কি ভাবে? না জানি তার সব অকাট্য যুক্তিগুলিকে সকলে তার ছেলে আর জামাইয়ের কথা ভাবিয়া অনায়াসে কাটিয়া টুকরা-টুকরা করিয়া দেয় কিনা?

মেয়েটি সত্যপ্রিয়ের খুব সুশ্রী নয়, কিন্তু অনেক খুঁজিয়া অনেক টাকা খরচ করিয়া জামাই আনা হইয়াছে রূপবান। কি বঙ জামাইয়ের! যেন সোনার ওজনে সোনার পুতুলই সত্যপ্রিয়

কিনিয়া আনিয়াছে মেয়ের জন্য।

একজন আত্মীয়, যে কখনো সত্যপ্রিয়ের কাছে টাকা প্রত্যাশা করে না, সত্যপ্রিয় যাচিয়া দিতে গেলেও বোধ হয় যে বিশেষ দরকারের সময়ও তার টাকা নিবে না, সম্বন্ধ ঠিক করার সময় সে একবার বলিয়াছিল, 'আরেকটু চলনসই পাত্র আনলে হ'ত না?'

সত্যপ্রিয় মুখ ভার করিয়া বলিয়াছিল, 'কেন?'

'কি জান, তোমার মেয়েকে যদি ছেলেটির পছন্দ না হয়? নিজের চেহারার জন্যেই এ সমস্ত ছেলের মাথা গরম হয়ে থাকে, টাকার লোভে যদি বা বিয়ে করে, খুব সুন্দরী মেয়ে না পেলে নিজের সঙ্গে মানায়নি ভেবে মনটা হয়তো খুঁতখুঁত করবে।'

'সবাই কি তোমার মত ভাবপ্রবণ ভাই!'

'তা মানুষ একটু ভাবপ্রবণ বৈকি। টাকা দিয়ে গরীবের ছেলে কিনছ, ছেলে তোমাদের সকলের অনুগত হয়ে থাকবে বটে, কিন্তু তাতে কি ছেলে আর মেয়ের মনেব মিল হবে? আর মনের মিল যদি না হ'ল—'

কিন্তু সত্যপ্রিয় বুঝিতে পারে নাই। সে যাকে কিনিয়া আনিতেছে, বাড়িতে রাখিতেছে, জীবিকার উপায় করিয়া দিতেছে, তার মেয়ের মনে কষ্ট দেওয়ার মত স্পর্ধা কখনও তার হইতে পারে! বিবাহের এক বছরের মধ্যে মেয়ের মুখের হাসি নিভিয়া যাইতে দেখিয়া তাই সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। তারপর তার চোখের সামনে চিরস্থায়ী বিষাদ মেয়ের মুখকে আশ্রয় করিয়াছে, কেমন যেন উদাস উদাস চাহনি হইয়াছে মেয়ের।

অথচ যামিনীর স্বভাব খুব নম্র, তার মত শান্ত শিষ্ট নিরীহ গোবেচারী জামাই পাওয়াই কঠিন। সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে কখনো মুখ তুলিয়া কথা বলে না। বাড়ির কারো সঙ্গে কখনো তর্ক করে না। বৌ-এর সঙ্গে একটা দিনের জন্যও কোনদিন সে কলহ করিয়াছে বলিয়া কেউ শোনে নাই। চরিত্রও তার খারাপ নয়, হঠাৎ বড়লোকের জামাই হইয়া হাতে অনেক টাকা-পাইয়াও বাহিরে স্ফূর্তি করার দিকে তার এতটুকু টান দেখা যায় না।

তবে? যোগমায়া মাঝে মাঝে লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদে কেন?

নিরুপায় আপসোসে সত্যপ্রিয়ের হাত-পা কামড়াইতে ইচ্ছা করে। কিছুই করিবার নাই, কিছুই বলিবার নাই। যামিনী যদি মেয়েকে তার মারিত, মদ খাইয়া মাতলামি করিত কিংবা অন্য কোনো স্পষ্ট অপরাধে মেয়ের চোখের জল আনিত, সে তাকে উপদেশ দিতে পারিত, শাসন করিতে পারিত, চাপ দিয়া সিধা করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু এখানে যে কোন প্যাঁচ পর্যন্ত খাটানোর উপায় নাই! যামিনীর হ'তখরচের টাকাটা কোন ছুতায় বন্ধ করিয়া দিলে কি কিছু লাভ হইবে? মেয়ের মনে বরং তাতে কষ্ট হইবে আরও বেশি।

তা ছাড়া সমস্যা তো ওরকম নয়। যে উদ্ধত নয় তাকে নরম করা চলিবে কেমন করিয়া?

একদিন যামিনীর একটু জ্বর হইয়াছে, সামান্য সর্দিজ্বর, ব্যস্ত হওয়ার কিছুই ছিল না। কিন্তু সত্যপ্রিয় যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িল। ব্যাকুল হওয়াটাই সত্যপ্রিয়ের পক্ষে খাপছাড়া ব্যাপার, এমন সামান্য ব্যাপাবে তাকে ব্যাকুল হইতে দেখিয়া যামিনীও ভয় পাইয়া গেল যে, অসুখটা বুঝি তার ভয়ানক কিছুই হইয়াছে।

নিজে মোটরে করিয়া সত্যপ্রিয় যামিনীকে ডাক্তারের কাছে নিয়া গেল।

ফোনটা তুলিয়া নিয়া একটা করিয়া হুকুম দিলে যার বাড়িতে ডাক্তারের ভিড় জমিয়া যাওয়ার কথা, জামাইকে দেখানোর জন্য সে নিজে ডাক্তারের বাড়ি যাইবে, এ ব্যাপারটা সকলের বড়ই অসাধারণ মনে হইল। ভাবিয়া-চিন্তিয়া সকলে ঠিক করিল, হয়তো যামিনীর

এমন কোন অসুখ হইয়াছে যা পরীক্ষা করিতে বিশেষ কোন যন্ত্রপাতি লাগে, যে সব যন্ত্রপাতি নিয়া ডাক্তারের বাড়িতে আসিবার উপায় নাই। কিন্তু সত্যপ্রিয় নিজে গেল কেন? যদি বা গেল, কাউকে সঙ্গে নিল না কেন? এভাবে সে তো কখনো কোথাও যায় না!

ডাক্তারের বাড়ি দেখিয়া যামিনী অবাক। মারাত্মক রোগ হইয়াছে তার, মস্ত এক ডাক্তারের বাড়িতে তাকে নিয়া যাওয়া হইতেছে, এই ভাবনায় মুখখানা যামিনীর সর্দি-জ্বরের টসটসে ভাবের মধ্যেও শুকনো দেখাইতেছিল। কিন্তু বড় ডাক্তার কি গলির মধ্যে এমন একটা ছোট রঙ-চটা বাড়িতে থাকে, এমন চেহারা হয় তার বসিবার ঘরের? পুরানো একটা ওষুধের আলমারি, কয়েকখানা কাঠের চেয়ার আর একটা ময়লা কাপড়ঢাকা কাঠের টেবিল, তাতে পাঁচ ছ'খানা ডাক্তারি বই। ঘরের মাঝখানে সবুজ রঙ-করা চটের পার্টিশন দেওয়া, তার ওপাশে বোধ হয় রোগীকে পরীক্ষা করা হয়।

ডাক্তার সম্ভবতঃ প্রতীক্ষা করিতেছিল, সত্যপ্রিয়কে দেখিয়া খুব বেশি বিস্মিত হইল না। কেবল মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, 'আসুন, আসুন, বসুন!'

একজন মাত্র রোগী বসিয়াছিল, পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি যুবক। চেহারাটি শীর্ণকায়, চোখের নিচে কালিপড়া, মুখখানা তেলতেলা। তাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করার জন্য ডাক্তার বলিল, 'আচ্ছা, আপনি দিন সাতেক পরে আবার আসবেন। যা-যা বললাম করবেন আর ওষুধ দুটো নিয়ম মতো খাবেন।'

'রাত্রে ঘুম হবে তো ডাক্তারবাবু?'

যুবকটির গলা খুব মোটা আর কর্কশ কিন্তু কি যে গভীর হতাশা তার প্রশ্ন আর প্রশ্নের ভঙ্গিতে! রাত্রির ঘুমের কথা ভাবিয়া, এখন, এই সকাল বেলাই, সে যেন আতঙ্কে আধমরা হইয়া গিয়াছে।

ডাক্তার বলিল, 'হবে। শোবার আগে যে ওষুধটা দিয়েছি, ওটাতেই ঘুম হবে। ঘুম যদি না হয় কাল সকালে একবার আসবেন।'

সত্যপ্রিয় বলিল, 'তোমার রাত্রে ঘুম হয় না?'

অপরিচিত মানুষের অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে ছেলেটি এমন করিয়া চমকাইয়া উঠিল যেন স্নায়ুর কেন্দ্রে ঘা লাগিয়াছে, চোখের পলকে মুখখানা তার ফ্যাকাশে হইয়া গেল। সত্যপ্রিয়ের মুখের দিকে একনজর তাকাইয়াই চোখ নিচু করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

সত্যপ্রিয় প্রচণ্ড একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ছেলেবেলা থেকে ব্রহ্মচর্যের অভাব ঘটলে তো এরকম হবেই। কত ছেলে যে এমনি ক'রে আত্মহত্যা করছে! তাদের বা দোষ কি, সব শিক্ষার দোষ। মা বাপ যদি না খেয়াল রাখে, তারা ছেলেমানুষ, তাদের কি জ্ঞান বুদ্ধি আছে যে ভবিষ্যৎ ভেবে নিজেদের সামলে চলবে! কি বলেন ডাক্তারবাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বৈকি।'

ছেলেটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'আচ্ছা, আজ আসি ডাক্তারবাবু।' বোঝা গেল পালানোর জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সত্যপ্রিয় বলিল, 'বোসো একটু, তোমার ঘুমের জন্য একটা কথা বলে দিই। ওষুধের চেয়ে এতে তোমার বেশি কাজ হবে। শোয়ার আগে এক কাজ করবে, মেঝেতে জোড়াসন হয়ে মেরুদণ্ড সিধা ক'রে বসবে। এইখানে তোমার নাভিপদ্ম আছে জানো বোধ হয়? এখানে বাঁ হাত দিয়ে এইভাবে আস্তে স্পর্শ ক'রে থাকবে—আঙুলগুলি যেন সোজা থাকে আর পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকে, বুঝলে? ডান হাতটি এইভাবে মাথার তালুতে রাখবে। তারপর

চোখ বন্ধ ক'রে ভাববে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যত জীবিত প্রাণী আছে সব ধীরে-ধীরে ঘুমিয়ে পড়েছে। ' ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে নিও, কেউ যেন ঘরে না আসে। আর—'

ছেলেটি কাতরভাবে বলিল, 'আজ্ঞে, আমার ঘরে আমার চারটি ভাই-বোন শোয়, আমার বাপ-মাও ওঘরে থাকেন। ঘরে সব সময় লোক থাকে।'

'অন্য ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা ক'রে নিও।'

'আরেকটা ঘরে দাদা-বৌদি শোয়। আর ঘর নেই আমাদের।'

ছেলেটি আর দাঁড়াইল না, একরকম পলাইয়া গেল। এই অবহেলাতেই সত্যপ্রিয় জ্বালা বোধ করে সবচেয়ে বেশি। কেউ শুনিতে চায় না, তার এত দামী দামী কথাগুলি সাধ করিয়া কেউ ধৈর্য ধরিয়া শুনিতে চায় না। না শুনিয়া যাদের উপায় নাই, শুধু তারা শোনে, অন্য সকলে পালানোর জন্য ছটফট করে। এত হাল্কা মানুষের মন? ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া সত্যপ্রিয় বলিল, 'এই সব অপদার্থ ছেলের জন্যই দেশটা রসাতলে গেল।'

ডাক্তার সায় দিয়া বলিল, 'নিশ্চয়। ওদের কথা আর বলবেন না।'

তারপর পরীক্ষা হইল যামিনীর। তাকে সঙ্গে করিয়া চটের পার্টিশনের ওপাশে গিয়া মিনিট পনেরো পরে আবার ডাক্তার ফিরিয়া আসিল। যামিনীর সুন্দর মুখখানা তখন টুকটুকে লাল হইয়া গিয়াছে। এদিকে আসিয়া সে ঘাড় নিচু করিয়া সত্যপ্রিয়ের পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল।

সত্যপ্রিয় বলিল, 'তুমি গাড়িতে বোসো গিয়ে যামিনী। আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে আসছি।'

যামিনীকে পরীক্ষা করিল অজানা অচেনা গরীব এক ডাক্তার কিন্তু চিকিৎসা আরম্ভ করিল সত্যপ্রিয়ের পরিচিত মস্ত নাম-করা কবিরাজ। যামিনীব জন্য নানা অনুপানের সঙ্গে পাথরের খলে কবিরাজী বড়ি পেষণ করা হইতে লাগিল, অনেক রকম সুপাচ্য ও পুষ্টিকর পথ্যেব ব্যবস্থা হইল।

ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা সত্যপ্রিয় সমস্তই মানিয়া নিল, কিন্তু একটা বিষয়ে কবিরাজের সঙ্গে তাব মতের মিল হইল না। চিকিৎসার সময়টা যোগমায়াকে আত্মীয়ের কাছে পাঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাবে কবিবাজ ঘাড নাড়িল।

'ভালর চেয়ে তাতে মন্দই বেশি হবে মনে হয়।'

কিন্তু চিকিৎসকেরও সব কথা স্বীকার করা সত্যপ্রিয়ের পক্ষে অসম্ভব, এ-যুগের চিকিৎসকেরা কি জানে? জানিলেও সত্যপ্রিয়ের চেয়ে তো বেশি জানে না।

'ব্রহ্মচর্য পালন না করলে শুধু ওষুধ আর পথ্যে কি ফল হবে কব্‌রেজ মশায়?'

কবিরাজ মৃদু হাসিয়া বলিল, 'স্বামী-স্ত্রীকে গায়ের জোরে তফাৎ করলেই কি ব্রহ্মচর্য পালনের ব্যবস্থা হয়ে যায়? ওদের দেখা-সাক্ষাৎ হ'তে না দিলে ফলটা খারাপ হবে।'

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কবিরাজ একটু ভাবিল, তারপর বলিল, 'তা ছাড়া, আমার মনে হয় সবটাই আপনার অনুমান, আপনার জামাইয়ের কোন চিকিৎসার দরকার ছিল না। শ্রীমানের স্বাস্থ্য তো এমন-কিছু খারাপ নয়! ওর মানসিক স্বাস্থ্যই বরং একটু খারাপ যাচ্ছে।'

'তা বলতে কি বুঝাচ্ছেন?'

'বুঝাচ্ছি যে শ্রীমানের মনটা একটু বিকারগ্রস্ত, কোন আঘাত-টাঘাত পেয়েছে মনে কিংবা অনেকদিন থেকে কোন দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে আসছে। ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা না ক'রে খুব হৈ-চৈ ফূর্তি ক'রে দিন কাটাবার ব্যবস্থা করলেই বোধ হয় ভাল হ'ত।'

'হৈ-চৈ ফূর্তিটা কি রকম?'

'এই মনের আনন্দে থাকা আর কি। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে হাসি-তামাশা করা, খেলাধূলা ভাল লাগলে তাই করা, দেশ-টেশ বেড়ানো, ভাল লাগলে শিকার-টিকারে যাওয়া—কি জানেন, সবাইকার তো এক জিনিস পছন্দ নয়, যার যেদিকে মন যায়। একেবারে মদটদ খেয়ে গোল্লায় যাবার ব্যাপার যদি না হয়, বেশি বাঁধাবাঁধির চেয়ে অল্প-বিস্তর অসংযমও ভাল। শ্রীমান বড় বেশি ভয়ে-ভাবনায় দিন কাটায়—'

'কিসের ভয় ভাবনা?'

সত্যপ্রিয়ের মুখ দেখিয়া কবিরাজ কথার মোড় ঘুরাইয়া নিল। যে চিকিৎসা চায় উপদেশ চায় না, তাকে যাচিয়া উপদেশ দিয়া লাভ কি!

কবিরাজের সঙ্গে আলোচনার কয়েকদিন পরেই সত্যপ্রিয় মেয়েকে দেশে পাঠানোর আয়োজন করে। দেশের বাড়িতে আত্মীয়স্বজন আছে। সত্যপ্রিয়ের এক পিসতুতো বোন স্বামীপুত্র নিয়া অনেকদিন হইতে এখানে আছে, হঠাৎ তার দেশে গিয়া বাস করার শখ চাপিল। সত্যপ্রিয়ের ইঙ্গিতে অনেকের মনে অনেক রকম শখই জাগিয়া থাকে। ঠিক হয়, যোগমায়াও এদের সঙ্গে যাইবে।

প্রথমে যোগমায়া কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দেয়, তারপর যখন বুঝিতে পারে তাকে দেশে পাঠানোর ইচ্ছাটা সত্যপ্রিয়ের, তখন সে মুখ ভার করিয়া বলে, 'না বাবা, আমি এখন কোথাও যাব না।'

সত্যপ্রিয় বলে, 'ক'দিন বেড়িয়ে আয়। বিয়ের পর দেশের সবাই তোকে দেখতে চাচ্ছে।'

শুনিয়া যোগমায়া আর আপত্তি করে না। মেয়ে-জামাইকে দেশে আত্মীয়স্বজনকে দেখাইবার ইচ্ছা যদি সত্যপ্রিয়ের হইয়া থাকে, সে-তো ভাল কথা। স্বামীর সঙ্গে সর্বত্র যাইতেই সে রাজি আছে।

'দুশো টাকা দেবে বাবা আমায়?'

'বিয়ের পর তুই যে হরদম টাকা নিচ্ছিস।—কি করবি টাকা দিয়ে?'

'নতুন রকম একটা গয়না কিনব। আজকেই দাও বাবা—আজকেই কিনব।'

বিবাহের পর বাপের ভয়টা যেন যোগমায়ার একটু কমিয়াছে—সব মেয়েরই কমে। বিবাহের পর খুব কড়া মেজাজের বাপও মেয়ের সঙ্গে একটু খুশি মেজাজেই মেলামেশা করে, মেয়েকে কিছু স্বাধীনতা দেয়। বাপ ও মেয়ের মধ্যে অতিরিক্ত একটা সম্পর্ক যেন কোথা হইতে কি ভাবে গড়িয়া উঠে।

কিন্তু যোগমায়া যখন টের পায় তাকে একাই যাইতে হইবে, যামিনী সঙ্গে যাইবে না, তখন সে হঠাৎ বাঁকিয়া বসে। না, তার যাইতে ইচ্ছা করিতেছে না, সে যাইবে না। শরীরটা ভাল নয় তার। কি হইয়াছে? এই গা ম্যাজ-ম্যাজ করিতেছে, মাথা ঘুরিতেছে, আরও অনেক কিছু হইয়াছে।

সন্তানের এ রকম মুখোমুখি অবাধ্যতার অভিজ্ঞতা সত্যপ্রিয়ের জীবনে এই প্রথম। প্রথমটা সে কেমন থতমত খাইয়া যায়। তারপর ক্রোধে পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে থাকে।

পিসতুতো বোন বলে, 'কি করব দাদা, যাব! মায়া তো কিছুতে যেতে রাজি নয়। যামিনীর এমন অসুখের সময় ওকে ফেলে কোথাও যেতে চায় না।'

'তোমাদের সকলের মাথায় গোবর ভরা।'

নিজের দোষটা বুঝিতে না পারলেও পিসতুতো বোন মন্তব্যটায় সায় দিয়া চুপ

করিয়া থাকে।

দিন তিনেক পরে সত্যপ্রিয় জামাইকে তার ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বলে, 'যামিনী।'

যামিনী বলে, 'আজ্ঞে?'

'তোমার ভালোর জন্যেই বলা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'জীবনে উন্নতি করতে হলে অভিজ্ঞতা চাই।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমাদের দিল্লী ব্রাঞ্চের সাব-ম্যানেজার ক'মাসের ছুটি নিয়েছে। তার জায়গায় তুমি গিয়ে কাজ ক'রে আসতে পারবে না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, পারব বৈকি।'

ক্রুদ্ধ আহত মনে যামিনীর বিনয়ে একটু শান্তি বোধ হয়। নিজের মেয়ের চেয়ে পরের ছেলেই ভালো। শ্বেত পাথরের মেঝেতেই দু'জনে বসিয়াছিল, যামিনী ঘাড় নিচু করিয়া উসখুস্ করিতে থাকে। কি যেন বলিতে চায় কিন্তু বলিতে পারে না।

'কবে যেতে হবে?'

'কালকেই রওনা হয়ে যাও। নিয়মিত ওষুধ-পত্র খেয়ো। কবরেজ মশায়কে ব'লে দেব, ডাকে ওষুধ পাঠিয়ে দেবেন। আর সকাল-সন্ধ্যায় একটু যে যোগাভ্যাস শিখিয়ে দিয়েছি—'

'আমার কিছু টাকার দরকার ছিল।'

সত্যপ্রিয় হঠাৎ চুপ করিয়া যায়। কতগুলি বিষয়ে বুদ্ধিটা খুবই ধারালো, হঠাৎ তার মনে হয় জামাইয়ের সম্বন্ধে একটা নতুন তথ্য যেন আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছে।

'কত টাকা?'

'পাঁচশো।'

খুব লজ্জার সঙ্গে ভয়ে-ভয়েই যামিনী টাকার আবেদন জানাইয়াছে, তবু সত্যপ্রিয়ের মনে হয় মাঝে মাঝে দু'একজন তাকে ফাঁদে ফেলিয়া যেভাবে টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করে, যামিনীর টাকার দাবীটা যেন কতকটা সেই ধরনের। আপিসে নামমাত্র কাজের জন্য হাতখরচ বাবদ যামিনীকে মাসে দু'শ টাকা দেওয়া হয়। খরচ তার কি যে দুশো টাকাতেও কুলায় না? গম্ভীর হইয়া সত্যপ্রিয় একটু ভাবে, তারপর চেক বই বাহির করিয়া পাঁচশো টাকার একটা চেক লিখিয়া দেয়।

সারাটা দিন তার কেবলি মনে হইতে থাকে, চঞ্চলভাবে ছুটাছুটি করিতে করিতে যেন দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া সে শান্ত হইয়া গিয়াছে। একটা অদ্ভুত স্তব্ধতাভরা শান্তির শান্তভাব।

যামিনী দিল্লী রওনা হইয়া যায় আর অতদূরে অসুস্থ স্বামীকে কাজ করিতে পাঠানোর জন্য বাপের ওপর রাগ করিয়া যোগমায়া বাড়ির সকলের সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া দেয়। শুনিয়া সত্যপ্রিয় নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবে, সকলে কি অকৃতজ্ঞ! যার ভালর জন্য যা করি তাতেই তার রাগ হয়।

মাস দুই পরে পিসতুতো বোন একদিন সত্যপ্রিয়কে একটা খবর দেয়। শুনিয়া প্রথমটা সত্যপ্রিয় কথাটা বিশ্বাস করিতেই চায় না।

'কার ছেলে হবে?'

'মায়ার। এই চার মাস।'

সংবাদটা এমন খাপছাড়া মনে হয় যে সত্যপ্রিয় তবু বোকার মত আবার জিজ্ঞাসা করে, 'ভুল হয়নি তো তোমাদের?'

দিল্লীর সাব-ম্যানেজার তিন মাসের ছুটি নিয়াছিল। যামিনী তিনমাস কাজ করিবার জন্য সেখানে গিয়াছে। দু'চারদিনের মধ্যেই তাকে সেখানে স্থায়ী করার নির্দেশপত্র পাঠানোর কথাটা সত্যপ্রিয় ভাবিতেছিল। এবার একেবারে চুপ করিয়া যায়। সহজে সত্যপ্রিয় লজ্জা পায় না, হঠাৎ যেন মেয়ের কাছে মুখ দেখাইতে তার লজ্জা করিতে থাকে। কেবল মেয়ের কাছে নয়, আরো অনেকের কাছে। জানিয়া বুঝিয়া ইচ্ছা করিয়া সত্যপ্রিয় অনেক ব্যাপারে বাহাদুরী করিয়াছে, এমন অনেক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছে যেদিকে তার তাকানোই উচিত ছিল না, কিন্তু কারো কাছে কোনদিন এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করে নাই। মনে মনে বরং নিজের সর্বব্যাপী প্রভুত্বে গর্বই অনুভব করিয়াছে। কিন্তু মেয়ে আর জামাইয়ের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়া এত বড় একটা ভুল করার জন্য সঙ্কোচ বোধ না করার ক্ষমতা সেও নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পায় না।

ছি, কি কদর্য ভুল!

মাসখানেক পরে যামিনী ফিরিয়া আসিল। শোনা গেল, যোগমায়ার মুখে নাকি হাসি ফুটিয়াছে।

দিন পনের পরে একদিন সকালে যামিনী মুখ কাঁচুমাচু করিয়া সত্যপ্রিয়ের কাছে শ'তিনেক টাকা চাহিল। তার বিশেষ দরকার।

সত্যপ্রিয় বলিল, 'সেদিন তোমায় পাঁচশো টাকা দিয়েছি যামিনী।'

সন্ধ্যার পর যোগমায়া আসিয়া আব্দার করিয়া বলিল, 'আমায় তিনশো টাকা দেবে বাবা?

সত্যপ্রিয় বলিল, 'সেদিন তোকে দুশো টাকা দিয়েছি মায়া।'

পরদিন শোনা গেল, যোগমায়ার মুখ কালো হইয়া গিয়াছে। চোখ দেখিয়া বুঝা গেল, রাত্রে খুব কাঁদিয়াছে। ঘুম ভাঙার পর হইতে যামিনীর আপিস যাওয়া পর্যন্ত একবার ধারে-কাছেও ঘেঁষিল না দেখিয়া বোঝা গেল দু'জনে ঝগড়া হইয়াছে।

সন্ধ্যার পর মেয়েকে ডাকিয়া সত্যপ্রিয় তিনশ টাকার একখানা চেক তার হাতে দিল। যোগমায়া নীরবে চেক হাতে করিয়া চলিয়া গেল।

আপিসে সেদিন একজন লোক সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। মহীতোষ তার কাছে সাড়ে তিন হাজার টাকা ধার নিয়াছিল, যতদিন পাবে অপেক্ষা করিয়া একেবারে শেষদিন লোকটি অগত্যা সত্যপ্রিয়ের কাছে আসিয়াছে।

'কোটিপতি মানুষ আপনি, আপনার ছেলের নামে এ ক'টা টাকার জন্য নালিশ করব? আমি কি পাগল? আমি জানি আপনার কাছে এসে দাঁড়ালেই টাকা পাওয়া যাবে। দু'মাস ছ'মাস অপেক্ষা করব তাতে আর কথা কি? তবে কি জানেন, হঠাৎ বড় দরকার পড়ে গেল টাকাটার — আজকের মধ্যে না পেলে নয়।'

পরদিন কোর্টে নালিশ রুজু না করিলে দেনাটা তামাদি হইয়া যাইবে।

সত্যপ্রিয় নীরবে একটা চেক লিখিয়া দিয়াছিল।

অন্ধকার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া সত্যপ্রিয় ভাবিতে থাকে। দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতির সমস্যার কথা নয়। অন্য কথা।

বুদ্ধিটা সত্যপ্রিয়ের সত্যই তীক্ষ্ণ। কিন্তু কতকগুলি ব্যাপারে মানুষের তীক্ষ্ণবুদ্ধি বুঝিবার

কাজেই শুধু লাগে, মানুষ বুঝিতে চায় না। সত্যপ্রিয় জানে, একই মানুষের মধ্যে এরকম সমাবেশ ঘটে না, তবু সে আশা করে গরীব মা-বাপকে পাঠানোর জন্য জামাই তার যদিও বা যোগমায়াকে কষ্ট দিয়া তার কাছে টাকা আদায় করার উপায়টা অবলম্বন করিয়াছে, মানুষটা সে আসলে ভাল, মনটা তার নিশ্চয় নরম, টাকার ব্যবস্থার জন্য ছাড়া অন্য কোন কারণেই তার মেয়েকে হয়তো সে কষ্ট দেয় না। যামিনী যে বাপকে পাঠানোর জন্য টাকা আদায় করে সম্প্রতি এটা সত্যপ্রিয় টের পাইয়াছে।

টাকা আদায় করিবার উপায় থাকিলে, তা সে স্ত্রীর উপর চাপ দিয়াই হোক আর যে ভাবেই হোক, টাকা আদায় করাকে সত্যপ্রিয় বিশেষ সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার বলিয়া মনে করে না, খুব বেশি অন্যায় বলিয়াও গণ্য করে না। যত মানুষকে সে চেনে তারা সকলেই টাকা টাকা করিয়া পাগল। তাই নিয়ম সংসারে। কেবল নিজের মেয়ে জামাইয়ের ব্যাপার বলিয়াই তার একটু খারাপ লাগিতেছে।

নরনারী সম্পর্কে যে মনের মিল বলিয়া একটা খুব বড় রকমের ব্যাপার আছে, সোজাসুজি অবিচার অত্যাচার না করিয়া, এমন কি রীতিমত ভাল ব্যবহার করিয়াও যে একজন আরেক-জনকে অবহেলা করিতে পারে, মিষ্টি ভদ্রতার সম্পর্ক আর স্নেহ-মমতার সম্পর্কের মধ্যে যে তফাৎ অনেক, সত্যপ্রিয় তা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছে। পুরুষমানুষ যদি অকারণে মেয়ে-মানুষকে মারধোর গালাগালি না করে, তবে আর মেয়েমানুষের সুখের জন্য কি দরকার হইতে পারে সে বুঝিতে পারে না।

কিন্তু যোগমায়ার অসুখী মন আজকাল নানা দিক দিয়া নানাভাবে আসিয়া তাকে ক্রমাগত আঘাত করে। সাধারণ অবস্থায় হয়তো সে খেয়ালও করিত না, কিন্তু এ দিকে এখন তার মন গিয়াছে। দেশের স্বাধীনতা চাহিলে যে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না বরং না চাইলেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাওয়া যায় এই সমস্যার মত, কন্যার বিবাহিত জীবনটাও তার কাছে এখন একটা সমস্যা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মেয়ে যে অসুখী হইয়াছে এর চেয়ে তার যেন বেশি যন্ত্রণা বোধ হয় এই ভাবিয়া যে মেয়েকে সুখী করিবার জন্য নিজে সে পাত্র ঠিক করিয়া মেয়ের বিবাহ দিয়াছে, অথচ মেয়ে সুখী হয় নাই।

ব্যবসার একটি সমস্যার মত ব্যাপারটাকে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে করিতে কয়েক দিনের মধ্যেই খুব ভাল একটি সমাধান আবিষ্কার করিয়া ফেলে। ব্যাপারটা তো মূলত এই। মেয়েকে সুখী করার ভার সে জামাই-এর উপর ছাড়িয়া দিয়াছে এবং সে জন্য খরচ করিয়াছে অনেক টাকা। তার মেয়েকে সুখী করার দায়িত্বটা জামাই-এর। জামাই যদি কাজটা না পারিয়া থাকে, তাকে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার, দায়িত্বটা সে পালন করিতে পারে নাই। সেই সঙ্গে এটাও বুঝাইয়া দেওয়া দরকার, দায়িত্বটা ভালভাবে পালন না করিলে তার নিজের অবস্থাটাও সুবিধা দাঁড়াইবে না। অনেক কর্মচারী আর এজেন্টের ভোঁতা মাথায় এই জ্ঞানটুকু ঢুকাইয়া দিয়া অনেক দায়িত্বপূর্ণ কঠিন কাজ সে করাইয়া নিয়াছে।

এই সহজ কথাটা এতদিন কেন মনে হয় নাই ভাবিয়া সত্যপ্রিয় একটু আশ্চর্য হইয়া যায়। একদিন যামিনীকে ডাকিয়া বলে, 'তোমার মনের অবস্থাটা বড় খারাপ দেখছি। তোমার মুখ দেখে যোগমায়ার মুখখানাও সব সময় শুকিয়ে থাকে। তা তুমি এক কাজ কর, ক'দিন বাপমা'র কাছ থেকে এসো গে। আজকেই চলে যাও, এইবেলা, এইমাত্র— জিনিসপত্র থাক।'

যামিনী আমতা আমতা করিয়া বলিবার চেষ্টা করে, 'আজ্ঞে, আমার মনের অবস্থা—'

'পথের খরচ বাবদ এই চার টাকা দিলাম, গাড়িভাড়া তিনটাকা চৌদ্দ পয়সা, নয়? মন

সুস্থ না ক'রে, মানে, মনের অবস্থা না বদ্‌লে এসো না।'

এক ঘণ্টার মধ্যে জামাই বিদায় হইয়া গেল।

জামাইকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ভাবিতে গেলে সকলের মাথা ঘুরিয়া যায়। তাও কি সম্ভব? কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সকলে ভাবে, ভিতরে কিছু আছে। কোন কাজে যামিনীকে পাঠানো হইয়াছে, কোন উদ্দেশ্যে। সত্যপ্রিয়ের অদ্ভুত কাজ আর উদ্দেশ্যের তো অন্ত নাই।

কিন্তু কাজটা কি? কি উদ্দেশ্য সত্যপ্রিয়ের?

রওনা হওয়ার সময় সত্যপ্রিয় যামিনীকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমায় কেন পাঠিয়ে দিচ্ছি বুঝতে পেরেছ তো বাবাজি?'

'আজ্ঞে না, ঠিকমত—'

এত করিয়াও যদি না বুঝানো গিয়া থাকে তবে আর এ অপদার্থের কাছে কি আশা করা যায়! সত্যপ্রিয় বড়ই ক্ষুণ্ন হয়!

'বুঝতে পারলে লিখে জানিও। আমি সঙ্গে সঙ্গে সব ব্যবস্থা করব ফিরে আসার।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, জানাব বৈকি, নিশ্চয়।'

যামিনী চলিয়া গেলে সত্যপ্রিয় ভাবে, মাসে মাসে এতগুলি টাকা হাতে পাইয়া আর এমন আরাম ও উৎসবের মধ্যে দিন কাটাইয়া গিয়া টাকা আর আরামের অভাবটাও যদি সেখানে তাঁকে আসল ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিতে না পারে, তবে আর কিছু না বুঝাইলেও চলিবে।

তবু, কয়েকদিন পরেই সে যামিনীর কাছে একখানা পত্র পাঠাইয়া দেয়। জামাইয়ের কাছে এরকম কবিত্বপূর্ণ পত্র লেখা সত্যপ্রিয়ের মত মানুষের পক্ষে শুধু নয়, অনেকের পক্ষেই উদ্ভট আর খাপছাড়া। সত্যপ্রিয়ের পত্রের মর্ম এই যে, বিবাহের পর হইতে মেয়ের মুখ তার বিষণ্ণ, যাই হোক, এবার যামিনী ফিরিয়া আসিবার পর বোধ হয় তার মুখে হাসি ফুটিবে। অন্ততঃ যামিনী যে হাসি ফুটাইবে তাতে সন্দেহ নাই।

ছয়

যশোদা ভাবিয়াছিল শ্রমিকদের সঙ্গে তার সম্পর্ক বুঝি চিরকালের জন্যই চুকিয়া গিয়াছে। বহুদিন নিজের বাড়ি দু'টিতে অনেকগুলি ওই শ্রেণীর নরনারীকে আশ্রয় দিয়া, দু'বেলা কুড়ি-বাইশ জনের জন্য ভাত রান্না করিয়া, এখানে-ওখানে দু'চারজনের কাজ জুটাইয়া দিয়া, বিপদে আপদে পরামর্শ দিয়া আর সাহায্য করিয়া তার মনে একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল, ঠিক ওভাবে ছাড়া এসব মানুষের সঙ্গে আর কোনরকম সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে না।

সম্পর্কটা গড়িয়া উঠিয়াছিল আপনা হইতে, স্বাভাবিক ভাবে। প্রথমে ওদের কেবল ভাড়াটে হিসাবে যশোদা বাড়িতে থাকিতে দিয়াছিল মাত্র, ওদের সুখ-দুঃখ ভাল মন্দের ভাবনাটাও যে তাকে একদিন ভাবিতে হইবে সে তখন এ কথাটা কল্পনাও করিতে পারে নাই। চোখের সামনে এই শ্রেণীর জীবগুলির কয়েকজন প্রতিনিধির জীবনযাপনের প্রক্রিয়া দেখিতে দেখিতে যশোদা টের পাইয়াছিল, এরা সব বয়স্ক শিশুমাত্র, অভাবে আর চাপে খানিকটা বিগড়াইয়া গিয়াছে। একটু একটু করিয়া তখন মায়া জাগিয়াছিল যশোদার মধ্যে। একটু একটু করিয়া তারপর সে জড়াইয়া গিয়াছিল ওদের জীবনের সঙ্গে। চাঁদের জন্য সব

সময় যশোদার মনটা তখন হু-হু করিত, এতগুলি বয়স্ক শিশুকে পাইয়া শোকটা তার কমিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু ওরা তাকে ত্যাগ করিয়াছে। সত্যপ্রিয়ের কারসাজিতে আর তাকে ওরা বিশ্বাস করে না। তাকে শত্রু জানিয়া, তার সংস্পর্শে আসিলে বিপদ ঘটিবে জানিয়া, সকলে তফাতে সরিয়া গিয়াছে। ওদের ভালবাসিবার ভান করিয়া সে উপরওয়ালাদের স্বার্থসাধনের সাহায্য করে, ওদের ন্যায্য দাবী ত্যাগ করায়, ধর্মঘট ভাঙিয়া দেয়, কাজ হইতে তাড়ায়। এতকাল পরে যশোদার সম্বন্ধে ওদের এই ধারণা জন্মিয়াছে!

অর্থহীন অভিমানকে প্রশ্রয় দেওয়ার মানুষ যশোদা নয়, কোন ব্যাপারকে ব্যক্তিগত কল্পনার বাষ্পে সে ফাঁপাইয়া তোলে না। বাঁচিয়া থাকাটাই যাদের পক্ষে একটা বীভৎস সংগ্রাম, অত কৃতজ্ঞতার ধার ধারিলে কি তাদের চলে? কৃতজ্ঞতাও ওদের যথেষ্টই আছে। কাজ না থাকার সময় দুদিন যাকে যশোদা খাইতে দিয়াছে, কাজ পাওয়ার পরেও যশোদার একটি ধমকে সে যে কাঁদ-কাঁদ হইয়া যাইত, বসিয়া বসিয়া যশোদা দু'দণ্ড সুখ-দুঃখের গল্প করিলে যে কৃতার্থ বোধ করিত. এ কি কৃতজ্ঞতা নয়? কিন্তু যখন জানা গেল যশোদা তলে তলে তাদের ক্ষতিই করে, যশোদার বাড়িতে থাকিলে কাজ থাকে না, শ্রমিক সমিতি হইতেও যখন উপদেশ দেওয়া হইতে লাগিল যশোদাকে বর্জন করিবার, ওদের তখন আর কি করিবার ছিল?

এসব কথা যশোদা ভাবিয়াছে। কিন্তু মন তার অবুঝ হইয়া পড়িয়াছে, কিছুই আর মানিতে চায় না। সুবর্ণকে নিয়া উধাও হইয়া গিয়া নন্দ তাকে আরও বেশি কাবু করিয়া দিয়াছে। নিজেকে যশোদার কেমন অপরাধী মনে হয়। মনে আর জোর পায় না। যুক্তি তর্ক দিয়া মনকে বুঝাইয়া মনের জোর তো আর বাড়ানো যায় না।

তাই, কেবল শ্রমিকরা যে তাকে ত্যাগ করিয়াছে তা নয়, সেও একরকম ওদের ত্যাগ করিয়াছে। সত্যপ্রিয়-মিলের কেউ না আসুক, অন্য মিলের অনেকে মাঝে মাঝে যশোদার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে, কেউ আসিয়াছে বিপদে পড়িয়া, কেউ আসিয়াছে কাজের সন্ধানে, কেউ আসিয়াছে নিছক দু'দণ্ড যশোদার সঙ্গে বসিয়া গল্প করিবার জন্য। সকলে যে তাকে ত্যাগ করে নাই তার এতবড় একটা প্রমাণও যশোদাকে কিন্তু খুশি করিতে পারে নাই।

সোজাসুজি কড়া সুরে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, 'কি চাই?'

কি চাই অর্ধেকটা শুনিতে না শুনিতে বলিয়াছে, 'আমি পারব না। আমার কাছে এসেছ কেন?'

মনটা যশোদার সত্যিই একটু বিগড়াইয়া গিয়াছে।

তবু মনের কোণে হয়তো যশোদার ক্ষীণ একটু আশা বা ইচ্ছা ছিল, একদিন আবার বাড়িতে তার কুলি-মজুরেরা বাসা বাঁধিবে, আবার সে দু'বেলা ওদের ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইবে। কিন্তু রাজেনের প্ররোচনায় বাড়িতে ভদ্র ভাড়াটেদের আনিবার পর সে-আশাও যশোদার ঘুচিয়া গিয়াছে। তাছাড়া যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তার বাড়ির চারিদিকের সহরতলীতে, তাতে কুলি-মজুরদের এখানে আর বাস করাও বোধ হয় সম্ভব নয়। চারিদিকের সহুরে ভদ্র আবহাওয়ার চাপে বেচারাদের দম আটকাইয়া আসিবে, এক মুহূর্তের স্বস্তি থাকিবে না।

কিন্তু আবার অন্য দিক দিয়া কুলি-মজুরদের সঙ্গে যশোদার যোগাযোগ টিকিয়া গেল।

একদিন রাজেন মাঝবয়সী এক ভদ্রলোককে আনিয়া হাজির, যশোদার সঙ্গে আলাপ

করিবে। কেন আলাপ করিবে, মানুষটার নাম কি, কি করে, কিছুই রাজেন প্রথমে বলিল না। লোকটিও ঘণ্টাখানেক এ-বিষয়ে সে-বিষয়ে এলোমেলো আলোচনা করিয়া উঠিয়া গেল। আলাপ করিতে যে আসিয়াছে সে শুধু আলাপ করুক, যশোদার তাতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এ কোন্ দেশী আলাপ? একেবারে যেন অনেকদিনের পরিচয় ছিল, খানিক্ষণ বসিয়া বাজে গল্পে আনন্দ করিয়া চলিয়া গেল। লোকটি বসিয়া থাকিতে থাকিতেই যশোদা কয়েকবার রাজেনের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, কিন্তু লোকটি বিদায় হওয়ার আগে তার কাছে একটি কথাও শুনা গেল না।

'আসছি' বলিয়া লোকটির সঙ্গে উঠিয়া গিয়া রাজেন ফিরিয়া আসিল।

'কেমন লাগল লোকটিকে চাঁদের-মা?'

'তা যেমনি লাগুক, আগে বল তো শুনি মানুষটা কে?'

'খুব নাম-করা লোক গো –বিধুবাবু।'

বিধুবাবুর নাম যশোদাও শুনিয়াছে, শ্রমিক নেতা হিসাবে লোকটি সত্যই এতখানি বিখ্যাত যে এভাবে বাড়ি আসিয়া যশোদার সঙ্গে আলাপ করিয়া যাওয়া সত্যই বিস্ময়ের ব্যাপার!

'বিধুবাবু! বিধুবাবু আমার সঙ্গে আলাপ করতে এলেন কেন?'

রাজেনের চেয়ে সে-কথা বিধুবাবুই যশোদাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিল, দিন তিনেক পরে। আবার তেমনিভাবে অসময়ে আসিয়া আলগোছে একটি মোড়াতে বসিয়া বলিল, 'তা'হলে পর্শুর সভাতে যাচ্ছ তো দিদি?'

আগের দিন বিধুবাবু তাকে 'তুমি'ও বলে নাই, দিদিও বলে নাই। যশোদা আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'কিসের সভা?'

বিধুবাবু আরও বেশি আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'কেন রাজেন বলেনি?'

'কই, না?'

সঙ্গে সঙ্গে বিধুবাবু হাসির শব্দে যশোদার বাড়ি সরগরম হইয়া উঠিল।—'তা রাজেন ওই রকম মানুষই বটে! আমি কে তা তো বলেছে, না তাও বলেনি?'

'প্রথমে বলেনি, আপনি যাওয়ার পর বলেছে।'

যশোদারও হাসি আসিতেছিল। প্রথমদিন বিধুবাবুর তবে ধারণা ছিল যশোদা তার নাম-ধাম আর দেখা করিতে আসার উদ্দেশ্য সমস্তই জানে, তাই পরিচয়ও দেয় নাই, কাজের কথাও বলে নাই। লোকটিকে যশোদার ভাল লাগিতে থাকে। এরকম লোকই ভাল, যারা অকারণে প্রথম পরিচয়ের দিন অনাবশ্যক ব্যগ্রতার সঙ্গে বড়-বড় কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া আরও বড় প্রয়োজন যে চেনা হওয়া, তাতে বাধা সৃষ্টি করিয়া বসে না।

দু'দিন পরে শ্রমিকদের একটি সভা হইবে, সাধারণ সভা। প্রথমে কর্মীদের সভা, তারপর শ্রমিকদের। বিধুবাবু যশোদাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিয়া যাইতে চায়, ব্যাপারটা একটু দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া আসিবে। তারপর যশোদার ইচ্ছা হয়, সমিতির মধ্যে ভিড়িয়া গিয়া একটু কাজ করিতে চায় সে তো আনন্দের কথা। আর ভিড়িতে যদি না চায় নাই ভিড়িবে। একবার গিয়া দেখিয়া আসিতে দোষ নাই।

'সমিতি-টমিতির সঙ্গে কি আমার বনবে বিধুবাবু? সমিতির লোকেরা আমার ওপর চটে আছে, কত কথাই রটিয়েছে আমার নামে।'

'ওসব লোকেশবাবুর কাজ দিদি। লোকেশবাবুর একটু বাড়াবাড়ি আছে কিনা সব বিষয়ে, সমিতির মেম্বার না হয়ে কেউ শ্রমিকদের ভাল করবে তা পর্যন্ত সহ্য হয় না। আগের কথা

ভুলে যাও দিদি, তোমাকে আমাদের চাই।'

অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়া অনেকক্ষণ ভাবিয়া যশোদা সভায় যাইতে রাজি হইয়া গেল।

বিদায় নেওয়ার আগে যশোদা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার কথা শুনলে কার কাছে? রাজেন বলেছে বুঝি?'

বিধুবাবু বলিল, 'সত্যপ্রিয়-মিলের কাণ্ডটার সময় আমি ছিলাম পশ্চিমে। এসে অনেক বকম কথা শুনলাম। তোমার কথা তো আগে থেকে সব জানতাম দিদি, তাই শুনে মনে হ'ল, এ তো বড় খাপছাড়া ব্যাপার হচ্ছে। তারপর রাজেন একদিন আমায় বললে বসে বসে, মরচে ধরায় বড় কষ্ট পাচ্ছ। আমারও একটু দরকার ছিল, তাই তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম। সত্যপ্রিয় মিল বড় করছে জানো?'

'শুনেছি।'

বিধুবাবু খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যশোদার মুখের ভাব দেখিতে থাকে। বড় ধারালো দৃষ্টি বিধুবাবুর, দেখিলেই বুঝা যায় মানুষটা সে ভয়ানক নিষ্ঠুর। তবে এটুকু যশোদা আগেই বুঝিয়াছিল, অন্যকে কষ্ট দিয়া আনন্দ পাওয়ার নিষ্ঠুরতা এটা নয়, এ নিষ্ঠুরতা জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া, যে প্রতিক্রিয়ায় মনের কোমলতা আর ভাবপ্রবণতা গোড়া শুদ্ধ উপড়াইয়া যায়; সাধারণ আলাপেই এটা বেশ বোধগম্য হয়। তাছাড়া, যেভাবে বিধুবাবু হাসে তার মধ্যেও তার মনের এ পরিণতির প্রমাণ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। এ রকম হাসির সঙ্গে যশোদার পরিচয় আছে, তার পরিচিত আরেক জন লোক এভাবে হাসিত। সমস্ত ব্যাপারে যারা কৌতুক বোধ করে, মর্মান্তিক বেদনায় কাঁদিবার সময়ও একজনকে খাপছাড়া মুখের ভঙ্গি করিতে দেখিয়া যাদের হাসি পায়, কেবল তারাই এ রকম হাসি হাসিতে পারে।

এ রকম লোককে কিন্তু এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস করা যায়। এদের আর যাই থাক, কিছুমাত্র স্বার্থপরতা থাকে না। পরের জন্য বেশি মন না কাঁদুক, নিজের ভাবনাটা এরা একেবারেই ভাবে না।

সেদিন খাওয়ার সময় সুব্রতা বলিল, 'আমরাও আজ এক জায়গায় যাচ্ছি দিদি।'

অজিত তাকে আজ সিনেমায় নিয়া যাইবে। খবরটা দেওয়ার সময় সুব্রতা মুচকি মুচকি হাসে। যশোদাও হাসে।'

'আমায় নিয়ে যাবে না?'

'তুমি না কোথায় যাচ্ছ আজকে?'

'ও, তাই আজ তোমরা সিনেমার যাচ্ছ, আমায় ফাঁকি দেবার সুযোগ পেয়ে!'

বলিয়া প্রচণ্ড শব্দে যশোদা হাসিতে থাকে। এই সামান্য পরিহাসে এত জোরে হাসিবার কি ছিল সে-ই জানে, হাসিটা বিধুবাবুর মত হইতেছে খেয়াল করিয়া হঠাৎ সে থামিয়া যায়।

তারপর সুব্রতা যে খবরটা দেয় সেটা একটু মারাত্মক। একজনেব গাড়িতে তারা সিনেমায় যাইবে. এদিকেই কোথায় সত্যপ্রিয় বলিয়া একজন মস্ত বড়লোক থাকে, তার ছেলের গাড়িতে। কবে যেন অজিত তার সঙ্গে কোন্ স্কুলে পড়িয়ছিল, হঠাৎ ক'দিন আগে দেখা হইয়া গিয়াছে। তারপর তাদের পরামর্শ হইয়াছে পরস্পরের বৌকে নিয়া আজ তারা একসঙ্গে সিনেমায় যাইবে, আলাপ-পরিচয়ও হইবে, একটু আনন্দও করা হইবে।

পাকা গিন্নির মত মুখ করিয়া সুব্রতা বলিতে থাকে, 'আমার কি আর সিনেমা-টিনেমায় যাওয়ার শখ আছে দিদি? কি করব, বন্ধু বড় ধরেছে। ও কি বলছিল জানো দিদি? বন্ধুর

বাপ নাকি বৌকে নিয়ে ছেলের কোথাও যাওয়া দু'চোখে দেখতে পারে না, ভীষণ চটে যায়। সেকেলে ভূত আর কি। বাপ নাকি কোথায় গিয়েছে ক'দিনের জন্য, ছেলেও বৌকে নিয়ে খুব বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।'

মহীতোষকে যশোদা জানে, ছেলেটার বুদ্ধি একটু কাঁচা। সকলে তাকে সেকেলে, গেঁয়ো আর অসভ্য মনে করে ভাবিয়া বড়ই মনের কষ্টে সে দিন কাটায়। বাহিরের লোকের সঙ্গে কথায় ব্যবহারে সে বিনয়ের অবতার, যশোদার সঙ্গে পর্যন্ত এমন মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কথা বলে যে দেখিলে হাসিও পায়, মমতাও হয়। তাতে ঘুমের মধ্যেও হয়তো বাপের ভয়ে মহীতোষ চমকিয়া জাগিয়া ওঠে, কিন্তু বাড়িতে যারা আশ্রিত ও আশ্রিতা, অফিসে ও কারখানায় যারা জীবিকার প্রত্যাশী তাদের সঙ্গে তার ব্যবহার বড় খারাপ। কথায় কথায় কারণে অকারণে রাগিয়া যায়, গালাগালি দেয়, অপমান করে। অজিতের সঙ্গে মহীতোষের বন্ধুত্ব না হয় আছে, কিন্তু মহীতোষ কি জানে না বন্ধু তার যশোদার বাড়িতে থাকে? যশোদার বাড়ির ভাড়াটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার সাহস সে পাইল কোথায়?

শ্রমিক সমিতির সভায় গিয়া যশোদা যে বিশেষ খুশি হইল তা বলা যায় না, তবে তেমন খারাপও তার লাগিল না। পরিচালক সমিতির সভায় বড় বেশি তর্ক চলে, নিজের নিজের মতামতটা জাহির করিবার জন্য অনেকে বড় ব্যস্ত। বড় বড় কথাও অনেক বলা হয়, একেবারে নাটকীয় ভঙ্গিতে, অবরুদ্ধ একটা উত্তেজনা যেন বক্তার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তবে সকলে এরকম নয়, শান্ত ও সংযত মানুষও কয়েকজন আছে, ভাবিয়া চিন্তিয়া হিসাব করিয়াই যারা কথা বলে। কিন্তু এদেরও আসল বক্তব্যটা যশোদা আগাগোড়া ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। খানিকক্ষণ হয়তো কথাগুলি জলের মত পরিষ্কার বুঝা যাইতে লাগিল তারপর হঠাৎ কখন কি ভাবে যে সমস্ত বিষয়টা জটিল আর দুর্বোধ্য হইয়া গেল কিছুই যশোদার মাথায় ঢুকিল না। তবে সেজন্য এদের সে দোষ দিল না, অপরাধটা ধরিয়া নিল নিজের বুদ্ধির।

এরা সমস্ত জগতের শ্রমিকদের অবস্থা জানে, শ্রমিক সমস্যা এরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করিয়াছে, এদের সমস্ত তর্ক-বিতর্ক পরিষ্কার বুঝিবার মত জ্ঞান সে কোথায় পাইবে? তার মত ঠেক্‌নো দিয়া দশ-বিশজন শ্রমিককে কোন রকমে খাড়া রাখিবার ব্রত এদের নয়, ধনিকতন্ত্রের চোরাবালির গ্রাস হইতে সমস্ত শ্রমিককে বাঁচাইয়া শক্ত মাটিতে তাদের দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা এদের কাজ।

সে কাজের বিরাটত্ব কল্পনা করিয়া যশোদার মাথা ঘুরিয়া যায়। কুলি-মজুরের সঙ্গে সে মিশিয়াছিল, তাদের কয়েকজনকে ভালবাসিয়াছিল, একটা শ্রেণী হিসাবে তাদের কথা কখনো ভাবিয়া দ্যাখে নাই। আজ সকলের আলোচনা হইতে শ্রমিক সমস্যার স্বরূপ তার কাছে যতটুকু প্রকট হইয়া উঠিল তাতেই সে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

শ্রমিকসভার বক্তৃতাগুলি যশোদার ভাল লাগিল না। প্রত্যেকটি বক্তা প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসই শুধু বিতরণ করিয়া গেল, কোন বিষয়েই একটু ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা কারো দেখা গেল না। বক্তৃতাগুলি জোরালো হইল সন্দেহ নাই, শ্রমিকদের উপর যথেষ্ট প্রভাবও দেখা গেল বক্তৃতায়, কিন্তু এরকম প্রভাব কি স্থায়ী হয়? কাজে লাগে?

হয়তো লাগে। যা ওদের করা উচিত সেটা কেন করা উচিত বুঝাইয়া দেওয়ার বদলে এমনি বক্তৃতার সাহায্যে করাইয়া নেওয়াই হয়তো সহজ ও সম্ভব।

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে রাত প্রায় ন'টার সময় বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া যশোদার চোখে পড়িল, তাদের গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া আছে সত্যপ্রিয়ের প্রকাণ্ড গাড়ি। ভিতরে একা

বসিয়া আছে একটি অল্পবয়সী বৌ। পাশ কাটাইয়া যশোদা গলির মধ্যে ঢুকিতে যাইতেছিল, বৌটি ক্ষীণস্বরে ডাকিয়া বলিল, 'চাঁদের-মা, ও চাঁদের-মা, শুনুন।'

বৌটি কে এবং এখানে গাড়ির মধ্যে একা কেন বসিয়া আছে যশোদা আগেই অনুমান করিয়াছিল। কাছে আসিতে মহীতোষের বৌ বলিল, 'ওঁকে একটু শীগ্‌গির পাঠিয়ে দেবেন চাঁদের-মা?'

'তা দিচ্ছি, কিন্তু তোমায় একা বসিয়ে রেখে কি ব'লে নেমে গেল বাছা?'

'কথা কইতে কইতে এগিয়ে গেছেন।'

বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়াইয়া মহীতোষ, অজিত আর সুব্রতার মধ্যে তখনো কথা চলিতেছিল। অজিত বা সুব্রতা যে মহীতোষকে আটকাইয়া রাখে নাই, মহীতোষ দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে বলিয়াই দু'জনে তারা ভিতরে যাইতে পারিতেছে না বুঝিতে যশোদার দেরী হইল না। ছেলেমানুষ তিনজনেই এবং মহীতোষের বুদ্ধি সত্যিই একটু কাঁচা। সুব্রতাই বা কি, এ দিকে তো মুখে তার কথা ছোটে তুবড়ীর মত, ভদ্রতা বজায় রাখিয়াই একটু ইঙ্গিতেও কি সে মহীতোষের মনে পড়াইয়া দিতে পারিল না, গলির মোড়ে বৌটাকে সে একা ফেলিয়া আসিয়াছে?

যশোদাকে দেখিয়া মহীতোষ বলিল, 'কেমন আছেন চাঁদের-মা? আজ এঁদের নিয়ে—'

'একা ব'সে থাকতে বৌমার ভয় করছে।'

'অ্যাঁ? ও, হ্যাঁ, যাই।'

বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া ,যে যার ঘরে কাপড় ছাড়িতে গেল। ধনঞ্জয় যশোদার বিছানা দখল করিয়া শুইয়া আছে।

'তুমি এখানে যে?'

ধনঞ্জয় জবাব দিল না।

'ভাত খেয়েছ!'

'খেয়েছি।'

সারাদিন রাগে গজ গজ করিতে করিতে কুমুদিনী আজ এখানে আসিয়া রাঁধিয়া দিয়া গিয়াছে। কথা ছিল কুমুদিনীর ননদ আসিয়া রাঁধিয়া দিবে, কিন্তু শত্রুর বাড়িতে নিজে বাঁধিয়া দিতে না আসিলে কুমুদিনীর বোধ হয় তৃপ্তি হয় না।.

বাহিরে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া যশোদা তিনজনের ভাত বাড়িল, তারপর ধনঞ্জয়কে ডাকিয়া বলিল, 'এখানে এসো না, আমাদের খাওয়া দেখবে আর গল্প শুনবে কোথায় গিছলাম!

ধনঞ্জয় সাড়া দিল না বটে কিন্তু খানিকক্ষণ পরে মুখ অন্ধকাব করিয়া উঠিয়া আসিল। সকলে তখন খাইতে বসিয়াছে। কাঠের পা ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে সে বাড়ির বাহিবে চলিয়া গেল। সুব্রতা বলিল, 'ওঁর ঠক্ ঠক্ ক'রে হাঁটা দেখলে এমন লাগে আমার! কি হ'ল দিদি তোমার ওখানে?'

'কি আর হবে, কুলি-মজুরের মিটিং হ'ল। তোমবা কেমন বায়োস্কোপ দেখলে বল।'

বায়োস্কোপের চেয়ে মহীতোষ আর তার বৌ-এর সঙ্গে পরিচয়েব কাহিনী বলিতে আর দু'জনের সমালোচনা করিতে সুব্রতার আগ্রহ দেখা গেল, ওদের কথাতেই খাওয়া শেষ হইয়া গেল। একবার মুখ খুলিলে সুব্রতা আর থাকিতে পারে না। আঁচাইয়া উঠিয়া ছবির গল্প আরম্ভ

করিয়া বলিল, 'দেখবে দিদি বইটা? নাম-টাম আছে, অনেকের ছবিও আছে।'

বাংলা চলচ্চিত্র। সুব্রতার কথা শুনিতে শুনিতে যশোদা ছাপানো প্রোগ্রামটির পাতা উল্টাইতে ছিল। এক পাতায় দু'জন অভিনেতা-অভিনেত্রীর ছবি দেখিয়া তার চোখের পলক বন্ধ হইয়া গেল।

নন্দ আর সুবর্ণ সিনেমায় অভিনয় করিতেছে?

সুব্রতা বলিল, 'কি হ'ল দিদি? কার ফোটো দেখেছ?—ওঃ, ওই ছেলেটার! এমন সুন্দর গান করলে দিদি ছেলেটা, কি বলব তোমায়!'

সাত

যামিনী ফিরিয়া আসিল এবং পরাধীনতায় অভ্যস্ত মানুষও যেমন বড়রকম একটা ঘা খাওয়ার সময় কিছুক্ষণের জন্য গা নাড়া দিয়া উঠিয়া স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দেয়, চার টাকা পথ খরচ দিয়া তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য সেইরকম একটা গোলমাল বাধাইয়া দিল।

আমাদেব স্বাধীন কর বলাটাই এ ধরনের আন্দোলনের প্রচলিত প্রথা। যামিনীও রাগ করিয়া সত্যপ্রিয়ের কাছে দাবী করিয়া বসিল, সত্যপ্রিয় তার ভিন্ন থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিক।

'ভিন্ন থাকবে? মেসে?'

'আজ্ঞে না। অন্য একটা বাড়ি নিয়ে—'

সত্যপ্রিয় সমস্তই বুঝিতে পারিতেছিল তবু জামাইয়ের ছেলেমানুষী রাগ কমানোর জন্য মৃদু একটু হাসিয়া পরিহাসের সুরে বলিল, 'আমার তো আর বাড়ি নেই বাবা, এই একটা ছাড়া?'

'ছোটোখাটো একটা বাড়ি ভাড়া নেওয়ার কথা বলছিলাম।'

এবার একটু গম্ভীর হইয়া সত্যপ্রিয় বলিল, 'বেশ তো, সেজন্য ব্যস্ত হবার কি আছে! কিছুদিন যাক না!'

যামিনী একগুঁয়ের মত বলিল, 'আজ্ঞে না, দু'চার দিনের মধ্যে একটা বাড়ি ঠিক করে চলে যাব ভাবছিলাম।'

সত্যপ্রিয় এবার রীতিমত গম্ভীর হইয়া গেল।

'দু'চার দিনের মধ্যে চলে যাবে ভাবছিলে ? তা বেশ। একটা বাড়ি দেখে নাও, কলকাতায় বাড়ির অভাব নেই। কিন্তু, একা একজনের জন্য একটা বাড়ি না নিয়ে মেসে হোটেলে থাকলেই সুবিধে হ'ত না?'

তখন যামিনী স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিল যে একা বাড়ি ভাড়া করিয়া থাকিবার কথা সে ভাবিতেছে না. সকলকে সঙ্গে নিয়া যাওয়াই তার ইচ্ছা।

সত্যপ্রিয় বলিল, 'আমাকে তাব ব্যবস্থা করে দিতে হবে, এই কথা বলছ তো? মাসে মাসে বাড়ি ভাড়াটাও দিতে হবে নিশ্চয়?'

'আমার মাইনেটা কিছু বাড়িয়ে দিলে—'

'কিসের মাইনে? একজনকে বসিয়ে বসিয়ে মাসে দুশো টাকা হাত খরচা দিলে কি আপিস চলে বাপু? কাজকর্ম শিখলে হয়তো একদিন মাইনে হবে তোমার, এখন আমার

পকেট থেকে যে হাত-খরচার টাকাটা দিচ্ছি, সেটা আর বাড়াতে পারব না। কমিয়ে দিতে হবে কিনা কে জানে,—বড় টাকার টানাটানি চলছে আমার।'

খুব সকালে যামিনী আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, ঝগড়ার পর না খাইয়াই আবার বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বিকালে অজিতের সঙ্গে সে গেল যশোদার বাড়ি।

সত্যপ্রিয় চার টাকা পথ খরচ দিয়া জামাইকে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছে যশোদা এ খবরটা জানিত। অজিত খবর দিয়াছিল। অজিত মহীতোষের বন্ধু, বুদ্ধিটাও মহীতোষের তেমন ধাবাল নয় যে ঘরের কোন কোন খবর যে বন্ধুর কাছেও চাপিয়া যাওয়া উচিত একটু তার খেযাল থাকিবে। সত্যপ্রিয়ের মনের কোন কথা কেউ কোনদিন ঘুণাক্ষরে টের পায় না, মহীতোষের মনের কথাগুলি বাতাসে উড়িয়া বেড়ায়।

যামিনীকে দেখিয়া যশোদা একটু অবাক হইয়া যায়, তারপর তার প্রস্তাব শুনিয়া যশোদার একেবারে চমক লাগে।

'আমার এখানে থাকবেন মানে কি গো জামাইবাবু?'

অজিত বুদ্ধিমানের মত একটু তফাতে সরিয়া গিয়াছিল। যামিনী গম্ভীরভাবে বলিল, 'শ্বশুরের অন্ন আর কতকাল ধ্বংস করব চাঁদের-মা? তাই ভাবছি, অজিতবাবুর মত আপনার এখানে ঘর ভাড়া ক'রে থাকব।'

'একা?'

'উঁহু, সবাইকে নিয়ে থাকব—অজিতবাবুর মত।'

যশোদা হাসিয়া ফেলিল। সত্যপ্রিয়ের মেয়েকে নিয়া যামিনী তার বাড়িতে ঘরভাড়া করিয়া থাকিবে। এমন ছেলেমানুষী-কথা যশোদা জীবনে কখনো শোনে নাই!

'ঝগড়া হয়েছে বুঝি শ্বশুরের সঙ্গে?'

'ঠিক ঝগড়া নয়, ওখানে আর বাস করা যায় না। কি কুক্ষণেই যে বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করেছিলাম চাঁদের-মা!'

প্রথমটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও শেষ পর্যন্ত যশোদা ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝিতে পারে। একটু সহানুভূতি পাইয়াই যামিনীর মুখ খুলিয়া যায়, ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া বাড়াইয়া কমাইয়া অবিরাম সে বড়লোকের, বিশেষ করিয়া সত্যপ্রিয়ের মেয়েকে বিবাহ করার ট্র্যাজেডি বর্ণনা করিয়া যায়, দুর্ভাগ্যের ইতিহাস যেন তার শেষ হইবে না।

ব্যাপারটা বুঝিতে যশোদার বিশেষ কষ্ট হয় না, সত্যপ্রিয়কে সে তো চেনেই, যামিনীর মত ছেলেরাও তার অজানা নয়! অন্য কারও ঘরজামাই হইলে যামিনীকে সে আমল দিত কিনা সন্দেহ, সস্ত্রীক যামিনীকে বাড়িতে থাকিতে দিলে যে হাঙ্গামা আরম্ভ হইবে সেটা সে বেশ অনুমান করিতে পারে। তাছাড়া, বেশিদিন বড়লোক শ্বশুরকে অবহেলা করিয়া শ্বশুরবাড়ির আরাম ছাড়িয়া এখানে বাস করিয়া থাকিবার মানুষও যামিনী নয়, তার বড়লোক শ্বশুরের কন্যাটিও নয়। সত্যপ্রিয়ের কাছ হইতে একবার ডাক আসিলেই দু'জনে ফিরিয়া যাইবে। সত্যপ্রিয়কে একটু নবম করার জন্য এ বিদ্রোহ।

তবু দু'দিনের জন্যও সত্যপ্রিয়কে একটু বিপাকে ফেলা চলিবে শুধু এইজন্যই যশোদা যামিনীর প্রস্তাবে রাজী হইয়া গেল।

প্রতিহিংসা?

তাছাড়া আর কি বলা চলে! মুখোমুখি দু'টি বাড়িতে পঁচিশ-ত্রিশটি মানুষ নিয়া যশোদার

ছিল গুছানো সুখের সংসার, সত্যপ্রিয় সে সংসার ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। সত্যপ্রিয়কে জ্বালাতন করার সুযোগ কি সহজে ছাড়া যায়!

ক্ষতি করার জন্য মানুষকে কষ্ট দিয়া সুখ পাওয়ার স্বভাব যশোদার নয়, সত্যপ্রিয়কে আঘাত দেওয়ার জন্য ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন উপায় আবিষ্কার করার কথাটা তার মনেও আসে নাই। যামিনী বাড়ি বহিয়া আসিয়া প্রতিশোধের এরকম একটা সুযোগ হাতে তুলিয়া না দিলে যশোদা কোনদিন কিছু করিত না। তাছাড়া, মেয়ে-জামাইকে এভাবে বাড়িতে রাখিলে সত্যপ্রিয়ের ধনসম্পদ নষ্ট হইবে না, হাত-পাও ভাঙ্গিবে না। হয়তো শুধু সহ্য করিতে হইবে নিছক একটু মানসিক অশান্তি। যশোদার অশান্তির তুলনায় সেটা কিছুই নয়।

'উনি কি মেয়েকে ছেড়ে দেবেন আপনার সঙ্গে?'

'উনি ছেড়ে না দিন, ওঁর মেয়ে আসবে।'

'মেয়েকে চুরি করবেন!' বলিয়া যশোদা হাসে!

যশোদা তামাশা করুক, যামিনীর সমস্যা কিন্তু দাঁড়াইয়াছিল তাই, সত্যপ্রিয়ের মেয়েকে চুরি করিবে, অথবা সকলের সামনে বুক ফুলাইয়া তার হাত ধরিয়া সত্যপ্রিয়ের বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া আসিবে? সত্যপ্রিয়কে আগে হইতে জানাইয়া তার মেয়েকে নিয়া বাড়ি ছাড়া সহজ ব্যাপাব নয়, যদিও সে যামিনীর আইন আর শাস্ত্রসম্মত স্ত্রী।

যোগমায়ার সঙ্গে সে দেখা কবে দুপুরে, সত্যপ্রিয় যখন বাড়ি থাকে না। পর পর তিনটি দুপুর পরামর্শের পর যোগমায়া মন স্থির করিতে পারে। গরীবের মত কিন্তু স্বাধীনভাবে থাকিবার অর্থ যোগমায়ার জানা নাই, সেটা তার কাছে একটা কাল্পনিক উত্তেজনাময় নতুনত্ব মাত্র, যশোদার বাড়িতে থাকিবার কথায় সে খুঁতখুঁত করিতে থাকে কলিকাতায় এত বাড়ি থাকিতে যশোদার বাড়িতে কেন? তাছাড়া বাপের বাড়ির এত কাছে যশোদার বাড়িতে থাকাটা কি উচিত হইবে, না ভাল দেখাইবে? নাটক ছাড়া মানায় না এমন অনেক বড় বড় আবোল-তাবোল কথা বকিয়া যশোদার বাড়িতে বাস করিতে যোগমায়াকে যদি বা রাজি করাইতে পারে, চুপি চুপি বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে যোগমায়া কিছুতেই রাজি হয় না।

'কেন, আমি কি পাপ করছি? স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে যাব, তা লুকিয়ে-চুরিয়ে যাব কেন?'

যোগমায়া এখনো স্বামীব ঘর করিতে যায় নাই, সে অভিজ্ঞতাও তার নাই। সে শুধু শুনিয়াছে, স্বামীর ঘর করিতে যাওয়াটা মেয়েদের মহা গৌরব ও সৌভাগ্যের কথা।

'বাবা যেতে দেবেন না।'

'খুব দেবেন।'

আসল কথা, যোগমায়ারও শখ চাপিয়াছিল, একটু বেড়াইয়া আসিবে, জীবনে একটু নতুনত্ব আনিবে। রাজপ্রাসাদের মত এতবড় বাগান-ঘেরা বাড়ি, ঘরভরা গাদা গাদা আপনজন আর আত্মীয়স্বজন, এতসব দামী আসবাব আর দাসদাসী, নানা উপলক্ষ্যে প্রায়ই লোকজনকে খাওয়ানোর হৈ চৈ, কর্তার মেয়ে বলিয়া সকলের উপর এতখানি কর্তৃত্ব, তবু যেন যোগমায়ার সব একঘেয়ে লাগে।

বিবাহের অনেক আগে হইতেই একঘেয়ে লাগে, বাড়ির বাহিরে খেলা করিতে যাওয়া সত্যপ্রিয় যখন রদ করিয়া দিয়াছিল। বিবাহ হইলে ভাল লাগিবে ভাবিয়াছিল, যামিনীর সঙ্গে বাত কাটাইতে ভাল লাগেও বটে, কিন্তু তাতে কি মানুষেব মন ওঠে, বাস্তবতার সঙ্গে সংশ্রব-

বিহীন অল্পবয়সী একটি মেয়ের মন?

যোগমায়ার রাগও হইয়াছিল। যামিনীকে দেশে পাঠানোর জন্য নয়, চার টাকা পথ-খরচ দিয়া যামিনীকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এই গুজবটা রটিয়াছে বলিয়া। তার স্বামীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করে তার বাবা, সকলের কাছে তার স্বামীকে এমনভাবে অপমান করে! স্বামীর ভাঙা ঘরে সে উপবাস করিবে (কিছুদিন করিবে, সত্যপ্রিয় ব্যস্ত হইয়া ফিরাইয়া আনিতে গেলেই ফিরিয়া আসিবে) তবু আর সে এমন বাপের বাড়িতে থাকিবে না।

সুতরাং সত্যপ্রিয়ের বাড়িতে একদিন সত্যই হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

মেয়েদের মধ্যে ফিস্‌ফাস্ গুজগাজের শেষ রহিল না। সকলেই বুঝিতে পারিল যে যামিনী রাগ করিয়া যোগমায়াকে নিয়া যাইতেছে, তবু যোগমায়া বাড়ির যেখানে যায় সেখানেই যেন তাকে ঘিরিয়া জিজ্ঞাসু মেয়েদের সভা বসিতে লাগিল। কেবল সত্যপ্রিয়ের অনুমতি চাহিতে যাওয়ার সময় কেউ তার সঙ্গে গেল না।

যামিনী দুপুরবেলা তার অনুপস্থিতির সময় আসা-যাওয়া করিতেছে শুনিয়া সত্যপ্রিয় মনে মনে একটু হাসিয়া ছিল। আর দু'একদিনের মধ্যেই যামিনী আসিয়া পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে। আসল ব্যাপারটা তার কানে গিয়াছিল সকালে যোগমায়া অনুমতি চাহিতে যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যায়। তারপর সত্যপ্রিয় মনে মনে আর হাসে নাই বটে, মেজাজটাও গরম করে নাই।

খবরটা দিতে আসিয়াছিল তার ভগ্নীপতি, খবর দিয়া আপশোষের শব্দ করিয়া বলিয়াছিল, 'আচ্ছা বিপদ হ'ল তো!'

সত্যপ্রিয় আশ্চর্য হওয়ার ভান করিয়া বলিয়াছিল, 'কিসের বিপদ?'

তার সঙ্গে লড়াই করিবে তার টাকা দিয়া কেনা জামাই? সত্যপ্রিয়ও লড়াই করিতে জানে।

দুরু দুরু বুকে ঘরে গিয়া যোগমায়া দ্যাখে, সত্যপ্রিয় মেঝেতে বসিয়া সামনে খবরের কাগজ বিছাইয়া ঝুঁকিয়া কাগজ পড়িতেছে।

কিভাবে কথাটা বলা যায়? কিভাবে বাপকে জানানো যায়, আমি তোমার বাড়ি ছাড়িয়া চলিলাম? মাথা ঘুরিয়া গা কাঁপিয়া, যোগমায়া অস্থির হইয়া পড়ে, কিভাবে যে শেষ পর্যন্ত কথাটা বলিয়া বসে নিজেই ঠিকমত বুঝিতে পাবে না।

সত্যপ্রিয় আগেই মুখ তুলিয়াছিল, সহজভাবে বলে, 'যামিনী নিয়ে যাবে? আচ্ছা। কবে যাবি?'

যোগমায়া বলে, 'আজ।'

সত্যপ্রিয় বলে, 'বেশ।'

যোগমায়ার পৃথিবী অন্ধকার হইয়া যায়। শুধু আশা নয়, যোগমায়ার বিশ্বাস ছিল সত্যপ্রিয় কখনো তাকে পাঠাতে রাজি হইবে না, রাগ করিবে, বকুনি দিবে, তাকে বুঝাইবে—আর সে তখন কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিবে, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিবে যে, তোমার জন্যেই তো সব গোলমাল, তুমি কেন ওকে অপমান করিলে! তার বদলে, একি! এক কথায় তাকে যাওয়ার অনুমতি দিয়া দিল? এখন তো আর না গিয়া উপায় থাকিবে না।

সত্যপ্রিয় খবরের কাগজ পড়িতে মন দেয়।

কাঁদিতে কাঁদিতে যোগমায়া বলে, 'আমি কিন্তু আর ফিরে আসব না বাবা, আমায় আর আসতে দেবে না।'

সত্যপ্রিয় অন্যমনে বলে, 'বেশ তো!'

যামিনী আসিলে খবরটা দিয়া যোগমায়া চোখ বড় বড় করিয়া প্রশ্ন করে, 'কি উপায়

হবে এখন?'

এত সহজে অনুমতি পাইয়া যামিনীরও ভাল লাগিতেছিল না, তবু সে জোর করিয়া বলে, 'ভালই তো হ'ল।'

'ছাই হ'ল! তোমার মাথা হ'ল!'

যোগমায়া কাঁদিতে থাকে, কাঁদিতে কাঁদিতে মাথা নাড়িয়া বলে, 'আমি যাব না।'

রাগ করিয়া যামিনীর সঙ্গে ক'দিনের জন্য চলিয়া যাওয়ার কল্পনায় যোগমায়া যত মজা আবিষ্কার করিয়াছিল তার একটাও এখন আর সে খুঁজিয়া পায় না। যা ছিল ছেলেমানুষি তাই এখন ভয়ানক বিপদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে!

'যাবে না মানে?'

'না না, যাব না। কোথায় যাব আমি বাবাকে ছেড়ে?'

যামিনী আহত হইয়া বলিল, 'বেশ। যাওয়া ঠিক করে এখন উল্টো গাইছ!'

'তুমিই তো কুপরামর্শ দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে দিলে আমার?'

যামিনীর সঙ্গে যোগমায়ার ঝগড়া হইয়া যায়।

বাপকে গিয়া যোগমায়া বলে, 'না বাবা, আমি যাব না। তোমাদের মনে কষ্ট দিয়ে—'

সত্যপ্রিয় বলে, 'আমাদের আবার কষ্ট কিসের!'

যোগমায়া থমকিয়া যায়। সামলাইয়া উঠিয়া আবার বলে, 'আমি জানি তোমার ইচ্ছে নেই বাবা, তোমার মনে ব্যথা দিয়ে—'

নিজে না গলিলে এ জগতে কারও ক্ষমতা নাই সত্যপ্রিয়কে গলায়। তেমনি স্নেহহীন কণ্ঠে নির্বিকারভাবে সে বলে, 'আমার মনে ব্যথা দিবি কেন?'

বাপের ব্যবহারে মর্মাহত যোগমায়ার দারুণ অভিমানে আবার মনে হয়, যামিনীর সঙ্গে যাওয়াই ভাল, সত্যপ্রিয় যতদিন নিজে না আনিতে যায় ততদিন না আসাই ভাল।

তবু, কোনরকমে চোখ কান বুজিয়া সে বলে, 'তুমি যদি ওকে একটু মিষ্টি ক'রে বুঝিয়ে বল বাবা—'

সত্যপ্রিয় বলে, 'তোরা দু'জনেই বড় বেশি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস, মাথায় চড়ে গেছিস্ দু'জনে।'

অগত্যা যামিনীর সঙ্গে যোগমায়া যশোদার বাড়িতে গিয়া উঠিল। রওনা হওয়ার সময় সত্যপ্রিয় বাড়িতেই ছিল। যোগমায়া ইচ্ছা করিয়াই দেরি করিয়া সত্যপ্রিয় বাড়ি ফিরিবার পর রওনা হইয়াছে। যাওয়ার সময় সত্যপ্রিয় যদি নরম হয়। মেয়েকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মন কেমন করিয়া উঠিলে সে যদি একটু নত হইয়া যামিনীকে মিষ্টি কথায় বুঝাইয়া শান্ত করিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দেয়!

আগে পরে দু'জনে সত্যপ্রিয়কে প্রণাম করিল। সত্যপ্রিয় যামিনীকে বলিল, 'সাবধানে থেকো', আর যোগমায়াকে বলিল, 'সাবধানে থাকিস্।'

কয়েক মিনিট পরেই যশোদার বাড়ি। যশোদা হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিল, সুব্রতা হাত ধরিয়া যোগমায়াকে ভিতরে নিয়া গেল, পাড়ার যেসব মেয়েরা যশোদার বাড়িতে সত্যপ্রিয়ের মেয়ের পদার্পণ দেখিবার জন্য ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল তারা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

যশোদাকে যোগমায়া চেনে, তার বাড়িটি কোনদিন দ্যাখে নাই। ভিতরে ঢুকিয়া সেও যেদিকে চোখ পড়িতে লাগিল সেইদিকেই হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতে লাগিল। ঘর দেখিয়া সে যেন মরিয়া গেল। কি সর্বনাশ, এই ঘরে তাকে থাকিতে হইবে নাকি? খাটপালঙ্ক,

আলমারী, ড্রেসিংটেব্‌ল এ-সব না থাক, কিন্তু একি দেওয়াল, একি মেঝে, একি দরজা জানালা! কতটুকু ঘর!

সুব্রতা আনন্দে ডগমগ হইয়া বলিল, 'যাক, এ্যাদ্দিনে একজন মনের সঙ্গী জুটল। তোমার ভাইয়ের কাছে তোমার কথা এত শুনেছি ভাই।'

'তুমি আমার ভাইকে চেনো?'

'চিনি না? কবে থেকে চিনি।'

'কি ক'রে চিনলে?'

প্রশ্ন শুনিয়া মনের মত সঙ্গী সত্যই জুটিয়াছে কিনা সে বিষয়ে বড়ই সন্দেহ জাগায় সুব্রতা একটু দমিয়া গেল।

'ওর সঙ্গে পরিচয় আছে। তোমার দাদা ওঁর বন্ধু।'

'তাই নাকি? তা তো জানতাম না।'

যশোদা যোগমায়াকে দেখিয়াই দমিয়া গিয়াছিল। পাড়ার মেয়েদের আস্তে আস্তে বিদায় করিয়া সে যামিনীকে নিয়া পড়িল।

'আপনার কেমন ধারা বিবেচনা জামাইবাবু?

'কেন চাঁদের-মা?'

'দু'দিন বাদে ওর ছেলেপিলে হবে, ওকে নিয়ে এ সময় টানা-হ্যাঁচড়া হাঙ্গামা আরম্ভ করেছেন? প্রথমবার লোকে কত সাবধানে রাখে, মন ভাল রাখার জন্য বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়, আর আপনি এমন একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। বয়স তো কম হয়নি আপনার?'

যামিনী আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, 'এখনো দেরি আছে।'

যশোদা ফোঁস করিয়া উঠিল, 'ছাই আছে। ও দু'চার মাস সময় কোন্ দিক দিয়ে কেটে যাবে টেরও পাবেন না। দেরি থাকলেই বা কি, এ সময় কেউ এমনি হাঙ্গামা করে?'

যশোদার বড় অনুতাপ হয়! সত্যপ্রিয়কে খোঁচা দেওয়ার সুযোগ পাইয়া খুশি হওয়ার সময় তার মেয়ের কথাটা মনে রাখা উচিত ছিল। সে অবশ্য জানিত না যোগমায়ার এরকম অবস্থা, তবু এতটুকু একটা মেয়ের মনে এই ধরনের হাঙ্গামার ব্যাপার কি রকম আঘাত দিতে পারে সেটা অনুমান করা তো তার পক্ষে কঠিন ছিল না। মানুষকে হিংসা করিলে এমনি হয়, একজনকে হিংসা করিতে গিয়া মনেও থাকে না আরও অনেকে তার ফলভোগ করিবে।

কি আর করা যায়, যোগমায়ার মনটা একটু ভাল করার জন্য যশোদা চেষ্টা আরম্ভ করে। গল্প জুড়িয়া দেয়, হাসি-তামাশা করে, গম্ভীরমুখে বলে, 'দু'দিনের জন্য বেড়াতে তো এলে দিদি, দু'দিন বাদে বাপ যখন গাড়ি পাঠিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, ঘর যে তখন আমার খালি হয়ে যাবে বাছা?'

'বাবা আর আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না যশোদাদিদি।' যোগমায়া কাতরভাবে বলে।

যশোদা হাসিয়া বলে, 'থামো বাছা তুমি। বাপ কখনো মেয়েকে ত্যাগ করতে পারে?'

'আমার বাবার ভীষণ রাগ, তুমি জানো না! চলে আসতে যখন দিয়েছে, কখখনো আর ফিরে যেতে দেবে না।'

'দেবে—আমি বলছি দেবে। বাপ-মার রাগ ক'দিন টেঁকে? দু'দিন বাদে রাগ জল হয়ে গেলে মন কেমন করতে আরম্ভ করবে, নিজে এসে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তোমাদের।'

কুমুদিনী প্রথম হইতে একপাশে মুখ বুজিয়া বসিয়াছিল, এবার সে সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা

করে, 'রাগারাগি করে এসেছে বুঝি?'

যশোদা বলে, 'কিসের রাগারাগি? সংসার অমন কথা কাটাকাটি হয়।'

যামিনী ও সত্যপ্রিয়ের কলহের ব্যাপারটাই যশোদা একেবারে তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিতে চায়। যামিনী শ্বশুরের সঙ্গে আর সত্যপ্রিয় জামাইয়ের সঙ্গে যেন একটু ছেলেখেলা করিতেছে, যশোদার ভাবটা এই রকম। যোগমায়াকে সাহস দেওয়ার জন্য এটা শুধু যশোদার ছলনা নয়। সত্যপ্রিয়কে সে জানে। পুতুল কথা না শুনিলে ছোট ছেলে যেমন তার অত সাধের পুতুলটি ঠুকিয়া ঠুকিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে, সত্যপ্রিয়ও তেমনি তার অবাধ্য প্রিয়জনকে পিষিয়া ফেলিতে পারে অনায়াসেই। তবু যশোদা বিশ্বাস করিতে পারে না সত্যপ্রিয় মেয়েকে ফিরাইয়া নেওয়ার ব্যবস্থা না করিয়া বেশিদিন চুপ করিয়া থাকিবে।

যোগমায়া যশোদার সঙ্গে যেন একেবারে আঁটিয়া যায়। অনেকদিন আগে যশোদার বাড়িতে যখন শুধু কুলি-মজুরের আস্তানা ছিল আর সত্যপ্রিয় হঠাৎ যশোদাকে খাতির করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, একদিন সত্যপ্রিয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া বেয়াদবী করার জন্য যশোদা যোগমায়াকে আচ্ছা করিয়া শাসন করিয়া দিয়াছিল। সাপের মত ফোঁস ফোঁস করিয়াছিল সেদিন যোগমায়া। আজ যখন রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, বিদ্যুতের আলো জ্বলে না, ঘরের দেওয়াল সরিয়া সরিয়া আসিয়া চাপ দিতে থাকে, দম আটকাইয়া আসে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার মনে হয়, যোগমায়া যশোদার কাছে সরিয়া আসে, পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়ায়।

'ঘরটা গুছিয়ে নাও।' যশোদা বলে।

'আমার কি হবে যশোদাদিদি?' যোগমায়া বলে।

ধনঞ্জয় ঘরে আর রোয়াকে বসিয়া বসিয়া সব দেখিতেছিল, এক ফাঁকে চুপি চুপি যশোদাকে জিজ্ঞাসা করে, 'ওরা এখানে থাকবে নাকি চাঁদের-মা?'

যশোদা বলে, 'না।'

পরদিন খুব ভোরে উঠিয়া যশোদা উনান ধরাইতেছে, যামিনী উঠিয়া আসিল। মুখখানা শুকাইয়া গিয়াছে, চোখ ঘুমে ঢুলু ঢুলু।

'ঘুমুচ্ছে?'

'হ্যাঁ। এই তো ঘুমালো চারটের সময়।'

যশোদা তা জানিত।

'খুব কেঁদেছে, না?'

'শুধু কান্না! কি বিপদেই যে পড়লাম চাঁদের-মা।'

যশোদা তাও জানিত। একটা আপসোসের শব্দ করিল।

যামিনী মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, 'একটা বড় দেখে বাড়ি ঠিক ক'রে উঠে যাব চাঁদের-মা?'

যামিনীর কাছে শ'খানেক টাকা আছে, যোগমায়ার কাছেও আছে সাতাত্তর টাকা। যোগমায়ার গায়ে আর বাক্সে গয়না আছে অনেক। কিন্তু যশোদা সংক্ষেপে বলিল, 'বড় বাড়ি দিয়ে কি হবে? ক'টা দিন যাক।'

যশোদা ভাবিয়াছিল, দু'একদিনের মধ্যেই সত্যপ্রিয়ের কোন আত্মীয় মধ্যস্থ হইয়া আসিবে। কিন্তু চার-পাঁচদিন কাটিয়া যায় কারও পাত্তা মেলে না। সত্যপ্রিয় যেন সত্যই মেয়ে-জামাইকে ত্যাগ করিয়াছে। যোগমায়ার অবস্থা দিন দিন কাহিল হইতে থাকে, যশোদা না থাকিলে

ইতিমধ্যেই হয়তো তার নার্ভাস্ ব্রেক ডাউন ঘটিয়া যাইত। যশোদা তাকে আদর করে, ধমক দেয়, নানাভাবে বুঝাইয়া শান্ত করিয়া রাখে। কিন্তু মনের যার জোর নাই একেবারে, কতটুকু মনের জোর তার মধ্যে সংক্রামিত করা যায়? ধার-করা মনের জোর কতক্ষণ কাজে লাগে মানুষের?

যশোদা যখন বলে, 'এরকম যদি করবে, এলে কেন?

যোগমায়া বলে, 'আমি আসিনি, আমায় জোর করে এনেছে।'

যামিনী যখন বলে, 'এমন জানলে তোমায় আমি আনতাম না।'

যোগমায়া বলে, 'আমাকে মেরে ফেলে বাবাকে কষ্ট দেবে বলে তুমি আমায জোর করে এনেছ।'

'চলো তবে তোমায় রেখে আসি?'

'বাবা না ডাকলে কি ক'রে যাব?'

শুধু এই একটি বিষয়ে সত্যপ্রিয়ের মেয়ের মতই তার তেজ দেখা যায়। অথবা সত্যপ্রিয়ের মেয়ে বলিয়াই হয়তো সে হিসাব করে যে না ডাকিতে ফিরিয়া গেলে ভবিষ্যতে প্রায়ই চলিয়া যাওয়ার ভয় দেখানোর সুবিধা থাকিবে না।

সাতদিনের দিন সকালে মহীতোষ আসিল। অজিত আর সুব্রতার সঙ্গে মহীতোষ মাঝে মাঝে আড্ডা দেয়, তবে সেটা তার নিজের গাড়িতে অথবা মাঠে ঘাটে হোটেলে সিনেমায়, যশোদার বাড়ির মধ্যে নয়। এবার কোথা হইতে পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিয়া সে একটি পিঁড়ি দখল করিয়া বসিল।

যোগমায়া তো আনন্দে প্রায় পাগল হওয়ার উপক্রম।—'দাদা! এসেছো! তুমি কোত্থেকে এলে দাদা? বাবা পাঠিয়েছে?'

মহীতোষ নিষ্ঠুরের মত নির্বিকার হাসি হাসিয়া বলিল, 'বাবা পাঠাবেন বৈকি! কাউকে আসতেই বাবা আরও বারণ ক'রে দিয়েছেন, বাবা পাঠাবেন!'

যোগমায়া দমিয়া গেল—'বারণ ক'রে দিয়েছেন!'

'করবেন না? যা কীর্তিটাই তোমরা করলে!'

যশোদা মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলিল, 'আহা, কেন মিছে ঘাবড়ে দিচ্ছেন ওদের? রাগ করবেন সে তো জানা কথা—ও রাগ কি টেঁকে? সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মহীতোষ সায় দিয়া বলিল, 'তা যাবে— তা যাবে। নিশ্চয় যাবে। তবে কিনা—তা ঠিক, সব ঠিক হয়ে যাবে বৈকি।'

'অন্য সবাই বলে না আমার কথা?'

'বলে বৈকি।'

'কি বলে বলো না দাদা?'

'নিন্দে করে, আবার কি বলবে।'

শুনিয়া যোগমায়া স্তব্ধ হইয়া যায়। নিন্দা করিবে বৈকি, স্পর্ধা কি কম সকলের! করুক, যত পারে নিন্দা করুক। ফিরিয়া গিয়া নিন্দা করার মজাটা সকলকে সে যদি টের না পাওয়াইয়া দেয়—

যোগমায়ার মন যতই খারাপ থাক আর বাড়িঘরের অবস্থার জন্য যতই লম্বা করিয়া কান্না আসুক, এটা তো ধরিতে গেলে একরকম তার নিজের বাড়ি, এখানকার কুঁড়ে ঘরেও তারই

তো সংসার। মহীতোষকে যে কি দিয়া অভ্যর্থনা আর আদর-যত্ন করিবে সে ভাবিয়া পায় না। শেষে, একরাশ বাজারের খাবার আনাইয়া তাকে খাইতে দেয় আর খুঁটিয়া বাড়ির সব খবর জিজ্ঞাসা করে। ক'দিন আর সে বাড়ি ছাড়িয়াছে, ক'দিনের মধ্যেই কতগুলি বছর যেন কাবার হইয়া গিয়াছে। জবাব দিতে দিতে মহীতোষ বিব্রত আর বিরক্ত হইয়া বলে, 'সবাই ভাল আছে, সব ঠিক আছে। যেমন ছিল তেমনি সব আছে। কেন ভাবছিস?'

যেমন ছিল সব তেমনি আছে? সে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া এতটুকু পরিবর্তন হয় নাই? একটু কাঁদাকাটাও করে নাই কেউ? যোগমায়া দুঃখে অভিমানে ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিতে থাকে।

আরও বেশি বিব্রত হইয়া কয়েক মিনিট বসিয়াই মহীতোষ উঠিয়া পড়ে।

যোগমায়া কান্না থামাইয়া আব্দার জানায়, 'রোজ একবার ক'রে এসো কিন্তু দাদা।'

'আসব।'

'আর শোন বাবা যদি জিজ্ঞেস করে আমার কথা—'

'বাবা কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আমি এসেছিলাম জানতে পেরে আমায় না খেয়ে ফেলে।'

মেয়ের খোঁজখবর নিতে সকলকে বারণ করিয়াছে? মেয়ে-জামাইকে ঘরে ফিরানোর চেষ্টাটা সত্যপ্রিয়ের দিক হইতে আরম্ভ হইবে এটা বোধ হয় তবে আর আশা করা যায় না। আশা কেন যশোদা করিয়াছিল, যশোদা নিজেই জানে না। মেয়ে-জামাই অন্য কোথাও গেলে হয়তো সত্যপ্রিয় কিছু করিত, তারা যশোদার বাড়িতে আসিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় সে গুম্ খাইয়া গিয়াছে। এবং হয়তো গুম্ খাইয়াই থাকিবে। অথবা হয়তো এমন কিছু করিবে যাতে মেয়ে-জামাই তার যশোদার বাড়ি ছাড়িয়া তার পায়ের উপর গিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িবে আর যশোদার হইবে সর্বনাশ। কি ভাবে সত্যপ্রিয়ের পক্ষে এটা করা সম্ভব যশোদা ভাবিয়া না পাক, সত্যপ্রিয়র মগজে ওরকম অনেক মতলব ঠাসা থাকে, সাধারণ মানুষের কাছে যা দুর্বোধ্য কল্পনাতীত।

কিন্তু আগে মেয়ে-জামাই-এর একটা ব্যবস্থা না করিয়া সে কি যশোদার কিছু করিবে? কে জানে, হয়তো যার উপর রাগ হইয়াছে তাকে পিষিয়া মারার জন্য মেয়ে-জামাই-এর ভাল-মন্দের কথাটাও সে ভাবিবে না। মেয়ে-জামাইকেই হয়তো যশোদাকে জব্দ করার কাজে ব্যবহার করিবে। ওদের উপরেও তো সে কম রাগে নাই!

যশোদার মনটা খারাপ হইয়া থাকে। আবার সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে লড়াই আরম্ভ হইয়া গেল? একটা তুচ্ছ বাজে উপলক্ষ্যে? আদর্শবাদের ব্যাপারটা যশোদা একেবারেই বোঝে না, তবু তার সহজবুদ্ধিতেই সে বুঝিতে পারে, এবারকার লড়াইটা একেবারে অর্থহীন, জগতে কারও এতে কোন উপকার হইবে না।

যোগমায়ার মনটা খারাপ হইয়া গেল বীভৎস রকমের। তার রকমসকম দেখিয়া যশোদাও ভড়কাইয়া গেল। কোন বিষয়ে ভড়কাইয়া যাওয়া যশোদার বড় অপছন্দ। বিরক্ত হইয়া যোগমায়াকে একেবারে সে আচ্ছা করিয়া ধমকাইয়া দিল, তারপর অনেক আদর করিল, তারপর নিজের বিষাদের স্বপ্ন ঝাড়িয়া ফেলিবার মত মাথা ঝাঁকি দিয়া বলিল, 'কেন মন খারাপ ক'রে আছি আমরা সবাই মিছিমিছি! বাড়িতে যেন মড়া জমেছে ক'গণ্ডা। এসো তো বাছা সবাই মিলে একটু ফুর্তি করি আজ। কি করা যায় বল তো?'

সুব্রতাই ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, 'সিনেমায় যাবে দিদি সবাই মিলে?'

সিনেমা-থিয়েটার যাওয়া ছাড়া ফুর্তি করার আর কোন উপায়ের কথা সুব্রতার জানা আছে কিনা সন্দেহ।

যশোদা না ভাবিয়াই বলিল, 'তাই চল।'

শহরতলীতে থাকিয়াও কতকাল যশোদা সিনেমায় যায় নাই তার নিজেরও মনে নাই। নন্দ আর সুবর্ণকে পর্দায় দেখিতে পাওয়ার ইচ্ছাটা আজকাল জোরালো হইয়া উঠিয়াছিল, যাই-যাই করিয়াও এতদিন যাওয়া হয় নাই। ভাবপ্রবণ ব্যাকুলতাকে যশোদা বড় ভয় করে। নন্দকে পর্দায় নড়িয়া চড়িয়া কথা বলিতে দেখিলে আর তার গান শুনিলে হয়তো সে ব্যাকুল হইয়া পড়িবে। এই আশঙ্কাটা যশোদাকে আটকাইয়া দিয়াছিল। সাধ করিয়া ওরকম ব্যাকুল হইয়া লাভ কি—ওতো মদ খাইয়া মাতাল হওয়ার সামিল!

আজ সে সুব্রতাকে বলিল, 'সেই ছবিটা দেখতে যাব— সেই যে সেদিন দেখে এসে আমায় বললে, একটা ছেলে চমৎকার গান গায়!'

সুব্রতা বলিল, 'সেটা তো আমি দেখেছি। একটা নতুন ছবি হচ্ছে, খুব ভাল বই, সেটা দেখবে চল।'

যশোদা বলিল, 'না, ওই ছবিটা দেখব। এক ছবি দু'বার দেখলে তুমি মরবে না। ইচ্ছে না হয়, যেও না।'

আট

সকলে সিনেমায় গেল দল বাঁধিয়া। যশোদার বাড়িতে যারা বাস করিতেছিল তারা তো গেলই, বাহির হইতে আসিয়া যোগ দিল কুমুদিনী আর কেদার।

যোগমায়া শেষ মুহূর্তে হঠাৎ বাঁকিয়া বসিয়াছিল।

সকলে তখন সাজগোজ করিয়াছে, কেদার আর কুমুদিনীও আসিয়া হাজির হইয়াছে। যশোদার সিনেমায় যাওয়ার উপযুক্ত বেশভূষা করা নিয়া একটু হাঙ্গামা বাধিয়াছিল—সেরকম কাপড় কই, ব্লাউজ কই? সুব্রতা যাচিয়া যশোদাকে কাপড় আর ব্লাউজ ধার দিতে গিয়াছিল, বলিয়াছিল, 'আমার এই কাপড়টা পরো না দিদি, আর এই ব্লাউজটা।'

অনেক দিনের পুরানো তোরঙ্গ ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে যশোদা বলিয়াছিল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? তোমার জামা আমার হাতে ঢুকবে কিনা সন্দেহ, গায়ে দেব!'

'আচ্ছা, কাপড়টা পরো তাহ'লে।'

'না দিদি, আমার যা আছে তাই ভাল।'

সুব্রতার মুখখানা ম্লান হইয়া গিয়াছিল।

'জানো দিদি, তোমার এই স্বভাবের জন্য তোমায় কেউ দেখতে পারে না।'

চওড়া পাড় পরিষ্কার একখানা সাদা শাড়ি পরিয়া যশোদা নিজেই একটু হাসিয়াছিল:—'রঙিন কাপড় পরার বয়েস কি আর আছে বোন? তোমার এমনি সাদাসিদে কাপড় থাকলে পরতাম। তোমার ঐ কাপড় পরে বৌ সাজি, আর আমায় দেখে সং ভেবে সবাই হাসুক, অত বোকা তোমার দিদিকে পাওনি!'

'রঙিন কাপড় পরলে লোকে হাসবে, এত বুড়ি তুমি হওনি দিদি। তোমার বয়েসে সবাই সাজগোজ করে।'

জামাকাপড়ের এই আলোচনায় বোধ হয় যোগমায়ার খেয়াল হইয়াছিল, একে একে সে চাহিয়া দেখিয়াছিল সকলের দিকে। তারপর চাহিয়াছিল নিজের জমকাল শাড়িখানার দিকে। এদের সঙ্গে সে সিনেমা দেখিতে যাইবে, এদের সঙ্গিনী হিসাবে? কি ভাবিবে লোকে? চেনা লোকে যদি তাকে এদের সঙ্গে দেখিতে পায়? এ পাড়াটা পার হইয়া যাওয়ার সময় তো অনেক চেনা লোকের চোখে পড়িয়া যাইবে, সত্যপ্রিয় চক্রবর্তীর মেয়ে সে, কে না তাকে চেনে এ পাড়ায়?

তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া যোগমায়া কাপড় ছাড়িয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। একটু পরে রওনা হওয়ার সময়েও তাকে ঘরের বাহির হইতে না দেখিয়া সুব্রতা ডাকিতে গেল।

যোগমায়া বলিল, 'আমি যাব না, যেতে ইচ্ছে করছে না আমার।'

'কেন? হঠাৎ তোমার কি হ'ল, যাবার জন্য তৈরি হয়ে?'

'বললাম তো ইচ্ছে করছে না।'

সুব্রতা মুখ ভার করিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল, 'ও যাবে না দিদি। কাপড়-চোপড় ছেড়ে ব'সে আছে।'

তখন ব্যাপার বুঝিতে গেল যশোদা।

মুখ ভার করিয়া যোগমায়া চৌকিতে বসিয়া আছে, বিনা দোষে কে যেন তাকে তিরস্কার করিয়াছে অনেক।

'কি হ'ল হঠাৎ, যাবে না কেন?'

'ভাল লাগছে না যশোদা দিদি!'

যশোদা একটু হাসিল, বলিল, 'সেজেগুজে রওনা হওয়ার সময় হঠাৎ এরকম ভাল না লাগা তো ভাল কথা নয়। চলো, লোকে কিছু ভাববে না। যদি ভাবে তো ভাববে যে, আমরা তোমার চাকর দাসী—তুমি কোথাকার রাজরাণী-টাণী হবে, পাঁচ-সাতজন চাকর দাসী নিয়ে বায়োস্কোপ দেখতে এসেছো।'

যোগমায়া চোখও তোলে নাই, আর কথাও বলে নাই।

যশোদা গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিল, 'তার চেয়ে এক কাজ কর না? সাদাসিদে একখানা কাপড় পরে চলো, এ কাপড়টা তোলা থাক। আমাদের সঙ্গে একেবারে মিশে যাবে--মনের খুঁতখুঁতানিটা যদি চাপতে পার কোনরকমে, কি ফূর্তিটা হবে বল তো?'

পাশে বসিয়া যোগমায়াকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, 'নতুন কিছু একটা করেই দ্যাখো না আমার কথায়—খেলা মনে করে দ্যাখো একবার? শখ করে!'

সাদাসিদে একখানা শাড়ি পরিয়াই শেষে, যোগমায়া দলে ভিড়িয়াছিল। সকলেই হাসিখুশি, অল্পবিস্তর উত্তেজিত—উত্তেজনা ছাড়া তো আনন্দ হয় না। কেবল যোগমায়ার উত্তেজনার মধ্যে আনন্দ নাই, যশোদার হুকুমে সে সকলের সঙ্গে আসিয়াছে কিন্তু মন কেন খুশি হওয়ার হুকুম মানিবে?

টিকিট আগেই করা ছিল, সকলে ভিতরে বসিল। আরম্ভ হইতে তখনও আধঘণ্টার উপরে দেরি। তবে তাতে কিছু আসে যায় না। অজিত আর যামিনী নিয়মিত সিনেমা দ্যাখে, তারা ছাড়া, এ আধঘণ্টা সকলের কাছেই উপভোগ্য, যে আনন্দ টিকিটের দামে কেনা হইয়াছে তার ফাউ। একেবারে অপরিচিত না হোক, এই আলো-ঝলমল গুঞ্জনধ্বনি মুখরিত ঘনীভূত আধুনিকতার জগতে সময় কাটানোর অভ্যাস যশোদার নাই। সকলের আগে যশোদার মনে হয় চারিদিকের দেওয়াল আর ছাদগুলি যেন শিশুকে ভুলানোর জন্যে মুখে রঙ-মাখা সুন্দরী

মেয়ের মত অসহ্য কৌতুকে উদ্ভট মুখভঙ্গি করিয়া আছে। ঘরের দেওয়ালে, আনাচে-কানাচে সর্বত্র হাস্যকর অনিয়ম। কোণগুলি কোণ নয়, রেখাগুলি সাপের মত আঁকা বাঁকা, এখানে ওখানে দু'চার হাত সমতল স্থান যদি বা থাকিয়া গিয়াছে রঙের কায়দায় সেখানটাও দেখাইতেছে উঁচুনীচু। কেমন পছন্দ মানুষের কে জানে, এমন খাপছাড়া ভঙ্গিতে ঘর তৈরি করে আর ঘর সাজানোর মধ্যে এমন কুৎসিত অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করে!

হল ইতিমধ্যেই প্রায় ভরিয়া গিয়াছিল, এখনও ক্রমাগত লোক ঢুকিতেছে ছোট বড় গৃহস্থ পরিবার, স্কুল কলেজের যুবক, মাঝবয়সী ও বৃদ্ধ। মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যাই বেশী, রঙীন শাড়ি আর গয়নায় সাজানো পুতুলের মত বৌ আর তার স্বামী, কোন কোন স্বামীর কোলে একটি শিশু, আবার অনেক দলে অল্পবয়সী মেয়ে-বৌ-এর সঙ্গে বাড়ির বয়স্কা গৃহিণীও আছে, সাজগোজটা তার একেবারে তুচ্ছ নয়।

যশোদার মনে হয়, সকলেই যেন তার চেনা মানুষ—ঠিক সামনের সিটের গল্প-বিভোর প্রেমিক-প্রেমিকা দুটিকে যেমন চেনে, খানিক তফাতে পাশাপাশি প্রায় তিন গণ্ডা সিট দখল করিয়া যে পরিবারটি বসিয়াছে তাদেরও তেমনি চেনে। সবাই যেন তার প্রতিবেশী, পাশের বাড়ির লোক।

কুমুদিনী বলিল, 'ভিড় হয়েছে তো খুব।'

সুব্রতা সগর্বে বলিল, 'বলিনি ভাল ছবি? কতদিন হ'ল চলছে, এখনো ভিড় হয়।'

যোগমায়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সে শুধু চারিদিকে চাহিতেছিল আর কেউ তার দিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে চাহিয়া নাই বলিয়া জ্বালা বোধ করিতেছিল। জমকালো শাড়ি গয়নার অভাবে তার মনে হইতেছিল ভিড়ের মধ্যে সে যেন একটু উলঙ্গ হইয়া বসিয়া আছে। কি ভাগ্যে চেনা কারও সঙ্গে দেখা হইয়া যায় নাই!

যশোদাও চুপ করিয়া ছিল। ছবি আরম্ভ হওয়ার আগে হইতেই সে প্রতীক্ষা করিয়া আছে, কখন নন্দ পর্দায় আসিবে!

'কত দেরি ছবি শুরু হতে?'

'এইবার শুরু হবে।'

যশোদার আগ্রহে সুব্রতা মনে মনে একটু হাসিল। যারা কখনো সিনেমায় আসে না, তারা এই রকম অধীর হইয়া পড়ে।

তারপর ঘর অন্ধকার করিয়া ছবি আরম্ভ হইল। যশোদা অন্ধকারে নিশ্চিন্তমনে ব্যাকুল আগ্রহের সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে পর্দায় নন্দের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় নন্দ? এলোমেলো কতকগুলি নরনারী পর্দার নড়াচড়া করিয়া আবোল-তাবোল কি সব বলিয়া গেল, তারপর আবাব আলো জ্বলিয়া উঠিল। সুব্রতা কি ভুল করিয়াছে?

যশোদা সুব্রতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কই সেই ছেলেটা তো গান করল না?'

সুব্রতা সবজান্তার মত বলিল, 'বই তো এখনো আরম্ভ হয়নি। বেশি বড় বই হ'লে হাফ-টাইমের আগে দেয়। ছোট বই হ'লে শীগগির হাফ-টাইম দিয়ে, পরে দেয়। কমিকটা সুন্দর হয়েছে, না?'

যোগমায়া সব ভুলিয়া-যাওয়া উজ্জ্বল হাসির সঙ্গে বলিল 'সত্যি। কি জব্দই হ'ল ছেলেটা মেয়েটার কাছে। বিয়ে ক'রে তবে রেহাই।'

কুমুদিনী বলিল, 'জব্দ হ'ল কিনা কে জানে!'

যোগমায়ার হাসি আরও উছলিয়া উঠিল, 'সত্যি! ঠিক্! বিয়ে করতেই তো চাইছিল।'

কমিক? বিয়ের কমিক? যশোদা রাগ করিয়া সোজা হইয়া বসে। এমন কেন হইয়াছে আজকাল, চোখের সামনে যা ঘটে তাও চোখে পড়ে না? মনে কষ্ট পাওয়ার কারণ ঘটিয়াছে, মনে কষ্ট হোক, তাতে যশোদার আপত্তি নাই। হাল-ভাঙ্গা নৌকার মত দিশেহারা হইলে চলিবে কেন?

আসল ছবি আরম্ভ হওয়াব কয়েক মিনিটের মধ্যেই নন্দের আবির্ভাব ঘটিল। নন্দই বটে, কিন্তু যেন কোন দেশী নন্দ, একেবারে চেনাই যায় না! সায়েব বাড়ির একটা ঘরে বাঙ্গালী বাড়ির একটা মেয়ে অর্গান বাজাইয়া গান গাহিতেছিল, এমন সময় আসিল সাহেবী পোষাক পরা নন্দ। গান শেষ হওয়া পর্যন্ত টেরও পাইল না কেউ ঘরে আসিয়াছে, তারপর চমকমারা, লজ্জাভরা আনন্দময় বিস্ময়ের সঙ্গে তাড়াতাড়ি অর্গান ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল। তারপর অনেকক্ষণ একটি অতি বুদ্ধিমতী মেয়ে আর অতি বুদ্ধিমান ছেলের কথা কাটাকাটি, হাসি-তামাসা অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি চলিতে লাগিল। প্রথমেই নন্দ একটা গান শোনানোর অনুরোধ জানাইয়াছিল এবং মেয়েটি বলিয়াছিল নন্দর মত গায়কের সামনে সে কিছুতেই গান করিবে না ; ধেৎ, তাই কি সে পারে, তার লজ্জা করে না বুঝি? মনে হইতে লাগিল, এ তর্কের জের যেন তাদের মিটিবে না। কথায় কথায় অন্য কথা আরম্ভ করিয়া নিজেদের সম্বন্ধে কত কথাই যে তারা দর্শকদের জানাইয়া দিতে লাগিল, মাঝে মাঝে কত বাড়ির লোক আর বাহিরের কত বন্ধু ও বান্ধবী বাজে ছুতায় আসিয়া দর্শকদের কাছে কৌশলে নিজেদের পরিচয় জানাইয়া চলিয়া গেল, তার পরেও দু'জনের মধ্যে কে আগে গান করিবে এ সমস্যা ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

'কেন শুনতে চাইছ গান?'

'তোমার গান বলে।'

'তার মানে আমি গাইতে পারি না। আমার গান বলে কোনরকমে শুনবে।'

'তোমার চেয়ে গান দামী,গানের চেয়ে তুমি দামী। গানে গানে সুবের মূর্ছনায় তুমি যখন জগৎ ভরে দাও, আমি নিজেকে ভুলে যাই।'

'আমিও। তুমি আগে গাও।'

'না, তুমি আগে।'

কি মানে দু'জনের এই কথা কাটাকাটির? যশোদা ভাবিয়া পায় না। সে তো জানে না দু'জনের গান সম্বন্ধে দর্শকের কৌতূহল বাড়ানোর এটা কৌশল।

তখন নন্দ বলিল, 'দু'জনে মিলে সেই গানটা গাই এসো।'

অর্গানের ধারে-কাছেও কেউ গেল না, নেপথ্যে কোথায় যেন গান আরম্ভ হওয়ার আগেই বাজনা বাজিয়া উঠিল—বাঁশী, বেহালা, হারমোনিয়াম, তবলা ইত্যাদির ঐকতান।

পালা করিয়া দু'জনে গান গায়, কাছাকাছি আসিয়া পরস্পরকে ধরাধরি করে, চোখে চোখে চাহিয়া থাকে, হঠাৎ পাক দিয়া তফাতে সরিয়া যায়। সকলে মুগ্ধ হইয়া দ্যাখে আর শোনে।

যশোদা যাত্রায় এরকম ডুয়েট গান অনেক শুনিয়াছে, তবে এতটা খাপছাড়া আর মার্জিত নয়। যাত্রার ডুয়েট গান যেন কাহিনী, আবেষ্টনী আর অভিনয়ের সঙ্গে বেশ মানায়।

তবে এখানে নন্দ আছে।

পর্দার কাহিনী আগাইয়া চলে, কোন্ দেশের মানুষের কোন্ দেশী কাহিনী বুঝিয়া উঠিতে গিয়া যশোদার ধাঁধা লাগিয়া যায়। যে ঘটনা ঘটা উচিত সে ঘটনা ঘটে না, যার যে কথা বলা উচিত সে সে-কথা বলে না, অথচ মাঝে মাঝে ঘরোয়া ঘটনা উঁকি দিয়া যায়, ঘরোয়া

কথা কানে আসে।

আগাগোড়া সবটা রূপকথা হইলে বোধ হয় যশোদা এতটা বিব্রত হইয়া পড়িত না। রূপকথাতেও আগাগোড়া একটা সামঞ্জস্য থাকে। যশোদা যখন ভাবে, এইবার নন্দ রাগ করিবে, নন্দ তখন হাল্কা হাসি হাসে, নন্দর হাসি দেখিবার আগ্রহে যশোদা যখন সামনে একটু ঝুঁকিয়া পড়ে, নন্দ তখন রাগে আগুন হইয়া ওঠে।

যশোদার নিজেরই তখন রাগ হয়।

তারপর দেখা দেয় সুবর্ণ। সুবর্ণ একটি অপ্রধান পার্টে নামিয়াছে, অল্পবয়সী বৌ-এর পার্টে। এই পার্টটিই বোধ হয় সে ভাল অভিনয় করিতে শিখিয়াছে।

যশোদাকে সহজে চমক দেওয়া যায় না, সে ধীরে ধীরে নাড়া খায়। সুবর্ণের উপর যশোদা বিশেষ খুশি ছিল না, ছবি শেষ হওয়ার আগেই মেয়েটার জন্য তার যেন বেশ মায়া জন্মিয়া যায়। মনের তলে একটা আশা যশোদার ছিল বৈকি যে একদিন নন্দ আর সুবর্ণ ফিরিয়া আসিবে, দু'জনকে সে ক্ষমা করিবে আর ভাই ও ভাই-এর বৌকে নিয়া সংসার করিয়া চলিবে সুখে। এখন মনে হইতে থাকে, নন্দ যেন তার সে আশা চিরদিনের জন্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে, তার ঘরের বৌকে করিয়া দিয়াছে সিনেমার অভিনেত্রী। জীবনে আর কোনদিন সে তার বাড়িতে বৌ সাজিয়া থাকিতে আসিবে না।

যশোদা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবে, আমার মত ভাগ্যবতী সংসারে কেউ নেই। আমি যা ধরতে যাই তাই ফসকে যায়। যে সুখ আমার জোটা উচিত ছিল, তা জোটে না। মরণও হচ্ছে না সেইজন্য?

বাড়ি ফিরিবার পথে জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন দেখলে দিদি?'

যশোদা সংক্ষেপে বলে, 'বেশ।'

রাজেন গম্ভীর চিন্তিত মুখে মাঝে মাঝে যশোদার মুখের দিকে তাকায়, কিন্তু কিছু বলে না। মন্তব্য করে কুমুদিনী।

বলে, 'ছেলেটা ঠিক আমাদের নন্দের মত নয়? গলার আওয়াজটা পর্যন্ত একরকম। প্রথমটা আমি তো—'

কেদার বলে, 'আহা, চুপ কর না?'

কুমুদিনী ফোঁস করিয়া ওঠে, 'কেন, চুপ করব কেন?'

যশোদা ধীরে ধীরে বলে, 'নন্দর মত নয়, ওই আমাদের নন্দ।'

'ও মা সে কি কথা গো?'

প্রথমে খানিকক্ষণ কুমুদিনী পলক না ফেলিয়া চাহিয়া থাকে, তারপর যেন প্রকাণ্ড একটা সমস্যা সমাধান করিয়া ফেলিয়াছে এইরকমভাবে বারকয়েক মাথা নাড়িয়া বলে, 'হুঁ, তাই তো বলি, জনে জনে কি এমন মিল থাকে! কেমনধারা সাজ পোশাক করেছে তাই, নইলে কি আর চিনতে একদণ্ড দেরি হ'ত। নন্দ বায়োস্কোপ করছে!'

যোগমায়া ধীরে ধীরে বলে, 'আমি দেখেই চিনেছিলাম।'

এসব আলোচনা যশোদার আর সহ্য হয় না। সে বিরক্ত হইয়া বলে, 'চেনা মানুষকে চিনবে, তাতে আশ্চর্যের কি আছে? কি যেন আরম্ভ করে দিয়েছ তোমরা।'

মনে মনে যশোদা ভাবে, নন্দকে চিনিতে পারিল, সুবর্ণকে কেউ চিনিতে পারিল না কেন?

সমস্ত পথ গম্ভীর হইয়া কি যেন ভাবে কুমুদিনী, বাড়ি ফিরিয়া যশোদাকে একান্তে টানিয়া নিয়া বলে, 'বলি চাঁদের-মা, একটি বৌ দেখলাম জ্যোতির্ময়বাবুর বোনের মত,

সে বুঝি—'

'সে সুবর্ণ।'

'মাগো! এসব কি !—'

কুমুদিনীর মুখ দেখিয়া মনে হয় সে বুঝি শুধু আশ্চর্য হয় নাই, ভয়ও পাইয়াছে।

পরদিন সকালে রাজেনকে ডাকিয়া যশোদা বলিল, 'একটা কাজ করে দেবে?'

এরকম ভূমিকা কবা যশোদার স্বভাব নয়। রাজেন একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

'কি কাজ?'

'নন্দর ঠিকানাটা জেনে আসবে?'

'নন্দর ঠিকানা জেনে করবে কি চাঁদের-মা?'

যশোদা হাসিল—'বেশ মানুষ বটে তুমি, বেশ কথা সুধোচ্ছো।'

রাজেন ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'মানে, কি জান চাঁদের-মা, আসবার হ'লে নন্দ নিজেই আসত আগে। বায়োস্কোপে পার্ট করলে নাকি ঢের পয়সা পাওয়া যায় শুনেছি, ওর তো পয়সার অভাব নেই—'

'পয়সার কথা নয়, নিজে থেকে ফিরে আসতে হয়তো সাহস পাচ্ছে না।'

তখন নন্দর ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া আনিবার কথা দিয়া রাজেন চলিয়া গেল, যশোদা গেল সত্যপ্রিয়ের বাড়ি।

হঠাৎ তার মনে হইয়াছে, অল্পবয়সী ছেলে-মেয়ে ঝোঁকের মাথায় বাড়ি ছাড়িয়া গেলে যে অনেক সময় সাধ থাকিলেও ফিরিয়া আসিতে ভরসা পায় না, একথাটা সত্যপ্রিয়কে বুঝাইয়া বলা দরকার।

যামিনী স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াক বৌকে নিয়া নিজের ভিন্ন সংসার পাতুক, যশোদার তাতে কোন আপত্তি ছিল না। মানুষের মধ্যে এরকম তেজই সে পছন্দ করে। কেবল যোগমায়াব সন্তান-সম্ভাবনার জন্য এসময়টা তাকে নিয়া এরকম টানা-হ্যাঁচড়া করা সঙ্গত নয় বলিয়া প্রথমটা সে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। এতকাল যে অনায়াসে শ্বশুরের অন্ন ধ্বংস করিয়াছে আর কয়েকটা মাস সে ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারিল না? বীরত্ব বা মনুষ্যত্ব তো পাগলামি নয়। বেহিসাবী তেজ দেখানো গোঁয়ার্তুমির সামিল।

প্রথমে যামিনী বুক ফুলাইয়া বলিত, কুঁড়ে ঘরে না খাইয়া দিন কাটাইবে তবু আর জীবনে কখনও শ্বশুরের অন্ন ধ্বংস করিতে যাইবে না। কিন্তু এখন মুখেও আর সে ওসব কথা বলে না। কিছুদিন পরে সে হঠাৎ একদিন যাচিয়া গিয়া সত্যপ্রিয়ের পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িবে, তাকে কোনমতেই আটকানো যাইবে না। নিজের পায়ে ভর দিয়া কুঁড়ে ঘরে স্বাধীন জীবনযাপন করিবার মানুষ সে নয়—একটু নরম হইয়া থাকিলেই সত্যপ্রিয়ের রাজপ্রাসাদে আরামে জীবন কাটানোর সুযোগটা অন্তত যতদিন সামনে উপস্থিত আছে। যোগমায়ারও এ জীবন সহ্য হইতেছে না। এরকম অবস্থায় ওদের এখানে রাখিয়া কষ্ট দিয়া লাভ কি? ফিরিয়া যদি যাইতে হয়, ক'মাস পরে যাওয়ার চাইতে, যোগমায়ার দিক হইতে ধরিলে, এখন যাওয়াই ভাল।

তাছাড়া আর একটা কথাও যশোদার মনে হইতে থাকে— ওদের দু'জনকে বাড়িতে রাখিয়া সত্যপ্রিয়কে খোঁটা দেওয়া যাইবে ভাবিয়া নিজের খুশি হওয়ার কথা। প্রতিহিংসার জন্য ওদের কেন সে কষ্ট দিবে? এই অন্যায় কল্পনা মনে আসিয়াছিল বলিয়া এখন তাহার মনে হয়, ওদের ফিরিয়া যাওয়াব উপায়টা তারই করিয়া দেওয়া উচিত।

সত্যপ্রিয় কাগজ পড়িতেছিল, মুখ তুলিয়া একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই বলিল, 'এসো চাঁদের-মা।'

খানিক তফাতে মেঝেতে জাঁকিয়া বসিয়া যশোদা নির্বিকারভাবে বিনা ভূমিকায় বলিল, 'মেয়েকে এবার ফিরিয়ে আনুন।'

'মেয়েকে ফিরিয়ে আনব? আমি?'

'তাতে দোষ কি বলুন? বাপ তো আপনি? বড় কাঁদাকাটা করছে খুকী। এ সময়টা খুকীর পক্ষে—ছেলেমেয়ে হবে ওর জানেন না বোধ হয়?'

'জানি।'

শুনিয়া যশোদা একটু চুপ করিয়া রহিল।

'জেনেও ওদের যেতে দিলেন?'

'আমি যেতে বলিনি। ওরা নিজেরাই গেছে।'

'আটকানো উচিত ছিল আপনার।'

'কি করে আটকাতাম? পায়ে ধরে?'

যশোদা তাড়াতাড়ি বলিল, 'ছি, ওকথা বলতে নেই। অকল্যাণ হয়। যা হবার হয়ে গেছে, এবার ওদের ক্ষমা করুন। ছেলেমানুষ তো, ওরা কি বোঝে? ফিরে আসবার জন্য মেয়েজামাই আপনার পাগল হয়ে আছে, কেবল না ডাকলে ভরসা পাচ্ছে না আসতে। আপনি যদি ডেকে পাঠান—'

সত্যপ্রিয় তার পরিচিত মৃদু হাসির সঙ্গে বলিল, 'ডেকে পাঠালেই তো ওরা মাথায় চড়ে বসবে, চাঁদের-মা।'

যশোদা অবাক হওয়ার ভান করিয়া বলিল, 'মাথায় চড়ে বসবে? আপনার? আপনার সামনে মুখ তুলে কথা কইবার সাহস ওদের আছে কিনা সন্দেহ, মাথায় চড়বে! তাছাড়া, বেয়াদবি যদি একটু করেই, মেয়ে-জামাইকে সিধে রাখতে পারবেন না?'

সত্যপ্রিয় ভাবপ্রবণতার চিহ্নও দেখাইল না, শান্তভাবে বলিল, 'ওরা নিজে থেকেই আসবে।'

যশোদাও তা জানিত, কিছুক্ষণ সে আর বলিবার কিছু খুঁজিয়া পাইল না। সত্যপ্রিয়ের নির্বিকার ভাব যশোদাকে সত্যসত্যই দমাইয়া দিয়াছিল। সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে কথা বলার এই একটা মস্ত অসুবিধা, এত সহজে সে মানুষের মধ্যে নিজের প্রয়োজনীয় অনুভূতি জাগাইয়া তুলিতে পারে, উত্তেজনা, ভয়, আনন্দ, উৎসাহ, হতাশা এসব যেন নিজের ইচ্ছামত পরের মধ্যে সংক্রামিত করিবার ক্ষমতা তার আছে। সত্যপ্রিয়ের উদাসীনতা দেখিয়া মনে হয়, মেয়ে-জামাই এর কথাটা আলোচনা করাও সে প্রযোজন মনে করে না। অতি সাধারণ একটা ব্যাপার, সংসারে এমন অনেক হয়, আপনা হইতেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। এজন্য মাথা-ঘামানোর কিছু নাই। যশোদারও মনে হইতে থাকে, ব্যাপারটা সে যত গুরুতর মনে করিয়াছে, হয়তো তেমন কিছুই নয়। এবিষয়ে আর কিছু না বলাই উচিত। তবে কোন কাজ আর আরম্ভ করিয়া মাঝখানে হাল ছাড়িয়া দেওয়া যশোদারও স্বভাব নয়।

'তা হয়তো আসবে, কিন্তু তার তো দেরি আছে। খুকীর মুখ চেয়ে একটু তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনাই ভাল। আপনার ছেলেকে যদি পাঠিয়ে দেন—'

সত্যপ্রিয় মাথা নাড়িয়া বলিল, 'আমি কাউকে পাঠাতে পারব না।'

কথাটা সে এমন স্পষ্টভাবেই বলিল, যে মাথা নাড়িবার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

যশোদা হাঁটু গুটাইয়া মেঝেতে ডান হাতের তালু পাতিয়া একটু কাত হইয়া মেঝেতে মেয়েদের বসিবার চিরন্তন ভঙ্গিতে বসিয়াছিল। উঠিয়া দাঁড়ানোর ভূমিকা হিসাবে সে এবার সোজা হইয়া বসিল। আর তার কিছুই বলিবার নাই।

সত্যপ্রিয় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'ওরা বুঝি তোমায় পাঠিয়েছে?'

যশোদা বলিল, 'না।'

সত্যপ্রিয় এতক্ষণ অন্যদিকে চাহিয়াছিল, কথা বলিবার সময় সে কদাচিৎ শ্রোতার মুখের দিকে তাকায়। এবার যশোদার চোখে চোখ মিলাইয়া সে খানিকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, তারপর মৃদুস্বরে বলিল, 'অন্য কেউ একথা বললে বিশ্বাস করতাম না চাঁদের-মা। তবে তোমার কথা আলাদা। তুমি কখনো মিথ্যা বল না।'

সত্যপ্রিয়ের দৃষ্টি দেখিয়া যশোদা এক মুহূর্তের জন্য শিহরিয়া উঠিয়াছিল। যশোদার স্নায়ুগুলি এরকম শিহরণের উপযোগী করিয়া তৈরি হয় নাই ; রাতদুপুরে হঠাৎ বাড়ির অন্ধকারে একটা ভূত দেখিলেও সে ভাল করিয়া চমকাইয়া ওঠে কিনা সন্দেহ। কিন্তু সত্যপ্রিয়ের দৃষ্টিতে যে-ভাষা তার স্পষ্ট চোখে পড়িয়াছে ভূত দেখার চেয়ে তা চমকপ্রদ। ধনঞ্জয়ের চোখে একদিন যশোদা এ ভাষা দেখিয়াছিল, তবে সত্যপ্রিয়ের চোখের এমন বিশ্বগ্রাসী মারাত্মক ক্ষুধার সঙ্গে ধনঞ্জয়ের সেই মৃদু কামনার অভিব্যক্তির তুলনাই হয় না। হঠাৎ যশোদার একটা অদ্ভুত ধরনের লজ্জা বোধ হয়, অনেকদিন সেরকম লজ্জার সঙ্গে তার পরিচয় ঘুচিয়া গিয়াছিল।

চোখের অস্বাভাবিক দীপ্তি নিভাইয়া সত্যপ্রিয় বলিল, 'তবু মেয়ে-জামাইকে ফিরিয়ে আনাবার জন্য আমি কিছু করতে পারব না চাঁদের-মা। তুমি নিজে যখন এসেছ, আমার মেয়ের ভালর জন্য এসেছ, তোমার জন্য আমি এইটুকু করতে পারি—ওদের ক্ষমা করলাম। তুমি গিয়ে ওদের বলতে পার, ওরা যদি ফিরে আসে আমি ওদের কিছু বলব না।'

বাড়ি ফিরিয়া যশোদা নিজের বিস্ময়ে নিজেই হতবাক্ হইয়া থাকে। তার জীবনে কখনও এমন সমস্যা উদয় হয় নাই। যা সে দেখিয়া আসিয়াছে সত্যপ্রিয়ের চোখে তাই কি ঠিক? অন্য আর কি হইতে পারে? যেভাবে সত্যপ্রিয় তাকে দু'চোখ দিয়া গ্রাস করিতে চাহিয়াছিল তার তো অন্য কোন ব্যাখ্যা সম্ভব নয়? কিন্তু সত্যপ্রিয়ের পক্ষে কি ওটা সম্ভব? বিশেষতঃ তাকে দেখিয়া? তার মত বিরাটকায়া মাঝবয়সী রমণীকে সামনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সত্যপ্রিয়ের মত প্রৌঢ় মানুষের মধ্যে জোয়ারের আকস্মিক বন্যার মত প্রচণ্ড কামনার উদ্রেক হইতে পারে, এ তো বিশ্বাস করার মত কথা নয়।

চোখ বুজিয়া বাস্তবকে এড়ানোর ছেলেমানুষি যশোদার নাই। সে জানে, সত্যপ্রিয়ের মত সবল সুস্থ সংযমী মানুষ প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছে বলিয়াই নিভিয়া যায় না। আকস্মিক এবং হয়তো ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের অসংযমকে একেবারে বর্জন করা মানুষের পক্ষে কঠিন। রামায়ণ মহাভারতে যশোদা মুনি ঋষিরও অনেক অসংযমের কাহিনী পড়িয়াছে। কিন্তু সে সব হঠাৎ-জাগা ভালবাসা জাগাইত অনন্যসাধারণ রূপবতী যুবতী মেয়েরা! যশোদাকে দেখিলে রাস্তার গুণ্ডাও যে ভড়কাইয়া যায়!

সত্যপ্রিয়কে যশোদা ভাল করিয়াই চেনে, এক এক সময় ব্যাপারটা তার বড়ই কৌতুক-জনক মনে হয়, আবার পরক্ষণে সে বুঝিতে পারে এর মধ্যে কৌতুকের কিছু নাই, বিষয়টা অতীব গুরুতর! সত্যপ্রিয় যা কিছু চায়, প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গেই চায়। প্রত্যেকটি কামনার এরকম অস্বাভাবিক প্রচণ্ডতাই সত্যপ্রিয়কে এরকম হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর করিয়াছে। বিরক্তি বোধ

করিলে ভূমিকম্পের জন্য সত্যপ্রিয় পৃথিবীকে পদাঘাত করিয়া ছাড়ে। পায়ে একটা কাঁটা ফুটিলে হয়তো জগতের সমস্ত কাঁটা নষ্ট করিয়া ফেলা সম্ভব কিনা এই কল্পনাকেও সে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু সে ভাববিলাসী নয়, বাস্তবকে সে এড়াইয়া চলে না,—তার মত হিসাবী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ফন্দিবাজ, সংযমী আর স্বার্থপর মানুষ যশোদা খুব কমই দেখিয়াছে। মানুষকে পায়ের নিচে চাপিয়া রাখার কামনা সম্বন্ধে হয়তো সে অসংযত, নিজের মতামত প্রচার করার স্বপ্ন দেখিবার বেলা হয়তো সে অবাস্তব, অসম্ভব কল্পনার ক্রীতদাস,—কিন্তু তাও যেন ইচ্ছাকৃত দুর্বলতা, জানিয়া বুঝিয়া নিজেকে একটু খেয়াল খেলার সুযোগ দেওয়া।

অথবা মোটের উপর মানুষটা আসলে পাগল?

এই সব চিন্তায় কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। তারপর একদিন সকালে পিয়ন আসিয়া একখানা খাম দিয়া গেল যশোদার নামে। খামের মধ্যে কারও ব্যক্তিগত চিঠি ছিল না, ছিল একটি নোটিশ। সহরতলীর উন্নতির জন্য যশোদার বাড়ির উপর দিয়া নতুন রাস্তা যাইবে, যশোদার বাড়ি আর আলগা জমি উপযুক্ত মূল্যে কিনিয়া নেওয়া হইবে। বাড়ি বিক্রয় করার বিরুদ্ধে আর নির্ধারিত মূল্যের বিরুদ্ধে যশোদার যদি কিছু বলিবার থাকে, নির্দিষ্ট একটি দিনের মধ্যে যশোদা যেন তার লিখিত আবেদন দাখিল করে।

ইংরাজিতে লেখা নোটিশ, যামিনী তাকে সমস্তটা পড়িয়া শুনাইয়া মানে বুঝাইয়া দিল। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া যশোদা বলিল, 'বাড়ি বেচতে হবে?'

যামিনী বলিল, 'তা ছাড়া আর উপায় কি! আপত্তির কথাটা বাজে, ওরা আপত্তি কানে তোলে না।'

'আমি বেচতে না চাইলেও বেচতে হবে?'

'তাই তো আইন—রাস্তার জন্য কিনা! তবে ওরা দাম ভাল দেয়—এখানকার বাড়ি বেচে অন্য জায়গায় বাড়ি করবেন।'

যশোদা বিশ্বাস করিল না। নোটিশ-হাতে পাড়ার রমেশ উকিলের বাড়ি গিয়া হাজির হইল। ফিরিয়া আসিয়া দ্যাখে রাজেন বসিয়া আছে।

'কি ব্যাপার চাঁদের-মা?'

'আবার পাততাড়ি গুটোতে হবে।'

আগে আর কখনো যশোদা পাততাড়ি গুটায় নাই, কেবল গুটানোর উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু কথা শুনিয়া মনে হয়, পাততাড়ি গুটাইয়া গুটাইয়াই যেন তার জীবন কাটিয়াছে।

রাজেন হাত বাড়াইয়া বলিল, 'দেখি, পড়ে দেখি একবারটি কি লিখেছে।'

'এর মধ্যে খবর পেয়েছ?' বলিয়া যশোদা নোটিশটি তার হাতে দিল। গম্ভীরভাবে নোটিশ পড়িয়া নিরুপায় আপসোসের সঙ্গে প্রচণ্ড একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'হুঁঃ! ওই হনুমানটার কাজ আর কি!'

যশোদারও কথাটা মনে হইয়াছিল, বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় নাই। সহর আর সহরতলীর উন্নতির জন্য যারা মাথা ঘামায়, তাদের সঙ্গে সত্যপ্রিয়ের সম্পর্কই বা কোথায়? তাছাড়া, ক'দিন আগে সত্যপ্রিয়ের চোখে যে দৃষ্টি দেখিয়াছিল, তাও যশোদা ভুলিতে পারিতেছিল না।

রাজেন আবার বলিল, 'মেয়ে-জামাইকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছ কিনা, তার শোধ তুলল।'

সকলেই আসিয়া হাজির হইয়াছিল। যোগমায়া হঠাৎ ক্ষেপিয়া গেল, 'আমাদের কথা বলছ

তুমি! বাবার কথা বলছ! আমার বাবাকে তুমি হনুমান বললে?'

রাজেন বলিল, 'শুধু হনুমান? তোমার বাবা—'

যশোদা বলিল, 'আহা, থামো না বাবু, তোমারও কি মাথা খারাপ হ'ল?'

এখানে আর বেশি সহানুভূতির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া যোগমায়া কাঁদিবার জন্য ঘরে চলিয়া গেল।

যশোদা বলিল, 'কিন্তু চক্কোত্তি মশায়ের সঙ্গে এদের সম্পর্ক কি?'

রাজেন বলিল, 'সম্পর্ক আর কি, ও-ব্যাটার কোম্পানি থেকে এপাড়ার সব ঘরবাড়ি জমিজমা কিনে নিয়েছে তো, তুমি আর আমি শুধু বেচিনি। তারপর বলে দিয়েছে, এখান দিয়ে রাস্তা গেলে সুবিধে হবে।'

'তুমি আর আমি যদি বলি এখান দিয়ে রাস্তা যেতে দেবো না? একটু তফাৎ দিয়ে—?'

রাজেন মাথা নাড়িল, 'আমরা দু'জন বললে কি হবে, সবাই বললে তবু ভরসা ছিল। তা সবাই তো আগেই ঘরবাড়ি বেচে বসে আছে। তাছাড়া ওই হনুমানটার কথা ফেলে আমাদের কথা কে শুনবে বলো? আমরা হলাম গরীব মানুষ।'

যোগমায়ার মনে কষ্ট হইবে বলিয়া সত্যপ্রিয়ের ক্ষমা করার প্রতিজ্ঞার কথাটা যশোদা তাদের শোনায় নাই। আপনা হইতে এরা যদি ফিরিয়া যায়,আর গিয়া দ্যাখে যে, সত্যপ্রিয় একটুও রাগ করে নাই, দু'জনেই খুব খুশি হইবে। ভাবিয়াছিল, নিজেই বুঝাইয়া দু'জনকে পাঠাইয়া দিবে।

রাজেন কাজে চলিয়া গেলে যশোদা যামিনীকে জিজ্ঞসা করিল, 'আমি তো চললাম, আপনারা এবার কি করবেন?'

যামিনী ইতিমধ্যে একবার ঘরে গিয়া বাপের অপমানে অপমানিতা যোগমায়ার সঙ্গে ঘণ্টা খানেক কাটাইয়া আসিয়াছে। সে বলিল, 'তাই ভাবছি।'

'ফিরেই যান না?'

'তাই যাই, কি বলেন?'

'সেই ভাল। আমার মনে হয়, চক্কোত্তি মশায় রাগ করেননি, আপনারা ফিরে গেলে খুব খুশি হবেন।'

যামিনী আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'ফিরেই যদি যেতে হয়, দেরি করা বোধ হয় উচিত হবে না। যেতে হলে আজকেই চ'লে যাই। আপনি কি বলেন?'

'তাই যান।'

অজিতের দিকে চাহিয়া যশোদা হাসিয়া বলিল, 'তোমরা কি করবে ভাই?'

অজিত বলিল, 'এই তো সবে নোটিশ এলো, এখনও ঢের দেরি। বাড়ি বেচে সব ঠিকঠাক করে উঠে যেতে বছর খানেক তো অন্ততঃ লাগবেই—ইচ্ছে করলে বেশিও লাগাতে পারেন। আমরা কি করব, ভেবে-চিন্তে ঠিক করলেই হবে।'

যশোদা হাসি বন্ধ করিয়া বলিল, 'দেরি নেই ভাই , দু'চার দিনের মধ্যে আমি উঠে যাব, যত শীগ্‌গির পারি। এখানে আর মন টিকছে না। দু'দিন বাদে উঠে যেতেই হবে, ভাবব আর দিন গুণে দিন কাটাব—বাপরে, আমার দম আটকে আসবে।'

'আমরা তবে অন্য কোথাও ঠিক করে—'

সুব্রতার কথার উৎস অনেক্ষণ বন্ধ হইয়াছিল, চোখ দু'টি একটু যেন ছলছল করিতেছিল। অজিতের কথা শেষ হওয়ার আগেই সে বলিয়া উঠিল, 'অন্য কোথাও না ছাই,আমরাও দিদির

সঙ্গে যাব। তোমায় আর আমি ছাড়ছি না দিদি, ম'রে গেলেও না—যেখানেই যাও তুমি, আমি তোমার সঙ্গে যাবই যাব। হুঁ, বলে এতকাল পরে সত্যিকারের একটা দিদি পেলাম, দিদি যাবে এক জায়গায়, আমরা যাব আর এক জায়গায়! কি যে বল তুমি!'

অজিত তাড়াতাড়ি বলিল, 'আমি এমনি বলছিলাম।'

সুব্রতার গালটা একটু টিপিয়া দিয়া যশোদা রান্নাঘরে চলিয়া গেল। ছোট ছোট দু'টি উনুনে রান্না হইতেছে, একটি তোলা উনুন। আগে একবার যখন যশোদার ভরাট বাড়ি খালি হইয়া গিয়াছিল, চলিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া বড় বড় উনুনগুলি সে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল; এই উনুনগুলিও আবার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।

কোথায় যাইবে? কোথাও বাড়ি কিনিয়া উঠিয়া যাইবে, না নন্দের বাড়িতে গিয়া উঠিবে? রাজেন নন্দের ঠিকানা আনিয়াছে, নন্দ নাকি এখন বড়লোক, তার বসিবার ঘরে গদি-আঁটা চেয়ার। সেখানে কি থাকিতে পারিবে যশোদা? কিন্তু যেখানেই যাক, উনুনগুলি আবাব তাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।

অহিংসা

সেরা মানিক—১০

।। এক ।।

সদানন্দ সাধুর আশ্রমের তিনদিকটা তপোবনের মত। বাকি দিকটাতে একটা নদী আছে। আশ্রম ঘিরিয়া অবশ্য তপোবনটি গড়িয়া ওঠে নাই, স্থানটি তপোবনের মত নির্জন আর শান্তিপূর্ণ দেখিয়াই আশ্রম গড়িয়া তোলা হইয়াছে। আশ্রমের বয়স আর কত হইবে, বছর পাঁচেকের বেশি নয়। তপোবনের বড় বড় গাছগুলির কোন কোনটা হয়ত শতাব্দীরও বেশি সময় ধরিয়া নিবিড় ছায়া বিলাইয়া আসিতেছে।

তপোবনের সমস্তটা আশ্রমের সম্পত্তি নয়। দলিলপত্রের হিসাবে দেখা যায়, আশ্রমের ভূমির পরিণাম শ'খানেক বিঘার কাছাকাছি। তপোবন আরও বিস্তীর্ণ—উত্তরে বাসুপুরের গা-ঘেঁষা প্রকাণ্ড কলাবাগান এবং দক্ষিণে সাতুনার বাগ্দীপাড়া পর্যন্ত এলোমেলোভাবে ছড়ানো আরও বড় আমবাগানটা ধরিলে আশ্রমের ভূমির দশ বার গুণ। তবে দলিলপত্রে ছাড়া আশ্রমের সীমানা ভাল করিয়া কোথাও দেখানো নাই কিনা, তাই বন, উপবন, আমবাগান, কলাবাগান, সমস্তই আশ্রমের তপোবন বলিয়া মনে হয়।

নদী পূর্বদিকে।

একটি শাখানদীর এই উপশাখাটিকে স্থানীয় লোক আদর করিয়া ডাকিত রাধা বলিয়া, বোধ হয়, আদরের আতিশয্যেই একটা ই'কার জুটিয়া এখন হইয়াছে রাধাই।

বড় আশ্চর্য নদী। প্রতি বছর বাঁচে আর মরে। আকাশে যেই কালো কালো মেঘ জমিয়া থম থম করে, লোকে জল আটকানোর জন্য চালের ফুটা আর ছাতির ফুটা মেরামত না করিয়া আর উপায় খুঁজিয়া পায় না, রাধাই নদীতে অমনি দেখা দেয় ঘোলা জলের স্রোত। ক'মাস ধরিয়া রোদে যে বালি তাতিয়াছে, সে বালি যায় ঢাকিয়া, স্থানে স্থানে যে আবদ্ধ জল পচিয়া উঠিতেছিল, সে জল যায় ভাসিয়া। সকলে অবাক হইয়া একবার তাকায় আকাশের দিকে, একবার তাকায় রাধাই নদীর দ্রুত বর্ধনশীল জীবনসঞ্চারের দিকে। বড় রহস্যময় মনে হয় ব্যাপারটা সকলের কাছে। বৃষ্টি আর হইয়াছে কতটুকু, কদিনের ছাড়া ছাড়া বর্ষণে পথঘাট ভাল করিয়া ভেজে নাই পর্যন্ত। কোন পুকুরে জল বাড়ে নাই, কোন ডোবায় জল জমে নাই। রাধাই এত জল পাইল কোথায়?

দূরদেশে কোথায় ইতিমধ্যে প্রবল বর্ষা নামিয়াছে, কোন্ বড় নদী সেই জল বহিয়া আনিয়া কোন্ শাখানদীকে দিয়াছে, আর কোন্ শাখানদীর দানে তাদের এই নদীতে দেখা দিয়াছে নবযৌবনের আবির্ভাব, এত সব রহস্যের সন্ধান কজনে আর রাখে। চোখের সামনে মরা নদীকে বাঁচিতে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হয়।

নদীর একেবারে ধারে প্রকাণ্ড চালাটায় বিকালের দিকে সাধুজীর দর্শনকামীদের সমাগম হয়। আশ্রমের সকলে তো উপস্থিত থাকেই, কাছাকাছি গ্রাম হইতে অনেকে আসে, দূরের গ্রাম ও সহর হইতেও আসে। সদানন্দ সকলকে দর্শনও দেয়, দর্শনের মনোমত ব্যাখ্যাও শোনায়।

এবার যেদিন প্রথম রাধাই নদীর বুকে স্রোত দেখা দিল, সেদিন অহিংসা ও প্রেমের কথা বলিতে বলিতে সদানন্দ হঠাৎ আনমনে চুপ করিয়া গেল। নদীর স্রোতের দিকে পলকহীন চোখে এমনভাবে চাহিয়া রহিল যে, কারও বুঝিবার উপায় রহিল না, অন্যমনস্ক সে ইচ্ছা করিয়া হইয়াছে। আজ কথা জমিতেছিল না। যার কথা মনের মধ্যে কাঁটার মত বেঁধে, মধুর মত মাখা হইয়া যায়, মধুপের মত গুঞ্জন করে, শুনিতে শুনিতে থাকিয়া থাকিয়া হয় রোমাঞ্চ,

আজ যেন তার কথায় জোর নাই, সুর নাই—নিছক কতকগুলি নীরস, ভোঁতা শব্দমাত্র পরিবেশন করিতেছে। অস্বস্তিবোধ করিতে করিতে এতক্ষণে কারণটা টের পাইয়া সকলে স্বস্তিলাভ করে। তাই বটে, সাধুজী আজ অন্যমনস্ক হইয়া আছেন। কথায় সাধুজীর মন নাই।

পুরুষরা চুপ করিয়া রহিল, মেয়েদেব মধ্যে শোনা গেল ফিস ফিস কথার গুঞ্জন। এখানে মেয়ে পুরুষের বসিবার পৃথক ব্যবস্থা নাই, সদানন্দ পুরুষ ও নারীর পার্থক্য স্বীকার করে, পৃথক রাখিবার প্রয়োজন স্বীকার করে না। এই সভায় যারা বসে, তাদের মধ্যে যেমন ছোট-বড নাই, আপন-পর নাই, তেমনি মেয়ে-পুরুষও নাই। অন্ততঃ, সাধুজীর তাই নির্দেশ। তবু, মেয়েরা দল বাঁধিয়া একপাশে তফাতে সরিয়া বসে, ব্যবধানটা ঘুচাইবার চেষ্টাও পুরুষদেব মধ্যে কখনও দেখা যায় না। চালার নিচে স্থানাভাব ঘটিলেও নয়।

চালার কাছে খানিকটা জায়গা গাছপালা কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এখানে গাছের ছায়া নাই। তপোবনের মাথা ডিঙ্গাইয়া বাঁকাভাবে রোদ আসিয়া মেয়েদের বসিবার জায়গায় পড়িয়াছে, বড় তেজ এখানকার রোদের। ঘামে সকলে ভিজিয়া গিয়াছে, তবু, সরিয়া ছায়ায় গিয়া বসিবার সাহস কারও নাই। একটি কমবয়সী বিধবা, গায়ের রঙটা যাব আশ্চর্যরকমের ফর্সা, মুখখানা সিঁদুরের মত রাঙ্গা করিয়া চোখ বুঁজিয়া পাশের ঘোমটা-টানা বৌটির গায়ে নির্লজ্জ ভঙ্গিতে হেলান দিয়া আছে। হয়, মূর্চ্ছা গিয়াছে, নয়, যাওয়ার উপক্রম করিয়াছে।

আনমনে নদীর দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতেই সদানন্দ বলিল, 'মেযেদের গায়ে রোদ লাগছে বিপিন।'

বিপিন সদানন্দের বন্ধু, শিষ্য এবং আশ্রমের জেনারেল ম্যানেজাব। একদিন সে সদানন্দের নাম ধরিয়াও ডাকিত, হাসিতামাশাও করিত। আজও অন্তরালে করিলে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু দশজনের সামনে আনমনে হঠাৎ ভুল করিয়া বসিবার ভয়ে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সব সময়েই সে শিষ্যত্বের খোলসটা বজায় রাখিয়া চলে।

বিপিন হাতজোড করিয়া বলিল, 'কি করব প্রভু?'

'ছায়ার ব্যবস্থা করে দাও।'

হোগলার বেড়া টানিয়া চালার খুঁটিতে ঠেস দিয়া দাঁড় করাইয়া বিপিন অল্পক্ষণের মধ্যেই ছায়ার ব্যবস্থা করিয়া দিল। আগেও কদিন মেয়েরা রোদে কষ্ট পাইতেছে, রৌদ্র নিবারণের এমন সহজ উপায় থাকিতে আগে কেন এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই, কে তা অনুমান করিবে! হয়ত কারও খেয়াল হয় নাই—সদানন্দেরও নয়। হয়ত তফাতে জমাট বাঁধিয়া বসিবার জন্য মেয়েদের উপর সদানন্দের রাগ হইয়াছিল, তাই কদিন তাদের রোদে ভাজা ভাজা করিয়া শাস্তি দিয়াছে। আজ বিধবা মেয়েটির রাঙ্গা মুখখানা দেখিয়া মায়া হইয়াছে। কিন্তু, রাগ কি সদানন্দের আছে? শাস্তি কি কারোকে সে দেয়? মায়া কি তার হয়? শুধু তাকে দর্শন করিয়া আর তার দর্শনের ব্যাখ্যা শুনিয়া কে তা অনুমান করিতে পারিবে!

মেয়েরা ছায়া পাওয়ামাত্র সদানন্দ মুখ ফিরাইল। মেয়েদের মৃদুগুঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া গেল। প্রেম ও অহিংসা সম্বন্ধে না জানি সাধুজী এবার কি বলিবে!

'নদীতে এবার অনেক আগে জল এল, না বলাই?'

কোথায় প্রেম ও-অহিংসা, কোথায় রাধাই নদীতে জল আসা, কোথায় শতরঞ্চি-জোড়া ভদ্রলোকের ভিড়, কোথায় এককোণে মাটির আসনে সাতুনার মূর্খ দোকানদার বলাই। বলাই নামে একজন যে আসিয়া আসরের একপাশে বসিয়াছে, তাই বা এতক্ষণে কজনে খেয়াল

করিয়াছিল? বলাই কৃতার্থ ও নির্বাক হইয়া রহিল।

তার হইয়া জবাব দিল শ্রীধর। অনেক বয়স হইয়াছে শ্রীধরের, ষাটের কাছাকাছি। সাতুনায় সে সম্পন্ন গৃহস্থ, তিন তিনটা রোজগেরে ছেলে লইয়া মস্ত সংসার পাতিয়াছে। রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতে সে অদ্বিতীয়। সূতাবাঁধা চশমা আঁটিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বাড়িতে সে রামায়ণ, মহাভারতের বাছাবাছা অংশ পাঠ করে, মাঝে মাঝে থামিয়া অতি সরল ও সহজবোধ্য কাহিনীর রসালো ব্যাখ্যা করিয়া শোনায়। তার বাড়িতে প্রায়ই এ রকম সভা বসে,—তবে এত বড় নয়। আর সে সভায় ভদ্রলোক আসে না, সে শুধু চাষী-মজুর, তেলি-তাঁতি-কামার-কুমোরের সভা।

বিপিনের অনুকরণে হাতজোড় করিয়া শ্রীধর বলিল, 'চারবাদ্‌লা নেমে গেছে, আজ্ঞা।'

চারবাদ্‌লা নামার সঙ্গে রাধাই নদীতে জল আসার সম্পর্ক কি? চারবার বৃষ্টি হইয়া গেলেই রাধাই নদীতে জল আসে। চিরদিনই নিয়ম। টিপ টিপ করিয়া দু'চার ফোঁটা জলই পড়ুক আর ঝম্ ঝম্ করিয়া সৃষ্টি-ভাসান বাদলাই নামুক, চারবার বর্ষণ হইয়া গেলে নদীতে জল আসিবেই আসিবে। সদানন্দ মৃদু হাসে। জবাব দিয়াছে শ্রীধর, কিন্তু স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সকলকে তিরস্কার করিয়া বলে, 'এ সব ধারণা পোষণ করা কেন, 'এ ধরণের সব কুসংস্কার?'

সাধুজীর স্নেহ-মধুর আবেগভরা ধমক শুনিয়া মনে হয়, যে সব কুসংস্কার তাদের আছে, সে সব যেন কিছু নয়, এটাই তাদের কুসংস্কারের চরম। মনে মনে এই কুসংস্কার পুষিয়া ইহকাল পরকাল সব তারা নষ্ট করিয়াছে।

তারপর শুষ্ক নদীতে হঠাৎ স্রোত দেখা দিবার কারণ সে ব্যাখ্যা করে। ব্যাখ্যা করিতে করিতে আসে রহস্যময়ী প্রকৃতির কথা। প্রকৃতির আসল রহস্য কোথায়, মানুষ যে তার সন্ধান জানে না, এ কি সহজ আপসোসের কথা! অজানার মধ্যে মানুষ প্রকৃতির রহস্যকে খুঁজিয়া মরে—রাধাই নদীতে জলসঞ্চারের কারণ না জানায় ভাবে, এই বুঝি তবে প্রকৃতিদেবীর দুর্বোধ্য লীলার অভিব্যক্তি। জানামাত্র যখন অজানার সমস্ত রহস্যের আবরণ খসিয়া যায়। অজানার জন্য মাথা ঘামানো কেন? জানার মধ্যে যে যতটুকু জানে তারই মধ্যে, প্রকৃতির সবটুকু রহস্যের খনি নিহিত থাকে। রাধাই নদীতে জলস্রোত আসিবার কারণ নাই বা জানিলে, জলস্রোত যে আসিয়াছে, এটুকু তো জান? এই জানাটুকুর মধ্যে সন্ধান কর, রহস্যানুভূতির অজ্ঞাত জগতের দিগন্তে আত্মজ্ঞানের ছায়া নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্বের সঙ্কেতে তোমায় সাড়া দিতেছে দেখিতে পাইবে।

সকলে মশগুল হইয়া শোনে। এতক্ষণে আসর জমিয়াছে। শুধু সদানন্দের বলিবার কৌশলে প্রত্যেকের মনে হয়, দুর্বোধ্য কথাগুলি যেন জলের মত বুঝিয়া ফেলিয়াছে। কি বুঝিয়াছে এ কথা কেউ ভাবে না, বুঝিতে পারিয়াছে, এই ধারণা উন্মাদনায় বিভোর হইয়া থাকে। বিপিনের শীর্ণ ম্লান মুখে আনন্দের ছাপ পড়ে। আজ প্রণামী জুটিবে ভাল।

মাঝে মাঝে দু'একজন নতুন শ্রোতা আসিয়া চুপি চুপি আসরের একপাশে বসিয়া পড়িতেছিল। দেরী হওয়ায় তারা গ্রাম হইতে ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তপোবনে ঢুকিবার পর আর তাদের ব্যস্ততা নাই। সমস্ত তপোবন পার হইয়া চালায় পৌঁছিতে হয়, সেই অবসরে তপোবন তাদের শান্ত করিয়া দিয়াছে। না, তাড়াহুড়া করিবার কিছু নাই। সাধুজীর কথা যদি শেষ হইয়া যায়, তাতেই বা কি? আরেকদিন সময়মত আসিলেই হইবে। সদানন্দের কথা শুনিবার আগ্রহে যারা ছুটিয়া আসে, তাদের সকলের মনেই তপোবন

কম-বেশি প্রায় এই রকম প্রভাব বিস্তার করে, সমস্ত অধীনতা যেন জুড়াইয়া যায়, আশা-আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা থাকে না। পতঙ্গ যেমন মধুতে ডুবিয়া চাপল্য হারায়, তপোবনের উদ্ভিদগুলির রক্ষণাবেক্ষণে যে নিবিড় শান্তি আছে, তার অদৃশ্য ঘনত্বের কবলে আসিয়া পড়ামাত্র মানুষের মনে বিভিন্ন গতিগুলি তেমনি সংযত হইয়া যায়।

তবে সকলের নাগাল তপোবন পায় না। কত অন্যমনস্ক জীব আছে জগতে, কত মন ইন্দ্রিয়ের মৃদুতর উপচারগুলি নির্বিচারে প্রত্যাখ্যান করে, কত মানুষ নিজে চারিদিকে লইয়া বেড়ায় দুর্ভেদ্য আবরণ।

আট বেয়ারার হুম্ হুম্ শব্দে তপোবনকে কিছুক্ষণের জন্য নিছক জঙ্গলে পরিণত করিয়া একটি পাল্কী একেবারে আশ্রমের ভিতরে আসিয়া থামিল, সদানন্দের তিনমহাল কুটীরের সামনে। আসর বসিবার চালা হইতে সদানন্দের কুটীর বেশি তফাতে নয়, একটা বাঁশঝাড় এবং কয়েকটা জাম ও বকুলগাছের জন্য চোখে পড়ে না।

না দেখিয়াও অনুমান করা গেল, কে আসিয়াছে। মহীগড়ের রাজা ছাড়া আট বেয়ারার পাল্কীতে আর যারাই চাপুক, আশ্রমে তারা আসে না। সদানন্দের কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বিপিন ব্যস্ত হইয়া নিবেদন করিল, 'রাজাসাহেব দর্শনলাভ করতে এসেছেন প্রভু।'

'এখানে আসতে বল।'

'এখানে প্রভু?'

সদানন্দের আকস্মিক বিদ্রোহ বিপিন প্রত্যাশা করে না, মুখে অনেকগুলি রেখাসৃষ্টি করিয়া সে চাহিয়া রহিল। হোক গুরুদক্ষিণা, আশ্রমের ভূমি তো রাজাসাহেবের দান, নিজে সে আশ্রমে পায়ের ধুলা দিয়াছে তাই কি যথেষ্ট নয়? তার প্রজাদের এই আসরে তাকে ডাকিয়া আনার তো কোন মানে হয় না। যার কলমের এক খোঁচায় আশ্রম উঠিয়া যাইতে পারে, সে শিষ্য হইলেও তাকে একটু, খুব সামান্য একটু খাতির করিলে দোষ কি?

রাধাই নদীর ঘোলাটে জলস্রোতই যেন আজ সদানন্দকে আনমনা করিয়া দিতেছে। বিপিনের প্রশ্নের মানে বুঝিতে দুবার চাহিতে হয় না। আনমনা হইয়া না-বুঝার ভান করাই সবচেয়ে সহজ।

'হ্যাঁ, বল গে, আমি এখানে আছি।'

বহুকাল শিষ্যত্বে, অভিনয় করিতে করিতে কিভাবে যেন বিপিনের সংযম অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তা ছাড়া মানুষটা সে বড় চালাক, ভাবিয়া চিন্তিয়া ফন্দি না আঁটিয়া কখনও সে কিছু করে না, যদি বা করে, অন্তরালে করে। জীবনের সমস্ত অসংযম তার গোপনীয়। সদানন্দের বোকামিতে রাগে গা জ্বলিয়া গেলেও তাই সে শুধু বলিল, 'প্রভু?'

সদানন্দ চুপ। আনমনে কথা বলার চেয়ে নীরবে আনমনা হওয়া ঢের সহজ। একটু অপেক্ষা করিয়া বিপিন কুটীরের দিকে চলিয়া গেল। আর ফিরিয়া আসিল না। সূর্য নামিয়া গেল তপোবনের গাছের আড়ালে, মেয়েদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল, সকলকে পা ছুঁইয়া প্রণাম করিবার ও প্রণামী দিবার অনুমতি দিয়া সদানন্দ ঠায় বসিয়া রহিল রক্তমাংসের দেবতার মত। দেবতার মতই তার মূর্তি, বটতলার ছবির মহাদেবের ছাঁচে ঢালিয়া যেন তার সৃষ্টি হইয়াছে। আসন করিয়া বসায়, ভুঁড়ি গিয়া প্রায় ঠেকিয়াছে পায়ে এবং তাতেই যেন মানাইয়াছে ভাল। নয় তো এই বৃষস্কন্ধ বিশালদেহ পুরুষের চওড়া বুক আর পেশীবহুল সুডৌল বাহু দেখিয়া মনে হইত, দেহের শক্তি ভিন্ন আর বুঝি তার কিছু নাই। কথায় তাহা হইলে মানুষ মুগ্ধ হইত কিনা, কারও ভক্তি জাগিত কিনা সন্দেহ। মাথায় জটা নাই বলিয়াই ভক্তেরা অনেকে

মনে মনে আপসোস করে। যার সৌম্য, প্রশান্ত মূর্তি স্থৈর্যের নিখুঁত প্রতীক, জটা ছাড়া কি তাকে মানায়?

সদানন্দের কুটীরের সদর আর কিছুই নয়, বড় একখানা ঘর। মেঝে লাল সিমেন্ট করা, দেয়াল গেরুয়ারঙের,— বাদামী ভাবটা একটু প্রকট। আশ্রমের ছোট, বড় সমস্ত ঘরই এই ধরনের, উপরে ছাউনি ছাড়া বাকি সব চুনসুরকি ইঁটকাঠের ব্যাপার। কিন্তু বিপিনের ভাষায় এগুলি সব কুটীর।

সদরের ঘরখানায় কতকটা বৈঠকখানার কাজ চলে, মাঝে মাঝে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ছোটখাট সভাও বসে। তবে সে সভা হয় অনেকটা ঘরোয়া মজলিসের মত, সকলে অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা পায়। সদানন্দকে যেমন ব্যক্তিগত সুখদুঃখ দ্বিধা-সন্দেহ নিবেদন করা চলে তেমনি চলে নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা, এমন কি উঁচু গলায় তফাতের মানুষকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করা চলে, কেমন আছ ভায়া? শিষ্য ও ভক্তের ব্যক্তিত্বকে এখানে সদানন্দ প্রশ্রয় দেয়, নদীর ধারে আটচালার নিচে এদের সঙ্গে তার যে ব্যবধানটা থাকে প্রায় দেবতা ও অধঃপতিতের, এখানে সেটা হয় অবতার ও মানুষের। কত তুচ্ছ বিষয়েই মাথা ঘামায় সদানন্দ, কত তুচ্ছ মানুষের কত তুচ্ছ পারিবারিক জীবনের কত তুচ্ছ খবরই যে জানিতে চায়। আগ্রহ দেখায় না বটে, দুঃসংবাদে বিচলিত হয় না, সুসংবাদে খুশীও হয় না, তবু নির্বিকার সহিষ্ণুতার সঙ্গে কান পাতিয়া সব কথা তো শোনে, মুখ ফুটিয়া তো বলে 'তাই নাকি' অথবা 'বেশ বেশ'।

সদর পার হইয়া আসিলে অন্দরের উঠান, ফুলের চাবায় ও ফলের গাছে বাগানের মত। একপাশে প্রকাণ্ড একটা বাঁধানো ইঁদারা. জল বড় মিষ্টি আর ঠাণ্ডা। গরমের দিনে সূর্য যখন মাথার উপরে থাকে আর ইঁদারার নতুন সিমেন্ট-করা গোলাকার চওড়া বাঁধটা হইয়া থাকে আগুন. হামাগুড়ি দিয়া একটিবার শুধু ক্ষণেকের জন্য ভিতরে উঁকি দিলে মনে হয়, জলে ডুবিয়া মরাই বুঝি ভাল ঃ পূর্ণিমার চাঁদের আলোতেও অত নিচের জল তো দেখা যায় না, গরমের দিনে-রাত্রে তাই যেভাবেই হোক মরার সাধ জাগানোর জন্য খালি গায়ে ঠাণ্ডা সিমেন্টে গা এলাইয়া দিতে সাধ যায়। ফুরফুরে হাওয়া থাক, অথবা দারুণ গুমোট হোক, রাশি রাশি ফুলে ঘন মিশ্রিত গন্ধে প্রথমে মন কেমন করিয়া ঘুম আসিয়া পড়ে, এইটুকু যা অসুবিধা। একদিনও কি সদানন্দ পুরা একটা ঘণ্টা জাগিয়া থাকিতে পারিয়াছে।

উঠানের একদিকে সদর, বাকী তিনদিকেই প্রায় ঘর— কোন ঘরের সামনে বারান্দা আছে কোন ঘরের সামনে নাই। অন্দর পা হইয়া নদীর দিকে অন্তঃপুর। অন্তঃপুরেও উঠান আছে, তবে অন্দরের উঠানটির তুলনায় আকারে অনেক ছোট আর আগাগোড়া সিমেন্ট করা। না আছে ফুলের চারা, না আছে ফলের গাছ, শুধু ঝকঝকে তকতকে মাজাঘষা পরিচ্ছন্নতা। এক কোণে কেবল একটা তালগাছ আকাশে মাথা তুলিয়াছে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় বুঝি জীবন্ত কিছু, চিরদিনের জন্য সদানন্দের অন্তঃপুরে বন্দী হওয়ায় ব্যাকুল আগ্রহে মাথা উঁচু করিয়া বাহিরের জগতে উঁকি দিতেছে। গাছটায় ফল ধরে না, কোনদিন নাকি ধরিবেও না ।

অন্তঃপুরে ঢুকিবার একটি খিড়কি পথ আছে, নদীর দিকে প্রাচীরের গায়ে বসানো ছোট একটি দরজা। ঘরের জানালা দিয়া সারাদিন সদানন্দ আজ রাধাই নদীতে জলের আবির্ভাব দেখিয়াছিল, তারপর খিড়কির দরজায় বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিয়া গিয়াছিল আটচালা

সভায়। এখন মন্থরপদে ফিরিয়া আসিয়া শিকলতোলা দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, বাহিরের মায়া-মদপায়ী মাতালের মত ভুঁড়ির উপর দুটি হাত রাখিয়া সামনে পিছনে একটুখানি টলিতে টলিতে। বিড় বিড় করিয়া কি যে বলিতে লাগিল, নিজের কানেই তা গেল না। নিজের কথা শুনিবার স্পৃহাও আর নাই। মনে তার শান্তি নাই কেন, এত মানুষকে সে শান্তি বিলাইতেছে? এত ক্ষোভ কেন তার, এমন আকস্মিক ক্রোধের সঞ্চার? কারও সে ক্ষতি করে নাই, কারও উপরে তার হিংসা নাই, বিদ্বেষ নাই,—বিপিনের কাণ্ডে মাঝে মাঝে রাগও হয়, ঘৃণাও জাগে বটে, কিন্তু বিপিনকে সে ভালই বাসে, এ জগতে বিপিন তার সবচেয়ে আপন, একমাত্র প্রাণের বন্ধু। এমন জ্বালাভরা অস্থিরতা তবে সে বোধ করে কেন? ভাবিতে ভাবিতে বাহিরের মায়ার নেশা যেন গাঢ় হইয়া আসে, আশ্রমে ঢুকিতে অনিচ্ছা বাড়িয়া যায়। শিকল খুলিয়া সদানন্দ তাই গায়ের জোরেই অন্তঃপুরে ঢুকিয়া পড়ে, সশব্দে ভিতর হইতে খিল বন্ধ করিয়া দেয়।

উঠানের তালগাছে ঠেস দিয়া একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সদানন্দের বিরক্তির সীমা থাকে না। রাগ করিয়া বলে, 'কে গা তুমি? কি করছ এখানে?'

'চুপ। আমি কেউ না।'

কথাগুলি জড়ানো কিন্তু গলাটি মিষ্টি— অল্পবয়সী মেয়ে। দক্ষিণের বড় ঘরের বারান্দায় আর পশ্চিমের ছোট ঘরখানার রোয়াকে দুটি লণ্ঠন জ্বলিতেছে, মেয়েটির গায়ে আলো পড়িয়াছিল যথেষ্ট। সদানন্দ চাহিয়া দেখে নাই, নতুবা বুঝিতে পারিত মেয়েটি আশ্রমের কেউ নয়। এত কমবয়সী মেয়েও আশ্রমে কেউ থাকে না, আশ্রমে মেয়েদের বেশভূষাও এরকম নয়।

কাণ্ডটা বিপিনের, বুঝিতে পারিয়া সদানন্দের বিরক্তি আরও বাড়িয়া গেল। আগে হইতে কিছু না জানাইয়া বিপিন যে কোথা হইতে এরকম এক একটি খাপছাড়া মেয়েকে আশ্রমে আনিয়া হাজির করে! গত বৈশাখের মাঝবয়সী স্ত্রীলোকটিকে ধরিলে এটি বিপিনের সাত নম্বরের ম্যাজিক। পাল্কীতে তবে মহীগড়ের রাজাসাহেব আসে নাই, আসিয়াছেন ইনি। বৈশাখের ব্যাপারে সদানন্দ ভয়ানক রাগ করায় বিপিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আর এসব ঘটিবে না, কোনদিন নয়। ক'মাসের মধ্যেই বিপিন প্রতিজ্ঞার কথাটা তাহা হইলে ভুলিয়া গিয়াছে। ভুলিয়া যাওয়ার আগে একটু আভাস দেওয়াও দরকার মনে করে নাই, তাকে যে কথা দিয়াছিল, সেটা মানিয়া চলা সম্ভব হইবে না। দুঃখে অপমানে নিজেকে সদানন্দের একান্ত অসহায় বলিয়া মনে হয়। বিনামূল্যে কিনিয়া বিপিন যেন তাকে ক্রীতদাস করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এবার সে ছাড়িবে না, এবার একটা চরম বোঝাপড়া করিতে হইবে বিপিনের সঙ্গে।

খুব বেশি বিব্রতবোধ না করিলে, অন্তঃপুরের উঠানে খাপছাড়া নিঃসঙ্গ তালগাছটার গুঁড়িতে মেয়েটাকে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সদানন্দের হয়তো মনে হইত, মন্দ মানায় নাই। কবে কে দা, কুড়াল কিছু একটা অস্ত্র দিয়া আঘাত করিয়াছিল গাছটার গুঁড়িতে, সেই ক্ষতের চিহ্ন, মাটি ঘেঁষিয়া কয়েকটা সরু সরু শিকড়ের ইঙ্গিত, সিমেণ্টে বিপিন কবে আনমনে পানের পিক ফেলিয়াছিল তার প্রায় মুছিয়া যাওয়া দাগ, হাত দেড়েক তফাতে নর্দমার কাছে এক বালতি জল আর একটা ঘষামাজা ঘটি আর এই আবেষ্টনীর মধ্যে অতিরিক্ত একটি মেয়ে। কিন্তু রাগে সদানন্দ অন্ধকার দেখিতেছিল।

রাগ চাপিয়া কোনরকমে সে বলিল, 'এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন বাছা, ঘরে গিয়ে বোসো?'

'আমি যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি, তোমার কি?'

জড়ানো সুরে কথাগুলি বলিয়া গাছের আশ্রয় ছাড়িয়া সদানন্দের ঝকঝকে তকতকে সিমেন্ট করা উঠোনে হিলতোলা জুতা ঠুকিয়া মেয়েটি আগাইয়া আসিল কাছে, খপ করিয়া ধরিয়া ফেলিল সদানন্দের হাত। হয়তো টাল সামলানোর জন্য।

'তুমি সাধুজী, না?'

মুখে তীব্র মদের গন্ধ। যে গন্ধে সদানন্দের চিরকাল বমি আসে। জবাব না পাইয়াও আহ্লাদে মেয়েটি যেন গলিয়া গেল, দুহাতে সদানন্দের গলা জড়াইয়া গদগদ হইয়া বলিল, 'শোন, 'আমি কেউ নয়,' বললাম না এক্ষুনি তোমাকে, তা সত্যি নয়। আমি মাধবী, মাধবীলতা—লতাটা কেটে বাদ দিয়েছি একদম।'

বলিয়া খিল খিল করিয়া মাধবীর কি হাসি! গলায় জড়ানো হাতের বাঁধন খুলিয়া সদানন্দ তাকে ঠেলিয়া দিয়া ঘরে চলিয়া গেল। পড়িয়া গিয়া আঘাতের ব্যথায় মাধবীলতা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মাধবীলতার কান্না শুনিয়া পূর্বের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল বিপিন আর সাহেবী পোষাকপরা একটি যুবক। দুজনে ধরাধরি করিয়া মাধবীলতাকে লইয়া গেল ঘরে। মাধবীলতা কাঁদিতে কাঁদিতে কেবলি নালিশ করিতে লাগিল 'সাধুজী আমায় মেরেছে, ঠেলে ফেলে দিয়েছে। আমি এখানে থাকব না, আমায় নিয়ে চল।'

আটবেয়ারার পাল্কী চাপিয়া মহীগড়ের রাজা আজ আসে নাই। আসিয়াছে রাজপুত্র। মাধবীলতাকেও সঙ্গে আনিয়াছে সে-ই। আনিয়াছে পাল্কীর মধ্যে এককোণে লুকাইয়া। একেবারে অন্দরে ঢুকিয়া পাল্কী থামিয়াছে, রাজাসাহেব স্বয়ং রাণীসাহেবাকে সঙ্গে করিয়া আশ্রমে আসিলে যেখানে থামে। রাজপুত্রের গায়ে ভর দিয়া মাধবীলতা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে।

অন্দর তখন এরকম ফাঁকাই ছিল, তবু মহীগড়ের রাজার বদলে রাজপুত্র আর রাণীর বদলে মাধবীলতার আগমন কারও নজরে পড়িয়াছে কিনা বলা শক্ত। এ রকম অবস্থায় তাকে আশ্রমে কয়েকদিনের জন্যও রাখা সঙ্গত হইবে কিনা, বিপিন ও রাজপুত্রের মধ্যে এতক্ষণ সেই পরামর্শই চলিতেছিল। বিপিন বার বার অনুযোগ দিয়া বলিতেছিল, এরকম প্রকাশ্যভাবে মাধবীলতাকে আশ্রমে আনা সত্যই বড় অন্যায় হইয়াছে রাজপুত্রের। আগে একটা খবর যদি সে পাঠাইত বিপিনকে, বিপিন সব ব্যবস্থা করিয়া দিত, এতটুকু হাঙ্গামাও হইত না, রাজপুত্রের ভাবনারও কিছু থাকিত না।

রাজপুত্রের নাম নারায়ণ। দীর্ঘ বলিষ্ঠ সুদর্শন চেহারা, মাঝে মাঝে মুখে অনাচারের যে ছাপটুকু পড়ে, সেটা স্থায়ী হয় না, দুদিন বিশ্রাম করিলেই মুছিয়া যায়, মুখে আবার স্বাস্থ্যের অমলিন জ্যোতি ফুটিয়া ওঠে। এমন মুখখানা উত্তেজনা ও ভয়ে অস্বাভাবিক রকম পাণ্ডুর দেখাইতেছে, চাউনি দেখিলেই টের পাওয়া যায়, মানুষটা এখন বিহ্বল।

বিপিনের অনুযোগের জবাবে সেও অনেকবার বলিয়াছে, 'কি করব বলুন, এমন একগুঁয়ে বলবার নয়। সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছিলাম, ওর জন্যেই সব ভেস্তে গেল। শেষ মুহূর্তে কোথায় যাই, তাই এখানে ছুটে এলাম।'

বিপিন তখন আশ্বাস দিয়া বলিয়াছে, 'যাক কি আর হবে, ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মাধবীলতাকে শান্ত করিতে বেশি সময় লাগিল না, ছোট ঘরখানায় চৌকির উপর বিছান ময়ূর-আঁকা মাদুরে সে গুম্ খাইয়া বসিয়া রহিল। রাজপুত্র নারায়ণ তখন পূবের ঘরে আসিয়া সদানন্দকে প্রণাম করিল। সদানন্দ কোনদিন কাহাকেও আশীর্বাদ করে না, বিড় বিড় করিয়া মুখে একটা আওয়াজ করে মাত্র; আজ তাও করিল না।

ঘরের আলোটা সদানন্দ কমাইয়া দিয়াছিল, বিপিন বাড়াইয়া দিল। দেখা গেল, নারায়ণের মুখের পাংশু বিবর্ণভাবটা বড় বেশিরকম স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সদানন্দকে সে কোনদিনই বিশেষ খাতির করে না, ভয় ভক্তি করার দরকারও কোনদিন বোধ করে নাই। আজ তার সবটুকু তেজ আর বেপরোয়াভাব উবিয়া গিয়াছে।

বিপিন নিবেদন করিল, 'রাজাসাহেব আসেননি প্রভু। নারায়ণবাবু একটি নিরাশ্রয় মেয়েকে আশ্রমে ভর্তি করে দিতে এনেছেন। মেয়েটির কেউ নেই প্রভু।'

'থাকবার ব্যবস্থা করে দাও। আর তোমরা যাও বিপিন।'

'আসনে বসবেন প্রভু?'

'যেতে বললাম যাও না বিপিন, আমায় একটু একা থাকতে দাও।'

বিপিনের মুখ দেখিয়া রাগ বোঝা যায় না, কেবল তার কপালে কয়েকটা রেখার সৃষ্টি হয় আর চোখের পলক পড়া অনিয়মিত হইয়া যায়। নারায়ণকে সঙ্গে করিয়া বিপিন ঘর হইতে চলিয়া গেল। ঘণ্টা দুই পরে সে যখন আবার ঘরে ফিরিয়া আসিল, সদানন্দ ঘুমের ভাণ করিয়া খাটের উপর গদির বিছানায় পড়িয়া আছে। গায়ে ঠেলা দিয়াও তার ঘুম ভাঙ্গাইতে না পারিয়া চাপা গলায় তাকে একটা কুৎসিত গাল দিয়া বিপিন চলিয়া গেল। সদানন্দের বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল, সেবার ব্যবস্থাটাও আজ একটু বিশেষ রকমের হইয়াছে, কাছাকাছি একটা গ্রাম হইতে মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে কে যেন আজ নানারকম সুখাদ্য পাঠাইয়া দিয়াছে আশ্রমে। বিপিনের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভয়ে না খাইয়াই আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে সদানন্দ এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙ্গিল খুব ভোরে, ভাল করিয়া তখনও চারিদিক আলো হয় নাই। পাশ না ফিরিয়াই বোঝা গেল কে যেন পিঠের সঙ্গে মিশিয়া শুইয়া আছে। মশারি ফেলিতে সদানন্দের মনে ছিল না, কে যেন মশারি ফেলিয়া সযত্নে গুঁজিয়া দিয়াছে। উঠিয়া বসিয়া সদানন্দ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। মাধবীলতার শুইবার ভঙ্গিটি মনোরম নয়, তাছাড়া তার নিজের দেহের উপর মাঝ রাত্রি পর্যন্ত তার নিজেরই ছটফটানির ঝড় বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এদিকে সদানন্দও প্রায় একযুগ হইল, সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া পিঠের সঙ্গে মেশা কুণ্ডলীপাকানো পুঁটুলীর মত নারীদেহ চাহিয়া দেখে নাই। হঠাৎ চোখ ফিরাইতে পারিল না।

তাছাড়া বিপিন যে মাধবীলতাকে আশ্রমে আনিয়াছে, এ অপমানের জ্বালা আছে প্রতিকার নাই, প্রতিকারহীন অপমানের আছে শুধু প্রতিশোধের কামনা। বিপিন যে কতদূর ছোটলোক, এই চিন্তায় ছেদ দিয়া ছাড়া ছাড়া ভাবে সদানন্দ ভাবিতে থাকে, আহা মেঘলা ভোরে মেয়েটি শীতে কেমন জড়সড় হইয়া গিয়াছে, দ্যাখো। গরমে নিজের দেহ যে ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, এটা সদানন্দের খেয়ালও হয় না। শীতের জন্যই মাধবীলতার এমন অদ্ভুত শোয়ার ভঙ্গি, এই অকাট্য যুক্তির কাছে গরমের অনুভূতি হার মানে। এইভাবে মাধবীলতাকে দেখিতে দেখিতে মনের আকাশ-পাতাল আলো-অন্ধকার কি ভাবে যেন ধীরে ধীরে ঝাপসা হইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল, অতীত হইতে ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত হওয়ার বদলে সময় বর্তমানকে কেন্দ্র করিয়া পাক খাইতে খাইতে আবর্ত রচনা করিতে লাগিল। মনটা বিদ্রোহ

করিয়া বসিল সদানন্দের, একবার চাহিল রুদ্ধ দরজার দিকে, একবার চাহিল জানালা দিয়া খানিক তফাতে রাধাই নদীর দিকে, তারপরে দুহাত বাড়াইয়া পুতুলের মত মাধবীলতাকে তুলিয়া লইল বুকে।

তখন অবশ্য মাধবীলতার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু সে কিছুই বলিল না। পুতুলটি যেন অন্য কেউ, এমনিভাবে কৌতূহলী চোখ মেলিয়া মহাপুরুষ নামে বিখ্যাত প্রৌঢ়বয়সী দৈত্যটির পুতুল-খেলার মুখভঙ্গি দেখিতে লাগিল।

।। দুই ।।

[লেখকের মন্তব্য ঃ ভাবিয়া দেখিলাম, গল্পের ইঙ্গিতে পরিস্ফুট করিযা তোলার পরিবর্তে মাধবীলতা সম্বন্ধে সদানন্দের আবিষ্কার ও মনোভাব পরিবর্তনের কথাটা আমার বলিয়া দেওয়াই ভাল। সংক্ষেপে বলাও হইবে, নীরস অশ্লীলতার ঝাঁঝও এড়ানো চলিবে। সদানন্দের ধারণা হইয়াছিল, মেয়েটি ভাল নয়। মাধবীলতার প্রতিবাদহীন আত্মদান এই ধারণাকে সমর্থনও করিত। কিন্তু সদানন্দ জানিতে পারিল, মাধবীলতা কুমারী।

একটা কথা স্পষ্ট বলিয়া রাখি। মাধবীলতা ভাল কি মন্দ, এটা তার প্রমাণ দিবার চেষ্টা নয়, আমার মতামতের কথা বলিতেছি না। সদানন্দের ধাবণার কথা হইতেছে। আমার মন্তব্য হইতে মাধবীলতা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হিসাবে বড় জোর এইটুকু অনুমান করিয়া লইবার অনুমতি দিতে পারি যে, পুরুষ সম্বন্ধে মাধবীলতার অভিজ্ঞতা ছিল না। নয় তো অবসাদে যতই কাবু হইয়া পড়ুক, চাঁদ-হারানো মাঝরাত্রির অন্ধকারে অচেনা অজানা জায়গায় আনাচে-কানাচে যত ভয়ই জমা থাক, বিপিন আর নারায়ণের চেয়ে বিখ্যাত সাধু সদানন্দকে যতই নিরাপদ মনে হোক, সদানন্দের শয্যায় গিয়া সদানন্দের পিঠ ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িবার মধ্যে কোন যুক্তি থাকে না। মশারি ফেলিয়া দিলে যে মশা কামড়াইবে না, এ জ্ঞানটা তো মাধবীলতার বেশ টনটনে ছিল।]

আশ্রমের খানিক তফাতে নদীর ধারে একটা মোটা কাঠের গুঁড়িতে সদানন্দ মাঝে মাঝে বসিয়া থাকে। সেইখানে বিপিন তাকে আবিষ্কার করিল। তখনও সূর্য আকাশে বেশি উঁচুতে ওঠে নাই। নদীর জল রাতারাতি আরও বাড়িযাছে, ঘোলাটে জলেব স্রোতে এখনও অনেক জঞ্জাল ভাসিয়া যাইতেছে, শুকনো নদীতে অনেকগুলি মাস ধরিয়া যেসব আবর্জনা জমা হইয়াছিল। কাছাকাছি ছোট একটি আবর্তে কয়েকবার পাক খাইয়া একটা মরা কুকুর ভাসিয়া গেল। বড় আপসোস হইতেছিল সদানন্দের, অনুতাপমিশ্রিত গ্লানিবোধ। তবু শরীর মন যেন হাল্কা হইয়া গিয়াছে। করুণা ও মমতার ব্যথায় হৃদয় ভারাক্রান্ত, তবু আনন্দের একটা অক্ষয় প্রলেপ পড়িয়াছে, মৃদু ও মধুর। ব্যাপারটা সদানন্দ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অন্যায়ের শাস্তি ও পুরস্কার কি এমনিভাবে একসঙ্গে আসে?

বিপিন পাশে বসিতে বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু বিপিন বোঝাপড়া করিতে আসে নাই, ভাব করিতে আসিয়াছে। এ কাজটা বিপিন ভাল পারে না, বন্ধুত্বের ফাটল ঝালাই করার কৌশল তার জানা নাই। রাজপুত্রের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সদানন্দের ঘবে মাধবীলতার রাত কাটানো লইয়া একটু পরিহাস করিতে যায়, তারপর সদানন্দের মুখ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সুর বদলাইয়া বলে, 'বড় ছেলেমানুষ তুই, রাগিস কেন? তুই ছাড়া আর কারও ঘরে ওকে থাকতে

দিতাম? তোর কাছে ছিল বলেই নারাণবাবুরও ভাবনা হয়নি, আমারও ভাবনা হয়নি।'

এত বড় তোষামোদেও সদানন্দ খুশি না দেখিয়া বিপিন মনে মনে রাগিয়া গেল ! বিপিন রাগিলেই সদানন্দ সঙ্গে সঙ্গে সেটা টের পায়, দুজনের মধ্যে একটা আশ্চর্য ঘনিষ্ঠতা আছে তাদের, একটা অতীন্দ্রিয় যোগাযোগ আছে, বোধ হয় ইন্দ্রিয়ের যখন বিকাশ হইতে থাকে—সেই শৈশব হইতে পরস্পরকে তারা ভালবাসিয়া আর ঘৃণা করিয়া আসিতেছে, এজন্য। কতবার ছাড়াছাড়ি হইয়াছে জীবনে, কিন্তু এ জগতে নূতন আর একটি বন্ধুও তারা খুঁজিয়া পায় নাই। ছাড়াছাড়ি যখন হইয়াছে, অপর জন মরিয়া আছে না বাঁচিয়া আছে এ খবরও যখন তারা দীর্ঘকাল পায় নাই, কারও মন এতটুকু খারাপ হয় নাই, আবার যখন দেখা হইয়াছে, তখনও হয় নাই আনন্দ। কয়েকটা দিনরাত্রি কেবল তখন একসঙ্গে কাটিয়া গিয়াছে—পরস্পরের মধ্যে মশগুল হইয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলিয়া আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করিয়া থাকিয়া।

সদানন্দ ঘাড়ে হাত রাখিবামাত্র বিপিন ঘাড় ফিরাইয়া অন্যদিকে তাকায়, একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয় বিপিনের এই ভাবপ্রবণতা, তার ক্রোধে অভিমানের এতখানি ভেজাল!

'তুই যা ভেবেছিলি, তা ঠিক নয় সদা, মেয়েটা সত্যি ভাল। ওকে না জানিয়ে নারায়ণবাবু চলে গেছে বলে সেই থেকে খালি কাঁদছে।'

'নারাণ আর আসবে না?'

'আসবে,—ওবেলা, নয় তো কাল সকালে। চার-পাঁচদিনের মধ্যে একটা ব্যবস্থা করে মাধবীকে নিয়ে চলে যাবে, এ কটা দিন একটু রয়ে-সয়ে কাটিয়ে দে সদা, দোহাই তোর। আর কেউ হলে কি আশ্রমে উঠতে দিতাম? রাজাসায়েবের ছেলে, দুদিন পরে নিজে সব কিছুর মালিক হবে, ওকে তো চটান যায় না, তুই বল, যায়?'

সদানন্দ গম্ভীরমুখে বলিল, 'বড়লোকের পা-চাটা আর টাকা রোজগারের ফন্দি আঁটবার জন্য আশ্রম করেছিলি, বিপিন? তা হলে ব্যবসা করলেই হত?'

বিপিন তর্ক করিল না, হাতজোড় করিয়া হাসিয়া বলিল, 'এ ব্যবসা মন্দ কি প্রভু?'

সদানন্দ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'তামাশা রাখ, ভাল লাগে না। দিন দিন তুই যে কি ব্যাপাব করে তুলছিস, বুঝতে পারি না বিপিন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আশ্রম করা হয়েছিল, সব চুলোয় গেছে, তোর খালি টাকা টাকা! টাকা ছাড়া কিছু হয় না বলেছিলি, টাকা তো অনেক হয়েছে, আবাব কেন? এবাব আসল কাজে মন দে না ভাই—এ সব ছেড়ে দে। আর টাকাই যদি তোর বড় হয়, তুই থাক তোর আশ্রম নিয়ে, আমি চলে যাই। দিন দিন আমার মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমার আর সয় না।'

নালিশটা নতুন নয়, সদানন্দের বলিবার সকরুণ ভঙ্গিতে বিপিন আশ্চর্য হইয়া গেল। একটু ভাবিয়া সে একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল জোরে, যতদূর সম্ভব মর্মাহত হওয়ার ভঙ্গিতে বলিতে লাগিল, 'টাকা? টাকা দিয়ে আমি করব কি? তুই ভাবিস টাকার লোভে আমি টাকা রোজগারের ফন্দি আঁটি? কতবার তোকে বলেছি সদা, তুই বুঝবি না কিছুতে, টাকা ছাড়া কিছু হয় না। কত লোক আশ্রমে এসে থাকতে চায়, থাকবার ঘর নেই, ঘর তুলবার টাকা নেই। দক্ষিণের আমবাগানটা কিনে ফেলা দরকার, টাকা আছে কিনবার? এবার যদি নারাণবাবু কিনে দ্যান। তুই আদর্শ জানিস সদা, কিসে কি হয় জানিস না। বড় কাজ করতে চাইলেই কি করা যায়? করতে জানা চাই। ভেবে দ্যাখ, এই যে আশ্রমটা হয়েছে, এতগুলি লোক আশ্রমে বাস করছে, দলে দলে লোক এসে তোর উপদেশ শুনে যাচ্ছে, আমি ফন্দি না

আঁটলে এটুকুও কি হত? রাস্তায় রাস্তায় চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেললেও কেউ তোর কথা শুনতো না। ভাল উদ্দেশ্যে দুটো মিথ্যা কথা, একটু ভড়ং, এ সবে দোষ হয় না। নারাণবাবু একটা মেয়েকে বার করে এনেছে তো আমাদের কি? আমরা আশ্রমে উঠতে দিলেও বার করে আনত মেয়েটাকে, না দিলেও বার করে আনত। আমরা শুধু এই সুযোগে আশ্রমের একটু উন্নতি করি নিচ্ছি। এ সব কথা নিয়ে মাথা ঘামাস না, তোর কাজ তুই করে যা, আমার কাজ আমি করে যাই, একদিন দেখবি আমাদের এই আশ্রমের নাম সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে।'

বিপিনের মত বড় বক্তৃতার জবাবে সদানন্দ শুধু বলিল, 'আশ্রমের নাম সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাবার জন্য আমার তো ঘুম আসছে না।'

'ঘুম তোর খুব আসে, মোষের মত ঘুমোস সারারাত। তোর মত শুয়ে বসে আরামে দিন কাটাতে পারলে আমারও ঘুম আসত।'—বলিয়া বিপিন রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

খানিক পরে সদানন্দ ভিতরে গেল। ছোট ঘরের চৌকিতে সেই ময়ূর-আঁকা মাদুরে মাধবীলতা চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বিপিন বোধ হয় তাকে চা আর খাবার আনিয়া দিয়াছে, কিন্তু সে খায় নাই। কথা বলিতে গিয়া প্রথমে সদানন্দের গলায় শব্দ আটকাইয়া গেল, তারপর এমন কথা বলিল যার কোন মানে হয় না।

'এখানে একা বসে আছ?'

একটু ইতস্ততঃ করিয়া চৌকিতেই একপাশে বসিল। মুখখানা তার অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর ও ম্লান হইয়া গিয়াছে। মাধবীলতা একবার চোখ তুলিয়া চাহিল, সরিয়াও বসিল না, কথাও বলিল না। সদানন্দের ইচ্ছা হইতেছিল অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে তার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দেয় আর কিছুক্ষণের জন্য তার আঙ্গুলগুলি যেন হইয়া যায় পাখির পালকেব চেয়ে কোমল।

'খাবার খাওনি কেন?'

'খিদে পায় নি।'

'কাল রাত্রে খেয়েছিলে কিছু?'

মাধবী মাথা নাড়িল।

'তা হলে খেয়ে নাও কিছু। চা'টা বোধ হয় জুড়িয়ে গেছে, গরম করে দিতে বলব?'

'না, কিছু খাব না। বমি হয়ে যাবে।'

মাধবীলতা যেন একটু বিস্ময়ের সঙ্গে সদানন্দের মুখের ভাব দেখিতে থাকে। সদানন্দের মনে হয়, তুচ্ছ খাওয়ার কথা লইয়া এত বেশি মাথা ঘামানোর জন্য বিরক্ত হইয়া চোখের দৃষ্টি দিয়া সে তাকে ভর্ৎসনা করিতেছে। সদানন্দ কাঠের পুতুলের মত বসিয়া রহিল। মাধবীলতাকে তার কি বলার আছে? ভাবিতে গিয়া মনে পড়িল, একটা কথা বলা যায়, মাধবীলতার ভুলের কথা।

'এমন কাজ কেন কবলে মাধবী, কেন বাড়ি ছেড়ে এলে? দুদিন পরে নারাণ যখন তোমাকে ফেলে পালাবে, কি করবে তখন তুমি? সমস্ত জীবনটা নষ্ট করে ফেলছ নিজের, একটু ভুলের জন্য। এমন ছেলেমানুষী কবে!'

শুনিতে শুনিতে মাধবীলতার দু'চোখ জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকে, মুখ আরক্ত হইয়া যায়। ইতিমধ্যে সে কখন স্নান করিয়াছে, ভাল করিয়া মোছা হয় নাই বলিয়া চুল এখনও ভেজা।

ভেজা চুলের জলপটি থাকা সত্ত্বেও এমন মাথা গরম হইয়া যায় মাধবীলতার যে, প্রথমে সে খাবারের প্লেট আর চায়ের কাপটা সদানন্দকে ছুঁড়িয়া মারে, তারপর বাঘিনীর মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আঁচড়াইয়া সদানন্দের মুখে রক্ত বাহির করিয়া দেয়। তারপর সদানন্দের কোলে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে।

এই ধরণের কাণ্ড সদানন্দ আরও প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এক যুগেরও বেশি আগে আরেকজনকে এমনিভাবে শান্ত ও সংযত অবস্থা হইতে চোখের পলকে উম্মাদিনীতে পরিণত হইয়া যাইতে দেখিত মাঝে মাঝে। তবে সে এভাবে খাদ্যের প্লেট, চায়ের কাপ ছুঁড়িয়া মারিত না, কোলে মুখ গুঁজিয়া এভাবে কাঁদিত না, দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া নিজেকে আহত করিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইত। হঠাৎ সদানন্দের মনে হইল, এতক্ষণে সে যেন বাস্তব জগতে নামিয়া আসিল, এতক্ষণে বোঝা গেল ব্যাপারখানা কি। হাত বাড়াইয়া র‍্যাক হইতে একটি গেরুয়া কাপড় টানিয়া আনিয়া মুখে আঁচড়ের রক্ত আর গায়ে লাগা চা ও খাবার খানিক খানিক মুছিয়া ফেলিল। মাধবীলতার গায়ে মাথায় পাখির পালকের মত কোমল আঙ্গুল বুলাইবার সাধটা এখন মেটানো যায়, কিন্তু ও ধরণের কবিত্বপূর্ণ সাধ আর সদানন্দের নাই। মাধবীলতার পিঠে একখানা হাত রাখিয়া সে তাকে কাঁদিতে দিল। কাঁচা রক্তমাংসে গড়া এতটুকু একটা কোমল মেয়ে, এত কাণ্ডের পর ওকে কাঁদিতে না দিলে চলিবে কেন?

কান্না কমিয়া আসে, মাধবী মুখ তোলে না, আরও জোরে সদানন্দকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। বাপ-মার আশ্রয় ছাড়িয়া সে আসিয়াছে কিনা কে জানে, বাপ-মা তার আছে কিনা, তাও সদানন্দের জানা নাই, তবু এটুকু সদানন্দ অনুমান করিতে পারে, তারই মত একজনের আশ্রয় ছাড়িয়া মাধবীলতা আসিয়াছে। হয়তো সে ছিল নির্মম, স্নেহ তার কাছে মাধবীলতা পায় নাই, শুধু নির্যাতন সহিয়াছে, হয়তো সে ছিল পরম স্নেহবান, তার আদরে জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্য গলিয়া গিয়া মাধবীলতার জীবন একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সেই ছিল একমাত্র আশ্রয়, আর কারও কথা মাধবীলতা জানে না। প্রেমিক? এতটুকু মেয়ে, কুমারী মেয়ে, সে প্রেমের কি জানে, প্রেমিকের দাম তার কাছে কতটুকু? খেলার সাথী হিসাবে শুধু তার প্রয়োজন হয় একটু, না হইলেও চলে, একটু মন কেমন করার মধ্যেই সে অভাবের পূরণ হয়।

'মুখ তোলো মাধবী, উঠে বোসো। ভয় নেই, আমি সব ঠিক করে দেব।'

মাধবী উঠিয়া বসিল। আঁচলে ভাল করিয়া চোখ মুছিবার পর তার মুখ দেখিয়া কে বলিবে এইমাত্র সে ক্ষেপিয়া গিয়াছিল!

'আশ্রমে অনেক মেয়ে থাকে, চল, তোমাকে তাদের কাছে দিয়ে আসি।'

মাধবীলতা সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'চলুন।'

সদানন্দ একটু হাসিয়া বলিল, 'আগে মুখ ধুয়ে কাপড়টা বদলে এসো, গালে তোমার সন্দেশ লেগে আছে, কাপড়ে চা ভর্তি।'

মুখ ধুইয়া কাপড় বদলাইয়া মাধবী প্রস্তুত হইলে, সদানন্দ তাকে সঙ্গে করিয়া খিড়কী-পথেই বাহির হইল। বিপিন বোধ হয় সদরের দিকে কোথাও আছে, তার সামনে পড়িবার ইচ্ছা ছিল না। গোলমাল বিপিন করিবেই, তবে সেটা এখন মাধবীলতার সামনে না ঘটাই ভাল। আশ্রমের দুটি অংশের মধ্যে পায়ে পায়ে দু'তিনটি আঁকাবাঁকা সরু পথ আপনা হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে। আর কোন পথ নাই। মাধবীলতা যেন বেশ উৎসাহের সঙ্গে জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিতে থাকে, তপোবনের শোভা দেখিয়া সে যেন খুশি হইয়াছে, ভিজা মাটিতে

পা ফেলিয়া যেন আরাম পাইতেছে। বলা মাত্র সে যে তার সঙ্গে নূতন একটা আশ্রয়ে যাইতে রাজী হইয়া যাইবে, এটা সদানন্দের কাছে আশ্চর্য ঠেকে নাই। এখন তার ভাবনা, ঝোঁকের মাথায় রাজী হইয়া গেলেও, শেষ পর্যন্ত আশ্রমে সে থাকিতে চাহিবে কি না। হয়তো নারায়ণ আসিয়া ডাকিলে তার মনে হইবে, আশ্রমে থাকিয়া জীবনটা নষ্ট করার বদলে তার সঙ্গে চলিয়া যাওয়াই ভাল।

তখনও আশ্রমের সকলের ধ্যানধারণা, সাধন-ভজন শেষ হয় নাই। গুরুদেবের পদার্পণে অনেকেরই কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হইয়া গেল বটে, কয়েকজন আরও বেশি আসন কামড়াইয়া চোখ বুঁজিয়া রহিল। গুরুদেব খোঁজ করিয়া জানিবেন, সকলে ইতিমধ্যেই আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছে কিন্তু তারা ধ্যানধারণায় এখনও মশগুল, গুরুদেবের আবির্ভাব পর্যন্ত টের পায় না, এমন আত্মহারা। জানিয়া গুরুদেব নিশ্চয় খুশি হইবেন, এরাই তাঁর খাঁটি শিষ্য। আশ্রমে এ রকম অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ জন সাতেক অন্ধ ভক্ত বাস করে, অন্য সকলের তুলনায় এদের ভক্তির বাড়াবাড়িতে সদানন্দকে মাঝে মাঝে রীতিমত বিব্রত হইতে হয়। দুজন বিধবা মহিলা আছে এইরকম, কি যেন একটা সম্পর্কও আছে দুজনের মধ্যে, পিসি ভাই-ঝির সম্পর্কের মত। একজনের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, শুষ্ক শীর্ণ চেহারা, অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজ। বৌরা সকলে ধীরে ধীরে খোলস ছাড়িয়া একে একে অবাধ্য হইতে আরম্ভ করায় এবং ছেলেরা সকলে একজোট হইয়া বৌদের পক্ষ নেওয়ায়, ছেলে, বৌ, নাতি, নাতনীতে ভরা প্রকাণ্ড সংসার ছাড়িয়া আশ্রমে আসিয়া ডেরা বাঁধিয়াছে।

অপরজনের বয়স কম, বছর ত্রিশেক হইবে। গোলগাল, ফর্সা, রসালো চেহারা, হঠাৎ অপদস্থ হইলে মানুষের মুখের ভাব যেমন হয়, সব সময় মুখে সেইরকম একটা সকাতর লজ্জার ভাব ফুটিয়া থাকে। সংসারত্যাগী বয়স্কা মহিলাটির সঙ্গে সে থাকে এবং সকল বিষয়ে তাকে অনুকরণ করিয়া চলে। ঘুম হইতে ওঠে একই সময়ে, স্নান ও জপতপ সারে একই সময় ধরিয়া, আহার করে একই খাদ্য,—পরিণামটা পর্যন্ত সমান রাখিতে চেষ্টা করে। বয়স্কা মহিলাটি অন্য সব অনুকরণে সায় দেয়, গোলমাল করে কেবল খাদ্যের পরিমাণটা লইয়া। বলে, 'মরণ তোমার! আমি অম্বুলে রুগী, যা দাঁতে কাটি তাতেই বুক জ্বলে, আমার সাথে পাল্লা দিয়ে খেলে তুই বাঁচবি কেন শুনি? নে, দুধটুকু গিলে ফ্যাল্ ঢক করে।'

অপরজন মিনতি করিয়া বলে, 'বমি হয়ে যাবে পিসিমা—অত দুধ খেলে নিশ্চয় বমি করে ফেলব।'

দুধ তাকে খাইতে হয়, সমস্তটাই। খানিক পরে একটা খোঁচাও খাইতে হয়, 'কৈ লো রত্নী, বমি হয়ে যাবে? বাঁচতে সাধ না থাকে, বিষ খেয়ে মরবি যা, নয়তো গলায় দড়ি দে—না খেয়ে শুকিয়ে মরা চলবে না বাবু আমার কাছে।'

এর নাম রত্নাবলী। পিসিমা কখনও ডাকে রত্নী, কখনও বলে রতন। পিসিমার নাম উমা। সদানন্দ ছাড়া এ জগতে তার নাম ধরিয়া ডাকিবার আর কেউ নাই,—একজন ছিল, মাঝে মাঝে নাম ধরিয়া ডাকিত, মস্ত সংসারটা গড়িয়া দিয়া অনেকদিন আগে বিদায় লইয়াছে, যে সংসার ছাড়িয়া উমা এখানে আসিয়াছে, ছেলে, বৌ, নাতি, নাতনীতে ভরা বিরাট সংসার।

মাধবীলতাকে সদানন্দ এদের কাছে জমা করিয়া দিল। বলিল 'মেয়েটি আজ আশ্রমে ভর্তি হল, মেয়েটির কেউ নেই উমা।'

রত্নাবলী খুসি হইয়া উঠিল, উমা সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে মাধবীলতার দিকে চাহিতে লাগিল। বোঝা গেল, আশ্রমে হঠাৎ এই বয়সী একটি মেয়ের আবির্ভাবে তার মনে নানা প্রশ্নের উদয়

হইতেছে, সদানন্দের কাছে সেগুলি মুখে উচ্চারণ করিবার সাহস তার নাই।

ঘরের সম্মুখে কার্পেটের আসন পাতিয়া সদানন্দকে বসিতে দেওয়া হইয়াছিল। কোলের উপর ডান হাতের তালুতে বাঁ হাতের তালু রাখিয়া মেরুদণ্ড সিধা করিয়া দেবতার মত সদানন্দ বসিয়াছে, আনন্দ বেদনার অতীত ধীর, স্থির, বিকারহীন একস্তূপ মূর্তিমান শক্তির মত—সংহত ও সচেতন। সোজা উমার মুখের দিকে চাহিয়া বজ্র-গম্ভীর ধমকের আওয়াজে সদানন্দ বলিল, 'তুমি কি ভাবছ উমা?'

আর কি ভাবছ উমা, ধূলায় গড়া পুতুলের মত উমা চুরমার হইয়া গিয়াছে। পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া উমা অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিতে থাকে, মুমূর্ষু জন্তুর মত জীর্ণশীর্ণ দেহটা থরথর করিয়া কাঁপে। গুরুদেবের সম্বন্ধে অন্যায় কথা মনে আসিয়াছে, গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে তাহা জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এ কি আকস্মিক সর্বনাশের সূচনা!

রত্নাবলীর মুখ পাংশু হইয়া গিয়াছে, আশ্রমবাসী আরও যে কয়জন নরনারী ইতিমধ্যে আসিয়া সমবেত হইয়াছিল, তাহাদের মুখও বিবর্ণ। মাধবীলতা সভয় বিস্ময়ে একবার ভূলুণ্ঠিতা উমার দিকে, একবার সদানন্দের মুখের দিকে চাহিতে থাকে। মানুষের উপর মানুষের যে এতখানি প্রভাব থাকে, একটিমাত্র ধমকে যে কেহ উমার বয়সী নারীকে পায়ের নীচে লুটাইয়া দিতে পারে, মাধবীলতার তা জানা ছিল না। নিজের বুকের মধ্যেও টিপ্ টিপ্ করিতেছে দেখিয়া সে আরও অবাক হইয়া গেল।

সদানন্দ মৃদুস্বরে বলিল, 'উঠে বোসো উমা।'

উমা উঠিয়া বসিলে তেমনি মৃদু ও শান্তকণ্ঠে বলিল, 'মনকে সংযত রেখো। মন হল ঘরের মত, ধুলো-বালি এসে জমা হয়, ঝাঁট দিয়ে সে সব সর্বদা সাফ করে নিতে হয়, নইলে ঘর যেমন আবর্জনায় ভরে ওঠে মনও তেমনি কুচিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।'

উমা মাথা নিচু করিয়া শুনিয়া যায়। সদানন্দের সাংঘাতিক নির্মমতার এই প্রকাশ্য অভিব্যক্তি মাধবীলতাকে ভীত ও সকাতর করিয়া তোলে। যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হইয়া সদানন্দের কথা শুনিতেছিল, দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া মাধবীলতা মেঝেতেই বসিয়া পড়িল।

তখন সদানন্দ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া বলিল, 'মেয়েটি তোমাদের কাছে থাকবে উমা, তোমরা ওকে দেখাশোনা কোরো। বোসো তোমরা,—আর সকলে কোথায়?'

একজন শিষ্য তাড়াতাড়ি আশ্রমের সকলকে ডাকিয়া আনিতে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আশ্রমের সকলে উমা ও রত্নাবলীর কুটিরের সম্মুখে আসিয়া জমা হইল, আসনে বসিয়া যে ঈশ্বরকে ডাকিতেছিল, সেও। ঈশ্বরকে ডাকার চেয়ে গুরুদেবের ডাক বড়।

।। তিন ।।

মাধবীলতাকে নিয়ে বাইরে কিছু হৈ-চৈ হইল না। রাজপুত্র নারায়ণের আশঙ্কাটা দেখা গেল, নিছক তার নিজেরই কল্পনা,—অন্যায়ে অনভিজ্ঞ মনের স্বাভাবিক ভীরুতার ফল। যাদের কাছ হইতে চুরি করিয়া আনা হইয়াছে মাধবীলতাকে, চোর বা বমাল সম্বন্ধে তাদের কিছুমাত্র মাথাব্যথার লক্ষণ টের পাওয়া গেল না। দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল, জীবনের আকস্মিক গতিপরিবর্তনের ধাক্কায় আহত ও বিব্রত মাধবীলতার রক্তমাংসের ক্ষয় বন্ধ হইয়া

বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে ফিরিয়া আসিতে লাগিল স্বাভাবিক ইক্ষুদণ্ডের রং,—তাদের কোনো সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না, যাদের কথা ভাবিয়া মাধবীলতাকে প্রকাশ্যে আশ্রমে আনার জন্য বিপিন নারায়ণকে অনুযোগ জানাইয়াছিল, অত পরামর্শ দরকার হইয়াছিল দুজনের।

নারায়ণ গোলমাল করিল না। হয়ত সাহস পাইল না, হয়ত ভাবিয়া দেখিল, গোলমাল করা মিছে, অথবা হয়ত ঘাড়ের বোঝা নামিয়া যাওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলিল স্বস্তির। আশ্রমে ভর্তি করার জন্যই মেয়েটিকে সে আনিয়াছে, প্রথমে এই কথা বলা হইয়াছিল সদানন্দকে, তার কাছে এই ঠাটই বজায় রাখিয়া চলিতে হইল আগাগোড়া। দেখা গেল, ঠাট বজায় রাখিতে সদানন্দও কম ওস্তাদ নয়। এসো বাবা বোসো, বলিয়া রাজপুত্রকে সে বসাইল কাছে। রাজপুত্রের বেলা নির্বিকার ভাবটা কমাইয়া একটু স্নেহ জানাইবার জন্য বিপিনের যে অনুরোধ ও উপদেশ এতকাল কিছুতেই স্মরণ রাখিতে পারিত না, আজ যেন সেই অনুরোধ ও উপদেশের মর্যাদা সুদে-আসলে দিবার জন্যই নির্বিকার ভাবটা বিসর্জন দিয়া জানাইল গভীর স্নেহ। বলিল 'হ্যাঁ যাও, বেড়িয়ে এসো গে' একটু নদীর ধার থেকে দুজনে। কবে আবার দেখা হয় তোমাদের ঠিক তো নেই। কেন যাবে না মাধু, যাও। শীগগির ফিরো—সন্ধ্যার আগে।'

মাধবীলতাকে চোখের দেখা দেখিতে না দিয়াই সদানন্দ রাজপুত্র নারায়ণকে ফিরাইয়া দিতে পারিত, কারও ক্ষমতা ছিল না বাধা দেয়। বিপিন তো রাগ করিয়াছেই, না হয় আরও খানিকটা বেশি রাগ করিত। কিন্তু দুজনকে নির্জনে একটু আলাপ করিতে দেওয়াই সদানন্দ ভাল মনে করিল। দুজনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার বলিয়া নয়,—বোঝাপড়া হইবে না, এরকম অবস্থায় বোঝাপড়া হয় না, বোঝাপড়ার কিছু নাই। একটু আবোল-তাবোল বকিবার সুযোগ পাক দুজনে। সদানন্দের জোর-জবরদস্তির অভিযোগ যেন ঘুণাক্ষরেও মনে না জাগে কারও ; মাধবীলতা আশ্রমে থাকিতেছে স্বেচ্ছায়, নারায়ণ তাকে আশ্রমে রাখিয়া যাইতেছে স্বেচ্ছায়, এর মধ্যে আর কারও কর্তৃত্ব নাই। বিপিনও হয় তো একটু ঠাণ্ডাও হইবে ব্যাপার বুঝিয়া, জোর দিয়া বলা চলিবে বিপিনকে যে, মাধবী থাকতে চাইলে, আমি কি করব বিপিন?

এত সব ভাবিয়া সদানন্দ দুজনকে নদীর ধারে বেড়াইতে পাঠাইয়া দিল। তবু একান্ত যুক্তিহীনভাবেই মনটা একটু উতলা হইয়া রহিল বৈ কি! বর্ষার গোড়ায় একি অপরাহ্ণ আসিয়াছে আজ। দীপ্তি সংবরণ করিয়া বর্ণচ্ছটা বিতরণের আর কি দিন জুটিত না অকালে ক্লান্ত সূর্যের। মন্থর গতিতে নদী-তীরের কোনখানে ওরা দুজনে পৌঁছিয়াছে, কি বলাবলি করিতেছে নিজেদের মধ্যে। কত অভিমান আর অনুনয় না জানি রাজপুত্র প্রকাশ করিতেছে কথায়, মুখের ভাবে, চোখের বিষাদে। অনুযোগ হইয়া উঠিতেছে মিনতি। মন যদি না মানে মাধবীর? মোড় যদি ঘুরিয়া যায় তার মনের? যদি সে তুলনা করে, এই বিরাট-দেহ শ্রীহীন দরিদ্র প্রৌঢ়ের সঙ্গে রূপবান ধনবান সঙ্গী যুবকটির, আর তুলনা করিয়া যদি তার মনে খটকা বাধে যে কি হইবে ধার্মিকের মুখোসপরা নরপিশাচটার আশ্রমে বাস করিয়া ; তার চেয়ে রাজপুত্রের হাত ধরিয়া উধাও হইয়া যাওয়া ঢের ভাল, যাহোক তাহোক ফলাফল? সকাতর ক্লিষ্ট ঔৎসুক্যের সঙ্গে সদানন্দ দুজনের ফিরিয়া আসার প্রতীক্ষা করে, নিজেকে নিজেই মনে মনে বলে, আমি কি অ্যাঁ!—অত্যন্ত আত্মাদর যেন দীনভাবের আধিক্যে কোথায় তলাইয়া যায় কিছুক্ষণের জন্য এবং এতক্ষণে প্রকৃত পুণ্যবানের মত অস্থায়ীভাবে বিনা প্রতিবাদে মাধবীলতা সম্পর্কে নিজেকে বিশ্বাস করিয়া ফেলে—পাপী। তেজস্বী কম নয় সদানন্দ। গোঁয়ার নয় বলিয়া বিপিন জানে মানুষটা সে নরম,—খুঁটিনাটিতে যে সর্বদা হার মানে, মোটামুটিতে

কবে তার প্রচণ্ড তেজস্বিতা প্রকাশ পাইয়াছিল, সে কথা মনে করে রাখে কে? তেজস্বীর কাছে দুঃখ বেদনা সহজে আমল পায় না। কিন্তু অন্যায়ের ক্ষণিক উৎসমুখে নিবিড় মমতার এক অপরূপ মাধুর্য উৎসারিত হইয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে, তার আপসোস বড় দুরন্ত। আহা, কি মিষ্টিই ছিল মাধবীলতাকে উমার জিম্মা করিয়া দিয়া আসিবার পর হইতে, প্রায় সমস্ত রাত্রির অযাচিত জাগরণের ছটফটানি রীতিমত আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত, সে বীভৎস করুণ পাশবিক মায়ার স্বাদ! অনাস্বাদিতপূর্ব সেই মাধুর্যের লোভই হাল ছাড়িয়া দিয়া ধৈর্যহীন, ক্লেদাক্ত দুঃখে কী কাবুই হইয়া পড়ে মহাতেজস্বী সদানন্দ।

সন্ধ্যা পার হইয়া যায়, দুজনের ফিরিবার নাম নাই। নিজের সঙ্গে নিজের বিষাক্ত আত্মীয়তা স্থাপনের মজাটা সদানন্দ পরিষ্কার টের পাইতে থাকে। তারপর যখন খবর আসে নারায়ণ চলিয়া গিয়াছে, মাধবীলতা উমা ও রত্নাবলীর কুটীরে ফিরিয়া গিয়াছে, তখন খুশি হইবার ক্ষমতাও থাকে না, এমনি নিস্তেজ আর ভোঁতা হইয়া পড়ে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, বিপিনও গোলমাল করিল না। অন্ততঃ সদানন্দ যেরকম ভাবিয়াছিল, সেরকমভাবে করিল না। পরের উত্তেজনা নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়া উত্তেজিত হওয়ার মত প্রথমটা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই ঠাণ্ডা হইয়া গেল। ফাট' ফাট' বোমার মত অবস্থায় সদানন্দের কাছে আসিয়া দাবী করিল, 'এর মানে?'—সদানন্দ জবাব দেওয়ামাত্র বোমার মত ফাটিয়া গেল। বাস্। আর কিছুই নয়। নিজের বিস্ফোরণে নিজেই যেন সে দারুণ আহত হইয়াছে, রাগ করিবারও আর ক্ষমতা নাই।

তারপর আশ্রমের কারও কাছে কিছু না বলিয়া সে যে কোথায় চলিয়া গেল, সেই জানে। মাধবীলতার সঙ্গে নদীর ধারে একটু পায়চারি করিয়া নারায়ণ সেদিন ফিরিয়া গেল, বিপিন আশ্রমে অনুপস্থিত। আরও দুদিন পরে সে ফিরিয়া আসিল। গম্ভীর চিন্তিতমুখে সদানন্দকেই জিজ্ঞাসা করিল, 'মাধবী নারাণবাবুকে কি বলেছে?'

'আমি তো জানি না বিপিন। মাধবী যেতে চায় না, আমিই বলেকয়ে দুজনকে নদীর ধারে পাঠিয়ে দিলাম। ওদের মধ্যে কি কথা হয়েছে, আমি কি করে বলব?'

বিপিন হঠাৎ হাসিয়া বলিল, 'তোর পাতানো মেয়ে, তুই ছাড়া কে বলবে? বাবা বলে ডাকে না তোকে?'

বিপিন কিছু সন্দেহ করিয়াছে নিশ্চয় এবং এটা তার নিছক সন্দেহমূলক কদর্য পরিহাস নয়। কিন্তু সদানন্দ ধরা দিল না। উদাসভাবে হাই তুলিয়া বলিল, 'পাতানো মেয়ে আবার কিসের!'

ভিতরটা রি রি করিতে লাগিল। একটা যেন খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গেল বিপিনের সঙ্গে, যাতে জয়-পরাজয়ের পার্থক্য নাই, তবু জয়ী হইলেই বেশি ক্ষতি। বিপিন হাত কচলায় আর ঠিক যেন মুখের হাসিটাকেই চিবাইতে চিবাইতে অশ্রুনিরোধের অভিনয় করিতে থাকে। কিছু ভাবিতেছে এমন কথা মনেও করা যায় না, জিহ্বা যেন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে চুপচাপ থাকিবার ভঙ্গিটা এমন খারাপ। হঠাৎ 'হুঁ' বলিয়া যেন ভাবিতে লাগিল তামাসা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিবে কি না।

সদানন্দ ধৈর্য হারাইয়া বলিল, 'কি ভাবছিস শুনি?'

'কিছুই ভাবছি না।'

কথাটা কিন্তু সত্য নয়। বিপিন যা ভাবিতেছিল, বলিবে কি না ঠিক করিতে পারিতেছিল না। সঙ্কোচটা কিসের, তাও সে নিজেই ভাল বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কিসে যেন

বাধিতেছে—একটা অর্থহীন অকারণ বাধা। খানিক পরে হঠাৎ মরিয়া হইয়া বলিয়া বসিল, 'মাধবীকে ফিরিয়ে রেখে আসি তবে কাল পরশু?'

'কোথায়?'

যেখান থেকে এসেছে, ওর মামার বাড়ি।'

সদানন্দ মাথা নাড়িয়া জোরের সঙ্গে বলিল, 'না। এইখানে থাকবে মাধবী, কোথাও যাবে না।'

ছোট একটি নুড়ি পাথর বিপিন হাতে নাড়াচাড়া করিতেছিল, উপরের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া আবার সেটিকে লুফিয়া লইয়া সে হঠাৎ মুচকি হাসিয়া বলিল, 'কেন মিছে বালির ঘর বাঁধছ বাবা! রাজপুত্তুরকে ছেড়ে তোমার দিকে ঝুঁকবে, তেমন মেয়েই ও নয়। গুরু সেজে বড় জোর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে গালটা টিপে দিতে পার, তার বেশি কিছু—'

'তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে বিপিন?'

বিপিন ধৈর্যহারা হইয়া বলিল, 'মাথা আমার খারাপ হয়নি, হয়েছে তোর। কচি একটা মুখ দেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে গেছিস। ঢং করে রতনীর ওখানে রাখা হল কেন, নিজের কাছে রাখলেই হত, বুকে করে?'

সদানন্দকে কথাটি বলিবার সুযোগ না দিয়া বিপিন গটগট করিয়া চলিয়া গেল। সেদিন আর কাছেই ঘেঁষিল না সদানন্দের। খবর আসিল মাধবীলতাকে সে অনেকক্ষণ নানা বিষয়ে জেরা করিয়াছে। চালচলনে যেন কেমন একটু রহস্যের আমদানি হইয়াছে বিপিনের। কাজ ও কথা হইতেছে খাপছাড়া, প্রতিক্রিয়া হইতেছে অপ্রত্যাশিত। পরদিন দেখা হইলে সদানন্দ তাকে একটু বুঝাইয়া বলিতে গেল যে দোষটা যখন সদানন্দের, আশ্রমে থাকিবার জন্য মাধবীলতাকে পীড়ন করাটা কি সঙ্গত হইবে? একথায় বিপিন রাগ করিবে সদানন্দ তা জানিত, কিন্তু রাগটা যে তার এমন অদ্ভুত রকমের হইবে, সে তা কল্পনাও করে নাই।

'শেষ পর্যন্ত মাধবীকে পীড়ন করব, তাও ভাবতে পেরেছিস সদা? ভয় নেই, তোর প্রেমের পথে কাঁটা হয়ে থাকব না, আমি বিদায় হচ্ছি।'

মুখচোখের কি ভঙ্গি বিপিনের, সর্বাঙ্গে কি থর থর কম্পন! দেখিলে মনে হয় ভিতর হইতে কি যেন তাকে জ্বালাও দিতেছে, ধরিয়া নাড়াও দিতেছে। সদানন্দ তার বাহুমূল চাপিয়া ধরিল। ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর অসুখ করেছে নাকি বিপিন?'

বিপিন বলিল, 'হাত ছাড়। আমার হাতটা লোহা দিয়ে তৈরি নয়।'

তারপর আর কিছুই বিপিন বলিল না, কোথায় যেন চলিয়া গেল। চলিয়া গেল? কোথায় চলিয়া গেল বিপিন তার এই আশ্রম ছাড়িয়া, তার প্রাণের বন্ধু সদানন্দকে ছাড়িয়া? কারোকে প্রশ্ন করিবার উপায় নাই, সদানন্দকে চুপ করিয়া থাকিতে হয়। বিপিন কোথায় গিয়াছে সদানন্দই যদি না জানে, সে তবে কেমন কথা হয়? গুরুদেবকে না জানাইয়া গিয়াছে নাকি বিপিন! সদানন্দের মনের মধ্যে নানা চিন্তা পাক খায়, নানা দুর্ভাবনা ঘনাইয়া আসে, বাহিরে গম্ভীর হইয়া থাকে, যথারীতি নিজের কাজ করিয়া যায়। নিয়ম-কানুন বাঁধাই আছে আশ্রমে, কোন ব্যবস্থারও অভাব নাই, তবু বিপিন না থাকিলে যেন চলে না, আশ্রমের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অবাধ গতি ঠেকিয়া ঠেকিয়া থামিয়া থামিয়া চলিতে থাকে—অসুবিধা সৃষ্টি হয়, গোলমাল বাধিয়া যায়, অনুষ্ঠান নিখুঁত হয় না, ঠিক যেন গৃহিণীবিহীন বৃহৎ সংসার। বিশেষভাবে সব ঠিকঠাক করিয়া দিয়া নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোথাও গেলেও বিপিনের

অনুপস্থিতি সব সময়েই অনুভব না করিলে চলে না, এবার তো কিছু না বলিয়া কহিয়া হঠাৎ চলিয়া গিয়াছে।

কেহ কেহ সদানন্দকে বিপিনের খবর জিজ্ঞাসা করে।

সদানন্দ সংক্ষেপে ভাসা ভাসা জবাব দেয়, 'আসবে, দু'চার দিনের মধ্যে আসবে।'

দু'তিনটা দিন কাটিয়া যাওয়ার পর বিপিনের জন্য সদানন্দের মন কেমন করিতে থাকে। অনেকরকম মনোভাবের মিশ্রণে প্রথমে মনের মধ্যে যে খিচুড়িটা তৈরি হইয়াছিল, সেটা হজম হইয়া যাওয়ার পর ক্ষুধার মতই অভাববোধটা ক্রমেই যেন হইয়া উঠিতে থাকে জোরালো। এটা একটু আশ্চর্য। কতবার তো ছাড়াছাড়ি হইয়াছে বিপিনের সঙ্গে, মাস কাটিয়াছে, বছর কাটিয়াছে, বিপিনের জন্য এরকম মন খারাপ হইয়াছে কবে? তবে এভাবে ছাড়াছাড়ি হয় নাই কোন বার। একসঙ্গে চলিতে চলিতে দুজনের পথ চলিয়া গিযাছে দুদিকে, দুজনে তাই চলিয়াও গিয়াছে দূরে। এবার বিপিন রাগ করিয়াছে, মনে আঘাত পাইয়াছে, ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাকে। কে ভাবিতে পারিয়াছিল এমন হইবে? রাগিয়া কলহ করিবে না, বোঝাপড়ার চেষ্টা করিবে না, নূতন নূতন মতলব আঁটিয়া প্রকারান্তরে নিজের জিদ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবে না, কেবল বলিবে চললাম, আর বলিয়া গট্ গট্ করিয়া চলিয়া যাইবে! এমন কি ঘটিয়াছে যার জন্য এমন ভয়ানক আঘাত পাইল বিপিন, এমন কাণ্ড করিয়া বসিল?

সদানন্দেব সবচেয়ে দুর্বোধ্য মনে হয়, সমস্ত ফেলিয়া গেল বিপিন, কিন্তু এই চরম চালটা কোন দিক দিয়া কাজে লাগানর চেষ্টা করিল না। চলিয়া যাওয়ার ভয় দেখাইয়া কাবু কবিয়া চলিয়া যাওয়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাধবীলতা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিতে রাজী হওয়ার সুযোগ দিয়া সদানন্দকে বশ করিবার চেষ্টা করিলে এবং চলিয়া যাওয়ার পরেও সদানন্দকে মত পরিবর্তন করিয়া তাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া আনিবার উপায় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া গেলে, তবেই যেন কাজটা বিপিনের প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইত। এভাবে চলিয়া যাওয়া তো সম্ভব বলিয়াই মনে হয় না বিপিনের পক্ষে।

বিপিনের কি চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল? ভাল লাগিতেছিল না আশ্রমের শিষ্য, ম্যানেজার, মন্ত্রী, সংগঠক ও বন্ধুর জীবন? এ ধরণের সন্দেহ মনে আসিলে সদানন্দ সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়িয়া ফেলে। আশ্রম সম্বন্ধে বিপিনের মমতাব কথা তার চেয়ে কে ভাল করিয়া জানে। যেখানেই গিয়া থাক বিপিন, আশ্রমের জন্য মন যে তার ছটফট করিতেছে. তাতে সন্দেহ নাই।

বিপিন ফিরিয়া আসিবে। রাগের মাথায় দুদিনের জন্য কোথাও গিয়াছে, আবার ফিরিয়া আসিবে। একদিকে মন কেমন করা যেমন চাপা যায় না, অন্যদিকে বিপিনের ফিরিয়া আসিবার আশাটাও অসংখ্য যুক্তি ও অন্ধবিশ্বাসের আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হয়। সমগ্রভাবে বিচার করিয়া নিজের অবস্থাটাই সদানন্দ মোটামুটি বুঝিতে পারে। বিপিন যেমন হোক, বিপিনকে ছাড়া চলিবে না।

বুঝিতে পারিয়া রাগ হয়। এই আশ্রমের এতগুলি মানুষের মধ্যে যাকে ইচ্ছা একটি মুখের কথায় সে মাটিতে লুটাইয়া দিতে পারে, শতাধিক মানুষ বাহির হইতে সপ্তাহে তিন দিন তার উপদেশ হাঁ করিয়া শুনিযা যায়, দেশের চারিদিকে নিকটে ও দূরে জানা অজানা কত ভক্ত তার ছড়াইয়া রহিয়াছে, বিপিনকে ছাড়া তার চলিবে না? এ তো ভাল কথা নয়!

আশ্রম পরিদর্শন ও পরিচালনার ভারটা সদানন্দ নিজের হাতে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। বিপিন গিয়াছে যাক। সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া বিপিন আশ্রমে নাই ভাবিয়া বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া

ওঠে—করুক। আশ্রমবাসী ও আশ্রমবাসিনীদের উপদেশ ও নির্দেশ দিতে, দর্শনার্থীকে দর্শন দিতে, আশ্রমের কাজ ও জিনিসপত্রে হিসাব রাখিতে, নদীর ধারে কাঠের গুঁড়িটাতে বসিয়া আশ্রমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরিকল্পনা গড়িয়া তুলিতে, এমন কি রাত্রে বিশ্রামের জন্য শয়ন করিতে পর্যন্ত বিপিনকে মনে পড়িয়া মন খারাপ হইয়া যায়—যাক্। বিপিন যেমন চলিয়া গিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে তাকে ছাড়া তার চলিবে না, সেও তেমনি আশ্রমকে নিখুঁতভাবে চালাইয়া, আশ্রমের উন্নতি করিয়া দেখাইয়া দিবে বিপিনকে ছাড়াও তার চলে।

কয়েকদিনের মধ্যেই সে টের পাইল, উন্নতি দূরে থাক, বিপিন এতকাল যেভাবে চালাইয়া আসিয়াছে, ঠিক সেইভাবে আশ্রমচালনার কাজটাও যেমন কঠিন, তেমনি জটিল। বিপিন যে বলিয়াছিল, সে কিছু বোঝে না, কেবল তার আদর্শ নিয়া থাকে, মনের মধ্যে আদর্শ পোষণ করা এক কথা আর সেটা কার্যে পরিণত করা আলাদা কথা—এবার বিপিনের সে কথার আসল মানেটা হাড়ে হাড়ে টের পাইতে লাগিল। কিন্তু সদানন্দ ক্ষুব্ধও হইল না, নিরুৎসাহও হইল না। এমন তো হইবেই। কাজ করার অভ্যাস চাই, জানা চাই কি হইলে কি হয়, কি করিতে কি করা দরকার। এক হিসাবে ভালই হইয়াছে বিপিনের চলিয়া যাওযাতে। বিপিনের উপর বড় বেশি নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল, বড় বেশি দূরে সরিয়া যাইতেছিল আশ্রমের পরিচালনা ও সংগঠনের খুঁটিনাটি হইতে। এবার সব বুঝিয়া মনের মত করিয়া আশ্রম চালাইতে পারিবে, আশ্রমকে গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

বিপিনের অনুপস্থিতির জন্য যতটা না হোক, সদানন্দের অপটু ম্যানেজারির ফলে আশ্রমে আরও বেশি বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে লাগিল। বিপিন ফিরিয়া আসিল দশ বার দিন পরে, এই সময়ের মধ্যেই কত নিয়ম যে ভাঙ্গিয়া পড়িল, কত ব্যবস্থা যে উল্টাইয়া গেল, সৃষ্টি হইল নূতন নিয়ম। ফলটা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াইত, বলা যায় না। পরিবর্তনের সময় বিশৃঙ্খলা আসিবেই। আশ্রমে সে একটা গোলমাল সৃষ্টি করিয়াছে, আশ্রমবাসী নরনারী একটু ভ্যাবাচেকা খাইয়া গিয়াছে, টের পাইয়াও সদানন্দ বিশেষ ব্যস্ত হয় নাই। সাজিয়া ঢালিতে গেলে এসব যে অবশ্যম্ভাবী, সে তা জানে। সদানন্দের ব্যবস্থায় আশ্রমের জীবন হয়ত এতদিনের কতগুলি কৃত্রিমতার খোলস ছাড়িয়া আরও উঁচু স্তরেই উঠিয়া যাইত শেষ পর্যন্ত, কে বলিতে পারে! অন্ততঃ কড়া বিধিনিষেধগুলি যে শিথিল হইয়া আসিত, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাল করিয়া গড়িবার উদ্দেশ্যে সদানন্দের ভাঙ্গন ভালরকম আরম্ভ হইবার আগেই বিপিন ফিরিয়া আসিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আশ্রমও যেমন ছিল হইয়া গেল তেমনি।

সদানন্দ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'বাঁচলাম ভাই। বলা নেই কওয়া নেই, কোথা গিয়েছিলি তুই? আশ্রম চালান কি আমার কাজ!'

'বাহাদুরি করতে তোকে কে বলেছিল? যা আরম্ভ করেছিলি তুই—চমৎকার!

কথাটার খোঁচা লাগিল সদানন্দের। একবার ইচ্ছা হইল সত্য সত্যই বাহাদুরি করিয়া বলে, কয়েকটা মাস পরে ফিরিয়া আসিলে আশ্রমের উন্নতি দেখিয়া বিপিনের তাক লাগিয়া যাইত। বিপিন রাগিয়া যাইবে ভাবিয়া ইচ্ছাটা দমনও করিল, নিরীহভাবে একটু শান্ত হাসিও হাসিল।

কোথায় গিয়েছিল বিপিন? আমবাগানটা বাগাইতে—একবারে দানপত্র পাকা করিয়া আসিয়াছে। একটা খবর দেয় নাই কেন বিপিন? কেন দিবে, সদানন্দ যখন চায় যে বিপিন আর তার এত সাধের আশ্রম সমস্ত চুলোয় যাক! কি গরজ বিপিনের খবর দিবার! না না, ঠিক তা নয়, খুব ব্যস্তও ছিল বটে বিপিন, একটু মজাও দেখিতেছিল বটে! হঠাৎ সে জন্মের মত বিদায় হইয়া গেলে সদানন্দ কি করে দেখিবার সাধটা বিপিনের অনেক দিনের।

।। চার।।

বর্ষাকালে সদানন্দ অবসর পায় বেশি। বড় চালাটার নিচে সর্বসাধারণের জন্য সভা বসে মাঝে মধ্যে, লোকজন আসেও খুব কম। সামান্য জলকাদা ভক্তদের উৎসাহ কমাইয়া দেয় দেখিয়া সদানন্দ ক্ষুণ্ণ হয়। নানারকম খটকা জাগে মনে। লোকে কি তার কথা শুনিতে আসে হুজুগে পড়িয়া, সময় কাটানোর জন্য? একটু কষ্টস্বীকাব করিবার দরকার হইলেই অনায়াসে আসাটা বাতিল করিয়া দেয়? কিন্তু আশ্রমের ভাণ্ডারে দান হিসাবে প্রণামী তো তাকে প্রায় সকলেই দেয়—কেউ দেয় যতবার আসে ততবারই, কেউ দেয় মাঝে মাঝে। ঘরের কড়ি পরকে দেওয়া ত্যাগ বৈকি। বিনিময়ে পুণ্য অবশ্য তারা পায়। কিন্তু বর্ষাকালে পুণ্যের দরকারটা এত কমিয়া যায় কেন ওদের? পুণ্যও কি বাজারের ভাল মাছ তরকারির সামিল ওদের কাছে, জলকাদা ভাঙ্গিয়া যোগাড় করার চেয়ে ঘরে যা আছে তাই দিয়া কাজ চালাইয়া দেয়? সবচেয়ে বেশি ক্ষোভ হয় সদানন্দের, বর্ষার জল ভক্তদের কাছে তার আকর্ষণকে জলো করিয়া দিতে পারে বলিয়া। অহংকার বড় আহত হয়। এদিকে আশ্রমের কাজেও বর্ষাকালে শৈথিল্য আসে। নিজের নিজের কুটীরে বসিয়া উপাসনা জপতপ পূজার্চনা যার যত খুশি করে, যার যত খুশি করে না, সকলকে একত্র করিয়া সদানন্দ উপদেশ বিতরণ করিতে আসে কম। কোনদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, কোনদিন থাকে মুষলধারে বর্ষণ। সদানন্দ হয়ত মেঘে ঢাকা আকাশকে উপেক্ষা করিয়া নদীর ধারে খানিকটা ঘুরিয়া আসে, হয়ত বাহির হইয়া যায় কেবল বৃষ্টিতে ভিজিতে। অথবা হয়ত নিজের ঘরে শুইয়া পড়ে বই। আশ্রমের নরনারীদের উপদেশ দিতে যায় খুব কম।

মাধবীলতা মাঝে মাঝে আসে। উপদেশ শুনিয়া যায়।

হিলতোলা জুতা খট্ খট করিয়া হাজির হয় সে একেবারে সদানন্দের অন্তঃপুরে। এটা আশ্রমের নিয়মবিরুদ্ধ. কিন্তু সদানন্দ নিজেই যখন অনুমতি দিয়াছে, নিয়ম অনিয়মের প্রশ্ন কে তুলিবে। বিপিন তুলিতে পারে, সদানন্দকে পাগল করিয়া দিতে পারে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিয়া, কিন্তু সে চুপ করিয়া থাকে। একদিন দুপুরবেলা মাধবীলতা আসিবার পর সদানন্দকে জানাইয়া হঠাৎ সে চলিয়া গিয়াছিল বাহিরে, বলিয়া গিয়াছিল ফিরিতে সন্ধ্যা হইবে। আধঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়াছিল হঠাৎ।

না, বুকে সদানন্দ মাধবীলতাকে টানিয়া নেয় নাই। খাটের একপ্রান্তে পা ঝুলাইয়া মাধবীলতা যে ভাবে বসিয়াছিল, এখনও বসিয়া আছে তেমনি ভাবেই, তেমনি মনোযোগের সঙ্গে শুনিতেছে সদানন্দের কথা। কেবল সদানন্দের দৃষ্টি বড় কোমল, বাস্তব মমতার স্পষ্ট অভিব্যক্তি যেন কোন কিছুব রূপ-ধরিয়া দু'চোখে ফোয়ারার মত উৎসারিত হইয়া উঠিবে, মুখের কথা শেষ হওয়ার শুধু অপেক্ষা।

মাধবীলতার মুখখানা টস্ টস্ করিতেছে জীবনীশক্তির রসে। আর হ্যাঁ, চোখ দিয়াও টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে মেয়েটার।

'মাধবী বলছিল, এখানে থাকতে ওর ভাল লাগছে না বিপিন। কদিন থেকে ওর মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে—রাত্রে ঘুমোতে পারে না।'

'তাই নাকি।' বলিয়া বিপিন এমন একটা আপসোসের শব্দ করিল যে, ঘরের করুণ আবহাওয়াটা বীভৎস প্রতিবাদে ওই সামান্য শব্দটুকুরও মধ্যে বজ্রের মত গর্জিয়া উঠিল। 'কি বললি?' বলিয়া সদানন্দ যে গর্জন করিয়া উঠিল, সে শব্দটা তুলনায় শোনাইল যেন

ক্ষীণকণ্ঠের ফিসফিসানি কথা।

তারপর কিছুক্ষণ তিনজনেই চুপ। একটা ভুল করিয়া ফেলিয়াছে, ঘর হইতে চলিয়া গিয়া আবেকটা ভুল বিপিন করিল না। ঠিক সময়মতই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, 'অন্য কথা ভাবছিলাম।'

সদানন্দ বলিল, 'ও!'

'এখানে থাকতে তোমার ভাল লাগছে না মাধবী?'

'লাগছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনটা খারাপ হয়ে যায়।'

কেন? মাঝে মাঝে মন খারাপ হইয়া যায় কেন মাধবীব? বাড়ির জন্য? না, বাড়িতে এমন কে আছে মাধবীর, যার জন্য মন কাঁদিবে! তবে? মাধবী শুধু মাথা নাড়ে, মুখ ফুটিয়া শুধু বলে জানি না। বাহিরে আকাশ ছাইয়া মেঘ করিয়াছে, ঘরের ভিতরটাও যেন ঐরকম ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে। চুরি করিয়া আনা একটি যুবতী মেয়ের মন খারাপ হয় কেন, প্রশ্ন করিয়া আবিষ্কার করা কি সহজ ব্যাপার! অন্য কোথা যাইতে চায় মাধবী! না, এইখানেই মাধবী থাকিবে, চিরকাল থাকিবে. যতদিন তার দেহে প্রাণ থাকে ততদিন।

সদানন্দ ও বিপিন মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। গুমোটে সদানন্দ ঘামিয়া গিয়াছে, এবার বিপিন ঘামিতে আরম্ভ করে ভিতরের উত্তেজনায়। ভুল বিপিন সহজে করে না, মাধবীলতার সম্বন্ধে কেবলি ভুল হইয়া যাইতেছে। ছোট একটা টুলে বসিয়াছিল বিপিন, জানালা দিয়া বাহিরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া সে মৃদস্বরে বলে, 'আশ্রমে আটকা পড়ে গেছ কিনা, সেইজন্য খাবাপ লাগছে। কদিন বাইরে থেকে ঘুরে এলে বোধ হয় ভাল লাগত। নারাণবাবু আমায় নেমন্তন্ন করেছেন পরশু, যাবে আমার সঙ্গে মহীগড়ে? বেশ জায়গাটা।'

মাধবীলতা মাথাও নাড়ে, মুখেও বলে, 'না।'

বিপিনকে স্বস্তিব নিঃশ্বাস ফেলিতে শুনিয়া সদানন্দ একটু অবাক হইয়া যায়, রাজপুত্র নারায়ণেব জন্য মাধবীলতার মন কেমন করিতেছে না, এজন্য বিপিনের খুশি হওয়াব কাবণটা তার বোধগম্য হয় না।

'চল, একটু বেড়িয়ে আসি আমরা নদীর ধার থেকে।' বলিয়া বিপিন উঠিয়া দাঁড়ায়, সদানন্দের দিকে চাহিয়া বলে, 'আমরা যাই প্রভু?'

সদানন্দ গম্ভীরভাবে. বলে, 'যাও।'

সেইদিন হইতে বিপিনের সঙ্গে কি ভাব মাধবীলতাব। সদানন্দ স্পষ্ট বুঝিতে পারে, দুজনের মধ্যে কি যেন একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে, গড়িয়া উঠিয়াছে কেমন এক নূতন ধবণের আত্মীয়তা। বিপিন শীত মানে না, গ্রীষ্ম মানে না, বর্ষা মানে না, বছবের সকল ঋতুতেই সে সমান ব্যস্ত, কাজে তার কখনও ঢিল পড়ে না। আমবাগানের গাছ কাটিয়া কুটীর তুলিবার স্থানগুলি বর্ষা শেষ হইবার আগেই সাফ করিয়া ফেলিবে ঠিক করায়, তার কাজ বাড়িয়াছে। পূজার মধ্যে সমস্তগুলি কুটীর তুলিয়া আশ্রমের নূতন অংশটিকে সে সম্পূর্ণ কবিয়া ফেলিবে। কিন্তু এত কাজের মধ্যেও বিপিন মাধবীলতাব সঙ্গে গল্প করিবার সময় পায়, তাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে যাইবার সময় পায় সে যাতে আশ্রমের ছোটখাট কাজ করিয়া সময় কাটাইতে পারে, তার ব্যবস্থা করিয়া দিবার সুযোগও পায়।

সদানন্দের কাছে আসে মাধবীলতা, মাঝে মাঝে আসে। শান্ত শিশুর মত চুপ কবিয়া বসিয়া তার কথা শোনে, একটা অভিনব নম্রতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তার সঙ্গে আলাপ করে।

আর সমস্তক্ষণ মুখখানা তার টস্ টস্ করিতে থাকে জীবনীশক্তির রসে। তবে চোখ দিয়া অন্য কিছু আজকাল আর টস্ টস্ করিয়া গড়াইয়া পড়ে না।

সন্তর্পণে একদিন সদানন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'বিপিনের সঙ্গে তোমার বেশ আলাপ হয়েছে, না?'

'বেশ লোক উনি। আমায় খুব স্নেহ করেন।'

'আশ্রমে থাকতে তোমার এখন ভাল লাগছে?'

'তা লাগছে। ভাল সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।'

'কি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন?'

'এই—যাতে সময় কাটে, আশ্রমের কাজকর্ম করতে পাই, ঘুরে বেড়াতে পাই—'

মাঝে মাঝে দুটি একটি প্রশ্ন করিয়া জবাবগুলি সদানন্দ গম্ভীরমুখে শুনিয়া যায়। একটা দিক ধীরে ধীরে তার কাছে পরিষ্কার হইয়া যায়। তার কাছ হইতে মাধবীলতাকে দেখাশোনা করার হুকুম পাইয়া এতদিন দেখাশোনার একেবারে চরম করিয়া ছাড়িয়াছিল উমা ও রত্নাবলী, সর্বদা চোখে চোখে রাখিয়া কি ভয়ানক আদর যত্নটাই দুজনে যে করিয়াছিল তাকে! সে যেন শিশু, সে যেন ভঙ্গুর, সে যেন দুষ্প্রাপ্য কিছু, সেবায়, স্নেহে, খাতিরে, শাসনে মাথায় করিয়া না রাখিলে চলিবে না। বিপিন তাকে মুক্তি দিয়াছে। একরকম কিছুই করে নাই বিপিন, উমা আর রত্নাবলীকে বলিয়া দিয়াছে--মাধবীলতা যা করিতে চায় তাই যেন করিতে পায় আর মাধবীলতাকে দিয়াছে কয়েকটা দায়িত্ব। আশ্রমের একপ্রান্তে আছে গোয়ালঘর, সকালে বিকালে দুধ দোয়ার সময় সে হাজির থাকিবে, যে কুটিরে যতটা দুধ যাওয়ার কথা, বাঁটিয়া দিবে। আশ্রমের মেয়েরা দুজন দুজন করিয়া রান্না করে, মাধবী তাদের তরকারি কুটিয়া সাহায্য করিবে, আব যদি কেউ অসুস্থ থাকে আশ্রমে, তার জন্য প্রস্তুত করিবে দরকারী পথ্য। এমনি সব ছোট ছোট কয়েকটা কাজ।

'আপনি আমায় বলছিলেন না আশ্রমের উদ্দেশ্যের কথা, ভাল বুঝতে পারিনি। বিপিনবাবু ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।'

'কি বলেছেন বিপিনবাবু?'

কথা আর কথার ভঙ্গি মাধবীলতাকে একটু দমাইয়া দিল। সন্দিগ্ধভাবে বলিল, 'কিভাবে সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকা যায়, মানুষকে তাই বুঝিয়ে দেওয়া, ধর্মের মধ্যে যে বিকার এসেছে, সংশোধন করা, সমাজ-গঠনে—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝেছি। জীবন, ধর্ম, সমাজ, দেশ, এই সবের জন্য বড় বড় কাজ করা আশ্রমের উদ্দেশ্য।'

'এভাবে বলছেন যে? তাই উদ্দেশ্য নয় আশ্রমের?'

আহা, চোখ দুটি ছল ছল করে মাধবীলতার। আঘাত পাইবে জানিয়া টস্ টস্ করিয়া জল ঝরানোর জন্য চোখ দুটিকে যেন প্রস্তুত করিয়া নিতেছে। হঠাৎ একটা তীব্র সন্দেহের স্পর্শে সদানন্দের মন হাত দিয়া আগুন ছোঁয়ার মত ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করিয়া ওঠে। মনে হয়, মাধবীলতা যেন ভান করিতেছে। বোকামির ভান, সরল বিশ্বাসের ভান, শব্দ-সংজ্ঞাগুলির অর্থ না বুঝিয়াও তৎসংক্রান্ত চিরন্তন আদর্শবাদের যে অসংখ্য পূজারিণী আছে, সেও তাদেরই একজন,—

অথবা তার নিজেরই ভুল? যেটা মাধবীর ভান মনে হইতেছে, মাধবী আসলে তাই, সে নিজেই মাধবীলতা সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে? মাধবী প্রশ্নভরা

শঙ্কিতদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে বলিল, 'মোটামুটি তাই। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে আশ্রমের, এখানে কিছুদিন থাকলেই আস্তে আস্তে সেটা বুঝতে পারবে। আরেকদিন তোমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেব।'

মাধবীর স্বস্তি ও কৃতজ্ঞতাবোধ অত্যন্ত স্পষ্ট। নিজের অস্বস্তি ও দুর্বোধ্য জ্বালাবোধ সদানন্দকে পীড়া দিতে থাকে। সে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ে। মাধবীলতা সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল সে, সেই করিয়া দিয়াছিল তার আশ্রমবাসের ব্যবস্থা। মাধবী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল মাধবীর, রাত্রে ঘুম হইতেছিল না। চোখের পলকে বিপিন তার জীবনকে সহজ ও সানন্দ করিয়া দিয়াছে। আশ্রমের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা কতবার সদানন্দ বলিয়াছে মাধবীকে, বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে কাতর হইয়া পড়িয়াছে মাধবী। বিপিন দু'কথায় সব তাকে বুঝাইয়া দিয়াছে, হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে মাধবী।

'পা টিপে দেব?'

সদানন্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে মাধবীর ঔৎসুক্য মুছিয়া যায়, চোখ নামাইয়া জড়সড় হইয়া সে বসে। প্রথমে এখানে আসিয়া শেষরাত্রে সদানন্দের পিঠের সঙ্গে মিলিয়া যেভাবে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়াছিল, লজ্জায় সঙ্কোচে যেন তেমনি কুণ্ডলী পাকাইয়া যাইবে। কৈফিয়ৎ দেওয়ার মত ভয়ে নিজে হইতে সে বলে, 'বিপিনবাবু বলছিলেন, আপনার একটু সেবা করতে। আপনি নাকি কারও সেবা যত্ন নেন না, বড় কষ্ট হয় আপনার।'

'না, পা টিপতে হবে না। বৃষ্টি আসছে, তুমি এবার যাও মাধবী।'

আহত হইয়া মাধবী চলিয়া যায়। রাগে সদানন্দের গা জ্বালা করিতে থাকে। মাধবীকে এ কি করিয়া দিয়াছে বিপিন ; নিজে আড়ালে থাকিয়া এ কি সম্পর্ক সে গড়িয়া তুলিতেছে তার আর মাধবীর মধ্যে? বিপিনের সঙ্গে কথা বলিবার সময় কত হাসে মাধবী, আশ্রমের জীবন নাকি হাল্কা হাসিখুসিতে ভরিয়া উঠিয়াছে, অজস্র কথা বলে, মনের আনন্দে চঞ্চলপদে ঘুরিয়া বেড়ায়, কাজের ফাঁকে ফাঁকে গুনগুন করিয়া গানও নাকি শোনা যায় তার সময় সময়। প্রথম প্রথম সদানন্দের কাছেও তো প্রায় এই রকমই ছিল মাধবী, আকস্মিক অবস্থা-পরিবর্তনের ধাক্কায় একটু যা কেবল হইয়া পড়িয়াছিল কাবু। এখন সামনে পড়িলে মনোভাবের সবগুলি উৎসমুখে সে তাড়াতাড়ি ছিপি আঁটিয়া দেয়, খোলা রাখে কেবল সভয় শ্রদ্ধাভক্তির উৎসটা, আর—

এইখানে একটু খটকা লাগে সদানন্দের। আর কি? আর কি উথলাইয়া পড়ে তার সান্নিধ্যগত মাধবীর সর্বাঙ্গীণ অস্তিত্ব হইতে? পরিণত নারীর সেবা ও স্নেহের সাধ? কিন্তু সেটা কেমন হয়। সেই সহজ ও সাধারণ সাধটা তাকে কেন্দ্র করিয়া মাধবীর মধ্যে যদি অস্বাভাবিকরকম জোরালো হইয়া উঠিয়াও থাকে, এইভাবে কি তা আত্মপ্রকাশ করে, এমন দুর্বোধ্য ও রহস্যময় প্রণালীতে? সর্বদা যেন আত্মসচেতন মাধবী, সর্বদা সংযত—গভীর দীনভাবে সর্বাঙ্গে তার একটানা ছেদহীন রোমাঞ্চ।

বৃষ্টি নামি' নামি' করিয়া বহুক্ষণ আকাশে আটকাইয়াছিল। হয়ত শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি আজ নামিবেই না। একবার ডাকিয়া পাঠাইলে কেমন হয় মাধবীকে, একটা সেবা করিবার অনুমতি দিলে? কোমরে আঁচল জড়াইয়া হয়তো মাধবী কুটিরের মেঝে ঝাঁট দিতেছে—শাড়ী, সেমিজ এলোমেলো, চুল এলোমেলো, কথা এলোমেলো, হাসি এলোমেলো। ডাক পৌঁছিলে হাত ধুইয়া কোমরে বাঁধা আঁচল খুলিবে, চুলটা তাড়াতাড়ি ঠিক করিয়া লইবে, কথা ও হাসি দিবে বন্ধ করিয়া। তার সেই হিলতোলা জুতাটি পায়ে দিয়া এই উঠান পর্যন্ত আসিবে

তাড়াতাড়ি—ঠক্ ঠক্ শব্দ স্পষ্ট কানে আসিবে সদানন্দের। তারপর জুতা শাড়ীটা এখানে ওখানে একটু টানিয়া, দুহাতে কপাল হইতে আলগা চুল কয়েকটি শেষবারের মত উপরের দিকে ঠেলিয়া তুলিয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া বলিবে, ডাকছিলেন?

সদানন্দ উঠিয়া অন্দরে গেল। অন্দরে কেউ নাই। সদরে গিয়া দাঁড়াইতে চোখে পড়িল, কিছুদূরে ছোট ফুলের বাগানটিতে আশ্রমের কয়েকটি মেয়ে ফুল তুলিতেছে। তাদের একজন মাধবী। তাইতো বটে, বিশ বাইশ বছর আগে একজনকে কোমরে আঁচল জড়াইয়া ঘর ঝাঁট দিতে দেখিয়াছিল বলিয়া মাধবীকেও যে ঘরই ঝাঁট দিতে হইবে তার কি মানে আছে!

সদানন্দকে চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মেয়েরা কাছে আসিল। অঞ্জলি ভরিয়া পায়ে ফুল ঢালিয়া প্রণাম করিল। নীরবে নির্বিকারভাবে প্রণাম গ্রহণ করিয়া সদানন্দ ভিতরে চলিয়া গেল। পায়ে ঢালিয়া দেওয়া ফুলগুলি কুড়াইয়া মেয়েরা আবার ফিরিয়া গেল ফুল তুলিতে।

পরদিন দুপুরবেলা সদানন্দ নিজেই ডাকিয়া পাঠাইল মাধবীলতাকে।

মাধবী ঘরে ঢুকিবামাত্র তার হাত ধরিয়া লইল বুকে। মাধবী বিবর্ণমুখে কাঠ হইয়া রহিল, এটা বাধাও নয়, প্রতিবাদ নয়, সদানন্দও তা জানে। কিন্তু কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে কি আকাশ-পাতাল পার্থক্য! হাতের বাঁধন আপনা হইতেই ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া গেল।

'আমাকে তুমি ভয় কর মাধবী?'

মাধবী অস্ফুটস্বরে বলিল, 'না'।

মাথায় হাত বুলাইয়া সদানন্দ তাকে একটু আদর করিল, এ ছাড়া স্নেহ মমতা জানানোর শারীরিক প্রক্রিয়া আর কি আছে। একটু আদর করিয়াই বুক হইতে নামাইয়া দিল—মেয়েটার দম প্রায় আটকাইয়া আসিয়াছে।

'কাল তোমায় বকেছিলাম বুঝি?'

মাধবী পুনর্জীবিতার মত অদ্ভুতভাবে হাসিয়া বলিল, 'হ্যাঁ। কাল যে হঠাৎ কেন রেগে গেলেন—'

'রাগিনি—আমি কখনও রাগি না। তুমি আমার সেবা করতে চাও—কি সেবা করবে বল ত?'

'আপনি যা বলবেন।'

'পাকা চুল তুলে দেবে?'

মাধবী হাসিল। পাকা চুল বাছিয়া দিবার সময় তার কোলে মাথা রাখিয়া সদানন্দ চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া রহিল সমস্তক্ষণ। মাধবী চলিয়া যাওয়ার পর মনে হইল, অসময়ে আজ যেন ঘুম আসিয়াছে। উঠিয়া জানালায় গিয়া দাঁড়াইল। রাধাই নদীর বুক আরও ভরিয়া উঠিয়াছে। কালের মত আজও নামি নামি করিয়া আকাশে আটকাইয়া রহিয়াছে বৃষ্টি। স্তিমিতদৃষ্টিতে বিকালের মত সদানন্দ চাহিয়া থাকে। এত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সদানন্দের, এত তেজ ও সংযম, জীবনকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে কি তীক্ষ্ণ হইয়াছে তার বিচারবুদ্ধি, এখন যেন জানিবার বুঝিবার ক্ষমতাটুকুও আর নাই। অন্ধ আবেগের মত, অমর সংস্কারের মত, কেবল একটা কথা মনে জাগিতেছে, তবে কি সত্যই দেবতা কেউ আছেন অন্তরালে মানুষ যাকে সৃষ্টি করে নাই, পাপ পুণ্য যাচাই-এর একটি করিয়া কষ্টিপাথর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দিয়া মানুষকে যিনি স্বাধীনতা দিয়াছেন কিন্তু বিচারের ক্ষমতাটা রাখিয়াছেন নিজের হাতে, অহরহঃ পাপ-পুণ্যের ওজন করিয়া মানুষকে যিনি শাস্তি আর পুরস্কার দিতেছেন— ? নয়তো মাধবীকে

বাহুবন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া তার কেন মনে হইতেছে নিজে সে মুক্তি পাইয়াছে—একটা অদৃশ্য দানবের নিবিড় আলিঙ্গনের অকথ্য যন্ত্রণা হইতে?

সন্ধ্যার সময় আশ্রমের সকলকে আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধনার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের সম্পর্ক লইয়া উপদেশ দিবার কথা ছিল। সদানন্দ গেল না। পরদিন আশ্রমের সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল, সাতদিন গুরুদেব বিশেষ সাধনায় ব্যাপৃত থাকিবেন, কেহ দর্শন পাইবে না।

বিপিন বলিল, 'মাঝে মাঝে তোর পাগলামি দেখে—'

'তুই আমার সর্বনাশ করবি বিপিন!'

'মাঝে মাঝে তোর পাগলামি দেখে—'

।। পাঁচ ।।

বাগবাদা গাঁয়ের সেই যে মহেশ চৌধুরী, যার ছেলে বিভূতি গিয়াছে আসল সরকারী জেলে, যার দুটি মেয়ে গিয়াছে শ্বশুরবাড়ি নামক নকল সামাজিক জেলে, যার উপর রাজা সায়েবের ভয়ানক রাগ, আশ্রমে যে একেবারেই আমল পায় না, সুযোগ পাইলেই সকলের সামনে যাকে অপদস্থ করিবার জন্য সদানন্দকে বিপিন বিশেষভাবে বলিয়া রাখিয়াছে, মানুষটা সে একটু খাপছাড়া কিন্তু তুচ্ছ নয়। তুচ্ছ নয় বলিয়াই অবশ্য তার উপর রাজা সায়েবের এত রাগ, আশ্রমে তাকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিবার জন্য বিপিনের এত চেষ্টা। চারিদিকের অনেকগুলি গ্রামে মহেশ চৌধুরীর যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি আছে, যেটা গড়িয়া তুলিবার জন্য কারও চেষ্টা করিতে হয় নাই, মহেশ চৌধুরীর জীবনযাপনের একনিষ্ঠ প্রক্রিয়া বহুকাল ধরিয়া তিলে তিলে যার জন্ম দিয়াছে। লোকে তাকে শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে, ভালবাসে। কিভাবে জানিয়াছে, কেন জানিয়াছে, জেরা করিলে কেহ বলিতে পারিবে না, কিন্তু সকলেই জানে, মনে মনে মহেশ চৌধুরী সকলের মঙ্গলকামনা করে, লোকটার ভক্তি ও নিষ্ঠা আন্তরিক, সকল সময় সকল বিষয়ে নির্ভয় নিশ্চিন্তমনে লোকটাকে বিশ্বাস করা যায়। লোকটা বুদ্ধিমান কিন্তু চালাক নয়, ভিতরে বাহিরে মিল আছে লোকটার—দৈনন্দিন জীবনের কারবারে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে অসংখ্য দেওয়া-নেওয়া চলে, তার মধ্যে মহেশ চৌধুরীর কাছে পাওনা গ্রহণ করিতে আশাভঙ্গের সম্ভাবনা নাই।

[লেখকের মন্তব্য ঃ কোন মানুষ সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা অসংখ্য ব্যক্তিগত ধারণার সমষ্টি, কিন্তু ধারণাগুলি নির্দিষ্ট পর্যায়ভুক্ত, সীমাবদ্ধ বৈচিত্র্যহীন। যার ব্যক্তিত্বের দু'টি একটি বিশিষ্ট দিক মাত্র অত্যন্ত স্পষ্ট ও স্থূলভাবে মানুষের কাছে আত্মপ্রকাশ করে, যার সম্বন্ধে মানুষ নিজের ধারণাকটির মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায়, নিজের মনে যতগুলি বিভিন্ন 'টাইপ' সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা মানুষের থাকে, তার মধ্যে কোন একটি টাইপের সঙ্গে মানুষ যাকে মোটামুটি মিলাইয়া লইতে পারে, কেবল তারই ব্যক্তিত্বকে মানুষ স্বীকার করে। ব্যক্তিত্ব আসলে পরাশ্রয়ী, ব্যক্তিত্বের বিকাশে পরধর্মানুশীলনের প্রয়োজন, এইজন্য জোরালো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের পক্ষে এটা ভয়াবহ বটে! যার ব্যক্তিত্বের প্রভাব যত বেশি, তাকে তত বেশি পরের ইচ্ছায় চলিতে হয়, নেতার চেয়েও সে পরাধীন। ব্যক্তিত্বকে প্রভাবশালী

করিবার মূলমন্ত্র পরের মনে ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া সে ছোট, আমি বড়, তার যা কিছু আছে কম, আমার সে সব আছে অনেক বেশি। সুতরাং পরের ছোট-বড় কম-বেশির সংস্কার ও ধারণা অনুসাবে আমার ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত না হইলে সেটা নিছক ব্যক্তি-স্বতন্ত্রে পরিণত হয় মাত্র! এ পর্যন্ত মোট কথা, কোন জটিলতা নাই। গোলমাল আরম্ভ হয় বিশ্লেষণ যখন সেই স্তরে পৌঁছায়, যেখানে ব্যক্তিত্বের সংগঠনে প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন মালমশলাগুলি পৃথক করিতে হয়, সমগ্র প্রক্রিয়াটার পিছনে কতখানি ক্রিয়াশক্তি অচেতন ও কতখানি সচেতন তাও পৃথক করিতে হয়।

আমার এ সব কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই। সদানন্দ ও মহেশ চৌধুরীর ব্যক্তিত্বের একটি মৌলিক সামঞ্জস্যের কথা আমি সোজাসুজি আপনাদের বলিয়া দিতে চাই। সদানন্দ, বিপিন, মাধবীলতা, এদের ব্যক্তিত্বের যে সব দিক আমি ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছি এবং চাই গল্পের মধ্যেই তা আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে। কিন্তু মহেশ চৌধুরী ও সদানন্দের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে সামঞ্জস্যটা আমি দেখাইতে চাই, গল্পের মধ্যে আপনা হইতে সেটা পরিস্ফুট করিয়া তোলা আমার সাধ্যাতীত। কারণ, দুজন মানুষকে কাছাকাছি টানিয়া আনিয়া অথবা দুজনের মধ্যে একটি মধ্যস্থ খাড়া করিয়া একজনের ব্যক্তিত্বরূপী সচেতন মননশক্তিব সঙ্গে অপরজনের ব্যক্তিত্বরূপী অচেতন মননশক্তির পার্থক্য সহজেই স্পষ্ট করিয়া তোলা যায়, কিন্তু সামঞ্জস্য কোন রকমেই দেখান যায় না। যাই হোক, বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই: কেবল বলিয়া দিই। মহেশ চৌধুরীর মধ্যে যে সচেতন মননশক্তি সকলের প্রীতি অর্জন করিয়াছে এবং সদানন্দের মধ্যে যে সচেতন মননশক্তি সকলের মধ্যে জাগাইয়াছে সভয় শ্রদ্ধা, মূলতঃ তার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।]

মহেশ চৌধুরী প্রত্যেকদিন আশ্রমে যাতায়াত করে, সাধারণতঃ বিকালের দিকে। সকালেও মাঝে মাঝে আশ্রমে তার আবির্ভাব ঘটে, খুব ভোরে। রাত্রে সে ঘুমায় কিনা অনেকের সন্দেহ আছে, প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হয় একরকম শেষরাত্রে। লাঠিহাতে চার মাইল পথ হাঁটিয়া হাজির হয় আশ্রমে, আবছা আলো অন্ধকারে এদিকে খোঁজে, ওদিকে খোঁজে, রাত্রিশেষে কার সঙ্গে যেন খেলিতেছে লুকোচুরি খেলা, খেলার সাথীটি তার কুটিরের পিছনে, গাছের আড়ালে, ঝোপের মধ্যে কোথাও গা ঢাকা দিয়াছে। খুঁজিতে খুঁজিতে যায় নদীর ধারে। কোনদিন হয়ত সদানন্দের সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। তৎক্ষণাৎ প্রণাম করিয়া মহেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সদানন্দ যদি প্রথমে কথা বলে তো বলে, নতুবা মহেশ চৌধুরী মুখ খোলে না।

'কে, মহেশ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু। বড় জ্বালা প্রভু মনে, বড় কষ্ট পেয়েছি সমস্ত রাত। তাই ভাবলাম ভোরবেলা প্রভুর চরণ দর্শন করে—'

সদানন্দের ধারণা, জ্বালা তারও আছে। সে বলে, 'তোমায় না আশ্রমে আসতে বারণ করে দিয়েছি?'

'না এসে পারি না প্রভু।'

'বটে? বেশ, বেশ। তোমার মত আর দু'একটি ভক্ত জুটলেই আশ্রম ছেড়ে আমায় বনে-জঙ্গলে পালাতে হবে। তা তোমার আসল মতলবটা কি বল তো শুনি?'

'চরণে ঠাঁই চাই প্রভু—মনে শান্তি চাই।'

পাগল? মাথা খারাপ মহেশ চৌধুরীর? এ রকম অন্ধ ভক্ত সদানন্দের আরও আছে, কিন্তু এমন নাছোড়াবান্দা কেই নাই। বাড়াবাড়ির জন্য ধমক দিলে, ভাবপ্রবণ ভক্ত দমিয়া

যায়, মুখ হইয়া আসে কালো, ভক্তিও যেন উবিয়া যায় খানিকটা। কিন্তু মহেশ চৌধুরী কিছুতেই দমে না, কিছুতেই হাল ছাড়ে না। সদানন্দের অবজ্ঞা, অবহেলা, কড়া কথা, এ সবও যেন তার কাছে পরম উপভোগ্য। বড় রাগ হয় সদানন্দের—বড় আনন্দ হয়। মনে হয়, আসলে মহাপুরুষ সে কেবল এই একজন মানুষের কাছে, প্রায় দেবতার সমান। আর সকলে তাকে ঠকায়, শুধু দাম দেয়, শুধু তার দামই মেটায়। তারই বলিয়া দেওয়া মন্ত্রে পূজা করে তার। কিন্তু মহেশ চৌধুরী কিছু জানে না, কিছু মানে না, নিজের রচিত একটিমাত্র মন্ত্র বলিয়া সে পূজা করে—তুমি আমায় চাও বা না চাও দেবতা, আমি তোমায় চাই।

একটু ভয়ও করে সদানন্দের মহেশ চৌধুরীর কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে, তার সঙ্গে কথা বলিতে। বাস্তব অভিজ্ঞতার মালমশলায় জীবনের যে আদর্শ সে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে নিজের জন্য, সে আদর্শ অবাস্তব কল্পনা কিনা, অর্থহীন স্বপ্ন কিনা, আজও এ বিষয়ে সদানন্দের সন্দেহ মেটে নাই। যে আত্মপ্রত্যয়েব নীচে এ সন্দেহ চাপা থাকে, মহেশ চৌধুবীর দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে, চোখের দৃষ্টিতে, মুখের কথায় তা যেন উবিয়া যাইতে থাকে—দেবতার সামনে পূজারীর মত মহেশ চৌধুবী দাঁড়াইয়া থাকে, পোষা কুকুবের মত তাকায়, স্তব করার মত কথা বলে—তবু। মনে হয়, আর যত ভক্ত তার আছে, যাদের মধ্যে অনেকে মনে মনে তার সমালোচনাও করে কম-বেশি, তাদের ভুলাইতে কোনদিন তার কষ্ট হইবে না, ভুলিবার জন্য শিশুর মত তারা উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে, কিন্তু এই অন্ধ ভক্তটিকে ভুলানোর ক্ষমতা তার নাই। মহেশ চৌধুরীর পূজা গ্রহণ করিলে বর দিবার সময় ফাঁকি চলিবে না, ভেজাল চলিবে না। অবাস্তব পাগলামির পুরস্কারকে করিয়া তুলিতে হইবে বাস্তব। কাব্যেব জন্য কবিকে যেমন নারীকে দিতে হয় খাঁটি রক্তমাংসের দেহটি।

‘তোমার ছেলে ছাড়া পেয়েছে মহেশ?’

‘আজ্ঞে না। ও কি আর ছাড়া পাবে!’

‘এ্যাঁ? সে কি কথা—ছাড়া পাবে বৈকি, দুদিন পরেই ছাড়া পাবে। ভেবো না।’

এই কি বাস্তব পুরস্কারের নমুনা? ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুটি মিষ্টি কথা বলা, একটু অনিশ্চিত আশ্বাস দেওয়া, হিসাব করিলে যার দাম কানাকড়িও হয় না, কিন্তু মহেশ চৌধুরীর কাছে যা অমূল্য?

কোনদিন সদানন্দ কথা না বলিয়া পাশ কাটিয়া চলিয়া যায়, মহেশ চৌধুরী ঠায় দাঁড়াইয়া যতক্ষণ দেখা যায় তাকে দেখে, তারপর আবার আপন মনে তপোবনে ঘুরিয়া বেড়ায় আর সদানন্দের সম্মুখে পড়ে না। এখানে সে অনাহূত, অবাঞ্ছিত, আগন্তুক, বিপিনের শাসনে আশ্রমের কেউ তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না, মাঝে মাঝে রীতিমত অপমানও জোটে, তবু মোহাচ্ছন্নের মত সে আশ্রমের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, ধীরে ধীরে আশ্রমের জাগরণ লক্ষ্য করে।

সদানন্দের অজ্ঞাতবাসের খবরটা মহেশ চৌধুরী পাইল সাতুনার শ্রীধরের বাড়িতে। বাগবাদায় নিজের বাড়ি হইতে আশ্রমে যাওয়ার পথে শ্রীধরের বাড়ি পড়ে, মহেশ চৌধুরী এখানে কিছুক্ষণ বসিয়া যায়। বিশ্রামও হয়, জানাশোনা অনেকের সঙ্গ কথা বলাও হয়, অনেকের খবরও পাওয়া যায়। আজ শ্রীধরের সদরের বড় ঘরটার দাওয়ায় লোক জুটিয়াছে অনেক। যারা অপরাহ্ণে যাইবে ভাবিয়াছিল, সদানন্দ সাতদিন দর্শন দিবে না শুনিয়া তাদের মধ্যে অনেকেই শ্রীধরের এখানে আসিয়া জুটিয়াছে। শ্রীধর একটি নূতন বই সংগ্রহ করিয়াছে কোথা হইতে, কামরূপের এক রোমাঞ্চকর প্রামাণ্য উপন্যাস। কাল চারটি পরিচ্ছেদ পাঠ

করা হইয়াছিল, আজ সকলে আসিয়া জুটিলেই বাকি অংশটুকু পড়া আরম্ভ হইতে পারিবে।

মহেশ চৌধুরী বলিল, 'কেউ দর্শন পাবে না?'

শ্রীধর বলিল, 'বিপিনবাবু তাই বললেন চৌধুরী মশাই। প্রকৃত-ভক্ত ছাড়া কেউ দর্শন পাবে না—প্রভুর জন্য যে সর্বস্বত্যাগ করতে পারে, জীবনবিসর্জন দিতে পারে, কেবল সেই দর্শন পাবে।'

'প্রভুর জন্য তোমরা সর্বস্বত্যাগ করিতে পার না, জীবনবিসর্জন দিতে পার না শ্রীধর?'

উৎসুকদৃষ্টিতে মহেশ চৌধুরী সকলের মুখের দিকে চাহিতে থাকে, সকলে স্বস্তিবোধ করে, চোখ নামাইয়া নেয়। বৃদ্ধ শ্রীধরের স্তিমিত চোখদুটি বোধ হয় তামাকের ধোঁয়াতেই বুঁজিয়া যায়।

'আমি প্রভুর চরণদর্শন করতে যাব শ্রীধর।'

সকলে স্তব্ধ হইয়া থাকে। অহংকারের কথা নয়, মহেশ চৌধুরীর অহংকার আছে কিনা সন্দেহ। সকলে তা জানে। কিন্তু একটা কথা প্রায় সকলের মনেই খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতে থাকে, কঠিন একটা সমস্যা। সর্বস্বত্যাগ করিতে পারে, জীবনবিসর্জন দিতে পারে, এত বড় ভক্তই যদি মহেশ চৌধুরী হয়, সদানন্দ তাকে আমল দেয় না কেন, কেন তাকে শিষ্য করে না? এই সমস্যা আজ বহুদিন সকলকে পীড়া দিতেছে, এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে তারা অনেক আলোচনা করিয়াছে, মনে মনে অনেক মাথা ঘামাইয়াছে। কারও মনে এ সন্দেহও জাগিয়াছে যে, মানুষটা মহেশ চৌধুরী কি আসলে তবে ভাল নয়, তার নীতি, ধর্ম, ভক্তি, নিষ্ঠা সব লোক-দেখানো ভালমানুষি?

মহেশ চৌধুরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলে, 'যাই, একবার ঘুরে আসি আশ্রম থেকে।'

কয়েকজন কৌতূহলভরে তার সঙ্গ নিলে সে তাদের ফিরাইয়া দেয়, বলে, 'না, আজ আর তোমাদের গিয়ে কাজ নেই ভাই। প্রভু যখন বারণ করে দিয়েছেন, মিছিমিছি গোলমাল না করাই ভাল।'

আশ্রমে গিয়া মহেশ চৌধুরী যাকে সামনে পাইল তাকেই প্রভুর চরণদর্শনের জন্য ব্যাকুলভাবে আবেদন জানাইতে লাগিল। কেউ জবাব দিল, কেউ দিল না। তখন মহেশ চৌধুরী গিয়া ধরিল বিপিনকে।

বিপিন চৌধুরী মিনতি করিয়া বলিল, 'আপনি একবার প্রভুকে গিয়ে বলুন, প্রভুর জন্য আমি সর্বস্বত্যাগ করব, জীবনবিসর্জন দেব। আপনি বললেই প্রভু আমায় ডেকে পাঠাবেন।'

বিপিন রাগিয়া বলিল, 'কে আপনাকে সর্ব্বস্বত্যাগ করতে, জীবন বিসর্জন দিতে সেধেছে মশায়? কেন আসেন আপনি আশ্রমে? যান, যান, বেরিয়ে যান আমার আশ্রম থেকে।'

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মহেশ চৌধুরী ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরিয়া গেল। ফিরিয়া আসিল শেষ রাত্রে।

সদানন্দের সদরের কুটিরের সামনে কদমগাছটার তলায় বসিয়া পড়িল। কুটীরের আড়াল হইতে সূর্য উঠিলেন মাথার উপরে, তারপর আকাশ ঢাকিয়া মেঘ করিয়া আসিয়া ঘণ্টাখানেক বৃষ্টি হইয়া গেল, তারপর আবার কড়া রোদ ঢালিতে ঢালিতে সূর্য আড়াল হইলেন অন্য একটি কুটীরের আড়ালে, গাছতলা হইতে মহেশ নড়িল না। রোদে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া খাওয়া ছাড়িয়া কি তপস্যা করিতে বসিয়াছে গাছতলায়? এত জায়গা থাকিতে এখানে তপস্যা করিতে বসা কেন? আশ্রমের সকলে সম্মুখ দিয়া যাওয়ার সময়ে বিস্ময় ও কৌতূহলভরা দৃষ্টিতে

তাকে দেখিতে থাকে,—তাকে দেখিবার জন্য কেউ আসে না বটে, কিন্তু এদিক দিয়া যাতায়াত করার প্রয়োজন আজ যেন সকলের বাড়িয়া যায়।

বেলা বাড়িলে তিন চার বার মহেশ চৌধুরীর বাড়ি হইতে লোক আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। বর্ষণের আগে আসিয়াছিল কেবল চাকর, গোমস্তা। বর্ষণের পরে আসিল মহেশের ভাগ্নে শশধর। গাছতলায় মাটিতে উপবিষ্ট মামার জলে-ভেজা মূর্তি দেখিয়া বেচারা কাঁদিয়া ফেলে আর কি! কিন্তু সেও মহেশের তপস্যাভঙ্গ করিতে পারিল না। তবে দেখা গেল ছেলেটার বুদ্ধি আছে। নিজে হার মানিয়া সে ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু বিকাল বেলা হাজির হইল একেবারে মামীকে সঙ্গে করিয়া।

ভাগ্নে কেবল কাঁদিয়া ফেলার উপক্রম করিয়াছিল, স্বামীর অবস্থা দেখিয়া স্ত্রী কাঁদিয়াই আকুল। কেন তার মরণ হয় না? যার স্বামী পাগল, ছেলে পাগল, সে কেন সংসারে বাঁচিয়া থাকে নিত্য নতুন যন্ত্রণা সহ্য করিতে? কাঁদিতে কাঁদিতে হাতের বালা দিয়া বিভূতির মা কপালে আঘাত করিল। রক্ত বাহির হইল একটু—ডান চোখের জলের ধারাটা লাল হইয়া গেল।

মহেশ চৌধুরী কাতরভাবে বলিল, 'শোন, শোন, আহা এমন করছ কেন? বাড়ি ফিরে যাও, আমি ঠিক সময়ে যাব।'

খোলা জায়গায় ফাঁকা গাছতলায় এমন নাটকের অভিনয় চলিতে থাকিলে দর্শকের সমাগম হইতে দেরী হয় না। একে একে আশ্রমের প্রায় সকলেই আসিয়া হাজির হয়, এলোমেলোভাবে চারিদিকে দাঁড়াইয়া দুজনকে দেখিতে থাকে, পুরুষেরা ব্যাপারটা অনেকটা হাল্কাভাবেই গ্রহণ করে, মেয়েদের মধ্যে দেখা দেয় চাপা উত্তেজনার চাঞ্চল্য, অনেকে ছোট্ট হাঁ করিয়া চোখ বড় বড় করিয়া চাহিয়া থাকে, শেষবেলার আলোয় দাঁত করে ঝক্ ঝক, চোখ করে চক্ চক্। আশ্রমে দাঁতমাজার নিয়ম বড় কড়া, দাঁতে ময়লা থাকিলে সদানন্দ রাগ করে, মেয়েদের দাঁত তাই সত্যই ঝক ঝক্ করে—কারও বেশি। রত্নাবলীর দাঁতগুলি বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশি সুন্দর, আর বেশি ঝক্‌ঝকে, চোখও তার বড় আর টানা। তবু গাছতলার ব্যাপার দেখিতে দেখিতে গায়ের আঁচল টানিয়া টানিয়া সে দুহাতে পুঁটলী করিতে থাকে, তারপর রক্তপাত ঘটামাত্র আঁচলসমেত হাত দিয়া চাপা দেয় নিজের মুখ। কাঁদে কিনা বলা যায় না, কিন্তু সর্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপে। কী কুৎসিত যে দেখায় তার পরিপুষ্টর অঙ্গের অনাবৃত অংশের ঢেউতোলা কাঁপুনি! শশধর অভিভূত হইয়া থাকে। মাধবীলতা তাড়াতাড়ি মহেশ চৌধুরীর স্ত্রীর কাছে গিয়া আঁচল দিয়া তার কপালের রক্ত মুছিয়া দেয়।

তারপর আবির্ভাব ঘটে বিপিনের। রাগ করিয়া লাভ নাই, সে তাই রাগ করে না, আশ্চর্য হইবার ভান করিয়া বলে, 'আপনি যাননি এখনো?'

মহেশ চৌধুরী বলে, 'আজ্ঞে না। আপনাকে তো বলেছি, একবার প্রভুর চরণ দর্শন করতে না দিলে আমি উঠব না।'

'তা হলে সাতদিন আপনাকে এখানে থাকতে হবে।'

'তাই থাকব।'

বিপিন একটু হাসিল, 'আপনার ভক্তিটা কিন্তু বড় খাপছাড়া চৌধুরী মশায়। প্রভুর আদেশ অমান্য করতে আপনার বাধবে না, প্রভুর চরণদর্শনের জন্য আপনি ব্যাকুল।'

মহেশ চৌধুরী নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন, 'ও আদেশ আমার জন্য নয়।'

মাধবীলতা বলিল, 'না, সত্যি, উনি জানিয়েছেন, সাতদিন কেউ দর্শন পাবে না। সাতদিন

উনি একমনে সাধনা করবেন কিনা।'

'আমি আড়াল থেকে একবার দর্শন করেই চলে আসব।'

'তা কি হয়?'

সন্ধ্যা হইল, রাত্রি বাড়িতে লাগিল, মহেশ চৌধুরী গাছতলার মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া রহিল। নিরীহ, শান্ত, ভীরু মানুষটা যে আসলে এমন একগুঁয়ে, সদানন্দ ছাড়া এতকাল আর কে তা জানিত! তাকে কিছু খাওয়ানোর চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া গেল। মাধবীলতা আর রত্নাবলী কোনরকমে তার স্ত্রীকে একটু দুধ খাওয়াইয়া শশধরকে ডাকিয়া নিয়া গেল আশ্রমের রাত্রির আহার্যের ব্যবস্থায় ভাগ বসাইতে। রাত্রে আশ্রমে রান্না হয় না, কিন্তু পেট ভরাইতে শশধরের অসুবিধা হইল না,—দুধ, ছানা, মিষ্টি, ফল-মূল এ সবের অভাব নাই। খাওয়ার পর সে আসিয়া আবার মামা-মামীর কাছে বসিয়া রহিল গাছতলায়। রাত্রি দশটা পর্যন্ত আশ্রমের দু'এক জনকে সেখানে দেখা গেল, তারপর একজনও রহিল না। রাত্রি দশটার পর কারও কুটিরের বাহিরে থাকা বারণ—বিপিন ও সদানন্দ ছাড়া।

রাত প্রায় এগারটার কাছাকাছি গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও নামিল, ছাতি-মাথায় বিপিনও হাজির হইল গাছতলায়। দাঁতে ব্যথা হওয়ায় বিপিন গলা, মুখ, চোয়াল, কান, সমস্ত ঢাকিয়া সযত্নে কম্ফর্টার জড়াইয়াছে। ঠাণ্ডা লাগিলে তার দাঁতের ব্যথা বাড়ে। মুখের ঢাকা একটু সরাইয়া সে বলিল, 'আপনারা দাওয়ায় উঠে বসবেন, যান। মাদুর আর বালিশ দিচ্ছি।' মহেশ চৌধুরী স্ত্রীকে বলিলেন, 'যাও না দাওয়ায়, যাও না তোমরা? বৃষ্টিতে ভিজে যে মারা পড়বে তুমি! যাও, দাওয়ায় যাও।'

বিভূতির মা বলিল, 'আর তুমি?'

'এক কথা একশ'বার কেন বলছ? বললাম না প্রভুকে দর্শন করতে না দিলে আমি উঠব না এখান থেকে? তুমি এখানে বসে থেকে কি করবে, তাতে লাভটা কি হবে শুনি?'

'তুমি এখান থেকে না উঠলে আমিও উঠব না।'

সন্ধ্যা হইতে এবিষয়ে দুজনের মধ্যে অনেক তর্ক, রাগারাগি হইয়া গিয়াছে, মহেশ চৌধুরী আর কিছু বলিল না, কেবল শশধরকে হুকুম দিল দাওয়ায় গিয়া বসিতে। শশধর দাওয়াতে গেল, বিপিন মাদুর আর বালিশ আনিযা দিলে তৎক্ষণাৎ মাদুর বিছাইয়া শুইয়াও পড়িল। আপসোস করিয়া বলিল, 'বর্ষাকালে এ কি ঠাণ্ডা মশায়, এ্যাঁ? এ কি শালার শীতকাল নাকি?'

বিপিনের সহানুভূতি জাগিবার লক্ষণ নাই দেখিয়া গলা নামাইয়া আবার বলিল, 'বৌটা এসেছে কাল—ছমাস বাপের বাড়ি ছিল। কি গরমটা কাল রাতে, তা বৌ বলে কি না বাবু, বাদলার দিন ঠাণ্ডা লাগবে।—ব'লে—

'আপনি বাড়ি ফিরে যান না?'

শশধর উঠিয়া বলিল—'আমি? মামী কাল বাড়ি ফিরেই কি করবে জানেন? কানটি ধরে বলবে, বেরো বাড়ি থেকে। কেবল আমাকে নয় মশায়, নিজের জন্য কি আমি ভাবি,—বৌটাকে শুদ্ধু। গায়ে দেবার দিতে পারেন কিছু,—কাপড়-চোপড় যা হোক?'

বিপিন একটা চাদর আনিয়া দিল। কিন্তু বাদল রাতে সদানন্দের সদর দাওয়ায় চাদর মুড়ি দিযা আরাম করিবার অদৃষ্ট বেচারীর ছিল না। বিভূতির মা ডাকিয়া বলিল, 'ও শশী, ভদ্রলোকের কাছ থেকে ছাতিটা চেয়ে রাখ, আর জিজ্ঞেস কর আরো যদি ছাতি থাকে একটা—'

একটা কেন, আরো তিনটা ছাতি ছিল, সবগুলি আনিয়া দাওয়ায় শশধরের কাছে ফেলিয়া বিপিন ভিতরে চলিয়া গেল। দাঁতের অসহ্য যন্ত্রণায় তার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম্ করিতেছিল, ইচ্ছা হইতেছিল মাটিতে শুইয়া হাত পা ছুঁড়িতে থাকে, আর চিৎকার করিতে থাকে।

ছাতি নিয়া শশধর গাছতলায় গেল, একটি ছাতি খুলিয়া দিল মামীর হাতে, আরেকটি ছাতি খুলিয়া মহেশ চৌধুরীকে দিতে গেলে সে বলিল, 'না, আমার ছাতি চাই না।'

স্ত্রী বলিল, 'কেন? এখেনে ধন্নে দিয়েছো, না খেয়ে বসে থাকবে, তা না হয় বুঝলাম—বিষ্টি যখন পড়ছে, ছাতিটা মাথায় দিতে দোষ কি?'

মহেশ চৌধুরী বলিল,—'নিজে থেকে আমি করব না।'

তখন মহেশ চৌধুরীর স্ত্রী আবার এমনভাবে নিজের মরণের জন্য আপসোস আরম্ভ করিল যে, মনে হইলে, আবার বুঝি আজ অপরাহ্ণের মত বালার আঘাতে নিজের কপাল কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া ছাড়িবে। কিন্তু খানিক আপসোস করিয়া নিজের ছাতিটা বন্ধ করিয়া শশধরকে ফেরৎ দিল, বলিল, 'যা তুই, দাওয়ায় শো' গে যা শশী।'

শশধর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'থাক, আমি বসে বসে ভিজি এখানে, আমিই বা বাদ যাব কেন।'

তারপর মিনিট দুই সব চুপচাপ। এ অবস্থায় গাছের পাতায় বাতাসের মৃদু শোঁ শোঁ শব্দ আর গাছের পাতা হইতে জল ঝরিবার ক্ষীণ জলো জলো আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ কানে শোনাও পাপ। মনে অবশ্য অনেক কথা টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকে এবং সেগুলি স্মৃতিও নয়।

'সারাটা জীবন আমায় তুমি জ্বালিয়ে খেলে, আমার শনিগ্রহ তুমি। আমার সব ব্যাপারে তোমার বাহাদুরি করা চাই, হাঙ্গামা বাধানো চাই। যদি শান্তি পাবার জন্যে গাছতলায় ধন্না দিয়ে পড়ে থাকি, তোমার কি তাতে, কেন তুমি এসে আমার মন বিগড়ে দেবে, কে ডেকেছিল তোমায়? স্বামীভক্তি দেখানো হচ্ছে—স্বামীর একটা কথা শুনবে না, স্বামীভক্তি দেখাতে গাছতলায় এসে ভেজা চাই। কি অদ্ভুত সতী রে আমার! স্বামীর শান্তি নষ্ট করে সতীত্ব ফলানো!'

বৃষ্টি আর বাতাস দুয়েরই বেগ বাড়িতে থাকে। মহেশ চৌধুরীর রাগ আর জ্বালাবোধ কিন্তু না বাড়িয়া এই সামান্য ভর্ৎসনার মধ্যেই একেবারে ক্ষয় হইয়া যায়। আরও অনেকক্ষণ জের টানিতে পারিত, বলিতে পারিত আরও অনেক কথা, কিন্তু কিছুই না বলিয়া একেবারে চুপ হইয়া গেল। অন্ধকারে এত কাছাকাছি বসিয়াও কেহ কারও মুখ দেখিতে পাইতেছে না। গাঢ় অন্ধকারে শুধু একটি আলোর বিন্দু চোখে পড়ে। কিছুদূরের একটি কুটীরে কে যেন একটি আলো জ্বালিয়া জানালা খুলিয়া রাখিয়াছে। জাগিয়া আছে না ঘুমাইয়া পড়িয়াছে মানুষটা কে জানে! এত রাত্রে চোখে ঘুম নাই, এমন শান্তিহীন অভাগা কে আছে সাধু সদানন্দের আশ্রমে? সদানন্দের যে শিষ্য, সদানন্দের আশ্রমের কুটীরে যে বাস করিবার অধিকার পায়, জীবনের সব জ্বালাপোড়ার ছোঁয়াচ তো সঙ্গে সঙ্গে তার মন হইতে মুছিয়া যাইবে, সন্ধ্যার সঙ্গে শিশুর মত দু'চোখ ভারি হইয়া আসিবে শিশুর চোখের ঘুমে? আলোর বিন্দুটি নিভিয়া গেলে মহেশ চৌধুরী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তাই বটে। কোন দরকারে কেউ আলো জ্বালিয়া রাখিয়াছিল—ঘুম আসিতেছিল না বলিয়া নয়। দুই হাত জড়ো করিয়া মহেশ চৌধুরী মনে মনে সদানন্দের চরণে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করে। হে মহেশ চৌধুরীর জীবন্ত দেবতা, মহেশ চৌধুরীর কল্যাণের জন্যই তুমি তাকে অবহেলা করিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখ, দুঃখের আগুনে

পুড়িয়া মহেশ চৌধুরীর মন যেদিন নির্মল হইবে, সেইদিন পায়ে ঠাঁই দিয়া মহেশ চৌধুরীর সমস্ত দুঃখ দূর করিয়া তাকে তুমি শান্তি দিবে, এ কথা জানিতে কি বাকী আছে মহেশ চৌধুরীর? এই ধৈর্যের পরীক্ষায় শিষ্য না করিয়া শিষ্যের মতই তাকে যে প্রকারান্তরে আত্মশুদ্ধির কঠোর সাধনায় নিযুক্ত করিয়াছ, সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য মহেশ চৌধুরী জীবন দিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু আজ এই বিপদে তুমি তাকে রক্ষা কর। তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না প্রভু মহেশ চৌধুরীকে বাড়িতে ফিরাইয়া নেওয়ার জন্য, মহেশ চৌধুরীর সাধনা ব্যর্থ করার জন্য একজন কি অন্যায় আবদার আরম্ভ করিয়াছে। রাত-দুপুরে গাছতলার সম্মুখে বসিয়া নীরবে বৃষ্টির জলে ভিজিতেছে? স্ত্রী বলিয়া নয়, ছেলের মা বলিয়া নয়, একজন স্ত্রীলোকের এত কষ্ট চোখে দেখিয়া স্থির থাকার মত মনের জোর যে মহেশ চৌধুরীর নাই প্রভু।

সদানন্দ অবশ্য তখন ঘুমাইতেছিল। আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে কিন্তু জানা থাকিলেও মহেশ চৌধুরীর কিছু আসিয়া যাইত না' পাথরের দেবতার কাছে মানুষ প্রার্থনা জানায়— ঘুমন্ত মানুষ তো জীবন্ত। নয় কি?

পরদিন চারিদিকে খবর ছড়াইয়া গেল, মহেশ চৌধুরী সস্ত্রীক সাধুবাবার আশ্রমে ধন্না দিয়াছে। চারিদিক হইতে নবনাবী দেখিবার জন্য আসিয়া জড়ো হইতে লাগিল—সদানন্দের আশ্রমে আসিয়া তারা আজ মহেশ চৌধুরীর দর্শনপ্রার্থী।

শেষরাত্রে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সকালবেলা ভিজা পৃথিবীতে সোনালী রোদ উঠিয়াছে। মহেশ চৌধুরী ও তার স্ত্রী দুজনের গায়ে রোদ পড়িয়া দেখাইতেছে যেন মূর্তি-ধরা বিশৃঙ্খলা ও অবাধ্যতা, কিন্তু অপার্থিব জ্যোতি দিয়া আবৃত। দুজনের গায়ে আববণের মত পড়িবে বলিয়া রোদের রঙটা আজ বেশি গাঢ় হইয়াছে নাকি?

রত্নাবলী ও উমা আসিয়াছিল সকলের আগে, রোদ উঠিবারও আগে। রত্নাবলী চোখ বড় করিয়া বলিয়াছিল,—'সমস্ত রাত এখানে ছিলেন?'

মহেশ চৌধুরী বলিয়াছিল, 'থাকবাব জন্যেই তো এসেছি মা।'

মহেশ চৌধুরীর কথা বলিবার ধরণ পর্যন্ত এক রাত্রে বদলাইয়া গিয়াছে।

'মারা পড়বেন যে আপনারা?'

মহেশ চৌধুরী করুণ চোখে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল। দেবতা কি প্রার্থনা শুনিবেন, এই বিপদে তাকে পথ দেখাইয়া দিবেন না?

কাল শেষরাত্রির দিকে কতবার যে তার মনে হইয়াছে সব শেষ করিয়া দিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া কোন একটি আশ্রমে চলিয়া যায়। মনে হইয়াছে, এমনভাবে একজনকে কষ্ট দিবার কোন অধিকার তার নাই, সে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেই বা এ জগতে কার কি আসিয়া যাইবে, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিলেই বা কার কি আসিয়া যাইবে, সব কি তার নিজেরই বিকৃত অহংকারের কথা নয়? সাধুজীর চরণদর্শন না করিয়া উঠিবে না বলিয়া গাছতলায় ধন্না দিয়াছে, চরণদর্শন হইবার আগে উঠিয়া গেলে লোকের কাছে একটু নিন্দা হইবে, লোকে বলিবে মহেশ চৌধুরীর মনের জোর নাই। নিজের কাছে নিজের দামটা একটু কমিয়া যাইবে বটে, মনে হইবে বটে যে, আমি কি অপদার্থ, ছি। কিন্তু নিজের কথা ভাবিয়া আরেকজনকে যন্ত্রণা দিলে, মারিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা ঘটাইলে, তাতে কি নিজের অপদার্থতা আর বেশী প্রমাণ হইয়া যাইবে না, নিজের মধ্যে অশান্তি বাড়িয়া যাইবে না?

রোদ উঠিবার পর আসিল মাধবীলতা। কে জানে কেন, এ আশ্রমে কোন ব্যাপারে সকলের

চেয়ে মাধবীলতার সাহসটাই সবচেয়ে বেশি হইতে দেখা যায়। বোধ হয় কোন কোন ব্যাপারে সে সকলের চেয়ে ভীরু বলিয়া।

আসিয়াই মহেশকে সে দিতে আরম্ভ করিল বকুনি। বলিল, 'মাথা-খারাপ হয়ে থাকে, অন্য কোথাও গিয়ে পাগলামি করুন না? আমরা আপনার কাছে কি অপরাধ করেছি?'

'অপরাধ? অপরাধের কথা কি হল মা?'

মহেশ চৌধুরী হাত জোড় করিল।

তফাতে শতাধিক নরনারী ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মাধবীলতার মুখের রঙ যেন রোদের সঙ্গে মিশ খাইয়া যাইবে।

'তবে আমাদের এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন? এটা তো হাট নয়, আশ্রম তো এটা? দেখুন তো চেয়ে—কি লোক জমতে সুরু করেছে? এর মধ্যে আশ্রমের কাজ চলে কি করে, আমরাই বা থাকি কি করে? একটু শান্তি পাবে বলে যারা আশ্রমে আসে—', সাহস মাধবীলতার একটুও কমে নাই, তবে আবেগটা বাড়িতে বাড়িতে একটু অতিরিক্ত হইয়া পড়ায় গলাটা রুদ্ধ হইয়া গেল।

মহেশ চৌধুরী বলিল, 'তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে মা? আচ্ছা আমি ওদের যেতে বলছি।'

'যেতে গরজ পড়েছে ওদের!'

কিন্তু তারা গেল। মহেশ চৌধুরী ঘুরিয়া বসিয়া সকলকে চলিয়া যাইতে অনুরোধ জানাইল, বলিল যে, এই গাছতলায় তার মরণ হইবে, এটা যদি তারা না চায়, তবে যে যার বাড়ি ফিরিয়া যাক। ভঙ্গি দেখিয়া প্রথমে মাধবীলতার মনে হইয়াছিল, মহেশ চৌধুরী বুঝি লম্বা বক্তৃতা দিবে, কিন্তু একটু অনুযোগ দিয়া ও নিজের মরণের ভয় দেখাইয়া কয়েকটি কথায় সে বক্তব্য শেষ করিয়া দিল এবং এমনভাবে কথাগুলি বলিল, যেন শ্রোতারা সকলেই তার শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সকলে আশ্রমের সীমানা পার হইয়া চলিয়া গেল। বাড়ি সকলে গেল না, আশ্রমের কাছেই খবরের লোভে ঘুরাফিরা করিতে লাগিল, কিন্তু গাছের জন্য আশ্রমের ভিতর হইতে তাদের আর দেখা গেল না, মাঝে মাঝে দু'একজন করিয়া, আশ্রমের মধ্যে আর ভিড় হইল না।

বিপিন ভিতর হইতে ব্যাপারটা লক্ষ্য করিতেছিল। দাঁতের ব্যথা এখনো তার সম্পূর্ণ কমে নাই, কিন্তু হয় রোদ উঠিয়াছে বলিয়া অথবা ব্যাপারটা দেখিয়া উত্তেজনা হইয়াছে বলিয়া, মাথায় জড়ানো সমস্ত কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া সে চুপ করিয়া বিছানায় বসিয়া রহিল।

মাধবীলতা একটা পাক দিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, আপনি কি চান?'

'প্রভুর চরমদর্শন করতে চাই।'

শুনিয়া মাধবীলতা আবার পাক দিয়া আসিতে গেল।

বেলা বাড়িতে থাকে, ভিজা জামাও কাদামাখা পরণের কাপড় ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া যায়, গুমোট হয় দারুণ। মহেশ একসময় স্ত্রীকে বলে, 'আচ্ছা এবার তো তুমি ফিরে যেতে পার?'

বিভূতির মার চোখ জবাফুলের মত লাল হইয়াছে, চোখের পাতা বুঁজিয়া বুঁজিয়া আসিতেছে। শুধু মাথা নাড়িল।

মহেশ চৌধুরী খানিকক্ষণ গুম্ খাইয়া থাকিয়া বলিল, 'চল, আমিও যাচ্ছি।'

শুনিয়া বিভূতির মার লাল চোখে পলক পড়া বন্ধ হইয়া গেল—'সাধুজীর চরণদর্শন না করেই যাবে?'

'কি করব? নারীহত্যার পাতক তো করতে পারি না।—জ্বর এসেছে না তোমার?'

হয়ত আসিয়াছে জ্বর, হয়ত আসে নাই, সেটা আর এখন বড় কথা নয়, বিভূতির মা এখন আর বাড়ি ফিরিয়া যাইতে চায় না। এখানে বসিবার সময় বলিয়াছিল বটে যে স্বামী লইয়া ফিরিয়া যাইবে কিন্তু এখন আর সদানন্দের চরণদর্শনের আগে সেটা করিতে চায় না। স্বামীর প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে ভয়ে? ভয় সেটাই বটে কিন্তু মহেশ যা ভাবিতেছে তা নয়, স্বামীর প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে ভাবনায় তো বিভূতির মার ঘুম আসিতেছে না। এখন বড় ভয় এই যে, এত কাণ্ডের পর তার পাগল স্বামী সদানন্দের দর্শনলাভ না করিয়াই বাড়ি ফিরিয়া গেলে, তার সঙ্গে সে ঘর করিবে কি করিয়া? সেই তিলে তিলে দিনের পর দিন দগ্ধানোর চেয়ে এইখানেই একটা হেস্ত-নেস্ত হইয়া যাক্।

যুক্তিটা যে খুবই জোরালো, তাদের সম্পর্কের হিসাব ধরিলে প্রায় অকাট্য, মনে মনে মহেশ তা অস্বীকার করিতে পারিল না কিন্তু অনাহারে অনিদ্রায় রোদে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া গাছতলায় বসিয়া বসিয়া দিবারাত্রি কাটানোর পর যুক্তিতে বেশি কিছু আসিয়া যায় না। পরের কাছে বিনয়ে কাদা হইয়া হাতজোড় করা যায় কিন্তু নিজের লোকের অবাধ্যতায় গা জ্বলিয়া যায়। মহেশ চৌধুরীর দাঁতে দাঁত ঘষিবার প্রক্রিয়াটা কাছে দাঁড়াইয়া কেউ লক্ষ্য করিলে চমকাইয়া যাইত।

'তুমি থাক তবে আমি ফিরে চললাম।'

'যাও।'

'আমি চলে গেলেও তুমি একা বসে থাকবে?'

'কি করব না বসে? এখন গেলেই চিরকাল তুমি আমায় দুষবে, বলবে আমার জন্য তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলে।'

'তোমায় দুষবো?'

'দুষবে না?'

খানিকক্ষণ হতভম্বের মত স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মহেশ চৌধুরী বলিল, 'আমি নিজেই যখন চলে যাচ্ছি, তোমায় দুষব কেন?'

এবার বিভূতির মা যেন একটু রাগ করিয়াই বলিল, 'দ্যাখো, তোমার সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক নয়, ওসব মারপ্যাঁচ আমাদের মধ্যে চলবে না,—রাস্তার লোককে ওসব বলে বুঝিও। নিজেই চলে যে যাচ্ছ তুমি, কার জন্য যাচ্ছ শুনি? বাড়ি গিয়ে যে ছটফট করবে, সেটা তলে তলে দগ্ধাবে কাকে শুনি? তোমায় চিনতে তো আমার বাকী নেই। তুমি হলে....তুমি হলে'....মাথা নত করিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

'কেঁদো না' বলিয়া মহেশ চৌধুরী বিহ্বলের মত বসিয়া রহিল। এ জগতে কোন প্রশ্নেরই কি শেষ নাই? মানুষ বিচার করিবে কি দিয়া? খুঁজিলেই সত্যের খুঁত বাহির হয়,—নিজে খোঁজ বন্ধ করিয়া দিলেও রেহাই নাই, প্রতিনিধি যদি খোঁজে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির হিসাবে তাতেও খুঁত বাহির হওয়া আটকায় না। নিজে যা হোক কিছু ঠিক করিয়া নিতে পারিলেই অন্যে তা' মানিবে কেন, অন্যেও যাহোক কিছু ঠিক করিয়া নিতে গিয়া নূতন কিছু আবিষ্কার করিবেই। সুতরাং এখন কর্তব্য কি? যা ভাল মনে হয় তাই করা?

কি করা ভাল?

হে মহেশ চৌধুরীর জীবন্ত দেবতা—

না, দেবতার কাছে আবদার চলিবে না। দেবতার কি জানে মহেশ চৌধুরী? দেবতা ও তার

সম্পর্কের মধ্যে কোনটা ম্যারপ্যাঁচ আর কোনটা মারপ্যাঁচ নয়, তা কি সে নিঃসন্দেহে জানিতে পারিয়াছে, যেমন জানিতে পারিয়াছে স্বামী নামক দেবতা সম্বন্ধে তারই সম্মুখে উপবিষ্টা তারই এই স্ত্রীটি? এরকম না জানিলেই বা কর্তব্যনির্ণয় চলিবে কেন? মহেশ চৌধুরীর ক্লেশ বোধ হয়। দেবতাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে কিন্তু দেবতার সঙ্গে নিজের সংযোগটা কেমন, সে সম্বন্ধে নিজের পরিষ্কার ধারণা নাই, এ কেমন আত্মসমর্পণ? চোখ কান বুঁজিয়া বিচার-বিবেচনা না করিয়া নিজেকে দিলেই কি আত্মসমর্পণ হয়? কোন প্রত্যাশা না থাকিলেই? তবে সদানন্দের জন্যও কেন নিঃসন্দেহ হইতে পারে না যে যা ঠিক করিয়াছে তাই ঠিক? তার সম্বন্ধে কর্তব্যনির্ণয় করিতে তার স্ত্রীর কেন একবারও দ্বিধা করিতে হয় না, ভুল করিবারও দ্বিধা করিতে হয় না, ভুল করিবার ভয়ে ব্যাকুল হইতে হয় না? মহেশ চৌধুরী কি তবে স্ত্রীলোকেরও অধম? অথবা—?

একটা প্রশ্ন যেন মনের তলায় কোনখানে উঁকি দিতে থাকে, মহেশ চৌধুরী ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কেমন একটা রহস্যময় দুর্বোধ্য অনুভূতি হইতে থাকে। আসল কথা, বিভূতির মার শেষ কথাগুলিতে সে একেবারে চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল, সকল বিষয়ের মূল্যনির্ণয়ের অভ্যস্ত মানসিক প্রক্রিয়াটা একেবারে গোড়া ধরিয়া নাড়া খাইয়াছিল। সমস্ত চিন্তার মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল মনে হইতেছিল, একথাটা তো মিথ্যা নয়, ওর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, এ জগতে আর কারও সঙ্গে তো তা নেই, কোনরকম মারপ্যাঁচ ওর সঙ্গে আমার তো চলতে পারে না! কি আশ্চর্য!

তারপর মাধবীলতা এক সময়ে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'চলুন আপনারা সাধুজীর চরণ দর্শন করবেন।'

মহেশ যেন বিশেষ অবাক হইল না, কৃতার্থও বোধ করিল না। সহজভাবে কেবল বলিল, 'অনুমতি দিয়েছেন?'

একথার জবাবে মাধবী বলিল, 'প্রণাম করেই চলে আসবেন কিন্তু কথাবার্তা বলে জ্বালাতন করবেন না।'

'আমরা দুজনেই যাব তো?'

'হ্যাঁ, আসুন।'

কিন্তু বিভূতির মা স্বামীকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে, সদানন্দের চরণ দর্শন করিতে আসে নাই, সে উঠিল না। বলিল, 'আমি এখান থেকেই মনে মনে প্রণাম জানাচ্ছি, তুমি যাও, প্রণাম করে এসো।'

একা যাইতে মহেশের ভাল মন সরিতেছিল না ; একসঙ্গে এত দুর্ভোগ সহ্য করিবার পর সাফল্যটা ভোগ করিবে একা? একটু অনুরোধ করিল, বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিল যে, এমন একটা অনুগ্রহ পাইয়া কি হেলায় হারাইতে আছে? কিন্তু বিভূতির মা কিছুই বুঝিল না। তখন মাধবীলতার সঙ্গে মহেশকে একাই ভিতরে যাইতে হইল। কাপড়ে কাদা লাগিয়াছিল, এখন শুকাইয়া পাঁপড়ের মত শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। মহেশ একবার ভাবিল কাপড়টা বদলাইয়া সদানন্দের সামনে যায়, তারপর আবার ভাবিল, থাক, হাঙ্গামায় কাজ নাই। সদানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থাটা বিপিনের বদলে মাধবীলতার মধ্যস্থতায় হইতেছে কেন একথাও মহেশের মনে হইতেছিল। ভাবিল, তার কাছে নিজে নত হইতে বিপিনের হয়ত লজ্জা করিতেছিল, তাই মেয়েটাকে দূতী করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু সদানন্দের অভ্যর্থনা এ ধারণা তার মন হইতে বলপূর্বক দূর করিয়া দিল। রাগে

আগুন হইয়া সদানন্দ বলিল, 'এর মানে? আমি না বারণ করে দিয়েছি, সাত দিন কেউ আমার দর্শন পাবে না?'

সদানন্দ নদীর দিকে জানালার কাছে পাতা চৌকিতে বসিয়াছিল, সেইখান হইতে ক্রুদ্ধ চোখে চাহিয়া রহিল। মহেশ তখন ঘরের চৌকাঠ পার হইয়াছে, সেইখানে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

মাধবীলতা তাড়াতাড়ি চৌকির কাছে আগাইয়া গেল। নিচু গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, 'আপনার পায়ে ধরছি, রাগ করবেন না অনেক ব্যাপার হয়ে গেছে, আমি সমস্ত বলছি আপনাকে। আপনি শুধু এই ভদ্রলোককে একবার প্রণাম করে চলে যেতে দিন।' বলিয়া মুখ আরও তুলিয়া সদানন্দের চোখে চোখে চাহিয়া মিনতি করিয়া বলিল, 'দেবেন না?'

সদানন্দ বলিল, 'আচ্ছা।'

'আসুন, প্রণাম করে যান।'

মহেশ নড়ে না দেখিয়া সদানন্দও ডাকিয়া বলিল, 'এসো মহেশ।'

মহেশ অবাধ্য শিশুর মত মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না প্রভু, আপনি আমায় ডাকেননি, এই মেয়েটি আমায় ফাঁকি দিয়ে এনেছে। না জেনে আপনার কাছে আমি একি অপরাধ করলাম প্রভু! আপনি ডাকেননি জানলে তো আমি আসতাম না।'

সদানন্দ শান্তভাবে বলিল, 'তাই নাকি? তা, এখন কি করবে?'

'আমি ফিরে যাচ্ছি প্রভু। আপনি নিজে ডাকলে এসে প্রণাম করে যাব।'

মাধবীর মুখখানা পাংশু হইয়া গিয়াছিল, সে ভীতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'আবার গাছতলায় গিয়ে ধন্না দেবেন? মরে যাবেন যে আপনারা দু'জনেই?'

মুখের চেয়ে মাধবীর চোখের পরিবর্তন ঘটিতেছিল বিচিত্রতর, এবার চোখ ছাপাইয়া জল ঝরিয়া পড়িল। কত ভাবিয়া কত হিসাব করিয়া নিজের দায়িত্বে এত বড় একটা কাজ করিতে গিয়া বুকটা ভয়ে ও উত্তেজনায় ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল, সদানন্দ দেবতা না দানব মাধবীর জানা নাই কিন্তু এমন ভয় সে করে সদানন্দকে যে, কাছে আসিলেই তার দেহ-মন কেমন একসঙ্গে আড়ষ্ট হইয়া যায়, সদানন্দ তাকে বুকে তুলিয়া লইলেও যে জন্য সে নূতন কিছুই আর অনুভব করতে পারে না, অনায়াসে সদানন্দের মুখের দিকে প্যাঁট প্যাঁট করিয়া চাহিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সে তো গা এলাইয়া দেওয়ার কথা, কোন হাঙ্গামাই তাতে নাই। এতকাল নিজের ও সদানন্দের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যা কিছু ঘটিয়াছে, তাতে তার নিজের কিছুই করিবার বা বলিবার থাকে নাই, সদানন্দই সমস্ত করিয়াছে ও বলিয়াছে। আজ প্রথম নিজেকে মানুষটার নিষেধ অমান্য করিতে সক্রিয় করিয়া তুলিয়া ভিতরটা তার আবেগ ফাটিয়া পড়িতেছিল। তাই তার পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করিয়া মহেশ আবার গাছতলায় ধন্না দিতে যাইবে, এই আশাভঙ্গের সুযোগ অবলম্বন করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। তার উদ্দেশ্যটা যথারীতি সফল হইলে, সদানন্দকে প্রণাম করিয়া মহেশ বাড়ি ফিরিয়া গেলে, অন্য কোন উপলক্ষে সে অবশ্য কাঁদিত। উপলক্ষ না পাইলে বিনা উপলক্ষেই কাঁদিত।

সদানন্দ অপলকচোখে মাধবীলতার চোখে জল ভরিয়া উপচিয়া পড়ার প্রক্রিয়াটা দেখিতেছিল। এ দৃশ্য সে আগেও দেখিয়াছে, মাধবীর চোখ তখন তার চোখের আরও কাছে ছিল। তবু এমন স্পষ্টভাবে আর কোনদিন কি মাধবীর চোখের কান্না দেখিয়াছে ইতিপূর্বে?

একটু ভাবিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে সদানন্দ বলিল, 'মহেশ, আমি তোমায় পরীক্ষা করছিলাম।'

'পরীক্ষা প্রভু?'

'হ্যাঁ পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ! আমি সব জানি মহেশ, তুমি আসবার একমুহূর্ত আগে আমি আসন ছেড়ে উঠেছি। দরজা বন্ধ ছিল, তুমি আসবে বলে দরজা খুলে রেখেছি! তোমায় দেখে রাগের ভান করছিলাম, আমায় না জানিয়ে কেউ কি আমার কাছে আসতে পারে মহেশ? এখন বাড়ি যাও, ক'দিন বিশ্রাম করে আমার সঙ্গে এসে দেখা কোরো। দেখি, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারি কি না।'

শুনিতে শুনিতে টলিতে টলিতে মহেশ চৌধুরী কোনবকমে খাড়া ছিল, সদানন্দের কথা শেষ হইলে প্রণাম করিবার জন্য আগাইতে গিয়া দড়াম করিয়া পড়িয়া গেল।

সুতরাং বিভূতির মাকেও শেষ পর্যন্ত ভিতরে আসিয়া সদানন্দের চরণ দর্শন করিতে হইল, শশধরও আসিল। বিপিন আসিয়া চুপ কবিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল, একবাব শুধু সে চোখ তুলিয়া চাহিল সদানন্দের দিকে, তারপর আর মনে হইল না যে আশেপাশে কি ঘটিতেছে, এ বিষয়ে তাব চেতনা আছে।

আধঘন্টা পরে মহেশ চৌধুরীকে একটু সুস্থ করিযা এবং একটু গরম দুধ খাওয়াইয়া শশধর ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। বাইরে দেখা গেল বিরাট কাণ্ড হইয়া আছে—শ'দুই নরনারী সেই কদমগাছটার তলে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া। শ্রীধরকেও তাহাদেব মধ্যে দেখা গেল।

মহেশকে দেখিয়া জনতা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—মহেশ চৌধুবীকি জয়!

জনতার মধ্যে একজনও অবাঙালী আছে কিনা সন্দেহ, মহেশ চৌধুরীর নামের সঙ্গে কোথা হইতে যে একটি 'কি' যুক্ত হইয়া গেল!

তারপর কয়েকজন যুবক মহেশ চৌধুরীকে কাঁধে চাপাইয়া গ্রামেব দিকে রওনা হইয়া গেল। কাঁধে চাপাইল একবকম জোব করিয়াই, মহেশ চৌধুরীর বারণও শুনিল না, বিভূতির মার ব্যাকুল মিনতিও কানে তুলিল না।

যতক্ষণ দেখা গেল, আশ্রমের সকলেই একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তাবপব ছোট ছোট দলে আরম্ভ হইল আলোচনা। বিপিনও সদানন্দের কুটীরের সামনে দাঁড়াইয়া আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়াছিল, শোভাযাত্রা গাছেব আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেলে কাহারও সঙ্গে একটি কথা না বলিয়া সে সটান গিয়া নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল। সে যেন হার মানিয়াছে, হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, অথবা দাঁতের ব্যথায় আবাব কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

মাধবীলতা সদানন্দের ঘরে ফিরিয়া গেল। তাহাব ব্যাখ্যা ও কৈফিয়ৎ বাকী আছে। সদানন্দ সাগ্রহ অভ্যর্থনা করিল, 'এসো মাধবী।'

কোথায় আসিবে মাধবী? কাছে? পাঁচ সাত হাত তফাৎ হইতে এমনভাবে ডাকিলে তাই অর্থ হয়। মহেশ চৌধুরী খানিক আগে টলিতে টলিতে সদানন্দের দিকে আগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, মাধবীলতা কাঁপিতে কাঁপিতে পায়ে পায়ে আগাইতে লাগিল, মহেশ চৌধুরীর মত দড়াম করিয়া পড়িয়া গেল না। কিন্তু কাছে যাওয়াবও তো একটা সীমা আছে? তাই হাতখানেক ব্যবধান থাকিতে মাধবীলতা থামিয়া পড়িল।

সদানন্দ হাত ধরিয়া তাকে পাশে বসাইয়া দিল। চিবুক ধরিয়া মুখখানা উঁচু কবিয়া বলিল, 'মাধবী, তুমি তো কম দুষ্টু মেয়ে নও!'

'ওঁর স্ত্রী যে মরে যাচ্ছিলেন।'

'তাহলে অবশ্য তুমি লক্ষ্মী মেয়ে।' সদানন্দ একমুখ হাসিল।

মাধবীলতা থামিয়া সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা সদানন্দকে জানাইয়া দিল, নিজের কাজের

কৈফিয়তে বলিল যে, সদানন্দ পাছে রাজী না হয় এই ভয়ে একেবারে মহেশ চৌধুরীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিল।

বলিয়া মাধবী হঠাৎ দাবী করিয়া বসিল সদানন্দের কৈফিয়ৎ, কাঁদ কাঁদ হইয়া বিনা ভূমিকায় সে প্রশ্ন করিয়া বসিল, 'কিন্তু আপনি ও কথা বললেন কেন মহেশবাবুকে?'

'আমি তো জানতাম না মাধবী এত কাণ্ড হয়ে গেছে। তুমি ডেকে এনেছ জানলে কি আর আমি রেগে উঠতাম?'

'না, তা নয়। আপনি মিছে কথা বললেন কেন? কেন বললেন আপনি সব জানতেন, ওকে পরীক্ষা করছেন?'

সদানন্দ বিব্রত হইয়া বলিলেন, 'ওটা কি জান মাধবী—'

কিন্তু মাধবী ওসব কথা কানে তোলে? আকুল হইয়া সে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল আর বলিতে লাগিল, 'কেন আপনি মিছে কথা বললেন! কেন বললেন!'

।। ছয় ।।

আকাশের মেঘ কাটিয়া গিয়া রোদ উঠিল, বিপিনের দাঁতের ব্যথা কমিয়া গেল, কিন্তু তার মুখের ব্যথিত ভাবটা যেন ক্ষুব্ধ বিষাদের মেকী ইস্পাতে গড়া মুখোশের মত হইয়া রহিল কায়েমী। রাগ হইলে বীররসের মধ্যে সেটা প্রকাশ করা বিপিনের অভ্যাস নয়। সদানন্দের মত যারা তার খুব বেশি অন্তরঙ্গ, তাদের কাছে কদাচিৎ তাকে রাগ করিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু সেও যেন কেমন এক খাপছাড়া ধরণের রাগ। রাগ বলিয়াই মনে হয় না। মনে হয়, ঠোঁট বাঁকাইয়া, মুখের চামড়া এখানে ওখানে কুঞ্চিত করিয়া, বাঁকা চোখে চাহিবার একটা আশ্চর্য কৌশল সে কোন এক সময় আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, আয়ত্ত রাখার জন্য রাগ করার সুযোগে প্র্যাক্‌টিস্ করিতেছে। এবার বিপিনের মুখ দেখিয়া সদানন্দও বুঝিতে পারিল সে রাগ করিযাছে, কিন্তু আগেকার রাগ করার ভঙ্গির সঙ্গে একেবারে মিল না থাকায় ভাবনায় পড়িয়া গেল।

'তোর কি হয়েছে রে বিপিন?'

'কিস্‌সু না! হবে আবার কি?'

বিপিনের কি হইয়াছে বোঝা গেল না, কিন্তু জবাবটা বোঝা গেল। বিপিন নিজেই জানে না তার কি হইয়াছে। এ রকম ব্যাপার সকলের জীবনে সর্বদাই ঘটিতেছে, নিজের কিছু একটা হয় কিন্তু নিজের কাছে সেটা দুর্বোধ্য থাকে, এমন কিছু গুরুতর ঘটা এটা নয়, সদানন্দ তা জানে। তবে নিজের কি হইয়াছে বুঝিবার চেষ্টাটা প্রচণ্ড অধ্যবসায়ে দাঁড়াইয়া গেলে তখন বিপদ, অধ্যবসায়টাই সাংঘাতিক গুরুত্ব পাইয়া বসে। এবং মাঝে মাঝে কম বেশি সময়ের জন্য এ রকম অধ্যবসায় মানুষের আসে বৈকি। বিপিনের কি তাই হইয়াছে?

'কি ভাবছিস ভাই?'

ভাই? সদানন্দের সম্বোধনে বিপিনের তো রীতিমত চমক লাগেই, মনেও হয় যে সে বুঝি তাকে গাল দিয়া বসিয়াছে। এমন সম্পর্ক তো তাদের নয় যে এমন গভীর স্নেহার্ত সুরে ভাই বলিতে হইবে, এতখানি আবেগময় আন্তরিকতার সঙ্গে? পরস্পরকে জানিয়া বুঝিয়া তাদের বন্ধুত্ব, পরস্পরের কাছে উলঙ্গ হইয়া দাঁড়াইতে যেমন তাদের লজ্জা করে না, মনের

দুর্বলতা আর বিকৃতি মেলিয়া ধরিতেও তেমনি ভয় বা সঙ্কোচ হয় না, অন্ততঃ কিছুকাল আগে তাই ছিল। এভাবে দরদ দেখানো তাদের মধ্যে চলিবে কেন? কি হইয়াছে সদানন্দের আজ, সাতদিন ঘরের কোণে কাটাইবার পর? বিপিন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়, সে দৃষ্টির বিশ্লেষণপটুতা অসাধারণ। বিপিন উসখুস করে, সেটা তার শারীরিক অস্বস্তিবোধের চরম প্রমাণ।

তখন দুপুরবেলা, ঘণ্টা দুই আগে দুজনেরই মধ্যাহ্নভোজন হইয়াছে। অনেক ভাবিয়া, অনেক দ্বিধা করিয়া, মনকে শান্ত করিবার জন্য সাতদিন ঘরের কোণে নিজেকে বন্দী করিয়া রাখিয়া মনকে আরও বেশি অশান্ত করিয়া, অতিরিক্ত জ্বালাবোধের জন্যই মাধবীলতা সম্পর্কে অত্যাশ্চর্য আত্মসংযমের মধ্যে নিজেকে সত্য সত্যই মহাপুরুষ করিয়া ফেলিবার চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। আজ সকালে হঠাৎ মাধবীলতাকে আজই রাত্রে ঘরে আনিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া বসিয়াছে। কে জানিত মাধবীলতাকে এমনভাবে সে নিমন্ত্রণ করিয়া বসিবে? সকালে নদীর ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে চোখে পড়িল স্নানরতা রত্নাবলী আর উমাকে, তাই মাধবীলতাকে খুঁজিতে সে জোরে জোরে হাঁটিতে আরম্ভ করিল আশ্রমের দিকে। মাধবীলতাকে দেখা গেল এক আমগাছের তলে। আশ্রমে যে গোয়ালা দুধ যোগায়, তার বৌ-এর সঙ্গে গল্প করিতেছে। গোয়ালা বৌ-এর কাঁখের শিশুটি প্রাণপণে স্তন চুষিতেছিল, দুধের কারবার করে বটে, গোয়ালা-বৌ নিজের বুকে যে তার সন্তানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দুধ জন্মে না, দেখিলেই সেটা বোঝা যায়।

সদানন্দকে দেখিয়া গোয়ালা-বৌ সরিয়া গিয়াছিল।

'রাত্রে একবার আমার ঘরে আসবে, মাধু?'

আদেশ নয়, অনুরোধ। মাধবীলতা নয়, মাধবী নয়, মাধু। পরে দুপুরবেলা বিপিনকে ভাই বলার ভূমিকার মত।

'রাত্রে? কখন?'

'যখন তোমার সুবিধা হয়।'

'সন্ধ্যেবেলা?'

'না, একটু রাত করে এসো। এই এগারোটা সাড়ে এগারটার সময়।' অনুরোধ নয়, আদেশ। এতক্ষণে মাধবীতলা বুঝিতে পারিয়াছিল, আহ্বানটা খাঁটি অভিসারেব, ধর্ষণের ফলে প্রেমের জন্ম হওয়ায় এতদিন যে পূর্বরাগের পালা চলিতেছিল, আজ তাব সমাধি।

'আজ নয়, পর্শু যাব।' একটা হাত বাড়াইয়া মাধবী আমগাছের গুঁড়িতে স্থাপন করিয়াছিল, যেখানে ছিল পিঁপড়াদের সারি বাঁধিয়া যাতায়াতের পথ।

'না, আজ।'

আদেশ নয়, প্রায় ধমক।

'আজ নয়, পর্শু।'

মিনতি নয়, মৃদু কোমল নিরুপায় বিদ্রোহ।

সদানন্দ তখন অন্ধ আর বোকা হইয়া গিয়াছে কিনা, তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া পাঁচ বছরের প্রিয়াকে লজেঞ্জসের লোভ দেখানোর মত কোমলকণ্ঠে বলিয়াছিল, 'তুমি কিছু বোঝ না মাধু। আজ ত্রয়োদশী, মেঘটেঘ না করলে চমৎকার জ্যোৎস্না উঠবে, জ্যোৎস্নায় বসে তোমার সঙ্গে গল্প করব। এসো কিন্তু।'

পরশু কি জ্যোৎস্না উঠিবে না? পরশু কি জ্যোৎস্নায় বসিয়া গল্প করা চলিবে না? কিন্তু

প্রতিবাদের যতটুকু শক্তি মাধবীর ছিল, এতক্ষণে প্রায় সবটুকুই শেষ হইয়া গিয়াছে। এবার যদি সদানন্দ রাগিয়া যায়? দুঃশাসন জানিয়াও যা বোঝে নাই, সদানন্দ কি না জানিয়া তা বুঝিবে! তবু মাধবী অন্যভাবে চেষ্টা করিয়াছিল।

'উমাশশী, কুন্দ, ওরা টের পাবে যে? একটা কেলেঙ্কারী হবে।'

'আমি সে ব্যবস্থা করব।'

সদানন্দ নিজেই যখন ব্যবস্থা করিবে তখন আর কার কি বলিবার থাকিতে পারে? একটিবার পশ্চিমে উঠিবার সাধ যদি সূর্যের থাকে, একমাত্র সদানন্দের হুকুমের সুযোগেই সাধটা মিটাইবার সম্ভাবনা কি তার সব চেয়ে বেশি নয়?

এইজন্য সদানন্দ আজ পেট ভরিয়া খাইতে পারে নাই। আহারে রুচি ছিল না। এখন সদানন্দের তাই ক্ষুধা পাইয়াছে। এদিকে দাঁতের ব্যথা না থাকায় কদিন প্রায় উপবাস করিয়া থাকিবার শোধ তুলিবার জন্যই বোধ হয় বিপিন এত বেশি খাইয়াছিল যে, এখন অম্বলে বুক জ্বলিতেছে। নিজেকে বিপিনের বড়ই ভোঁতা মনে হইতেছিল। সদানন্দের আদরের জবাবে সে তাই বলিল 'ভাবছি তোর মাথা।'

তারপর ঘরে আসিল মাধবী। ঘরে ঢুকিয়াই বিপিনকে সদানন্দের সঙ্গে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

সদানন্দ বলিল, 'কি মাধবী?'

'কিছু না, এমনি এসেছিলাম।' বলিয়া বোকার মত একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া মাধবী প্রায় চলিয়া যায়, সদানন্দ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তার কাছে গেল।

—'শোন মাধু, শোন।'

কাছে গিয়া গলা নামাইয়া বলিল, 'কিছু বলবে? চল, বাইরে যাই।'

দুজনে ঘরের বাইরে চলিয়া গেল, বিপিন ঘাড় বাঁকাইয়া বাঁকা চোখে চাহিয়া রহিল খোলা দরজার দিকে।

মাধবীলতা বাহিরে আসিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কথা বলে না।

সদানন্দ চিবুক ধরিয়া তার মুখখানা উঁচু করিয়া ধরে। এটা সদানন্দের যেন অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

'কি আর বলবে বল?'

কি আর বলিবে মাধবী, সেই পুরাতন কথা। আবার খানিকটা সাহস সঞ্চয় করিয়া আজ রাত্রির অভিসার পিছাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়াছে।

সদানন্দ জোর করিয়া মাধবীর মুখ উঁচু করিয়া রাখিয়াছিল, হঠাৎ হাত সরাইয়া দেওয়ায় মাধবীর চিবুক প্রায় কণ্ঠার সঙ্গে ঠেকিয়া গেল। কিন্তু সদানন্দের মন সত্যিই একটা চিন্তার সঙ্গে ঠোক্কর খাইযাছে। কেন যে হঠাৎ সদানন্দের মনে হইল বড় পাকা মেয়ে মাধবীলতা, বড় ঝানু, প্রায় বাজারের বেশ্যার মত। দেহটা যে বেশি-পাকা আমের মত কোমল আর রঙীন মাধবীর, আদর করিয়া তাহার দেহে হাত বুলানোর সময় আঙ্গুলগুলির যে পাখির পালকের মত কোমল হইয়া যাওয়া উচিত, সদানন্দ তা জানে। কিন্তু মাধবীর ভিতরটা শুধু শক্ত নয়, পাথর। বোঁটা-ছেঁড়া ফলের মত বছরের পর বছর ধরিয়া শুকাইয়া কুঁকড়াইয়া যাইতে পারিলে যেমন হইতে পারে, সেইরকম শক্ত, এই ধরণের একটা চিন্তা মনে আসায় সদানন্দের কাছে মাধবীর দেহটা পর্যন্ত রঙচটা কাঠের খেলনার মত কুৎসিত হইয়া গেল।

কিন্তু—

কথাটা মনে হইল মাধবীকে বিদায় দিয়া ঘরের মধ্যে বিপিনের কাছে চৌকিতে গিয়া বসিবার পর। আশ্রমে যে আসিয়াছিল কুমারী মাধবী? তাই তো?

ঠিক এই সময় সদানন্দ আর বিপিনের মধ্যে একটু কলহ হইয়া গেল। কত কলহ-বিবাদই আজ পর্যন্ত দুজনের মধ্যে হইয়াছে, কি তীব্র ঝাঁঝ সে সব ঝগড়ার, মনে হইয়াছে জীবনে বুঝি আর দুজনের মধ্যে মিল হইবে না, কেহ কাহারও মুখ পর্যন্ত দর্শন করিবে না। কিন্তু কখন আবার বিনা ভূমিকায় দুজনে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, নিজেদেরই তাদের খেয়াল থাকে নাই। আজিকার কলহটা একেবারেই সে রকম হইল না। দুজন পুরুষের মধ্যে, বিশেষতঃ বিপিন আর সদানন্দের মত দুজন পুরুষ বন্ধুর মধ্যে এত মৃদু, এতখানি ভদ্রতাসম্মত কলহ হইতে পারে, এতদিন কে তা ভাবিতে পারিত!

বিপিন বলিল, 'ওটাকে নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি করছিস সদা।'

সদানন্দ বলিল, 'তুই তো সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি দেখিস।'

বিপিন বলিল, 'ওকে আশ্রমে এনেছি আমি।'

সদানন্দ বলিল, 'তাই বলে ওর ওপরে তোর অধিকার জন্মেছে নাকি?'

বিপিন বলিল, 'অধিকারের কথা নয়। ওর ভালমন্দের একটা দায়িত্ব তো আমার আছে?'

সদানন্দ বলিল, 'অ! ভালমন্দের দায়িত্ব!'

তারপর বিপিন চলিয়া গেল নিজের ঘরে, সদানন্দ বসিযা বসিয়া দেখিতে লাগিল নদী। এ কি কলহ? এ তো নিছক কথোপকথন, অলস মধ্যাহ্নের স্বাভাবিক আলাপ। কিন্তু নিজের ঘরে বসিয়া বিপিনের উপর সদানন্দের আর সদানন্দের উপর বিপিনের রাগে গা যেন জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। একজন আরেকজনের কত অন্যায়, কত অবিচার, কত স্বার্থপরতা আজ পর্যন্ত সহিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আর সত্যিই সহ্য হয় না। একজন আরেকজনকে যেন একেবারে পাইয়া বসিয়াছে!

সে দিন রাত্রে সত্যিই জ্যোৎস্না উঠিল। আকাশে একেবারে যে মেঘ রহিল না তা নয়, বর্ষাকালের আকাশ তো। কিন্তু ছাড়া ছাড়া মেঘ আকাশে ভাসিয়া বেড়াইলেই তো জ্যোৎস্নার শোভা বাড়ে, অনেক দিনের বিশ্বাস এটা। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বিপিন বাহির হইয়া পড়িল, ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল আশ্রমের এক কুটীর হইতে অন্য কুটীরে। যে কোন সময় আশ্রম পরিদর্শনের অধিকার বিপিনের আছে। রাত্রিব অসংখ্য বিচিত্র শব্দ আছে, কত তুচ্ছ অদৃশ্য প্রাণী শুধু শব্দের মধ্যে প্রাণের পরিচয় ঘোষণা করিয়া চলে, তবু দিনের চেয়ে রাত্রিতে স্তব্ধতা গভীরতর। দিবারাত্রি আশ্রমকে ঘিবিয়া যে নিবিড় শান্তি বিরাজ করে, বাহিরের তপ্ত মানুষকে যা কুড়াইয়া দেয় চোখের নিমেষে, রাত্রে যেন সেই শান্তির ভাব আরও বেশি অপার্থিব হইয়া ওঠে। চোখ জুড়াইয়া যায় বিপিনের চারিদিকে চোখ বুলাইয়া, মন ভরিয়া যায় মন-জুড়ানো আনন্দে, কোন কোন রাত্রে নিজেকে ভুলিয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য স্বপ্ন পর্যন্ত যেন সে দেখিতে আরম্ভ করিয়া দেয়—অবাস্তব, অর্থহীন, কোমল, মধুর স্বপ্ন ; আদর্শের যে অবাধ্য, অপরিত্যাজ্য লেজুড়কে বিপিন ঘৃণাই করে চিরদিন।

আজ স্বপ্ন দেখা দূরে থাক, একটু গর্ব পর্যন্ত অনুভব করিল না। নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া আশ্রমের ছড়ানো কুটীর আর রহস্যময় ছায়ালোকবাসী নির্বাক নিশ্চল দৈত্যের মত ছোট বড় গাছগুলি দেখিয়া গভীর ক্ষোভের সঙ্গে তার শুধু মনে হইল কি অকৃতজ্ঞ সদানন্দ,

কি স্বার্থপর সদানন্দ, কি বিশ্বাসঘাতক সদানন্দ! নিজে রাজ্য সৃষ্টি করিয়া নিজেকে বিসর্জন দিয়া সদানন্দকে রাজা করিয়াছে যে, আজ সদানন্দ তাকেই হীন মতলববাজ মানুষ মনে করিয়া তুচ্ছ করে। অন্যমনে বিপিন এক কুটীরের অধিবাসীদের সঙ্গে দুটি একটি কথা বলিয়া অন্য কুটীরে চলিয়া যায়। কেহ শয়ন করিয়াছে, কেহ শয়নের আয়োজন করিতেছে, কেহ আসনে বসিয়া চিন্তাসাধনায় মগ্ন হইয়াছে, কেহ বারান্দায় বসিয়া করিতেছে মেঘের গতিতে চাঁদের গতিসৃষ্টির ভ্রান্তিকে উপভোগ।

উমা আর রত্নাবলীর কুটীরের সামনে আসিয়া বিপিনের অন্যমনস্কতা ঘুচিয়া গেল। বারান্দার নীচে দাঁড়াইয়া আছে শশধর, বারান্দায় থাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া তার সঙ্গে কথা বলিতেছে রত্নাবলী।

চিনিতে পারিয়াও বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কে?'

শশধর উৎসাহের সঙ্গে বলিল, 'আমায় চিনলেন না? সেই যে সেদিন—'

রত্নাবলী সোজাসুজি বলিল, 'উনি মহেশবাবুর ভাগ্নে।'

বিপিন বলিল, 'এত রাত্রে আপনি এখানে কি করছেন?'

বিপিনের গলার সুরে শশধরের উৎসাহ নিভিয়া গিয়াছিল, সে আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'মহেশবাবু বললেন কিনা—'

তার হইয়া রত্নাবলী কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিল, 'মহেশবাবুর খুব অসুখ, একশ চারে জ্বর উঠেছে ; মাধবীকে একবার দেখবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। শশধরবাবু তাই বলতে এসেছেন, মাধবী যদি একবার যায়'—

'এত রাত্রে! দিনের বেলা বলতে এলেই হত।'

বিপিনের আবির্ভাবেই রত্নাবলী যেন বিরক্ত হইয়াছিল, জেরা আরম্ভ করায় সে যেন রাগিয়া গেল, 'আপনি বুঝছেন না দিনের বেলা অতটা ব্যাকুল হন নি! এখন এতবেশী ছটফট করছেন যে, শশধরবাবু ভাবলেন, মাধবীকে যেতে বলে গেছেন, এ খবরটা জানালে হয়ত একটু শান্ত হবেন। তাই এখন বলতে এসেছেন। নইলে এত রাত্রে ওঁর আশ্রমে আসবার দরকার!'

এত কথা এক সঙ্গে রত্নাবলী কোনদিন বলে না। চাঁদের আলোতেও বোঝা যায়, রত্নাবলীর দাঁতগুলি কি ধবধবে। ব্যাপারটা বিপিনের একটু জটিল মনে হইতে লাগিল। মহেশ চৌধুরীর খুব অসুখ হইয়াছে, মাধবীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, শুধু এই ব্যাপারটুকুই কম জটিল নয়। জগতে এত লোক থাকিতে মাধবীলতাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা কেন? কতটুকুই বা তার পরিচয় মাধবীর সঙ্গে! মাধবীলতাকে কথাটা জানাইতে এত রাত্রে আশ্রমে আসিয়া রত্নাবলীর সঙ্গে শশধরের গল্প জুড়িয়া দেওয়াটাও জটিল ব্যাপার বৈকি। উমা আর মাধবীলতার অনুপস্থিতির ব্যাপারটা আরও বেশি জটিল।

জিজ্ঞাসা করায় রত্নাবলী বলিল, 'ওরা খাচ্ছে।'

'এখনও খাওয়া হয় নি কেন?'

রত্নাবলী মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়া ঝাঁঝালো গলায় বলিল, 'কারণ আছে, ওসব মেয়েদের ব্যাপার আপনি বুঝবেন না। পারি না বাপু আর আপনার কথার জবাব দিতে।'

মনে মনেও কোন রকমেই বিপিন রাগ করিতে পারিতেছিল না, আশ্রমের নিয়ম ভঙ্গ করা তার কাছে গুরুতর মনে হইতেছিল না। আশ্রমের নিয়মেই যেন এসব ঘটিতেছে, আগাগোড়া তার নিজেরও সমর্থন আছে। একটু ভাবিল বিপিন, তারপর কোনরকমে গলা গম্ভীর করিয়া বলিল, 'আপনি ভেতরে যান, রাত্রে কেউ কোন দরকারে আশ্রমে এলে এবার

থেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আর আপনি বাড়ি ফিরে যান শশধরবাবু, মহেশবাবুকে বলুন গিয়ে মাধবীকে সঙ্গে করে নিয়ে আমি যাচ্ছি।'

'আজ রাত্রেই যাবেন?'

'অসুখ-বিসুখের সময় কি দিন-রাত্রির বিচার করলে চলে? সময় বুঝে মানুষের অসুখ হয় না। বুড়ো মানুষ, এমন অসুখে পড়েছেন, তাঁর সামান্য একটা ইচ্ছা যদি আমরা না পূর্ণ করিতে পারি, আমাদের আশ্রমে থাকা কেন? নিজেরা সুখে থাকার জন্য আমরা আশ্রম-বাস করি না শশধরবাবু।'

শশধর অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বিপিন তাগিদ দিয়ে বলে, 'দাঁড়িয়ে থাকবেন না, আপনি যান। বলুন গিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা যাচ্ছি।'

শশধর চলিয়া গেলে রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করিল, 'এত দূর রাস্তা যাবেন কি করে? হেঁটে?'

'সে ভাবনা তো আপনাকে ভাবতে বলিনি? আপনাকে যা বললাম তাই করুন, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।'

রত্নাবলী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি সঙ্গে যাব না?'

বিপিন বলিল, 'না।'

এত রাত্রে বিপিন মাধবীলতাকে সঙ্গে করিয়া মহেশ চৌধুরীর বাড়ি যাইবে। মহেশ চৌধুরীর বাড়ি কাছে নয়, আশ্রম হইতে প্রায় চার মাইল পথ। বিপথে মাঠ-ঘাট বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়া গেলে পথ সংক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু এখন বর্ষাকালে দিনের বেলাও সে পথে যাতায়াত করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আশ্রম হইতে বাগবাদা যাইতে হইলে সাতুনার গা ঘেঁষিয়া যাইতে হইবে, সাতুনা বেশি দূরে নয়। সাতুনা পর্যন্ত যাওয়ার আগেই পথের ধারে ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকজন গৃহস্থের খানকয়েক বাড়ি আর ক্ষেতখামার পাওয়া যায়, তাদের কারও কারও গরুব গাড়ি আছে। বিপিন কি লোক পাঠাইয়া গরুর গাড়ি আনাইয়া লইবে? অথবা মাধবীকে সঙ্গে করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিয়া দিবে, পথে ওই ছোট পাহাড়টিতে হোক, সাতুনায় হোক, কারও কাছে সংগ্রহ করিয়া লইবে গরুর গাড়ি? গরুর গাড়ি না পাওয়া গেলে হাঁটিয়াই হাজির হইবে বাগবাদায় মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে? এই সব ভাবিতে ভাবিতে রত্নাবলীর সর্বাঙ্গে কাঁটা দেয়,—আকাশ ও পৃথিবীব্যাপী ক্ষান্তবর্ষার রাত্রি রত্নাবলীকে ঘিরিয়া আছে, নির্জন পথ বাহিয়া দুজন হাঁটিয়া চলিয়াছে ঘুমন্ত গ্রামের গা ঘেঁষিয়া, পথের খানিক খানিক ভিজা চাঁদের আলোয় ঢাকা আর খানিক খানিক বড় বড় গাছের ছায়ায় প্রায় অন্ধকার, কোথাও ঝোপ-ঝাড় পথের উপব ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, কোথাও দুদিকেই জলভরা ক্ষেত ঃ হাঁটিয়া চলিতে চলিতে দু'জন কখন উঠিযা বসিয়াছে গরুর গাড়িতে ছাউনির মধ্যে, গাড়ির দোলনে এদিক ওদিক টলিতে কখন তারা জড়াইয়া ধরিয়াছে পরস্পরকে, কখন শশধরের দুটি হাতের মত রত্নাবলীর সর্বাঙ্গে ব্যাকুল আগ্রহে খুঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে রত্নাবলীর সর্বাঙ্গের পরিচয়—একা বিপিনের সঙ্গে একাকিনী মাধবীর এত রাত্রে মহেশ চৌধুরীর বাড়ি যাওয়ার নানারকম অসুবিধা ও অসঙ্গতির কথা ভাবিতে ভাবিতে রত্নাবলীর গায়ে সত্যই কাঁটা দিয়া ওঠে! বিপিনের কি মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে? কাল মাধবীকে নিয়া গেলে চলিবে না মহেশ চৌধুরীর বাড়ি?

'কি ভাবছেন? খাওয়া হয়ে থাকলে মাধবীকে পাঠিয়ে দিন বাইরে।'

'আমিও যাই না আপনাদের সঙ্গে?'

বিপিন মাথা নাড়িয়া জোর দিয়া বলিল, 'না না, আপনাকে যেতে হবে না।

'আমি সঙ্গে না গেলে মাধু আপনার সঙ্গে যাবে না।'

'মাধু যাবে কি যাবে না, সেটা আপনার কাছে না শুনে মাধুর কাছেই না হয় শুনতাম?'

রত্নাবলী অধীর হইয়া বলিল, 'বুঝেও কি বুঝতে পারেন না আপনি? এত রাত্রে আপনার সঙ্গে মাধুকে আমি যেতে দেব না। যদি চেষ্টা করেন নিয়ে যাবার, হৈ-চৈ গণ্ডগোল বাধিয়ে দেব।'

বিপিনের যে প্রতিভা ক'দিন হইতে মায়ানিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল, রত্নাবলীর মুখে একথা শুনিবামাত্র সোনার কাঠির স্পর্শে ঘুমভাঙ্গার মত চোখের পলকে জাগিয়া উঠিল। সত্যই চোখের পলকে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পর্যন্ত পাওয়া গেল বিপিনের চোখেই। রত্নাবলী স্পষ্ট দেখিতে পাইল একবার কি দু'বার পলক পড়ার মধ্যে বিপিনের চোখ যেন জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল অন্ধকারে হিংস্র পশুর চোখের মত, তারপর হইয়া গেল জ্ঞানের ছানিপড়া বৃদ্ধের চোখের মত স্তিমিত।

'আপনাকে নিলে আর গোলমাল করবেন না?

'না। আমি সঙ্গে গেলে—'

'ডাকব নাকি সবাইকে?'

রত্নাবলী ভয় পাইয়া বলিল, 'সবাইকে ডাকবেন? সবাইকে ডাকবেন মানে? কেন ডাকবেন সবাইকে?'

বিপিন গম্ভীরমুখে বলিল, 'পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে যাওয়া কি ভাল নয়? আপনি এত সঙ্কোচ বোধ করছেন কেন, আপনি প্রথম নন, আপনার মত দু'একজন এ ভাবে আশ্রম ছেড়ে গিয়েছে।'

'আশ্রম ছেড়ে যাব?' এতক্ষণ রত্নাবলী দাঁড়াইয়াছিল, এবার দাওয়ায় উঠিবার ধাপটিতে বসিয়া পড়িল। বলিল, 'একটু বসি, পা ধরে গেছে। কি বলছেন আপনি বুঝতে পারছি না।'

কথাটা সত্য নয়। রত্নাবলী বেশ বুঝিতে পারিতেছিল সব। অনেকদিন আগে, দেড়বছর দু'বছরের কম হইবে না, সে তখন অল্পদিন হয় আশ্রমে বাস করিতে আসিয়াছে, বিপিন একদিন এমনিভাবে অসময়ে হঠাৎ সকলকে ডাকিয়াছিল। সীতা নামে একটি শিষ্যার আশ্রমে মন টিকিতেছে না, সে চলিয়া যাইবে, সকলের কাছে বিদায় চাহিতেছে। সে দৃশ্য রত্নাবলীর মনে গাঁথা হইয়া আছে। কুটীরের সামনে মাটিতে বসানো দু'টি লণ্ঠনের আলো সকলের মুখে পড়িয়াছে, কারও মুখে বেশি কারও কম। সকলে নির্বাক—পাথরের মূর্তির মত নির্বাক। এখনকার চেয়ে শিষ্য ও শিষ্যার সংখ্যা তখন কম ছিল আশ্রমে।

সীতা কাঁদিতেছিল। দাওয়ায় বসিয়া মুখ নীচু করিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল। কয়েকদিন আগে স্বামীকে বিপিন আশ্রমেরই কি একটা কাজে দূরদেশে পাঠাইয়াছে, তিন চার দিন পরে সে ফিরিয়া আসিবে। কল্যাণী নামে আশ্রমের একটি মেয়েকে বিপিন সেই ক'টা দিন সীতার সঙ্গে তার কুটীরে থাকিতে বলিয়া দিয়াছিল। বছর বার বয়স ছিল কল্যাণীর আর ছিল কাঠির মত সরু চেহারা। একটু তফাতে দাওয়ার একটা খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া সে ভয়ার্ত চোখে চাহিয়া ছিল। সীতার মুখের চেয়ে কল্যাণীর সেই দৃষ্টিই রত্নাবলীর বেশি স্পষ্টভাবে মনে আছে।

সকলেই জানিত, একঘণ্টা আগে কল্যাণীর বাবাকে অবিলম্বে আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার নোটিশ দেওয়া হইয়াছে এবং সে গরুর গাড়ি আনিতে গিয়াছে। কল্যাণীর বাবার মত রূপবান পুরুষ রত্নাবলী কখনও দেখে নাই। শান্তির খোঁজে ভদ্রলোক সদানন্দের আশ্রমে

আসিয়াছিল, কিন্তু একটু স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ হওয়ায় বিপিনের সঙ্গে ক্রমাগত খিটিমিটি বাধিয়া অশান্তির সৃষ্টি হইতেছিল। মানুষটাকে সকলেই পছন্দ করিত, মেয়েকে সঙ্গে করিয়া আবার সংসারে ফিরিয়া যাইতেছে জানিয়া সকলের দুঃখও হইয়াছিল, কিন্তু ঘটনার সীতা-সংক্রান্ত আকস্মিক পরিণতিতে সকলে থতমত খাইয়া গিয়াছিল।

তারপর বিপিন সীতাকে বলিয়াছিল, 'আপনি তবে তৈরি হয়ে নিন।'

তখন সীতা বলিয়াছিল, 'আমি যাব না।—উনি না ফিরে এলে এক পা নড়ব না আমি এখান থেকে।'

বিপিন যেন স্তম্ভিত হইয়া বলিয়াছিল, 'সে কি!'

সীতা প্রায় আর্তনাদ করিয়া বলিয়াছিল, 'উনি নেই, এভাবে আপনারা আমায় তাড়িয়ে দিতে পারেন না।'

বিপিন গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিল, 'আপনাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে কে?'

কল্যাণীর বাবা গরুর গাড়ি আনিয়া মেয়েকে সঙ্গে করিয়া বিদায় হইয়া গিয়াছিল, সীতা কয়েকটা দিন আশ্রমে ছিল। সীতার স্বামী কিন্তু আর আশ্রমে ফিরিয়া আসে নাই। বিপিন কি তাকে আশ্রমের কাজে বাহিরে পাঠাইয়াছিল? বাহিরে থাকিতে আশ্রমের কোন কথা কানে যাওয়ায় আর সে ফিরিয়া আসে নাই? অথবা নিজেই সে আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল? এই সব ছিল তখন সকলের জিজ্ঞাস্য। এখনও এসব জিজ্ঞাসাই রহিয়া গিয়াছে। কয়েকদিন স্বামীর প্রতীক্ষা করিয়া সীতাও যেন আশ্রম হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল।

বিপিন রত্নাবলীকে লক্ষ্য করিতেছিল। আশ্রমের নিয়ম তো আছেই, তাছাড়া রত্নাবলী নিজেও অত্যন্ত সাবধান, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না, রত্নাবলীর দেহটাই বড় বেহায়া। দেখিতে দেখিতে বিপিনের মনে হয় কি, এর কাছে কোথায় লাগে মাধবীলতা, নদীর কাছে কাঁথার মত? তবু মাধবীলতার আকর্ষণ কত বেশি। রত্নাবলীকে এতকাল সে কি দেখিয়াও কোনদিন চাহিয়া দেখিয়াছে? কুটীরে হোক, নদীর ঘাটে হোক, রত্নাবলী দৃষ্টিপথে পড়িলে তাকে না দেখিয়া অবশ্য থাকা কঠিন, অন্ততঃ তাড়াতাড়ি সরিয়া যাওয়ার আগে,—মেয়েদের দিকে তাকানো উচিত নয়, মনের এই ছুতাতেও অন্ততঃ—একটিবার রত্নাবলীকে দেখিতেই হয়, কিন্তু সে দেখা ওই দেখা পর্যন্তই। রত্নাবলী আকর্ষণ করে না, কেবল মনটা বিচলিত করিয়া দেয় কিছুক্ষণের জন্য। মাধবীলতা ও রত্নাবলীর তুলনামূলক সমালোচনাটা বিপিন আগেও যে কোনদিন করিতে পারিত, কিন্তু এই মুহূর্তের আগে কথাটা যেন তার খেয়ালই হয় নাই। কথাটা মনে পড়িয়া সে একটু আশ্চর্য হইয়া যায়। সে জানে এখন তাকে এই দাওয়ায় বসাইয়া কুটীরের সামনে খোলা জায়গায় জ্যোৎস্নালোকে মাধবী আর রত্নাবলী যদি পরস্পরের কিছু তফাতে দাঁড়ায়, যাতে এক একটি চোখের কোণে সে এক একজনকে আশ্রমের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া জ্যোৎস্নার আবরণ অঙ্গে চাপানোর প্রক্রিয়ায় ব্যাপৃতা দেখিতে পায়, দুটি চোখই তার অপলক হইয়া থাকিবে রত্নাবলীর দিকে কিন্তু মন তার পড়িয়া থাকিবে মাধবীলতার কাছে। অভদ্র কল্পনাটি বিপিনের রোমাঞ্চকর মনে হয়। বিপিনের নিজেরই একটা ধারণা ছিল যে, মোটামুটি হিসাবে বছর ত্রিশেক বয়স হইবার পর মানুষের আর এ ধরণের কল্পনা ভাল লাগে না, ছেলেমানুষী মনে হয়, হাসি পায়—রাজাসাহেবের বাড়িতে দেয়ালে টাঙ্গানো কয়েকটি নগ্না নারীর প্রকাশ্য চিত্র দেখিয়া বিপিন ওই ধারণাটি সৃষ্টি করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল যে, এই ছবিগুলির দিকে কেউ তাকাইয়া দ্যাখে না, দেখিয়া দেখিয়া আর কারও কিছুমাত্র কৌতূহল নাই, রক্ত-মাংসের স্ত্রীলোকের বেলাও মানুষের তাই হয়, প্রথম বয়সটা কাটিয়া যাওয়ার পর

নারীদেহ সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল মিটিয়া যায়। প্রথম বয়স বিপিনের বহুকাল কাটিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় বয়সটাও প্রায় কাটিতে চলিল, তবু রত্নাবলী ও মাধবীলতা সম্বন্ধে ছেলেমানুষী কল্পনা করিতে তার ভাল লাগিতেছে কেন, এটা অবশ্য বিপিন ভাবিয়া দেখিল না। রত্নাবলীর পাশে বসিয়া সে হঠাৎ একটা খাপছাড়া কাজ করিয়া ফেলিল—এত জোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, বলিবার নয়। রত্নাবলী আরও ভয় পাইয়া গেল। পাশে বসে কেন বিপিন? দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কেন বিপিন? অমন করিয়া তাকায় কেন বিপিন জ্ঞানী বৃদ্ধের মত?

'আমি বড় ছেলেমানুষ রতন দেবী।'

গা ঘেঁষিয়া বিপিন বসিয়াছে। বিপিন যদি এবার গায়ে হাত দেয়? যদি জড়াইয়া ধরে? পুরুষ সব সময়ই সংযত থাকিতে পারে, কিন্তু পুরুষমানুষের সংযম শুধু অন্যমনস্কতা, হয় তো পাঁচ সাত বছর কোন মেয়ের কথা মনেও পড়িল না, কিন্তু তার পাশে গা ঘেঁষিয়া বসিবার পর পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে হয়তো এমন পাগলামি করিয়া বসিল যার তুলনা হয় না। বিপিনের কিছু হইবে না, বিপদে পড়িবে সে। সে যদি গোলমাল করে, সকলে যদি বুঝিতেও পারে যে দোষ আগাগোড়া বিপিনের, তবু বিপিনেব এতটুকু আসিয়া যাইবে না, মারা পড়িবে সে-ই।

'উমা-মাসী আসছে বোধ হয়।'

সহজভাবে স্বাভাবিককণ্ঠে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াও কোন লাভ হইল না, রত্নাবলীর নিজের কানেই কথাগুলি শুনাইল যেন সে চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ করিয়া প্রণয়ীকে সতর্ক করিয়া দিতেছে।

বিপিন একটু হাসিল। 'আসুন না, সকলেই তো আসবেন।'

'সকলে আসবেন কেন! ও-কথা বলছেন কেন আপনি!'

কাঁদিয়' ফেলিবার উপক্রম করিবে কি না, মনে মনে রত্নাবলী তাই ভাবিতেছিল, গলাটা তাই কাঁদ' কাঁদ' শোনাইল। মেয়েদের প্রকৃতিই এই রকম—একটা কিছু করিবে কি করিবে না ভাবিতে ভাবিতে কাজটা অর্ধেক করিয়া ফেলে। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্যই আজ পর্যন্ত কোন মেয়ে নিজেকে দান করার আগে ঠিক করিয়া ফেলিতে পারে নাই আত্মদান করিবে কি না।

[লেখকের মন্তব্য ঃ কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল। কিন্তু উপায় নাই, রত্নাবলীকে বুঝিতে হইলে, কথাটা মনে রাখা দরকার। কোন বিষয়ে আগে হইতে মন স্থির করিয়া ফেলিবার ক্ষমতাটাই মনের জোরের চরম প্রমাণ হিসাবে প্রায় সকলকেই গণ্য করিয়া থাকে, আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওটা গোঁয়ার্তুমিরই রকমফের। ধরা বাঁধা নিয়মগুলি জীবনে কাজে লাগে না, ধরা বাঁধা নিয়ম কি জীবনে বেশি আছে? যেগুলিকে অপরিবর্তনীয় নিয়ম বলিয়া মনে হয়, আসলে সেগুলি মানুষের আরোপ করা বিশেষণ মাত্র, উল্টাটাও অনায়াসে খাটিতে পারিত। মানুষ কি চায়, মানুষ কি করে এবং মানুষের কি চাওয়া উচিত আর মানুষের কি করা উচিত, এর কোন নির্দিষ্ট ফরমূলা আছে? অন্যের প্রস্তুত করা ফরমূলা চোখ কান বুঁজিয়া অনুকরণ করা হয় বোকামি নয় গোঁয়ার্তুমি। মেয়ে এবং পুরুষের মধ্যে যারা সুবিধাবাদী, তারা বোকাও নয় গোঁয়ারও নয়। এই জন্য তারা আগে হিসাব-নিকাশ শেষ করিয়া চরম সিদ্ধান্ত করিতে পারে না, দরকারমত কাজ আরম্ভ করে কিন্তু মন সিদ্ধান্তের বাঁধনে বাঁধা পড়তে চায় না। শশধরের বাহুর বাঁধন রত্নাবলী মানিয়া লইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তখনও সে কি স্বীকার করিবে নারীজন্ম তার সফল হইল অথবা মস্ত একটা ভুল সে করিয়া বসিয়াছে ঝোঁকের

মাথায়? দেহ অবশ্য তার অবশ হইয়া যাইবে, চোখ মেলিয়া চাহিবার ক্ষমতাও হয় তো থাকিবে না, মনে প্রায় এই ধরণের একটা চরম সিদ্ধান্ত সমস্ত চিন্তাকে দখল করিতে চাহিবে, যে জীবনের তার অতীতও ছিল না, ভবিষ্যৎও থাকিবে না, তবু সে তখনও ভাবিতে থাকিবে যে, শশধর যদি তাকে কামনা করে, নিজেকে সে কি তখন দান করিবে? নিজেকে দান করা কি উচিত হইবে তার?

আপনারা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, রত্নাবলীর এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্টের অভিব্যক্তিটা একটু অসাধারণ। সে যেন ইচ্ছা করিয়া নিজেকে ধাঁধায় ফেলিয়া দেয়। সে যেন সব সময় সচেতন হইয়া থাকে যে, কি করিবে না করিবে, ঠিক সে করিয়া উঠিতে পারিতেছে না এবং তাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না।]

বিপিন আবার মৃদু একটু হাসিয়া বলিল, 'আপনি বড় ছেলেমানুষ।' বলিয়া নিছক বাহাদুরি করার জন্যই গম্ভীরমুখে হাত বাড়াইয়া রত্নাবলীর গালটা টিপিয়া দিল। রত্নাবলী মাথায় ঝাঁকি দিল, আধহাত সরিয়া বসিল এবং ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—আর কিছুই করিল না। একটু অপেক্ষা করিয়া রত্নাবলীর নিশ্চেষ্ট শান্তভাবে খুশি হইয়া বিপিন বলিল, 'মাধুকে নিয়ে যাচ্ছি, মহেশবাবুর বাড়িতে রেখে আসবো বলে। এখন কয়েকদিন ওইখানেই থাকবে, তারপর যেখানকার মানুষ সেখানেই ফিরে যাবে। ওর পক্ষে আশ্রমে থাকাও চলবে না, আমাদেরও ওকে রাখা চলবে না। আপনি বলছেন, আপনি সঙ্গে না গেলে ওকে আপনি যেতেই দেবেন না, আমি তাই ভাবলাম আপনিও বুঝি চিরদিনের মত ওর সঙ্গে আশ্রম ত্যাগ করে চলে যেতে চাইছেন। তাই সকলকে ডাকার কথা বলছিলাম। আপনি তো মাধবীর মত চুপি চুপি আশ্রমে আসেন নি, আপনি কেন চুপি চুপি আশ্রম ছেড়ে চলে যাবেন—যেতে হলে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই যাবেন।'

বলিয়া বিপিন হাসিতে লাগিল।

গাল টিপিয়া দেওয়ায় রত্নাবলী আধ হাত তফাতে সরিয়া গিয়াছিল, এবার প্রায় হাতখানেক কাছে আসিয়া চাপা গলায় বলিল, 'মাধু চলে যাচ্ছে আশ্রম থেকে?'

সায় দিবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়িতে যাওয়ায় বিপিনের মুখ প্রায় রত্নাবলীর মুখে ঠেকিয়া গেল। তা হোক, তাতে দোষ নাই, গোপন কথার আদান-প্রদানের সময় মানুষের মুখ কাছাকাছিই আসে। ভিতরের কৌতূহল রত্নাবলীর চোখ দুটিকে যেন সত্যসত্যই খানিকটা বাহিরের দিকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়াছে। তেমনি চাপা গলায় সে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি করেছে মাধু? কার সঙ্গে করেছে?'

'কি করবে? কার সঙ্গে করবে? ও তো আশ্রমে চিরকাল থাকবার জন্য আসেনি —ক'দিন বেড়িয়ে গেল, এই মাত্র।'

'আমার কাছে লুকোন কেন? বলুন না? পায়ে পড়ি, বলুন।'

'কি বলব?'

রত্নাবলী হতাশ হইয়া গেল। অভিমানে সরিয়া বসিল। কি করিয়াছে মাধবী? আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে, এমন কি অপরাধ মেয়েটা করিযাছে! এতকাল সঙ্গে থাকিয়াও জানিতে পারিল না! জিজ্ঞাসা করিতে হইবে তো মাধবীকে, মাধবী চলিয়া যাওয়ার আগে!

'বসুন, ডেকে দিচ্ছি মাধবীকে।'

'আপনি বসুন, আমিই ডেকে আনছি।'

ডাক শুনিয়া মাধবীর মুখ পাংশু হইয়া গেল। বিপিনকে দিয়া সদানন্দ তাকে ডাকিয়া

পাঠাইয়াছে।

'এখুনি যেতে হবে আপনার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, এখুনি যেতে হবে।'

'চলুন তবে, যাই।'

যাওয়ার সময় দাওয়ায় বসিয়া রত্নাবলী ক্ষীণস্বরে একবার মাধবীলতাকে ডাকিল। মাধবী সাড়া দিল না। ছুটিয়া গিয়া উন্মাদিনীর মত সদানন্দের গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া তাকে খুন করিয়া ফেলিবার জন্য তার ধৈর্য ধরিতেছিল না। বিপিনকে দিয়া সদানন্দ তাকে ডাকিয়া পাঠায়! সে এত সস্তা, মানুষের কাছে তার মর্যাদা এত কম যে, প্রকাশ্যভাবে বিপিনকে দিয়া সদানন্দ তাকে অভিসারে যাওয়ার হুকুম পাঠাইয়া দিতে পারে এমন অনায়াসে।

বিপিন আশ্চর্য হইয়া বলে, 'ওদিকে কোথায় চলেছ?'

মাধবীলতা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'ফপরদালালি করবেন না—আমি পথ চিনি।'

'শোনো, শোনো। দাঁড়াও।'

পিছনে পিছনে খানিকটা প্রায় ছুটিয়া গিয়া মাধবীলতার হাত ধরিয়া বিপিন তাকে দাঁড় করায়। মাধবী বলে, 'ও! আপনি বুঝি পাওনা মিটিয়ে নেবেন আগে? শীগগির নিন, একটু তো ঘুমোতে হবে রাত্রে?'

বিপিন কোমলকণ্ঠে বলে, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে মাধু? কি বকছ পাগলের মত?'

মাধবীলতাও কোমলকণ্ঠে বলে, 'মাথা খারাপ হবে না? যা আরম্ভ করে দিয়েছেন আপনারা, এতে মাথা ঠিক থাকে মানুষের? এর চেয়ে কুমারসায়েবের মিস্‌ট্রেস্ হওয়াই আমার ভাল ছিল, কিছুদিন তো মজা করে নিতাম।'

এখানটা ফাঁকা, কাছাকাছি দু'একটি মোটে গাছ আছে। এদিকে এলোমেলোভাবে ছড়ানো আশ্রমের কুটীরগুলির কয়েকটি মাত্র চোখে পড়ে, আর এদিকে চোখে পড়ে সদানন্দের কুটীর। জ্যোৎস্নালোকে কুটীর ও আবেষ্টনীর মধ্যে ফাঁকা মাঠে মাধবীলতার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে বিপিনের মনে হয়, আঙ্গুলগুলি যদি তার পাখির পালকের মত কোমল হইয়া না যায়, আর সে যদি মেয়েটার সর্বাঙ্গে সস্নেহে আঙ্গুল বুলাইয়া না দেয়, পৃথিবীটাই রসাতলে চলিয়া যাইবে! অকারণে নিজেকে এই মেয়েটার জন্য মহাশূন্যে বিলীন করিয়া দিবার কোনও একটা কারণ কি আবিষ্কার করা যায় না? অসহ্য কোন যন্ত্রণা সহ্য করা যায় না এই মেয়েটার জন্য? অসম্ভব কোন কার্য সম্ভব করা চলে না? ভাবিতে ভাবিতে মাধবীলতার মাথাটি বুকে চাপিয়া ধরিয়া বিপিন মৃদুস্বরে বলে, 'মাধু, কে তোমার ওপর অত্যাচার করছে বল, কাল তাকে আশ্রম থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেব। এ আশ্রম আমার, দলিলপত্রে আমার নাম আছে, আমার কথার ওপর কারও কথা কইবার অধিকার নেই। কে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছে, একবার তার নামটি শুধু তুমি বল।'

কি উগ্র উদারতা বিপিনের! এদিকে চাপিয়া ধরিয়া মাধবীর মাথাটা নিজের বুকে, মুখে তাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে কে অত্যাচার করিয়াছে তার উপর, কে কষ্ট দিয়াছে তার মনে? একটু কাঁদে মাধবীলতা, একটু ফোঁস ফোঁস করে। বিপিন ব্যাকুল হইয়া বলে, কেন কাঁদছ মাধু? কেঁদো না। বল না তুমি কি চাও? অন্য কোথাও চলে যাবে?'

'কোথায় যাব? কার কাছে যাব?'

'যেখানে যেতে চাও, পাঠিয়ে দেব। নিজে আমি তোমার নামে বাড়ি কিনে দেব, ব্যাঙ্কে তোমার নামে টাকা জমা রেখে দেব,—'

'আপনার মিস্ট্রেস হয়ে থাকতে হবে তো?'

বিপিন একটু ভাবিল। হাতের আঙ্গুল পাখির পালক নয় বলিয়া আপসোস করার সময় সদানন্দ যেমন ভুলিতে পারিতেছিল না যে, মাধবীলতার ঠোঁটের নীচে দাঁত আছে, আর আঙ্গুলের ডগায় নখ আছে আর রক্ত মাংসের তলায় হাড় আছে, বিপিন তেমনি এখন কেবলি ভুলিবার চেষ্টা করিতেছিল যে, মাধবীলতা যাকে হাতের কাছে পায়, তাকেই আঁকড়াইয়া ধরে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া বিপিন তারপর জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কি বল?'

মাধবীলতা চুপ। বিপিন সত্যই মানুষ নয়।

'যাকগে, ওসব কথা পরে হবে। এখন চলো, তোমাকে মহেশবাবুর ওখানে রেখে আসি।'

'মহেশবাবুর ওখানে?'

'হ্যাঁ। এখানে তোমার থাকা চলবে না।'

মাধবীলতা কাঁদিতে কাঁদিতে বিপিনের সঙ্গে নদীর ঘাটে গিয়া নৌকাটিতে উঠিয়া বসিল। ছোট ডিঙ্গি নৌকা, ছাউনি নাই, হাল নাই, বসিবার ভাল ব্যবস্থাও নাই। তবু পায়ে হাঁটিয়া যাওয়ার চেয়ে নৌকায় মহেশ চৌধুরীর বাড়ি যাওয়া অনেক সুবিধা। বিপিন নৌকা বাহিতে জানে।

।। সাত ।।

কয়েকদিন জ্বরে ভুগিয়া মহেশ চৌধুরী সারিয়া উঠিলেন। এ কয়দিন কত লোক আসিয়া যে তার খবর জানিয়া গেল, হিসাব হয় না। কেবল খবর জানা নয়, পায়ের ধুলা চাই। সদানন্দের আশ্রম জয় করিয়া আসিযা মহেশ চৌধুরীও পর্যায়ে উঠিয়া গিয়াছেন। লোকের ভিড়েই মহেশ চৌধুরীর প্রাণ বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, মাধবীলতাকে পৌঁছিয়া দিতে আসিয়া কথায় কথায় এই বিপদের কথাটা শুনিয়া বিপিন ভাল পরামর্শ দিয়া গেল। পরদিন হইতে শশধর সকলকে একটি করিয়া তুলসীপাতা বিতরণ করিয়া দিতে লাগিল—উঠানের মস্ত তুলসী গাছটি দেখিতে দেখিতে দু'একদিনের মধ্যে হইয়া গেল প্রায় ন্যাড়া। যারা আসে, তাদের প্রায় সকলেই চাষী-মজুর-কামার-কুমোর শ্রেণীর এবং বেশির ভাগই স্ত্রীলোক—তুলসীপাতা পাইয়াই তারা কৃতার্থ হইয়া যাইতে লাগিল।

বিপিন প্রত্যেক দিন খবর জানিতে আসে। কার খবর জানিতে আসে, মহেশের অথবা মাধবীলতার সেটা অবশ্য ঠিক বুঝা যায় না। যদিও মহেশের কাছেই সে বসিয়া থাকে অনেকক্ষণ, আলাপ করে নানা বিষয়ে। আশ্রমে বিপিনের কাছে মহেশ বহুদিন ধরিয়া যে অবহেলা অপমান পাইয়া আসিতেছে, সে কথা কেউ ভুলিতে পারিতেছিল না, এখন মহেশের খাতির দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গিয়াছে। আশ্রমের কদমগাছের নীচেই কি মহেশের সব লাঞ্ছনার সমাপ্তি ঘটিয়াছে? সদানন্দ কি সত্যই এতকাল মহেশকে পরীক্ষা করিতেছিলেন, বিপিন এবং আশ্রমের অন্যান্য সকলে তারই ইঙ্গিতে মহেশের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিতেছিল? পরীক্ষায় মহেশ সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ায় এবার বিপিন বাড়ি আসিয়া তার সঙ্গে ভাব করিয়া যাইতেছে, সেবার জন্য মাধবীলতাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছে?

বিপিন আসে, নানা বিষয়ে আলোচনা করে, আর মহেশ চৌধুরীর ভক্তদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দ্যাখে। কয়েকদিন পরে মহেশ চৌধুরীর আশীর্বাদ-প্রার্থীদের সংখ্যাও কমিয়া যাইতে থাকে, বিপিনের উৎসাহেও যেন ভাঁটা পড়িয়া যায়। প্রতিদিন আর তাকে বাগবাদায় দেখা যায় না। আসিলেও মহেশের কাছে সে বেশিক্ষণ বসে না।

মহেশ ব্যাকুলভাবে মাধবীলতাকে জিজ্ঞাসা করে, 'বিপিনবাবু যে আর আসেন না মা?'

মাধবীলতা বলে, 'কাজের মানুষ, নানা হাঙ্গামায় আছেন, সময় পান না।'

'বড় ভাল লোক। কি বুদ্ধি, কি কর্মশক্তি, কি তেজ, কি উৎসাহ—সবরকম গুণ আছে ভদ্রলোকের। এমন একটা মানুষের মত মানুষ, জানো মা, আমি আর দেখিনি।'

বিপিনের এরকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া মাধবীলতা হাসিবে না কাঁদিবে, ভাবিয়া পায় না। বুদ্ধি হয় তো আছে, কিন্তু বুদ্ধি থাকিলেই কি লোক ভাল হয় নাকি? ওই স্তিমিত নিস্তেজ মানুষটার কর্মশক্তি, তেজ আর উৎসাহ!—যার মুখের চিরস্থায়ী বিষাদের ছাপ সংক্রামিত হইয়া মানুষের মনে বৈরাগ্য জাগে?

এখানে মাধবীলতার ভাল লাগে না। মহেশ যে ক'দিন দক্ষিণের ভিটার ঘরটিকে দেড়শো বছরের পুরানো খাটে শুইয়া জ্বরের ধুঁকিতে ধুঁকিতে থাকিয়া থাকিয়া বলিল, 'ওরা আমার কাছে আসছে কেন? প্রভুর কাছে পাঠিয়ে দাও ওদের', সে ক'দিন সেবার হাঙ্গামায় একরকম কাটিয়া গিয়াছিল, মহেশ সুস্থ হইয়া উঠিবার পর মাধবীলতার সব একঘেয়ে লাগে। গ্রামের মেয়েরা দু'চার জন করিয়া সকলেই প্রায় মাধবীলতাকে দেখিযা গিয়াছে। পাড়ার কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু এদের মাধবীলতার ভাল লাগে না। তাই নিজেও সে এদের কাউকে কাছে টানিবার চেষ্টা করে নাই, নিজে হইতে তার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া ভাব জানাইবার ভরসাও এদের হয় নাই। বেড়াইতে আসিয়া অভদ্র বিস্ময়ের সঙ্গে এরা মাধবীলতাকে শুধু দেখিয়াই যায়। আশ্রমবাসিনী কুমারী সন্ন্যাসী (বয়স কত হইয়াছে ভগবান জানেন) সাধারণ বেশে আশ্রম ছাড়িয়া আসিয়া মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে বাস করিতেছে, গাঁয়ের মেয়েদের কাছে সে কতকটা স্বর্গচ্যুতা অপ্সরী কিন্নরীর মত রহস্যময়ী জীব।

এখানে মানুষ নাই, বৈচিত্র্য নাই। স্নেহমমতা আদরযত্ন আছে, বিভূতির মা মেয়ের মতই মাধবীলতাকে আপন করিয়া ফেলিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু কেবল মেয়ের মত সব সময় একজনের আপন হইতে কি মানুষের ভাল লাগে? আশ্রমের জীবনের পর কেমন নীরস একঘেয়ে মনে হয়। আশ্রম নির্জন, কিন্তু সে অনেক নরনারীর নির্জনতা, আশ্রমের নিয়মে বাঁধা জীবন শান্ত, কিন্তু সে নিয়মও অসাধারণ, সে শান্তিও অসামান্য। কি যেন ঘটিবার অপেক্ষায় গাছপালায় ঘেরা আশ্রমের ছোট ছোট কুটীরগুলিতে প্রতি মুহূর্তে উন্মুখ হইয়া থাকা যায়—মনে হয়, এই বুঝি আশ্রমের গাম্ভীর্যপূর্ণ শান্তভাবে চুরমার করিয়া প্রচণ্ড একটা অবরুদ্ধ শক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিবে, এমন একটা কাণ্ড ঘটিবে যা দেখিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া হাত-তালি দিয়া নাচা যায়। এখানে কোনদিন কোন কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

বিপিনকে মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করে, 'উনি কি বললেন?'

'কিছু বলেন নি।'

'কিছুই না? একেবারে কিছু না?'

বিপিন মাথা নাড়িয়া বলে, 'কি বলবে? বলবার ক্ষমতা থাকলে তো বলবে। কি কুক্ষণে

যে ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল মাধু।'

মাধবী ভয় ও বিস্ময়ে চুপ করিয়া থাকে। তার জন্য বিপিন আর সদানন্দের মনান্তর হইয়া গেল? জানালা দিয়া গ্রামের পথ দেখা যায়, বর্ষায় একেবারে শেষ করিয়া দিয়া গিয়াছে, এখনও ভালরকম মেরামত হয় নাই। পথের ধারে অবনী সমাদ্দারের বাড়ির সামনে একটি গরু বাঁধা আছে। রোজই বাঁধা থাকে, ঘাসপাতা খায় আর কয়েকদিনের বাছুরটির গা চাটে। আজ বাছুরটি যেন কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য না? মাধবীলতা যেদিন যে-সময় কথা পাড়িল সে চলিয়া আসায় সদানন্দের কি অবস্থা হইয়াছে, সেইদিন সেই সময় বাছুরটি উধাও হইয়া গিয়া গাভীটিকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে!

'আশ্রমের কিসে উন্নতি হবে, সে চিন্তা ওর নেই, দিনরাত নিজের কথাই ভাবছে। আমার এটা হল না, আমার ওটা হল না, আমার এটা চাই, আমার ওটা চাই। ওকে নিয়ে সত্যি মুস্কিলে পড়েছি মাধু।'

'কেন, উনি বেশ লোক।'

মাধবীলতার মুখে একথা শুনিয়া বিপিন প্রায় চমকাইয়া যায়। নৌকায় উঠিবার আগে রাগের মাথায় সদানন্দের কুটীরের দিকে পা বাড়াইয়া, স্টেজে সরলা কোমলা বনবালার অভিনয় করিয়া করিয়া হয়রান হইয়া গরম মেজাজে সাজঘরে ফিরিয়া আসা বেশ্যার মত ফুঁসিতে ফুঁসিতে মাধবীলতা যেসব কথা বলিয়াছিল, বিপিন তার একটি শব্দও ভোলে নাই। জ্যোৎস্নালোকে দেখা মুখভঙ্গিও ভোলে নাই মাধবীলতার। সদানন্দের অত্যাচার মেয়েটার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তার চোখের আড়ালে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করিবার সুযোগ সদানন্দ পাইয়াছে ভাবিয়া, সে রাগের চেয়ে অনুতাপের জ্বালাতেই জ্বলিয়াছিল বেশি। যে বিপিন, আশ্রমের কোথায় মাটির নীচে কোন্ চারার বীজ হইতে অঙ্কুর মাথা তুলিতেছে, এ খবর পর্যন্ত যে রাখে, তাকে ফাঁকি দিয়া সদানন্দ এত কষ্ট দিয়াছে মাধবীলতাকে! কি হইয়াছিল তার? আগেই কেন সে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করে নাই? কেন আশ্রমকে চুলায় যাইবার অনুমতি দিয়া নিজে গা এলাইয়া দিয়াছিল অসহায় শিশুর মত?

সদানন্দের কুটীরের সামনে একটা কদমগাছের নীচে মহেশ চৌধুরীর মহাযুদ্ধ এবং মাধবীলতার মধ্যস্থতায় সে যুদ্ধের সমাপ্তির পর কয়েকটা দিন যেভাবে কাটিয়াছিল, ভাবিলে বিপিনের এখন লজ্জা করে। শরীরটা একটু দুর্বল ছিল কিন্তু দাঁতের ব্যথা ছিল না। স্নায়ু ভোঁতা হইয়া থাকা উচিত ছিল বিপিনের, শ্রান্ত অবসন্ন দেহে দু'তিনদিন পড়িয়া পড়িয়া ঘুমানোই ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তার বদলে কি তীব্র মানসিক যন্ত্রণাই সে ভোগ করিয়াছে। বার বার কেবলি তার মনে হইয়াছে, সে কি ভুল করিযাছে? ছলে বলে কৌশলে দিগন্তের কোল হইতে তার আদর্শের সফলতাকে আশ্রমের এই মাটিতে টানিয়া আনিবার সাধনা কি তার ভ্রান্তিবিলাস মাত্র? এভাবে কি বড় কিছু মানুষ করিতে পারে না? নিজের জন্য সে কিছু চায় না, এইটুকুই কি তার নৈতিক শক্তিকে অব্যাহত রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়? ন্যায় অন্যায়ের বিচারের চেয়ে কার্যসিদ্ধিকে বড় ধরিয়া লইয়াছে বলিয়াই কি তার এত চেষ্টা আর আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যাইবে? মনে মনে নিজের দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের হিসাব করিয়া বিপিন বড় দমিয়া গিয়াছে। কতটুকু লাভ হইয়াছে, কতটুকু সার্থকতা আসিয়াছে? কোনদিকে কতটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছে? আশ্রম বড় হইয়াছে, আশ্রমের সম্পত্তিও বাড়িয়াছে, লোকজনও বাড়িয়াছে, কিন্তু উন্নতি হয় নাই। ভাল উদ্দেশ্যে যে মিথ্যা আর প্রবঞ্চনা আর ফন্দিবাজিকে সে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, সে-সব একান্তভাবে তার নিজস্ব

গোপন পরিকল্পনার অঙ্গ, আশ্রমের জীবনে কেন সে সমস্তের প্রতিক্রিয়া ফুটিয়া ওঠে? আর এদিকে মহেশ চৌধুরী, সরল নিরীহ বুদ্ধিহীন ভালমানুষ মহেশ চৌধুরী, না চাহিয়া সে সকলের হৃদয় জয় করিয়াছে, নিজের দুঃখময় ব্যর্থ জীবনকে পর্যন্ত সার্থকতায় ভরিয়া তুলিয়াছে। কি এমন মহাপুরুষ মহেশ চৌধুরী যে, তার পাগলামি পর্যন্ত মানুষকে মুগ্ধ করিয়া দেয়? আর কি এমন অপরাধ বিপিন করিয়াছে যে, সকলে তাকে কেবল ফাঁকিই দেয়, সদানন্দ হইতে মাধবীলতা পর্যন্ত? এইসব ভাবিতে ভাবিতে বিপিন মড়ার মত বিছানায় পড়িয়া থাকিয়াছে—অন্য মানুষ সে অবস্থায় ছটফট করে। সেই সময়েই বিপিন ভাবিয়া রাখিয়াছিল, মহেশ চৌধুরীর সঙ্গে ভাব করিয়া লোকটাকে একটু ভালভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিবে। তবে বিশেষ উৎসাহ তার ছিল না। তারপর ধীরে ধীরে মহেশ চৌধুরীকে কাজে লাগাইবার পরিকল্পনা মনের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। এখন আর আশ্রমের পরিসর বাড়ান সম্ভব নয়, সম্প্রতি যে আমবাগানটা পাওয়া গিয়াছে, তাই লইয়াই আপাততঃ সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। সুতরাং রাজাসায়েবের ভয়ে মহেশ চৌধুরীকে এড়াইবার চলিবার আর তো কোন কারণ নাই। আশ্রমে অর্থ-সাহায্য করাও রাজাসায়েব বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, কিছুদিন আর পাওয়া যাইবে না। ভবিষ্যতে আবার যদি রাজাসায়েবের কাছে কিছু আদায় করা সম্ভব মনে হয় তখন অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে।

এদিকে, যাদের চাষাভূষো মানুষ বলে, জনসাধারণ নামে যারা আশ্রমকে ঘিরিয়া আছে গ্রাম আর পল্লীতে, তাদের সঙ্গে আশ্রমের একটু যোগাযোগ ঘটানো দরকার। ওদের বাদ দিয়া কোন প্রতিষ্ঠানই গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। ওদের সঙ্গে এখন যে সংযোগ আছে আশ্রমের, সে না থাকার মত। কাছাকাছি কয়েকটি গ্রামের নরনারী আশ্রমে সদানন্দের উপদেশ শুনিতে এবং সদানন্দকে প্রণাম করিতে আসে, প্রণামান্তে কিছু প্রণামীও দিয়া যায়—কিন্তু সে আর ক'জন মানুষ, সে প্রণামী আর কত! তিন দিনের পথ হাঁটাইয়া অনেক দূরের গ্রাম হইতে মানুষকে যদি আশ্রমে টানিয়া আনিতে হয়, আর একদিনের প্রণামীর পরিমাণ দেখিয়া নিশ্চিন্ত মনে দেশের সর্বত্র আশ্রমের শাখা খুলিবার ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়া দেওয়া সম্ভব করিতে হয়, তাহা হইলে অন্য কিছু করা চাই, কেবল সদানন্দকে দিয়া কাজ চলিবে না।

মহেশ চৌধুরীকে এরা পছন্দ করে—এইসব সাধারণ মানুষগুলি।

মানুষটাও ভাল মহেশ চৌধুরী।

শিশুর মত সরল।

কয়েকদিন আনা-যাওয়া মেলামেশা করিয়া বিপিন কিন্তু একটু ভড়কাইয়া গেল। মহেশ চৌধুরীর আসল রূপটা সে আর খুঁজিয়া পায় না। ভালমানুষ, শিশুর মত সরল, কিন্তু জোর কই? আশ্রমের কদমতলায় তার যে মনের জোরের পরিচয় বিপিনকে পর্যন্ত কাবু করিয়া কয়েক দিন আনমনা করিয়া রাখিয়াছিল? ছেলের কথা বলে, ঘরের কথা বলে, নিজের কথা বলে, আর এই সব কথার মধ্যে ফোড়ন দেয় ভগবানের কথার—শান্তি চাই মহেশের, শান্তি! অনেক দুঃখ পাইয়াছে, মহেশ, সে জন্য কোন দুঃখ নাই, এবার একটু শান্তি না পাইলে যে শেষ জীবনটাও মন দিয়া ভগবানকে ডাকা হয় না মহেশের!

'ভগবানকে ডাকবার জন্য আমরা আশ্রম করিনি।'

মহেশ চৌধুরী কৌতুকের হাসি হাসিয়া বলে, 'এখনও আমার সঙ্গে ছলনা করবেন, বিপিনবাবু? ভগবানকে ডাকার জন্য ছাড়া আশ্রম হয়! তবে ভগবানকে ডাকার সুবিধের জন্যে অন্য কিছু যদি করেন—সে সবও ভগবানকে ডাকারই অঙ্গ!'

'আপনি তো প্রভুর বাণী শোনেন?'

'শুনি বৈকি।'

'উনি কি কোনদিন বলেছেন, আশ্রমে যাঁরা আছেন, তাঁদের কাজ হল ভগবানকে ডাকা?'

'বলেন বৈকি—সব সময়েই বলেন। আমরা সবাই পাপী তো বিপিনবাবু?' প্রশ্ন শুনিয়া বিপিন গুম খাইয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরী সায় না পাইয়াও বলে, 'মহাপাপী আমরা। আমাদের কি ক্ষমতা আছে নিজে থেকে ভগবানকে ডাকবার? তাই যদি পারতাম বিপিনবাবু, মনে আমার এমন অশান্তি কেন—সকলের মনে অশান্তি কেন! প্রভু আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছেন কি করলে ভগবানকে ডাকবার ক্ষমতা হয়, কি করলে আমরা ভগবানকে ডাকতে পারি। কাণ্ডারী একমাত্র ভগবান, কিন্তু গুরুদেবের চরণতরীই ভরসা—।' তর্কের কথা নয়, তর্ক বিপিন করে না, কথায় কথা তুলিয়া মানুষটাকে বুঝিবার চেষ্টা করে। অন্য সব দিক দিয়া সে হতাশ হইয়া যায়, একটিমাত্র ভরসা থাকে মহেশের নিজের বিশ্বাস আঁকড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতা। নিজে যা জানিয়াছে তার বেশি কিছু জানিতে বা বুঝিতে চায় না, সদানন্দের কথা হোক, শাস্ত্রের বাক্য হোক, তার নিজের ব্যাখ্যাই ব্যাখ্যা। এদিক দিয়া মহেশ ভাঙ্গিবে কিন্তু মচকাইবে না।

এ রকম মানুষ দিয়া বিপিনের কাজ চলিবে কি?

'আচ্ছা, প্রভু যদি আপনাকে কোন অন্যায় আদেশ দেন, সে আদেশ আপনি পালন করবেন?'

'প্রভু অন্যায় আদেশ দিতে পারেন না।'

'মনে করুন দিলেন—'

'ওরকম ছেলেমানুষী অসম্ভব কথা মনে করে কি লাভ হবে বলুন?'

বিপিনের ধৈর্য অসীম।

'ওঁর আদেশ অন্যায়, আমি তা বলছি না। ধরুন, উনি ঠিক মত আদেশই দিয়েছেন, আপনার মনে হল আদেশটা সঙ্গত নয় ; তখন আপনি কি করবেন?'

মহেশ নিশ্চিন্তভাবে বলে, 'আদেশ অন্যায় বলে ওঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেব।'

'আদেশটা পালন করবেন তো?'

'উনি যদি আমার মনের ধাঁধা মিটিয়ে দিয়ে আদেশ পালন করতে বলেন, তবে নিশ্চয় করব।'

'আর যদি মনের ধাঁধা না মিটিয়ে শুধু আদেশ পালন করতে বলেন?'

মহেশ হাসিয়া বলে, 'যান মশায়, আপনার আজ মাথার ঠিক নেই। ওরকম উনি কখনো বলতে পারেন?'

'যদি বলেন?'

'আপনি আবার সেই অসম্ভব কল্পনার মধ্যে যাচ্ছেন।'

বিপিনের ধৈর্য সত্যই অসীম।

'বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যদি বলেন? এতদিন আপনাকে যেরকম পরীক্ষা করছিলেন না, এই রকম কোন পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি আপনাকে অন্যায় আদেশ পালন করতে বলেন?'

'পরীক্ষার জন্য? আরও পরীক্ষা করবেন?' মহেশের মুখ চোখের পলকে শুকাইয়া যায়।

ভীত সন্ত্রস্ত শিশুর মত অসহায় চোখ মেলিয়া সে বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। সদানন্দের পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে কি ফেল করিয়াছে, আজও মহেশ চৌধুরী ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই, শুধু জানিয়াছে যে, সদানন্দ তাকে অনুগ্রহ করিয়াছে, জানিয়া এই সৌভাগ্যেই সর্বদা ডগমগ হইয়া আছে। পরীক্ষার কথা মনে হইলেই তার মুখ শুকাইয়া যায়।

বিপিনের পিছনে বিভূতির মা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল। দুধের বাটি হাতে করিয়া আসিয়াছে। দুধটা বেশি গরম ছিল, এমনিভাবে ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকাতেও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হইতে কোন বাধা হইতেছে না, তাই এতক্ষণ দু'জনের অপরূপ আলাপে বাধা দেয় নাই। এবার বলিল, 'বিপিনবাবু, ওঁর সঙ্গে আপনি কথায় পারবেন না। গুরুদেবের সমস্ত আদেশ উনি চোখ কান বুঁজে মেনে চলবেন—ভাববেন না।'

তবু বিপিনের ভাবনার শেষ হয় না। এমন সমস্যায় সে আর কখনও পড়ে নাই। একটা মানুষকে গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত ঠিক করিয়া ফেলিতে যে এত ভাবিতে হয়, বিপিনের সে ধারণা ছিল না। আশ্রমে যদি স্থান দেওয়া হয় মহেশকে, কাজে কি তার লাগিবে মহেশ?

মাধবীলতাকে পর্যন্ত অন্যমনে এক সময় সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, 'মহেশবাবু লোক কেমন মাধু?'

মাধবীলতা সংক্ষেপে বলে, 'ভাল নয়।'

সদানন্দকে মাধবীলতা ভাল লোক বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিল। মনে পড়াতেও বিপিনের হাসি আসিল না। মাধবীলতা অন্য মানদণ্ড দিয়া বিচার করিতেছে—ভাল শব্দটারও অনেক রকম মানে আছে।

গম্ভীরমুখে সে জিজ্ঞাসা করে, 'আশ্রমে ফিরে যাবে মাধু?'

'যাব।'

'কি করবে আশ্রমে গিয়ে?'

এ প্রশ্নের জবাব মাধবীলতা দিতে পারিল না।

।। আট ।।

বিপিন ভাবিতেছিল, মাধবীলতাকে প্রথমে আশ্রমে ফিরাইয়া আনিবে, তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া মহেশকেও আশ্রমে বাস করিতে বলিবে কিনা ঠিক করিবে। ভাবিতে ভাবিতে দিন কাটিতে লাগিল। সদানন্দের নাগালের মধ্যে আবার মাধবীলতাকে আনিয়া ফেলিতে বিপিন আর সময়ই পায় না। নিজেই সে বুঝিতে পারে না মাধবীলতাকে ফিরাইয়া আনিবে ঠিক করিয়াও মহেশের ওখানে মেয়েটাকে কেন ফেলিয়া রাখিয়াছে। এবার অবশ্য সে মাধবীলতার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করিবে, নিজেও সতর্ক থাকিবে, তবু যেন ভয় হয়।

সদানন্দ বড় ভয়ানক মানুষ। (বিপিনের মতে) সদানন্দের মানুষ বশ করার যে ক্ষমতাকে অসামান্য গুণ মনে করিয়া বিপিন এতদিন আশ্রমের কাজে লাগাইয়াছে, আজ সেই ক্ষমতাকে অনিষ্টকর ভয়ানক কিছু বলিয়া গণ্য করিতে বিপিনের দ্বিধা হয় না। বিজ্ঞানের সুবিধাভোগীরা যে ভাবে বিজ্ঞানকে অভিশাপ দেয়, সদানন্দকেও বিপিন আজকাল তেমনি ভাবে কাজ ফুরানো পাজীর দলে ফেলিয়াছে। কেবল মাধবীলতার জন্য এ বিরাগ নয়, সদানন্দের কাজ প্রকৃতপক্ষে ফুরায় নাই, মনে হইয়াছিল সদানন্দকে বাদ দিয়াও আশ্রম চালানো যাইবে, কিন্তু কল্পনাটা

কার্যে পরিণত করিবার নামেই নানারকম আশঙ্কা মনে জাগায় আপনা হইতেই বিপিন টের পাইয়াছে যে, সদানন্দকে সে বিদায় দিতে চায় বটে কিন্তু এখনও সেটা সম্ভব নয়।

যে কোন বুদ্ধিমান উৎসাহী লোক সদানন্দকে সামনে দাঁড় করাইয়া এরকম একটি আশ্রম গড়িয়া তুলিতে পারিবে—সদানন্দকে বিদায় করার পক্ষে এই এখন সব চেয়ে বড় বাধা। সদানন্দ শুধু চলিয়া গেলে আরও বেশি কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া আশ্রমকে সে চালাইয়া নিতে পারিবে, কিন্তু প্রতিহিংসার উদ্দেশ্যে সদানন্দ প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিলে পারিবে না। হয়তো পারিবে, কোন বিষয়েই নিজেকে বিপিন অক্ষম ভাবিতে পারিবে না, কিন্তু সাধ করিয়া সে হাঙ্গামা টানিয়া আনিবার সাহস বিপিনের নাই।

বিপিনের সাহস কি কম? বিপিন কি ভীরু?

মাধবীলতা তাই বলে। বলে, 'বিপিনবাবু? উনি অপদার্থ ভীরু কাপুরুষ—'

বলে মহেশকে। প্রাণ খুলিয়া বিপিনের নিন্দা করিতে পারে। মহেশ চৌধুরীর উপব বিরক্তিটা তার এত বেশি বাড়িয়া গিয়াছে, লোকটাকে দেখিলেই গায়ে যেন আজকাল তার জ্বর আসে। কিছুদিন আগে মাধবীলতা বিপিনকে বলিয়াছিল মহেশ চৌধুরী লোক ভাল নয়। তখন বিপিনের সাহচর্য সে সহ্য করিতে পারিত না। আজকাল মহেশ চৌধুরীর একসুরে বাঁধা মনোবীণার একঘেয়ে ঝঙ্কারগুলি একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তোলায় বিপিনের মধ্যেও হঠাৎ সে কিছু কিছু বৈচিত্র্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। বিপিনের কাছে আর তাই মহেশ চৌধুরীর সম্বন্ধে কোনরকম মন্তব্য করে না, মহেশ চৌধুরীর কাছে বিপিনকে বিশেষণের পর বিশেষণে অভিনন্দিত করিয়া চলে—চালবাজ, মিথ্যুক, লোভী, অসংযত প্রভৃতি কত সংজ্ঞাই যে বিপিনকে সে দেয়।

বিপিনের প্রশংসায় মহেশ কিন্তু পঞ্চমুখ। কারও সম্বন্ধে মহেশ কখনও কোন কারণেই মত বদলায় না— অন্ততঃ স্বীকার করে না যে, নিন্দা প্রশংসায় কারও সম্বন্ধে তার ধারণার কিছুমাত্র পরিবর্তন হইয়াছে। নিন্দা সে জগতে কারও কবে না, একবার যার যে গুণগান করিয়াছে, চিরকাল সমান উৎসাহের সঙ্গে তাব সেই গুণকীর্তনই করিয়া যায়।

মাধবীলতার মুখে বিপিনের বিশেষণগুলি শুনিয়া সে একে একে বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণ করিতে বসে যে, মাধবীলতা ভুল করিয়াছে, ওসব বিশেষণ বিপিনের প্রতি প্রয়োগ করা চলে না। বিপিন মহান্, উদার, আত্মত্যাগী মহাপুরুষ,—চাল বিপিনের নাই, মিথ্যা সে কখনও বলে না, লোভী সে নয়, সংযমের তাব তুলনা নাই। বিপিনের ভীরুতাব অপবাদটিবও মহেশ প্রতিবাদ করে।

মাথা নাড়িয়া হাসিয়া বলে, 'বিপিনবাবু ভীরু কাপুরুষ? কি যে তুমি বলো মা! ওঁর মত বুকের পাটা কটা মানুষের থাকে?'

মাধবীলতা রাগিয়া বলে, 'কি যে দেখেছেন আপনি বিপিনবাবুর মধ্যে! উনি যদি ভীরু কাপুরুষ নন, কে তবে ভীরু কাপুরুষ? শুনুন বলি তবে। আশ্রমের ক্ষতি করবেন ভয়ে আপনাকে উনি আশ্রমে নিতে ভরসা পাচ্ছেন না।'

রাগের মাথায় ভিতরের মস্ত বড় কথা যেন ফাঁস করিয়া দিয়াছে, এমনি গর্বভরা অনুতাপের ভঙ্গিতে মাধবীলতা একদৃষ্টে মহেশ চৌধুরীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। মহেশ চৌধুরী হঠাৎ গম্ভীর হইয়া যায়। মনে হয়, ভিতরেব আসল কথাটা জানিতে পারিয়া বুঝি চটিয়াই গিয়াছে! কিন্তু কথা শুনিয়া বুঝা যায়, এত সহজে খেইহারা হইবার মানুষ সে নয়।

'ভয় তো বিপিনবাবুর মিথ্যে নয় মা! আমাকে আশ্রমে ঠাঁই দিলে আশ্রমের ক্ষতির আশঙ্কা

আছে বৈকি! আমি হলাম মহাপাপী, আমার সংস্পর্শে—'

বিপিনের ভীরুতার প্রমাণটি ফাঁসিয়া যায়। চালের উপরেই বিপিন চলে, এ ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে কিন্তু উদাহরণ দাখিল করিতে গিয়া বিপিনের চালবাজির একটি দৃষ্টান্তের কথাও মাধবীলতা আগে এতদিন অনেক চেষ্টাতেও মনে করিতে পারে নাই। বিপিনের ভীরুতার কয়েকটি জোরালো দৃষ্টান্ত আজ সে কোনরকমেই স্মরণ করিতে পারে না। বিপিন ভীরু সন্দেহ নাই, কিন্তু কবে কোথায় সে ভীরুতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে?

ভাবিতে গেলে সত্যই বড বিস্ময় বোধ হয়। বিপিনের কি তবে দোষ বলিয়া কিছুই নাই? অভাব কেবল তার গুণের? সদ্‌গুণ একেবারে নাই বলিয়াই লোকটার চালচলন এমন নিন্দনীয় মনে হয়? সংসারে মানুষ হয় ভালমন্দ মেশানো, কারো মধ্যে ভাল বেশি, কারও মধ্যে কম, কিন্তু বিপিনের মধ্যে ভালর নামগন্ধও নাই। তাই কি বিপিনকে মনে হয় খারাপ লোক, যদিও তার মধ্যে মন্দের ভাগটাও খুঁজিয়া মেলে না? কথাটা যেন দাঁড়িয়ে যায় ধাঁধায়—ভালও নাই, মন্দও নাই, কি তবে আছে বিপিনের মধ্যে? কিসের মাপকাঠিতে মানুষ তাকে মানুষ হিসাবে বিচার করিবে? তাকে কি ধরিয়া নিতে হইবে নিন্দা প্রশংসার অতীত মহামানব বলিয়া?

বিপিন মহামানব। ভাবিলেও মাধবীলতার হাসি আসে। কিন্তু ধারণাগুলি দিয়া—আপনা হইতে মনের মধ্যে যে সব ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই ধারণাগুলি দিয়া—বিপিনের বিচার না করিলে, বিপিনের দোষগুণ নিরপেক্ষভাবে ওজন করিতে বলিলে, বিপিন সত্যই পরিণত হয় মহামানবে।

নিজের সমস্যাগুলি নিয়া অত্যন্ত বিব্রতভাবে বিপিনের দিন কাটিতেছে, মাধবীলতার খবর নেওয়ার সময়ও বিশেষ পাইতেছে না, এমন সময় বিভূতি একদিন বাড়ি ফিরিয়া আসিল। মহেশের অসুখ উপলক্ষে তাকে বাড়ি ফিরিতে দেওয়া হইয়াছে। না বলিয়া গ্রাম ত্যাগ করিতে পারিবে না, সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত বাড়ীতে থাকিবে।

ছেলের চেহারা দেখিয়া বিভূতির মা কাঁদিয়াই আকুল। মহেশ বলিল, 'কাঁদছ কেন? পাপ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না?'

বিভূতি বলিল, 'খিদে পেয়েছে মা, খেতে দাও। খালি খেতে দাও, দিনরাত শুধু খেতে দাও, আর কিছু নয়।'

পরদিন ভোরবেলা মহেশ ছেলেকে নিয়া সদানন্দের চরণ বন্দনা করিতে বাহির হইল। চরণ বন্দনার উদ্দেশ্যে আশ্রমে যাইতেছে, একথা অবশ্য বিভূতিকে জানাইল না, শুধু বলিল, 'আমাদের একবার আশ্রম থেকে ঘুরিয়ে আনবি, চল তো।'

'কি হবে আশ্রমে গিয়ে? এ্যাদ্দিন পরে এলাম, গাঁয়ের সকলের সঙ্গে দেখা-টেখা করি?'

'পরে দেখা করিস। আগে আশ্রম থেকে ঘুরে আসবি চল।'

কিন্তু বিভূতির কাছে আশ্রমের কিছুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। গ্রামের চেনা মানুষগুলির সঙ্গে দেখা করিবার জন্যই মনটা তার ছটফট করিতেছিল। তার আসিবার খবরটা সে আসিয়া পৌঁছিবার অনেক আগেই গ্রামে ছড়াইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই, তবু কাল কেউ তাকে দেখিতে আসে নাই বলিয়া বিভূতি একটু আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে। তার সংস্পর্শে আসিতে কয়েকজনের ভয় হওয়া সম্ভব, অন্ততঃ ভয় ভাঙ্গিতে কিছুদিন সময় লাগিবে, কিন্তু চোরা গাইয়ের সঙ্গে কপিলা গাইয়ের বাঁধা পড়িবার আতঙ্কটা কি সকলের মধ্যেই এত বেশি প্রচণ্ড যে, একজন

তার খবর নিতেও আসিল না?

না আসুক, বিভূতি নিজেই সকলের সঙ্গে-দেখা করিয়া ভয় ভাঙ্গাইয়া দিয়া আসিবে। আশ্রমে যাওয়ার প্রস্তাবে সে তাই ইতস্ততঃ করিতে থাকে।

আশ্রমে যাওয়ার নামে মাধবীলতা আনন্দে ডগমগ হইয়া বলে, 'তাই চলুন, আশ্রম দেখে আসবেন।'

বিভূতি হাসিয়া বলে, 'আশ্রম দেখা কি আব আমাব বাকী আছে, ঢের দেখেছি।'

'সে আশ্রম আর নেই, কত পরিবর্তন হয়েছে দেখে অবাক হয়ে যাবেন।'

বিভূতির জেলে যাওয়ার আগে সদানন্দের আশ্রম কেমন ছিল এবং তারপর আশ্রমেব কি পরিবর্তন হইয়াছে, মাধবীলতার জানিবার কথা নয়, এটা তার শোনা কথা। মাধবীলতার উৎসাহ দেখিয়া বিভূতি আর আপত্তি করিল না, তিনজনে আশ্রমের দিকে রওনা হইয়া গেল—মহেশ, মাধবীলতা আর বিভূতি। বিভূতির মা গেল না, বলিল, 'আশ্রম মাথায় থাক, তোমরা ঘুরে এসো।'

বাড়ির সামনে কাঁচা পথ ধরিয়া তিনজনে হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছে, শশধর আসিয়া জুটিল। আশ্রমে যাওয়ার একটা সুযোগও শশধর ত্যাগ করে না।

মহেশ মাধবীলতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁটতে পারবে তো মা?'

মাধবীলতা হাসিয়া বলিল, 'আমাকে জিজ্ঞেস না করে বরং আপনাব ছেলেকে জিজ্ঞেস করুন।'

মহেশ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'দুর্গা, দুর্গা। সত্যি ওর চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে।'

আশ্রমে পৌঁছিয়া প্রথমেই দেখা হইয়া গেল রত্নাবলীব সঙ্গে। মাধবীলতাকে দেখিয়া সে একগাল হাসিয়া বলিল, 'বেঁচে আছিস?'

মহেশ তাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন আছ মা?'

কাছেই একটা মোটা গাছের গুঁড়ি পড়িয়াছিল, কদিন আগে গাছটা কাটা হইয়াছে। বিভূতি গুঁড়িতে পা ঝুলাইয়া বসিয়া পড়িল, কিছুক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া সে আর নড়িবে না।

মাধবীলতা বলিল, 'কাঠ পিঁপড়ে হুল ফুটিয়ে দেবে কিন্তু।'

বিভূতি বলিল, 'দিক, গোখরো সাপ কামড়ালেও এখন আমি নড়ছি না।'

তখন সেইখানে কাঠের গুঁড়িতে বসিয়া সকলে গল্প আরম্ভ করিয়া দিল। শীতের সকালেব প্রথম মিষ্টি বোদ আসিয়া পড়িতে লাগিল সকলের গায়ে। আরামে এমন জমিয়া উঠিল আলাপ যে মনে হইতে লাগিল, সদানন্দের চরণবন্দনাব কথাটা মহেশও ভুলিয়া গিয়াছে! কিছুক্ষণ পরে কুটীর হইতে বাহির হইয়া তাদের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবাব সময় স্বয়ং সদানন্দকেও কেউ দেখিতে পাইল না। খেয়াল হইল সদানন্দ যখন সামনে আসিয়া বোদ আড়াল করিয়া দাঁড়াইল।

প্রথমে প্রণাম করিল মহেশ, তারপর মামার অনুকরণে শশধর। রত্নাবলী প্রণাম কবায় মাধবীলতাও ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম ঠুকিয়া দিল।

সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন আছ মাধু?'

মাধবী বলিল, 'ভালই আছি।'

মহেশ বিভূতিকে বলিল, 'এঁকে প্রণাম কর।'

আগের কথা সদানন্দের মনে ছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, 'থাক্, থাক্।'

মহেশ জোর দিয়া আবার বলিল, 'প্রণাম কর বিভূতি, এঁর আশীর্বাদে তুমি ছাড়া পেয়েছ।'

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বিভূতি উঠে নাই। বসিয়া থাকিয়াই সে দু' হাত একত্র করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল, 'নমস্কার, ভাল আছেন? অনেক দিন পরে দেখা হল। আপনার আশীর্বাদ গবর্ণমেন্টকেও টলিয়ে দিতে পারে, তা তো জানতাম না!'

সদানন্দ শান্তভাবে বলিল, 'আমার বলে নয়, আশীর্বাদ আন্তরিক হলে ভগবানকে পর্যন্ত টলিয়ে দিতে পারে বাবা।'

বিভূতি আরও বেশি শান্তভাবে বলিল, 'ভগবানের কথা বাদ দিন, তিনি তো সব সময়েই টলছেন মাতালের মত। টাল সামলাতে প্রাণ বেরোচ্ছে আমাদের।'

মাধবীলতা চোখ বড় বড় করিয়া বিভূতির দিকে চাহিয়া থাকে। রত্নাবলীর সাদা দাঁতগুলি ঝক্ ঝক্ করে। অস্থির হইয়া ওঠে মহেশ। কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়াই যেন প্রথম দিকে ব্যাকুলভাবে শুধু বলিয়া চলে, 'আহা', 'ওকি' আর 'ছি ছি'। তারপর হঠাৎ রাগ করিয়া, সোজা আর শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া, গম্ভীরকণ্ঠে ডাকে, 'বিভূতি!'

বসা অবস্থাতেই বিভূতি বলে, 'কেন?'

'পায়ে হাত দিয়ে এঁকে প্রণাম কর, নিজের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে নাও।'

'এঁকে আমার প্রণাম করতে ইচ্ছা হয় না বাবা। ক্ষমা চাওয়ার মত অন্যায় কথা কিছু বলি নি।'

'এঁকে আমি দেবতা মনে করে পূজা করি, আমার ছেলে তুই, এঁকে তোর প্রণাম করতে ইচ্ছা হয় না? যা মনে এল বলে বসলি মুখের ওপোর, তবু তোর অন্যায় কথা বলা হল না?'

বিভূতি নীরবে মাথা নাড়িল।

'করবি না প্রণাম?'

'না।'

এবার প্রশান্তকণ্ঠে সদানন্দ বলিল, 'মহেশ, কি ছেলেমানুষী আরম্ভ করে দিলে তুমি?'

'ছেলেমানুষী প্রভু?'

'তুমি কি ভাব ওর প্রণাম পাওয়ার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে আছি?'

'তা ভাবিনি প্রভু। ও প্রণাম করুক না করুক আপনার তাতে কি আসবে যাবে—সর্বনাশ হবে ওর নিজের। ও যে আমার সন্তান প্রভু?'

সদানন্দ অভয় দিয়া বলিল, 'ভয় নেই, ওর কিছু হবে না। প্রণাম নিয়ে আমি আশীর্বাদ বিক্রী করি না মহেশ, আশীর্বাদ করাটা আমার ব্যবসা নয়, ভুলে যাও কেন? ছেলেমানুষের কথায় যদি আমি রাগ করি, আমি যে ওর চেয়েও ছেলেমানুষ হয়ে যাব।'

মহেশ ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে বলিল, 'তা কি জানি না প্রভু? আপনি দেবতা, আপনার কি রাগদ্বেষ আছে? কিন্তু আপনাকে প্রণাম না করলে ওর অকল্যাণ হবে।'

'অনিচ্ছায় প্রণাম করার চেয়ে না করাই ভাল, মহেশ।'

'না প্রভু। প্রণম্যকে প্রণাম করতেই হয়। প্রণাম করতে করতে মনে ভক্তি আসে।—বিভূতি, প্রণাম কর এঁকে।'

বিভূতি নীরবে মাথা নাড়িল।

মহেশ আবার বলিল, 'বিভূতি, প্রণাম কর। এই দণ্ডে যদি প্রণাম না কর এঁকে, আমি যেমন আছি তেমনিভাবে যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাব, কোনদিন আর ফিরব না।'

বিভূতি শুকনো মুখে কোন রকমে বলিল, 'আমি পারব না বাবা।'

মাধবীলতার সব কথাতেই ফোড়ন দেওয়া চাই। পিতার আদেশ আর মিনতি যেখানে ব্যর্থ হইয়া গেল, যে দিকে দু'চোখ যায় চলিয়া যাওয়ার ভয় প্রদর্শন পর্যন্ত কাজে লাগিল না, সেখানে কাতরকণ্ঠে বিভূতিকে অনুরোধ না জানাইয়া সে পারিল না, 'আহা এমন করে বলছেন সবাই, করুন না প্রণাম একবারটি?'

এমন সময় আসিল বিপিন।

কারও দিকে বিপিন চাহিয়াও দেখিল না। সোজাসুজি মাধবীলতার কৈফিয়ৎ দাবী করিয়া বলিল, 'আমায় না জানিয়ে আশ্রমে এলে যে মাধু?'

বিপিনের মুখ দেখিয়া আর গলার আওয়াজ শুনিয়া মাধবীলতার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। মহেশ বলিল, 'আমি ওকে এনেছি বিপিনবাবু।'

বিপিন তীব্রস্বরে ধমক দিয়া বলিল, 'চুপ করুন, আপনাকে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিনি।'

প্রকাশ্যভাবে কেউ কোনদিন বিপিনকে উঁচু গলায় কথা বলিতে শোনে নাই—বিশেষতঃ সদানন্দের সামনে।

সকাল বেলাই এমন একটা জটিল অবস্থা সৃষ্টি হইবে কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। মনে মনে সকলেই একটা শঙ্কা-জড়িত অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে। বিভূতি সদানন্দকে প্রণাম করিতে অস্বীকার করায় যে খাপছাড়া কাণ্ড ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল, বিপিনের আবির্ভাবে এখানকার মত সেটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্য? মহেশ চৌধুরী ছাড়িবার পাত্র নয়। সে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়া দিয়াছে, বিভূতি সদানন্দের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম না করিলে যেদিকে দু'চোখ যায় চলিয়া যাইবে। বিপিনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হইয়া গেলেই সে আবার ছেলেকে নিয়া পড়িবে।

কিন্তু কি বোঝাপড়া হইবে বিপিনের সঙ্গে? মহেশ চৌধুরী কি চুপ করিয়া থাকিবে বিপিনের ধমক সহ্য করিয়া? ধমকটা সদানন্দ দিলে সকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিত, সদানন্দ এমন প্রচণ্ড শব্দে ধমক দিলে এতটা খারাপ শোনাইত না। মহেশ চৌধুরীর মত ভক্তকে ধমক দিবার অধিকার সদানন্দের মত মহাপুরুষের থাকে এবং আগেও অনেকবার অনেক ছুতায় মহেশ চৌধুরীকে সে অপমান করিয়াছে। সদানন্দের অপমান অনেকটা গা-সহা হইয়া আসিয়াছে মহেশ চৌধুরীর। কিন্তু বিপিনের অপমান সে সহ্য করিবে কেন? দুজনে যদি এখন কলহ বাধিয়া যায়!

মহেশ চৌধুরী কি বলে শুনিবার জন্য সকলে উৎকর্ণ হইয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরীর মুখ দেখিয়া বিশেষ কিছু বুঝা যায় না। বিপিনের ধমকটা তার কানে গিয়াছে কি না, এ বিষয়েও যেন কেমন সন্দেহ জাগে। চাহিয়া সে থাকে মাধবীলতার মুখের দিকে। কিছুক্ষণের জন্য তার দৃষ্টি এমন তীক্ষ্ণ ও অস্বাভাবিক মনে হয় যে, এতদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর তার একটা নূতন রূপ আবিষ্কারের সম্ভাবনায় শশধর ও সদানন্দের কেমন ধাঁধা লাগিয়া যায়।

মহেশ চৌধুরীর মুখ ধীরে ধীরে গম্ভীর হইয়া আসে। আকাশের দিকে একবার মুখ তুলিয়া উদাস কণ্ঠে সে বলিল, 'মাধু আশ্রমে আসতে পাবে না হুকুম দিয়েছিলেন, আমি জানতাম না বিপিনবাবু!'

মহেশ চৌধুরীর ভঙ্গিটাই মারাত্মক। তার উপর 'হুকুম' শব্দটা সকলের কানে যেন বিঁধিয়া যায়।

মাধবীলতার অপরাধ-ক্লিষ্ট মুখের গ্লানিমায় স্নায়বিক মূঢ়তার ভাবটাই এতক্ষণ স্পষ্ট হইয়াছিল, তবে মহেশ চৌধুরী ছাড়া সেটা কেউ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছিল কিনা সন্দেহ। নিজের প্রয়োজনে কে আর ওভাবে তরুণী মেয়ের মুখ দেখিতে শেখে? সোজাসুজি ভীরুতা আর কোমলতার অভিব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া নেওয়ায় কত ভাল লাগিতেছিল সকলের, কেমন দরদ সকলে বোধ করিতেছিল মেয়েটার জন্য! কিন্তু ওরকম বর্বরের মত মায়া করা মহেশ চৌধুরীর ধর্ম নয়, ওরকম সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা তার নাই। মানুষের এই স্বগত রসানন্দরূপী পিপাসা-সৃষ্টির আগ্রহ ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় অসংখ্য ছোট ছোট মুক্তির মধ্যে মহেশ শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। মাধবীলতার ভীরু কোমল কাঁদ' কাঁদ' মুখখানা দেখিয়া মহেশ চৌধুরী ছাড়া আর কে বুঝিতে পারিত তার ভয় বা দুঃখ নাই, আকস্মিক স্নায়বিক উত্তেজনায় সে একটু দিশেহারা হইয়া গিয়াছে? খোঁচা দিয়া তার আত্মমর্যাদার জ্ঞান জাগাইয়া তুলিবার এবং তার অবরুদ্ধ তেজকে মুক্তি দিবার বুদ্ধি বা সাহস আর কার হইত? সোনালী রোদের মতই মাধবীলতার মুখে লালিমার আবির্ভাব ঘটিতে দেখিয়া মহেশ আবার বলে, 'এবারকার মত ওকে মাপ করুন বিপিনবাবু। আপনি ওকে বারণ করেছেন জানলে—' বিপিনের আদেশ অমান্য করায় মাধবীলতার যে অকথ্য অপরাধ হইয়াছে তার বিরাটত্ব অনুভব করিয়া মহেশ চৌধুরী নিজেই যেন সঙ্কুচিত হইয়া যায়, কোন রকমে এবারকার মত মেয়েটাকে বিপিনের ক্ষমা পাওয়াইয়া দিবার ব্যাকুলতায় যেন দিশেহারা হইয়া যায়। মাধবীলতার হইয়া সে যেন বিপিনের পায়ে ধরিয়া বসিবে।

এবার মাধবীলতা ফোঁস করিয়া উঠে, 'বারণ করেছেন মানে? উনি বারণ করবার কে? বেশ করেছি আমি আশ্রমে এসেছি।'

বিপিন বলে, 'আশ্রমটা বেড়াবার জায়গা নয় মাধু।'

মাধবীলতা ব্যঙ্গ করিয়া বলে, 'কি করবেন, মারবেন?'

সদানন্দ বলে, 'আহা, কি আরম্ভ করে দিয়েছ তোমরা?'

সে কথা কানে না তুলিয়া বিপিন রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলে, 'ছেলেমানুষী কোরো না মাধু। আমার সঙ্গে এসো।'

মহেশ তাড়াতাড়ি সায় দিয়া বলে, 'যাও মা, যাও। বিপিনবাবুর সঙ্গে যাও।'

মহেশ চৌধুরী ফোড়ন না দিলে হয়তো মাধবীলতার উদ্ধত ভাবটা ধীরে ধীরে নরম হইয়া আসিত। বিপিনের সংযমহারা রাগ দেখিতে ভিতরে ভিতরে তার যেন কেমন ভাল লাগিতেছিল। সেদিন রাত্রের কথা মাধবীলতার মনে পড়িয়া গিয়াছে, বিপিন যখন তাকে মহেশ চৌধুরীর বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছিল। সে রাত্রের স্মৃতি ভুলিবার নয়, মাধবীলতা ভুলিয়াও যায় নাই। হঠাৎ তার খেয়াল হইয়াছে, সে রাত্রে বিপিন তার সঙ্গে যে আশ্চর্য ব্যবহার করিয়াছিল, তার মাথাটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সে যেখানে যাইতে চায় পাঠাইয়া দিবে, তাকে বাড়ি কিনিয়া দিবে, তার নামে ব্যাঙ্কে টাকা রাখিবে, মাঝখানে কয়েকদিনের ছেদ দিয়া আজ দিনের আলোয় বিপিন যেন সেই ব্যবহারেরই জের টানিয়া চলিয়াছে। তফাৎ কেবল এইটুকু যে, মাঝখানের সময়টাতে সে যেন সত্যসত্যই নিঃসন্দেহে বিপিনের হইয়া গিয়াছে। বিপিনের রাগ আর ধমক দিয়া জোর গলায় কথা বলার মধ্যে পর্যন্ত মাধবীলতা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে বিপিন জোর খাটাইতেছে আত্মীয়তার, অন্য কিছু নয়। সে যেন বিপিনের মেয়ে বা বৌ বা ওইরকম একটা কিছু।

কিন্তু মহেশ চৌধুরী ফোড়ন কাটায় এতগুলি মানুষের সামনে বিপিনের ব্যবহারে মেজাজটা

তার চড়িয়াই যাইতে থাকে। সকলের সামনে এভাবে শাসন করিতে গেলে মেয়ে বা বৌও চটিয়া যায় বৈকি!

মাধবীলতা বিভূতির সামনে গিয়া দাঁড়াইল, বিপিনের দিকে পিছন ফিরিয়া।

'চলুন আমরা ফিরে যাই বিভূতিবাবু। যাবেন?'

'আমার ওখানে একবার আসবে না মাধু?'—সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিল।

মহেশ সঙ্গে সঙ্গে বলিল, 'যাও মা যাও, প্রভুর মন্দিরে একবার যাও।'

মাধবীলতা জবাব দিল না।

বিভূতি এতক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। মাধবীলতাকে সঙ্গে করিয়া সে বাড়ির দিকে রওনা হওয়ার উপক্রম করে, সকলে দাঁড়াইয়া থাকে কাঠের পুতুলের মত। বিভূতি অস্বীকার করিয়াছে প্রণাম করিতে, মাধবীলতা ফিরিয়া চলিল আদেশ অমান্য করিয়া। চারিদিকে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে না কি সদানন্দের বিরুদ্ধে? আশ্রমে দাঁড়াইয়া সদানন্দকে এভাবে অপমান আর অমান্য করা। দাঁতের বদলে রত্নাবলীর চোখ দু'টি চকচক করে। শশধর বোকার মত হাঁ করিয়া থাকে। কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া বিপিন অসহায় ক্রোধ দমন করার জন্য একটা বিড়ি ধরায়। সদানন্দের ভীতিকর গাম্ভীর্য ঘনীভূত হইয়া আসে। বিপিন আর সদানন্দ দুজনের মনেই প্রায় এক ধরনের অদম্য ইচ্ছা জাগে—ছুটিয়া গিয়া মাধবীলতাকে বগলদাবা করিয়া বিভূতিকে আথালি-পাথালি প্রহার করা।

মহেশ ডাকে, 'বিভূতি।'

বিভূতি দাঁড়ায় এবং মুখ ফিরাইয়া তাকায়। মাধবীলতা দাঁড়ায় কিন্তু মুখ ফিরায় না।

মহেশ বলে, 'এখানে এসো।'

বিভূতি কাছে আসে এবং হাই তোলে। মাধবীলতা সঙ্গে আসে কিন্তু মুখ নীচু করিয়া থাকে।

মহেশ বলে, 'প্রভুকে প্রণাম কর।'

সদানন্দ বলে, 'তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ মহেশ।'—সদানন্দের গলা কাঁপিয়া যায়।

মহেশ হাত জোড় করিয়া বলে, 'বাড়াবাড়ি প্রভু? ও যদি আপনাকে এখন প্রণাম না করে, আমার যেদিকে দুচোখ যায় চলে যেতে হবে প্রভু!'

সদানন্দ বলে, 'তাই যাও তুমি, বজ্জাত কোথাকার।'

মহেশ তখনও হাত জোড় করিয়া বলে, 'ওকে প্রণাম না করিয়ে কেমন করে যাব প্রভু?'

সদানন্দ বাক্যহারা হইয়া থাকে। মহেশ বলে, 'বিভূতি, প্রণাম কর প্রভুকে।'

বিভূতি নড়ে না। সদানন্দ আগাইয়া গিয়া সশব্দে মহেশের গালে বসাইয়া দেয় এক চড়।

কিছুদূরে চালার নীচে আশ্রমের অধিকাংশ নরনারী জমা হইয়াছিল ; দু'চারজন করিয়া তখনও আসিয়া জুটিতেছিল। সদানন্দ আজ আত্মজ্ঞানলাভের প্রক্রিয়ায় ব্রহ্মচর্যের স্থান সম্বন্ধে উপদেশ দিবে। সকলে নিঃশব্দে সদানন্দের প্রতীক্ষা করিতে করিতে কাঠের গুঁড়িটার কাছে এদের লক্ষ্য করিতেছিল। ততদূর হইতে কথা বুঝা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু সকলের চলাফেরা আর অঙ্গভঙ্গির নির্বাক অভিনয় দেখিয়া বেশ অনুমান করিতে পারিতেছিল যে, রীতিমত একটি ব্যাপারই ঘটিতেছে! সদানন্দ আগাইয়া গিয়া মহেশ চৌধুরীর গালে যে চড় বসাইয়া দিয়াছে, এটা তারা স্পষ্টই দেখিতে পাইল। হঠাৎ একটা জোরালো গুঞ্জনধ্বনি উঠিয়া আবার তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল।

সদানন্দ সকলের আগে একবার চাহিয়া দেখিল চালার দিকে। অনেক সাক্ষীর সামনেই মহাপুরুষ সদানন্দ সাধু মহেশ চৌধুরীকে মারিয়া বসিয়াছে বটে। এখন কেবল ঘটনাটা সকলের চোখে পড়িল, পরে বিস্তারিত বিবরণ শুনিবে।

রত্নাবলীর চোখ আর দাঁত দুই-ই তখন চকচক করিতেছে। মাধবীলতা অস্ফুট শব্দ করিয়া মুখের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়াছে ডান হাতের চারটি আঙ্গুল—ছেলেবেলায় মাধবীর এই অভ্যাসটা ছিল, বড় হইয়া কোনদিন এভাবে সে মুখে আঙ্গুল ঢুকাইয়া দেয় নাই।

থতমত খাইয়া গিয়াছিল সকলেই, কিন্তু দেখা গেল অবাধ্য বিভূতি বাপের অপমানের প্রতিকার করিতে বড়ই চটপটে। মহেশ চৌধুরীর মোটা বাঁশের ছড়িটি কাঠের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া রাখা ছিল। চোখের পলকে লাঠিটা তুলিয়া নিয়া সে সদানন্দের দিকে আগাইয়া আসিল। দেশের জন্য মানুষ খুন করার কেবল পরামর্শ করার জন্য এতগুলি বছর সে আটক থাকিয়া আসিয়াছে, আজ বাপের জন্য হয়তো সত্যসত্যই মানুষ খুন করিয়া বসিত। বাধা দিল মহেশ।

'ছি বিভূতি, ছি।'

বিভূতির হাতের লাঠি ছিনাইয়া নিয়া সদানন্দের পদতলে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মহেশ চৌধুরী তার মাথা গুঁজিয়া দিল।

'আপনাকে রাগিয়েছি, আমায় মাপ করুন প্রভু। ছেলে আমার আপনাকে লাঠি নিয়ে মারতে উঠেছিল, আমায় মাপ করুন প্রভু।'

প্রায় আর্তনাদ করাব মত চিৎকার করিয়া বিভূতি বলিল, 'তোমার কি লজ্জাশরম নেই বাবা?'

'কি বকছিস্ তুই পাগলের মত? প্রণাম কর বিভূতি, প্রভুকে প্রণাম কর। ও বিভূতি, শীগগির প্রণাম কর প্রভুকে। আমি না তোর বাপ বিভূতি? আমার দেবতাকে মারবার জন্য তুই লাঠি তুলেছিস, হাত যে তোর খসে যাবে রে, কুষ্ঠ হবে যে তোর হাতে! শীগগির প্রণাম কর বিভূতি, প্রভুকে শীগগির প্রণাম কর।'

পাগল হইয়া গিয়াছে মহেশ চৌধুরী? বিভূতি সভয় বিস্ময়ে সদানন্দের পদতলে বাপের সর্বাঙ্গীণ আত্মোৎসর্গ চাহিয়া দেখে আর তার অভিনব মন্ত্রোচ্চারণ শুনিয়া যায়।

মাধবীলতা কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলে, 'প্রণাম করে নিন্। তারপর ওঁকে নিয়ে বাড়ি যাই চলুন।'

বিভূতি একটু ইতস্ততঃ করিয়া সদানন্দকে প্রণাম করিবার জন্য আগাইয়া যায়। মহেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সদানন্দের পা দুটিকে মুক্তি দেয়। হাত জোড় করিয়া নিবেদন জানায়, 'প্রভু, আশীর্বাদ করুন, ছেলের যেন আমার সুমতি হয়।'

।। নয় ।।

বিকালে মহেশ চৌধুরীব বাড়িতে সকলে পিঠা খাইতে বসিয়াছে। খাওয়ার জন্য বিভূতির লুব্ধ ব্যাকুলতা দেখিয়া তার মার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। ছেলে বাড়ি ফেরার পর বিভূতির মা আজকাল কেবল নানা রকম খাবারই তৈরি করে। বিভূতি খাইতে পারে না, সামান্য কিছু খাইলেই তার পেট ভরিয়া যায়।, দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মত উগ্র খাওয়ার লোভের তার তৃপ্তি হয় না। তার চাহনি দেখিয়া কত কথাই যে মাধবীলতার মনে হয়। হঠাৎ শিহরিয়া

উঠিয়া মাথায় সে একটা ঝাঁকুনি দেয়।

ভিতরের চওড়া বারান্দায় অর্ধচন্দ্রাকারে সকলে বসিয়াছে, মুখোমুখি হওয়ার সুবিধার জন্য। বৈকালিক জলখাবার শেষ হইতে কোন কোনদিন দু'ঘণ্টা সময়ও লাগিয়া যায়। রাজ্যের কথা আলোচনা হয় এই সময়। আজ কথাবার্তা তেমন জমিতেছিল না। সকালের ঘটনায় একমাত্র মহেশ চৌধুরী ছাড়া সকলেই কমবেশী অস্বস্তি বোধ করিতেছে।

হঠাৎ বিভূতি বলিল, 'আচ্ছা বাবা, তুমি পাগল হয়ে গেছ?'

মহেশ চৌধুরী হাসিয়া বলিল, 'কে আগে কথা তোলে দেখছিলাম। পাগলামি মনে হয়েছে তোদের, না? কেন বল তো? পাগলের কথা, কাজ, কোন কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না, আমি তো খাপছাড়া কিছু বলিওনি, কিছু করিও নি।'

'বল নি? কর নি?'

'না। আমি আবোলতাবোল কথা কোনদিন বলি না, খাপছাড়া কাজ করি না। মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যেতে পারে, তা সেটা সবারি হয়।'

'এরকম অহঙ্কার তো কখনও দেখিনি তোমার! নিজেকে প্রায় মহাপুরুষে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছ।'

মহেশ চৌধুরী মাথা নাড়িল, 'তা করিনি, একটা সোজা সত্য কথা বলেছি। তোর অহঙ্কার মনে হল কেন জানিস্? তোর সঙ্গে কথা বলবার সময় আমার মনে আছে তুই আমার ছেলে, কিন্তু আমার বিচার করার সময় তুই ভুলে যাচ্ছিস যে আমি তোর বাপ। কথাটা প্রভুকে বললে অন্যভাবে বলতাম—শুনলে আমার বেশি বেশি বিনয় দেখে তুই চটে যেতিস, তখন তোর খেয়াল থাকত যে আমি তোর বাপ, আর নিজের বাপের আত্মমর্যাদা, জ্ঞানের অভাব দেখে লজ্জায় দুঃখে অপমানে তোর মাথা হেঁট হয়ে যেত।'

এভাবে মহেশ চৌধুরীকে বলিতে মাধবীলতা কখনও শোনে নাই। সে একটু বিস্ময়ের সঙ্গে মহেশ চৌধুরীর কৌতুকোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মহেশ চৌধুরী আবার বলিল, 'আত্মমর্যাদা বলতে তোরা কি বুঝিস জানিস? ফাঁকা গর্ব, গোঁয়ার্তুমি। মানুষের সঙ্গে সংঘর্ষ ছাড়া তাদের আত্মমর্যাদা টেকে না, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের ঠোকাঠুকি লাগবে, দরকার হলে প্রকাশ্যেও হাতাহাতি হয়ে যাবে, লাঠি হাতে মারতে উঠবি, তবে তোদের আত্মমর্যাদা খাড়া থাকতে পারবে। কি বল মাধু, তাই নয়?'

মাধবীলতার মুখ ভর্তি ছিল, খাবারটা গিলিয়া কথা বলিতে হওয়ায় বড়ই সে লজ্জা পাইল।—'কি জানি, ওসব বড় বড় দার্শনিক কথা ভাল বুঝি না।'

মহেশ চৌধুরী হাসিয়া বলিল, 'বড় বড় দার্শনিক কথা আবার কখন বললাম? জানলে তো বলব! আচ্ছা, কথাটা বুঝিয়ে বলছি তোমাকে।'

'থাক না, আমার না বুঝলেও চলবে।'

'উহুঁ, তা চলবে না। কথাটা তোমায় না বুঝিয়ে ছাড়ব না।'

মহেশ চৌধুরীর একগুঁয়েমিতে মাধবীলতার হঠাৎ বড় হাসি পায়। মনে হয়, সে যদি কথাটা না বুঝে, সদানন্দের চরণদর্শনের জন্য একদিন যেমন ধন্না দিয়াছিল, আজ সকালে যেভাবে বিভূতিকে সদানন্দের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করাইয়াছে, তেমনি একটা কিছু কাণ্ড মহেশ চৌধুরী আরম্ভ করিয়া দিবে।

'বুঝেও যদি না বুঝি?'

মহেশ চৌধুরী শান্তভাবে বলিল, 'হেসো না, হাসতে নেই। বুঝবে বৈকি, বললেই বুঝবে। শোন বলি। সকালে বিপিনবাবুর সঙ্গে যে ঝগড়া করলে, মানুষটার মনে কষ্ট দিয়ে বাড়ির দিকে চলতে আরম্ভ করলে, আত্মমর্যাদা বাঁচাবার জন্য তো? তুমি ভাবলে, বিপিনবাবুর সঙ্গে ভালভাবে কথা বললে সবাই তোমাকে ভীরু অপদার্থ মনে করবে, লোকের কাছে তোমার অপমান হবে। ব্যাপারটা কি বিশ্রী দাঁড়িয়ে গেল বল ত? তুমিও উল্টেপাল্টে সারাদিন ওই কথাই ভাবছ, বিপিনবাবুও ভাবছেন। তোমাদের দুজনের মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি যদি হাসিমুখে দুটো মিষ্টি কথা বলতে, এক মুহূর্তে বিপিনবাবুর রাগ জল হয়ে যেত। তুমিও চাইছিলে ঝগড়া না হয়ে বিপিনবাবুর সঙ্গে ভাব হোক, বিপিনবাবুও তাই চাইছিলেন— আত্মমর্যাদা বাঁচাবার জন্য তোমাদের ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। তোমরা সকলকে হিংসা কর কি না, তাই এমন হয়। নিজের যাতে কোন ক্ষতি নেই, পরের জন্য সেটুকু ত্যাগও করতে পার না।'

মাধবীলতা কথা বলিল না।

বিভূতি বলিল, 'গালে যে চড় মারে, তার পায়ে লুটিয়ে পড়ার চেয়ে ওরকম ঝগড়া ঢের ভাল।'

মহেশ চৌধুরী বলিল, 'গালে চড় মেরেছেন, প্রভুর সঙ্গে আমার কি শুধু এইটুকু সম্পর্ক বিভূতি? আমি তো চিরদিন প্রভুর পায়ে লুটিয়ে আসছি? প্রভুকে যদি আগে থেকে দেবতার মত ভক্তি না করতাম, আজ গালে চড় মারার পর মানুষকে আমার ক্ষমা আর সহিষ্ণুতা দেখাবার জন্য প্রভুর পায়ে ধরতাম, তা হলে অন্যায় হত। তার মানে কি দাঁড়াত জানিস? আমি যেন প্রভুর চেয়ে বড়। কিন্তু প্রভুর সম্বন্ধে আমার অহঙ্কার নেই, দীনতা নেই, উদারতা নেই—আমি সোজাসুজি তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করি। গালে যখন উনি চড় মারলেন, আমি বুঝতে পারলাম উনি ভয়ানক রাগ করেছেন। আমার মনে বড় কষ্ট হল, তাই ওঁর পায়ে ধরলাম। উনি আমায় বড় ভালবাসেন বিভূতি—আমায় মারার জন্য না জানি মনে মনে কত কষ্ট পাচ্ছেন।'

বিভূতি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'মানুষের পক্ষে মানুষকে দেবতার মত ভক্তি করা—'

মহেশ চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়া বলিল, 'উচিত নয়। মানুষ কখনও মানুষকে দেবতার মত ভক্তি করে না। কিন্তু সংসারে কটা মানুষ আছে বল তো? যে মানুষ নয়, সে মানুষকে দেবতার মত ভক্তি করবে না কেন বল তো? সবাই যদি মানুষ হত বিভূতি, পৃথিবীটা স্বর্গ হয়ে যেত।'

এবারও বিভূতি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'তোমার কথা ঠিক নয় বাবা। একজন মানুষ আরেকজনকে দেবতার মত ভয় ভক্তি করে বলেই সংসারে এত বেশি অমানুষ আছে—সবাই মানুষ হতে পারছে না। একজন মানুষের চাপে আরেকজন কুঁকড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেকথা থাক—আমাকে কেন তুমি জোর করে ওঁকে প্রণাম করালে? আমি তো ওঁকে দেবতার মত ভক্তি করি না। বরং—'

মহেশ চৌধুরী তাড়াতাড়ি বলিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। তুই আমার ছেলে বলে তোকে প্রণাম করিয়েছি। তুই ভক্তি করিস বা না করিস সে কথা ভিন্ন, তোকে দিয়ে ওঁকে প্রণাম করাবার ক্ষমতা থাকতেও যদি প্রণাম না করাতাম, আমার পক্ষে অন্যায় হত। অন্য কাউকে তো আমি জোর করে প্রণাম করাই না!'

বিভূতি মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর হঠাৎ স্বয়ং সদানন্দ মহেশ চৌধুরীর বাড়ি আসিল।

সকলে ভাবিল, বুঝি সকালবেলা মহেশ চৌধুরীর গালে চড় মারার প্রতিবিধান করিতে আসিয়াছে। ভক্তকে সদানন্দ আজ অনেক আদর করিবে।

মহেশ চৌধুরী তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া বলিল, 'প্রভু?'

সদানন্দ বলিল. 'মহেশ, বিপিন আমাকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই তোমার কাছে এলাম। তোমার বাড়িতে থাকব।'

।। দশ ।।

একথা কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল যে, সদানন্দ সাধুর আশ্রম হইতে সদানন্দ সাধুকেই তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। অন্য সকলের মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝা গেল, কথাটা সত্যই কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই, কেবল মহেশের ভাব দেখিয়া মনে হইল না সে বিশেষ অবাক হইয়াছে। সে যেন এ রকম একটা কিছু প্রত্যাশাই করিতেছিল। বিস্ময় প্রকাশ করার বদলে সে দেখাইল রাগ!

'বটে! বিপিনবাবুর স্পর্ধা তো কম নয়!'

তারপর সদানন্দের সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাতজোড় করিয়া ঊর্ধ্বমুখে সদানন্দেব মুখের দিকে চাহিয়া গদগদকণ্ঠে বলিল, 'আপনি আমার এখানে থাকবেন প্রভু? আমার এত বড় সৌভাগ্য হবে, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। আজ আমার জীবন সার্থক হল। এ বাড়ি আপনার, এ বাড়ির মেয়ে-পুরুষ আপনার দাসদাসী।'

ব্যাপারটা কি হইয়াছে, কেন বিপিন হঠাৎ সদানন্দকে আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, এ ক্ষমতা বিপিন কোথায় পাইল, সকলের মনে এ ধরনের কত যে প্রশ্ন জাগিতেছিল হিসাব হয় না! কিন্তু সদানন্দকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সাহস কারও নাই। ভরসা না পাওয়ার জন্যই হোক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, মহেশ চৌধুরীও এ বিষয়ে একেবারে মুখ বুঁজিয়াছিল।

অন্য কেউ কথা তুলিবে ভাবিয়া মাধবীলতা একটু অপেক্ষা করে, তারপর খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ কবিয়া বলিয়া বসে, 'আপনাকে তাড়িয়ে দিলেন কেন বিপিনবাবু?'

সদানন্দ কিছু বলিবার আগেই মহেশ চৌধুরী বলে, 'কি যে তুমি বল মাধু? তাড়িয়ে আবার কে দেবে প্রভুকে? উনি রাগ করে চলে এসেছেন, তাও বুঝতে পার না?'

সদানন্দ বলে, 'না মহেশ, বিপিন আমায় তাড়িয়েই দিয়েছে।'

মহেশ বলে, 'তাই কি হয় প্রভু! আপনাকে তাড়াবার ক্ষমতা কারও নেই।'

সদানন্দ বলে, 'তা আছে বৈকি। আশ্রমটা বিপিনের সম্পত্তি। আমি আশ্রমের শিক্ষক হিসাবে ছিলাম, ক'বছরের মাইনে ছাড়া আর কিছু দাবী করতে পারব না। বিষয়বুদ্ধি তো নেই—'

'আপনার বুদ্ধির কাছে বিপিনবাবুর বিষয়বুদ্ধি!' মহেশ চৌধুরী একগাল হাসে, 'ক'বিঘা মেঠো জমি বিপিনবাবুর নিজের নামে লিখে নিয়েছেন, আপনি জয় করেছেন মানুষগুলিকে আশ্রম কখনো বিপিনবাবুর সম্পত্তি হতে পারে প্রভু? আপনাকে নিয়ে তবে তো আশ্রম।

আপনি যেখানে থাকবেন সেখানটাই হবে আশ্রম। আপনি যখন চলে এসেছেন, আপনার সঙ্গে আশ্রমও চলে এসেছে।'

সজোরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া গভীর আপসোসের সঙ্গে মহেশ আবার বলে, 'প্রথমটা রাগ হয়েছিল, এখন আবার বিপিনবাবুর জন্য মায়া হচ্ছে। বুদ্ধির দোষে মানুষ কি সর্বনাশটাই নিজের করে।'

মহেশ চৌধুরী সদানন্দের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিল। মহেশ চৌধুরীর ঘরবাড়ি সর্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, ঘষা-মাজা, ধোয়া-মোছা নিয়া বিভূতির মা সবসময়েই ব্যস্ত হইয়া আছে। সবচেয়ে ভাল ঘরখানায় তাড়াতাড়ি সদানন্দের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। পিতামহের আমলের প্রকাণ্ড খাটে আনকোরা নূতন তোষক পাতা হইল—একটু ছোট হইল তোষকটা। তা হোক, লোকের ব্যবহার করা তোষক তো আর সদানন্দকে দেওয়া যায় না। তোষক ঢাকা পড়িল গায়ে দেওয়ার মুগার চাদরে। বালিশের বদলে দেওয়া হইল ঝালর দেওয়া তাকিয়া, কেবল বিশেষ উপলক্ষে আসর পাতা হইলে সেগুলি কাজে লাগে। ঘরের এক কোণে পড়িল ঘরে বোনা কার্পেটের আসন, দুপাশে জ্বলিতে লাগিল ধূপধুনা আর কোণ ঘেঁষিয়া একটি মস্ত ঘিয়ের প্রদীপ। অভ্যর্থনার আরও কত ছোটবড় আয়োজনই যে মহেশ চৌধুরী করিল! কিছুকাল আগেও মহেশ চৌধুরীর বাড়ি ছিল নিস্তব্ধ, মহেশ আর তার ভাগ্নে শশধর এবং তাদের দুজনের দুটি স্ত্রী চুপচাপ এ বাড়িতে দিনরাত্রি কাটাইয়া দিত, কারও মধ্যে যেন প্রাণ ছিল না। তারপর মাধবীলতা আসিয়াছে, বিভূতি আসিয়াছে, আজ আসিল সদানন্দ—মাধবীলতার পদার্পণের পর সেই যে একটু জীবনের সাড়া জাগিয়াছিল বাড়িতে, আজ যেন তা চরমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে বিশেষ একটি উৎসবে।

সকলের মধ্যে চাঞ্চল্য আসিয়াছে, মুখে ফুটিয়াছে কথা। একজন কেবল আগেও যেমন চুপচাপ ছিল, এখনও তেমনি চুপচাপ থাকিয়া গিয়াছে। সে শশধরের ঘোমটা-টানা বৌ। কোন্ ফাঁকে কখন বাড়ির কোন্ আড়াল হইতে আসিয়া সে যে সদানন্দের সামনে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল এবং আবার নিজের অন্তরালে চলিয়া গেল, কেউ খেয়ালও করিল কিনা সন্দেহ। শশধরের বৌ যে বাড়িতে থাকে, অধিকাংশ সময়ে তা টেরও পাওয়া যায় না।

মহেশ কেবল একবার একরাশি বাসন হাতে খিড়কি পুকুর যাওয়ার সময় উঠানের কোণে পিছন হইতে তাকে পাকড়াও করিয়া বলিল, 'বৌমা, তুমিই প্রভুর জন্য রান্না কোরো। চান করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যেমন করে ঠাকুরদেবতার ভোগ রান্না কর না, ঠিক তেমনি করে।'

শশধরের বৌ মামাশ্বশুরের সঙ্গে কথা বলে না। ডাক শুনিয়া মহেশ চৌধুরীর দিকে পিছন করিয়াই সে থমকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক সেই অবস্থাতেই ঘোমটার মধ্যে মাথা নত করিয়া সে নীরবে সায় দিল। মহেশ চৌধুরী সরিয়া গেল আর কিছু বলিবার নাই জানিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল খিড়কির পুকুরের দিকে।

তারপর মহেশ জিজ্ঞাসা করিতে গেল, শশধরের বৌ স্নান করিয়া ভোগ রান্না করিয়া দিলে সদানন্দের আপত্তি নাই তো?

সদানন্দ বলিল, 'বাড়াবাড়ি কোরো না মহেশ, বাড়াবাড়ি কোরো না।'

মহেশ বলিল, 'না প্রভু।'

'সকলের জন্য যা রান্না হবে, আমিও তাই খাব। আমার ওসব নেই জান তো?'

'আপনি অনুমতি দিলে একটু বিশেষভাবেই রান্নাটা করাই প্রভু। আশ্রমের কথা আলাদা, এখানে—'

সদানন্দ হাসিয়া বলিল, 'তুমি আমায় টিকতে দেবে না মহেশ।'

মহেশও হাসিয়া বলিল, 'আপনাকে আমি আর ছাড়ব না প্রভু, আজ থেকে আপনি আমার হয়ে গেলেন।'

অন্য কেহ হইলে হয়তো একথার জবাবে তামাশা করিয়া বলিত, আজ তোমার সম্পত্তি হয়ে গেলাম মহেশ? কিন্তু ওসব রসিকতা সদানন্দের আসে না। মহেশ যে তাকে সত্যসত্যই স্থায়ীভাবে এখানে আটকাইয়া ফেলিবার বিরাট আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, সদানন্দের এটা যেন ভাল লাগিতেছিল না। বিপিন একবার রাগ করিয়া আশ্রম হইতে একদিনের জন্য কিছু না বলিয়া যখন চলিয়া গিয়াছিল, আশ্রমের পাশের আমবাগানটি যেবার সে বাগাইয়া আনে, তখন বিপিনের জন্য তার কি রকম মন কেমন করিয়াছিল, সদানন্দের মনে আছে। আজ নিজে রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াও তার তেমনি মন কেমন করিতেছে। সেবার যেমন কেবলি মনে হইত বিপিন ফিরিয়া আসিবে, আজ তেমনি আশা হইতেছে বিপিন হয়তো ডাকিতে আসিবে, হাতে পায়ে ধরিয়া তাকে ফিরাইয়া নিয়া যাইবে।

মহেশ চৌধুরী বলে, 'আশ্রম থেকে আপনার জিনিসপত্র সব আনিয়ে নিই প্রভু?'

সদানন্দ বারণ করিয়া বলে, 'না, না, এখন থাক্। তাড়াতাড়ির কি আছে!'

জন্মের মত আশ্রম ত্যাগ করিয়া সদানন্দ চলিয়া আসিয়াছে, বলিয়া আসিয়াছে জীবনে আর কোনদিন বিপিনের জমিদারিতে আর সে পা দিবে না। আশ্রমের সঙ্গে আর তার কিসের সম্পর্ক? তবু তার নিজস্ব জিনিসপত্রগুলি যতক্ষণ আশ্রমে আছে, একটু যেন যোগাযোগ বজায় রহিয়াছে ততক্ষণ আশ্রমের সঙ্গে, ওই যোগাযোগটুকুও ঘুচাইয়া ফেলিতে সদানন্দের ইচ্ছা হয় না। তাছাড়া, সদানন্দের একটু ভয়ও হয়। জিনিসপত্রগুলি আনাইয়া নিলে বিপিন যদি আরও রাগিয়া যায়, তাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া নিযা যাওয়ার সাধ থাকিলেও যদি ওই কারণেই সে মতটা বদলাইয়া ফেলে!

মহেশ চৌধুরীও বোধ হয় এসব কথা অনুমান করিতে পারে। সদানন্দের আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের পথে আরও একটু বাধা সৃষ্টি করিতে তার আগ্রহ দেখিয়া অন্ততঃ তাই মনে হয়। জিনিসগুলি আনাইবার অনুমতি পাওয়ার জন্য সে পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। পরে আনাইলেও অবশ্য চলিবে, কিন্তু এখন আনাইলেই বা দোষ কি? এক মূহূর্তের জন্যই বা সদানন্দ সামান্য একটু অসুবিধা ভোগ করিবে কেন। মহেশের তো তা সহ্য হইবে না!

কিন্তু সদানন্দ কিছুতেই অনুমতি দেয় না। বলে, 'আজ থাক মহেশ। কাল যা হয় করা যাবে।'

বিপিন তাকে হাতে পায়ে ধরিয়া ফিরাইয়া নিতে আসিবে, সদানন্দের এরকম আশা করার একটু কারণ ছিল। বিপিন সত্যই তাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। সহজ ভাষায় স্পষ্ট করিয়া বলিযাছে, 'আমার আশ্রম ছেড়ে চলে যাও।'

সদানন্দ রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। তাকে এভাবে তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য বিপিনের মন খারাপ হওয়া আশ্চর্য নয়, তাকে ফিরাইয়া নিতে আসাও আশ্চর্য নয়।

সেদিন সকালে বিপিনের বিনা অনুমতিতে মাধবীলতার আশ্রমে আসা এবং সদানন্দের পায়ে বিভূতিকে প্রণাম করানো নিয়া যে কাণ্ডটা হইয়া গিয়াছিল, তারপর সারাদিন বিপিন আর সদানন্দের দেখা হয় নাই।

অনেক রাত্রে বিপিন সদানন্দের ঘরে আসিয়াই বলিয়াছিল, 'সদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম তোকে। আগের মত আমার কথা শুনে চলবি কি চলবি না তুই?'

'আমি কি তোর মাগনায় কেনা চাকর যে, তোর সব হুকুম মেনে চলব?'

'ওসব বাজে কথা থাক। তোর সঙ্গে কোন দিন আমি ওরকম ব্যবহার করি নি, সে সম্পর্ক আমার নয় তোর সঙ্গে। আমার কথা শুনে চলা মানে আমার হুকুম মেনে চলা নয়। নিজেই ভেবে দ্যাখ, আমি বুদ্ধি খাটিয়ে আশ্রমের উন্নতির ব্যবস্থা করব, তুই আমার একটা কথা মানবি, একটা কথা মানবি না, তা'হলে কি আশ্রম চলে? আশ্রমের জন্য তোকে দরকার আছে, কিন্তু আশ্রম চালাবার ক্ষমতা তোর নেই, তুই যদি—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। আসল কথাটা শুনি?'

বিপিন একটু চুপ করিয়া থাকিয়াছিল। রাগ করিবে না এবং তর্ক করিবে না ঠিক করিয়াই সে এখন সদানন্দের কাছে আসিয়াছে, কিন্তু আজকাল কথায় কথায় সদানন্দের সঙ্গে তর্ক করিতে ইচ্ছা হয়, ঝগড়া করিবার সাধ জাগে।

'আসল কথাটা এই। আগে যেমন সব বিষয়ে আমার কথা শুনে চলতিস, তেমনিভাবে যদি না চলিস, তোকে দিয়ে আমার কাজ হবে না।'

'না হলে কি করবি?'

'তোকে বিদেয় দেব।'

'বিদেয় দিবি! তোর তো স্পর্ধা কম নয়। তোকে কে বিদেয় দেয় ঠিক নেই—'

'আমার আশ্রম থেকে আমাকে কে বিদেয় দেবে?'—বিপিন হাসিয়াছিল।

সদানন্দ সগর্বে বলিয়াছিল, 'আমি একটা মুখের কথা বললে সবাই তোকে কেটে মাটিতে পুঁতে ফেলবে, তা জানিস?'

বিপিন নির্বিকারভাবেই বলিয়াছিল, 'বলেই দ্যাখ না মুখের কথাটা?'

কথাটায় ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। সদানন্দ হুকুম দিলেও আশ্রমের কেউ বিপিনের বিরুদ্ধে যাইবে না। এ বিষয়ে সদানন্দের মনেও বারবার একটা খটকা আছে। সকলে তাকে ভক্তি করে বটে, কিন্তু সাধুতার মধ্যে যেমন ফাঁকি আছে, সকলের ভক্তির মধ্যেও তেমনি একটা ফাঁকি আছে বলিয়া সদানন্দের সন্দেহ হয়।

বিপিন একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিয়াছিল, 'তুই বড় বোকা সদা। সবাই টিপ্ টিপ্ করে প্রণাম করে, আর তুই ভাবিস্ তোর জন্য প্রাণ দিতে সবাই ছটফট করছে। প্রাণ পাওয়া অত সহজ নয় রে! আমি তোকে ভড়ং শিখিয়েছি, সেই ভড়ং করে লোকের মনে তুই জন্মিয়েছিস একটা ভয়। তুই থাকিস একটা ধোঁয়ার আড়ালে, তোর সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না, সকলের সামনে মহাপুরুষের মত চলিস ফিরিস, সবাই তাই তোকে মহাপুরুষ ভেবে রেখেছে। কল্পনা-জগতের অবাস্তব প্রমাণ দেখিয়ে দেখিয়ে তোকে আমার মহাপুরুষ দাঁড় করাতে হয়েছে। তুই যে মহাপুরুষ নোস্, তার একটা বাস্তব প্রমাণও কেহ যাতে না পায়, সেইজন্যই তোকে আমার লুকিয়ে রাখতে হয়। সকলে তোকে কি রকমের ভয় ভক্তি করে জানিস? কাল যদি আমি রটিয়ে দিই তোর অত্যাচারে মাধুকে আশ্রম ছাড়তে হয়েছে, সবাই তাই বিশ্বাস করে বসবে। মাধুকে নিয়ে কয়েকটা যে বোকামি করেছিস, সেগুলি হবে তার বাস্তব প্রমাণ। এত বড় সাধু তুই, কিন্তু তোর সাধুত্বের বাস্তব প্রমাণ নেই কিনা, তাই মাধুর সম্বন্ধে তোর বোকামির ওই কটা তুচ্ছ প্রমাণেই তোর সাধুত্ব ফেঁসে যাবে।'

'মাধুকে নিয়ে কি বোকামি করেছি?'

'জানিস না? তা, না জানতে পারিস! চোর কি করে জানিস, যখন দরকার নেই তখন বেশি বেশি সাধু ব'নে থাকে, আর চুরি করার সময় ভাবে কেউ জানতে পারছে না। তবু চোর ধরা পড়ে জেলে যায়। আজ সকালেই তো সকলের সামনে কেঁদে কেঁদে বললি, একবার আমার ঘরে আসবে না মাধু? আহা, একটা মেয়ের কাছে কি করুণ মিনতি মহাপুরুষ সদানন্দের! মাধু মুখ ফিরিয়ে গটগট করে চলে গেল। কথাটা কেউ মনে আনছে না তাই, কিন্তু একবার যদি কেউ সুর তোলে, কারও দু'বার ভাবতে হবে না কিসের মানে কি।'

এবার সদানন্দ রাগ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, বিপিনের মনটাই কদর্য। কতদূর কদর্য, লাগসই উপমা দিয়াও বুঝাইয়া দিয়াছিল। বিপিন যা ভাবে, কেউ তা ভাবিবে না। সকলে তো বিপিন নয়, বিপিনের মত কুৎসিত মন তো নয় সকলের, বিপিন যেমন বড়লোকের পা-চাটা, ফন্দিবাজ, হীন, বিশ্বাসঘাতক মানুষ—

'তিন দিনের মধ্যে তুই আমার আশ্রম ছেড়ে চলে যাবি। আমি যাই হই, আশ্রমের কুটোটি পর্যন্ত আমার, তা মনে রাখিস। তুই সত্যি আমার চাকর—তোকে থাকবার কোয়ার্টার দিয়েছি, খেতে পরতে দিয়েছি, চাইলে মাইনে বাবদ কিছু টাকা পাবি, ব্যস। আর কোন কিছু অধিকার তোর নেই।'

'আচ্ছা, রাজাসায়েবের সঙ্গে সে বোঝাপড়া হবে।'

'রাজাসায়েব? রাজাসায়েব কি করবেন? দুদিন আগে রাজাসায়েবের যা খুশি করার ক্ষমতা ছিল, এখন আর নেই। এখন সমস্ত কিছুর মালিক আমি। তুই কি ভাবিস সেবার গিয়ে আমি শুধু আমবাগানটা বাগিয়ে এনেছি? সব নিজের দখলে এনেছি। টাকা পয়সার মালিক তো ছিলাম প্রথম থেকেই, এবার জমিজমারও মালিক হয়েছি। কি করবেন বল্ রাজাসায়েব, ক' বিঘা জমির জন্য ছেলেকে তো আর জেলে পাঠাতে পারেন না।'

'জেল!'

'আমি না বাঁচিয়ে দিলে, মাধুর জন্য নারাণবাবুর জেল হত বৈকি।'

'ও!'

সদানন্দ চুপ করিয়াছিল অনেকক্ষণ।

'আশ্রমের আয়ে প্রথম থেকে তোর অধিকার ছিল?'

'ছিল বৈকি। আমার নামে আশ্রম হল, আশ্রমের আয় আমার হবে না? লোকসান হলেও অবশ্য আমার ঘাড়ে চাপত। প্রথমে ক'জনকে নিয়ে কতটুকু আশ্রম হয়েছিল মনে আছে সদা? তখন তোরা ভাবতেও পারিস নি একদিন আশ্রম এতবড় হবে—দিনরাত কেবল কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করতিস, আশ্রম চলবে না, আশ্রম চলবে না। রাজাসায়েবও আশ্রমের এ রকম উন্নতির কথা ভাবতে পারেন নি, তাই প্রথম দফায় অল্প জমি আমাকে একেবারে দান করে দিয়েছিলেন। পরের দফায় যখন জমি দিলেন, তখন করলেন কি জানিস, এত সব অধিকার চেয়ে বসলেন যে, আশ্রম নিয়ে যা খুশি করতে পারেন। আমি তাতেই রাজী হয়ে গেলাম। জানতাম, একদিন সমস্ত ক্ষমতা আবার আমার হাতেই ফিরে আসবে।'

এক মুহূর্তের জন্য বিপিন থামিয়াছিল, তারপর আবার বলিয়াছিল, 'এসব কথা তোকে বলতাম না, তোকে আর রাখা চলবে না বলেই বললাম। আমার আশ্রম ছেড়ে তুই চলে যা ভাই, দোহাই তোর। গোলমাল তুই করতে পারিস, কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না, যেতে তোকে হবেই। গোলমাল না করে যদি চলে যাস, আশ্রমের লাভের একটা ভাগ বরং তোকে দেব, যতই হোক, এতদিন তো তুই আশ্রমের উন্নতিতে সাহায্য করেছিস, কিছু দাবী তোর

আছে। ওই টাকায় যেখানে খুশি নিজের একটা ছোটখাট আশ্রম তুই খুলতে পারবি।'

রাত্রি বাড়িবার জন্যই ঘরের আলোটার জ্যোতি যেন একটু ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছিল। দুজনে চুপ করিয়া থাকিয়াছে। বিপিন একবার ভাল করিয়া মুখখানা দেখিয়াছে সদানন্দের, সদানন্দ একবার ভাল করিয়া মুখখানা দেখিয়াছে বিপিনের। ব্যাপারটা গুরুতর, তাই তারা ভিন্ন কে বুঝিবে কি গুরুত্ব সেই দেখার! দুজনে তারা বন্ধু, বন্ধুব মধ্যে ছাড়া এমন ব্যাপার ঘটে না, এ রকম বিচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় না। সদানন্দ কি বলিত অনুমান করা কঠিন, বিপিন একটা খাপছাড়া কথা বলিয়া বসায় সে আর মুখ খোলে নাই।

'আরও একটা জিনিস তোকে দিলাম সদা। মাধুকে তুই নিস্ । ওকে দিয়ে আমার আর দরকার নেই।'

বিপিনের শেষ কথাটার কোন মানে হয়? মাধবীলতাকে সে দান করিয়া দিল, মাধবীলতা যেন তার সম্পত্তি! আশ্রমটা সম্পূর্ণরূপে নিজের দখলে আনার জন্য এতদিন মাধবীলতাকে তার দরকার ছিল, এখন আর দরকার নাই, তাই বন্ধুকে দিয়া দিয়াছে! কেমন লাগে কথাটা ভাবিতে? মনটা কি রকম জ্বালা করে? কে বলিয়াছে বিপিনকে, মাধবীলতাকে তার দরকার আছে?

তবু বিপিনের কথার একটা ইঙ্গিত নিন্দনীয় অভিপ্রায়ের ধারাবাহিক অবাধ্যতার মত মনের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়ায়। মাধবীলতাকে নিয়া সদানন্দ এবার যা খুশি করিতে পারে, বিপিনেব দিক হইতে এতটুকু বাধার সৃষ্টি হইবে না। মাধবীলতাকে বিপিন আশ্রমে আনিয়াছিল কিন্তু ওর সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব তার শেষ হইয়া গিয়াছে। হয়তো এতটুকুই ছিল বিপিনের আসল বক্তব্য। মাধবীলতার সম্বন্ধে বন্ধুকে অভয় দেওয়া।

মহেশ যখন সদানন্দকে তার ঘরে একা বিশ্রাম করিবার সুযোগ দিয়াছে, সকলকে বারণ করিয়া দিয়াছে ঘরে যাইতে, তখন মাধবীলতা আসিয়া হাজির হয়।

'ব্যাপার কি বলুন তো?'

'এসো মাধু। বোসো।'

'বসছি, কিন্তু ব্যাপারটা কি হ'ল?'

'ব্যাপার আর কি হবে, ঝগড়া করে চলে এলাম। ও রকম স্বার্থপর ছোটলোকের সঙ্গে মানুষের পোষায়? এতদিন সহ্য করেছিলাম, আর সহ্য হল না।'

মাধবীলতা মুখ গম্ভীর করিয়া বলে, 'আপনাদের দিয়ে কোন ভাল কাজ হতে পারে না। খালি নিজেদের মধ্যেই মারামারি করবেন তো কাজ হবে কি। ছি ছি, নিজের নিজের স্বার্থচিন্তাই যদি করবেন দিনরাত, এসব কাজে কেন আসেন আপনারা?'

সদানন্দ গম্ভীরভাবে একটু হাসিয়া বলে, 'স্বার্থচিন্তাই যদি করতাম মাধু, আশ্রম ছেড়ে আজ চলে আসতে হত না। বিপিনের বদলে আশ্রমটা আমিই দখল করতাম।'

'পারলে তা করতেন।'

মাধবীর মন্তব্যে সদানন্দ রাগ করিয়া বলে, 'আমাকে কি তুমি বিপিনের মত অপদার্থ ভাব?'

'বিপিনবাবুকে আমি অপদার্থ ভাবি না।'

'মহাপুরুষ ভাব বুঝি?'

সদানন্দের ব্যঙ্গের জবাবে মাধবীলতাও ব্যঙ্গ করিয়া বলে, 'বিপিনবাবু কেন মহাপুরুষ হবেন, মহাপুরুষ তো আপনি!'

মাধবীলতা আর সে মাধবীলতা নাই। সদানন্দের কাছে সব রকম চাপল্য হারাইয়া আর সে জড়সড় হইয়া যায় না, ভয়ে ভয়ে হিসাব করিয়া কথা বলে না, অনায়াসে ব্যঙ্গ করে। মাধবীলতার সঙ্গে সদানন্দের ব্যবহারও অবশ্য বদলাইয়া গিয়াছে। বাহিরের সকল ভক্তের সঙ্গে আলাপ করার অভ্যস্ত ভঙ্গিতেই প্রথম প্রথম সে মাধবীলতার সঙ্গে আলাপ করিত, মাঝে মাঝে সব গোলমাল হইয়া যাইত বটে, কিন্তু তাও যেন ছিল ছেলেমানুষী ভাবপ্রবণতার আবরণে মানবীকে দেবতার প্রশ্রয় দেওয়া, দেবতার বাড়াবাড়ি অন্তরঙ্গতার জবাবেও যাতে মাথা তুলিবার সাহস মানবীর হয় না। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে মাধবীলতার সঙ্গে আলাপ করাটা তার নামিয়া গিয়াছে বিপিনের সঙ্গে আলাপ করার স্তরে।

মাধবীর আগের মন্তব্যে সদানন্দ রাগ করিয়াছিল, এবারকার ব্যঙ্গে হাসিয়া বলে, 'তোমার কাছে তাই বটে। আমাকে মহাপুরুষ না ভেবে তো তোমার উপায় নেই।'

'কেন?'

'তোমাকে যে তাহলে দ্বিচারিণী হতে হবে।'

মুখ মাধবীর লাল হয় না, বিবর্ণ হইয়া যায়। ধীরে ধীরে উঠিয়া সে বাহিরে চলিয়া যায়।

সদানন্দ নীচু গলায় ব্যগ্রভাবে বলে, 'রাগ করলে মাধু? শোন, শুনে যাও—'

কিন্তু মাধবীলতা আজকাল বড়ই অবাধ্য হইয়াছে, কোন কথাই শুনিতে চায় না।

সদানন্দ যতই আশা করুক, বিপিন তো আসেই না, আশ্রম হইতে কোন শিষ্যও আসে না। সদানন্দ কারও কাছে কিছু বলিয়া আসে নাই, আশ্রমের শিষ্যদের কিছু জানাইবার কথা ভাবিতেও তার সঙ্কোচ হইতেছিল। বিপিন তাদের কি বুঝাইয়াছে, সেই জানে। হয়তো আশ্রমের কেউ এখনও জানিতেই পারে নাই, সদানন্দ চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছে অথবা সদানন্দ বাগবাদায় মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে গিয়া উঠিয়াছে। হয়তো বিপিন তাদের বুঝাইয়াছে, সদানন্দ বিশেষ কারণে কিছুদিন মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে বাস করিতে গিয়াছে, তাকে গিয়া কারও দর্শন করা বারণ। বিশেষ কারণটাও হয়তো বিপিন সকলকে ইঙ্গিতে জানাইয়া দিয়াছে। মাধবীলতার আকর্ষণ।

মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে আসিয়া উঠিলে বিপিন যে এমন একটা ইঙ্গিত করার সুযোগ পাইবে, এখানে আসিবার আগে সদানন্দের সেটা খেয়াল হয় নাই। যাই হোক, এখন নানাভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কথাটা সে ভাবে। মাধবীলতা এখানে আসিবার কয়েকদিন পরে সেও আসিয়া হাজির হইয়াছে, মাধবীলতার সঙ্গে তাব নাম জড়াইয়া কলঙ্ক রটানোর পক্ষে এ একটা জোরালো যুক্তিই বটে। ভাবিতে ভাবিতে মাথা গবম হইয়া উঠিলে এই বলিয়া সদানন্দ নিজেকে সান্ত্বনা দেয় যে, বিপিন কি বলিয়াছে কি বলে নাই না জানিয়া নিজের মনের অনুমান নিয়া বিচলিত হওয়ার কোন কারণ হয় না। হয়তো ক্ষতিকর কিছুই বিপিন বলে নাই, সদানন্দের অন্তর্ধানের একটা সাধারণ ও সঙ্গত কারণই সকলকে জানাইয়াছে। আর যদি সত্য সত্যই তাকে ফিরাইয়া নিয়া যাওয়ার ইচ্ছা বিপিনের জাগিয়া থাকে, তবে হয়তো সেই সঙ্গে একথাও সকলকে জানাইয়া দিয়াছে যে, কয়েকদিন পরেই সাধুজী আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

আশ্রমের কেউ না আসুক, আশেপাশের গ্রামের নরনারী দলে দলে সদানন্দকে দর্শন ও প্রণাম করিতে আসে। প্রথমে ঝোঁকের মাথায় সদানন্দ এখানে সকলের কাছে নিজের আশ্রমত্যাগের ভিতরের ব্যাপারটা ঘোষণা করিয়া ফেলিয়াছিল, তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া মহেশ চৌধুরীকে বলিয়া দিয়াছে, কথাটা কয়েকদিন যেন বাহিরে প্রকাশ না পায়।

'এখন সকলকে জানিও, আমি এমনি কয়েকদিন তোমার এখানে থাকতে এসেছি।'

'প্রভু?'

সদানন্দ বুঝিতে পারিয়াছে।

'না, মিথ্যে কথা তোমায় বলতে বলিনি মহেশ। তোমরা যে জানো আমি কেন আশ্রম ছেড়ে এসেছি, একথা অস্বীকার করবে কেন? শুধু বলবে যে, কারণটা এখন প্রকাশ করা হবে না।'

পরদিন সকালেই দলে দলে দর্শনার্থীর সমাগম ঘটায় মহেশ বারণ না মানিয়া সব কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে ভাবিয়া সদানন্দ প্রথমটা বড়ই রাগিয়া যায়।

মহেশ চৌধুরী বলে, 'আজ্ঞে না, আমি কিছুই বলি নি। আপনি এখানে এসেছেন জেনে সকলে প্রণাম করতে আসছে।'

'আমি এখানে এসেছি, একথাটাও এত তাড়াতাড়ি নাই বা ছড়িয়ে দিতে মহেশ? দু'দিন একটু শান্তিতে থাকতাম।'

'আপনি এসেছেন, একথা কি ছড়িয়ে দেবার দরকার হয প্রভু? মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে যায়। সূর্যকে কি লুকিয়ে রাখা চলে প্রভু! কাল সকালে যখন এলেন, তখনি গাঁয়ের অর্ধেক লোক জেনে গেছে আপনি এসেছেন। কাল অনেকে এসেছিল, আমি আপনাকে বিরক্ত করতে দিই নি। আজ আসতে বলে দিয়েছিলাম।'

সকলে আসে, প্রণাম করিয়া যায় এবং অনেকে প্রণামীও দেয়। মাধবীলতা কাছে উপস্থিত থাকিলে কেউ কেউ কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকে দ্যাখে, কৌতূহলের সঙ্গে মেশানো থাকে ভয়। কে জানে, মাধবীলতাব সম্বন্ধে তাদের মনে কি কল্পনাব ছায়া ভাসিয়া আসিতে শুরু করিয়াছে। মেযে দরকার হয়, এমন সাধনাও তো সাধু-পুরুষেরা কবে, শব-সাধনার মত যে সব সাধনার কাল্পনিক বিবরণ শুনিলেই সাধারণ মানুষের রোমাঞ্চ হয়।

প্রণামী নিয়া একটু বিপদ হয়। প্রণামী নেওয়া হইবে কিনা, সদানন্দও ঠিক করিতে পারে না, মহেশও ঠিক করিতে পাবে না। প্রথমে মুখ খোলে মহেশ।

'কি করব প্রভু?'

'তুমি কি বল মহেশ?'

'আমাব মনে হয়, প্রণামী এখন না নেওয়াই ভাল। এখন প্রণামী নিলে যেন নিজের জন্য নেওযা হবে প্রভু। আশ্রম খোলা হলে তখন আশ্রমেব জন্য প্রণামী নিলে দোষের হবে না।'

শুনিয়া সদানন্দ ভাবে, মহেশ তবে তাকে নিয়া নূতন একটি আশ্রম খুলিবাব কল্পনা আরম্ভ করিযা দিয়াছে? কে জানে, প্রথম হইতেই মনে মনে মহেশের এ মতলব ছিল কি না! হয়তো এরকম একটা উদ্দেশ্য নিয়াই তাকে বাগানোর জন্য এতকাল মহেশ হাজার অপমান সহিয়াও আশ্রমে যাতায়াত করিয়াছে, অতিভক্তির বন্যায় তাকে ভাসাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে। প্রথম প্রথম মহেশকে একটু বোকা মনে হইত, কিন্তু এখন সময় সময় সদানন্দের তাকে বিপিনের চেয়েও চালাক মনে হয়।

না, ঠিক বিপিনের চেয়ে চালাক নয়, বিপিনের চেয়ে বুদ্ধিমান মনে হয়। বিপিনের সঙ্গে মহেশের পার্থক্য এত বেশি প্রকট যে, দুজনের বুদ্ধিকে এক শ্রেণীতে ফেলিতে মনে খটকা লাগে। মহেশও হয়তো বিপিনের মতই ভাল উদ্দেশ্যে ভড়ং করে, মিথ্যার আশ্রয় নেয়, মনে মনে ধারণা পোষণ কবে যে, বোগীকে আর শিশুকে ভুলানোর মত জগতের পীড়িত, বয়স্ক

শিশুগুলিকে দরকারমত ভুলাইলে দোষ হয় না, তবু যেন বিপিনের বেলা এসব মনে হয় অন্যায় কিন্তু মহেশের বেলা অন্যায়ের প্রশ্ন মনেও আসেও না।

তবে একথা সত্য যে, বিপিনের ঘোরপ্যাঁচ বুঝা যায়। উদ্দেশ্য তার অতি মহৎ, এটা বুঝা গেলে, প্যাঁচ যে কষিতেছে সে অতি জটিল, তাতে আর সন্দেহ থাকে না। মহেশের উদ্দেশ্য না বুঝিলেও, কখনও জোর করিয়া ভাবা চলে না তার মধ্যে ঘোরপ্যাঁচ আছে, মতলব হাসিল করিবার জন্য তলে তলে সে চালিতেছে চাল।

কেন এমন হয়? দশজনের ভালর জন্য একজনের সর্বনাশ করাটা বিপিন অন্যায় মনে করে না, কিন্তু কারও সামান্য একটু ক্ষতি করার চিন্তা মহেশের পক্ষে মনে আনাও সম্ভব নয়, এইজন্য? সদানন্দের মনে হয়, আরও অনেক কারণ আছে। মহেশের মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ আছে, বিপিনের যা নাই। বিপিনের মধ্যে এমন কতকগুলি দোষ আছে, মহেশের যা নাই। কিন্তু আসল গুণ বা দোষ, যার শাখা-প্রশাখাই মানুষের মধ্যে ছোট বড় নানা রকম দোষগুণের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, মানুষের তো দশটা থাকে না? কি সেই গুণ মহেশের এবং কি দোষ বিপিনের অথবা কি সেই দোষের অভাব মহেশের এবং কি সেই গুণের অভাব বিপিনের, যার জন্য দু'জনের মধ্যে এতখানি পার্থক্য সম্ভব হইয়াছে?

ভাবিতে ভাবিতে সদানন্দ আনমনে বলে, 'আচ্ছা, এখন তবে প্রণামী নিও না।'

মনে হয়, সাধু সদানন্দ যেন মহেশ চৌধুরীকে এই কয়েকটি কথার মধ্যে নূতন একটি আশ্রম খুলিবার অনুমতিই দিয়া ফেলিয়াছে, মহেশ চৌধুরীর মুখখানা আনন্দে এমনি উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

।। এগারো ।।

দিন কাটিয়া যায়, আশ্রম হইতে বিপিনও আসে না, কোন শিষ্যও আসে না। সদানন্দ আকাশ-পাতাল ভাবে মন খারাপ করিয়া। শিষ্যদের না আসিবার কারণটা যে সদানন্দ মোটামুটি অনুমান করিতে পারে না, তা নয়। বিপিনের কোন কারসাজি আছে নিশ্চয়; কিন্তু আশ্রমে কি এমন ভক্ত তার একজনও নাই, বিপিনের কোন কথায় কান না দিয়া যে তার সঙ্গে দেখা করিতে আসাটা দরকার মনে করে? মুখখানা তার বড় বিমর্ষ দেখায়। কেউ সেটাকে ভাবে গাম্ভীর্য, কেউ মনে করে গভীর চিন্তার ছাপ। যে বুঝিতে পারে সাধু সদানন্দের মুখখানা বিষণ্ণ দেখাইতেছে, সে ভাবে, সাধু সন্ন্যাসী মানুষের আবার মন খারাপ হওয়া কেন? মাধবীলতা মনের দুঃখে মাথা নাড়িয়া ভাবে, নাঃ, লোকটার একটুও মনের জোর নেই।

একদিন রাত্রি প্রায় আটটার সময় বিনা খবরে রত্নাবলী আসিয়া হাজির হয়। সঙ্গে কেউ নাই। কার একটা মোটা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া একাই এতখানি রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়াছে।

মাধবীলতা চোখ কপালে তুলিয়া বলে, 'কি করে এলি!'

রত্নাবলী হাসিয়া বলে, 'এলাম।'

মাধবীলতা খুঁত খুঁত করিয়া বলে, 'দিনের বেলা এলেই হত, নয়তো কাউকে সঙ্গে নিয়ে—'

'চুপি চুপি এলাম যে লুকিয়ে।'

'কেন, লুকিয়ে কেন?'

'বিপিনবাবু টের পেলে তাড়িয়ে দেবে না আশ্রম থেকে?'

'দেয় দেবে তাড়িয়ে, এখানে এসে থাকবি তুই।'

'আহা, সেটা জানতে হবে তো আগে? এখানে থাকতে পাব কিনা, না জেনে আগে থেকে ওখানকার আশ্রয়টা তো আর ঘুচিয়ে দিতে পারি না।'

রত্নাবলী গোড়া হইতে হাসিতেছিল, এবার হাসিল শশধরের দিকে তাকাইয়া।

ঘরে অনেক লোক, কিছুক্ষণ আগে মহেশ চৌধুরীর চেষ্টায় এ ঘরে বাড়ীর সকলের ঘরোয়া মজলিস বসিয়াছে। হাতে পায়ে ধরিয়া সদানন্দকে মহেশ এ মজলিসে টানিয়া আনিয়াছে। সতরঞ্চি বিছানো প্রকাণ্ড চৌকিতে অন্য সকলে বসিয়াছে, কিছু তফাতে অন্য একটি ছোট চৌকিতে ঘরে বোনা সুদৃশ্য আসনে সদানন্দের বসিবার ব্যবস্থা। আশ্রমে সদানন্দের কুটীরে মাঝে মাঝে শিষ্য ও ভক্তদের মজলিসে সদানন্দ উপস্থিত থাকিত, নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করা, সদানন্দকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, এসব অধিকার ভক্তদের কিছু কিছু থাকিত, তবু সে মজলিসের অনেক তফাৎ। যেটুকু স্বাভাবিক হওয়ার স্বাধীনতা সেখানে সকলকে দেওয়া হইত, সদানন্দের সামনে সেটুকু স্বাধীনতা কাজে লাগানোর সাহস কারও হইত না, সকলে কথা বলিত ভয়ে ভয়ে। এখানে মহেশ নিজেই বাজে গল্প আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, রত্নাবলী যখন ঘরে ঢোকে, বিভূতি রস দিয়া জেলের কাহিনী বলিতেছে, সকলে মন দিয়া শুনিতেছে তার কথা, সদানন্দের দিকে কারও নজর নাই! বিপিন সদানন্দকে আড়ালে রাখিত তার অসাধারণত্ব অটুট রাখিবার জন্য, মহেশের সব ব্যবস্থাই যেন উল্টা, সে যেন সকলের সামনে আনিয়া সদানন্দের কৃত্রিম অসাধারণত্বের আবরণটি ঘুচাইয়া দিতে চায়। বিভূতির গল্প শুনিতে শুনিতে সদানন্দ এই কথাটাই ভাবিতেছিল। বিভূতির মাও ঘরে আসিয়াছে, ছেলের দুর্দশার রসালো কাহিনী শুনিতে শুনিতে তার চোখ ছলছল করিতেছিল। ঘরে আসে নাই কেবল শশধরের ঘোমটা-টানা বৌ। তবে তার অনুপস্থিতিটা কেউ একবার খেয়াল করিয়াছে কিনা সন্দেহ। বাড়ীর কারও চেতনায় নিজের অস্তিত্বের সাড়া না তুলিয়া বাঁচিয়া থাকিবার কঠিন সাধনায় বৌটি প্রায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ফেলিয়াছে।

রত্নাবলীর কথার জবাবে মহেশ চৌধুরী বলিল, 'তুমি তো আমার মেয়ে, মা? এখানে থাকতে পাব কিনা তাতে তো তোমার সন্দেহ থাকা উচিত নয় মা!'

রত্নাবলী এবার হাসিল না।—'না না, এমনি কথাটা বলছিলাম মাধুকে তামাশা করে। থাকতে পাব বৈকি এখানে।'

'তুমি এখানে এসে থাকলে আমরা বড় সুখী হব মা।'

'আমি তো যখন খুসী আসতে পারি, কেবল উমা মাসীর জন্যে—', রত্নাবলী একটু হাসিল।

মহেশ বলিল, 'প্রভু যখন এখানে আছেন, ওঁকে বললে উনি এসে এখানে থাকতে রাজী হবেন না?'

'মনে তো হয় না। উনি বড় চটেছেন।'

রত্নাবলী আসিয়া সদানন্দকে প্রণাম করে নাই। সদানন্দ এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, এবার জিজ্ঞাসা করিল, 'উমা চটেছে কেন?'

'আজ্ঞে, আপনি সন্ন্যাস ছেড়ে দিলেন বলে।'

'সন্ন্যাস ছেড়ে দিলাম? সন্ন্যাস ছেড়ে দিলাম মানে?'

'সন্ন্যাস ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন নি আপনি?'

'বিপিন বলেছে বুঝি?'

রত্নাবলী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, বলিল, 'তা ছাড়া, সন্ন্যাস না ছাড়লে গেরস্তের বাড়ি তিন রাত্রির বেশী বাস করছেন কি করে।'

সদানন্দের তীব্র দৃষ্টিপাতে রত্নাবলী মাথা হেঁট করে, সকলে স্তব্ধ হইয়া থাকে মহেশ চোখ বুঁজিয়া হাঁটুতে হাত বুলায়। মাধবীলতা চাহিয়া দেখিতে থাকে সকলের মুখের দিকে।

হঠাৎ সদানন্দ বলিল, 'তাই বুঝি তুমি আজ আমায় প্রণাম করলে না?'

রত্নাবলী মাথা হেঁট করিয়া রাখিয়াই বলিল, 'আজ্ঞে না। আমার আজ কাউকে প্রণাম করতে নেই।'

'ওঃ!' বলিয়া সদানন্দ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।—'আর কি বলেছে বিপিন আমার নামে?

মহেশ চৌধুরী হাত জোড় করিয়া বলিল, 'প্রভু?'

সদানন্দ অধীর হইয়া বলিল, 'না মহেশ, আমায় শুনতে দাও। বলো রতন, বলো আর কি বলেছে বিপিন?'

রত্নাবলী বলিল, 'আমি আর কি বলব, ও তো সবাই জানে।'

'তবু তুমিই বল না শুনি।'

রত্নাবলী মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি জানেন না কিছু?'

সদানন্দ বলিল, 'না। কি জানি না?'

'তবে তো সত্যি নয়!'—খুব সম্ভব রত্নাবলীর বিস্ময় আরও বাড়িয়া যায়, কিন্তু সেটা মুখে ভাল করিয়া ধরা পড়ে না, হাসি ছাড়া আর কিছুই রত্নাবলীর মুখে ভাল করিয়া পরিস্ফুট হয় না।—'ওমা, আমি তো সত্যি কিনা জানতেই ছুটে এলাম! সত্যি নয় তবে! কি কাণ্ড মা, এ্যাঁ! এমন করে বলতে পারেন বিপিনবাবু!'

'কি ছ্যাবলামি করছ রতন? কি সত্যি নয়? কি বলেছে বিপিন?'

সদানন্দের ধমকে রত্নাবলী মুষড়িয়া গেল, আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'আর আমি তা উচ্চারণ করতে পারব না! সত্যি যখন নয়,—ছি ছি...'

কিন্তু আর কি এখন উচ্চারণ না করিলে চলে? কদিন ধরিয়া আশ্রম আর বিপিনের কথা ভাবিতে ভাবিতে সদানন্দের মাথা গরম হইয়া গিয়াছে, তার উপর রত্নাবলীর এতক্ষণের ভণিতা! সদানন্দ সিধা হইয়া বসিয়া ডাকে, 'রতন!'—আর সে ডাক শুনিয়া ঘরের সকলের বুক কাঁপিয়া ওঠে।

'আমার দিকে মুখ করে বোসো।'

রত্নাবলী সদানন্দের দিকে মুখ করিয়া বসে।

'চোখের দিখে তাকাও আমার।'

রত্নাবলী সদানন্দের চোখের দিকে তাকায়।

'এইবার বলো।'

রত্নাবলী বলে, তবে বলার আগে চোখ নামাইয়া নেয়। প্রথমে আশ্রমে রটিয়াছিল সদানন্দ সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়াছে। তারপর কয়েকদিন আগে রটিয়াছে, সদানন্দ নাকি মাধবীলতাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে। সন্ন্যাস ত্যাগ করার উদ্দেশ্যও তাই। খবরগুলি অবশ্য রত্নাবলী সোজাসুজি বিপিনের কাছে শোনে নাই। তবে আশ্রমে বিপিন ছাড়া এসব খবর আর কে ছড়াইবে?

আশ্রমের কেউ আসে নাই কেন? বিপিন একদিন আশ্রমের সকলকে একত্র করিয়া বলিয়া

দিয়াছে, যে কারণেই হোক, সদানন্দ যখন কারও কাছে বিদায় না নিয়া আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সঙ্গে দেখা করিতে যাওয়া উচিত হইবে না। যতই হোক, এতদিন তো সদানন্দ তাদের শ্রদ্ধেয় গুরুদেব ছিলেন! যুক্তিটার জন্য যত না হোক, বিপিনের হুকুমের বিরুদ্ধে কেউ আসিতে সাহস পায় নাই। বিপিন এই রকম ভাবেই হুকুম দেয়। তা ছাড়া, মনেও সকলের প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে। কয়েকজন খুব কাঁদিয়াছে।

সদানন্দ সিধা হইয়াই বসিয়া থাকে কিন্তু নিজেকে তার বড়ই দুর্বল অসহায় মনে হইতে থাকে। সে ছাড়া এ জগতে আর সকলেই কি অবস্থা বুঝিয়া হিসাব করিয়া নিজেকে বাঁচাইয়া নিজের কাজ হাঁসিল করিয়া চলিতে পারে, সে-ই কেবল সব সময় ঠকিয়া যায়, না পারে গুছাইয়া কোন একটা কাজ করিতে, না পারে নিজেকে বিপদের হাত হইতে বাঁচাইয়া চলিতে? বিপিন যখন ওদিকে তার নামে নানা কথা রটাইয়া আটঘাট বাঁধিয়া নিতেছে, সে তখন ভাবিতেছে কখন বিপিন আসিবে হাতে পায়ে তাকে ফিরাইয়া নিতে—অনুতপ্ত, লাঞ্ছিত বিপিন! বিপিন যে বলিয়াছিল বাস্তব জগতে তার কোন দাম নাই, কথাটা তো মিথ্যা নয়। কত হিসাব করিয়া বিপিন কাজ করে, প্রত্যেকটি সুযোগ-সুবিধা কিভাবে কাজে লাগায়, সে শুধু বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবে। গৃহস্থের বাড়ী তিনরাত্রির বেশী বাস করা যে সন্ন্যাস-ত্যাগের কত বড় একটা প্রমাণ সাধারণ মানুষের কাছে, আর এক্ষেত্রে সন্ন্যাসত্যাগের কারণ হিসাবে মাধবীলতাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হওয়ার উদ্দেশ্য যে কত জোরালো সমর্থক যুক্তি, কিছুই বিপিনের ভাবিতে বাকী থাকে নাই। আর এখানে আসিবার পরে তার শুধু একবার খেয়াল হইযাছিল মাত্র যে, মাধবীলতার সঙ্গে তার নাম জড়াইয়া বিপিন কুৎসা রটনার সুযোগ পাইবে।

এখন সদানন্দ বুঝিতে পারে, এর চেয়ে কুৎসা রটানো ঢের ভাল ছিল। কারও কারও মনে একটু খটকা লাগিত মাত্র। মহেশ চৌধুরীর এ বাড়ীতে আজ কত যুগ ধরিয়া একটি পারিবারিক জীবনের ধারা বহিতেছে, বাড়ীতে গহিণী আছে, একটি বৌ আছে, মেয়েরা মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করে, এখানে মাধবীলতা আর সাধু সদানন্দেব বাস করাটাই তো নিন্দনীয় হইতে পারে না। মাধবীলতার পিছনে পিছনে সদানন্দও মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইয়াছে, কুৎসার স্বপক্ষে শুধু এই যুক্তি। কিন্তু ও যুক্তি বাতিল হইয়া যাইত দু'দিনে, সদানন্দ যখন ঘোষণা করিয়া দিত আশ্রম সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে—অনাচার ও ব্যভিচারে ভরা বিপিনের টাকা রোজগারের উপায় যে আশ্রম। কিন্তু বিপিন তার নিন্দা করে নাই, তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলে নাই, কেবল এত বড় সাধু সদানন্দ তার সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া সংসারী হওয়ার ইচ্ছার জন্য বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে। এ গুজবও মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া যাইবে, কিন্তু লোকের মনে একটা ছাপ থাকিয়াই যাইবে। কত কথাই মনে হইবে লোকের। কেউ ভাবিবে, কোন কারণে বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল। কেউ ভাবিবে, বিবাহটা বোধ হয় দরকার হইল না, বিবাহ ছাড়াই—

মাধবীলতা সদানন্দের সম্পত্তি, সদানন্দের কোন রোমাঞ্চকর গোপন সাধনার জন্য মাধবীলতাকে প্রয়োজন হয়, এসব কল্পনাও যে ইতিমধ্যে অনেকের মনে দেখা দিয়াছে আশেপাশের গ্রামে, সে খবরটা সদানন্দ জানিত না। নিজে সাধু বনিয়া থাকিয়া সাধু-সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা যে কি রকম, সে বিষয়ে সদানন্দের পরিষ্কার ধারণা নাই। স্ত্রী সঙ্গে থাকিলেও সাধু-সন্ন্যাসীর কিন্তু আসিয়া যায় না, স্ত্রীও যদি সন্ন্যাসিনী সাজিয়া থাকে। তখন লোকে বলে 'মাতাজী' এবং ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া তার পায়েও প্রণাম করে। সাধু-সন্ন্যাসীর নামে স্ত্রীলোক-সংক্রান্ত কুৎসা বলিয়া কিছু হয় না। সাধু সন্ন্যাসী তো সামাজিক জীব নয়,

সাধারণ মানুষ নয়। তাদের কথাই আলাদা। স্ত্রীলোক ছাড়াও তাদের সাধনা চলে, স্ত্রীলোক নিয়াও সাধনা চলে। সে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, যে মুক্ত পুরুষ, তার আবার ব্যভিচার কিসের? কত বদমেজাজী সাধু থাকে, কথায় কথায় রাগে আগুন হইয়া অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেয়, মারিতে ওঠে—কিন্তু সেজন্য কে মনে করে এই সাধুটি ক্রোধ রিপুর বশ, রিপুই যখন দমন করিতে পারে নাই, এ আবার সাধু কিসের? রাগারাগি গালাগালির জন্যই বরং লোকের ভয়ভক্তি আরও বাড়িয়া যায়। কামও তো একটা তুচ্ছ রিপুমাত্র।

তবে জটা-ভস্ম-বিবর্জিত, প্রচলিত কুসংস্কার ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রচারকারী আদর্শবাদী সাধু সম্বন্ধে লোকের মনে আনেক রকম খুঁতখুঁতানি থাকে। এসব সাধু চমকপ্রদ কিছু করে না কিনা, ওষুধ দেয় না, হিমালয়ের দুর্গম গুহায় দিনযাপনের কাহিনী শোনায় না, মাটির নীচে কিছুদিনের জীবন্ত সমাধির পর জ্যান্ত হইয়া আসে না—এক রকম কিছুই করে না। শুধু বলে, এই কোরো না, ওই কোরো না।

তবে সদানন্দকে লোকে অবিকল এই ধরনের সাধুর পর্যায়ে ফেলে না। সদানন্দের কিছু কিছু অলৌকিক শক্তি আর কার্যকলাপের বিজ্ঞাপন বিপিন আগে প্রচার করিয়াছিল।

সকলের আগে কথা বলিল মহেশ চৌধুরী।

'বিয়ের কথাটা মিথ্যে নয় মা। তবে বিপিনবাবু একটু ভুল শুনেছেন। মাধুর বিয়ে হবে আমাদের বিভূতির সঙ্গে।'

মাধবীলতার সঙ্গে সদানন্দের বিবাহের গুজব রটিয়াছে শুনিয়া সকলে হতবাক্ হইয়া গিয়াছিল, মহেশ চৌধুরীর কথা শুনিয়া চমকাইয়া গেল। সকলে এমনভাবে মুখ ফিরাইল মহেশ চৌধুরীর দিকে যে, ঘাড়ে একটু ঝাঁকুনি লাগিল সকলেরই, বিভূতির পাট করা চুলের কিছু অংশ সিঁথি লাইন ডিঙ্গাইয়া ও-পাশে চলিয়া গেল, মাধবীলতার কানে বিভূতির মার আদর করিয়া পরাইয়া দেওয়া দুল দুটি কানের সামনে আর পিছনে জোরে জোরে আঘাত করিয়া দুলিতে লাগিল, রত্নাবলীর এলো খোঁপা খুলিয়া গেল।

তারপর খোঁপা ঠিক করিতে করিতে রত্নাবলী বলিল, 'সত্যি?'

মহেশ চৌধুরী হাসিয়া বলিল, 'সত্যি বৈ-কি মা। এখন একটি শুভদিন দেখে—'

'দিন ঠিক হয় নি?'

'বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে আর দিন ঠিক হতে কতক্ষণ লাগে মা?'

অন্য সকলে এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। এবার সদানন্দ বলিল, 'মহেশ?'

'প্রভু?'

সদানন্দ কিছুই বলিল না।

রত্নাবলী বলিল, 'কিন্তু তুই কি মাধু? আমায় জানাস্ নি কিছু!'

মাধবীলতাও কিছু বলিল না।

রত্নাবলী একবার এদিক ওদিক চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মাধবীলতার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া এক রকম টানিতে টানিতেই তাকে সঙ্গে নিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

তখন বিভূতি গম্ভীরমুখে ডাকিল, 'বাবা?'

মহেশ চৌধুরী বলিল, 'বুঝেছি, তুমি কি বলতে চাও। কিন্তু এখন নাই বা বললি? ভেবে-চিন্তে কথা বলতে কিছু দোষ আছে? যদি কিছু বলার থাকে, কাল না হয় পরশু বলিস, কেমন?'

বিভূতি খুব সম্ভব বলার কথাটা ভাবিয়া দেখার বদলে, কথাটা এখনই বলিয়া ফেলিবে

না ভাবিয়া চিন্তিয়া কাল পরশু বলিবে, গম্ভীরমুখে প্রচণ্ডভাবে ভাবিতে আরম্ভ করিয়া দিল।
সদানন্দ বলিল, 'তোমার ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না মহেশ।'

'প্রভু?'

মুখখানা একবার একটু বিকৃত করিয়া সদানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল, বাহিরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়া বলিল, 'ঘরে গেলাম মহেশ। ঘণ্টাখানেক পরে একবার শুনে যেও।'

মিনিট দুই বসিয়া থাকিয়া বিভূতিও উঠিয়া গেল।

বিভূতির মা তখন বলিল, 'তুমি আর মেয়ে পেলে না?'

'কেন, মাধু তো বেশ মেয়ে।'

'আমার অমন ছেলে, তার জন্যে কুড়োনো মেয়ে!'

'অন্য মেয়ে তোমার ছেলে বিয়ে করলে তো। দ্যাখো, হয়তো শেষ পর্যন্ত না বলে বসবে। কথাটা ভেবে দেখতে রাজী হয়েছে, এইটুকু যা ভরসা। আমি তো ভাবলাম, মুখের উপরেই বুঝি বলে—', চোখ বুঁজিয়া মহেশ একটা নিশ্বাস ফেলিল। পরক্ষণে চোখ মেলিয়া বিভূতির মার ডান হাতটি বুকের উপর রাখিয়া বলিল, 'এখনো বুক কাঁপছে দ্যাখো।'

রত্নাবলীকে আশ্রমের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া আসিতে গেল শশধর। এতক্ষণে মাধবীলতা যেন এত রাতে লুকাইয়া রত্নাবলীর একা এখানে আসার কারণটা বুঝিতে পারিল। একা আসিলেও তাকে যে কেউ পৌঁছিয়া দিয়া আসিতে যাইবে, তা কি আর রত্নাবলী জানিত না? এবং সঙ্গে যে যাইবে, তার শশধর হইতেই বা বাধা কি?

অন্য সময় মাধবীর মনে ব্যাপারটা পাক খাইয়া বেড়াইত, আজ তার এমন একটা বিষয়েও মাথা ঘামানোর ক্ষমতা ছিল না। কি উদ্ভট মানুষ মহেশ চৌধুরী! কেমন অনায়াসে বলিয়া বসিল বিভূতির সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে! কাউকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার মনে করিল না। এক মুহূর্ত আগে এ রকম একটা সম্ভাবনার কথা কি কারও কল্পনাতে ছিল?

অথবা আগেই কথাটা সকলে আলোচনা করিয়াছিল, সেই কিছু জানে না? তাকে না জানাইয়াই সকলে তলে তলে বিভূতির সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে? কিন্তু, তাও কি সম্ভব!

কি হইবে এবার ? মহেশ চৌধুরী তো যা মুখে আসিল বলিয়াই খালাস, ফলটা দাঁড়াইবে কি? সদানন্দ কি করিবে? কি করিবে সদানন্দ? সদানন্দের সেদিনকার সেই কথাটাই ঘুরিয়া ফিরিয়া মাধবীলতার মনে ভাসিয়া আসিতে থাকে, 'আমাকে মহাপুরুষ না ভেবে তো তোমার উপায় নাই, তোমাকে যে তা'হলে দ্বিচারিণী হতে হবে!'

সদানন্দের ভয়টাই মাধবীলতার মনে সব চেয়ে বড় হইয়া দেখা দেয়। বিভূতিকে বিবাহ করার কথাটা সে কখনো ভাবে নাই, এ রকম একটা সম্ভাবনার কথা তার কল্পনাতেও আসে নাই। আজ এ বিষয়ে মাথা ঘামানোই তার পক্ষে উচিত ও স্বাভাবিক ছিল সব চেয়ে বেশী, কিন্তু কথাটা যে বিবেচনা করা দরকার, নিজের মনে তাও যে এ বিষয়ে একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিতে হইবে আজকালের মধ্যে, এটা যেন তার খেয়ালও হইল না। বিভূতির জীবন-সঙ্গিনী হইতে সে রাজী আছে কি নাই, নিজেই সে তা এখনো জানে না। তবু সদানন্দ কি ভাবিবে, সদানন্দ কি বলিবে, সদানন্দ কি করিবে, কল্পনা করিয়া সর্বাঙ্গে যেন রীতিমত অপরাধমূলক ভয়ের টিপটিপানি অনুভব করিতে থাকে।

নিজের ঘরে বিছানায় শুইয়া মাধবীলতা ভাবিতেছিল, কে যেন পাশে আসিয়া বসিল

সন্তর্পণে, চোরের মত। মুখ ফিরাইয়া মাধবীলতা দেখিল শশধরের বৌ ঘোমটা কমাইয়া দিযাছে, তবু কপাল প্রায় সবখানিই ঢাকা।

'দিদি?'

আজ সে প্রথম ঘোমটা কমাইয়া মাধবীলতার সঙ্গে কথা কহিল, এতদিন কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও মাধবীলতা তাকে কথা বলাইতে পারে নাই। হাত দেখিয়াই বোঝা যায় বৌটির রঙ খুব সুন্দর, মুখের রঙ আরও টুকটুকে।

'ঠাকুরপোর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে দিদি?'

এমন সুন্দর মুখের এত আনন্দের কথা কি যে বিশ্রী শুনাইল, বলিবার নয়। বৌটি ফোক্‌লা!

সদানন্দ বলে, 'তবে কি তুমি বলতে চাও, ওদের মধ্যে কোন কথাই হয় নি, বিভূতি আর মাধুর মধ্যে?'

মহেশ বলে, 'আজ্ঞে না। তবে দুজনে বেশ ভাব হয়েছে সেটা তো বোঝাই যায়।'

সদানন্দ বলে, 'ভাব তো আর প্রণয় নয় মহেশ। দুজনে সর্বদা মেলামেশা করছে, এদের ভাব হওয়াটা আশ্চর্য কি। কিন্তু বিয়ে হল আলাদা ব্যাপার। সকলের সামনে কথাটা বলার আগে ওদের একবার জিজ্ঞাসা করা তো তোমার উচিত ছিল? আমার সঙ্গেও তো পরামর্শ করতে পারতে একবার?'

'সময় পেলাম না প্রভু? আপনার নামে অমন একটা কুৎসিত কথা রটেচে শুনে মনে হল, বিয়ে যখন এদের হবেই, আর দেরী না করে মেয়েটিকে কথাটা জানিয়ে দেওয়াই ভাল। মাধুর সম্পর্কে আপনার নামে আর কোন কথাই তা'হলে উঠতে পাবে না!'

'বিয়ে যখন ওদের হবেই মানে?'

'আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে বিয়েটা ওদের নির্বিঘ্নে হয়ে যাবে প্রভু। ছেলেটার মাথাও একটু ঠাণ্ডা হবে, মেয়েটা সুখী হবে'

শুনিলে মনে হয় না, বিভূতি আর মাধবীলতার বিবাহ যে হইবেই, সে বিষয়ে মহেশ চৌধুরীর কিছুমাত্র সন্দেহ আছে। কারও মত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, কারও সঙ্গে পরামর্শ করা হয় নাই, যাদের বিবাহ দু'ঘণ্টা আগেও তাদের ইঙ্গিতেও ব্যাপারটা জানানো হয় নাই, তবু যেন মহেশ চৌধুরী জানে, এ বিবাহ হইয়া যাইবে। রাগে সদানন্দের গা যেন জ্বলিয়া যায়। একটু ভয়ও হয়। মহেশ চৌধুরীর একগুঁয়েমির কিছু কিছু পরিচয় সে পাইয়াছে।

'জানো মহেশ, তোমার ব্যাপার ভাল বুঝতে পারছি না। বিভূতির একটা বিয়ে দিতে চাও, ভাল কথা। কিন্তু মাধুর সঙ্গে বিয়ে হবে কি করে? মাধু আশ্রমে এসেছে, সংসার ওর ভাল লাগেনি বলে, সেবা আর আধ্যাত্মিক সাধনা নিয়ে ওর জীবনটা কাটিয়ে দেবার ইচ্ছা। আমি ওকে দীক্ষা দেব, নিজে ওকে সাধনপথে চালিয়ে নিয়ে যাব। ওর বিয়ের প্রশ্নই তো উঠতে পারে না।'

'প্রভু?'

'তুমি বুঝতে পার না মহেশ, ও মেয়েটির মধ্যে খাঁটি জিনিস আছে? আমি কি সাধে ওকে বেছে নিয়েছি! একদিন ও অনেক উঁচুতে উঠে যাবে, হাজার হাজার মানুষের জীবনে একদিন ও সুখশান্তি এনে দেবে। এমন একটা খাঁটি জিনিষ নষ্ট হতে দেওয়া যায়!'

'প্রভু?'

'বল না, কি বলতে চাও ? আলোচনা করবার জন্যই তো ডেকেছি তোমায়!'

'বিয়ে না হলে মেয়েটির মন শান্ত হবে না, প্রভু। বিয়ের জন্য মেয়েটি ছটফট করছে।'

সদানন্দ ব্যঙ্গ করিয়া বলে, 'তোমায় বলেছে নাকি, তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে দিয়ে দিন, বিয়ের জন্য আমি ছটফট করছি মহেশবাবু?'

মহেশ হাত জোড় করিয়া বলে, 'আপনার তো অজানা কিছু নেই প্রভু! কেন মনে কষ্ট দিচ্ছেন আমার? কোন মেয়ে অমন করে বলেও না, পারেও না। কিন্তু মেয়েমানুষের মন কি বোঝা যায় না? রাজাসায়েবের ছেলে তো ওকে বিয়ের লোভ দেখিয়ে বার করে এনেছিল।'

'ছেলেমানুষ হঠাৎ একদিন মনের ভুলে কি করেছিল—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও তো তাই বলি। নইলে নিজের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইতাম? বিয়ে করে সংসারী হবার ইচ্ছা মেয়েটির মনে প্রবল।'

'কিন্তু মহেশ—'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। বিয়েটা হয়ে যাক্, দুজনকেই আপনি দীক্ষা দিয়ে পায়ের তলে আশ্রয় দেবেন। যেমন চান তেমনি করে গড়ে তুলবেন দুজনকে। আপনার কাজে দুজনে জীবন উৎসর্গ করবে। ওরা তো আপনারই সন্তান প্রভু?'

সদানন্দের মনে হয়, মহেশ যেন তাকে ভক্তিমাখা চাবুক মারিয়াছে।

।। বারো ।।

এ বিষয়ে বিভূতি সত্যই বড় ছেলেমানুষ—বিবাহ করার বিষয়ে। এতটুকু অভিজ্ঞতা নাই মেয়েদের সম্বন্ধে কোন দিন সে যে মাথা ঘামায় নাই তা নয়, তবে সেটা খুবই কম। অস্পষ্ট একটা ধারণা তার মনে আছে যে, দেখিলেই ভাল লাগে এমন চেহারার আর মিশিলেই মিষ্টি লাগে এমন স্বভাবের একটি চালাকচতুর চটপটে মেয়ের সঙ্গে একদিন প্রেম তার হইবেই, বাস্, তারপরেই মালাবদল। কিন্তু মাধবীলতা কি তার কল্পনার সেই মেয়ে? দু'দিন ভাবিয়া বাপকে একটা জবাব দিবে বলিয়াছিল, সাতদিন ভাবিয়াও কিছু ঠিক করিতে পারিল না। তারপর মনে হইল, মাধবীলতার সঙ্গে পরামর্শ করিলে দোষ কি?

মাধবীলতা সোজাসুজি জবাব দিল, 'আমি কি জানি।'

অর্থাৎ মাধবীলতার আপত্তি নাই। মনে মনে বড় অভিমান হয় মাধবীলতার, তাকে জিজ্ঞাসা করা কেন, কি করা উচিত? ইচ্ছা না থাকে, বাতিল করিয়া দিলেই হয়! সে তো আর পায়ে ধরিয়া সাধে নাই!

সদানন্দ অনেকবার মাধবীলতাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে, সে যায় নাই। কি করিবে গিয়া? সদানন্দ কি বলিবে, সে ভাল করিয়াই জানে! আর ওসব কথা শুনিবার সাধ মাধবীলতার নাই। নিজে সে অনেক ভাবিয়াছে—এখনো ভাবিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে মাথার মধ্যে যখন একটা যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, মনে হয় মাথার ঘিলুগুলি গলিয়া তালুর কাছ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে (মোমের মত), তখন হঠাৎ একসময় দু'কানে তার তালা লাগিয়া গিয়া সমস্ত জগৎ বদলাইয়া যায়। স্তব্ধ ও শান্ত চারিদিক। ভাবনার তো কিছু নাই? আত্মগ্লানির কোন কারণ তো খুঁজিয়া পাওয়া যায় না? সব ভাল, সব মিষ্টি, সব সুন্দর। জীবনে সুখী হওয়ার পথে একটা বাধাও আর নাই। কত আনন্দ জীবনে। আপসোস

শুধু এই যে, সে জানে, আবার গোড়া হইতে সব সুরু হইবে, দুর্ভাবনা, অস্বস্তিবোধ, আত্মগ্লানি, আর মাথার অনির্দিষ্ট দুর্বোধ্য যাতনা। প্রথমে সামান্যভাবে আরম্ভ হইয়া বাড়িতে বাড়িতে কয়েকদিনে উঠিয়া যাইবে চরমে, তখন আবার দু'কানে তালা লাগিয়া পাওয়া যাইবে শান্তি ও স্তব্ধতা। ব্যাপারটা মাধবীলতা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এ কি কোন অসুখ? মাথার অসুখ? পাগল-টাগল হইয়া যাইবে না তো? সদানন্দ একদিন বিভূতিকে দিয়াই তাকে ডাকিয়া পাঠাইল। মাধবীলতা নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করিল, 'যাব?'

'যায় বৈ কি, বাঃ বে।'

'একা একা যেতে আমার কেমন ভয় করে।'

'ভয় আবার কিসের?'

সদানন্দের সামনে নিজেকে মাধবীলতার সত্যই কেমন যেন পুতুলের মত অসহায় মনে হয়। তাকে নিয়া যা খুশি করার ক্ষমতা যেন এই লোকটির কেমন করিয়া জন্মিয়া গিয়াছে।

'আমাকে একেবারে ত্যাগ করে দিলে মাধু?'

মাধবীলতা পুতুলের মতই চাহিয়া থাকে। এই তো সবে আরম্ভ, আরও কত কথা সদানন্দ বলিবে! কিন্তু সদানন্দও কথা না বলিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া, খানিক পরে সে সত্যই আশ্চর্য হইয়া যায়। তখন মাধবীলতা মাথা নীচু করে, অনেক ভাবিয়া আস্তে আস্তে বলে, 'আপনি যদি বারণ করেন—'

সদানন্দ ভাবিতেছিল সেদিনকার কথা, আঙ্গুলগুলিকে সেদিন পাখীর পালকের চেয়ে কোমল করিয়া মাধবীলতার গায়ে বুলাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। আজ মারিতে ইচ্ছা হইতেছে। এমন কোমল, এমন মোলায়েম গা মাধবীলতার, দেখিলেই মনে হয় চামড়ার উপর বুদ্ধি আর একটা অপার্থিব আবরণ আছে (এটা সদানন্দ অনেকবার কল্পনা করিয়াছে), তাকে স্পর্শ করিবার কল্পনাতেই রোমাঞ্চ হইত, আজ কাটিয়া ছিঁড়িয়া রক্তপাত করিয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইচ্ছা হইতেছে হঠাৎ উঠিয়া গিয়া সদানন্দ দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দেয়। সত্যই কি মাধবীলতার শরীরটা সে ছিঁড়িয়া ফেলিবে না কি? চোখ দেখিয়া মাধবীলতার সর্বাঙ্গ অসাড় হইয়া আসে। পাগল না হইয়া গেলে কি মানুষের এমন চোখ হয়? কি করিবে সদানন্দ? খুন-টুন করিয়া ফেলিবে না তো?

কাছেই বসে সদানন্দ, ডান হাত শক্ত করিয়া তার বাঁ হাতের কব্জির কাছে চাপিয়া ধরে। মায়ামমতা যে আজ সদানন্দের মনে এক ফোঁটা নাই, রাগে দুঃখে অপমানে মানুষটা গরগর করিতেছে, মাধবীলতা অনেক আগেই সেটা টের পাইয়াছিল। এতক্ষণে সে বুঝিতে পারে, ভয়ঙ্কর একটা আঘাতে দেহে মনে তাকে চিরদিনের জন্য পঙ্গু করিয়া দিবার সাধটাই সদানন্দের মনে চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। এতদিন মনে মনে সদানন্দ কি ভাবিয়াছে কে জানে, হয়তো এইরকম একটা কল্পনাই মনে মনে নাড়াচাড়া করিয়াছে। আজ আর কোন রকমেই ঠেকানো যাইবে না। গলা টিপিয়া তাকে মারিয়া ফেলাও সদানন্দের পক্ষে আজ আর্শ্চয নয়। মাধবীলতা জানে বাঁ হাতের কব্জিটা তার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু মাথার মধ্যে এমন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে যে ব্যথাটা ভাল রকম অনুভব করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বিস্ফারিত চোখ দুটি সদানন্দের চোখের সঙ্গে মিলাইবার চেষ্টা করিতে মাধবীলতা জ্ঞান হারাইয়া সদানন্দের গায়েই ঢলিয়া পড়িয়া গেল।

ঘরের কুঁজায় জল ছিল, মাথার খানিকটা জল চাপড়াইয়া দিয়া সদানন্দ দরজা জানালা খুলিয়া দিল। খানিক তফাতে হাত গুটাইয়া বসিয়া বিড়বিড় করিতে লাগিল। বোধ হয়,

আত্মরক্ষার এত বড় অস্ত্র আয়ত্ত করিয়া রাখার জন্য মাধবীলতাকে গালাগালি।

মাধবীলতা জ্ঞান হওয়ার 'পর সদানন্দ উদাসভাবে বলিল, 'আচ্ছা তুমি যাও মাধু।'

'আপনি কি করলেন আমার?'

'কিছুই করি নি।'

মাধবীলতা সেকথা বিশ্বাস করিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। গেল একেবারে বিভূতির কাছে। নালিশ যদি করিতে হয়, হবু স্বামীর কাছে করা ভাল।

বিভূতি শুনিয়া অবাক। 'অপমান করেছেন স্বামীজি তোমাকে?'

মাথার মধ্যে কতকগুলো বড় অদ্ভুত প্রক্রিয়া চলিতেছিল মাধবীলতার, স্থান ও কালের কতকগুলি নিয়ম যেন ঢিলা হইয়া গিয়াছে। মাথার মধ্যে, অথচ ঠিক যেন মাথার মধ্যেও নয়, মাথার পিছন দিকে একটা বাড়তি অঙ্গ আছে, সেইখানে কত কি জিনিস এক সঙ্গে সরু আর মোটা হইয়া যাইতেছে, কয়েক দিন পরে পরে কানে যে তার তালা লাগে, সেই বীভৎস স্তব্ধতা সর্বব্যাপী আলোড়নের মধ্যে ঢেউ তুলিয়া এমন একটা এলোমেলো গতি লাভ করিয়াছে, যা চোখে দেখা যায়, আর এমন একটা অকথ্য ভয় (অনির্দিষ্ট ভয়ের যে এমন একটা অবর্ণনীয় রূপ থাকে, মাধবীলতার জানা ছিল না)— ব্যাপারটা বুঝিবারও নয় বুঝাইবারও নয়। অথচ মস্তিষ্কের সাধারণ অংশটা এদিকে বেশ কাজ করিতেছে। সমস্ত ঘটনাটা অনায়াসে গড়গড় করিয়া সে বিভূতিকে বলিয়া গেল। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া হাত ধরিয়া টানিবার সময় ভয়ে অজ্ঞান হইয়া যাওয়ায় আজ কি ভাবে রাক্ষসটার হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে।

'তুমি যদি এর প্রতিকার না কর—'

বিভূতির মুখে মুখ গুঁজিয়া দিয়া মাধবীলতা ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বিভূতি কথা বলে না দেখিয়া, খানিক পরে মুখ তুলিয়া চাহিয়াই সে চমকাইয়া গেল। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া আসিয়া হাত চাপিয়া ধরিবার সময় সদানন্দের মুখ যেমন হইয়াছিল, বিভূতির মুখও তেমনি দেখাইতেছে।

'একটু বোসো, আমি আসছি।'

মাধবীলতা সভয়ে তার হাত চাপিয়া ধরিল, 'কি করবে? থাকগে, কিছু করে কাজ নেই। যা হবার তা তো হলই—'

কিন্তু আর কি বিভূতিকে আটকানো যায়? হাত ছাড়াইয়া সে চলিয়া গেল। সদানন্দর ঘরে গিয়া সদানন্দের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, 'মাধুর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করার মানে?'

'দ্যাখো বিভূতি, তুমি ছেলেমানুষ—'

বাকী কথাগুলি সে বলিয়া উঠিতে পারিল না, বিভূতির ঘুঁষিতে নাকটা ছেঁচিয়া গেল। বিভূতি আরও মারিত, কিন্তু পিছন হইতে মহেশ তাকে জড়াইয়া ধরায় আর কিছু করিতে পারিল না।

'ছেড়ে দাও বাবা, বজ্জাতটাকে আমি খুন করব।'

'ছি বিভূতি, ছি!'

'আমাকে ছি করছ? জানো ও কি করেছে?'

'জানি বৈকি।'

'জানো?'—বিভূতি এতক্ষণ ছাড়া পাওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করিতেছিল, এবার স্তব্ধ

হইয়া গেল।

নাক দিয়া রক্ত পড়া বন্ধ হইল প্রায় আধঘণ্টা পরে, সেবা বেশীর ভাগ করিল শশধরের বৌ। কখন কোন্ ফাঁকে সে যে আসিয়া জুটিয়াছিল, কেউ টেরও পায় নাই। বিভূতি একদিকে ছোট একটা হলে বসিয়া ব্যাপার দেখিতেছিল আর থাকিয়া থাকিয়া মুখ বাঁকাইতেছিল। এখনও তার রাগ কমে নাই, বেশ বুঝা যায় একটা হেস্তনেস্ত করিবার জন্যই সে বসিয়া আছে। মাঝখানে একবার সে একটা মন্তব্য করিতে গিয়াছিল, মহেশ হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল, 'দোহাই তোর, একটু থাম।' তারপর হইতে সে চুপ করিয়া আছে।

বুঝা যায়, মহেশ ভাবিতেছে।

ভাবিবার কি আছে বিভূতি বুঝিতে পারে না। তার বিরক্তির সীমা থাকে না। মহেশ যদি সব জানেই, তবে আর এই পাষণ্ড সম্বন্ধে কর্তব্য স্থির করিতে তো একমুহূর্ত দেরী হওয়া উচিত নয়। এত সেবা যত্নই বা কি জন্য? ঘাড় ধরিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দিলেই হয়!

সদানন্দ একটু সুস্থ হইলে মহেশ বলিল, 'বিভূতি, বড় ঘরের রোয়াকে ভাঙ্গা কাঠের বাক্সটা আছে না, তার থেকে বড় হাতুড়িটা নিয়ে আসবে?'

'হাতুড়ি দিয়ে কি করবে?'

'একটু কাজ আছে।'

বিভূতি হাতুড়ি আনিয়া দিল। লোহার মরিচা ধরিয়া গিয়াছে। হাতুড়ি হাতে করিয়া মহেশ চৌধুরী বলিল, 'প্রভু, আমার ছেলের হয়ে আমি আপনার কাছে মাপ চাইছি। ছেলে আমার প্রায়শ্চিত্ত করবে না, ওকে বলা বৃথা। ছেলের হয়ে আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি, আপনি তাই মঞ্জুর করুন।'

বলিতে বলিতে মহেশ চৌধুরী করিল কি, হাতুড়িটা দিয়া নিজের নাকের উপর সজোরে মারিয়া বসিল। সকলে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, কেবল শশধরের বৌ আবার সেবা আরম্ভ করিয়া দিল মহেশের। সে যেন এইরকম একটা কাণ্ড ঘটিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

সদানন্দের চেয়ে মহেশের যে জোরে লাগিয়াছিল তাতে সন্দেহ নাই, রক্ত আর বন্ধ হইতে চায় না। মহেশের বারণ না মানিয়া বিভূতি পাড়ার সুবিমল ডাক্তারকে ডাকিতে পাঠাইয়া দিল। ডাক্তার আসিয়া কিন্তু করিতে পারিল না কিছুই, থেঁতলা নাকটা পরীক্ষা পর্যন্ত নয়। মহেশ তাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া অতিকষ্টে খোনাসুরে বলিল, 'না না, আমার কর্মভোগ আমায় ভোগ করতে দিন।'

সুবিমল ডাক্তারের কাছে পাড়ার লোক জানিতে পারিল, সাধু সদানন্দ আর মহেশ চৌধুরীর মধ্যে ভয়ানক রকমের একটা হাতাহাতি হইয়া গিয়াছে। দুজনেই দারুণ আহত। মহেশ চৌধুরীর এখন ভয়ানক অনুতাপ হইয়াছে, বিনা চিকিৎসায় মরিয়া যাইতে চায়।

হাতাহাতি হইল কেন? প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর হাতাহাতি! ও রকম তো ওদের মধ্যে লাগিয়াই আছে। অন্যদিন কথা কাটাকাটির মধ্যেই সমাপ্তি হয়, আজ হাতাহাতি পর্যন্ত গড়াইয়াছে।

কথাটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত রূপ নিল অন্যরকম। ঘটনাটা অপরাহ্ণের, সন্ধ্যার পর অনেকে খবর জানিতে আসিল। সদানন্দ তখন নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে, তার দেখা কেউ পাইল না। মহেশ চৌধুরীর সমস্ত মুখটাই ফুলিয়া গিয়াছে, কথা বলিতেও কষ্ট

হয়। তবু সে-ই সংক্ষেপে ব্যাপারটা সকলকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিল। গোঁয়ারগোবিন্দ একটা ছেলে আছে তার সকলে জানে তো? একটা ভুল বোঝার দরুন হঠাৎ রাগের মাথায় সে সদানন্দকে অপমান করিয়া বসে। ছেলের হইয়া মহেশ চৌধুরী তাই শাস্তি গ্রহণ করিয়ছে।

রসিক ভট্টাচার্য মহেশ চৌধুরীর বন্ধু। সে বলিল, 'তুমি কি উন্মাদ মহেশ?'

'কাল পরশু তোমার সঙ্গে ওবিষয়ে তর্ক করা যাবে, কেমন?' বলিয়া মহেশ চৌধুরী শয়ন করিতে ভিতরে গেল।

যে দশ-বারজন উৎসাহী ও কৌতূহলী পরিচিত লোকের কাছে মহেশ চৌধুরী কথাগুলি বলিল, তারা তখন ডাকাইয়া আনিল বিভূতিকে। কি হইয়াছিল? সদানন্দকে সে কি অপমান করিয়াছিল? কেন অপমান করিয়াছিল? কি দিয়া সদানন্দ মহেশ চৌধুরীকে আঘাত করিয়াছে?

কিন্তু বিভূতি তেমন ছেলেই নয়, সে সংক্ষেপে শুধু বলিল, 'আমি কিছু জানি না। আপনারা এবার যান তো।'

সকলে দয়া করিয়া তার বাড়ীতে পায়ের ধুলা দিয়াছে, সকলকে বসাইয়া রাখিয়া বাড়ীর-ভিতরে যাইতে মহেশ চৌধুরীর কত সঙ্কোচ, কত আপসোস! আর তার ছেলে কিনা সোজাসুজি সকলকে বিদায় দিল! ছেলেটা সত্যই গোঁয়ার।

পরদিন অনেক দূরের গ্রামে পর্যন্ত রটিয়া গেল, ছেলেটাকে বাঁচাইতে গিয়া মহেশ চৌধুরী সদানন্দের হাতে ভয়ানক মার খাইয়াছে। একটি টুঁ শব্দও করে নাই মহেশ চৌধুরী, সদানন্দ মার বন্ধ করিলে রক্তাক্ত শরীরে সদানন্দের পায়ে মাথা ঠেকাইয়া ছেলের হাত ধরিয়া ঘরের বাহির হইয়া আসিয়াছে। ডাক্তার ডাকা হইয়াছিল, কিন্তু মহেশ চৌধুরী বলিয়াছে, 'প্রভুর প্রহারের চিকিৎসা? ছি!'

শেষ কথাটাতে সকলে যে কি মুগ্ধ হইয়া গেল বলিবার নয়। এমন ভক্তি মহেশ চৌধুরীর যে মার খাইয়া মরিতে বসিয়াছে তবু চিকিৎসা করিবে না--গুরু মারিয়াছে বলিয়া! সকলের কানে যেন বাজিল, 'মারলি কলসী-কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না?'

না জানি কতবড় মহাপুরুষ সদানন্দ, যার জন্য মহেশ চৌধুরীর এমন অলৌকিক ভক্তিভাবের উদয় হইয়াছে, এমন মহৎ প্রেরণা আসিয়াছে। সদানন্দের উপর মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধা যেন সভয় বিস্ময়ে হু হু করিয়া বাড়িয়া গেল। অনেকের মনে হইতে লাগিল, সদানন্দ হয়তো মানুষ নয়, মানুষের রূপধারী—

ফিস্ ফিস্ করিয়া অন্তরঙ্গ মানুষের কানে কানেই শুধু কথাটা বলা যায়। কয়েকটি ভাঙ্গা কুঁড়ের ভিতরে, গেঁয়ো পথের ধারে, কয়েকটি জমকাল গাছের ছায়ায় দেবতার আবির্ভাবের কথাটা কানাকানি হয়। অকাল-বার্ধক্যের ছাপমারা কয়েকটি ক্লিষ্ট মুখে উত্তেজিত আনন্দের বিস্ময়কর আবির্ভাব ঘটে।

কয়েকটা দিন একরকম একা একা ঘরের কোণে কাটাইয়া দিবার পর সদানন্দই প্রথম কথাটা পাড়ে। বলে, 'আমি বরং কোথাও চলে যাই মহেশ।'

মহেশ চৌধুরী বলে, 'আর ও কথা কেন প্রভু? সে দিন তো ক্ষমা করেছেন, ও ব্যাপার তো চুকে গেছে?

'চুকে গেছে বললেই কি সব ব্যাপার চুকে যায় মহেশ?'

'আজ্ঞে তা যায় বৈকি। আমরা এখন ভাবব ও ঘটনাটা যেন ঘটেই নি, মন থেকে একেবারে মুছে ফেলব। মনের বাইরে তো কোন কিছুর জের চলতে পারে না প্রভু।'

মাঝে মাঝে মহেশ চৌধুরী এমনভাবে কথা বলে, মনে হয় ঠিক যেন সদানন্দকে

উপদেশ দিতেছে। প্রথম প্রথম সদানন্দ অতটা খেয়াল করিত না, আজকাল মন দিয়া শোনে। উপদেশের মতই কথাগুলি সে গ্রহণ করে এবং পালন করিবার চেষ্টাও করে। মহেশ চৌধুরীর এখনকার উপদেশ, সেদিনকার ব্যাপারটা মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। কথায়, ব্যবহারে, এমন ভাব দেখাইতে হইবে, যেন কিছুই ঘটে নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া সদানন্দ সেই চেষ্টাই করে। কয়েকদিন গম্ভীর ও বিষণ্নভাবে ঘরের কোণায় কাটাইবার পর হঠাৎ সেদিন হাসিমুখে গিয়া হাজির হয় সান্ধ্য মজলিসে।

সকলেই উপস্থিত আছে। বিভূতি এবং মাধবীলতাও। প্রথমটা সদানন্দের ভয় হয়, বিভূতি হয়তো রাগ করিয়া উঠিয়া যাইবে, হয়তো একটা কেলেঙ্কারী করিয়া বসিবে। মাধবীলতা হয়তো তেমন কিছু করিবে না, সে সাহস তার নাই, কিন্তু কথায় ব্যবহারে সহজ ভাব কি ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে মেয়েটা? মহেশ চৌধুরী তো বলিয়া খালাস, সব চুকিয়া বুকিয়া গিয়াছে, কিন্তু ওদের দুজনের পক্ষে কি চুকিয়া বুকিয়া যাওয়া সম্ভব?

কিছুক্ষণ কাটিয়া যাওয়ার পর সদানন্দ বুঝিতে পারে, ব্যাপারটা সত্যসত্যই সকলে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতেছে—যতটা মুছিয়া ফেলা সম্ভব। বিভূতি আর মাধবীলতা যে একটা সঙ্কোচ আর অস্বস্তি বোধ করিতেছে, প্রথমদিকে এটা পরিষ্কার বুঝা গিয়াছিল, কিছুক্ষণ পরে দুজনেই অন্যদিনের মত সহজভাবে সকলের হাসি-গল্পে যোগ দিয়াছে।

সদানন্দের খুশি হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু মনটা তার হঠাৎ বড় খারাপ হইয়া গেল। আর একবার সে যেন মহেশ চৌধুরীর কাছে হারিয়া গিয়াছে। অতি শোচনীয় কুৎসিত পরাজয়। সেদিনকার ব্যাপারে মহেশ চৌধুরীর কাছে সে যে ছোট হইয়া গিয়াছে, আজ এই সান্ধ্য—মজলিসে আসিয়া প্রথম সেটা সদানন্দের খেয়াল হইল।

তার মনে হইতে লাগিল, এই উদ্দেশ্যই ছিল মহেশ চৌধুরীর, তাকে হীন করার জন্যই সে হাতুড়ি দিয়া সেদিন নিজের মুখে আঘাত করিয়াছিল। এখনো মহেশ চৌধুরীর মুখ অল্প অল্প ফুলিয়া আছে—কি সাংঘাতিক মানুষ মহেশ চৌধুরী!

।। তেরো ।।

যাই হোক, একদিন যথারীতি বিভূতি আর মাধবীলতার বিবাহটা হইয়া গেল। প্রকাশ্য জীবনটা যেমন কাটিতেছিল, প্রায় সেই রকমই কাটিতে লাগিল দুজনের, বেশভূষার কিছু পরিবর্তন দেখা গেল মাধবীলতার এবং চেহারাটাও যেন তার বদলাইয়া যাইতে লাগিল। এমন পরিবর্তন যে দেখিলে মনে প্রশ্ন জাগে, এতদিন কি অসুখী ছিল মেয়েটা, এবার সুখী হইতে আরম্ভ করিয়াছে?

বিবাহে বিপিন আসিয়াছিল, পরে আরেক দিন আসিয়া সে অনেকক্ষণ সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া গেল,—সদানন্দ ছাড়া। আমল দিলে সদানন্দের সঙ্গেও হয়তো সে ভাব জমাইয়া যাইত—শত্রুতা ভুলিয়া যাওয়ার প্রয়োজনে মানুষ মানুষের সঙ্গে যে রকম ভাব জমায়। মহেশ চৌধুরী সদানন্দকে কেন্দ্র করিয়া নতুন একটি আশ্রম খুলিতেছে, এ খবরটা বিপিন পাইয়াছিল, কিন্তু রাগ দুঃখ বা হিংসার বদলে তার উৎসাহই দেখা গেল বেশী। নিজেই কথা তুলিয়া সে মহেশ চৌধুরীকে বলিয়া গেল, রেষারেষি আশঙ্কা করিবার কোন কারণই অনুমান করা যায় না, বিপিন আর মহেশের আশ্রমের উদ্দেশ্য হইবে সম্পূর্ণ পৃথক।

'আপনার আশ্রমের উদ্দেশ্যটা কি বিপিনবাবু?'

প্রশ্নটা অসঙ্গত। এতকাল যে আশ্রম চলিতেছে, চারিদিকে যে আশ্রমের বেশ নামও একটা আছে, তার মালিককে বাড়িতে পাইয়া একেবারে আশ্রমের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এ রকম একটা প্রশ্ন না করিলেই ভাল হইত। মহেশ চৌধুরীকে বিপিন কোনদিন পছন্দ করিত না, আশ্রমে লোকটাকে সে চিরদিন দমাইয়া রাখিবার চেষ্টাই করিয়াছে, এখন হঠাৎ অতীতের কথা ভুলিয়া বাড়ি বহিয়া আসিয়া এ রকম খাতির জমানোর চেষ্টাতেই মহেশের কৃতার্থ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। আশ্রমের উদ্দেশ্য? কে না জানে বিপিনের আশ্রমের উদ্দেশ্যর কথা! জিজ্ঞাসা করাটাই বাহুল্য।

বিপিনের কোন জবাব না পাইয়া মহেশ চৌধুরী আবার বলিয়াছিল, 'সত্যি কথাটা বলি, এতকাল আপনার আশ্রমে যাতায়াত করছি, কিন্তু উদ্দেশ্যটা ঠিক বুঝতে পারি নি। প্রভু যতকাল ছিলেন, ততকাল তবু একটা কারণ ছিল, জন্যে—'

বিপিন মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিল, 'প্রভুই বটেন!'

মহেশ চৌধুরী দুই কানে আঙ্গুল দিয়া বলিয়াছিল, 'ছি বিপিনবাবু, ছি!'

তবু তো সর্বজনবিদিত আশ্রমের উদ্দেশ্যটা বিপিন পর্যন্ত মহেশকে ঠিকভাবে বুঝাইয়া দিতে পারিল না। নিজের মনেও তার ধারণা ছিল কথাটা অত্যন্ত সহজ ও সরল। বলার সময় দেশ, সমাজ ও ধর্মের মধ্যে বক্তব্যটা দিশেহারা হইয়া গেল। দেশ, সমাজ ও ধর্মের কল্যাণ তো বটেই, কিন্তু কোন্ দিকে, কি ভাবে?

'আহা, আশ্রমে কি হয় না হয় সে তো আপনার জানাই আছে।'

মহেশ চৌধুরী সবিস্ময়ে বলিয়াছিল, 'কিন্তু আশ্রমে তো আপনার একরকম কিছুই হয় না! ভাল একটা জায়গা দেখে কয়েকজন লোককে শুধু থাকতে দিয়েছেন। প্রভু যখন ছিলেন, তখন তবু মাঝে মাঝে দশজন এসে সদুপদেশ শুনবার সুযোগ পেত, এখন—'

'এখনও পায়।'

'কে বলেন?'

'আমি বলি। আশ্রমে যাঁরা আছেন, তাঁরাও বলেন।'

'লোকজন আসে?' মহেশ চৌধুরী সন্দিগ্ধভাবে বলিয়াছিল, 'শুনলাম লোকজনের আসা অনেক কমে গেছে?'

মহেশ চৌধুরীর আশ্রম স্থাপিত হওয়ার পর বিপিনের আশ্রমের লোকজনের যাতায়াত আরও কমিয়া গেল—একরকম বন্ধই হইয়া গেল বলা চলে। নূতন আশ্রমের উদ্বোধন উৎসবটা হইল বেশ জমকাল। শহর হইতে দু'চারজন নামকরা লোক আসিল, খবরের কাগজে বিস্তারিত বিবরণও বাহির হইল। বিপিনের আশ্রমে যারা সদানন্দের উপদেশ শুনিতে যাইত, তারা সকলে তো আসিলই, কাছে ও দূরের আরও অনেক গ্রামের নারী পুরুষ ছেলেমেয়ের আবির্ভাবও ঘটিল। ভিড় হইল ছোটখাট একটি মেলার মত। তার উপর আবার ছিল বাঙালীভোজনের ব্যবস্থা। কদিন ছোটখাট গ্রামটির উপর দিয়া যে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার প্রবাহ বহিয়া গেল, তা সত্যই অভূতপূর্ব। উৎসব শেষ হইয়া গেল, দূরের যারা আসিয়াছিল সকলেই প্রায় ফিরিয়া গেল, আশ্রমের চিহ্ন হিসাবে খাড়া রহিল কেবল মহেশ চৌধুরীর বাড়ীর বাগানের পিছনের মাঠে মস্ত একটা নতুন চালা আর বাগানের বাঁশের গেটের উপরে এক টুকরো আলকাতরা মাখানো চারকোণা কাঠে সাদা অক্ষরে লেখা 'শ্রী শ্রী সদানন্দ স্বামীর আশ্রম।'

নূতন আশ্রমে মানুষের ভিড় কিন্তু কমিল না, মানুষের মুখে নতুন আশ্রমের আলোচনাও থামিল না। প্রত্যেক দিন দলে দলে লোক আসিয়া নতুন চালার নীচে বসে, মহেশ চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও সদানন্দের বিস্তারিত উপদেশ শোনে, দলে দলে সদানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সদানন্দ যতদিন বিপিনের কাছে ছিল, সাধারণ মানুষের পক্ষে তার শিষ্যত্ব লাভ করা প্রায় অসম্ভব ছিল, অনেক বাছাবাছির পর বিপিন কদাচিৎ যাকে উপযুক্ত মনে করিত তাকেই কেবল সদানন্দ শিষ্য করিত। এখানে সব বাছবিচার তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, যে আসে তাকেই সদানন্দ আলিঙ্গন দেয়।

আলিঙ্গনটাই শিষ্যের দীক্ষা। এখানে মহেশ চৌধুরীর পরামর্শে অথবা অনুরোধে এই নতুন প্রথায় দীক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। মেয়েদের জন্য ব্যবস্থাটা অবশ্য অন্য রকম, দু'পায়ের পাতার উপব মেয়েরা মাথা নামাইলে সদানন্দ মাথার উপর দুটি হাত রাখিয়া তাদের শিষ্যত্ব দান করে। বিভূতি আশ্রমের ম্যানেজার। প্রকাণ্ড একটা বাঁধানো খাতায় সে সকলের নাম, ঠিকানা এবং প্রণামীর পরিমাণটা লিখিয়া রাখে।

মন্ত্রশিষ্যও করা হয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম। মন্ত্রের জন্য বিশেষভাবে যাবা আবেদন করে ও আগ্রহ জানায়, কেবল তাদেরই কানে সদানন্দ মন্ত্রদান করে।

মহেশ চৌধুরীই একদিন সবিনয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করিয়া সদানন্দকে বুঝাইয়া দিয়াছিল, হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল, 'প্রভু, গুরু অনেকের আছে, গুরু ত্যাগ করাটা ঠিক উচিত কাজ হয় না। মন্ত্র দেওয়া তো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শুধু মন্ত্র নিয়ে শিষ্য হবার নিয়ম করলে যারা আগেই মন্ত্র নিয়েছে তাদের বড় মুস্কিল হবে। এমনি শিষ্য হতে দোষ নেই, উপদেশ শুনবে, সাধন ভজন পূজা অর্চনার নিয়মকানুন জেনে যাবে, সৎকাজে যোগ দেবে, আশ্রমের নিজের লোক হয়ে থাকবে তাই যথেষ্ট। এ ভাবে শিষা করলে কারও আশ্রমে যোগ দিতে কোন অসুবিধা থাকবে না।'

সদানন্দ একটু খুঁত খুঁত করিয়া বলিয়াছিল, 'কিন্তু নির্বিচারে সকলকে—'

মহেশ চৌধুরী বলিয়াছিল, 'বেশী বাছাবাছি করে লাভ কি প্রভু? সবাইকে নিলে আমাদের ক্ষতিও কিছু নেই। ফাঁকিবাজ বাজে লোক হয়, খাতায় শুধু তার নামটা থাকবে। শিষ্য হলেও শিষ্য হয়েছে বলেই বিশেষ কোন অধিকারও দেওয়া হবে না যে ক্ষতি করবার সুবিধা পাবে। ক্ষতি করার ইচ্ছা যদি কারও থাকে, শিষ্য হিসাবে খাতায় নাম উঠলেও যতটা সুযোগ পাবে, শিষ্য না হয়েও ততটা সুযোগ পাবে।'

শুনিতে শুনিতে সদানন্দের মনে হইয়াছিল, মহেশ চৌধুরী বুঝি তাকে আশ্রম পরিচালনার কায়দা-কানুন শিখাইয়া দিতেছে—গুরু যেমন শিখায়। মহেশ চৌধুরীর মুখে বিনয় ও ভক্তির স্থায়ী ছাপ থাকে, জোড় হাতে দেবপূজার মন্ত্রোচ্চারণের মত করিয়া সে কথা বলে, তবু আজকাল প্রায়ই সদানন্দের এ রকম মনে হয়। মনে হয়, এর চেয়ে বিপিন যেন ভাল ছিল, অন্তরালে সে তর্ক করিত, উপদেশও দিত, হুকুমও দিত, কিন্তু সে সব ছিল বন্ধুর মত, তার কাছে নিজেকে এতটা অপদার্থ মনে হইত না।

আরও একটা ব্যাপার সদানন্দ লক্ষ্য করে। তার নামে আশ্রম করা হইয়াছে, সে-ই একরকম ভিত্তি এই আশ্রমের, অথচ খাতির যেন লোকে তার চেয়ে মহেশ চৌধুরীকেই করে বেশী। লোকের কাছে নিজের দামটা আগের চেয়ে যে কমিয়া গিয়াছে, এটা সদানন্দ স্পষ্টই অনুভব করিতে পারে। সকলের মুখে আর যেন আগের সেই ভক্তির ছাপটা খুঁজিয়া মেলে না, সকলের কথায় ও ব্যবহারে মানুষের বদলে নিজেকে আর দেবতা হিসাবে প্রতিফলিত

হইতে দেখা যায় না। মহেশ চৌধুরীর উপরে লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা যেন হুহু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে দিন দিন। এত যে ন্যাকামি মহেশ চৌধুরী করে, সকলের কাছে সব সময় মোসাহেবের মত নত হইয়া থাকে,—তবু!

মাঝে মাঝে সদানন্দ সন্দেহমূলক ক্ষীণ একটা অনুভূতির মধ্যে নিজের চালচলনের ভাঙ্গনধারা পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে। আগের মত তেজ কি আর তার নাই? আগের সেই সহজ আত্ম-বিশ্বাস? একটু একটু ভয় কি সে করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে সাধারণ তুচ্ছ মানুষগুলিকে? মানুষের সংস্পর্শে আসিলে মাঝে মাঝে হঠাৎ সদানন্দ নিজেকে যাচাই করিবার চেষ্টা করে, কোথায় কি ঢিলা হইয়া গিয়াছে তার নিজের মধ্যে যা সকলে টের পাইয়া যাইতেছে? টেরও কি পাইয়া যাইতেছে সত্যসত্যই? আর কিছুই সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না, মৃদু একটা অস্বস্তিবোধের স্থায়ী অস্তিত্ব ছাড়া, আত্মবিশ্লেষণের অন্যমনস্কতা সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হইবার পর যেটা আরও বেশী জোরালো হইয়া পড়ে। সদানন্দ জানে, খুব ভাল করিয়াই জানে, এমন কোন পরিবর্তন তার বাহিরে প্রকাশ পায় না, কারও পক্ষে যেটা লক্ষ্য করা সম্ভব। তবু মনটা কেন যে খুঁত খুঁত করিতে থাকে। আগে কথা বলার মধ্যেও একটা বিস্ময়কর আনন্দ ছিল, নিজের কথা শুনিতে শুনিতে নিজেই সে মুগ্ধ হইয়া যাইত, সকলের অভিভূত ভাব দেখিয়া নিজের মধ্যে একটা অপার্থিব শক্তির সঞ্চার অনুভব করিত। এখন কথা হয়তো সে বলে আগের মতই, সামনের ভীরু অসহায় আর অসুখী শিষ্যগুলিকে সুখ ও শান্তির সন্ধান দিবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা যে তার আছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই হয়তো বলার সময়টা তার থাকে না, কিন্তু তারপর একসময় তার মনে হইতে আরম্ভে হয়, সমস্ত জড়াইয়া ফলটা সুবিধাজনক হইল না। এই ভীরু অসহায় আর অসুখী শিশুগুলির মনে তার ব্যক্তিত্ব ও উপদেশের প্রভাব আগের মত কাজ করিতেছে না। করা সম্ভবও নয়, কারণ নিজেই কি সে বুঝিতে পারিতেছে না যে, আর সব ঠিক আগের মত থাকিলেও, সমগ্রভাবে ধরিলে তার ব্যক্তিত্ব ও উপদেশের প্রভাবটা আব আগের মত নাই?

ব্যাপাবটা সদানন্দের বড়ই দুর্বোধ্য মনে হয়। কোন কারণ খুঁজিয়া পায় না। কখনও সে ভাবে, সব কি তার নিজের কল্পনা, আজকাল একটু কল্পনাপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছে? কখনও ভাবে, এখানকার প্রকাশ্য খোলাখুলি জীবন ভাল লাগিতেছে না বলিয়া, সব বিষয়ে বিরক্তি জাগিতেছে বলিয়া, এ রকম হইতেছে? বিপিনের মত একজন তাকে আড়াল করিয়া রাখে না, অধিকাংশ সময় নিজের একটি কুটীরেব অন্তরালে নিজের মনে একা থাকার সুযোগ পায় না, সেই জন্য কি আনন্দ, উৎসাহ, শান্তি নষ্ট হইয়া যাইতেছে? অথবা মাধবীলতার জন্য মন কেমন করিতেছে, চিরদিনের জন্য মেয়েটা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে বলিয়া?

কিন্তু মাধবীলতার জন্য বিশেষ কোন কষ্ট হইতেছে, তাও সদানন্দের মনে হয় না। প্রথমটা সত্যই বড় রাগ হইয়াছিল, পছন্দসই একটা খেলনা হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া ফসকাইয়া গেলে ছোট ছেলেব যেমন অবুঝ রাগ হয়, খেলনাটা একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিবার সাধ জাগে, কিন্তু সে সব সাময়িক প্রতিক্রিয়া কি মিটিয়া যায় নাই? মাধবীলতাকে দেখিলে এখন কি একটা বিতৃষ্ণার ভাবই জাগে না তার?

অন্য একটা কারণেও মাধবীলতার উপর আজকাল মাঝে মাঝে সদানন্দের রাগ হয়। মাধবীলতা প্রাণপণে তাকে এড়াইয়া চলে। কথা তো বলেই না, সামনে পড়িলে তাড়াতাড়ি সরিয়া যায়। মাঝে মাঝে মহেশ চৌধুরীর পারিবারিক সান্ধ্য মজলিসে বাধ্য হইয়া যদি বা হাজির থাকে, সদানন্দেব যতটা তফাতে সম্ভব, পারিলে একেবারে পিছন দিকে, বসিবার

চেষ্টা করে।

একদিন খুব ভোরে বারান্দায় মাধবীলতাকে একা দেখিয়া সদানন্দের একটু আলাপ করার শখ চাহিয়াছিল। নিছক আলাপ, আর কিছু নয়। হাসিমুখে সে বলিয়াছিল, 'এই যে মাধু। তোমার যে আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না।'

'আমার বিয়ে হয়ে গেছে জানেন?' বলিয়া মাধবীলতা তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিয়াছিল। মাধবীলতার বাড়াবাড়িতে সদানন্দের বড় জ্বালা বোধ হয়, সেই সঙ্গে হাসিও পায়। এত অবিশ্বাস কেন তাকে? এ রকম হীন অমানুষ মনে করা? কি ছেলেমানুষ মাধবীলতা! তাই বটে, মেয়ে জাতটাই এরকম উদ্ভট হয় বটে!

এ সব ছাড়াও সদানন্দের মানসিক জগতে আরও একটা ব্যাপার ঘটে, যেটা আরও গুরুতর, আর মারাত্মক, আরও বিস্ময়কর, আরও গভীর এবং আরও অনেক কিছু। অন্য কেউ নিজের মনের এরকম একটা অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলে, সে সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়া নিত লোকটার মাথা খারাপ হইয়াছে, কিন্তু নিজের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটায় সে বেশ বুঝিতে পারে মাথা খারাপ হওয়ার সঙ্গে এ ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নাই, এটা মনোবিকার নয়, মনের মধ্যে তার এলোমেলো হইয়া যায় নাই কিছুই। যা কিছু অজানা ছিল, বুদ্ধির অগম্য ছিল, দুর্বোধ্য সঙ্কেতের মত সে সব অস্পষ্ট স্পষ্টতা লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এতকাল নিজের সমগ্র নিজস্বতা বলিয়া যা সে জানিত, পরিবর্তনহীনবিচ্ছিন্নতা বজায় থাকিয়াও ওই অভিনব স্পষ্টতার সঙ্গে একটা আতঙ্কময় ফাঁপর-ফাঁপর ভাবের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সদানন্দ জানে সব সে বুঝিতে পারিতেছে, তবু বার বার নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া সে ব্যর্থ হইয়া যায়। বুঝাইবার চেষ্টাটা হয় নানা ভাবে। ধরা যাক, প্রকাণ্ড গভীর একটা বন, যার মধ্যে আনুমানিক আবছা অন্ধকার, বাঘ, ভালুক, সিংহ, চিরস্থায়ী ভয় ও বিষাদ—বনের ঠিক বাইরে ঝলমলে সূর্যালোকে দাঁড়াইয়া অজ্ঞাত কারণের অসহ্য শোকে শান্ত ও নির্বিকার সদানন্দ চুপচাপ গা এলাইয়া দিয়া মাটি হইতে কয়েক হাত উঁচুতে বাতাসে ভাসিতেছে। এরকম আরও কয়েকটা ইচ্ছাকৃত স্বপ্নের সাহায্যে সদানন্দ নিজের কাছে প্রমাণ করার চেষ্টা করে, নিজের মনের অপূর্ব ব্যাপারটা বুঝিতে পারে বলিয়া তার যে ধারণা আছে, সেটা মিথ্যা নয়। কিন্তু স্বপ্ন দেখার সময় স্বপ্ন যা থাকে এবং জাগিয়া থাকার সময় স্বপ্ন যা হইয়া যায়, তার পার্থক্যটা ঘুচাইয়া দিবার মত ক্ষমতা তার হয় না, তাই ঘুমন্ত অবস্থার স্বাভাবিক স্বপ্নকে জাগ্রতাবস্থায় ব্যাখ্যা হিসাবে সামনে খাড়া করিয়া জাগ্রত অবস্থার স্বাভাবিক স্বপ্নের সঙ্গে কোন মিল সে খুঁজিয়া পায় না। জাগ্রত অবস্থার কল্পনার স্বপ্ন হইলেও কথা ছিল, বিশেষ প্রশ্রয় না দিলে বিচিত্র, উদ্ভট আর অসম্ভব অনেক কিছুকে সম্ভব ধরিয়া নিয়া খাপছাড়া আনন্দ উপভোগের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সদানন্দের পরিচয় আছে। কিন্তু সে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।

একবার কেবল সদানন্দের মনে হইয়াছিল, এই কি প্রেম, প্রিয়কে হারানোর পর প্রেম যা হয়, আসল খাঁটি প্রেম? মাধবীলতাকে হারানোর পর হইতেই তো তার মধ্যে এরকম হইতেছে? কিন্তু নিজের কাছে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করিয়া ব্যাকুলতা এত সহজে মিটাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই। অজানা ও দুর্বোধ্য স্মৃতি হোক, উপলব্ধি হোক, ক্ষয়িতমূল আত্মবিকাশের বিচ্ছিন্ন অংশ হোক, অথবা আর যাই হোক, স্পষ্টতর হওয়ার যে প্রক্রিয়া চলিতে থাকে, তার সঙ্গে মাধবীলতার কোন সম্পর্ক নাই। মাধবীলতা সম্বন্ধে মানসিক দুর্বলতা ঘটিবার একটা আশঙ্কা মনে আসিয়াছিল, সেই আশঙ্কাটার জন্যই এ ধরণের কথা সদানন্দের মনে আছে।

এক সময় হঠাৎ দরজা বন্ধ করিয়া সদানন্দ ঘরের কোণে মাটিতে বসিয়া পড়ে, আসন থাকিলেও মনে থাকে না। মেরুদণ্ড সিধা করিয়া বসে, চোখ বন্ধ করে, হাত জোড় করে —ইচ্ছায়ও নয়, অনিচ্ছায়ও নয়। বিড় বিড় করিয়া বলিতে থাকে—হে ঈশ্বর দয়া কর। ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাকো, এ সময় আমায় দয়া কর। তুমি তো জানো আমি স্বীকার করি না তুমি আছ, তবু যদি থাকো, দয়া কর। তুমি তো সব জানো —তুমি তো জানো কি উদ্দেশ্যে আমি এখন মেনে নিচ্ছি যে তোমায় আমি স্বীকার করি না—তোমায় স্বীকার করি না মেনে নেওয়ার উদ্দেশ্যটা কেন মেনে নিচ্ছি তাও তো তুমি জানো—কথা জড়াইয়া সদানন্দের কথা বন্ধ হইয়া যায়। মাথাটা প্রণাম করার ভঙ্গিতে মাটিতে ঠেকাইয়া সে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে।

এমনিভাবে ভাবোচ্ছ্বাসের নেশায় সদানন্দ অন্যমনস্কও হয়, নিজেকে শ্রান্ত ও শান্ত করিয়া ঘুমও পাড়ায়।

আশ্রমের বড় চালাটার পাশে সদানন্দের জন্য একখানা নতুন ঘর তোলা হয়। সদানন্দ হাসিয়া বলে, 'বাড়িতে রাখতে ভরসা হচ্ছে না মহেশ?'

মহেশ আহত হইয়া বলে, 'প্রভু?'

'আহা, এত সহজে ঘা খাও কেন বলতো মহেশ? তামাশা বোঝ না?'

স্তব্ধ হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মহেশ হঠাৎ বলে, 'না প্রভু, আমি সত্যই বড অপদার্থ। আপনি যা বললেন, ওই জন্যই আপনাকে সরিয়ে দিচ্ছি।'

মহেশ চৌধুরীর মুখে কথাটা এমন খাপছাড়া শোনায়, বলিবার নয়। অন্তঃপুরে তাকে স্থান দিতে সাহস না হওয়াও মহেশের পক্ষে যেমন আশ্চর্য, তার সামনে এ ভাবে স্বীকার করার সাহস হওয়াও তার চেয়ে কম আশ্চর্য নয়। এই মহেশ চৌধুরীই না হাতুড়ি দিয়া নিজের মুখে আঘাত করিয়াছিল, মাধবীলতাকে অপমান করার জন্য সদানন্দের উপর ছেলের রাগ হওয়ার প্রায়শ্চিত্ত বাবদে?

'আমায় তুমি আর বিশ্বাস কর না, না মহেশ?'

'বিশ্বাস করি বৈকি প্রভু, আপনি তো দেবতা। তবে সাধনার যে স্তরে আপনি পৌঁছেছেন, এখন আর আপনাকে ঘর-গেরস্থালির মধ্যে রাখতে ভরসা হয় না। আপনার জন্যে সারাদিন আমার বুকের মধ্যে কাঁপে প্রভু। আমি এ অবস্থাটা পার হতে পারি নি প্রভু, তবে আমি তো অপদার্থ বাজে লোক, আমার সঙ্গে আপনার তুলনাই হয় না,— আপনি পারবেন। আপনি নিশ্চয় পার হয়ে যাবেন।'

সদানন্দ ভ্রূ কুঁচকাইয়া মহেশ চৌধুরীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, বুঝিয়াও যেন বুঝিয়া উঠিতে পারে না মানুষটাকে, দ্বিধা সন্দেহ ভয় শ্রদ্ধা মমতা প্রভৃতি কত বিভিন্ন মনোভাব যে পলকে উদয় হয়, তার হিসাব থাকে না। যা বলিল মহেশ চৌধুরী তাই কি তবে ঠিক? মিথ্যা কথা তো মহেশ বলে না। কেমন করিয়া লোকটি সম্বন্ধে এই ধারণাটা তার নিজের মনেই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, নিজেই সদানন্দ তা জানিতে পারে নাই, কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যে এই ধারণাটি আর সব মনোভাবকে যখন চাপা দিয়া মাথা চাড়া দিয়া ওঠে, তখন সদানন্দ এক অদ্ভুত কাজ করিয়া বসে। হঠাৎ মহেশের পায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, 'মহেশ, আমায় তুমি রক্ষা কর—বাঁচাও আমায়।'

তিন সন্ধ্যা পরম ভক্তিভরে যার পায়ের ধূলা মাথায় ঠেকায়, তাকে এই ভাবে পায়ে পড়িতে দেখিয়া মহেশ চৌধুরীর মূর্ছা যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মানুষটা যে সত্যই খাপছাড়া।

আরও কত তুচ্ছ কারণে কতবার যে ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্তু এখন ব্যাকুলতার বদলে আত্মপ্রতিষ্ঠাই যেন তার বাড়িয়া যায়। সহজভাবেই সে বলে, 'প্রভু, এ রকম করবেন না। এই জন্যই তো গেরস্থালির ভেতর থেকে আপনাকে সরিয়ে দিচ্ছি। আপনাকে রক্ষা করার ক্ষমতা কি আমার আছে প্রভু? নিজেকে আপনার নিজেরি রক্ষা করতে হবে—ভেবে দেখুন, নিজেকে আপনার নিজেরি রক্ষা করতে হবে।'

তারপর সদানন্দ উঠিয়া বাগানে চলিয়া যায়, লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ সদানন্দ! 'গেরস্থালি!' কতবার মহেশ কথাটা উচ্চারণ করিয়াছে। মানুষটা কি কম চালাক মহেশ, কম ফন্দিবাজ! মেয়েমানুষ নয়, গেরস্থালি! গেরস্থালির মধ্যে সদানন্দকে আর রাখিতে ভরসা হইতেছে না, তাই মহেশ তাকে সরাইয়া দিতেছে! বাগান হইতে সদানন্দ মাঠে যায়, সেখানে নেংটি পরা কে যেন একটা মানুষ একটা বাঁধা গরুকে প্রাণপণে মারিতেছিল। দেখিয়াই প্রাণপণে ছুটিতে ছুটিতে কাছে গিয়া সদানন্দ লাঠিটা ছিনাইয়া লইয়া লোকটাকে এক ঘা বসাইয়া দেয়। 'এমন, করে মারছিস, লাগে না গরুটার?' তারপর লাঠিটা ফেলিয়া দিয়া লোকটার যেখানে মারিয়াছিল সেখানে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলে, 'আহা তোমার লেগেছে বাবা?' তারও পরে লোকটিকে সঙ্গে করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া মহেশকে বলে, 'একে একটা টাকা দিয়ে দাও তো মহেশ।'

গরীব-চাষাভূষা মানুষ সাধু-সন্ন্যাসী দেখিয়াই ভড়কাইয়া যায়। তার উপর, সাধুটি কে, তাও তার অজানা ছিল না। থতমত খাইয়াই ছিল, এতক্ষণে বলিল, 'মোটে একটা, আজ্ঞে?

শুনিয়াই তো সদানন্দ চটিয়া গেল।' 'ওরে হারামজাদা, যা করে মারছিলি গরুটাকে, তোকে খুন করে ফেলা উচিত ছিল। তার বদলে একটা টাকা দিচ্ছি, তাতে তোমার পোষাল না? যা এখানে থেকে, ভাগ, কিছু পাবি না তুই।'

'আজ্ঞে না কর্তা, যা দিবেন মাথা পেতে লিব।'

'কিছু দেবে না তোকে—একটি পয়সাও নয়। যা এখান থেকে — গেলি? দিও না মহেশ, খপর্দারি দিও না।'

রাগের মাথায় সদানন্দকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া টাকার আশা ছাড়িয়া লোকটি তখনকার মত পালাইয়া যায়। টাকাটা কোমরে গুঁজিয়া সদানন্দ দাঁড়াইয়া থাকে। ঘণ্টাখানেক পরে আশ্রমের চালার নীচে মস্ত আসর বসিলে সকলের সামনেই জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সদানন্দ বলে, 'আমার মনটা বড় দুর্বল হয়ে গেছে, মহেশ।'

মহেশ চৌধুরী ভরসা দিয়া বলে, 'তা তো যাবেই প্রভু?'

ভরসা পাওয়ার বদলে সদানন্দ কিন্তু আবার ভয়ানক চটিয়া ধমক দিয়া বলে, 'যাবেই মানে? কি যে তুমি পাগলের মত বল, তার ঠিক নেই।'

।। চৌদ্দ ।।

সদানন্দ ভাবে ঃ আমি নিজে যে কি সাধনা করছি, আমি নিজে তা জানি না কেন? সাধনার কোন্ স্তরে আমি পৌঁছেছি, আমার চেয়ে মহেশ চৌধুরী তা বেশী জানে কেন? ব্যাপারখানা কি?

নিজের কাছে ফাঁকি খুব ভালরকমেই চলে কি না, সদানন্দ তাই ভাবিয়া পায় না ঠিক

কোন্ প্রক্রিয়ায় কি ভাবে কোন্ সাধনাটা সে কবে করিয়াছে। আসন করিয়া অনেক সময় বসিয়া থাকিয়াছে বটে, আবার অনেক সময় বসিয়া থাকেও নাই। কিন্তু আসন করিয়া বসিয়া থাকিলেই কি সাধনা হয়, আর কোন রীতিনীতি নিয়ম-কানুন সাধনের নাই? আসন করিয়া বসিয়াই থাক আর বিছানায় চিৎ হইয়া পড়িয়াই থাক, চিন্তা সে যে একরকম সব সময়েই করে, জীবনের তুচ্ছতম বিষয়টির মধ্যে রহস্যময় দুর্বোধ্যতা আবিষ্কার করা হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট রহস্যগুলির ফাঁকি ধরিয়া ফেলা পর্যন্ত নানা ধরণের বিচিত্র চিন্তায় মশগুল হইয়া সে যে দিন কাটাইয়া আসিতেছে, এটা তার খেয়াল হয় না। দিনের পর দিন নিজেকে নতুন চেনায় চিনিয়াছে, আবার নতুন আত্মহারা হইয়া গিয়াছে। এ ব্যাপারটাকে সদানন্দ সাধারণ বাঁচিয়া থাকার পর্যায়েই ফেলে। এক একজন মানুষ থাকে যারা ঘরে বসিয়া এলোমেলো লেখাপড়া করে, আগে শেষ করে দ্বিতীয়ভাগ, তারপর ধরে প্রথমভাগ, জ্ঞান হয়তো তাদের জমা হয় অনেক ডিগ্রীধারী নামকরা জ্ঞানীর চেয়ে বেশী, কিন্তু জ্ঞান বলিয়া কিছু যে তারা সংগ্রহ করিয়াছে, এ ধারণাটাই তাদের মনে আসে না। ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া যেখানে উঠিতে হয়, বাঁশের খুঁটি বাহিয়াও যে সেইখানেই উঠিয়া পড়িয়াছে, উঠিবার পরও অনেকে তা বিশ্বাস করিতে চায় না। সাধুসন্ন্যাসীর যোগসাধনার বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ হইলেও বরং কথা ছিল এসব যে ছেলেখেলা নয়, সদানন্দ তা ভাল করিয়াই জানে। নিজের অজ্ঞাতসারে সাধনার পথে অগ্রসব হইয়া চলা এবং কঠিন ও বিপজ্জনক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছানো যে কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে, কোনমতেই তার মাথায় ঢুকিতে চায় না।

রাত দুপুরে ঘুম আসে না। অনেকক্ষণ ছটফট করিয়া মহেশ চৌধুরীকে ডাকিয়া পাঠায়।

'ভয় করছে প্রভু?'

প্রশ্ন শুনিবামাত্র সদানন্দ টের পায়। এতক্ষণ ভয়ই করিতেছিল বটে। একটা দুর্বোধ্য বীভৎস আতঙ্ক মনের মধ্যে চাপিয়া বসিয়াছে।

তবু সাহস করিয়া সদানন্দ বলে, 'তুমি ভুল করছ মহেশ। আমি তো কোনদিন সাধন-ভজন কিছু করিনি।'

'রাত দুপুরে জেগে বসে এই যে হিসাব করছেন সাধনভজন কিছু করেছেন না কি, এটা কি প্রভু?'

সদানন্দ অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে।

জোড়হাতে সবিনয়ে মহেশ চৌধুরী সদানন্দকে নানারকম উপদেশ দেয়। সদানন্দ নিজে কেন জানে না সে সাধক? কেন জানিবে! সাধক যে নিজেকে সাধক বলিয়া জানে, সেই জানাটা কি, সদানন্দ কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছে? অনন্যসাধারণ প্রক্রিয়াগুলি ওই জ্ঞানের জন্ম দেয় আর যতদিন সাধক ওই জ্ঞানকে একেবারে ভুলিয়া যাইতে না পারে, ততদিন সিদ্ধিলাভের কোন ভরসাই থাকে না। সদানন্দের জানিবার তো কোন কারণ ঘটে নাই যে সে সাধনা করিতেছে, প্রক্রিয়া সে ঠিক করিয়া গিয়াছে নিজে, ও সব তার কাছে বাঁচিয়া থাকারই অঙ্গস্বরূপ। তা ছাড়া, যে রকম সাধনা সে কোনদিন করে নাই, লোকের কাছে নিজেকে সেইরকম সাধক বলিয়া পরিচিত করার ফলে মনে মনে একটা তার ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, সাধনার ব্যাপারে সে ফাঁকিবাজ। আসলে কিন্তু—

'আমি যে ফাঁকিবাজ তাও দেখছি তুমি জানো মহেশ?'

'ফাঁকিবাজ তো আপনি নন প্রভু!'

সদানন্দ চটিয়া বলে, 'এই বলছ লোককে ফাঁকি দিই, সঙ্গে সঙ্গে আবার বলছ ফাঁকিবাজ

নই, তোমার কথার মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারি না মহেশ।'

'আজ্ঞে, দশজনকে জানিয়েছেন, আপনি সাধু—তাতে তো ফাঁকিবাজি কিছু নেই। দশজনের ভালোর জন্য নিজেকে সাধু ঘোষণা করাও সাধু ছাড়া অন্যের দ্বারা হয় না প্রভু। নিজের জন্য তো চান নি, লোকে সাধু ভাবুক, অসাধু ভাবুক, আপনাব বয়ে গেল!'

সদানন্দ সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িয়া বলে, 'নিজের জন্য চেয়েছিলাম কিনা কে জানে!'

'না, প্রভু, না। তাই কি আপনি পারেন?'

খানিক পরে প্রকারান্তরে সদানন্দ মহেশ চৌধুরীকে এখানে শুইযা থাকার অনুরোধ জানায়, কিন্তু মহেশ রাজী হয় না। বলে যে ভয়কে এড়াইবার চেষ্টা করিলে তো চলিবে না, ভয়কে জয় করিতে হইবে।

মহেশ চৌধুরীর তুলনায় নিজেকে সদানন্দের অপদার্থ মনে হয়।

গভীর হতাশায় মন ভরিয়া যায়, রাগের জ্বালায় দেহের কি যেন সব পুড়িয়া যাইতে থাকে। মহেশ চৌধুরীর বাঁচিয়া থাকার কোন মানে হয় না, এই ধরণের উদ্ভট চিন্তা অসংখ্য খাপছাড়া কল্পনার আবরণে আসিয়া ভিড় করে। ক্রমে ক্রমে একটা বড় আশ্চর্য ব্যাপার সে লক্ষ্য করে। মহেশ চৌধুরীর একটা বড রকম ক্ষতি করার চিন্তাকে প্রশ্রয় দিলেই হঠাৎ নিজেকে যেন তার সুস্থ মনে হইতে থাকে, দেহ মনের একটা যন্ত্রণাদায়ক অসুস্থ অবস্থা যেন চোখের পলকে জুড়াইয়া যায়। যে আতঙ্কময় ফাঁপর ফাঁপর ভাবটা আজকাল তাকে থাকিয়া থাকিয়া আক্রমণ করে, আর যেন তার পাত্তাই পাওয়া যায় না। মহেশ চৌধুরীকে মনে মনে হিংসা করিবার সময়টা জাগ্রত স্বপ্নের প্রভাব হইতে সে মুক্তি পায়, মাথাব ঝিমঝিমানি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। বাতাসে ভাসিয়া বেড়ানোর বদলে হঠাৎ যেন শক্ত মাটিতে দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া টের পায়।

মহেশ চৌধুরীকে তীব্রভাবে ঘৃণা করিয়া, দশজনের কাছে তাকে হীন প্রতিপন্ন করার সম্ভব অসম্ভব মতলব আঁটিয়া, আর নিজেকে তার চেয়ে ছোট মনে করার প্রতিক্রিয়ায় জর্জরিত হইয়া গিয়া, সদানন্দ আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। অন্ততঃ তার তাই মনে হয়। ভয়টা যে এড়ানো যায়, রক্ত চলাচল শ্লথ করিয়া দেওয়ার মত উত্তেজনাবিহীন সর্বগ্রাসী ভয়, তাও কি কম? মহেশ চৌধুরী অবশ্য ভয় এড়ানোর চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু এসব ব্যাপারেব সে কি বোঝে, কি দাম আছে তার উপদেশের? সদানন্দকে উপদেশ দিতে আসে, স্পর্ধাও কম নয় লোকটার!

দিন কাটিয়া যায়। মহেশ চৌধুরী শান্ত চোখে সদানন্দের চালচলন আর ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে। মুখখানা যেন তার দিন দিন অল্পে অল্পে বিষণ্ণ ও গম্ভীর হইয়া উঠিতে থাকে।

একদিন মহেশ চৌধুরী বলে, 'প্রভু?'

সদানন্দ একটা শব্দ করে, যেটা জবাব হিসাবেও ধরা যায়, আবার অবজ্ঞা হিসাবেও ধবা যায়।

'আর এগোতে পারছেন না প্রভু, না?'

'কিসের এগোতে পারছি না? কে বললে তোমাকে, এগোতে পারছি না?'

মহেশ চৌধুরীর চোখ ছল ছল করিতে থাকে, 'এগোতে না পারলে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, পিছিয়ে আসছেন কেন প্রভু? এখন পিছু হটতে শুরু করলে কি আর উপায় আছে! প্রথমটা একটু ভাল লাগে, কিন্তু দুদিন পরে নিজের হাত পা কামড়াতে ইচ্ছা হবে। এমন যন্ত্রণা পাবেন, এখন তা ভাবতেও পারবেন না।'

'তোমার উপদেশ বন্ধ কর তো মহেশ।'

'উপদেশ নয়, কথাটা মনে পড়িয়ে দিচ্ছি। নিজেই বুঝে দেখুন, কি বিপদ ঘটাচ্ছেন নিজের।'

সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও সদানন্দ কিছু কিছু বুঝিতে পারে। মহেশ চৌধুরীর সম্মুখ হইতে ছুটিয়া পালানোর এরকম জোরালো ইচ্ছা আগে তার হইত না এবং মহেশ চৌধুরীর দিকে চোখ তুলিয়া চাহিবার কাজে এতটা শক্তিক্ষয়ও করিতে হইত না! নূতন একটা অনুভূতি আজকাল তার কাছে ধরা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, মানুষের জীবনের ব্যর্থতার অনুভূতি। অনুভূতিটা একেবারে নূতন, এ পর্যন্ত চাপা পড়া সঙ্কেতের মতও কোনদিন অনুভব করে নাই। মানুষের জীবনের ব্যর্থতার কথা অবশ্য সে অনেক ভাবিয়াছে, মাঝে মাঝে গভীর বিষাদে হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে যেন ছিল অন্য জিনিষ। রোগে শোকে একজন মানুষকে কষ্ট পাইতে দেখিলে সহানুভূতির মধ্যে যে বিষাদ জাগিত, সমস্ত মানুষের জীবনের মূল্যহীনতা জাগাইয়া তুলিত সেই বিষাদ। কিন্তু এখন সে যা অনুভব করে, সেটা যেন ঠিক বিষাদ নয়। মানুষের বাঁচিয়া থাকার কোন অর্থ নাই, তার নিজের জীবনটা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত লোক বাঁচিয়াছিল, তাহাদের জীবনও ব্যর্থ এবং ভবিষ্যতে যত লোক পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে, তাদের জীবনও ব্যর্থ—কিন্তু তাতে যেন কিছু আসিয়া যায় না। ব্যর্থতার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর নাই, জীবনের প্রতিকারহীন জীবনব্যাপী। বার্থতা—। অথচ তাও যেন সদানন্দের কাছে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। নির্বিকার ভোঁতা একটা ক্ষোভ শুধু সে অনুভব করে। জ্বর আসিবার আগে শরীর ম্যাজ ম্যাজ করার মত এটা কি ভয়ানক কিছুর সূচনা?—মহেশ চৌধুরীর আলোচনা এই প্রশ্ন আর ভয় তার মধ্যে জাগাইয়া দেয়।

মহেশ চৌধুরীর ভক্তিশ্রদ্ধা ক্রমে ক্রমে যেন কমিয়া আসিতে থাকে। জোড়হাতে ছাড়া সদানন্দের সঙ্গে সে একরকম কথাই বলিত না, আজকাল হাত জোড় করিতে ভুলিয়া যায়। প্রভু শব্দটাও তার মুখে শোনা যায় কদাচিৎ। মহেশ চৌধুরীর ভক্তি শেষের দিকে সদানন্দকে বিশেষ কিছু তৃপ্তি দিত না, কিন্তু ভক্তির অভাব ঘটায় আজকাল তার ভয়ানক রাগ হয়।

সভায় কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া সে সকলের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দ্যাখে। মহেশ চৌধুরীর মত অন্য সকলের ভক্তিশ্রদ্ধাও কি কমিয়া গিয়াছে? এতকাল যাদের সে শিশু মনে করিয়া আসিয়াছে, মতামত নিয়া কোনদিন মাথা ঘামায় নাই, আজকাল তাদের তাকানোর ভঙ্গিতে অনুকম্পা আর অবজ্ঞা আবিষ্কার করিয়া বুকের মধ্যে হঠাৎ তার ধড়াস করিয়া ওঠে। কি করিয়াছে সে? কার কাছে কি অপরাধ করিয়াছে? কার সঙ্গে কিসের বাধ্যবাধকতায় সে আটক পড়িয়া গিয়াছে? দেহবাদী এই সব অপদার্থ মানুষ কেন তাকে সর্বদা ইঙ্গিত করিতেছে, আমরা কাপুরুষ, কিন্তু হে মহাপুরুষ, তোমার চেয়ে কত সুখেই আমরা বাঁচিয়া আছি!

নিছক ভাবপ্রবণতা? যে জিনিষটা চিরদিন সে এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে? বুঝিয়াও সদানন্দ যেন বুঝিতে পারে না। কোন্‌টা মনের দুর্বলতা জানিবার পরেও সেটাকে দমন করা যে এমন কঠিন ব্যাপার, এতকাল তার জানা ছিল না। আগে ঘরের কোণে নিজের ছেলেমানুষির কথা ভাবিয়া তার হাসি পাইত, এমন তুচ্ছ একটা বিষয়কে এত বড় করিয়া তুলিয়াছে কেন ভাবিয়া অবাক হইয়া যাইত—আজকাল ছেলেমানুষিকে প্রশ্রয় দেওয়ার দুর্ভাবনায় মাথা যেন তার ফটিয়া যাওয়ার উপক্রম করে। হাত পা নাড়ায় বাধা দিলে শিশু যেমন ক্ষেপিয়া যায়, ছেলেমানুষিকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টার ব্যর্থ হইয়া সদানন্দের সেইরকম

উন্মাদের মত আর্তনাদ করিতে ইচ্ছা যায়।

একবার বিপিন আসিয়া বলে, 'তোর চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে?'

সদানন্দ রাগিয়া বলে, 'গেছে তো গেছে, তোর কি?'

বিপিন উদাসভাবে বলে, 'আমার আবার কি! তুই মরলেই বা আমার কি?'

ফিরে যাওয়ায় সময় মহেশ চৌধুরীর সঙ্গে বিপিনের দেখা হয়। বিপিন বলে, 'সাধুজীকে খেতে দেন না নাকি? মুখের চামড়া যে কুঁচকে যেতে বসেছে মশায়?'

মহেশ চৌধুরী বলে, 'না খেলে কি মুখের চামড়া কুঁচকে যায় ভাই? নিজে কুঁচকে দিচ্ছেন, মুখের চামড়ার কি দোষ!' বিষণ্নভাবে মহেশ চৌধুরী মাথা নাড়ে 'কত আশা করেছিলাম, সব নষ্ট হয়ে গেল। কি খেলাই যে ভগবান খেলেন। এত বড় মানুষ আমি আর দেখিনি বিপিনবাবু, অবতার বলা চলত। কি যে হল, নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে ফেলছেন।'

বিপিন অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরী আবার বলে, 'গুরুর নির্দেশ মেনে সারা জীবন প্রাণপাত করে যোগী ঋষি যে স্তরে উঠতে পারেন না, উনি নিজের স্বাভাবিক প্রেরণায় বিনা চেষ্টায় সে স্তরে পৌঁছেছিলেন। এক একবার আমি ভাবি কি জানেন, আমিই ভুল করলাম আমি সচেতন করিয়ে দিয়েছি বলে কি বিগড়ে গেলেন? যেমন অবস্থায় ছিলেন সে অবস্থায় থাকলে হয়তো নিজের চেষ্টায় আপনা থেকে সামলে এগিয়ে চলতেন।'

মহেশ চৌধুরীর আপসোস দেখিয়া বিপিন আরও অবাক হইয়া যায়। লোকটাকে একটু পাগলাটে বলিয়া তার ধারণা ছিল, আজ হঠাৎ যেন চমক খায়। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মহেশ চৌধুরী আবার বলে, ' এ সব লোকের প্রচণ্ড তেজ আর শক্তি থাকে। যেই জেনেছেন সাধনার পথে এগোচ্ছেন অমনি বিদ্রোহ করে বসেছেন। সামনে এগিয়ে দেবার জন্য আমি একটু আধটু চেষ্টা করেছি বলেই বোধ হয় রাগ করে পিছু হটতে আরম্ভ করেছেন। কি সর্বনাশটাই আমি করলাম বিপিনবাবু?'

'যা করেছেন, ভাল উদ্দেশ্যেই তো করেছেন।'

'তবু আমার ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করাই হয়তো উচিত ছিল।'

দিন দশেক পরে মহেশ চৌধুরী একদিন সকালে বিপিনের আশ্রমে গেল। বিপিন আশ্রমে ছিল না, রত্নাবলী মহেশকে আদর করিয়া বসাইল। আজকাল মহেশের সম্মান বাড়িতেছে—মাধবীলতা তার ছেলের বৌ!

রত্নাবলী বলিল, 'আপনার ওখানে এবার আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করেছি।'

মহেশ হাসিয়া বলিল 'আমাদের ওখানে কি কারও থাকবার ব্যবস্থা আছে?—গিয়ে থাকতে হয়।'

উমা বলিল, 'আমাদের যেতে দিতে আপনি আপত্তি করছেন কেন বুঝতে পারি না।'

'আপত্তি? আপত্তি কিসের! তবে জানেন আপনারা গেলে বিপিনবাবু রাগ করবেন কিনা, তাই আপনাদের নিয়ে যাইনি।'

'বিপিনবাবু রাগ করবেন বলে ইচ্ছে হলে আমরা কোথাও যেতে পারব না! আমরা কি বিপিনবাবুর কয়েদী নাকি?'

'উহুঁ, তা কেন হবেন। আপনাদের ইচ্ছে হলে আপনারা যেখানে খুশি যাবেন, কিন্তু আমার কি নিয়ে যাওয়া উচিত? সে রকম ইচ্ছেও আপনাদের হয়নি যাওয়ার, হলে আপনারা নিজেরাই

যেতেন, জোর করে যেতেন।'

'থাকতে দিতেন গেলে?'

'থাকতে দিতাম বৈকি।'

রত্নাবলী একটু খোঁচা দিয়া বলিল, 'কিন্তু বিপিনবাবু যে রাগ করতেন?'

মহেশ সহজভাবেই বলিল, 'রাগ করলে কি আর করতাম বলুন। আমি আপনাদের নিয়ে যাইনি, আপনারা নিজের ইচ্ছায় গিয়েছেন। তাতেও যদি বিপিনবাবু রাগ করতেন—করতেন!'

'আপনি আশ্চর্য মানুষ!' উমা বলিল।

'উচিত অনুচিত জ্ঞানটা আপনার যেন একটু বেশীরকম সূক্ষ্ম। সব ব্যাপারেই কি এমনি করে বিচার করেন?' রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করিল।

'বিবেক বড় কামড়ায় কিনা, বিচার না কবে উপায় কি? বিবেকের কামড় এড়াবার সহজ উপায় থাকতে জেনে শুনে সাধ করে কামড় খাওয়া কি বোকামি নয়?'

'জীবনটা একঘেয়ে লাগে না আপনার?' রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করিল।

'কেন, একঘেয়ে লাগবে কেন? সবাই বিচার করে কাজ করে, আমিও করি। অন্য দশজনে নিজের নিজের বুদ্ধি বিবেচনামত কর্তব্য ঠিক করে, আমিও তাই করি। কেউ জেনে শুনে ভুল করে, কেউ বুদ্ধির দোষে ভুল করে, কেউ কেউ আবার করছে কি না করছে গ্রাহ্যও করে না। আমি একটু চালাক মানুষ কিনা, তাই সব সময় চেষ্টা করি যাতে ভুল না হয়। তবু আমিও অনেক ভুল করে বসি। আমার যদি একঘেয়ে লাগে, তবে পৃথিবীর সকলেরি একঘেয়ে লাগবে।'

'আপনিও তবে ভুল করেন?'

'করি না? মারাত্মক ভুল করে বসি। সাধুজীকে নিয়ে গিয়ে একটা ভুল করেছি।'

উমা ও রত্নাবলী দুজনেই একসঙ্গে বলে, 'বলেন কি!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ! জীবনে এমন ভুল আর করিনি।'

উমা আর রত্নাবলী মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।—'কিন্তু বিপিনবাবু ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বলেই তো আপনি—'

মহেশ চৌধুরী মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না না, তাড়াবেন কেন? দুজনে একটু মনোমালিন্য হয়েছিল, বন্ধু কিনা দুজনে। বিপিনবাবু তাই রাগ করে—যাকগে, কি আর হবে ও-সব কথা আলোচনা করে?'

ঘণ্টাখানেক পরে বিপিন ফিরিয়া আসিলে মহেশ চৌধুরী তাকে আড়ালে ডাকিয়া নিয়া গেল। তাকে আশ্রমে দেখিয়াই বিপিন আবাক হইয়া গিয়াছিল, প্রস্তাব শুনিয়া তার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

'ওকে ফিরিয়ে আনতে বলছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আগের অবস্থায় ফিরে এলে হয়তো আত্মসংবরণ করতে পারবেন।'

'ও কি ফিরে আসবে?'

'আসবেন বৈকি।'

বিপিন চুপ করিয়া থাকে। মাঝে মাঝে চোখ তুলিয়া তাকায় আর চোখ নামাইয়া নেয়। তারপর হঠাৎ বলে, 'দেখুন আপনাকে সত্যি কথা বলি। মাঝে মাঝে আমি যে আপনার ওখানে যেতাম, আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। সদা চলে যাওয়ার পর আমাব কতগুলি ভারি মুস্কিল হয়েচে। তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকে আমরা বন্ধু, ওকে ছেড়ে থাকতেও কেমন কেমন

লাগছে। তাই ভেবেছিলাম, বলে কয়ে আবার ফিরিয়ে আনব। আমি অনেক বলেছি, ও কিন্তু রাজি হয়নি।'

মহেশ চৌধুরী বলিল, 'তা জানি। আমিও ওই রকম অনুমান করছিলাম।'

বিপিন চোখ বড় বড় করিয়া চাহিয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরী আবার বলিল, 'এতকাল রাজি হন নি, এবার বললেই রাজি হবেন। এখানে উনি ভয়ানক যন্ত্রণা পাচ্ছেন।'

।। পনেরো ।।

বলা মাত্র সদানন্দ রাজি হইল না, তবে শেষ পর্যন্ত রাজি সে হইয়া গেল। তবে একটা চুক্তি সে করিল বড় খাপছাড়া। প্রথমটা আরম্ভ করিল যেন একটু সলজ্জভাবে, সঙ্কোচের সঙ্গে, বিপিনের হাঁটুর দিকে তাকাইয়া, 'আমার সব কথা শুনে চলবি?'

'না।'

আর খানিকটা চোখ তুলিয়া সদানন্দ বলিল, 'কোন বিষয়ে আমায় জ্বালাতন করবি না?'

'করব।'

আর খানিকটা তুলিয়া ; 'আমার কাছে গোপন করবি না?'

'করব।'

তখন সোজাসুজি চোখের দিকে চাহিয়া সদানন্দ বলিল, 'আরেকটা কাজ করতে হবে আমার জন্যে। মাধুকে আমার চাই।'

'মাধুকে তোর চাই? কি করবি মাধুকে দিয়ে—ও!'

বিপিন হাঁ করিয়া সদানন্দের দিকে চাহিয়া রহিল। এ রকম সদানন্দের সঙ্গে তার কোনদিন পরিচয় ছিল না। মাধবীলতার জন্য আকর্ষণ অনুভব করা অবস্থাবিশেষে সদানন্দের পক্ষে সম্ভব, অবস্থাবিশেষে হঠাৎ মাথাটা তার মাধবীলতার জন্য খারাপ হইয়া যাওয়াও অসম্ভব নয়, কিন্তু এভাবে কোন ছেলেমানুষকে চাওয়ার মানুষ সে নয়। যদি বা মনে মনে চায়, লজ্জায়, দুঃখে, ঘৃণায়, লোকের কাছে মুখ দেখাইতে তার অস্বস্তি বোধ হওয়া উচিত। বিপিন নিজেই দারুণ অস্বস্তিবোধ করিতে থাকে, সে স্পষ্টই বুঝিতে পারে, মাধুকে পাওয়া সম্বন্ধে চেষ্টা করিবার কথা না দিলে সদানন্দ ফিরিয়া যাইবে না।

'কিন্তু মাধুর যে বিয়ে হয়ে গেছে?'

'তাতে কি?'

'তাতে কি? তাতে কি? তুই একটা পাঁঠা সদা, আস্ত পাঁঠা। আগে বলিস্‌নি কেন, বিয়ের আগে? তোর কথায় যখন উঠত বসত?'

সদানন্দের চোখ জ্বলিয়া উঠিল—এ জ্যোতি বিপিন চেনে। মানুষকে খুন করবার আগে মানুষের চোখে এ জ্যোতি দেখা দেয়—'কি জানিস বিপিন, আগে মেয়েটাকে বড় মায়া করতাম, তখন কি জানি এমন পাজি শয়তান মেয়ে, তলে তলে এমন বজ্জাত! একটা রাত্রির জন্য ওকে শুধু আমি চাই, বাস, তারপর চুলোয় যাক, যা খুশি করুক, আমার বয়ে গেল। ওর অহঙ্কারটা ভাঙ্গতে হবে।'

এবার বিপিন যেন ব্যাপারটা খানিক বুঝিতে পারে। মাধবীলতা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, তাই সদানন্দের এত জ্বালা। নিজে সে যাচিয়া মাধবীলতাকে প্রত্যাখ্যানের অধিকার দিয়াছে, তাই আজ প্রত্যাখ্যানের জ্বালা সহ্য হইতেছে না, নয়তো তাকে অবহেলা করার অধিকার কোন মেয়ের আছে, এ ধারণাই সদানন্দের মনে আসিত কিনা সন্দেহ। নিজে সে মাধবীলতাকে বড় করিয়াছে, মাধবীলতাকে অধিকার দিয়াছে অনেক, নিজের উপভোগের স্বাদ বাড়ানোর জন্য নিজের কামনাকে জোরালো করিয়াছে, ব্যাপক করিয়াছে। নয়তো কে ভাবিত মাধবীলতার কথা—কেবল মাধবীলতার কথা নয়, সে কি করে না করে আর ভাবে না ভাবে তা পর্যন্ত! বড় জোর একদিন তার কাছে মুচকি হাসির সঙ্গে আপসোস করিয়া বলিত, 'ছুঁড়িটা বড় ফসকে গেল রে বিপিন!'

নতুন করিয়া সদানন্দকে আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করিয়া এই ব্যাপারটা নিয়াই বিপিন মাথা ঘামায়। সদানন্দের সম্বন্ধে মহেশ চৌধুরীর কয়েকটা মন্তব্যও সে যেন কম বেশী বুঝিতে পারে। সদানন্দের সংযম সত্যই অসাধারণ ছিল, কারণ তার মধ্যে সমস্তই প্রচণ্ড শক্তিশালী, অসংযম পর্যন্ত। কেবল তাই নয়, সংযমও তার মাঝে মাঝে ভাঙিয়া পড়ে। কামনার যার এমনিই জোর নাই, ভিতর হইতে যার মধ্যে বোমা ফাটিবার মত উপভোগের সাধ কোন দিন ঠেলা দেয় নাই, আত্মজয়ের তো তার প্রয়োজনও হয় না। কিন্তু সদানন্দের মত মানুষ, অতি অল্প বয়সেই যারা নিজের উপর অধিকার হারাইয়া বিগড়াইয়া যাইতে আরম্ভ করে, তার পক্ষে তো হঠাৎ কদাচিৎ অন্যায় করিয়া ফেলিয়াও অন্যায় না করিয়া বাঁচিয়া থাকা, অন্যায় করার অসংখ্য সুযোগের মধ্যে অন্যায় করার সাধ দমন করিয়া চলা, আত্মোপলব্ধির সাংঘাতিক সাধনায় ব্যাপৃত থাকার মত মনের জোর বজায় রাখা তো সহজ ব্যাপার নয়। সদানন্দের অনেক দুর্বলতা, অনেক পাগলামির একটা নূতন অর্থ বিপিনের কাছে পরিষ্কার হইয়া যায়। সে বুঝিতে পারে মহেশ চৌধুরীর কথাই ঠিক, ও সব দুর্বলতা শক্তির প্রতিক্রিয়া, ও সব পাগলামি অতিরিক্ত জ্ঞানের অভিব্যক্তি। নিজে সদানন্দ জানিত না সে সত্য সত্যই মহাপুরুষ, তাই ভাবিত লোকের কাছে মহাপুরুষ সাজিয়া লোককে ঠকাইতেছে। শত শত মানুষ যে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অভিভূত হইয়া যায়, সামনে দাঁড়াইয়া চোখ তুলিয়া মুখের দিকে চাহিতে পারে না, তাও সে ধরিয়া নিয়াছিল শুধু তার নানারকম ছল আর মিথ্যা-প্রচারের ফল। এত বড় বড় আদর্শ সে পোষণ করিত (হয়তো এখনো করে) যে, নিজের অসাধারণত্বকে পর্যন্ত তার মনে হইত (হয়তো এখনো হয়) সাধারণ লোকের তুচ্ছতার চেয়েও নীচু স্তরের কিছু।

বন্ধুর জন্য বিপিন একটা শ্রদ্ধার ভাব অনুভব করে, বন্ধুর আধুনিকতম এবং বীভৎস ও বিপজ্জনক প্রস্তাবটাও যার তলে চাপা পড়িয়া যায়। যোগাযোগটা তার বড় মজার মনে হয়। মহেশ চৌধুরী যখন সদানন্দকে মনে করিত দেবতা, তখন তার জন্য বিপিনের মনে ছিল প্রায় অবজ্ঞারই ভাব, তারপর সদানন্দের অধঃপতনের জন্য মহেশ চৌধুরীর ভক্তি যখন উবিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন বিপিনের মধ্যে জাগিয়াছে শ্রদ্ধা! মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের নিয়মকানুনগুলি খাপছাড়া নয়?

বিপিনের আশ্রম ত্যাগ করা, মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে বাস করা, নূতন আশ্রম খুলিয়া নূতনভাবে জীবনযাপন করা এবং তারপর আবার নিজের পুরাতন আশ্রমে ফিরিয়া আসা, নাম ছড়ানোর দিক দিয়া এ সমস্ত খুবই কাজে আসিল সদানন্দের। মহেশে চৌধুরীর আশ্রমে সমবেত নারী পুরুষের ভক্তিশ্রদ্ধা হারানোর যে ভয়টা সদানন্দের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা

দিতেছিল সেটা অবশ্য নিছক ভয়, সকলেই শিষ্যত্ব অর্জনের এবং তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার অধিকার আর সুযোগ পাওয়ায় তার সম্বন্ধেই লোকের অস্বাভাবিক ভয়টা কমিয়া আসিতেছিল। বিপিনের সাহায্যে নিজের চারিদিকে সে যে কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছিল, মহেশের চেষ্টা ছিল সেটা ভাঙিয়া ফেলিয়া সকলের সঙ্গে তার সম্পর্কটা সহজ করিয়া তোলা। সম্পর্কটা সত্যসত্যই সহজ হইয়া আসিতে থাকায় সদানন্দের মনে হইয়াছিল, লোকের কাছে সে বুঝি নীচে নামিয়া যাইতেছে।

হয়তো নামিয়া যাওয়াই। সংস্কার-নাড়া-দেওয়া ভয়ের ভিত্তিতেই হয়তো দেবতার সর্বোচ্চ আসন পাতা সম্ভব।

সদানন্দের সঙ্গে মহেশ চৌধুরীর আশ্রমের জনপ্রিয়তা যেন শেষ হইয়া গেল, যেদিন পুরাতন আশ্রমে সদানন্দ নূতন পর্যায়ে আসর বসাইল প্রথমবার, সেদিন মহেশ চৌধুরীর আশ্রমে লোক আসিল মোটে দশ-বার জন। সকলে সদানন্দের উপদেশ শুনিতে গিয়াছে —আগে যত লোক আসিত তার প্রায় তিনগুণ। সদানন্দ ভাবিয়াছিল এবার হইতে যতটা সম্ভব মহেশ চৌধুরীর নিয়মেই আশ্রম পরিচালনা করিবে, শিষ্য করিবে সকলকেই, নাগালের মধ্যে আসিতে দিবে সকলকেই, কথা বলিবে, সহজভাবে। একনজর তাকাইয়াই আর নারী বা পুরুষকে অপদার্থ করিয়া দিবে না। কিন্তু ভিড় দেখিয়া হঠাৎ তার কি যে জাগিল উল্লাস আর গর্ব মেশানো একটা নেশা, মুখের গাম্ভীর্যের আর তুলনা রহিল না, যেন গোপন পাপ সব আবিষ্কার করিয়া ফেলিতেছে দৃষ্টির তীব্রতায়, এমনি অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল অনেকের, আর কথা শুনিতে শুনিতে অনেকের মনে হইতে লাগিল তার পায়ে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে মরিয়া যায়।

প্রণামী দিতে গিয়া দু'একজন পায়ে আছড়াইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সুবিধা হইল না।

প্রথম জনকে সদানন্দ বলিল, 'উঠে বোসো। তিনমাস মাছ, মাংস, মেয়েমানুষ ছুঁয়ো না। এবার যাও—যাও!'

দ্বিতীয় জনকে সংক্ষেপে বলিল, 'পাঁচ বছরের মধ্যে তুমি আমার কাছে এসো না।'

আগে কেউ বাড়াবাড়ি করার সাহস পাইত না, ভাবপ্রবণতার নাটকীয় অভিব্যক্তি সদানন্দ পছন্দ করে না। মাঝখানে অনেকগুলি ব্যাপার ঘটায় আর সদানন্দ নিজের নূতন পরিচয় দেওয়ায় কয়েকজনের সাহস হইয়াছিল, নূতন লোকও আজ আসিয়াছিল অনেক। কিন্তু পায়ে আছড়াইয়া পড়ার (তিন টাকা প্রণামী দেওয়ার পরেও) আর হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করার (প্রণামী—আড়াই টাকা) ফল দেখিয়া সকলের সাহস গেল। সকলের বসিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, সদানন্দ যেন কোথাও কোনদিন যায় নাই, মাঝখানে প্রায় বছরখানেকের ফাঁক পড়ে নাই, এইখানে আগে যেমন সভা বসিত, আজ একটু বড় ধরণে সেই রকম সভাই বসিয়াছে।

কিন্তু দোকানে ফিরিয়া গিয়া শ্রীধর সেদিন সন্ধ্যার পর মুখখানা যেন কেমন একটু ম্লান করিয়া বলিল 'ঠাকুরমশায় কেমন যেন বদলে গেছেন। ঠাকুরমশায়ের রাগ তো দেখিনি কখনো, সত্যিকারের রাগ?'

ঠিক সেই সময় আশ্রমে নিজের গোপন অন্তঃপুরে সদানন্দ বিপিনকে বলিতেছিল, 'উমা আর রতনকে দিয়ে মাধুকে আনতে হবে। এই ঘরে মাধুকে বসিয়ে রেখে ওরা চলে যাবে, তারপর আমি না ডাকলে কেউ আমার মহলে আসবে না।'

'উমা আর রতন? ওরা কেন রাজি হবে?'

'হবে। আমি বললেই হবে।'

'তা হবে না। এ রকম মতলবের কথা শুনলেই ওদের মন বিগড়ে যাবে, আশ্রম ছেড়েই হয়তো চলে যাবে।'

'সে আমি বুঝব।'

কিন্তু বুঝা বিপিনের পক্ষেও প্রয়োজন, সে তাই সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়ে। তারপর অন্য কথা বলে, 'কিন্তু মহেশ বা বিভূতি যদি পুলিস ডেকে আনে?'

'আনে তো আনবে।'

'আনে তো আনবে? তোর খারাপ মাথাটা আর খারাপ হয়ে গেছে সদা।'

'তুই বড় বোকা বিপিন। পুলিস আশ্রমের ধারে আসামাত্র উমা, রতন আর আশ্রমের আরও পাঁচ-সাতটি মেয়ে মাধুকে ঘিরে বসবে। পুলিস এসে দেখবে মাধুকে কেউ আটকে রাখেনি, মেয়েদের সঙ্গে ফাঁকা জায়গায় বসে গল্প করছে। তবু যদি জেলে যেতে হয়, আমি যাব, সব দোষ আমি নিজে মেনে নেব'খন।'

'কিন্তু দরকার কি শুনি এত হাঙ্গামায়?'

'সে তুই বুঝবি না।'

বুঝুক না বুঝুক, বিপিন ভয় পাইয়া গেল। একদিন চুপি চুপি গিয়া মাধবীলতাকে সাবধান করিয়া দিয়া আসিল। সব কথা সে ফাঁস করিয়া দিল তা নয়, আভাসে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল যে সদানন্দ বড় চটিয়াছে, সে যেন কখনো কোন অবস্থায় আশ্রমে না যায়।

'যেই নিতে আসুক, যে উপলক্ষেই নিতে আসুক, যেও না। উমা, রতন এলেও নয়। বুঝেছ?'

মাধবীলতা সায় দিয়া বলিল, 'বুঝেছি। আপনি না বললেও আমি যেতাম না।'

কয়েকদিন পরে উমা আর রত্নাবলী মাধবীলতাকে আনিতে গেল। সদানন্দ যেন কোথায় গিয়াছে, আশ্রমে মেয়েদের কি যেন একটা ব্রত আছে, কি যেন একটা বিশেষ কারণে বিপিন তাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছে। মহেশ চৌধুরী আর বিভূতিব অবশ্য নিমন্ত্রণ আছে।

মাধবীলতা আসিল না, বিভূতিও নয়। মহেশ চৌধুরী শুধু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল। ব্রতের কোন আয়োজন নাই দেখিয়া সে আর্শ্চযও হইয়া গেল না, কিছু জিজ্ঞাসাও করিল না। মেযেদের ব্রত কোন ঘরের কোণে, গাছের নীচে বা পুকুরঘাটে কি ভাবে হয়, মেয়েরাই তা ভাল করিয়া জানে! নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়া কেউ কিছু খাইতে দিল না দেখিয়াই সে একটু আশ্চর্য হইয়া গেল। কে জানে, হয়তো ব্রত শেষ না হইলে খাইতে দিতে নাই। কিন্তু বেলা তিনটার সময়ও যদি ব্রত শেষ না হয়, না খাওয়াইয়া বসাইয়া রাখিবার জন্য কেবল তার বাড়ির তিনজনকে নিমন্ত্রণ করিবার কি দরকার ছিল?

সদানন্দ যেখানেই গিয়া থাক, ফিরিয়া আসিয়াছে। মহেশ চৌধুরী তার কাছে গিয়া বসে। এদিকে বিপিন ভাবে, উমা আর রত্নাবলী যখন সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, তারাই মহেশের খাওয়ানোব ব্যবস্থা করিবে। উমা আর রত্নাবলী ভাবে, বিপিন যখন নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে বলিয়াছে, সে-ই জানে অতিথিকে কি খাইতে দেওয়া হইবে। বিপিন নিশ্চিন্তমনে কাজে বাহির হইয়া যায়। সদানন্দের কুটীরে মহেশকে খাইতে দেওয়া হইয়াছে ভাবিয়া উমা আর রত্নাবলী নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম করে।

সদানন্দ বলে, 'কি খবর মহেশ?'

মহেশ বলে, 'আজ্ঞে, খবর আর কি?'

মহেশ যেন 'প্রভু' শব্দটা উচ্চারণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

'কিছু উপদেশ দেবে না কি?'

'কি আর উপদেশ দেব বলুন?'

'এই আমার কি করা উচিত, কি করা উচিত নয়—'

মহেশ একটু ভাবিয়া বলে, 'উপদেশ তো নয়, পরামর্শ দিতে পারি। কথাটা মনে রাখলে কাজ হবে। মানুষ যখন উঁচু পাহাড় পর্বতে ওঠে, কত যত্নে, কত সাবধানে প্রাণপণ চেষ্টায় তিল তিল করে ওঠে, সময়ও লাগে অনেক, কিন্তু মানুষ যখন উঁচু থেকে হাত-পা এলিয়ে নীচে পড়ে, পড়বার সময় কোন কষ্টই হয় না, সময়টা কেবল চোখের পলকে ফুরিয়ে যায়।'

সদানন্দ গম্ভীর হইয়া বলে, 'পড়বার সময়টা ফুরিয়ে গেলেও অনেক সময় কষ্ট হয় না মহেশ। বরং উঁচু থেকে পড়লে চিরকালের জন্য কষ্ট ফুরিয়ে যায়।'

'ফুরিয়ে যায়, না সুরু হয়, কে তা জানে বলুন?'

'আমি জানি। যে সীমার মধ্যে কষ্ট, সে সীমাই যদি পার হয়ে গেলাম, তবে আর কষ্ট কিসের? যারা বোকা তারাই বেঁচে থেকে রোগের জ্বালা, শোকের জ্বালা সহ্য করে। অথচ আত্মহত্যা করা এত সহজ!'

'আত্মহত্যা করা সহজ? আত্মরক্ষা করা সহজ বলুন। আত্মহত্যা করা সহজ হলে মানুষের জীবনটাই আগাগোড়া বদলে যেত, সমাজ, ধর্ম, রীতিনীতি, সুখ-দুঃখ, ভাবনা-চিন্তা, অনুভূতি সব অন্যরকম হত। ব্রহ্মচারী দু'চারজন আছে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য কি সহজ, না মানুষের পক্ষে সম্ভব? আত্মহত্যা দু'চারজন করে, কিন্তু সেটাও সহজ নয়, মানুষের পক্ষে সম্ভবও নয়। আপনি তো যন্ত্রণায় ক্ষেপে যাবার উপক্রম করেছেন, একবার দেখুন তো আত্মহত্যা করতে গিয়ে পারেন কি না? কষ্ট পাবেন, বেঁচে থাকার সাধ থাকবে না, তবু বেঁচে থেকে কষ্ট ভোগ করবেন। এই সমস্যা আছে বলেই তো বেঁচে থাকার এত নিয়মকানুনের আবিষ্কার। আসল সাধু কি ঈশ্বরকে চায়, স্বর্গ চায়, পরকালের কথা ভাবে? সাধু চায়, বিশেষ কতকগুলি অবস্থায় বাঁচতে যখন হবেই, বাঁচার সবচেয়ে ভাল উপায় কি, তাই আবিষ্কার করতে। অনেক যুক্তিই লাগসই মনে হয়, কিন্তু সব যুক্তিই কি খাটে? অতি তুচ্ছ বিষয়ে যুক্তি খাড়া করবার সময় বিচার করে দেখবেন, কত অসংখ্য বিষয়ের সঙ্গে যুক্তিটার যোগ আছে। কোন্ যুক্তিটা সবচেয়ে বেশী খাটবে, কোন্টা সবচেয়ে কম খাটবে, ঠিক করতে নিরপেক্ষ মন নিয়ে জগতের সমস্ত যোগাযোগ বিচার করতে হয়। ওটা হল মহাপুরুষের কাজ। মূল্য যাচাই করার ক্ষমতা অর্জন করবার নাম সাধনা। এইজন্য সাধনা এত কঠিন। মানুষকে জানেন তো, মরুভূমিতে তৃষ্ণায় মরবার সময় পর্যন্ত এক গ্লাস জল আর একদলা সোনার মধ্যে বেছে নিতে বললে—'

'আমি তাই করেছি, না?' সদানন্দ ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করে।

'হ্যাঁ, একেই পাপ বলে।'

'পাপ? অনুতাপ না হলে আবার পাপ কিসের?'

'অনুতাপ যদি না হয়, তবে আর পাপ কিসের? হজম করতে পারলে আর শরীরের পুষ্টি হয়ে স্বাস্থ্য বজায় থাকলে, রাশি রাশি অখাদ্য, কুখাদ্য খাওয়া আর দোষ কি! কিন্তু মুশকিল কি জানেন, অনুতাপ হয়। ভগবান দেন বলে নয়, লোকে বলে ব'লে নয়, অনুতাপ হওয়ার কথা ব'লেই অনুতাপ হয়। একটা কাজ করলে যদি আনন্দ হয়, আরেকটা কাজ করলে নিরানন্দ হতে পারে না?'

'সাধারণ লোকের হতে পারে, সকলের হয় না। মনকে যদি বশ করা যায়, আপসোস হ'তে না দিলে কেন হবে?'

'সে তো বটেই, কিন্তু মনকে বশ করা হয় না। অনুতাপ বড় ভীষণ জিনিষ, মনকে একেবারে ক্ষয় করে দেয়। অনুতাপ এড়িয়ে চলাও বড় শক্ত, একটা নখ কাটার জন্য পর্য্যন্ত অনুতাপ হতে পারে কি না। যাই করুক মানুষ, হয় সুখ পাবে নয় কষ্ট পাবে, উঠতে বসতে চলতে ফিরতে এর দুটোর একটা ঘটবেই ঘটবে। মহাপুরুষেরা এর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ঘটাবার উপায় দেখিয়ে দেন। অনুতাপ হবেই, তবে মারাত্মক রকমের না হয়। মারাত্মক অনুতাপ যাতে হয়, তাকেই লোকে পাপ বলে। যেমন ধরুন, আপনি যদি গায়ের জোরে মাধুর ওপর অত্যাচার করেন—'

সদানন্দ চমকাইয়া বলে, 'তার মানে?'

মহেশ শান্তভাবেই বলে, 'কথার কথা বলছি, একবার মাধুকে ধরে টানাটানি করেছিলেন কিনা, তাই কথাটা বলছি। ও রকম কিছু করলে আপনার অনুতাপ হবেই। হিসাব করে হয়তো দেখলেন ওজন্য অনুতাপ করা মনের দুর্ব্বলতা, প্রকৃতির নিয়ম ধরে বিচার করলে ও কাজটা আপনার পক্ষে কিছুমাত্র অন্যায় হয় নি, তবু অনুতাপে আপনি ক্ষয় হয়ে যাবেন। উচিত হোক আর অনুচিত হোক, এ প্রতিক্রিয়াটা ঘটবেই। মনকে যদি এমনভাবে বদলে নিতে চান, যাতে ওরকম পাপ করেও অনুতাপ হবে না, তখন বিপদ হবে কি জানেন, যতদিন পাপ করার ইচ্ছা না লোপ পাবে, মনটা বদলাবে না। যোগ-সাধনার মূল নীতি এই। সাধারণ জীবনে উঠতে বসতে আমরা অসংখ্য ছোট বড় পাপ করি আর অনুতাপ ভোগ করি, সব সময় টেরও পাই না। সেইজন্য যোগ-সাধনার নিয়ম এত কড়া—কবার নিঃশ্বাস নিতে হবে তা পর্য্যন্ত ঠিক করে দেওয়া আছে। কানের চুলকানি পর্য্যন্ত জয় করতে হয়—নইলে মন বশে আসে না। তেইশ ঘণ্টা উনষাট মিনিট তপস্যা করেও হয়তো এক মিনিট শিষ্যকে দিয়ে ঘামাচি মারানোর জন্য তপস্যা বিফল হয়ে যায়।'

'গায়ে ছাই মেখে যে তপস্যা—'

মহেশ মৃদু হাসে, আপসোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলে, 'আপনাকে বলা বৃথা, আপনি আমার কথা বুঝবেন না। গায়ে ছাই মেখে হাত উঁচু করে বসে থাকা কি তপস্যা? না আমি সে তপস্যার কথা বলছি? আমি বলছিলাম আপনার তপস্যার কথা, আপনি যে তপস্যায় দিন দিন সফল হচ্ছিলেন।'

এবার সদানন্দ অনেকক্ষণ নীরব হইয়া থাকে, তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে, 'আমার আর কোন উপায় নেই?'

'মনে তো হয় না। তবে তেমন গুরু যদি খুঁজে বার করতে পারেন—'

শেষ বেলায় উপবাসী মহেশ বাড়ি ফিরিয়া গেল। খাইতে চাহিল মাধবীলতার কাছে।

মাধবীলতা অবাক হইয়া বলিল, 'এ আবার কোন্ দেশী ব্যাপার, নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে খেতে না দেওয়া!'

যে ব্যাপার সে জানিত, তার চেয়ে এ ব্যাপারটা তার খাপছাড়া মনে হয়। তার সম্বন্ধে সদানন্দের খারাপ মতলব আঁটা আশ্চর্য্যের কিছু নয়, কিন্তু ডাকিয়া নিয়া গিয়া মহেশ চৌধুরীকে খাইতে না দেওয়ার কোন মানে হয়?

'বড় পাজি লোক ওরা।'

'ছি মা, রাগ করতে নেই। কোন একটা কারণ নিশ্চয় ছিল, বিব্রত করার ভয়েই তো

আমি বললাম না, নইলে চেয়ে খেয়ে আসতাম।'

দুজনে এ সব কথা বলাবলি করিতেছে, শশধরের বৌ খাবার আনিয়া হাজির। কোথায় সে থাকে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু সব সময়েই বোধ হয় আশে-পাশে আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া সকলের কথা শোনে।

মাধবীলতা কিন্তু হঠাৎ বড় চটিয়া গেল।

'সব ব্যাপারে তোমার বড় বাড়াবাড়ি। আমিই তো দিচ্ছিলাম!'

আড়ালে গিয়া শশধরের বৌ ঘোমটা ফাঁক করিয়া তাকে দেখাইয়া একটু হাসিল, হাতছানি দিয়া তাকে কাছে ডাকিল।

মাধবীলতা কাছে গেলে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, 'তোমার না আজ কিছু ছুঁতে নেই— ?'

মাধবীলতা চুপ করিয়া রহিল। সদানন্দের আশ্রমে নিমন্ত্রণ রাখিতে না যাওয়ার মিথ্যা অজুহাতের কথাটা তার মনে ছিল না।

এদিকে আশ্রমে তখন সদানন্দ বিপিনকে ডাকিয়া আনিয়াছে।

'মাধু এল না কেন?'

উমা আর রত্নাবলীর কাছে বিপিন যা শুনিয়াছিল জানাইয়া দিল! সদানন্দ বিশ্বাস করিল না। দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া বলিল, 'ও সব বাজে কথা, আসল কথা আসবে না। না আসুক, আমিও দেখে নেব কেমন না এসে পারে। তোকে বলে রাখছি বিপিন, ওর সর্বনাশ করব, মহেশকে পথে বসাব, তবে আমার নাম সদানন্দ।'

কয়েকদিন পরে মহেশের বাড়িঘর, বাগান আর আশ্রম পুলিস তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাস করিয়া গেল। বিভূতির সঙ্গে যখন সংস্রব আছে মাঝে মাঝে হঠাৎ এ রকম পুলিসের হানা দেওয়া আশ্চর্য নয়। তবু, বাহির হইতে তাগিদ না পাইলে এ সময়টা পুলিস হয়তো বিভূতির নূতন আশ্রম নিয়া মাথা ঘামাইত না। বিভূতিকে যে কতগুলি কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিল, খবরটা সে-ই ফাঁস করিয়া দিয়া গেল। পুলিসের লোকটি একদিন সদানন্দকে প্রণাম করিতে গিয়াছিল, কথায় কথায় সদানন্দ নাকি এমন কতকগুলি কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল যে তাড়াতাড়ি অনুসন্ধান না করিয়া উপায় থাকে নাই।

'সত্যি, সত্যি কিছু আরম্ভ করেছেন না কি আবার? উনি তো মিথ্যে বলবার লোক নন।'

'উনিই মিথ্যে বলবার লোক।'

পুলিসের লোকটি সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, 'বিয়ে থা' করেছেন একটু সাবধান থাকবেন, আর কি ও সব ছেলেমানুষি পোষায়?'

পুলিসের খানাতল্লাসের পর মহেশের আশ্রমে লোকের যাতায়াত আরও কমিয়া গেল। এতদিন পরে লোকের মুখে মুখে কি করিয়া যে একটা গুজব রটিয়া গেল, মহেশ চৌধুরী লোক ভাল নয় বলিয়া সদানন্দ তাকে ত্যাগ করিয়াছে, সাধু সদানন্দ।

।। ষোল ।।

রাগে পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে দেখিতে বিভূতি বলিল, 'দেখলে বাবা তোমার দেবতার

কীর্তি?'

মহেশ বলিল, 'ওর অধঃপতন হয়েছে।'

বিভূতি নাক সিঁটকাইয়া বলিল, 'ও আবার ওপরে উঠল কবে যে পতন হবে? ও লোকটা চিরকাল ভেতরে ভেতরে এমনি বজ্জাত। সাধে কি ওকে ঘুঁষি মেরেছিলাম।'

ছেলের সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে মহেশকে হাতুড়ি দিয়া নিজেকে আঘাত করিতে হইয়াছিল, ব্যাপারটা সহজে ভুলিবার নয়। মহেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'ঘুঁষি মেরে লাভ কি হয়েছিল?'

'তোমার জন্যে—'

'আমার কথা বাদ দিয়ে বল। আমি কিছু না করলে তোর লাভটা কি হত? চারিদিকে বিচ্ছিরি একটা কেলেঙ্কারী বেধে যেত, গাঁয়ের লোক আমাদের মারতে আসত, নিজে রাগের যন্ত্রণায় ছটফট করতিস্—'

মহেশের যুক্তিতর্ক কোন দিনই ভাল করিয়া বিভূতির মাথায় ঢোকে না, তার মনে হয় ছেলেবেলা হইতেই সে যা বলে আর ভাবে, মহেশ ঠিক তার উল্টা কথাটা বলিয়া আসিতেছে। রক্তটা বিভূতির একটু গরম, ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ আর কর্তব্যপ্রবণতা বাপের জীবন্ত দেবতার নাকে ঘুঁষি মারানোর মত উদ্ধত, মানুষের চাপে পৃথিবীতে মানুষ কষ্ট পায় বলিয়া তার আপসোসের সীমা নাই। আর-আদর্শগুলি এমন যে, কাজে কিছু করার সুযোগ না পাইলেও, কেবল একটা দলে কয়েকমাস মেলামেশা করার জন্যই পুলিস তাকে কয়েকটা বছর আটকাইয়া রাখিয়াছিল। মনটা যে বিভূতির একটু নরম হইয়াছে, সংসারের অন্যায়গুলির সঙ্গে রফা করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে সে যে প্রস্তুত হইয়াছে, মাধবীলতাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হওয়াটাই তার প্রমাণ। তবু, মানুষেব মন মানে না, কাজে না পারিলে তর্কে নিজেকে জাহির করে।

'তুমি বুঝি ভাব, তোমার জন্যে চুপ করে গিয়েছিলাম বলেই আমার রাগ কমে গিয়েছিল?'

'ক্ষমা চাওয়ার জন্যে তো কমেছিল।'

'তুমি আমাকে দিয়ে জোর কবে ক্ষমা চাওয়ালে, তাতে কখনো রাগ কমে?'

'কমে বৈকি, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, ক্ষমা চাইলেই মানুষের রাগ কমে যায়। তখন কি মনে হয় জানিস, মনে হয় এবারকার মত চুলোয় যাক, আবার যদি লোকটা কিছু কবে তো দফা নিকেশ করে দেব। আমি জোর করে ক্ষমা চাওয়ালে কি হবে, নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা তো তোকে সত্যি সত্যি চাইতে হয়েছিল। ক্ষমা চাওয়ার পর আগের মত জোরালো রাগ পুষে রাখতে মানুষের বড় বিরক্তি বোধ হয়।'

বিভূতি বিশ্বাস করিল না। আগের বারের চেয়েও এবার তার বেশী রাগ হইয়াছিল। তার চলাফেরার দিকে পুলিস একটু নজর রাখিবে, মাঝে মাঝে বাড়িঘর খানাতল্লাস করিবে, এ সব বিভূতির কাছে খাপছাড়া ব্যাপার নয়। এতকাল আটক রাখার পর তাকে পুলিস একেবারে জন্মের মত ত্যাগ করিবে, বিভূতি নিজেও তা বিশ্বাস করে না। ছাড়া পাওয়ার পর সব সময়েই তার মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া আছে, কখন আবার ডাক আসে। এমনিই পুলিস যাকে বাগে পাওয়ার জন্য ওৎ পাতিয়া আছে, তার নামে মিথ্যা করিয়া পুলিসের কাছে লাগানো! বিভূতির মনে ভয় ছিল, সকলের মনেই এ অবস্থায় থাকে, রাগের জ্বালায় তাই তার মনে হইতে লাগিল, ভোঁতা একটা দা দিয়া সদানন্দের গায়ের মাংস কাটিয়া নেয়।

এই অসম্ভব কাজটার বদলে একবার আশ্রমে সদানন্দকে একটু ধমক দিয়া আসিবে কি না ভাবিতে ভাবিতে বিভূতি অন্যমনস্ক হইয়া থাকে।

রাতে মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করে, 'কি ভাবছ?'

বিভূতি বলে, 'না। কিছু ভাবছি না।'

মাধবীলতা গভীর আদরের সঙ্গে তাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়া বলে, 'বল না, কি ভাবছ?'

দিনের বেলা মেলামেশা চলে, কিন্তু দিনের বেলা ভালবাসার খেলা মাধবীলতার পছন্দ হয় না। মাঝে মাঝে স্বামীর পাওনাগণ্ডার বিষয়টা খেয়াল না থাকিলেও এমনও হয় যে, ফাঁকতালে একটু সোহাগ করিতে আসিয়া দু'হাতের জোরালো ঠেলায় বিভূতি চমকিয়া যায়। তখন অবশ্য মাধবীলতার খেয়াল হয়, মৃদু তিরস্কারের সুরে সে বলে, 'কি যে কর তুমি চাদ্দিকে লোক রয়েছে না? ওমা, দরজা বন্ধ করে দিয়েছ! বেশ লোক তো তুমি?' তবু, দিনে রাত্রে সব সময় মাধবীলতাকে নিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিবার অধিকার জম্মানোর অল্পদিনের মধ্যেই বিভূতি টের পাইয়া গিয়াছে, দিনের বেলা মিলনের আনন্দ ভোগ করার ক্ষমতাটা মাধবীর যেন ভোঁতা হইয়া যায়। ব্যাপারটা তার দুর্বোধ্য মনে হয়, কারণ, রাত্রে মাধবীর তীক্ষ্ণতায় তাকেও মাঝে মাঝে বিব্রত হইতে হয়, ঘুম পর্যন্ত যেন মাধবীর চলিয়া যায়, বিভূতির ঘুম আসিলেও তাকে সে ঘুমাইতে দেয় না, প্রাণের চেয়ে যে প্রিয়তর, তাকে পর্যন্ত ভালবাসিতে শ্রান্ত হইয়া বিভূতি ঝিমাইয়া পড়িবে, মাধবীলতা অক্লান্ত চেষ্টায় যেভাবে আবার তাকে বাঁচাইয়া তোলে, মানুষের বাস্তব জীবনে যে সে ধরনেব অনুরূপ কাব্যের স্থান আছে, বিভূতি কোনদিন কল্পনা করিতে পারে নাই।

বিভূতি বলে, 'পুলিসের কথা ভাবছিলাম আবার যদি আমায ধরে নিয়ে যায়?'

এক নিমেষে মাধবীলতা বদলাইয়া যায়, রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'মাগো, পুলিস দেখে আমার যা হচ্ছিল!'

পুলিস চলিয়া যাওয়ার পর আরও তিনচার বার এমনিভাবে সে প্রায় এই কথাগুলি বলিয়াছে। হঠাৎ একবার বিভূতির মনে হয়, সব কি মাধবীলতার ন্যাকামি, বাড়াবাড়ি, হিস্টিরিয়া? কিন্তু এই টাইপেব খাঁটি ন্যাকামি আর বাড়াবাড়ি আর হিস্টিরিয়া ঠিক কি রকম, সে বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় সন্দেহের চোখে মাধবীলতার ভীত চোখ দুটি দেখিতে গিয়া সে মুগ্ধ হইয়া যায়। কত জন্ম তপস্যা করিয়া সে এমন বৌ পাইয়াছে, কত ভাগ্য তার!

তখন মাধবীলতার ভয় দূর করার জন্য তাকে ভিতরের সব কথা খুলিয়া জানাইয়া দেয়। আশ্বাস দিয়া বলে যে, সমস্তটাই সাধু সদানন্দের কাবসাজি, সদানন্দ পিছনে না লাগিলে পুলিস আর তাকে জ্বালাতন করিতে আসিত না। ভয় নাই, মাধবীলতার কোন ভয় নাই, পুলিস আর বিভূতিকে ধরিবে না, বৌকে এমনিভাবে বুকে করিয়া, বিভূতি জীবন কাটাইয়া দিবে।

শুনিয়া, ভয়ে না যত হইয়াছিল মাধবীলতাব চোখ তার চেয়ে বেশী রকম বিস্ফারিত হইয়া গেল।

'উনি! উনি এমন কাজ করলেন!'

'কেন, ও কি এমন কাজ করতে পারে না?'

মাধবীলতা সায় দিয়া বলিল, 'পারে, ও লোকটা সব পারে। ওর অসাধ্য কাজ নেই। ওর

মত ভয়ানক মানুষ—'

মাধবীলতার ক্ষোভ-দুঃখের বাড়াবাড়ি দেখিয়া আবার বিভূতির মনে হইল সে যেন বাড়াবাড়ি করিতেছে। ভালবাসিতে আজ যেন মাধবীলতার ভাল লাগিল না, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বার বার সে ওই কথাই আলোচনা করিতে লাগিল। প্রথমটা কয়েক মুহূর্তের জন্য বাড়াবাড়ি মনে হইলেও তার বিচলিত ভাব দেখিয়া বিভূতি আবার মুগ্ধ হইয়া গেল। কি ভালই মাধবীলতা তাকে বাসে!

বিভূতির এই কৃতজ্ঞতাই মাধবীলতাকে সব চেয়ে বেশী মুগ্ধ করিয়াছিল! বড় সহজে বিভূতির মন ভুলানো যায়! একটু আদর যত্ন করা, রূপের সামান্য একটু বিশেষ ভঙ্গি দেখানো, বিভূতির কাছে এ সমস্ত যে কত দামী বুঝিতে পারিয়া মাধবীলতা নিজেই অবাক হইয়া যায়। কত সহজে কত গভীর আনন্দ সৃষ্টি ও উপভোগ করা যায়, মাঝে মাঝে খেয়াল করিয়া নিজের অফুরন্ত মন কেমন করার অভিশাপ তার যেন অসহ্য ঠেকে। ভয়ানক কিছু, বীভৎস কিছু, প্রচণ্ড কিছুর জন্য কামনা যে স্বপ্নানুভূতির মত মৃদু অথচ মানসিক রোগের মত একটানা হইতে পারে, মাধবীলতার তা জানিবার বা বুঝিবার কথা নয়, ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার তরঙ্গে উঠিতে নামিতে তার প্রাণান্ত হইতে থাকে বলিয়া, জীবনের প্রত্যেকটি সহজ সুখ ও আনন্দের জন্য বিভূতিকে মনে মনে সে প্রায় পূজা করে। বিচলিত ভাবটা যতক্ষণ না কমে ততক্ষণ অবশ্য বিভূতিকে বড় করার কথাটা তার খেয়ালও হয় না এবং বিচলিত ভাবটা কমিতে কমিতে মাঝরাত্রি প্রায় কাবার হইযা যায়। তখন হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়ায় আপসোসের তার সীমা থাকে না। বিভূতির কপালে হাতের তালু ঘষিয়া দিতে দিতে সে ব্যগ্রকণ্ঠে বলে, 'না না, তুমি ভেবো না, ও তোমার কিচ্ছু করতে পারবে না।'

এতক্ষণ পরে নিজের দেওয়া আশ্বাস ফিরাইয়া পাইয়া গভীর ঘুমের আক্রমণ আর বিভূতিকে কাবু করিতে পারে না, মাধবীলতার গোলামি করার একটা রোমাঞ্চকর সাধ বরং তাকে ছোট ছেলের মত লজ্জার হাসি হাসাইয়া দেয়।

তার মাথাটা সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া মাধবীলতা বলে, 'তোমার কিছু হলে আমি মরে যাব।'

বিভূতি চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে।

লণ্ঠনের বাদামী আলোয় মশারির ভিতরে ও বাহিরে গভীর রাত্রি রূপ নিয়াছে, কয়েকটা জিনিস ছাড়া মশারির জন্য বাহিরের আর কিছু ভাল দেখা যায় না, রঙিন কুয়াশায় যেন একটু ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। স্টোভের পাশেই স্পিরিটেব বোতলটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে আবেগের ভাঙ্গনপ্রবণতার জন্য মাধবীলতার চোখে যেন জল আসিয়া পড়ে। এমন কোমল কেন বিভূতি, এত বেশী ভাবপ্রবণ আর মমতাময়? এত অল্পে সে সন্তুষ্ট কেন, এত কম সে চায় কেন, এত কম সে নেয় কেন, কেন সে এত ব্যগ্র শুধু দেওয়ার জন্য? জেল আর ফাঁসির ভয় তুচ্ছ করিয়া সে বুক-কাঁপানো কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, অনায়াসে সে সদানন্দের নাকে ঘুঁষি মারিতে পারে, সে যেন মাটির পুতুল, মায়ের কোলের শিশু!

তা হোক। তাই ভাল।

আরও জোরে বিভূতির মাথাটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া গায়ের জোরেই যেন মাধবীলতা স্পিরিটের বোতলটার দিক হইতে দৃষ্টি সরাইয়া আনে।

'ঘুমোবে না?'

'তোমার ঘুম পেয়েছে?'

হাতের চাপ একটু আলগা করিয়া মাধবীলতা মৃদু হাসে, 'আমার ঘুম দিয়ে কি করবে, আমি তো দিনে ঘুমোই। তোমার ঘুম পেয়েছে কি না তাই বল।'

পরদিন দুপুরে ঘুমানোর বদলে মাধবীলতা শশধরের বৌকে সঙ্গে করিয়া সদানন্দের আশ্রমের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল। গেল প্রতিবেশী মনোহর দত্তের গরুর গাড়িতে। আশ্রমে যাইবে শুনিয়া মনোহর দত্তের বুড়ো মা, বয়স তার প্রায় সত্তরের কাছে গিয়াছে, তাড়াতাড়ি নামাবলী গায়ে জড়াইয়া তাদের সঙ্গ নিল।

মনোহর দত্তের বৌ দেড় মাসের ছেলে কোলে করিয়া আপসোস করিয়া বলিল, 'আমিও যেতাম বাছা তোমাদের সঙ্গে, কিন্তু আমার কপালে কি আর ধম্মো কম্মো আছে।'

আগে মাধবীলতা শশধরের বৌকে কিছু বলে নাই, বাহির হওয়ার একটু আগে কেবল খবরটা দিয়াছিল। শশধরের বৌ তো শুনিয়া অবাক।

'আশ্রমে যাবে? সাধুবাবাকে তুমি এত ভক্তি কর তা তো জানতাম না ভাই!'

'ভক্তি না তোমার মাথা। যাচ্ছি তার মুণ্ডুপাত করতে। আমাদের বাড়িতে পুলিস লেলিয়ে দেয়, এমন আস্পদ্দা!'

শশধরের বৌ থতমত খাইয়া গিয়াছিল, একটু ভয়ও পাইয়াছিল। বলিয়াছিল, 'বাড়িতে ওঁরা জানতে পারলে কিন্তু বড্ড রাগ করবেন।'

'বাবাকে বলে এসেছি।'

চুপি চুপি কারো কাছে কিছু না বলিয়া যাইবে অথবা মহেশ চৌধুরীর অনুমতি নিয়া যাইবে, সমস্ত সকালটা মাধবীলতা আজ এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছে। মহেশ চৌধুরী তাকে সদানন্দের আশ্রমে যাইতে দিতে রাজি হইবে কি না এ বিষয়ে মাধবীলতার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু বলিয়া যাওয়াই ভাল মনে করিয়া অনুমতি চাহিতে গিয়া তার বিস্ময়ের সীমা থাকে নাই।

মহেশ চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে রাজি হইয়া বলিয়াছিল, 'আশ্রমে ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে মা? বেশ তো।' তারপর হাসিয়া বলিয়াছিল, 'পুরানো সাথীদের দেখতে সাধ হচ্ছে?'

মহেশ চৌধুরীই যে সদানন্দকে তাড়াইয়া দিয়াছে, সদানন্দকে ভক্তি করার বদলে সে যে এখন তার অধঃপতনের জন্য আপসোস করে, এ সব মাধবীলতার অজানা নয়। একটা প্রশ্ন পর্যন্ত জিজ্ঞাসা না করিয়া হাসিমুখে তাকে সদানন্দের আশ্রমে যাইতে অনুমতি দেওয়া মহেশ চৌধুরীর মত মানুষের পক্ষেও সম্ভব মাধবীলতা ভাবিতে পারে নাই। সদানন্দের অধঃপতনে বিশ্বাস হইয়াছে, কিন্তু তাকে যে সদানন্দ সত্যই অপমান করিয়াছিল, মহেশের মনে কি এ বিষয়ে একটু খুঁতখুঁতানিও জাগে নাই? যে কাণ্ডের ফলে নিজেকে তার হাতুড়ি দিয়া আঘাত করিতে হইয়াছিল?

দুপুরবেলা আশ্রমে যে যার ঘরে বিশ্রাম করিতেছিল, উমা ছিল রত্নাবলীর ঘরে। শশধরের বৌ আর মনোহর দত্তের মাকে সঙ্গে করিয়া মাধবীলতা প্রথমে সে-ঘরে গেল, তারপর সঙ্গী দুজনকে সেখানে বসাইয়া রাখিয়া একা দেখা করিতে গেল সদানন্দের সঙ্গে।

রত্নাবলী বলিল, 'একটু বোস্ না ভাই, দু'দণ্ড গল্প করি। সেদিন তো কথা বলারই সময়

পেলাম না।'

সদানন্দের নির্দেশে উমার সঙ্গে মাধবীলতাকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া রত্নাবলী একাই প্রায় তিনঘণ্টা মাধবীলতার সঙ্গে গল্প করিয়াছিল। কিন্তু যে রকম রোমাঞ্চকরভাবে মাধবীলতার বিবাহ হইয়াছে, তাতে দু'চার ঘণ্টার গল্পে কি মনের কথা সব বলা হয়?

মাধবীলতা বলিল, 'না ভাই, চট্ করে আগে দেখাটা করে আসি। সেদিন আসিনি বলে বড্ড চটে আছেন।'

'তুই কি করে জানলি চটে আছেন?'

'ওঁকে চিনি না আমি?'

সদানন্দের মহলে ঢুকিতে গিয়া আগে দেখা হইল বিপিনের সঙ্গে। বিপিন তাকে দেখিয়াই বলিল, 'কি সর্বনাশ, তুমি এখানে!'

'ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'কেন?'

'আমার দরকার আছে।'

'কি দরকার?'

'আছে।'

বিপিন খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর বলিল, 'সেদিন তোমাকে অত করে বুঝিয়ে বলে এলাম—'

মাধবীলতার নিজেরও বুকের মধ্যে অকথ্য রকমের ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল, তবু সে মুখে সাহস দেখাইয়া বলিল, 'আপনার ভয় নেই, উনি আমার কিছু করতে পারবেন না। আপনার যত সব উদ্ভট ধারণা—উনি সে রকম মানুষ নন।'

ইতিমধ্যে বিপিন একটু আত্মসংবরণ করিয়াছিল, সে গম্ভীরমুখে বলিল, 'আমার যেমন ধারণাই থাক, ওঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে না। চল, তোমাকে বাইরে রেখে আসি।'

'কেন?'

'কেন আবার কি? আমার আশ্রমে যদি তোমায় ঢুকতে না দিই, তুমি কি গায়ের জোরে ঢুকবে?'

কথা হইতেছিল সদানন্দের ঘরের সামনে বারান্দায় দাঁড়াইয়া। মাধবীলতার গলা শুনিয়া সদানন্দ আগেই দরজার কাছ উঠিয়া আসিয়া দুজনের কথা শুনিতেছিল, এবার ডাকিয়া বলিল, 'এসো মাধু, ভেতরে এসো। বিপিন তুমি একটু বাইরের দরজার কাছে বসবে যাও তো, কেউ এসে আমাদের বিরক্ত না করে।'

আগাইয়া আসিয়া বিপিনের চোখের সামনে মাধবীলতার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সদানন্দ তাকে ঘরের মধ্যে নিয়া গেল, বিপিনের মুখের উপর বন্ধ করিয়া দিল দরজা।

মাধবীলতার আর্তকণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল, 'বিপিনবাবু! ও বিপিনবাবু!' তারপর স্পষ্টই বুঝা গেল সদানন্দ তার মুখে হাত চাপা দিয়াছে।

দরজার কাছে সরিয়া গিয়া বিপিন চাপা গলায় বলিল, 'সদা, তুই কি আমাদের সকলকে না ডুবিয়া ছাড়বি না? দরজা খুলে দে—ওকে ছেড়ে দে।'

সদানন্দ ভিতর হইতে বলিল, 'কেন ভাবছিস্ তুই? কিচ্ছু হবে না, তোর কোন ভাবনা নেই। যদি হয়, তোর বকামির জন্যে হবে।'

'তোর পায়ে পড়ি সদা—'

'পায়ে পড়িস্ আর যাই করিস্ কিছু লাভ হবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাধার মত কেন সময় নষ্ট করছিস্, একজন কেউ এসে পড়লে ভাল হবে? এই সোজা কথাটা তুই বুঝতে পারছিস না নচ্ছার, মাধু একা ফিরে গেলে ও কারো কাছে কিছু বলবে না। কিন্তু অন্য কেউ জানতে পারলে, না বলে মাধুর উপায় থাকবে না!'

বিপিন জানিত মানুষটা সদানন্দ ভয়ানক, কিন্তু এতটা সেও ভাবিতে পারে নাই। এর চেয়ে ঢের বেশী অমানুষিক কাণ্ড সর্বদাই সংসারে ঘটে, কিন্তু নিজের সামনে না ঘটা পর্যন্ত নিজের জানাশোনা মানুষের সম্বন্ধে কে তা সম্ভব ভাবিতে পারে! বিপিন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। সদানন্দ যা বলিতেছে তাই করাই হয় তো ভাল, তা ছাড়া আর কি উপায় আছে!

ভিতর হইতে সদানন্দ বলিল, 'বিপিন, গেলি?'

বিপিন বলিল, 'যাচ্ছি।'

ধীরে ধীরে বিপিন সদরের দরজার দিকে আগাইয়া যায়, মাথার মধ্যে তার যেন সব গোলমাল হইয়া যাইতে থাকে। দরজা বন্ধ না করিয়া খোলা দরজার সামনেই সে বসিয়া থাকে। মাথার মধ্যে তার যত গোলই পাকাইয়া যাক, এ বুদ্ধিটা তার থাকে যে, দরজা বন্ধ করার চেয়ে দরজা খুলিয়া রাখিয়া নিজে বসিয়া সকলের পথ আটকানো ভাল।

আশ্রমের একজন সামনে দিয়া যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করে 'এখানে বসে আছেন?'

'এমনি। উনি একজনকে বিশেষ উপদেশ দিচ্ছেন—আমারও একটু দরকার আছে ওনার সঙ্গে।'

বেলা পড়িয়া আসে, সামনে দিয়া আশ্রমের শিষ্য-শিষ্যার যাতায়াত বাড়িয়া যায়। কেউ কেউ বিপিনকে এখানে এভাবে বসিয়া থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করে, কেউ দু'দণ্ড দাঁড়াইয়া বাজে কথা বলিয়া যায়। চালার নীচে নিত্যকার সভার জন্য গ্রামবাসী একে একে আসিয়া জমা হইতে থাকে। তৃষ্ণায় বিপিনের বুক ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম হয় কিন্তু উঠিয়া গিয়া এক গ্লাস জল যে খাইয়া আসিবে, সে সাহসও হয় না, কাউকে এক গ্লাস জল আনিয়া দিতে বলিতেও ভরসা পায় না।

শেষ বেলায় চালার নীচে সকলে সমবেত হইয়া অধীর আগ্রহে যখন সদানন্দের প্রতীক্ষা করিতেছে, উমা আর রত্নাবলী শশধরের বৌকে সঙ্গে করিয়া মাধবীলতার খবর নিতে আসিল।

বিপিন হাসিবার চেস্টা করিয়া বলিল, 'মাধুকে উনি একটু বেশী পছন্দ করেন। তা ছাড়া, অনেকবার আমায় বলেছিলেন, বিবাহিত জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে মাধুকে কিছু বলবেন। সে কথা বলছেন বোধ হয়।'

রত্নাবলী বলিল, 'এতদিন এক বাড়িতে থেকে বললেন না, এখন—'

বিপিন বলিল, 'বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ দিলে কি হবে? উনি অ্যাদ্দিন ইচ্ছে করেই কিছু বলেন নি। আজ মাধু নিজে শুনতে চাইল—'

'আমরাও একটু শুনে আসি' বলিয়া রত্নাবলী ভিতরে ঢুকিতে যায়, বিপিন ব্যস্ত হইয়া বাধা দিয়া বলিল, 'না না, যেও না। উনি কাউকে যেতে নিষেধ করেছেন।'

কিন্তু রত্নাবলীকে আটকাইবার মত গায়ের জোর বিপিনের ছিল না, তাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া রত্নাবলী ভিতরে চলিয়া গেল।

রত্নাবলীর মনটা একটু সন্দিগ্ধ।

সদানন্দের ঘরের সামনে রত্নাবলী একটু দাঁড়াইল। সন্দিগ্ধমনে সাহস থাকে না, থাকে

কৌতূহল। দরজা বন্ধ না খোলা? ঠেলা দিলেই যদি খুলিয়া যায়? সদানন্দ দরজা খুলিয়া যদি জিজ্ঞাসা করে, কি চাই? বিপদ হিসাবে কোনটাই কম নয়।

সাহস যে মনে নাই, কৌতূহল দমন করার মনের জোর সে মনে কোথায় পাইবে, দরজাটা ভেজানই ছিল।

সদানন্দ খাটে বসিয়া আছে, পা ঝুলিয়া। দু'পাশে হাতের তালু দিয়া খাটে চাপ দিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় হাতের উপরের শরীরের ভর দিয়া যেন সদানন্দ বসিয়াছে। মাধবীলতা বসিয়াছে মেঝেতে তার ঝুলানো পায়ের কাছে,—ঊর্ধ্বমুখী, উত্তেজিতা, শব্দময়ী মাধবীলতা। উপদেশ দেওয়ার কথা সদানন্দের, কিন্তু সে রীতিমত অস্বস্তির সঙ্গে মাধবীলতার বক্তৃতা শুনিতেছে।

সদানন্দের চোখে না পড়িলে রত্নাবলী হয়তো চোরের মত পালাইয়া যাইত, সদানন্দ তাকে দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে আহ্বান করিয়া বসায় সে সুযোগটা আর পাওয়া গেল না।

'এসো রতন।'

মাধবীলতা মুখ নামাইয়া ভাল করিয়া গা ঢাকিয়া কুঁজো হইয়া বসিল। পায়ে পায়ে আগাইয়া আসিয়া রত্নাবলী তার কাছে বসিল, সন্তর্পণে। মনের মধ্যে তার ওলট-পালট চলিতেছিল। অবস্থাবিশেষে কত রকম সন্দেহই মনে জাগে।

'তুমি একা এসেছ রতন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ভাবলাম যে একবার—'

'দেখে আসি ওরা কি করছে?' সদানন্দ হাসিল। রত্নাবলীর বিব্রত ভাব দেখিয়া আবার বলিল, 'বন্ধুর জন্য ভাবনা হচ্ছিল, চাবুক মারছি না গায়ে ছ্যাঁকা দিচ্ছি ভেবে পাচ্ছিলে না, কেমন? আশ্রম ত্যাগ করার জন্য আমি কাউকে শাস্তি দিই না রতন! যার গলায় খুশি মালা দিয়ে তুমিও যেদিন ইচ্ছা আশ্রম ছেড়ে চলে যেও, আমি কিছু বলব না।'

সত্যমিথ্যায় জড়ানো কথা, না-চাওয়া কৈফিয়তের মত। সদানন্দের ভাবটা যেন নতুন জামাই-এর মত, শালীর সঙ্গে ফাজলামি করিতেছে। রত্নাবলী কিছুই বুঝিতে পারে না, কারণ, বুঝিবার মত কি যেন একটা জ্ঞান মনের অন্ধকার তলা হইতে উপরে উঠিতে উঠিতে চাকায় লাগা নোংরা কিছুর মত পাক খাইয়া নীচে তলাইয়া যায়। সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

সকলে চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে কেন? মাধবীলতা তাই বলে, 'এবার থেকে মাঝে মাঝে আশ্রমে আসব ভাই। ওঁকে প্রণাম করে যাব।'

তারপর আবার তিনজনেই চুপ করিয়া থাকে, তবে বেশীক্ষণের জন্য নয়। একটু পরেই বিপিন আসিয়া গম্ভীরমুখে খবর দেয় যে, চালার নীচে বসিয়া বসিয়া অনেকে চলিয়া যাইতেছে, অনেকে অপেক্ষা করিতেছে। সদানন্দ যদি না যায়, বিপিন তাদের খবরটা দিতে পারে।

'চল যাচ্ছি।' সদানন্দ যেন একটু ব্যস্ত হইয়াই চলিয়া গেল।

তারপর দু'জনে চুপচাপ বসিয়া থাকে। অনেকক্ষণ। শেষে মাধবীলতাই বলে, 'এখানে বসে থেকে কি হবে, চলো আমরাও যাই।'

'আশ্রমে থাকবে নাকি আজ?'

'থাকবার কি উপায় আছে ভাই? তোমার ঘরে বসে নিরিবিলি দু'দণ্ড কথা বলিগে' চল।'

রত্নাবলীর মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন পাক খাইয়া বেড়াইতেছিল, সে খানিক খানিক জানে কিন্তু সব জানে না। সব তাকে জানানো হয় নাই বলিয়া অভিমানে প্রশ্নগুলি গলার কাছে আসিয়া আটকাইয়া যাইতেছিল। তবে জানার সাধটা জোরালো হইলে প্রায় সব মেয়েরাই

খুক্ খুক্ করিয়া একটা কাসির ধাক্কাতেই দারুণ অভিমানের বাধা ঠেলিয়া দিতে পারে। জিজ্ঞাসা তাই হয় আকস্মিক।

'হঠাৎ এলে যে?'

'হঠাৎ এলাম? ও হঠাৎ কেন এলাম? এমনি এলাম আর কি।'

'এমনি এলে না তোমার মাথা এলে। ছি, ধিক্ তোকে। ঘরে যদি মন না বসে, ঘরের বৌ সাজতে গেলি কেন? কে তোর পায়ে ধরে সেধেছিল?'

'একজন সেধেছিল ভাই।'

ফাঁকি দেওয়া হাসি। হাসির ভঙ্গির সঙ্গে হাল্কা কথা রতনকে রাগে যেন অন্ধকার দেখাইয়া দেয়। আশ্রমের মানুষ-দেবতার পূজার জন্য কোন্ গ্রামের কে যেন কি উপলক্ষে এক বোঝা নৈবেদ্য পাঠাইয়াছিল, আশ্রমের সকলেই ভাগ পাইয়াছে। ক্রুদ্ধ চোখে চাহিতে চাহিতে রত্নাবলী বন্ধুর জন্য একটা পাথরের থালায় ফলমূল আর মিষ্টান্ন সাজাইতে থাকে। সন্দেহটা মনের মধ্যে ধীরে ধীরে বিশ্বাসে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। মনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ না জানিলেও মানুষের বড় বড় ভাবপরিবর্তনের মধ্যে মনের পরিবর্তন আবিষ্কার করা যায়। ভদ্রগৃহস্থের ছেলের সঙ্গে সামাজিক বিবাহের ফলে জীবনের সমস্ত তুচ্ছ খুঁটিনাটি যার কাছে এমন গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল যে, প্রায় মুচকি একটু হাসি পর্যন্ত অন্যায় মনে হইত, বন্ধুর এ রকম সাংঘাতিক জেরার সময় সে যদি এমন শয়তানি-ভরা ফাজলামি করিতে পারে, কিছু একটা ঘটিয়াছে বৈকি। হায়, মাঝখানে কিছুদিনের ছেদ পড়িয়া সদানন্দের সঙ্গে আবার কি মাধবীলতার আগের সম্পর্ক পাতানো হইয়া গেল?

'খা।'

'তুইও বোস ভাই, দু'জনে একসঙ্গে খাই?'

এতক্ষণে, মাধবীলতা যখন এক টুকরো ফল মুখে তুলিতেছে, রত্নাবলীর নজর পড়িল, মাধবীলতার ডান হাতের কব্জির কাছটা লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে।

'হাতটা প্রায় ভেঙ্গে গেছে ভাই, গায়ে কি জোর মানুষটার!'

চিবানো ফলের সঙ্গে ঢোক গিলিয়া রত্নাবলী ভাল মানুষের মত জিজ্ঞাসা করে, 'কেন, এত জোরে হাত ধরল কেন?'

মাধবীলতা হাসিয়া বলে, 'রাগের চোটে, আবার কেন।'

'তারপর?'

'তারপর আবার কি? আমি কটমট করে তাকাতে হাত ছেড়ে দিয়ে বকবকানি আরম্ভ করে দিল।'

মাধবীলতা তৃপ্তির হাসি হাসে।

।। সতেরো ।।

সত্য কথা বলিতে কি, মাধবীলতা কটমট করিয়া তাকানোর অবসর বেশীক্ষণ পায় নাই। অবসর পাইলেও সে তাকানিতে বিশেষ কোন কাজ হইত কি না সন্দেহ। মূর্ছার উপক্রম হইলে যেমন হয়, মাথা সেই রকম বোঁ বোঁ করিয়া পাক খাইতে আরম্ভ করায় সে চোখ বুঁজিয়া মূর্ছা গিয়াছিল। সদানন্দের চোখ মুখ দেখিয়া সে যেমন ভয় পাইয়াছিল, অন্ধকার

রাত্রে হঠাৎ ভূত দেখিলে সে রকম ভয় পাইত কি না সন্দেহ। তার মুখের সেই বীভৎস ভঙ্গি আর চোখের মারাত্মক দৃষ্টির মধ্যে পাশবিক কামনার একটু চিহ্ন খুঁজিয়া পাইলে, মাধবীলতা হয়তো মূর্ছার চরম শিথিলতা আনিয়া সদানন্দের আলিঙ্গনে গা এলাইয়া দিত না, আলিঙ্গন আরেকটু জোরালো হইলেই সে দেহে কয়েকটা পাঁজর নির্ঘাৎ মড়মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইত। মাধবীলতা নিঃসন্দেহে টের পাইয়াছিল, সদানন্দ তাকে খুন করিবে—সঙ্গে সঙ্গেই হোক অথবা অকথ্য যন্ত্রণা দিবার পরেই হোক। খবরের কাগজে যে সব খুনের খবর বাহির হয়, সোজাসুজি সেই রকম অভদ্র অমার্জিত হত্যা, উপন্যাসের পাষণ্ডেরা যে রকম রসালো খুন করে, সে রকম নয়।

মাধবীলতা ভয় পাওয়ার আরেকটা কারণ ছিল।

সদানন্দ তখন মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে, তাকে নূতন আশ্রমে সরানোর আয়োজন চলিতেছে। একদিন হঠাৎ নির্জন বারান্দায় সদানন্দের সামনে পড়িয়া সে পাশ কাটাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছে, সদানন্দ ডাকিয়া বলিয়াছিল, 'একটা কথা শোন মাধু।'

মাধবীলতা কথা শুনিতে দাঁড়ায় নাই। তখন তীব্র চাপা গলায় সদানন্দ বলিয়াছিল, 'একদিন তোমায় হাতে পেলে গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেব।'

তখন কথাটার দাম ছিল না। আজ মূর্ছা যাওয়ার আগে মনে হইয়াছিল সদানন্দের পক্ষে ও কাজটা অসম্ভব কি?

বিভূতি জিজ্ঞাসা করে, কেন গিয়েছিলে!'

মাধবীলতা জবাব দেয়, 'তোমার পেছনে কেন পুলিস লেলিয়ে দিল!'

মাধবীলতার সর্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, জাগিয়া আছে তবু ঘুমেই দু'চোখ বুঁজিয়া গিয়াছে। মনের মধ্যে একটা ধিক্কার-ভরা আর্তনাদ গুনগুনানো গানের মত মৃদু চাপা সুরে গুমরাইতেছে। কি হইয়াছে? কেন হইয়াছে? কবে হইয়াছে? কিছুই যেন মনে নাই। অবসাদের যন্ত্রণা যে এমন বৈচিত্র্যময় সকলেই তা জানে, তবু সকলের পক্ষেই এটা 'কে তা জানিত'র পর্যায়ের।

[লেখকের মন্তব্য ঃ অনেকে বিশ্বাস করে না, তবু জীবনের একটা চরম সত্য এই যে সমস্ত অন্যায় আর দুর্নীতির মূলভিত্তি জীবনীশক্তির দ্রুত অপচয়—ব্যক্তিগত অথবা সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের। যতই বিচিত্র আর জটিল যুক্তি ও কারণ মানুষ খাড়া করুক, ভাল-মন্দ উচিত-অনুচিত মানুষ ঠিক করিয়াছে এই একটিমাত্র নিয়মে। অবশ্য, মানুষের ভুল করা স্বভাব কিনা, তাই এমন একটা সোজা নিয়ম মানিয়া জীবনের রীতিনীতি স্থির করিতে গিয়াও কত যে ভুল করিয়াছে, তার সংখ্যা নাই।

মাধবীলতার তৃপ্তি উবিয়া যায় নাই, অবসাদের যন্ত্রণার নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে মাত্র। এটা অনুতাপ নয়।]

সে রাত্রে আর বেশী জেরা করা গেল না। কারণ, বিড় বিড় করিয়া কয়েকটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা দুর্বোধ্য কথা বলিতে বলিতে মাধবীলতা ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন সে অনেক কথাই বলিল বটে কিন্তু বিভূতি ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। মাধবীলতার অনেক কথার মানেটা দাঁড়াইল সেই একই কথায়, সে গিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া বলিয়া আসিয়াছে বিভূতির পিছনে আর যেন সদানন্দ পুলিস না লাগায়। কথাটা জটিলও নয়, দুর্বোধ্য নয়, তবু বিভূতির মনে হইতে লাগিল, মাধবীলতা যেন একটা খাপছাড়া কাজ করিয়া ব্যাখ্যা আর কৈফিয়তের বদলে

একটা হেঁয়ালি রচনা করিতেছে। কাঁদিতে কাঁদিতে মাধবীলতা একদিন যার বিরুদ্ধে তার কাছে নালিশ করিয়াছিল আর সে যাকে গিয়া মারিয়াছিল ঘুঁষি, এতকাল এক বাড়িতে আর বাড়ির কাছে আশ্রমে থাকার সময় যে মাধবীলতা তার ধারে কাছে ঘেঁষে নাই। এখন বলা নাই কওয়া নাই এত দূর আশ্রমে গিয়া তার হাতে পায়ে ধরিয়া সাধিয়া আসিল যেন বিভূতির পিছনে আর পুলিস না লেলাইয়া দেয়! কচি খুকী তো সে নয় যে এটুকু জ্ঞান তার নাই, এভাবে তার সদানন্দের হাতে পায়ে ধরিয়া সাধিতে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না? তার ভালর জন্য গিয়াছিল? তার বিপদের ভয়ে দিশেহারা হইয়া? কথাটা ভাবিতে ভাল লাগে কিন্তু বিশ্বাস যে করা যায় না! দিশেহারা আতঙ্ক ছাড়া আর কিছুতেই প্রকাশ পায় না সে আবার কোন্ দেশী সৃষ্টিছাড়া প্রেম, সে প্রেম মাধবীলতা পাইলই বা কোথায়? তা ছাড়া দিশেহারা আতঙ্কের আর কোন লক্ষণ তো তার মধ্যে দেখা যায় নাই?

মনটা এমন খারাপ হইয়া গেল বিভূতির বলিবার নয়। আটক থাকার সময় প্রায়ই মনে হইত সব ফাঁকি আর সব ফাঁকা, কাঁটা বিছানো বিছানায় এপাশ ওপাশ করাটাই জীবন আর মেশানো আলো অন্ধকারের আবছা অর্থহীন উপমার মত স্মৃতি-কল্পনা আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখের খিচুড়ি পাকানো ভোঁতা অনুভূতিগুলির মাথার মধ্যে মাথাধরার মত টিপ্ টিপ্ করাটাই বাঁচিয়া থাকার একমাত্র অভিব্যক্তি, আজ তেমনি মনে হইতে লাগিল, মাধবীলতাও যে তার আপন নয়, এই সত্যটা ধীরে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হওয়াটাই তাকে আপন করিতে চাওয়ার একমাত্র সম্ভবপর পরিণতি। আটক থাকার সঙ্গে মাধবীলতা আপন নয় ভাবার পার্থক্য অনেক, কিন্তু মন খারাপ হওয়াটা একরকম কেন, দার্শনিক সমস্যাটা মনে উদয় হওয়ায় বিভূতি একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেল এবং সকল অবস্থার সুখদুঃখ একই রকম কিনা এই কথাটা ভাবিতে আরম্ভ করায় আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘটিয়া গেল স্নায়বিক বিপর্যয়। তখন, মৃদুস্বরে ডাকিল, 'মাধু?'

আজ অবসাদ কমিয়াছে, কারণ বিভূতির রকমসকম দেখিয়া অল্প অল্প ভয়ের উত্তেজনা আসিয়াছিল। ঘুম তাই একেবারেই আসে নাই। ঘুমের ভানে মাধবীলতা এমনভাবেই সাড়া দিল যে, পরমুহূর্তে আকস্মিক আবেগে বিভূতি তাকে জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু কি মৃদু আর সশঙ্ক সে আলিঙ্গন, পাঁজর যদি মাধবীলতার পাটখড়ির হইত, তবু ভাঙ্গিবার কোন ভয় ছিল না।

অনেকগুলি দিন কাটিয়া গেলে হয়তো আবার একদিন আশ্রমে যাওয়ার সাধটা মাধবীলতার অদম্য হইয়া উঠিত কিন্তু কয়েকটা দিন কাটিবার আগেই একদিন মহেশ চৌধুরী বলিল, 'চল মা, একবার আশ্রম থেকে ঘুরে আসি।'

না গেলেও চলিত, খুব বেশী ইচ্ছাও ছিল না যাওয়ার, তবু মাধবীলতা শ্বশুরের সঙ্গে আশ্রমে বেড়াইতে গেল। তখন সকালবেলার মাঝামাঝি, আবহাওয়া অতি উত্তম। এক বছর সদানন্দের উপদেশ শোনার চেয়ে এক বছর আশ্রমে পায়চারি করিলে প্রকৃতির প্রভাবেই মনের বেশী উন্নতি হয়। মহেশ চৌধুরীকে একটু চিন্তিত দেখাইতেছিল। চিন্তা মহেশ চৌধুরী চিরকালই করিয়া থাকে কিন্তু বেশ বুঝা যায় যে, এখন তার মুখের ছাপটা দুর্ভাবনার। কি হইয়াছে কে জানে!

গাছতলায় আশ্রমের সকলে সদানন্দকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। প্রাচীন ভারতের তপোবনে শিষ্যবেষ্টিত ঋষির ছবি যার কল্পনায় আছে, দেখিলেই তার মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। মহেশ

চৌধুরী ভুরু কুঁচকাইয়া বিস্ময়ের সঙ্গে চাহিয়া থাকে আর মৃত্যুর মধ্যে জীবনের কতখানি শেষ হইয়া যায় সকলকে তার হিসাব বুঝাইতে বুঝাইতে হাসিমুখে সদানন্দ মাথাটা হেলাইয়া তাকে অভ্যর্থনা জানায়। মাধবীলতা রত্নাবলীর কাছে গিয়া বসে আর সদানন্দের ইঙ্গিত উপেক্ষা করিয়া মহেশ চৌধুরী বসে সকলের পিছনে। কয়েক মিনিটের মধ্যে বেশ বুঝিতে পারা যায় একমনে সে সদানন্দের কথা শুনিতেছে, অসম্ভব কিছু সম্ভব হইতে দেখিবার বিস্ময়ের সঙ্গে।

অন্য সকলের, পুরুষ ও নারীদের, বিস্ময় নাই। সকলে মুগ্ধ, উত্তেজিত। কথা শেষ করিয়া সদানন্দ হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়ায়, ধীরে ধীরে একা নদীর দিকে আগাইয়া যায়। যে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি ক্ষণকালের স্তব্ধতার শেষে সুরু হয়, তার মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি আত্মসমর্পিত মনের সার্থকতার আনন্দ যেন রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের মত প্রাঞ্জল মনে হয়। অন্ততঃ মহেশের যে মনে হয় তাতে সন্দেহ নাই, কারণ সে আরও বেশী থতমত খাইয়া সদানন্দের গতিশীল মূর্তির দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে।

রত্নাবলীর সঙ্গে তার কুটীরে যাওয়ার আগে মাধবীলতা তাকে খবরটা দিতে আসিল, ফিরিবার সময় যাতে তাকে খোঁজ করার হাঙ্গামা না বাধে।

মহেশ চৌধুরী বলিল, 'আমরা আজ এখানে থাকব মাধু।'

'সারা দিন?'

'সারা দিন তো বটেই, সারা রাতও থাকতে পারি।'

মাধবীলতা এই উদ্ভট সিদ্ধান্তের কারণটা জানিবার চেষ্টা আরম্ভ করার আগেই মহেশ চৌধুরী উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সদানন্দ তখন চোখের আড়ালে চলিয়া গিয়াছে। নদীর ধারে অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও তার দেখা না পাইয়া মহেশ চৌধুরী অবশ্য বুঝিতে পারিল যে, নদীর দিকের খিড়কি দরজা দিয়া সদানন্দ কুটীরে ফিরিয়া গিয়াছে, কিন্তু নিজে সে কুটীরে ঢুকিল না। রত্নাবলীর কুটীরে ফিরিয়া গিয়া মাধবীলতাকে বলিল, 'ওঁকে একবাব ডেকে আন তো মাধু।'

মাধবীলতা অবাক!—'ডেকে আনব? এখানে?'

'হ্যাঁ। বলগে, আমি একবার দেখা করতে চাই।'

মহেশ চৌধুরী হুকুম দিয়া ডাকিয়া আনিয়া দেখা করিবে সদানন্দের সঙ্গে! প্রতিবাদ করিতে গিয়া কিছু না বলিয়াই মাধবীলতা চলিয়া গেল। হঠাৎ তার মনে পড়িয়া গিয়াছিল মহেশ চৌধুরীর পাগলামির মানে বুঝিবার ক্ষমতা এতদিন এক বাড়িতে থাকিয়াও তার জন্মে নাই।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে, রত্নাবলী যখন ব্যস্ত আর বিব্রত হইয়া বার বার বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, তার একবার গিয়া খোঁজ করিয়া আসা উচিত, মাধবীলতা ফিরিয়া আসিল। সদানন্দ বলিয়া পাঠাইয়াছে, দেখা করিবার দরকার থাকিলে মহেশ চৌধুরী যেন সন্ধ্যার পর তার সঙ্গে দেখা করিয়া আসে। শুনিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া মহেশ চৌধুরী বলিল, 'চল আমরা ফিরে যাই মাধু।'

'সারা দিন এখানে থাকবেন বলেছিলেন যে?'

'আর থেকে কি হবে? ভেবেছিলাম মানুষটা বুঝি হঠাৎ বদলে গেছে, কিন্তু মানুষ কি কখনো বদলায়?'

মানুষ যে বদলায় না, তার আরেকটা মস্ত বড় প্রমাণ পাওয়া গেল ফিরিবার পথে। চরডাঙ্গা গ্রামের কাছাকাছি মস্ত একটা মাঠে পঁচিশ ত্রিশ জন অর্ধ-উলঙ্গ নোংরা মানুষকে আত্মহত্যা করিতে বিভূতি নিষেধ করিতেছে। মুখে ফেনা তুলিয়া এমনভাবে নিষেধ করিতেছে যেন

কোনরকমে এই লক্ষ্মীছাড়া বোকা মানুষগুলোকে কথাটা একবার বুঝাইয়া দিতে পারিলেই তারা হত্যা করিবে তবু আর এভাবে আত্মহত্যা করিবে না।

একসঙ্গে খাইতে বসিয়া মহেশ চৌধুরী সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিল, 'আবার কি তুমি জেলে যেতে চাও?'

'সাধ করে কেউ জেলে যায়?'

বিভূতির মেজাজটা ভাল ছিল না।

'অমন করে ওদের ক্ষেপিয়ে তুললে জেলেই তো যেতে হয় বাবা? একটু কিছু ঘটলেই তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

'নেয় নেবে।'

মহেশ চৌধুরী ডালমাখা ভাত খায় আর ভাবে। বুঝাইয়া কোন লাভ হইবে না। এই কথাটাই অনেকবার অনেকভাবে ছেলেকে সে বুঝাইয়াছে যে, অকারণে জেলে গিয়া কোন লাভ হয় না, সেটা নিছক বোকামি—কাজের মত কোন কাজ করিয়া ছেলে তার হাজার বার জেলে যাক, হাজার বছরের জন্য জেলে যাক, মহেশ চৌধুরীর তাতে তো কোন আপত্তি নাই! কিন্তু পাহাড়ে উঠিবার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার মত দেশ আর দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য চোখ কান বুঁজিয়া জেলে যাওয়ার তো কোন অর্থ হয় না। মনে হইয়াছিল, বিভূতি বুঝি কথাটা বুঝিতে পারিয়াছে—বিভূতি চুপচাপ শুনিয়া গিয়াছে, তর্কও করে নাই, নিজের মতামত জাহির করিবার চেষ্টাও করে নাই। আজ আবার মহেশ চৌধুরীর মনে হইতে লাগিল, অনেক দিন পরে বাড়ি ফিরিয়া সে শুধু বাপের সঙ্গে কথা কাটাকাটি এড়াইয়া চলিয়াছিল, কথাগুলি তার মাথায় ঢোকে নাই।

একবার ঢোক গিলিয়া মহেশ চৌধুরী এক চুমুকে জলের গ্লাসটা প্রায় অর্ধেক খালি করিয়া ফেলিল। ছেলেও যদি তার সহজ সরল কথা না বুঝিয়া থাকে—

অথবা এ সব কথা বুঝিবার নয়? মানুষ যা করিতে চায় তাই করে?

অল্প দূরে মহেশের পোষমানা বিড়ালটি ঘুপটি মারিয়া বসিয়া ছিল। মাছের ঝোল পরিবেশন করিতে আসিবার সময় বেচারীর লেজে কি করিয়া মাধবীলতার পা পড়িয়া গেল কে জানে, চমক দেওয়া আওয়াজের সঙ্গে লাফাইয়া উঠিয়া মাধবীলতার নতুন শাড়িখানা আঁচড়াইয়া ছিঁড়িয়া দিল। মাছের ঝোলের থালাটি মাটিতে পড়িয়া গেল, বিড়ালটির মতই বিদ্যুৎগতিতে লাফ দিয়া পিছু হটিতে গিয়া মাধবীলতা ধপাস করিয় মেঝেতে পড়িয়া গেল—পা ছড়াইয়া বসিবার ভঙ্গিতে। গায়ে তার আঁচড় লাগে নাই, পড়িয়া গিয়াও বিশেষ ব্যথা লাগে নাই, কিন্তু চিৎকার শুনিয়া মনে হইল তাকে বুঝি বাঘে ধরিয়াছে।

কাঠের মোটা একটা পিঁড়ি কাছেই পড়িয়াছিল, দু'হাতে পিঁড়িটা তুলিয়া নিয়া এমন জোরেই বিভূতি বিড়ালটিকে মারিয়া বসিল যে, মরিবার আগে একটা আওয়াজ করার সময়ও বেচারীর জুটিল না।

সকলের আগে মহেশ চৌধুরীর মনে হইল তার পোষমানা জীবটি আর কোনদিন লেজ উঁচু করিয়া তার পায়ে গা ঘষিতে ঘষিতে ঘড় ঘড় আওয়াজ করিবে না। তারপর অনেক কথাই তার মনে হইতে লাগিল।

জটিল, খাপছাড়া, সব রাশি রাশি কথা—চিন্তাগুলি যেন ছেঁড়া কাগজের মত মনের ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ দমকা হাওয়ায় এলোমেলো উড়িতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এ রকম অবস্থায় মহেশ চৌধুরী কথা বলে না। তা ছাড়া আর উপায় কি আছে? এমন অভ্যাস

জন্মিয়া গিয়াছে যে, বিচার-বিবেচনার পর একটা কিছু সিদ্ধান্ত দিয়া না বুঝিলে মনের ভাব আর প্রকাশ করা যায় না। আত্মা-বিরোধী মত যদি কিছু প্রকাশ করিয়া বসে? সেটা প্রায় সর্বনাশের সামিল। কেন সর্বনাশের সামিল, তা অবশ্য মহেশ চৌধুরী কখনও ভাবিয়া দেখে নাই, তবে ক্ষতির সম্ভাবনাকে আত্মরক্ষী জীবমাত্রেই ভয় করে। নিজের সুখ-দুঃখের মুখাপেক্ষী করার নীতি যাকে মানিয়া নিতে হয়, অস্বাভাবিক সংযম তার একমাত্র বর্ম। রাগে, দুঃখে, অভিমানে বিচলিত হওয়া মহেশ চৌধুরীর পক্ষে সম্ভব, কিন্তু উচিত কি অনুচিত না জানিয়া পোষা বিড়ালকে মারার জন্য বিভূতিকে চড়-চাপড়টা মারিয়া বসাও সম্ভব নয়, গালাগালি দেওয়াও সম্ভব নয়।

কয়েকবার ঢোঁক গিলিয়া মহেশ চৌধুরী একেবারে চুপ করিয়া যায়। অন্য বিষয়েও একটি শব্দ আর তার মুখ দিয়া বাহির হয় না। খাওয়াও তখনকার মত শেষ হয় সেইখানে।

বিস্ফারিত চোখে খানিকক্ষণ মরা বিড়ালটার দিকে চাহিয়া থাকিয়া মাধবীলতা প্রথম ভয়ে ভয়ে কথা বলে, 'কেন মারলে? কি নিষ্ঠুর তুমি!'

'যেখানে যেখানে আঁচড় দিয়েছে, আইডিন লাগিয়ে দাও গিয়ে।'

'আঁচড় লাগেনি।'

কথাটা বিভূতি সহজে বিশ্বাস করিতে চায় না। একটুও আঁচড় দেয় নাই? একেবারে না? কি আশ্চর্য ব্যাপার! তবে তো বিড়ালটাকে না মারিলেও চলিত। বোকার মত একটু হাসে বিভূতি, মড়া বিড়ালটার দিকে চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া নেয়। বেশ বুঝিতে পারা যায় সে যেন একটু স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে,—বিস্ময়ে নয়, ব্যথা লাগে না এমন কোন আকস্মিক ও প্রচণ্ড আঘাতে। মহেশ চৌধুরীর নির্বাক থাকার চেয়ে বড় সংযম যেন বিভূতির দরকার হইতেছে শুধু সহজ নির্বিকাব ভাবটা বজায় রাখিতে। বিচলিত হওয়ার উপায় তো বেচারীর নাই। মনের কোমল দুর্বলতা যদি প্রকাশ পাইয়া যায়? সেটা প্রায় সর্বনাশের সামিল। কেন সর্বনাশের সামিল, তা অবশ্য বিভূতি কখনও ভাবিয়া দ্যাখে নাই, তবে অন্যায়-বিরোধী মানুষমাত্রেই নিজের দুর্বলতাকে চাপা দিতে চায়। পরের দুঃখ কমানোর জন্য নিজের দুঃখকে তুচ্ছ করার নীতি যাকে মানিয়া নিতে হয়, অস্বাভাবিক সংযম তারও বর্ম। অনুতাপে থতমত খাইয়া যাওয়া বিভূতির পক্ষে সম্ভব, কিন্তু স্ত্রীকে আক্রমণ করার জন্য তুচ্ছ একটা বিড়ালকে শাস্তি দিয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

চাকর বিড়ালের দেহটা তুলিয়া নিয়া যায়। বিভূতি আবার খাইতে আরম্ভ করে। খাইতে খাইতে ধীরে ধীরে সে আত্মসংবরণ করিতে থাকে। আত্মসংবরণ করিতে সময় তার বেশীক্ষণ লাগে না, খাওয়া-দাওয়ার পর মাধবীলতা যখন আজ শশধরের বৌ-এর সঙ্গে গল্প করার বদলে পান হাতে স্বামীর ঘরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে দরজাটা বন্ধ করিয়া দেয়, বিভূতির মন তখন কঠিন কর্তব্য সম্পন্ন করার গাঢ় আর আঠার মত চটচটে তৃপ্তিতে ভরিয়া গিয়াছে। দুপুরটা সেদিন দুজনের গভীর আনন্দে কাটিয়া গেল। পুরুষ আর নারীর প্রথম যৌবনের সব দুপুর ও রকম আনন্দে কাটে না।

বিভূতির মা ঘরে যায় দুধের বাটি হাতে। মহেশ একরকম কিছুই খায় নাই।

'খাও!'

মহেশ কথা বলে না, শুধু মাথা নাড়ে। কিন্তু শুধু মাথা নাড়িয়া পতিব্রতা স্ত্রীকে কে কবে ঠেকাইতে পারিয়েছে? শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিতে হয়, 'কেন জ্বালাতন করছ? এখন কিছু খাব না।'

'কেন খাবে না?'

বিভূতির মার নিজেরও খাওয়া হয় নাই, ক্রমে ক্রমে মেজাজ চড়িতেছিল, আবার খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া মহেশ যখন সংক্ষেপে কৈফিয়ৎ দেয় যে, মনের উত্তেজনার সময় খাইলে শরীর খারাপ হয়—বিভূতির মার মেজাজ রীতিমত গরম হইয়া উঠে।

'কচি খোকার মত কি যে কর তুমি!'

ভাল করিয়া কথা বলিলে, এমন কি রীতিমত ঝগড়া করিলেও, হয়তো বিভূতির মা তখনকার মত শুধু রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া যাইত, এক ঘণ্টা পরে আবার ফিরিয়া আসিত দুধের বাটি হাতে। কিন্তু এভাবে কথা পর্যন্ত বলিতে না চাহিলে কি মানুষের সহ্য হয়? বিভূতির মা তো আর জানিত না, নিজের মনের সঙ্গে মহেশ বুঝাপড়া করিতেছে, কত যে বিচার-বিশ্লেষণ চলিতেছে, তার সীমা নাই। খোলা দরজা দিয়ে দুধের বাটিটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বিভূতির মা আগাগোড়া একটা বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়া দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া রহিল।

তখন মনটা মহেশ চৌধুরীর বড় খারাপ হইয়া গেল। কি দোষ করিয়াছে বিভূতির মা? অন্যের পাপে সে কেন কষ্ট পায়? সেদিনের কথা মহেশের মনে পড়িতে থাকে, সদানন্দের কুটিরের সামনে তার সঙ্গে বিভূতির মা যখন গাছতলায় বৃষ্টিতে ভিজিতেছিল। বিছানার একপ্রান্তে পা গুটাইয়া বসিয়া মহেশ ভাবিতে থাকে। বিভূতির মাকে তুলিয়া খাওয়ানো যায়, সেটা তেমন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু কি লাভ হইবে? বিভূতির সম্বন্ধে যা সে ভাবিতেছে, তাই যদি স্থির করিয়া ফেলে, তখন বিভূতির মাকে যে কষ্টটা ভোগ করিতে হইবে, তার তুলনায় এখনকার এ কষ্ট কিছুই নয়।

বিভূতিকে বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতে বলিবে কি না, এই কথাটাই মহেশ ভাবিতেছিল। বিড়াল মারার জন্য নয়, বিভূতির প্রকৃতি যে কখনও বদলাইবে না, এটা সে ভাল করিয়া টের পাইয়া গিয়াছে বলিয়া। এখন বিভূতিকে বাড়িতে থাকিতে দেওয়ার অর্থ-ই কি তাকে সমর্থন করা নয়? শুধু ছেলে বলিয়া তাকে আর কি ক্ষমা করা চলে, চোখ কান বুঁজিয়া আর কি আশা করা চলে এখনও তার সংশোধন সম্ভব? বিনা প্রতিবাদে এখন চুপ করিয়া থাকা আর বিভূতিকে স্পষ্ট বলিয়া দেওয়া যে, সে যা খুশি করিতে পারে, এর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তার ছেলে বলিয়া বিভূতির অন্যায় করার যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আছে, মানুষের উপর যে প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে, বিভূতিকে জানিয়া শুনিয়া সে সমস্ত ব্যবহার করিতে দেওয়া আর তার নিজের অন্যায় করার মধ্যেই বা পার্থক্য কি? মনে মনে মহেশ চৌধুরী স্পষ্টই বুঝিতে পারে, এ বিষয়ে আর ভাবিবার কিছু নাই, বিভূতিকে বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলা উচিত কি অনুচিত, এটা আর প্রশ্নই নয়, এখন আসল সমস্যা দাঁড়াইয়াছে এই যে, বিভূতি তার ছেলে। বিভূতি যে তার স্ত্রীরও ছেলে, এটা এতক্ষণ মহেশের যেন খেয়াল ছিল না। বিভূতির মা'র চাদরমুড়ি দেওয়া মূর্তি এই আসল সমস্যাটাকে তাই একটু বেশিরকম জটিল করিয়া দিয়াছে।

বিভূতির মা'র ছেলেকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেওয়ার অধিকার কি তার আছে?

ভাল ছেলে, সৎ ছেলে, আদর্শবাদী ছেলে—গ্রামে আর এমন ছেলে নাই। কেবল বুদ্ধিটা একটু বিকৃত—ভাল মন্দের ধারণাটা ভুল। অনেকগুলি মানুষকে ক্ষেপাইয়া তুলিবার আনন্দ, দু'দিন পরে যখন প্রচণ্ড একটা সংঘর্ষ ঘটিয়া যাইবে, কতকগুলি মানুষ যাইবে জেলে আর কতকগুলি যাইবে হাসপাতালে আর কতকগুলির দেহ উঠিবে চিতায়, আনন্দের তখন আর

তার সীমা থাকিবে না। জেল, হাসপাতাল বা চিতা, এর কোনটার জন্য নিজেরও অবশ্য তার ভয় নাই। ছেলের এই নির্ভীকতাও মহেশের আরেকটা বিপদ। নিজের কথা যে ভাবে না, স্বাধীনভাবে চলা-ফেরার বয়স যার হইয়াছে, ছেলে বলিয়া তার উপর বাপের অধিকার খাটানোর কথা ভাবিতে মনটা মহেশের খুঁতখুঁত করে।

মহেশ চৌধুরী নির্বাক হইয়া থাকে প্রায় তিন দিন। গম্ভীর নয়, বিষণ্ণ নয়, উদাস নয়, শুধু নির্বাক। বিভূতির মাও নির্বাক হইয়া থাকে, কিন্তু তাকে বড় বেশি গম্ভীর, বিষণ্ণ আর উদাস মনে হয়।

বিভূতি বলে, 'কি হয়েছে মা?'

বিভূতির মা বলে, 'কিছু হয় নি।'

বিভূতি পিছন হইতে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কানের কাছে মুখ নিয়া চুপি চুপি বলে, 'শোন, আমার জন্যে ভেবো না। ভয় নেই, আমি আর জেলে যাব না। সে সব ছেলেমানষি বোকামির দিন কেটে গেছে।'

তবু বিভূতির মার প্রথমটা মন-মরা ভাব কাটিতে চায় না! বরং বাড়িবার উপক্রম হয়। কারণ, একদিন মহেশ চৌধুরী সোজাসুজি বিভূতির সম্বন্ধে তার সিদ্ধান্তের কথাটা তাকে শুনাইয়া দেয়।

বিভূতির মা প্রথমটা শোনে হাঁ করিয়া, তারপর দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া বলে, 'বেশ তো, তাড়িয়ে দাও।'

'তুমি কি করবে?'

'আমি? গলায় কলসী বেঁধে পুকুরে গিয়ে ডুব দেব।'

'সত্যি? না, তামাশা করছ?'

ছোট ছেলেকে প্রথমভাগ পড়ানোর মত ধৈর্যের সঙ্গে বিভূতির মা বলে, 'দ্যাখো, স্পষ্ট কথা বলি তোমাকে, শোনো। তুমি না থাকলেও আমার একরকম করে দিন কেটে যাবে, কিন্তু ছেলে ছাড়া আমি বাঁচব না বলে রাখছি।'

মহেশ তা জানিত, এতদিন খেয়াল করে নাই।

'এই কথা ভাবছ বুঝি ক'দিন?' বিভূতির মা জিজ্ঞাসা করে।

মহেশ চৌধুরী নীরবে মাথা হেলাইয়া সায় দেয়।

বিভূতির মা তার মুখের সামনে হাত নাড়িয়া বলে, 'কেন শুনি? কি জন্যে শুনি? ওর কথা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার কি শুনি? ছেলে বড় হয়েছে, বিয়ে-থা' দিয়েছ, তার যা খুশি সে করুক। তোমার তাতে কি? তোমার কাজ তুমি ক'রে যাও, তার কাজ সে করুক—তুমি কেন ওর পেছনে লাগতে যাবে?'

মহেশ ভাবিতে ভাবিতে বলে, 'নিজের কাজ করার জন্যই তো ওর পেছনে লাগতে হচ্ছে গো।'

ভাবিতে ভাবিতে মহেশ চৌধুরীর দিন কাটে। মানুষটার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে—সদানন্দের অধঃপতনের আঘাতে অথবা সদানন্দের সম্বন্ধে ভুল করার ধাক্কায়। আর যেন নিজের উপর সে সহজ বিশ্বাস নাই। সমস্ত প্রশ্নই আজকাল ধাঁধার মত মনে হয়। কত সন্দেহই যে মনে জাগে। জীবনের পথে চলিবার জন্য আত্মবিশ্বাসের একটিমাত্র রাজপথ ধরিয়া এতকাল চলিবার পর বুদ্ধিবিবেচনা যেন ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন পথের অস্তিত্ব দেখাইয়া তার সঙ্গে খেলা

আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বিভূতির মার সঙ্গে আলোচনা করার পর একটা যে প্রচণ্ড সংশয় মহেশের মনে জাগে, তার তুলনা নাই। বিভূতির সম্বন্ধে কি করা উচিত স্থির করিয়া ফেলার পর সেটা করা সত্যই উচিত কিনা সে বিষয়ে আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি তার মনে আসিয়াছে, প্রথমে যা খেয়ালও হয় নাই। বিভূতির সম্বন্ধে কি করা উচিত জানিয়াও তা না করা এক কথা—নিজের অনেক দুর্বলতার মধ্যে একটির সম্বন্ধে সুনিশ্চিত প্রমাণ হিসাবে গণ্য কার যায় আর দুঃখিত হওয়া চলে। কিন্তু এ তো তা নয়! অনেক বিষয়-বিবেচনা না করিয়াই সে যে কি করা উচিত স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। তার সমস্ত বিচার-বিবেচনাই কি অসম্পূর্ণ, একপেশে? কেবল উপস্থিত প্রমাণ-প্রয়োগের উপর নির্ভর করিয়া আদালতের চোখ-কান বুঁজিয়া বিচার করার মত নিজের জ্ঞান আর বুদ্ধির উপর নির্ভর করাই কি তার নিরপেক্ষতা? একটা প্রশ্ন সম্বন্ধে কত কথা ভাবিবার থাকে, নিজের ভাবিবার ক্ষমতা দিয়া কি সে প্রশ্নের মীমাংসা করা উচিত, যদি মীমাংসা করার আগেই সমস্ত কথাগুলি ভাবিবার ক্ষমতা না থাকে? চিরজীবন সে কি এমনি ভুল করিয়া আসিয়াছে? মানুষ কি এমনি ভুল করে, পৃথিবীর সব মানুষ?

মিথ্যাকে সত্য বলিয়া জানে আর নূতন জ্ঞানের আলোকে এই ভুলকে আবিষ্কার করে? এবং হয়তো আবার নূতন জ্ঞানের আলোকে আবিষ্কার করে যে, এই আবিষ্কারটাও মিথ্যা?

সুতরাং বিষম এক জটিল সমস্যা নিয়া মহেশ চৌধুরী বড়ই বিব্রত হইয়া পড়ে। ব্যাপারটা কিন্তু হাস্যকর মোটেই নয়। জগতে এমন কে চিন্তাশীল আছে, এ সমস্যা যাকে পীড়ন না করে? এ সংশয়ের হিমালয় না ডিঙ্গাইলে তো চরম সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না

[লেখকের মন্তব্য ঃ মহেশ চৌধুরীর আসল সমস্যার কথাটা আমি একটু সহজভাবে পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিই। বলার প্রয়োজনও আছে। মহেশ চৌধুরীর মনের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়াইলে তার মনের অবস্থাটা বুঝা সম্ভব, ধাঁধাটা পরিষ্কার হওয়া সম্ভব নয়।

কোন প্রশ্নের বিচারের সময় সেই প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত যুক্তিতর্ক বিবেচনা করা উচিত, এই কথাটা মহেশ চৌধুরীর মনে হইয়াছে। কথাটা গুরুতর বটে, যুক্তিসঙ্গতও বটে। কিন্তু মুস্কিল এই, কেবল প্রশ্ন নয়, জগতে এমন কি আছে, যার সঙ্গে জগতের অন্য সমস্ত কিছু সংশ্লিষ্ট নয়? অস্তিত্বের অর্থ তাই—সমগ্রতা। বিচ্ছিন্ন কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। এদিকে মানুষের মস্তিষ্ক এমন যে, সেখানে এক সময় একটির বেশি সমগ্রতার স্থান হয় না—অংশও মস্তিষ্কের পক্ষে সমগ্র। জগতের অসংখ্য আংশিক সমগ্রতাকে ধারাবাহিকভাবে বিচার করিয়া কোন প্রশ্নের জবাব পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পৃথিবীর সমস্ত দর্শন তাই একটিমাত্র উপায় অবলম্বন করিয়াছে—আংশিক সমগ্রতার পরিধি বাড়াইয়া চলা। দু'টি অংশের একত্ব আবিষ্কার করিয়া, দু'টি আংশিক সমগ্রতাকে এক করিতে পারিলে জ্ঞানের পথে চরম বা পরম সত্য আবিষ্কারের পথে, এক পা অগ্রসব হওয়া গেল। আজ পর্যন্ত কেউ বিশ্বের সমগ্রতাকে নিজের ব্যক্তিগত একটিমাত্র সমগ্রতায় পরিণত করিতে পারিয়াছে কি না, ভবিষ্যতে কোনদিন পারিবে কি না, জানি না।

তবে, সীমাবদ্ধ জ্ঞান মানুষকে এমনিভাবে সংগ্রহ করিতে হয়, সঙ্কীর্ণ জীবনের তুচ্ছ সমস্যার বিচারও করিতে হয় এমনিভাবে। তা ছাড়া আর উপায় নাই। জন্ম হইতে সকলে আমরা করিয়াও আসিতেছি তাই। শৈশবেও সমস্যার মীমাংসা করিয়াছি, আজও করিতেছি। তখন যেটুকু জ্ঞান আয়ত্তে ছিল কাজে লাগাইতাম, আজ যেটুকু জ্ঞান আয়ত্তে আছে কাজে লাগাই। তখনকার জ্ঞান হয়তো ছিল মোটে কয়েকটি টুকরা জ্ঞানের যোগফল, আজকের

জ্ঞান হয়তো অনেক বেশি টুকরার মিলিত পরিণাম, কিন্তু তখনও যেমন আর টুকরাগুলির জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মাথা ঘামাইতাম না, আজও ঘামাই না। জলের সঙ্গে জল মেশার মত, আলো মেশার মত, আলোর সঙ্গে আলো মেশার মত, মিলিত আংশিক জ্ঞানের পার্থক্য ঘুচিয়া গিয়াছে।

সমস্ত মানুষ, মনের মধ্যে কোন প্রশ্ন জাগিলে, সাময়িক যুক্তি বা সত্যোপলব্ধির সম্পত্তি দিয়া তার বিচার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জবাবও পায়। জবাব না মানা আর নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করা আর নিজের ভবিষ্যৎ পরিবর্তিত যুক্তি বা সত্যোপলব্ধির কাছে আপীলের ভরসা করা অবশ্য ভিন্ন কথা। তবে সাধারণ আপীলের ফলটাও হয়তো মন মানিতে চায় না—শেষ যুক্তি বা শেষ সত্যের আদালত খুঁজিয়া মরিতে হয়।

সীমাবদ্ধ সংক্ষিপ্ত জ্ঞানের জগতের সমগ্রতার আশীর্বাদ মানুষ ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছে। সংশয়বাদের রোগ ধরিয়াছে মানুষকে। প্রত্যেক প্রশ্নের বিচার করিতে আজ তাকে সেই প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খোঁজ করিতে হয়। কে জানে এমন একদিন আসিবে কি না, যে দিন কেহ আমার এই উপন্যাসটি পড়িতে বসিয়া প্রথম লাইনটি পড়িয়া ভাবিতে আরম্ভ করিবে, লাইনটির যে অর্থ মনে আসিয়াছে তাই কি ঠিক, অথবা প্রত্যেকটি শব্দের আর প্রত্যেকটি অক্ষরের অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া, ব্যাকরণের নিয়ম-কানুনগুলি ভাল করিয়া ঘাঁটিয়া, শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিয়া লাইনটির মানে যাচাই করা উচিত?]

একটি দুপুর তো বিভূতির মাধবীলতার সঙ্গে অপরিসীম আনন্দে কাটিয়া গেল, কিন্তু রাত্রি? পরের দিনের দুপুরটা? তার পরের দিনগুলি? দুপুরটা যেন ছিল মাতালের মাঝরাত্রির মত, শেষ হওয়ার জীবনের আর কিছুই যেন রহিল না। তারপর কয়েকদিন ধরিয়া মাতলামির ক্ষুধায় ভিতরটা যেন জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু স্নায়ুবিক বিকারের ভাটিখানায় বড় বেশি খামখেয়ালি চলে।

তাই আর কোন কারণ, কোন তুচ্ছতম নূতন ঘটনা না ঘটিলেও মাধবীলতার উপর অবিশ্বাসে বিভূতির যেন প্রায় বিশ্বাস জন্মিয়া গেল। অনেক যুক্তিই মনে আসিতে লাগিল, তার মধ্যে সর্বপ্রধান, সে নিজে অতি অপদার্থ, আকর্ষণহীন, কুৎসিত পুরুষ। কেবল তাকে নিয়া খুশী থাকা মাধবীলতার পক্ষে কি সম্ভব?

হঠাৎ আবার একদিন বিভূতি জেরা আরম্ভ করে, 'কই, সেদিন আশ্রমে গিয়েছিলে কেন, তা তো বললে না?

মাধবীলতা ভয় পাইয়া বলে, 'বললাম যে?'

'কই বললে?'

'ওই যে সেদিন বললাম।'

'হুঁ', বলিয়া বিভূতি চুপ করিয়া যায়।

গভীর বিতৃষ্ণায় পিছন ফিরিয়া সে শুইয়া থাকে, মাধবীলতা মৃদুস্বরে ডাকিলে বলে বড় ঘুম পাইয়াছে। ঘুম কিন্তু আসে না, মনের অস্বস্তি দেহের একটা অপরিচিত যন্ত্রণার মত তাকে জাগাইয়া রাখে। মনে হয়, ঠিক চামড়ার নীচে সর্বাঙ্গে পেটের অম্বলের জ্বালা যেন ছড়াইয়া গিয়াছে আর বাহিরের গুমোটে তাতিয়া উঠিয়াছে মাথাটা। অথচ এমন আশ্চর্য ব্যাপার. শেষরাত্রে ঘুমাইয়া পরদিন যখন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙ্গে, মনের অবস্থাটা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। পাশে যে অসতী স্ত্রী ছিল গত রাত্রে, অবিশ্বাসের সব কিছু ঝাড়িয়া ফেলিয়া আজ

সকালে সে যেন চোখের আড়ালে সংসারের কাজ করিতে গিয়াছে। আগের রাত্রের ধারণা আজ বিভূতির নিছক ছেলেমানুষি মনে হয়। এমন তুচ্ছ মনে হয় কথাটা যে, ও বিষয়ে একটু চিন্তা করাটাও তার কাছে পরিশ্রমের অপচয়ের সামিল হইয়া দাঁড়ায়। দুঃস্বপ্ন দেখিয়া যেন বিচলিত হইয়াছিল, দুঃস্বপ্ন কাটিয়া গিয়াছে। অনুভূতির জগতে যদি বা একটা দুর্বোধ্য আতঙ্কের জের এখনও আছে, পেটে অম্বলের শক্রতা নাই, দেহে টনটনানি নাই, মাথায় গ্রীষ্মবোধও নাই। একটু শুধু ভারি মনে হইতেছে দেহটা। বোধ হয় হৃদয়ের ঈষৎ চাপা-পড়া বেদনাবোধের ভারে।

চা আর খাবার খাইয়া বিভূতি গ্রামের দিকে যায়। শেষরাত্রে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, আকাশে অল্প অল্প মেঘের জন্য রোদেরও তেমন তেজ নাই। ঘুরিতে ঘুরিতে বিভূতি গিয়া হাজির হয় শ্রীধরের দোকানে। দোকানের সামনে কাঠের বেঞ্চে বসিয়া কয়েকজন ফিস্‌ফাস্ করিতেছিল, বিভূতিকে দেখিয়া তারা অপরাধীর মত চুপ করিয়া যায়।

শ্রীধর অভ্যর্থনা জানাইয়া বলে, 'আসেন। বসেন। বিড়ি খান?'

বিভূতি বসে কতকটা উদাসভাবেই, মাথা নাড়িয়া বলে, 'বিড়ি তো আমি খাই না।'

শ্রীধর সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়া বলে, 'ঠিক বটে, শহরে ছিলেন এতকাল, আপনারা খান সিগারেট। তা তো নেই দাদাবাবু!' তারপর কোথা হইতে কি করিয়া শ্রীধর যে মারাত্মক গাম্ভীর্য মুখে টানিয়া আনে, সে-ই জানে, একটা অদ্ভুত আপসোসের শব্দ করিয়া বলে, 'শহর ভাল। জানেন দাদাবাবু, মোদের এ সব লক্ষ্মীছাড়া গাঁয়ের চেয়ে শহর ঢের ঢের ভাল। বৌ-ঝি নিয়ে নিভ্‌ভাবনায় ঘর তো করা চলে—ঘরের বৌ-ঝিকে তো কেউ জোর করে ধ'রে নিয়ে যায় না।'

যারা ফিস্‌ফাস্ করিতেছিল, তারা সকলে একবাক্যে সায় দেয়। একজন, রামলোচন দে, কাঁচাপাকা চুলের বাবরিতে ঝাঁকি দিয়া বলে, 'আপনি তো ব'লে খালাস দাদাবাবু, মরি যে আমরা। হুঁ, নিজের দোষে মরি তো বটে, উপায় কি বলেন?'

ক্রমে ক্রমে নানারকম আপসেসমূলক মন্তব্য ও প্রশ্নের বাধা ডিঙ্গাইয়া আসল ব্যাপারটা বিভূতির বোধগম্য হয়। কারও বৌ ঝি কেউ সম্প্রতি হরণ করে নাই, যদিও কিছুকাল আগে এ রকম একটা ব্যাপার এই গ্রামেই ঘটিয়া গিয়াছে। সকলের বর্তমান রাগ, দুঃখ আর আপসোসের কারণটা এই। নন্দনপুরের ভদ্রলোকেবা গ্রামে গ্রামে চাঁদা তুলিয়া পাকা নাটমন্দিরের অভাব মিটানোর জন্য খড়ের একটা চালা তুলিয়াছে। তার নীচে নানা উপলক্ষে, মাঝে মাঝে বিনা উপলক্ষেও, যাত্রাগান, কীর্তনগান প্রভৃতি হয়। খড়ের নাটমন্দিরটিতে স্থান একটু কম, তবে সাধারণ অনুষ্ঠানের সময় সেই স্থানও সবটা ভরে না। মুস্কিল হয় ভাল দলের যাত্রা বা নাম-করা কীর্তনীয়ার কীর্তন বা ঐ রকম কোন প্রোগ্রাম থাকিলে, যার আকর্ষণ আছে! তখন চালার নীচে অর্ধেক লোকের বসিবার স্থান হয় না, ভিড়ের বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিতে হয়। তাতেও কোন আপত্তি ছিল না, যদি ও-গ্রামের ভদ্রলোকেরা এ-গ্রামের ভদ্রলোকদের মাঝে মাঝে সামনে গিয়া বসিতে দিত।

'জায়গা থাকলেও বসতে দেয় না দাদাবাবু। এগিয়ে গিয়ে বসতে গেলে ঠেলে পিছনে হটিয়ে দেয়। কেন আমরা শতরঞ্চিতে বসতে পারি না সামনের দিকে? চাঁদা দিই না আমরা? ওকি তোদের বাপের সম্পত্তি যে, শুধু গাঁয়ের বাবুদের জন্যে বেদখল করে রাখিস?'

আগের দিন শ্রীধর, রামলোচন এবং আরও অনেকে যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। সামনের দিকে অনেকটা জায়গা খালি পড়িয়া আছে দেখিয়া যেই বসিতে গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে গলাধাক্কা।

কে একজন শ্রীধরের পিঠে সত্যই একটা ধাক্কা দিয়াছিল এবং আরেকজন রামলোচনের বাবরি ধরিয়া দিয়াছিল টান।

'শেষে ভিড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাত্রা শুনি।'

বিভূতি আশ্চর্য হইয়া বলে, 'তারপরেও যাত্রা শুনলে?'

'শুনব না? চাঁদা দিই নি আমরা?'

বিভূতি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া সকলের মন্তব্য শুনিয়া যায়, তারপর জিজ্ঞাসা করে, 'ওরা কি বলল, যারা তোমাদের ঠেলে সরিয়ে দিলে?'

জবাব দিল শ্রীধর, 'কি আর বলবে দাদাবাবু, বলল, পিছন দিকে তোমাদের জন্যে বসবার জায়গা থাকে, আগে এসে বসতে পার না?'

'একটা দিন হয়তো বিশেষ কারণে—'

'একটা দিন? প্রত্যেকবার এমনি হচ্ছে, একটা দিন কি দাদাবাবু! মোদের গাঁয়ের কেউ সামনে গিয়ে বসতে পায় না।'

এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে বিভূতির সাধ যায় না। মনে হয়, প্রতিবাদ করার মত ব্যাপারও এটা নয়। যাত্রা শুনিতে গিয়া গ্রামের কয়েকজন বসিবার স্থান পায় নাই বলিয়া কি বিচলিত হওয়া চলে? তবু বসিবার স্থানের উপর এ-গ্রামের লোকেরও অধিকার আছে, স্থান থাকিলেও যদি তাদের বসিতে দেওয়া না হয়, সেটা অন্যায়। অন্যায়ের প্রতিকার করা কর্তব্য। নিজের চোখে দেখিয়া ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার উদ্দেশ্যে বিভূতি বলে, 'সামনের জন্মাষ্টমীতে যাত্রাটাত্রা হবে না?'

শ্রীধর বলে, 'তিন রাত্তির হবে, অনেক মজা আছে দাদাবাবু।'

বিভূতি বলে, 'তোমরা সবাই আমার সঙ্গে যেও, দেখি কেমন বসতে না দেয়।'

একজন একটু সংশয়ভরে জিজ্ঞাসা করে, 'কি করবেন?'

বিভূতি হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলে, 'আমি একা কি করব? তোমরা সবাই করবে- জায়গা থাকলে সেখানে বসে পড়বে। আবার কি?'

।। আঠারো ।।

নেতা হওয়া যে এত সহজ আর নেতৃত্ব করা এমন কঠিন, বিভূতি তা জানিত না। এবার সে ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে। শ্রীধরের দোকানে বসিয়া মাত্র কয়েকজনের কাছে সে আবেগের সঙ্গে ঘোষণা করিয়াছিল যে নন্দপুরের যাত্রার আসরে সামনে বসিবার অধিকার সে তাদের আদায় করিয়া দিবে। জন্মাষ্টমীর দিন দেখা গেল নানা বয়সের প্রায় দেড়শ' মানুষ তার এই অধিকার আদায়ের অভিযানে যোগ দিয়াছে। শ্রীধর বা রামলোচনের মত যারা অন্ততঃ ফতুয়া গায়ে দিয়া যাত্রা শুনিতে যায়, এদের অধিকাংশই সমাজের সে-স্তরের মানুষও নয়। এরা যাত্রা শুনিতে যায় গামছা কাঁধে, আসরে সামনের দিকে ভদ্রলোকদের মাঝে বসিতে পাইলে বোধ হয় রীতিমত অস্বস্তিই বোধ করে। শ্রীধর, রামলোচন প্রভৃতির মত চাঁদা দিয়াও সামনে বসিতে না পাওয়ার অপমানে এরা ক্ষুব্ধ হয় নাই। চাঁদাই বা এদের মধ্যে ক'জন দিয়াছে কে জানে! কোথা হইতে দিবে? খাজনা দিতে যাদের অনেকের ঘটিবাটি বাঁধা দিতে হয়, চাঁদা দেওয়ার বিলাসিতা তাদের কাছে প্রশ্রয় পায় না।

তবু তার নেতৃত্বে যাত্রার আসর আক্রমণের জন্য সকলে যেন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। নন্দনপুরের স্থায়ী আটচালার নীচে সর্বসাধারণের যাত্রার আসর। চাঁদা দিক বা না দিক, গায়ে ফতুয়া থাক বা না থাক, এদের সকলেরই অবশ্য সে আসরে সামনে বসিবার অধিকার আছে। কিন্তু এরা কি তাই চায়? সেজন্যই কি এরা সকলে জড়ো হইয়াছে? বাঁচিবার অধিকার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে এদের সে যে সব কথা বলিয়াছে, এ কি তারই প্রতিক্রিয়া?

এই প্রশ্ন বিভূতিকে পীড়ন করিতে থাকে। তার বক্তৃতা আর উপদেশ এতগুলি মানুষের মধ্যে সাড়া জাগাইয়াছে, এ কথা বিশ্বাস করিতে ভাল লাগে কিন্তু নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। গ্রামের সঙ্গে গ্রামের প্রতিযোগিতা থাকে, মনোমালিন্য থাকে—এক গ্রাম অন্য গ্রামকে অনায়াসে হিংসা করে। কে জানে এরা নন্দনপুরের অধিবাসীদের একটু জব্দ করিতে চলিয়াছে কি না? শ্রীধর, রামলোচন আর অন্যান্য কয়েকজন ফতুয়াধারী হয়তো নিজেদের কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এই সব অশিক্ষিত সরল মানুষগুলিকে ক্ষেপাইয়া দিয়াছে। যাত্রার আসরে হয়তো আজ একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটিয়া যাইবে।

কিন্তু এখন আর পিছাইবার উপায় নাই, মরিয়া গেলেও না। বিভূতি বার বার সকলকে আসল কথাটা বুঝাইয়া দেয়। গালাগালি, হাতাহাতি চলিবে না। ধীর স্থির শান্তভাবে সকলে সামনের দিকে জাঁকিয়া বসিয়া পড়িবে, কিছুতেই আর সেখান হইতে উঠিবে না।

একজন প্রশ্ন করে, 'ওরা যদি গাল দেয়, অপমান করে? যদি মারে?' বিভূতি জবাব দেয়, 'তবু চুপ করে বসে থাকবে, কথাটি কইবে না। আমাদের ভদ্র ব্যবহারে ওরাই লজ্জা পাবে। ওরা যদি ছোটলোকমি করে, আমরা কেন ছোটলোক হতে যাব?'

বিভূতি ইচ্ছা করিয়াই সকলকে সঙ্গে নিয়া যাত্রা আরম্ভ হওয়ার অনেক আগে আসরে গিয়া হাজির হইল। মানুষ তখন জমা হইয়াছে অনেক, তবে বসিবার স্থানও যথেষ্ট ছিল। সামনে বিশেষ স্থানগুলি রাখা হইয়াছিল বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের জন্য। সকলে দল বাঁধিয়া সেই স্থানগুলি দখল করিয়া বসিবার উপক্রম করিবামাত্র কয়েকজন ভলান্টিয়ার আসিয়া প্রতিবাদ করিল। বিভূতি যেখানে খুশী বসুক, বিভূতি দু'একজন বন্ধু-বান্ধবও বসুক, কিন্তু সকলে বসিলে চলিবে কেন!

বিভূতি খুব অহিংসভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন চলবে না? এরা সকলেই আমার বন্ধু।'

একজন ভলান্টিয়ার, বয়স তার আঠার- উনিশের বেশি হইবে না, একগাল হাসিয়া বলিল, 'আর আমরা বুঝি আপনার শত্রু?'

'না, তা বলছি না—

একজন তিন চার হাত তফাৎ হইতে বিভূতির মুখগহ্বরটিকে পিকদানি হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করিল। মুখ ভাসাইয়া পানের পিক বুকে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, বিভূতি মুছিবার চেষ্টাও করিল না। এক লাফে সামনে আগাইয়া গিয়া এক হাতে অপরাধীর গলাটা টিপিয়া ধরিয়া অন্য হাতে তাকে মারিতে লাগিল কিল, চড, ঘুঁসি। আরেকজন চট করিয়া বসিয়া পড়িয়া পিছন হইতে বিভূতির পা ধরিয়া মারিল এক হ্যাঁচকা টান, বিভূতি মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল।

একজন চিৎকার করিয়া উঠিল, 'মার শালাদের।'

অনেকের মুখে প্রতিধ্বনি শোনা গেল : 'মার! মার! মার!'

অধিকাংশ লোক যেন দাঙ্গার জন্যই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে এমন দাঙ্গা বাধিয়া গেল বলিবার নয়। কোথা হইতে যে এত লাঠি, ইঁট, পাটকেল আসিয়া জুটিল!

কয়েকটা মাথা ফাটিয়া গেল, অন্যভাবে আহত হইল অনেকে। হৈ হৈ রৈ রৈ, হল্লা, ছুটাছুটি, মারামারি—এক গ্রামের লোক যে ভাবে পারিতেছে অন্য গ্রামের লোককে আঘাত করিতেছে। নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই, ভাল করিয়া দল বাঁধিয়া দাঙ্গা করিবার মত কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত কারও নাই। একজন হয়তো পেছন হইতে অন্য একজনের মাথায় লাঠি মারিবার আয়োজন করিয়াছে, এমন সময় তৃতীয় এক ব্যক্তি লোহার একটা মুখ-সরু শিক তার পিঠের মধ্যে ঢুকাইয়া দিল। এ ধরণের অস্ত্র কেউ কেউ দু'একটা সঙ্গে আনিয়াছিল। কেবল আজ নয়, আগের দু'দিনও আনিয়াছিল। মারামারিটা যে আজ হঠাৎ লাগে নাই এ তার একটা মস্ত বড় প্রমাণ।

শেষ পর্যন্ত বিভূতির স্থাপিত ব্যায়াম-সমিতি গুলির সদস্যেরা আসিয়া সেদিনকার মত সেখানকার হাঙ্গামাটা থামাইয়া দিল। মারামারিটা হইতেছিল এক গ্রামের লোকের সঙ্গে আরেক গ্রামের লোকের এবং বিভূতি ব্যায়াম স্থাপন করিয়াছিল এক এক গ্রামে একটা করিয়া। কিন্তু এমনই আশ্চর্য ব্যাপার, মারামারিটা বন্ধ করিল ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ব্যায়াম-সমিতিগুলির সদস্যেরা একসঙ্গে মিলিয়া। অধিকাংশ মাথা-গরম যুবক, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন ঘোরতর মিল দেখা গেল, ঠাণ্ডামাথা বুড়োদের মধ্যে যা সম্ভব হয় না।

আহত বিভূতিকে তারা গরুর গাড়িতে বাড়ি পাঠাইয়া দিল। বিভূতির আঘাত বিশেষ গুরুতর নয়, অন্ততঃ দেহের আঘাত নয়। অন্যান্য যারা আহত হইয়াছিল, তাদের কয়েকজনকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হইল, কিন্তু অধিকাংশ আহত মানুষ যে কোথায় উধাও হইয়া গেল, তার আর কোন পাত্তাই মিলিল না।

মারামারি কিন্তু সেইখানেই শেষ হইল না।

এক গ্রামের কয়েকজন অন্য গ্রামের একজনকে একা পাইলে ধরিয়া পিটাইয়া দিতে লাগিল। মারামারির পরদিন সকালে নন্দপুরে গিয়া মহেশ চৌধুরী মার খাইয়া অজ্ঞান হইয়া গেল। মাথাটা তার ফাটিয়া গেল এবং দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল কয়েকটা।

বিভূতি আহত অবস্থায় বাড়ি ফিরিলে মহেশ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'তুমি গিয়ে দাঙ্গা করে এসেছ?'

বিভূতি বলিয়াছিল, 'না। যাতে দাঙ্গা না বাধে তার চেষ্টা করেছিলাম।'

কথাটা মহেশ বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু তখনকার মত কিছু আর বলেও নাই। পরদিন সকাল হইতে আসল ব্যাপারটা জানিবার জন্য নিজে ছুটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু খোঁজখবর নেওয়ার সুযোগটাও সে পায় নাই। তাকে দেখিয়াই নন্দপুরের জনপাঁচেক বদমেজাজি মানুষ বলিয়াছিল, 'বিভূতির বাপ ব্যাটা এসেছে রে!'

বলিয়াই তাকে পিটাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

অনেক বেলায় খবর পাইয়া বিভূতি তাকে আনিতে গেল। বাপের অবস্থা দেখিয়া মুখ তার অন্ধকার হইয়া গেল। যাদের সে যাচিয়া আগের দিন যাত্রার আসরে সঙ্গে নিয়া গিয়াছিল, মারামারির জন্য তাদের উপরেও তার বিরক্তির এতক্ষণ সীমা ছিল না। এরকম একটা কুৎসিত কাণ্ড ঘটার জন্য মনে মনে তার বড়ই খারাপ লাগিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, এইরকম বর্বর যদি তার দেশের মানুষ হয়, আর এইরকম কারণে অকারণে পরস্পরকে হিংসা করে আব পরস্পরের সঙ্গে কলহ বাধায়, দেশের তবে হইবে কি ? আজ আহত বাপকে দেখিয়া সর্বাগ্রে তার মনে হইল, যারা তার বাপকে এ ভাবে মারিয়াছে তাদের কিছু উত্তম-মধ্যম না দিলে জীবনধারণ করাই বৃথা।

কিন্তু কে যে মহেশ চৌধুরীকে মারিয়াছে, কেউ তা জানে না। অত সকালে আটচালার দিকে বড় কেউ যায় নাই। একটু বেলায় মহেশকে রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া গ্রামে একটা গোলমাল বাধিয়া যায়। তখন নন্দপুর ব্যায়াম-সমিতির সদস্যেরা তাকে সযত্নে তুলিয়া আনিয়া সেবাযত্নের ব্যবস্থা করিয়াছে।

ডাক্তার দেখাইয়া পাল্কিতে করিয়া মহেশকে বাড়ি নিয়া যাওয়া হইল। সারাদিন সারারাত বিভূতি মহেশের শিয়রে বসিয়া রহিল, বিভূতির মা বসিয়া রহিল পায়ের কাছে। মাধবীলতা ওইরকমভাবেই রাতটা কাটাইবার আয়োজন করিয়াছিল, বিভূতির জন্য পারিয়া উঠিল না। মাঝরাত্রে বিভূতি তাকে এমন একটা অপমানজনক ধমক দিয়া.ন্যাকামি করিতে বারণ করিয়া দিল যে, কাঁদিয়া ফেলিয়া মাধবীলতা উঠিয়া গেল।

মহেশ চৌধুরীর জ্ঞান ফিরিল পরদিন সকালে।

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবটা একটু কাটিয়া আসিলে বিভূতি মৃদুস্বরে তাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমায় কে মেরেছে বাবা?'

মহেশ চৌধুরী বলিল, 'একজন কি মেরেছে—চার-পাঁচজনে।'

'কেন মারল?'

'তোমার জন্যে। পাপ করলে তুমি, তোমার বাপ বলে আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করলাম।'

উত্তেজিত হওয়ার ফলে হঠাৎ ব্যথায় মহেশ একটু কাতব হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ সকলে চুপচাপ।

'তুমি আমার বাবা ব'লে তোমায় মারল? কে কে মারল?'

মহেশ চৌধুরী চোখ বুঁজিয়া বলিতে লাগিল, 'ওরা সবাই ভাল লোক, অকারণে কখনো মারতো না। যোগেন, দীনু, কালীপদ, রামনাথ আর নগেনের সেজমামা ছিল, — কি যেন নাম লোকটার? আমি তো ওদের কোনদিন ক্ষতি করিনি, মিছিমিছি কেন ওরা আমায় দেখামাত্র পিটতে আরম্ভ করবে?'

নড়িতে গিয়া মৃদু একটা আর্তনাদ করিয়া মহেশ চৌধুরী চুপ করিয়া গেল।

বিভুতি দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া বলিল, 'আমি যদি ওদের তোমার মত অবস্থা না করি, তোমার ব্যাটা নই আমি।'

কাৎরাইতে কাৎরাইতে চোখ মেলিয়া মহেশ চৌধুরী বলিল, 'তুমি যদি আবার ওদের পিছনে লাগতে যাও, তোমায় আমি জন্মের মত ত্যাগ করবো বলে রাখছি।'

'তা তুমি ত্যাগ করো। তাই বলে ঘাড় গুঁজে এ অন্যায় সহ্য করা—'

'কিসের অন্যায়? যদি করেই থাকে অন্যায়, তোর কি ? মেরেছে আমাকে, তোমাকে তো মারেনি, তোমার মাথা ঘামাবার দরকার?'

'বাঃ, বেশ!' বলিয়া বিভূতি খানিকটা হতভম্বের মতই বসিয়া রহিল। মহেশ চৌধুরী বলিতে লাগিল, 'তুমি ওদের পেছনে লাগবে, বদনাম রটবে আমার। সবাই বলবে আমি তোমায় দিয়ে ওদের মারিয়েছি।'

বিভূতি বলিল, 'তুমি এমন কাপুরুষ!'

'কাপুরুষ?'

'নয় তো কি? লোকে নিন্দে করবে ভয়ে মুখ বুঁজে এত বড় অন্যায় সহ্য করে যাবে? লোকের নিন্দা-প্রশংসা দিয়ে তোমার নীতি ঠিক হয়, আর কিছু নেই তার পেছনে?'

বিভূতির মা ব্যাকুলভাবে বলিল, 'চুপ কর না বিভূতি? কি যে তোরা আরম্ভ করেছিস?'

বিভূতি কথাটা গ্রাহ্য করিল না, চুপচাপ একটু ভাবিয়া বলিল, 'নিন্দা-প্রশংসা তো আমারও আছে। আমার বাপকে ধরে পিটিয়ে দিল, আমি যদি চুপ করে থাকি, লোকে আমায় অপদার্থ বলবে। ভীরু কাপুরুষ বলবে।'

মহেশ সভয়ে বলিল, 'কি করবি তুই?'

বিভূতি বলিল, 'ওদের বুঝিয়ে দেব, মারতে কেবল ওরা একাই জানে না।'

'তাতে লাভ কি হবে?'

'ভবিষ্যতে আর এ রকম করবে না।'

'আরও বেশি ক'রে করবে। তার চেয়ে সেরে উঠে আমি যদি গিয়ে হাসিমুখে এদের সঙ্গে কথা বলি, ভাই বলে জড়িয়ে ধরি, ওরা কি রকম লজ্জা পাবে বল তো?'

'ছাই পাবে। ভাববে, আবার মার খাবার ভয়ে খাতির করছ।'

মহেশ শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, আর তার তর্ক করার ক্ষমতা ছিল না। তখনকার মত সে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু বিভূতি উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই আবার তাকে ডাকিয়া বসাইয়া বুঝাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিল। রাগ করিয়া, মিষ্টি কথা বলিয়া, মিনতি করিয়া, কতভাবে যে সে বিভূতিকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করিল। যতই সে কথা বলিতে লাগিল, বিভূতির কাছে ততই স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল তার ভয়ের পরিচয়—মার খাইয়া মহেশ চৌধুরী মার ফিরাইয়া দিয়াছে, মানুষের কাছে এইরকম অসভ্য বর্বররূপে পরিগণিত হওয়ার ভয়! মহেশ চৌধুরীকে এমন দুর্বল বিভূতি আর কখনো দেখে নাই। শেষে বিরক্ত হইয়া সে বলিল, 'আচ্ছা সে দেখা যাবে।' বলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

নিজের ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সে ভাবিতে লাগিল। হাতাহাতি মারামারি সে নিজেও কোনদিন পছন্দ করে না, ও সমস্ত সত্যই নীচতা। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই কি তাই? মহেশ চৌধুরী কোন অপরাধ করে নাই, কেবল তার বাবা বলিয়া তাকে যারা মারিয়াছে, উদারভাবে তাদের ক্ষমা করাটা কি উচিত? তাকে উদারতা বলে? তার চেয়ে ছোটলোকের মত ওদের ধরিয়া কিছু উত্তম-মধ্যম লাগাইয়া দেওয়াই কি মহত্ত্বের পরিচয় নয়, মনুষ্যত্বের প্রমাণ নয়? ভাবিতে ভাবিতে বিভূতি বুঝিতে পারিল, মাধবীলতা ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গতরাত্রে মাধবীলতাকে বিশ্রী ধমক দিয়া কাঁদানোর কথাটা মনে পড়ায়, ভাব করার উদ্দেশ্যে হঠাৎ সে মাধবীলতার কাছে পরামর্শ চাহিয়া বসিল।

মাধবীলতা চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, 'ওদের মেরে ফেলা উচিত, খুন করে ফেলা উচিত।'

বিভূতি হাসিয়া বলল, 'সত্যি? কিন্তু ওরা যদি আমায় মেরে ফেলে?'

বিভূতি হাত বাড়াইয়া দিতে মাধবীলতা তার বুকের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এতক্ষণ যেন অধীর আগ্রহে সে এইজন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। বিকারের সঙ্গে ভালবাসার তীব্রতা বাড়িয়া গিয়াছে। বিকার ছাড়া স্বাভাবিক মায়ামমতা জোরালো হয় না। এক রাত্রির অভিমান-সংক্ষুব্ধ বিরহ মাধবীলতাকে অধীর করিয়া দিয়াছে।

হাঙ্গামার ফলে নন্দনপুরে যাত্রা আর কীর্তন বন্ধ হইয়া গেল, সেই যাত্রা আর কীর্তন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইল আশ্রমে। বুদ্ধিটা মাথায় আসিল কয়েকটি গ্রামের মাতব্বরদের।

তারা ভাবিয়া দেখিল, আশ্রমে সব গ্রামের লোকের সমান অধিকার, সেখানে বিশেষ সুবিধাও কেউ দাবি করতে পারিবে না, বদমাইসি করিয়া গোলমাল সৃষ্টি করার জন্য সাহসও কারও হইবে না। যেদিন সকালে মহেশ চৌধুরীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সেইদিন দুপুরে আরম্ভ হইল শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাকীর্তন। রাত্রি আটটা ন'টার সময় যাত্রাভিনয় আরম্ভ হইবে এবং সমস্ত রাত চলিবে।

বিভূতি যখন দল বাঁধিয়া বাপের প্রহারকারীদের খোঁজে বাহির হইল, তখন পুরা দমে কীর্তন চলিতেছে। বাছা বাছা কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে করিয়া পাঁচটি অপরাধীর খোঁজ করিতে গিয়া বিভূতি শুনিল, তারা সকলে কীর্তন শুনিতে গিয়াছে। বিভূতি তখন সোজা আশ্রমে চলিয়া গেল।

আসর লোকে ভরিয়া গিয়াছে। কীর্তনের দলটি নামকরা, প্রধান কীর্তনীয়ার গলাটি মধুর আর আবেগ রোমাঞ্চকর—শ্রীকৃষ্ণ কেন জন্মিবেন, যুগে যুগে তপস্যা করিয়া যোগী ঋষিরা যার হদিশ পায় না, তিনি কেন নিজে মানুষের মধ্যে মানুষের রূপ ধরিয়া আসিবেন, এই কথাটা সুর করিয়া বুঝাইয়া বলিতে বলিতেই সে সকলকে একেবারে মাতাইয়া দিয়াছে,—গদগদ করিয়া তুলিয়াছে। কয়েকজনের চোখে জলও দেখা দিয়াছে।

সদানন্দের কিছু তফাতে অপরাধী পাঁচজন বসিয়াছিল। মনে তাদের একটু ভয় ঢুকিয়াছে, মহেশ চৌধুরী যদি মরিয়া যায়! কাছাকাছিই বসিয়া চুপি চুপি ইঙ্গিতে তারা এ বিষয়ে প্রথমে একটু আলাপ করিয়াছিল, তারপর চুপ করিয়া কীর্তন শুনিতেছে। দলবলসহ আসিয়া বিভূতি যখন আসরের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া তাহাদের খোঁজেই চারিদিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিতেছে, তার উপর পাঁচজনেরই নজর পড়িল।

পাঁচজনকে দেখিয়া বিভূতি সঙ্গীদের বলিল, 'ওই যে ওরা।'

সঙ্গীদের একজন একটু দ্বিধাভরে বলিল, 'এত লোকের মাঝখান থেকে টেনে আনা কি উচিত হবে?'

বিভূতি বলিল, 'প্রথমে ডাকব, যদি আসে ভালই। না এলে ঘাড় ধরে টেনে আনতেই হবে। শাস্তিটা সকলের সামনে দিতে হবে!'

ইতিমধ্যে সদানন্দ বিভূতিকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়া দিয়াছে—মহেশের খবর জানিবে। বিভূতিকে আশ্রমে দেখিয়া সদানন্দ সত্যই খুশী হইয়াছিল। বিভূতি মুখ তুলিয়া তার দিকে চাইতে সে একটু হাসিল। বিভূতি হাসিল না, হাসিবার মত মনের অবস্থা তার তখন নয়, শুধু মাথা একটু কাৎ করিয়া হাসির জবাব দিল।

লোকটিকে বলিল, 'বলগে, একটু কাজ সেরে আসছি।'

পূর্ণেন্দু নামে একটি যুবককে বিভূতি অপরাধী পাঁচজনের কাছে পাঠাইয়া দিল। পূর্ণেন্দু গিয়া বলিল, 'মহেশবাবুর ছেলে বিভূতিবাবু আপনাদের একটু বাইরে ডাকছেন—বিশেষ দরকার।'

যোগেন ভড়কাইয়া গিয়া বলিল, 'আমাদের ডাকছে?'

'দরকার আছে, আসুন।'

'আমাদেব ডাকছে? আমাদের কাদের?'

পূর্ণেন্দু একে একে আঙুল দিয়া পাঁচজনকে দেখাইয়া দিল, 'আপনাকে—আপনাকে—আপনাকে—আপনাকে—আপনাকে।'

পাঁচজনেই ভড়কাইয়া গেল। আসর ছাড়িয়া কি যাওয়া যায়? দরকার থাকিলে বিভূতি

আসুক না?

'চৌধুরী মশায় কেমন আছেন জানো?'

পূর্ণেন্দু বলিল, 'ভাল নয়।'

শুনিয়া পাঁচজনে আরো ভড়কাইয়া গেল এবং আরো স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিল যে, কীর্তন যখন চলিতেছে, আসর ছাড়িয়া যাওয়া কোনমতেই সঙ্গত হইবে না। আশেপাশের দু'একজন এতক্ষণে গোলমালের জন্য অসহিষ্ণু হইয়া বিরক্তিপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পূর্ণেন্দু উঠিয়া গেল।

তারপর ঘটিল অতি খাপছাড়া নাটকীয় ব্যাপার। লোকজনকে ঠেলিয়া সরাইয়া বিভূতি আর তার সঙ্গীরা অপরাধী পাঁচজনের কাছে আগাইয়া গেল! চার-পাঁচজনে মিলিয়া এক একজনকে ধরিয়া হ্যাঁচকা টান মারিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। পাঁচজনের মুখ তখন পাংশু হইয়া গিয়াছে। কীর্তন বন্ধ হইয়া গেল, সকলে অবাক হইয়া ব্যাপার দেখিতে লাগিল।

বিভূতি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া, 'এই পাঁচটি গুণ্ডা মিলে কাল সকালে আমার বাপকে বিনা দোষে মেরে প্রায় খুন করে ফেলেছে। আজ সকাল পর্যন্ত বাবা অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। আপনাদের সকলের সামনে আমি এদের শাস্তি বিধান করছি, চেয়ে দেখুন।' বলিয়া একদিন সদানন্দের মুখে যেরকম ঘুঁসি লাগাইয়াছিল, কালীপদর মুখে সেইরকম একটা ঘুঁসি বসাইয়া দিল। তারপর সকলে মিলিয়া পাঁচজনকে মারিতে আরম্ভ করিল। আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু মারটা তেমন জমিল না। ভয়ে যারা আধমরা হইয়া গিয়াছে, চোখ বুঁজিয়া গোঙ্গাইতে আরম্ভ করিয়াছে, হাত তুলিয়া একটা আঘাত ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা পর্যন্ত যাদের নাই, একতরফা তাদের কাঁহাতক পিটানো যায়? এমনি মারিতে হাত উঠিতেছে না দেখিয়া, বিভূতি একজনের একটা ছড়ি কুড়াইয়া নিল, তারপর সেই ছড়ি দিয়া পাঁচজনকে মারিতে আরম্ভ করিল।

এতক্ষণে চারিদিকে হৈ চৈ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মারের ভয়ে আশেপাশের সকলে তফাতে সরিয়া গিয়াছে এবং সেখানে নিরাপদে দাঁড়াইয়া চিল্লাইতেছে। সদানন্দই বোধ হয় সকলের আগে তাদের কাছে আগাইয়া আসিল। সদানন্দকে আগাইতে দেখিয়া তখন অগ্রসর হইল আশ্রমের অধিবাসীরা।

সদানন্দ বিভূতিকে ধরায় বিভূতি তাকে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিল। তখন সকলের দিকে চাহিয়া বজ্রকণ্ঠে সদানন্দ বলিতে লাগিল, 'আমার আশ্রমে এসে একজন গুণ্ডা গুণ্ডামি করছে, আমায় অপমান করছে, তোমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে তাই দেখছ? আমাকে মারল, এ অপমান তোমাদের সহ্য হচ্ছে? আমার যদি একজন ভক্ত এখানে থাকে—'

উত্তেজনা অনেকের মধ্যেই সঞ্চারিত হইয়াছিল, তার উপর সদানন্দের অনুপ্রেরণা। একটা গর্জনের মত আওয়াজ উঠিয়া এলোমেলো গোলমালটা একেবারে ঢাকিয়া দিল।। শ'চারেক লোক আগাইয়া গেল বিভূতি আর তার সঙ্গীদের দিকে। বিভূতিরা দলে যে বিশেষ ভারি নয়, সেটা টের পাইয়া সকলের মধ্যেই অনেকটা সাহসের সঞ্চার হইয়াছিল। বাকি পাঁচ শ' ছ'শ লোকের মধ্যে তিন চার শ' স্ত্রীলোক আর্তনাদ করিতে লাগিল, বাকি সকলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল মজা।

মাঝে মাঝে শোনা যাইতে লাগিল ঃ 'মার শালাদের।' এই মহামন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া বাঙ্গালী দাঙ্গাহাঙ্গামা, মারামারি আরম্ভ করিতে পারে না।

জনতা যখন আক্রমণ করে, তখন দেরি হয় শুধু আরম্ভ করিতে, একজন যতক্ষণ আসল

ব্যাপারটা হাতেনাতে সুরু করিয়া না দেয়, ততক্ষণ চলিতে থাকে শুধু হৈ চৈ আস্ফালন। তবে এরকম অবস্থায় আরম্ভ হইতেও যে খুব বেশি দেরি হয় তা নয়, —দু'এক মিনিটের মধ্যেই কারোর না কারোর উত্তেজনা চরমে উঠিয়া যায়। ব্যাপার যে কি রকম গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বিভূতি আর তার সঙ্গীরা ভাল করিয়াই টের পাইয়াছিল। সকলে মিলিয়া আরম্ভ করিলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাদের ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। কিন্তু এখন আর উপায় কি? পালানোর চেষ্টা করিলে কয়েকজন বাঁচিয়া যাইতে পারে, কিন্তু পালানোর চেষ্টা তো আর করা চলে না। তার চেয়ে উন্মত্ত জনতার হাতে মরাই ভাল।

পালানোর চেষ্টা করা চলে না কেন? বিভূতির ভক্তবা সকলে কি মনে কবিবে! মানুষের নিন্দা-প্রশংসা সম্বন্ধে মহেশ চৌধুরীর দুর্বলতা দেখিয়া সেদিন সকালে বিভূতির লজ্জা আর দুঃখ হইয়াছিল, এখন সে চোখের পলকে বুঝিতে পারে, অনুগত যুবক-সমাজেব নিন্দা-প্রশংসার ভাবনাই তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে আড়ষ্ট কবিয়া দিয়াছে। যাদেব এত বড বড় কথা শুনাইয়াছে, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বুক ফুলাইয়া যাদের সঙ্গে করিযা এখানে নিয়া আসিয়াছে, এখন বিপদ দেখিয়া তাঁদের ফেলিয়া পালানোর কথা ভাবিতেই হাত পা অবশ হইয়া আসিতেছে। অথচ এ ভাবে মরণকে বরণ করা নিছক বোকামি। রেল লাইনে ট্রেনের সামনে দাঁড়াইয়া সাহস দেখানোর মত।

সদানন্দও নিমেষের মধ্যে ব্যাপারটা অনুমান করিতে পারিয়াছিল। দুহাত মেলিযা বিভূতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া সকলকে ঠেকানোর কল্পনাটা মনের মধ্যে আসিয়াই অন্য একটা কল্পনার তলে মিলাইয়া গেল। চোখের সামনে এমন একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটিতে যাইতেছে, অথচ এই অবস্থাতেও সদানন্দের মনে পড়িয়া গেল যে, এ জগতে মাধবীলতার একজনমাত্র মালিক আছে,' তার নাম বিভূতি। বিভূতির যদি কিছু হয, মাধবীলতার তবে কেউ আর কর্তা থাকিবে না। চিন্তাটা মনে আসিতে সদানন্দ একটু সবিয়া দাঁড়াইল।

এমন সময় ঘটিল আরেকটা কাণ্ড। হাতে আর মাথায় ব্যাণ্ডেজবাঁধা মহেশ চৌধুবী খোঁড়াতেই খোঁড়াইতে পাগলের মত আসিয়া হাজিব হইল। খানিকটা তফাৎ হইতেই সে প্রাণপণে চেঁচাইতে লাগিল, 'ওরে, রাখ্, রাখ্। ওরে বিভূতি রাখ্।'

সকলে স্তব্ধ হইয়া গেল। কতকটা বিস্ময়ে, কতকটা কৌতূহলে, কতকটা সহানুভূতিতে। বিভূতি প্রথমে সকলকে শুনাইয়া যা বলিয়াছিল. মহেশ চৌধূরীকে দেখিয়া সেই কথাগুলি সকলের মনে পড়িয়া গিয়াছে।

।। উনিশ ।

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা। তারপর আবার মারামারি আরম্ভ হইয়া গেল। এবার আবও জোরে। আসরে মহেশ চৌধুরীরও অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিল, তাদের রক্ত গরম হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, মহেশ চৌধুরী আর্তনাদের সুরে বিভূতিকে হাঙ্গামা থামাইতে অনুরোধ করে নাই, বিভূতিকে রক্ষা করার জন্য তার অনুগতদের কাছে আবেদন জানাইয়াছে। বাপের আর্তনাদ বিভূতির কানে পৌঁছায় নাই। গোলমালের জন্য নয়, সে তখন প্রায় সদানন্দের পায়ের কাছেই উদ্ভট ভঙ্গিতে পড়িয়া আছে, বাঁ হাতটা কব্জি ছাড়াও আরেক জায়গায় ভাঁজ হইয়া শরীরের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে আর ডান হাতটা টান হইয়া নিবেদনেব

ভঙ্গিতে আগাইয়া গিয়াছে সদানন্দের পায়ের দিকে। শরীরটা রক্তমাখা। তবে কোন কোন অঙ্গের নড়নচড়ন দেখিয়া বুঝা যায় তখনও মরে নাই। আরও অনেকে জখম হইয়াছে, সকলে তারা বিভূতির সঙ্গীও নয়, সদানন্দের মানরক্ষার জন্য তার যে সব উৎসাহী ভক্তেরা আগাইয়া আসিয়াছিল, তাদের মধ্যেও কয়েকজন অন্য উৎসাহী ভক্তের হাতে মার খাইয়াছে। মারামারির সময় হাতের কাছে যাকে পাওয়া যায় তাকেই দু'ঘা দিতে এমন হাত নিস্‌পিস্ করে।

শুধু হাতের মার নয়, গ্রামের লোকের পথ চলিতে লাঠির বড দরকার হয়।

মারামারির দ্বিতীয় খণ্ডটা পরিণত হইয়া গেল রীতিমত দাঙ্গায়, কেউ ঠেকাইতে পারিল না। অনেকে আগেই পালাতেই আরম্ভ করিয়াছিল, ব্যাপার এতদূর গড়াইবে না আশায় বুক বাঁধিয়া যারা অপেক্ষা করিতেছিল, এবার তারাও ছিটকাইয়া সরিয়া গেল। কেউ সটান পা বাড়াইয়া দিল বাড়ির দিকে, কেউ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল মজা। কেউ মাটির ঢেলা ইঁট পাটকেল, হাতের কাছে যা পাইল, দূর হইতে তাই ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল যুদ্ধক্ষেত্রে—একটু আগেও যেটা ছিল শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-কীর্তনের আসর। খানিক তফাতে একটা চ্যালাকাঠের স্তূপ ছিল, আট-দশজন লোক হঠাৎ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া দু'হাতে চ্যালাকাঠ ছুড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল— ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে নয়, একপাশে, সেখানে তখন সমবেত স্ত্রীলোকদের অর্ধেকের বেশি নিরুপায় আতঙ্কে কিচির মিচির সুরে আর্তনাদ করিতেছে। কোন অল্পবয়সী স্ত্রীলোক পুরুষ সঙ্গীর খোঁজে বিফলদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে প্রাণপণে চিৎকার করিতেছে বাবাগো মাগো বলিয়া, আর কোন বয়স্কা স্ত্রীলোক বসিয়া বসিয়াই মদুসূদনকে ডাকিতেছে। মেয়েদের অবস্থাই সবচেয়ে সঙ্গীন। আসরের চারিদিকে রাত্রি আর নির্জনতা, পালানোর উপায় নাই। কয়েকজন অবশ্য দাঙ্গার সূচনাতেই উন্মাদিনীর মত যেদিকে পারে ছুটিয়া পালাইয়াছে, সকলে সে রকম উদ্‌ভ্রান্ত সাহস কোথায় পাইবে? পুরুষ অভিভাবকরা আসিয়া অনেককে উদ্ধার করিয়া নিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন উদ্ধারের কাজটাও হইয়া দাঁড়াইয়াছে আরও কঠিন। নিজেদের সঙ্কীর্ণ সীমানাটুকুর মধ্যে অনেকে ভয়েব তাড়নায় কয়েকটি পলাতকা উন্মাদিনীর মতই দিশেহারা হইয়া এদিক ওদিক ছুটিতে আরম্ভ করায় নিজেদের মধ্যে নিজেরাই হারাইয়া গিয়াছে। তারপর আছে ছোট ছেলেমেয়ে। তারপর আছে ধাক্কা দেওয়ার, গা মাড়াইয়া দেওয়ার বচসা আর গালাগালি। যে দু' একজন অভিভাবক লজ্জা ভয় ভদ্রতা ছাড়িয়া একেবারে মেয়েদের মধ্যে আসিয়া খোঁজ করিতেছে, খোঁজ পাইয়া, দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, কাছে আনাইয়া সঙ্গে করিয়া পালাইতে তারও সময় লাগিতেছে অনেকটা।

এই অবস্থায় চ্যালাকাঠগুলি আসিয়া পড়িতে লাগিল তাদের গায়ে মাথায়।

কেউ থামানোর চেষ্টা না করিলেও দাঙ্গা আপনা হইতেই থামিয়া যায়। কোনটা তাড়াতাড়ি থামে, কোনটার জের চলে এখানে সেখানে ছাড়াছাড়া হাতাহাতিতে, পিছন হইতে মাথা ফাটানোর। এই দাঙ্গাটা থামাইয়া দিল বিপিন। আশ্রমে একটা লুকানো বন্দুক ছিল। বন্দুকের লাইসেন্স ছিল, তবু বন্দুকটা লুকানোই থাকিত। ছুটিয়া গিয়া বন্দুকটা আনিতে বিপিনের সময় লাগিল মিনিট পাঁচেক আর খানিকটা তফাতে দাঁড়াইয়া কয়েকবার আওয়াজ করিতে সময় লাগিল দু'মিনিট। শেষ মিনিটের আওয়াজ দরকার ছিল না, এ ধরণের শখেব দাঙ্গা থামাইতে এক মিনিটে যে কটা আওয়াজ করা যায় তাই যথেষ্ট।

দাঙ্গা থামার পরে হাঙ্গামার প্রথম বীভৎস আর বিশৃঙ্খল অবস্থাটাও শেষ হইয়া গেল অল্প সময়ের মধ্যেই। এ রকম হাঙ্গামার ডালপালা ছাঁটিয়া ফেলিতে সদানন্দের আশ্রমবাসী

শিষ্য-শিষ্যাদের পটুতা দেখা গেল অসাধারণ। পরিচালনার ভারটা নিতে হইল বিপিনকে, সদানন্দের কিছু করার ক্ষমতা ছিল না, সেও মার খাইয়াছে। মেয়েদের শান্ত করিয়া অভিভাবকদের সঙ্গে মিলন ঘটাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল এবং আহতদের প্রাথমিক শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হইল।

আধঘণ্টা পরে দেখা গেল আসরে আছে শুধু আশ্রমের লোক, আহত আর নিহতদের আত্মীয়স্বজন, আর আছে গহনার শোকে কাতর কয়েকজন নরনারী। মধ্যে যারা চ্যালা-কাঠ ছুড়িয়া মারিতেছিল, দাঙ্গার শেষের দিকে হঠাৎ সে কাজটা বন্ধ করিয়া মেয়েদের ভিড়ে ঢুকিয়া কয়েকজনের গলার হার, কানের মাকড়ি, হাতের চুড়ি ছিনাইয়া নিয়া তারা সরিয়া পড়িয়াছিল। সকলে পলাইতে পারে নাই, একটা চ্যালাকাঠ কুড়াইয়া নিয়া রত্নাবলী দু'জনের মাথা ফাটাইয়া দেওয়ায় তারা এখনও আহতদের সারির একপ্রান্তে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে।

আনকোরা নূতন আঘাতের রক্তমাখা চিহ্ন গায়ে নিয়া সদানন্দ, আর পুরানো আঘাতের ব্যাণ্ডেজবাঁধা চিহ্ন গাযে নিয়া মহেশ চৌধুরী, জড়ভরতের মত একরকম কাছাকাছিই বসিয়া আছে—বিভূতির গা ঘেঁষিয়া। দাঙ্গা শেষ হওয়ার একটু আগে অথবা সঙ্গে সঙ্গে অথবা একটু পরে বিভূতি মরিয়া গিয়াছে। এক মিনিট স্তব্ধতার আগের তিন মিনিট আর পরের সাত মিনিট, মোট দশ মিনিটের দাঙ্গায় মারা গিয়াছে চারজন। গুরুতর আঘাত পাইয়াছে সাতজন আর সাধারণভাবে আহত হইয়াছে সতেরোজন। আরও কয়েকজন আহত হইয়াছে সন্দেহ নাই, তবে তারা এখানে নাই, আগেই সরিয়া পড়িয়াছে। সদানন্দ আর মহেশ আহতদের প্রাথমিক সেবাশুশ্রূষার পর প্রাথমিক চিকিৎসার আয়োজন চাহিয়া দেখিতে থাকে, আর শুনিতে থাকে মরা ও আধমরা মানুষগুলিকে ঘিরিয়া বসিয়া মেয়েদের ডুকরানো কান্না আর পুরুষদের হায় হায় আপসোস। সদানন্দের মাথায় মৃদু ঝিমঝিমানির মধ্যেও মনে হয়, এতগুলি গলার কান্না আর আপসোসের শব্দ না থামা সত্ত্বেও আসরটা যেন বড় বেশি নিঃশব্দ হইয়া গিয়াছে—মানুষের ভিড়ে যখন গমগম করিতেছিল আর খোল করতালের সঙ্গে কীর্তন চলিতেছিল, তখনও আসরে যেন ঠিক এইরকম স্তব্ধতা নামিয়া আসিয়াছিল। মেয়েদের কান্না শুনিতে শুনিতে মহেশ চৌধুরীর মনে হয় অন্য কথা—এই শোকের ছড়াছড়ির মধ্যে বিভূতি যেন অন্যায়রকম ফাঁকিতে পড়িয়া গিয়াছে, তার জন্য শোক করিবার কেউ নাই!

অন্যায়টা শেষ পর্যন্ত তার বোধ হয় সহ্য হইল না, তাই মাঝরাত্রি পার হইয়া যাওয়ার অনেক পরে বিপিনকে ডাকিয়া বলিল, 'বাড়িতে একটা খবর পাঠাতে পার বিপিন?'

'পাঠাচ্ছি—সকালে পাঠালে ভাল হত না? এত রাত্রে মেয়েদের—'

'না, এখুনি খবরটা পাঠিয়ে দাও। মেয়েরা এসে একটু কাঁদুক।'

সদানন্দ এতক্ষণ বার বার শুশ্রূষা আর চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, এবার বিপিন অনুরোধ করিতেই রাজি হইয়া গেল এবং একজন শিষ্যের গায়ে ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নিজের তিন মহল আশ্রমের দিকে চলিয়া গেল। সঙ্গে গেল একজন শিষ্য। মনে হইল, এতক্ষণ অন্য সব আহতদের মত কেবল সাধারণ শুশ্রূষা আর চিকিৎসা পাওয়া যাইত বলিয়া, সে গ্রহণ করে নাই, এবার বিশেষ ব্যবস্থা করা সম্ভব হওয়ায় সকলের চোখের আড়ালে সেটা উপভোগ করিতে যাইতেছে।

এদিকে কয়েক মিনিট কাটিতে না কাটিতে মহেশের মনে হইতে লাগিল, বাড়ির মেয়েদের আসিতে বড় দেরি হইতেছে। তাই. আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া নিজেই সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল। মনে হইল, সদানন্দের সামনে ছেলের জন্য কাঁদিতে

এতক্ষণ তার যেন লজ্জা করিতেছিল, এবার সুযোগ পাওয়ায় প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বিভূতির মা, মাধবীলতা আর বাড়ির সকলে আসিল প্রায় শেষ রাত্রে। কিন্তু তেমনভাবে কেউ কাঁদিল না। মাধবীলতা একরকম হাঁ করিয়া বিভূতির দিকে চাহিয়া নিঃশব্দেই বাকি রাতটুকু কাবার করিয়া দিল। বিভূতির মা এত আস্তে কাঁদিতে লাগিল যে একটা কান ব্যাণ্ডেজে ঢাকা না থাকিলেও পাশে বসিয়া মহেশ চৌধুরী সব সময় তার কান্নার শব্দ শুনিতে পাইল না।

পুলিস আসিল সকালে।

পুলিসের লোকের কাছে একটা খবর পাওয়া গেল, ইতিমধ্যেই তারা তিনজনকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিয়াছে। তখন দাঙ্গার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল না। আশ্রমের পশ্চিম সীমানায় আশ্রমের যে ছোট ফুলের বাগানটি আছে, সেখানে পাঁচজন লোক কাল রাত্রে একটি এগার বছরের মেয়েকে নিয়া একটু আমোদ করিয়াছিল। তিনজন ধরা পড়িয়াছে দু'জন পলাতক।

'না, মরেনি, বেঁচে উঠবে বলেই তো মনে হয় মেয়েটা। তবে কি জানেন বিপিনবাবু–'

মহেশ চৌধুরী শুনিতেছিল, হঠাৎ তার মনে হইল দাঙ্গার চেয়ে এই মেয়েটির আলোচনাই সকলে যেন বেশি উপভোগ করিতেছে। দাঙ্গাহাঙ্গামা সামান্য ব্যাপার, জগতের কোথাও না কোথাও সর্বদাই যে কুরুক্ষেত্রীয় কাণ্ড চলিতেছে, তার তুলনায় দাঙ্গাহাঙ্গামার ক্ষুদ্রতা আর তুচ্ছতা শোচনীয়ভাবে লজ্জাকর। কিন্তু এগার বছরের একটি রক্তমাংসের বিন্দুতে তীব্র আর বীভৎস অস্বাভাবিকতার সিন্ধু খুঁজিয়া মেলে, রোমাঞ্চকর লজ্জা ভয় রাগ দ্বেষ আর অবাধ্য আবেগে স্নায়ুগুলি টান হইয়া যায়, কানে ভাসিয়া আসে লক্ষ কোটি পশুর গর্জন।

মহেশ চৌধুরী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া একচোখে চারিদিক চাহিতে থাকে। আহতদের অনেক আগেই ভাল আশ্রয়ে সরানো হইয়াছে, পড়িয়া আছে কেবল চারটি সাদা চাদর ঢাকা দেহ। এত বয়সে এত কাণ্ডের পর এ রকম আবেষ্টনীতে এমন অসময়ে একটা জানা কথা নূতন করিয়া জানিয়া নিজেকে তার বড় অসহায় মনে হইতে থাকে। চাপা দিলে সত্যই রোগ-সারে না, হিমালয় পাহাড়ের মত বিরাট স্তূপ সুগন্ধি ফুলের নীচে চাপা দিলেও নয়।

[লেখকের মন্তব্য ঃ মহেশ চৌধুরীর এই অস্পষ্ট আর অসমাপ্ত চিন্তাকে মহেশ চৌধুরীর চিন্তার শক্তি ও ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া স্পষ্টতর করিয়া তুলিতে গেলে অনেক বাজে বকিতে হইবে, সময়ও নষ্ট হইবে অনেক। আলপিন ফুটাইয়া খাঁড়ার পরিচয় দেওয়ার চেয়ে মন্তব্যের এই ভোঁতা ছুরি বেশি কাজে লাগিবে মনে হয়।

মোট কথা, মহেশ চৌধুরীব মনে হইয়াছে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ অনেকদিন হইতে রোগে ভুগিতেছে। মাঝে মাঝে দু'একজন মহাপুরুষ এবং সব সময় অনেক ছোটখাট মহাপুরুষ এই রোগ সারানোর চেষ্টা করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন, কিন্তু সে চেষ্টায় বিশেষ কোন ফল হয় নাই, এখনও হইতেছে না। কারণ, তাদের চেষ্টা শুধু ভালর আড়ালে মন্দকে চাপা দেওয়ার, কেবল দুধ ঘি খাওয়াইয়া রুগীকে স্বাস্থ্যবান করার।

মানুষের রোগের কারণ তারা জানে না, অর্থ বোঝে না, চিকিৎসার পথও খুঁজিয়া পায় না। তারা নিজেরাও রুগী। না হইয়া উপায় কী? মানুষ হইতে যে মানুষের জন্ম, মানুষের কাছ হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া যার আত্মসংগ্রহ, মানুষের যা আছে তা ছাড়া মানুষের যা নাই তা সে কোথায় পাইবে? উপাদানগুলি সেই এক, ভিন্ন ভিন্ন মানুষ শুধু নিজের মধ্যে ভিন্নভাবে

আত্মচিন্তার খিচুড়ি রাঁধে।

তাই মানুষের রোগের চিকিৎসার উপায় কেউ খুঁজিয়া পায় না, পাওয়া সম্ভবও নয়। তাই মানুষকে সুস্থ করার সমস্ত চেষ্টা গরীবকে স্বপ্নে বড়লোক করার চেষ্টার মত দাঁড়াইয়া যাইতেছে ব্যর্থ পরিহাসে।

জগতের কোটি কোটি অন্ধকে অন্ধের পথ দেখানোর চেষ্টার করুণ দিকটা মহেশ চৌধুরীকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে। হতাশায়, অবসাদে সমস্ত ভবিষ্যৎ তার অন্ধকার মনে হয়। কেহ খুঁজিয়া পাইবে না, মানুষের মুক্তির পথ কেউ খুঁজিয়া পাইবে না।

মনুষ্যত্বকে অতিক্রম করিয়া মানুষের নিজেকে জানিবার, নিজের আর বিশ্বের সমস্ত মানুষের মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাওয়ার, একটা উপায়ের কথা যে শাস্ত্রে লেখা আছে, মহেশ চৌধুরীও তা জানে, আমিও জানি। তবে, শুধু লেখা আছে, এইটুকুই আমরা দুজনে জানি।]

দাঙ্গাহাঙ্গামার জের চলিতে লাগিল, মহেশ চৌধুরীও বিষাদ ও অবসাদের ভারে জীর্ণশীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। মানুষের মুক্তি নাই, মানুষের ভাল নাই, এ কথা ভাবিলেই তার মনে হয় পৃথিবীশুদ্ধ আত্মভোলা লোক ভালমন্দে জড়ানো জীবন নিয়া মনের আনন্দে বাঁচিয়া আছে, সে-ই কেবল পশুর খাঁচায় আটক পড়িয়াছে। সকলে ভাবে পুত্রশোকে মহেশ কাতর, মহেশ ভাবে, পুত্রশোকে সে যদি সকলের মত রীতিমত কাতর হইতে পারিত! একটি মাত্র ছেলে, তার শোকেও আত্মহারা হইতে পারিতেছে না, এ কি ভয়ানক অবস্থা তার? শোক বাড়ানোর জন্যই মহেশ সর্বদা বিভূতির কথা ভাবিতে চেষ্টা করে, গৃহ কেমন শূন্য হইয়া গিয়াছে অনুভব করার চেষ্টা করে, বিভূতির স্মৃতিচিহ্নগুলি ঘাঁটাঘাঁটি করে, বারবার মাধবীলতার নূতন বেশের দিকে তাকায়।

কেবল শোক বাড়ানোর জন্য। অন্য কোন কারণে নয়।

মহেশ চৌধুরীর শোক দেখিয়া বাড়ির লোকের বুক ফাটিয়া যায়। বিভূতির মা মাথা নাড়িয়া বলে, 'ও আর বাঁচবে না। না বাঁচুক, আর বেঁচে কি হবে? ওর আগেই যেন আমি যেতে পারি, হে মা কালী, ওর আগেই যেন—তোর মত বেশ যেন আমায় ধরতে না হয় রাক্ষসী।'

মাধবীলতার শোকটা তেমন জোরালো মনে হয় না। তাকে কেবল একটু বেশিরকম রুক্ষ দেখায়,—তেল মাখিয়া স্নান না করার রুক্ষতা নয়, ভিতর হইতে রস শুকাইয়া যাইতে থাকিলে যেমন হয়।

অনেক ভাবিয়া একদিন সে মহেশ চৌধুরীর সামনে জোড়াসন করিয়া বসে, আগে মাথার ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া বলে, 'ওই লোকটাই খুন করেছে বাবা।'

'স্বামীজি?'

'ওই লোকটা' বলিতে মাধবীলতা যে কাকে বুঝাইতেছে, অনুমান করিতে মহেশের দ্বিধা পর্যন্ত করিতে হয় না।

'হ্যাঁ।'

'তুমি জানলে কি করে, তুমি যাও নি!'

'লোকের কাছে শুনেছি। আপনিও তো জানেন। ওই তো সকলকে ক্ষেপিয়ে দিল, সকলকে ডেকে খুন করতে বলল—'

'খুন করতে বলেন নি, বলেছিলেন—'

মাধবীলতা অসহিষ্ণু হইয়া বলে, 'তার মানেই তো তাই। এ লোকটা আমায় অপমান করেছে, তোমরা চুপ করে সহ্য করবে—ও কথা ব'লে সকলকে ক্ষেপিয়ে দেওয়ার আর কি মানে হয়? কি অপমান করেছে সবাই তো দেখতে পাচ্ছিল, শুনতে পাচ্ছিল? কেউ তখন আর মারতে ওঠেনি কেন, যেই সকলকে ডাকল তখনি সবাই এসে একজনকে মারতে আরম্ভ করল কেন?'

মহেশ চৌধুরী ধীরভাবে বলে, 'উনি হয়ত ওকে শুধু আসর থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য সবাইকে ডেকেছিলেন।'

মাধবীলতা আরও ব্যাকুল হইয়া বলে, 'না না, আপনি বুঝতে পারছেন না। আশ্রমের লোকেরা তাড়াতে পারত না?'

'দল নিয়ে গিয়েছিল যে?'

অগত্যা মাধবীলতাকে ধৈর্য ধরিতে হয়, শান্ত হইতে হয়। সব কথা বুঝাইয়া না বলিলে মহেশ চৌধুরী বুঝিতে পারিবে না, এমন ভাল মানুষ কেন যে সংসারে জন্মায়।

'তা নয়, দলে আর ক'জন ছিল? ওকে খুন করাই ওই লোকটার উদ্দেশ্য ছিল। জেলে দেবার জন্যে পুলিস লেলিয়ে দিয়েছিল মনে নেই? জেলে পাঠালে আমার পেছনে লাগার সুবিধে হত। জেলে পাঠাতে পারল না, তাই একেবার মেরে ফেলল।'

এবার মহেশ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকে। একজন স্ত্রীলোককে পাওয়ার লোভে তার স্বামীকে হত্যা করা দুর্বোধ্য ব্যাপার নয়, তবু যেন মহেশ কিছুই বুঝিতে পারিল না। ও রকম হত্যাকাণ্ডগুলি অন্যভাবে হয়। বিভূতিকে সদানন্দ ডাকিয়া পাঠায় নাই, বিভূতি যে আসরে যাইবে, তাও সদানন্দ জানিত না। বিভূতি নিজে হইতে গিয়া হাঙ্গামা আরম্ভ করিয়াছিল। এ রকম অবস্থায় সদানন্দের সম্বন্ধে এমন একটা ভয়ানক কথা অনুমান করা চলে কেমন করিয়া?

মহেশের মুখ দেখিয়া মাধবীলতার শরীর রাগে রি রি করিতে থাকে। এমন অপদার্থ হাবাগোবা ভাল মানুষও পৃথিবীতে জন্মায়!

'বুঝতে পারছেন না? আমার বিয়ে হবার পর থেকে দিনরাত ভাবত ওকে কি করে সরানো যায়, সেদিন সুযোগ পাওয়ামাত্র—যেই বুঝতে পারল যে সবাইকে ক্ষেপিয়া দিলেই সকলে মিলে ওঁকে মেরে ফেলবে, অমনি সকলকে ক্ষেপিয়ে দিল।'

'তা বটে, সুযোগ পাওয়ামাত্র সুযোগের সদ্ব্যবহার করা সদানন্দের পক্ষে অসম্ভব নয়।'

মাথা হেঁট করিয়া মহেশ চুপ করিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবে আর মাধবীলতা ক্ষুব্ধদৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া থাকে। এই সহজ কথাটা কেন যে মানুষ বুঝিতে পারে না। বিভূতিকে বাঁচাইতে দু'হাত বাড়াইয়া আগাইবার উপক্রম করিতে গিয়া হঠাৎ যে চিন্তা মনে আসায় সদানন্দ পিছাইয়া গিয়াছিল, মাধবীলতা সেই চিন্তাকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া সদানন্দের জীবনের দিনে, মাসে, বৎসরে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে। সদানন্দ এই কথাই সর্বদা চিন্তা করিত, কি করিয়া বিভূতিকে মারিয়া মাধবীলতাকে লাভ করা যায়। মাধবীলতাকে পাওয়ার চিন্তা ছাড়া সদানন্দের কি অন্য চিন্তা থাকিতে পারে?

।। কুড়ি ।।

প্রথমটা একটু উত্তেজিত হইয়াছিল, তারপর কিন্তু মহেশ চৌধুরী অস্বাভাবিকরকম শান্ত হইয়া

পড়িল। একেবারে শান্তির প্রতিমূর্তি। মুহূর্তের জন্যও তার মুখের চামড়া কুঁচকায় না, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত হয় না, কথায় আলো প্রকাশ পায় না। আরও বেশি আস্তে চলাফেরা করে, আরও বেশি ধীরতার সঙ্গে বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজনগুলি নিখুঁতভাবে পালন করিয়া যায়।

মাধবীলতা দাঁতে দাঁত কামড়ায়।—'আপনি কিছুই করবেন না?'

'করব।'

'কি করবেন?'

'কি করব তাই ভাবছি মা।'

মাধবীলতা রাগে পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে থাকে।—'আপনার কিছু করা উচিত কিনা, তাও ভাবছেন বোধ হয়?'

মহেশ চৌধুরীর স্পষ্ট, মৃদু ও একটানা আলাপ করার সুর বদলায় না! 'ভাবছি বৈকি। সব কথা না ভেবে কিছু করতে আছে? সব কথা ভাবছ না বলেই সদানন্দের দোষের কথা ভেবে তুমি অস্থির হয়ে পড়েছ।'

আগে কোনদিন মহেশ চৌধুরী সদানন্দকে সদানন্দ বলে নাই। সে অনায়াসে নামটা উচ্চারণ করিয়া গেল ; খাপছাড়া শোনাইল মাধবীলতার কানে—সে নিজেই মহেশ চৌধুরীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে যে, ও নামটা খুনীর।

'স্বামীজির দোষ আছে বলেই—'

'দোষ তো তোমারও থাকতে পারে মা?'

মাধবীলতা বড় দমিয়া গেল, মুখখানা হইয়া গেল ফ্যাকাশে। মহেশ চৌধুরী কেন তাকেও দোষী করিতেছে, অনুমান করা কঠিন নয়। এ দিকটা আগে সে ভাবিয়া দ্যাখে নাই।

'তুমি আগেও ভাবতে সদানন্দ তোমার জন্য এমন পাগল যে. বিভূতিকে খুন পর্যন্ত কবতে পারে। তাই এত সহজে সদানন্দকে দোষী ভেবে নিয়ে অস্থির হয়ে পড়েছ যে—একবার একটু সন্দেহও জাগে নি। তোমার কোন দোষ না থাকলে এ সব কথা ভাবতে কেন?'

'আমি—'

'তোমার কি দোষ তুমি জান না?' অতি ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া মহেশ চৌধুরী যেন তার সেই অক্ষমতাকে সমর্থনই করে, 'সেইখানে তো মুস্কিল বাছা। নিজের দোষ যদি আমরা জানতে পারতাম, তবে আর ভাবনা ছিল কি। আমি কি আমার দোষ জানি?'

মাধবীলতা বড় দমিয়া যায়। কি ভাবিতেছে মহেশ চৌধুরী? কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। কি ধারণা জাগিয়াছে তার সম্বন্ধে তার মৃত স্বামীর পিতার মনে? কি সন্দেহ করিয়াছে এই হাবাগোবা ভালমানুষটি,—মাঝে মাঝে যাকে মারাত্মক রকমে চালাক মনে হয়? তার ছেলের বৌকে পাওয়ার লোভে সদানন্দ ইচ্ছা করিয়া তার ছেলেকে হত্যা করিয়াছে শুনিয়াও মহেশ চৌধুরীর অবিচলিত ভাব দেখিয়া মাধবীলতার আর রাগ করিবার সাহস হয় না। তা ছাড়া, এতক্ষণে তার মনে হইতে থাকে যে, মহেশ চৌধুরীর করিবার বা কি আছে, সে কি করিতে পারে? প্রথম মনে হইয়াছিল, মহেশ চৌধুরী আসল ব্যাপারটা অনুমান করিতে পারিলেই বুঝি সদানন্দের শাস্তির আর সীমা থাকিবে না। এখন মাধবীলতা ভাবিয়া পায় না, এমন একটা বিশ্বাস তার কেন জাগিয়াছিল। প্রতিহিংসা নেওয়ার মানুষ চৌধুরী নয়, সে ক্ষমতাও তার নাই।

দাঙ্গার ফলে আর কিছু না হোক আশ্রমের নাম আরও বেশি ছড়াইয়া গিয়াছে। কেবল

কাছাকাছি গ্রাম আর সহরের মানুষের মধ্যেই ব্যাপারটা নিয়া হৈ হৈ হয় নাই, খবরের কাগজেও বিস্তারিত বিবরণ বাহির হইয়াছে। দাঙ্গার বিবরণ শুধু নয়, আশ্রম সম্পর্কেও অনেক কথা প্রকাশিত হইয়াছে। একটি কাগজে লেখা হইয়াছে ঃ এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক শ্রীশ্রীসদানন্দ স্বামী দীর্ঘকাল তপস্যার পর জনসেবাই সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া জানিয়া রোগশোকদারিদ্র্যনিপীড়িত নরনারীর কল্যাণের জন্য ইত্যাদি। সকল মহৎ কর্মের বিরোধিতা করাই এক শ্রেণীর লোকের প্রকৃতি, এইরূপ একদল লোক অন্যভাবে আশ্রমের ক্ষতি করিতে অসমর্থ হইয়া আক্রোশের বশে আশ্রমের বাৎসরিক প্রতিষ্ঠা-উৎসবের দিন গুণ্ডা ভাড়া করা ইত্যাদি। এই বিবরণ যে কাগজে বাহির হইয়াছিল, মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে সেই কাগজটিই রাখা হয়। বাড়িতে খবরের কাগজটি আসামাত্র সকলের আগে মাধবীলতা সেটিকে দখল করে। দাঙ্গাহাঙ্গামার কোন বিবরণ তার অজানা নয়, ব্যাপারটার জের কি দাঁড়াইতেছে, তাও খবরের কাগজে বাহির হওয়ার কয়েকদিন আগেই তার কানে আসে, তবু খবরের কাগজে সংক্ষিপ্ত আর ভুল বিবরণ পড়িবার জন্য সে ছটফট করিতে থাকে। সদানন্দ, তার আশ্রম ও দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্বন্ধে অভিনব টীকা পড়িয়াই কাগজটি হাতে করিয়া সে মহেশ চৌধুরীর কাছে ছুটিয়া যায়।

'দেখছেন কি আরম্ভ করেছে ওরা? পড়ে দেখুন।'

মহেশ ধীরে ধীরে আগাগোড়া পড়িয়া বলে, 'সদানন্দের তপস্যা আর আশ্রমের উদ্দেশ্যের কথা সত্য, গুণ্ডা ভাড়া করার কথাটা সত্য নয়।'

মাধবীলতা বোমার মত ফাটিয়া যায়, 'একটা কথাও সত্যিই নয়। ও লোকটা কত খারাপ আপনি জানেন না, যে সব কাণ্ড চলে—'

মহেশ বলে, 'জানি মা, সব জানি। সদানন্দ অনেক সাধনা করেছে, তবে কি জান মা, সাধকেরও পতন হয়। সদানন্দ লোক ভাল। আশ্রমটাও বড় উদ্দেশ্য নিয়েই স্থাপন করা হয়েছিল, তবে ঠিক সেভাবে কাজ হয় নি। মানুষের ভুল ত্রুটি হয় কিনা, বুঝবার দোষ হয় কিনা নানারকম—'

মাধবীলতা অবাক হইয়া শুনিয়া যায়। সদানন্দ লোক ভাল? আশ্রমের উদ্দেশ্য মহৎ? এত কাণ্ডের পর মহেশ চৌধুরীও যে এমন কথা বলিতে পারে, কানে শুনিয়াও মাধবীলতার যেন বিশ্বাস হইতে চায় না। হঠাৎ তার মনে হয়, লোকটি বোধ হয় পাগল। প্রত্যেক উন্মাদের মত নিজের একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়া সেখানে সে বাস করিতেছে আর বাস্তব জগতের অর্থ স্থির করিতেছে তার নিজের খাপছাড়া জগতের নিয়মে।

'কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মাধবীলতা অভিভূতের মত বলে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে?'

·

মহেশ চৌধুরী একদিন আশ্রমে গেল। বিপিনের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, 'বিভূতির দোষে এতগুলি লোক জেলে যাবে বিপিনবাবু?'

'ওরাও তো মারামারি করেছিল।'

'তা করেছিল, কিন্তু দোষ তো ওদের নয়। বিভূতি হাঙ্গামা না বাধালে কিছুই হ'ত না।''

বিপিন চুপ করিয়া মহেশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। কয়েক মুহূর্তের জন্য তারও মনে হয়, লোকটা কি পাগল? দাঙ্গা করার জন্য পুলিশ যাদের ধরিয়াছে, বিভূতিকে নিজের হাতে মারিয়াছিল এমন লোকও যাদের মধ্যে আছে, তারা শাস্তি পাইবে বলিয়া এই মানুষটার দুর্ভাবনা!

সেদিন সকালেই বিপিন আর সদানন্দের মধ্যে পরামর্শ হইয়াছিল, আদালতে প্রমাণ করিতে হইবে দাঙ্গাহাঙ্গামার দায়িত্বটা ছিল বিভূতির। কিছু দিন আগে একটি আশ্রম স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে মহেশ চৌধুরী সদানন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়া তার বাড়িতে নিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কোন ভাল উদ্দেশ্যের পরিবর্তে বড় আশ্রমটির ক্ষতি করিবার জন্য একটি বিরোধী আশ্রম স্থাপন করাই মহেশ চৌধুরী আসল উদ্দেশ্য, ইহা টের পাইয়া সদানন্দ চলিয়া আসিয়াছিল। বাপের অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধগ্রহণের জন্য বিভূতি এই হাঙ্গামা বাধায়। মহেশ চৌধুরীকেও দাঙ্গাহাঙ্গামার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জড়াইয়া কিছুদিনের জন্য জেলে পাঠানোর চেষ্টা করার ইচ্ছা সদানন্দের ছিল, বিপিন কোনমতেই রাজি হয় নাই। মহেশ চৌধুরীর সম্বন্ধে বিপিনের মনের ভাব ক্রমে ক্রমে বদলাইয়া যাইতেছিল।

বিকৃত সত্য বলিয়া জানিয়া যে আদালতে প্রমাণ করার জন্য সদানন্দের সঙ্গে গোপনে চক্রান্ত করিতেছিল, মহেশ চৌধুরী নিজে আসিয়া তাই সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, সব দোষ ছিল তার ছেলের! বিভূতিকে দোষী প্রমাণ করার উদ্দেশ্য তাদের ছিল স্বার্থরক্ষা, বিভূতির দোষে কতকগুলি লোক জেলে যাইবে বলিয়া মহেশ চৌধুরীর হইতেছে আপসোস!

'কিছু করা যায় না?'

'কি করা যাবে বলুন?'

'বিভূতির দোষটা আদালতে প্রমাণ করলে—?'

বিপিন ভাবিয়া বলিল, 'তাতে অন্য সবাই ছাড়া পাবে না, তবে শাস্তিটা কম হতে পারে।'

মহেশ বলিল, 'তাই হোক। তা ছাড়া যখন উপায় নেই, কি আর করা যাবে।'

সদানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যা ঠিক হইয়াছিল, সেটা মনে মনে বাতিল করিয়া দিয়া বিপিন বলিল, 'আদালতে কি বলবেন?'

'যা সত্য তাই বলব, আর কি বলব?'

যা সত্য আদালতে তাই বলা হইবে স্থির হইলেও, কি বলা হইবে, সে বিষয়ে পরমার্শ করাব প্রয়োজন দেখা গেল। সকলে সত্য কথা বলিলেও সত্যের খুঁটিনাটিগুলি ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখে এমন পরস্পরবিরোধী হইয়া দাঁড়ায়! আদালতে দাঁড়াইয়া মহেশ চৌধুরী ধীর স্থির শান্তভাবে বলিয়া গেল, বিভূতি কেমন একগুঁয়ে ছিল, মেজাজটা তার কি রকম গরম ছিল, আগে একবার সে একটা ছোটখাট হাঙ্গামা সৃষ্টি করিবার ফলে মহেশ কি ভাবে কয়েকজনের হাতে মার খাইয়াছিল এবং বাপকে যাবা মারিয়াছিল তাদের শাস্তি দিবার জন্য কীর্তনের আসরে গিয়া সে কি ভাবে হাঙ্গামার সৃষ্টি করিযাছিল। এই প্রসঙ্গে ছেলের চরিত্রের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টাও করিল যে কর্তব্যজ্ঞান, নিষ্ঠা, তেজ, সাহস, এ সব মানুষের যতই থাক, ভাল মন্দ, উচিত অনুচিত, ন্যায় অন্যায় বিচার করিবার ক্ষমতা না থাকিলে ও সব কোন কাজেই লাগে না।

অনেকে হতভম্বের মত শুনিয়া গেল, কেউ ভাবিল মহেশ চৌধুরীর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, কয়েকজন সকৌতুকে হাসিতেও লাগিল।

বিভূতির মা বলিল, 'আদালতে দশ জনের কাছে তুমি আমার ছেলের নিন্দে করে এলে! এবার আমি গলায় দড়ি দেব। আমি অনেক সয়েছি, আর সইব না!' বলিয়া মাথা কুটিতে লাগিল।

মাধবীলতা বলিল, 'আপনার মনে এই ছিল! আমিও গলায় দড়ি দেব।' বলিয়া হু হু করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

মহেশ চৌধুরী তাদের বুঝাইয়া শান্ত করিবার কোন চেষ্টা করিল না, এতটুকু বিব্রত হইয়াছে বলিয়াও মনে হইল না।

অপরাহ্ণে বিপিন আসিল। মহেশ বলিল, 'এসো বিপিন।'

বিপিন যেন হঠাৎ তার স্নেহের পাত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সম্বোধনের তারতম্যটা বিপিনও খেয়াল করিল কিনা সন্দেহ, শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষের মত সামনে বসিয়া পড়িয়া পরমাত্মীয়ের মতই বিনা ভূমিকায় বলিল, 'কিছু ভাল লাগছে না।'

মহেশ সায় দিয়া বলিল, 'অনেকদিন থেকেই তো তোমার মন খারাপ।'

ছোট ছেলে যেমন সহানুভূতির প্রত্যাশায় গুরুজনকে দুঃখ জানায়, তেমনিভাবে বিপিন বলিল, 'আশ্রম নিয়ে আমি পাগল হয়ে গেলাম চৌধুরীমশায়। যা ভেবেছিলাম তা তো কিছু হলই না, একটার পর একটা হাঙ্গামাই বাধছে। কত বড় উদ্দেশ্য নিয়ে কি রকম আশ্রমের গোড়াপত্তন করেছিলাম, দিন দিন কি দাঁড়াচ্ছে আশ্রমটা! এত চেষ্টা করছি, কিছুতেই গোল্লায় যাওয়া ঠেকাতে পারছি না।'

মহেশ বলিল, 'কেন, তুমি তো আশ্রমের টাকা আর সম্পত্তি বাড়াবার চেষ্টা করেছিলে তা তো বেড়েছে? নাম ছড়াবার চেষ্টা করেছিল, তাও তো ছড়িয়েছে?'

বিপিন বলিল, 'কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আশ্রম করেছিলাম, তার যে কিছুই হচ্ছে না, বরং উল্টো ফল হচ্ছে।'

মহেশ বলিল, 'সে দোষটা তোমার।'

বিপিন আহত হইয়া বলিল, 'আমার দোষ? আমার কি দোষ?'

মহেশ বিপিনকে তার দোষগুলি বুঝাইয়া দিতে আরম্ভ করে। আগে বিপিন রাগ করিত, আজ নিঃশব্দে শুনিয়া যায়। মহেশের কথা শেষ হওয়ার আগেই তার মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া যায়, 'আপনাকে যদি আশ্রমে পেতাম।'

'পাবে।'

'আপনি আশ্রমে যোগ দেবেন?'

'দেব। ক'দিন আগেই ঠিক করেছি, আশ্রমের ভারটা আমিই নেব। মন দুর্বল কিনা, তাই ভাবছিলাম, ধীরেসুস্থে ক'দিন পরে আশ্রমে যাব। কিন্তু ঠিক যখন করে ফেলেছি, অনর্থক দেরি করে লাভ কি, কি বল?'

বিপিন অভিভূতের মত বলিল, 'নিশ্চয়।'

মহেশ বলিল, 'চলো তবে আজকেই যাই।'

বিপিন ভয়ে ভয়ে বলিল, 'কিন্তু সদানন্দের বিষয়ে কি করা যাবে?'

মহেশ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'সদানন্দ আর মাধবীলতাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিলেই চলবে।'

সদানন্দ আর মাধবীলতাকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থার অর্থ বিপিন একরকম বুঝিয়াছিল। সদানন্দকে আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলা হইবে এবং মাধবীলতাকে মহেশের কোন আত্মীয়ের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। মাধবীলতাকে অন্য কোথাও পাঠাইয়া দিবার অর্থটা সে ঠিক বুঝিতে পারে নাই। মহেশের আশ্রমে যোগদানের সঙ্গে সদানন্দকে সরাইয়া দেওয়ার প্রশ্ন জাগিতে পারে, মাধবীলতাকে সরাইয়া দিবার প্রয়োজন কি, কারণ কি? মহেশ যে দু'জনকে একসঙ্গে সরাইয়া দিবার মতলব করিয়াছে, বিপিন সেটা কল্পনাও

করিতে পারে নাই।

সদানন্দ অথবা মাধবীলতাও কল্পনা করিতে পারে নাই।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় মাধবীলতাকে সঙ্গে লইয়া মহেশ চৌধুরী আশ্রমে আসিল, তার কিছুক্ষণের মধ্যেই তার আসল উদ্দেশ্যটা তিনজনের কাছেই পরিষ্কার হইয়া গেল। মাঝরাত্রে আশ্রমের পিছনের ঘাটে বাঁধা নৌকায় উঠিয়া সদানন্দ আর মাধবীলতা চলিয়া গেল। মাধবীলতা প্রথম দিন রাত্রে আশ্রমে আসিবার সময় নৌকা হইতে এই ঘাটেই নামিয়াছিল।

নৌকা চলিয়া গেলে মহেশ বলিল, 'আমরা সবাই মিলে এবার আশ্রমটা গড়ে তুলব বিপিন।'

দর্পণ

রম্ভা ছিল ঝুমুরিয়া গাঁয়ে। রামপাল কলকাতায়।

রম্ভা ঝুমুরিয়ার বীরেশ্বর মাইতির মেয়ে। বাড়ন্ত মেয়ে, অতি বাড়ন্ত। তার ভাইদের সকলেরই লম্বা চওড়া জবরদস্ত চেহারা, কেবল ছোটজন ছাড়া। জন্মেই নিজের মাকে খাওয়ায় সে মায়ের দুধ পায়নি। সকলের মতে বেচারীর কৃশ আর খর্ব হওয়ার কারণ তাই। রম্ভা কিন্তু বলে যে তা নয়, এটা বেশী আদর খেয়ে পেটরোগা হবার পরিণাম।

রম্ভা বাপ-মার এক মেয়ে। আদর সেও কিছু কম পায়নি। তাতে স্বভাব যদি তার বিগড়ে গিয়ে থাকে, দেহের কিছু হয়নি! গোড়ায় সে লম্বা হয়েছে বাঁশের মত, তারপর পুষ্ট হয়েছে বর্ষার কলাগাছের মত। কলাগাছের মত আগাগোড়া সর্বাঙ্গে সমানভাবে নয়, লঘু গুরুত্বের মেয়েলি ছাঁদটা বজায় রেখে। যেমন, তার কাঁকাল যেন মোটেই মোটা হয়নি, দশ এগার বছর বয়সে যেমন ছিল তেমনি সরু থেকে গেছে। ঈষৎ অনুজ্জ্বল মোলায়েম বাদামী রঙের এই প্রতিমার ধাঁচে গড়া দেহটির জন্য তার অহঙ্কার কতখানি হয়েছে জানা যায় না, কারণ ছেলেবেলা থেকেই বড় সে রাগী আর তেজী। রূপের গর্ব যদি তার জন্মে থাকে বড় হয়ে, তেজের সঙ্গে মিশে সেটাকেই তা আরও জোরালো করেছে: এ স্বভাবটা সে পেয়েছে তার বাপের কাছে। বদমেজাজ আর জিদের জন্য বীরেশ্বরের এ অঞ্চলে রীতিমত খ্যাতি আছে। মেয়ের বাড়াবাড়ি অবশ্য মাঝে মাঝে বীরেশ্বরের মেজাজে আগুন ধরিয়ে দেয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তর্জনগর্জনের তাপটুকুই শুধু রম্ভার গায়ে লাগে, আর কোন শাস্তি সে পায় না। শাসনের ব্যবস্থা আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যায়। কারণ, মেয়ের স্বভাবের এই গুরুতর তেজস্বিতার দোষের জন্যই নিজের অজান্তে বীরেশ্বর তাকে বড় পছন্দ করে।

বিয়ের বয়স রম্ভার পার হয়ে গেছে, ভালমত পাত্র জোটেনি। চাষীর ঘরের পক্ষে তার বেমানান ও নিন্দনীয় রূপ যৌবনটা অবশ্য তার বড় কারণ নয়। ঘরে ঘরে না থাক, এমন অনেক রূপসী মেয়ে আছে অনেক চাষীর ঘরে, চাষী সমাজে যাকে ভাল পাত্র বলা চলে সেরকম পাত্রেরও তাদের অভাব ঘটেনি। বীরেশ্বরের প্রকৃতি আর ছন্দ ওসব লোকের মত হলে কবেই হয়তো রম্ভারও বিয়ে হয়ে যেত। কিন্তু কতকগুলি বিচিত্র মানুষ ও ঘটনার সংস্পর্শে বীরেশ্বর জীবনে কতকগুলি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। চেতনার যে পরম রসায়ন সকল বিরোধী শক্তির সঙ্গে হার মানার আপোষ করে কোনমতে বেঁচে থাকার সন্তোষ নষ্ট করে দেয় তারই ছিঁটেফোঁটা সঞ্চারিত হয়েছে তার শোণিতে। তাই রক্তের যে উষ্ণতা তাকে সাধারণ নিয়মে নিছক একজন হিংস্র প্রকৃতির কলহপ্রবণ দাঙ্গাবাজ মানুষে পরিণত করে দিত সেই উষ্ণতা আগুন হতে শিখেছে তার মনের অনুমতি নিয়ে, মন যখন সায় দিয়েছে যে না, এ অন্যায় সত্যই সহ্য করা যায় না। ভালমন্দ পছন্দ-অপছন্দের একটা বিচারবুদ্ধি আছে বীরেশ্বরের, যা প্রায় বিদ্রোহী দৃষ্টিভঙ্গির সামিল, অবশ্য চাষাড়ে পর্যায়ের।

গাঁয়ের প্রধান, বামুন আর জাতভাইরা মেয়ের জন্য তাকে জাতে ঠেলবার চেষ্টা করে, সে একরকম ব্যক্তিগত জোরজবরদস্তিতে সে চেষ্টা বাতিল করে দেয়।

বলে, 'জাতের বদলে সবাইকে না পারি, দু'একটাকে ফাঁসাবই তোমাদের, মা কালীর দিব্যি। ফাঁসি যেতে হবে? যাবো!'

একবার সে দাঙ্গা করে খুনের দায়ে জেলে যেতে বসেছিল, ঘটনাচক্রে দু'বছর জেল খেটেই রেহাই পায়। আরও কয়েকবার স্বদেশী বাবুদের সংসর্গ দোষের জন্য পুলিশ তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এসব সকলের মনে আছে। বয়স বাড়লেও স্বভাব তার শুধরেছে কিনা সন্দেহ। জাত মারলে ঠিক কাকে সে ফাঁসাবে তাও ঠিক নেই। সমাজ তাই

ক্তিগতভাবে ভয় পেয়ে ভাবে, আর কিছুদিন যাক।

তবে গায়ের জোর আর বেপরোয়া জিদ ছাড়া কি আর আছে বীরেশ্বরের যে সকলকে চিরকাল ভয় দেখিয়ে কাবু করে রাখবে? সে রাজাও নয়, ধনীও নয়, পুলিশও নয়। কাজেই জাত তার শেষে যায় যায় হল। সাতাইবুনীর লক্ষ্মণ বা পাঁচনিখের কেষ্ট দাসের সঙ্গে রম্ভার বিয়ে দেওয়া অথবা জাত ছাড়া—এ ছাড়া আর পথ রইল না।

রম্ভার বড় ভাই শ্যামলাল, তার বৌয়ের নাম সুরবালা। তাকে রম্ভা জানিয়ে দিল, 'আনো ওদের যেটাকে খুসী, শোন বলি কিন্তু। বিয়ের রাতে খুঁজে পাবে না আমাকে। না পালাই তো বিয়ের আসরে খাড়া লাথি মারব মুখপোড়ার মুখে।'

সুরবালা চোখ কপালে তুলে বলল, 'কেন লো মদ্দামাগী? কেষ্টর রঙ তো ফর্সা বেশ?'

'ফর্সা নাকি? তা তুমি এনে পিরীত কোরো, আমি ওতে নেই।'

সুরবালা তখন তামাশা করে বলে, 'সূয্যিবাবুকে বিয়ে করবি?'

তার তামাশায় রম্ভা হাসে না, তামাশা করে না। হঠাৎ নিরীহ শান্ত বনে গিয়ে চোখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলে, 'হাঁ।'

সুরবালা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। রম্ভা তামাশা করছে না এটুকু টের পেয়েই সে অবাক হয়। ভাবে একি উদ্ভট পছন্দ বাবা মেয়ের! বিশ বাইশ বছরের রোগা হ্যাংলা এক ছোকরা, চালচুলো নেই বললেই চলে, গাঁয়ের বাইরে যাওয়ার হুকুম যার নেই, রোজ যাকে পাঁচনিখে থানায় হাজিরা দিতে হয় আর দাগী চোরের মত ঘরে আছে কিনা জানতে চৌকিদার কানাই গভীর রাতে নাম ধরে হাঁক দিয়ে যায়, তাকে মনে ধরেছে রম্ভার এত বর থাকতে। যেমন পাগল তার শ্বশুর, তেমনি পাগল তার এ মেয়ে।

রাত্রে চুপি চুপি শ্যামলালকে কথাটা সে জানিয়ে দেয়। শ্যামলাল শুনে ক্রুদ্ধ ও উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, 'বাড়ী ঢুকতে দেয়া উচিত নয় ছোঁড়াকে। বাবা যে কি দেখেছে ছোঁড়ার মধ্যে, হাঁ করে বসে গিলবে কথাগুলো। গুরু ঠাকুর এয়েছেন যেন, খাতির কত!'

'মেয়েব বাপ নয় গো খালি, মেয়েও কথা গেলেন হাঁ করে! অ্যাদ্দিন কি টের পেয়েছি ছুঁড়ির মনে কি আছে!'

কথাটা নিয়ে বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে ক'দিন গুঞ্জন চলে—রম্ভা ছাড়া। বীরেশ্বরের মেজ ছেলে জীবনলালের বৌ মায়া অন্য সকলের সামনে গম্ভীর মুখে বলে, 'মাগো! একি কাণ্ড?'—তারপর রম্ভাকে একা পেয়ে একগাল হেসে শুধোয়, 'আমায় কেন বলিসনি অ্যাদ্দিন? বল ভাই সব, বলতে হবে।'

অ্যাদ্দিন বলার কি ছিল রম্ভা ভেবে পায় না। সূর্যকে বিয়ে করতে তার আপত্তি নেই এর চেয়ে বেশী কি বলার আছে তাও সে ভেবে পায় না।

পুরুষেরা নিজেদের মধ্যে কথাটা একটু নাড়াচাড়া করেই চুপ করে যায়। শ্যামলাল একবার সূর্য সম্পর্কে বাবাকে সর্তক করতে গিয়ে এত বয়সে এমন প্রচণ্ড ধমক খেয়েছিল, যা প্রায় গালের সামিল। বীরেশ্বরের কাছে আবার এ বিষয়ে কথা তোলার সাহস কারো ছিল না।

বর্ষায় ঝুমুরিয়া ও ঝুমুরিয়ার চারিদিক কাদায় কাদাময় হয়ে যায়। লোনা জলের বন্যাও আসে কোন কোন বছর, সর্বনাশ করে দিয়ে। বৃষ্টি মাথায় করে জলকাদা ভেঙ্গে সূর্যকে পাঁচনিখে যেতে আসতে হয় বলে এ বছর সূর্যের জন্য মমতা আর যে অপ্রত্যক্ষ শক্তি বেচারাকে কষ্ট দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে রাগটা রম্ভার যেন বেশী হয়। জোরে বর্ষা নামলেই নিজেকে

তার মনে হয় বন্দিনী, ঘরের মধ্যে ছটফট করতে করতে সে হাতে হাত কচলায়। তারপর ধৈর্য হারিয়ে উঠানে নেমে জলে ভিজে আসে এবং অসময়ে ঝোঁকের মাথায় চুল ভেজানোর আপসোসে নিজের ওপর রাগ করে গুম্ খেয়ে বসে থাকে।

হঠাৎ ওঘরে গিয়ে বলে, 'বাবা, শুনছো? সেই গপ্পোটা বলো দিকি। সেই যে কার সঙ্গে কোথায় ক'মাস ধরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছিল ধরা দেয়ার আগে?'

বীরেশ্বর মনে মনে খুশী হয়। বাইরে বিরক্তি জানিয়ে বলে, 'হাজারবার তো শুনলি।'

তা ঠিক। শুনে শুনে সে কাহিনীর খুঁটিনাটি পর্যন্ত রম্ভার মুখস্থ হয়ে গেছে। তবু প্যাঁজলঙ্কা দেয়া পুরানো চালভাজার মত বেশ লাগবে বাদলার দিনে আবার সেই পুরানো রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতে।

'আবার বলো।'

চৌকির এক কোণে পা তুলে দু'হাতে বুকের কাছে হাঁটু জড়িয়ে বসে হাঁটুর জোড়ে থুতনি রেখে রম্ভা গল্প শোনে। শোনা শেষ হলে খানিক চুপ করে থেকে আচমকা জিজ্ঞেস করে, 'গরীব হলে তো মানুষ কষ্ট পাবেই, না?'

বীরেশ্বর গরীবের কষ্ট পাওয়ার কথা কিছু বলেনি। প্রশ্নটা সে বুঝতে পারে না।

রম্ভা আপন মনে বলে, 'তবে যে সূর্যবাবু বলে বড়লোকদের জন্য গরীবরা কষ্ট পায়? বড়লোকরা চোর, ডাকাত?'

বীরেশ্বর ভেবে চিন্তে বলে, 'হাঁ, গরীবরা সব দেশে কষ্ট পায়। তবে আমাদের মত নয়, এই আর কি।'

বর্ষার পর মেয়েকে নিয়ে বীরেশ্বরের একবার কলকাতা যেতে হল।

লোকনাথ দত্ত কলকাতায় থাকেন। কয়েকটা কারখানা আছে, মস্ত বড়লোক। তার বাপের ছোটখাট জমিদারী ছিল ঝুমুরিয়া ও আশেপাশের গাঁয়ে। এখন সামান্য অবশিষ্ট আছে। বাকীটুকুও যাক, লোকনাথ অবশ্য তা মোটেই চান না, তবে এই সামান্য আয়ের জমিদারীটুকুর জন্য নিজে তিনি আর বিশেষ মাথা ঘামাতে বা কষ্ট করতে রাজী নন। তাঁর এক দূর সম্পর্কের ভাই ঝুমুরিয়ার বাড়ীর থেকে জমিদারীটুকু দেখা শোনা করতেন। সম্প্রতি তিনি মারা গিয়েছেন। তাঁর বড় ছেলে বিদেশে চাকরী করে। পরিবার প্রতিপালন ও বাপের দায়িত্ব পালন করার ভার পড়েছে অন্য ছেলেটির ঘাড়ে। তার নাম শশাঙ্ক। সে ঘরবাড়ী আগলায় আর যতদুর সম্ভব কম পরিশ্রমে খাজনাপত্র যা কিছু আদায় করে তাই দিয়ে মা, বোন আর বৌয়ের ভরণপোষণ চালায়।

শশাঙ্ক কলকাতায় যাবে। তার সঙ্গে কালীঘাটে কালী দর্শন ও গঙ্গাস্নান করতে যাবে তার মা আর রম্ভার পিসী।

রম্ভা প্রথমে আবদার এবং তারপর জিদ ধরল, সেও পিসীর সঙ্গে কলকাতা যাবে। বেশ, ফিরে আর সে আসবে না, আসতে চায় না। হয় গঙ্গায় ডুবে নয় হাওয়া গাড়ীর নীচে চাপা পড়ে প্রাণ বিসর্জন দেবে। আর যেতে যদি তাকে না দেয়া হয়, বাড়ীর কাছেই পুকুর আছে, দড়িরও কিছু অভাব নেই ঘরে।

মেয়ের জন্য এতদিন যত যন্ত্রণা সইতে হয়েছে তার জ্বালাটা এবার বীরেশ্বরের পড়ল গিয়ে মেয়ের ওপরে। কাটারি নিয়ে সে রম্ভাকে কাটতে গেল। চকচকে ধারালো সে কাটারি, বীরেশ্বর রাগের মাথায় কোপ বসিয়ে দিলে মানুষ একঘায়েই হয়তো দু'খণ্ড হয়ে যাবে—

কটা কোপ বসিয়ে সে ক্ষান্ত হবে কেউ জানে না। বাড়ীর কেউ, ছেলেরা পর্যন্ত, বাপকে গিয়ে আটকাতে ভরসা পেল না। রম্ভার মা বেঁচে থাকলে কি করত বলা যায় না।

রম্ভা গলা বাড়িয়ে দিল না বটে কিন্তু এক পা না নড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কাটারির কোপের প্রতীক্ষায়। বীরেশ্বর যেন থ' বনে গেল কাছাকাছি গিয়ে মেয়েকে দেখে। মেয়ের দুঃসাহসে নয়, মেয়েকেই দেখে। ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে জেনেও বাপেরা সহজে জানতে পারে না, ছেলেমেয়ে ঠিক কেমন আর কত বড় হয়েছে, বিশেষ করে মেয়ের বেলায়। আজ বিশেষভাবে নজর পড়ায় মেয়ের বদলে এক যুবতীকে দেখে সে যেন চমকে গেল।

এত বেড়ে গেছে রম্ভা!

কাটারি দিয়ে মেয়েকে অবশ্য বীরেশ্বর কাটত না। বদমেজাজী হলেই মানুষ তো আব পাগল হয় না। তবে কাটতে গিয়ে রম্ভাকে এভাবে না দেখলে সে হয়তো পিসী আর শশাঙ্কের মা সঙ্গে থাকবে এই ভরসায় মেয়েকে শশাঙ্কের হেফাজতেই কলকাতা বেড়িয়ে আসতে পাঠিয়ে দিত। এবার সে ভাবল, সর্বনাশ! সে নিজে সঙ্গে না থাকলে এই মেয়েকে কি কারো সঙ্গে কোথাও যেতে দেওয়া যায়! সেই সঙ্গে একথাও সে ভাবল যে কি সর্বনাশ! এখনো মেয়ের সে বিয়ে দেয়নি!

রম্ভা আর তার পিসীকে নিয়ে বীরেশ্বরকে অগত্যা নিজেকেই শশাঙ্কের সঙ্গে কলকাতা যাবার জন্য প্রস্তুত হতে হল। অল্প বয়সে রম্ভা একবার কলকাতা গিয়েছিল, আবছা আবছা মনে আছে দালান, রাজপথ, গাড়ীঘোড়া, মানুষের দিশেহারা ভিড়ের সমারোহ। রওনা হওয়ার দিন সকালে রম্ভা যখন উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে আছে, সূর্য এল। ক্লিষ্ট মুখে ম্লান হেসে বলল, 'আমারও এমন যেতে ইচ্ছে করছে তোমাদের সঙ্গে কলকাতায়!'

সূর্যকে দেখেই হঠাৎ উত্তেজনা কমবার প্রক্রিয়ায় রম্ভার বুকে তোলপাড় উঠেছিল। সে কথা কইতে পারল না।

'একটা কিন্তু সুখবর আছে। এখন থেকে হপ্তায় একবার পাঁচানখে গেলেই চলবে।'

শুনে রম্ভা ভাবল যে বর্ষার আগে এটা হলে কত কষ্ট বাঁচত সূর্যবাবুর! কালও রম্ভা সূর্যকে দেখেছে কিন্তু আজ গাঁ ছেড়ে দূরে যাবার চেতনা নিয়ে সূর্যকে তার বড় বেশী জীর্ণ শীর্ণ ঠেকল, মনে হল তার যেন অসুখ হয়েছে, কঠিন অসুখ। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল রম্ভার। কলকাতা সে যাচ্ছে বটে মাত্র কয়েকটা দিনের জন্য, কিন্তু শৈশবে একবার এবং এত বড় হয়ে আরেকবার যে কলকাতা যায়, যাওয়াতে কি তার দিনের হিসাব থাকে? ফিরে আসবার কথা কি সে ভাবতে পারে যাবার সময়? অনেক দূরের স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে ওঠা পর্যন্ত রম্ভা তাই কাতর হয়ে রইল। তারপর রেলগাড়ীতে চেপে চলার আনন্দ ও উদ্দীপনার মাদক রসে রম্ভার যখন নেশা ধরে গেল, গতিশীল জড় জীবন্ত সব কিছুকে তীব্রভাবে ভালবাসবার আকাঙ্ক্ষা জাগল, তখন সূর্যর কথা তার মনেই রইল না।

কলকাতায় পৌঁছে তারাও শশাঙ্কের সঙ্গে লোকনাথের প্রকাণ্ড বাড়ীতে উঠল। তাদের মত অনাহূত ও তুচ্ছ আত্মীয়-পরের বসবাসের জন্য বাড়ীতে স্থায়ী ব্যবস্থা করা আছে।

এই বাড়ীতে রামপালের সঙ্গে দেখা হল রম্ভার।

লোকনাথের একটি কাঠের গোলা ও আসবাব তৈরীর মস্ত কারখানা আছে। বিস্তৃত অঙ্গনে করাতিরা চেরে নানা কাঠের মোটা মোটা গুঁড়ি, কারখানার মধ্যে তৈরী হয় নানা ধাঁচের ও নানা দামের চেয়ার টেবিল খাট পালঙ্ক কোচ আলমারি। রামপাল এখানে মিস্ত্রির কাজ করে।

প্রথমে সে কমদামী সাধারণ আসবাব তৈরীর কাজ আরম্ভ করেছিল, তারপর অল্পদিনে সে দামী শৌখীন জিনিস তৈরীর কাজে লেগেছে। তার হাতের কাজ বড় সুন্দর হয়, তৈরী জিনিসের কারুকার্য একটা সর্বাঙ্গীণ রূপ পায়। কয়েক টুকরো দামী কাঠ নিয়ে সে খানিকটা ফাঁকি দিয়ে ও খানিকটা অবসর সময়ে ছোট একটি সুদৃশ্য কাঠের বাক্স তৈরী করছিল, কারুকার্য যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে কারখানাব ম্যানেজার স্বয়ং উমাপদর কাছে একদিন ধরা পড়ে। এসব বজ্জাতি উমাপদর সয় না। গালাগালি খেয়ে রামপাল সেদিন হয়তো বরখাস্ত হয়ে যেত, বাক্সটি দেখে হঠাৎ স্ত্রী লিলির কথা উমাপদর মনে পড়ে যাওয়ায় জিনিসটাই শুধু সে বাজেয়াপ্ত করে নিল।

গম্ভীর মুখে বলল, 'কাজে ফাঁকি দিও না।'

বাক্সটি নিয়ে উমাপদ চলে যায়, রামপাল বলল, 'একটু বাকী আছে বাবু।'

নেড়ে চেড়ে দেখে কোন ত্রুটি কিন্তু উমাপদর চোখে ধরা পড়ল না।—'কেন, এই তো বেশ হয়েছে।'

তারপর রামপালের তৈরী অনেক ছোট ছোট কাঠের জিনিস লিলির ঘরের শোভাবর্দ্ধন করেছে। সময় লেগেছে অনেক। রামপাল বড় আস্তে ধীরে সুস্থে কাজ করে।

রামপাল মানুষটাও ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির, কাজের সময় ছাড়া অন্য সময় একটু আলস্যপ্রিয়। কথা সে কম বলে, শোয়া বসা সব অবস্থাতেই নড়াচড়া কম করে, অনেক বিষয়েই আগ্রহ দেখায় কম। পাঁচজনের সঙ্গে বসে আলাপ আলোচনা হাসি-তামাশা সমস্তই সে মন দিয়ে শোনে, কিন্তু তাকে মনে হয় আনমনা। উত্তেজিত আলোচনার মধ্যেও চোখ তার মাঝে মাঝে বুজে যায়, ভাবুক মনে হয় তাকে। তার এই খাপছাড়া প্রকৃতির জন্য করাতি আর মিস্ত্রী-মজুরদের কাছে তার অস্তিত্ব একটু স্পষ্ট। অনেকে এজন্য তাকে পছন্দ করে না। তার নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত ভাবের মধ্যে অনড় অচল হয়ে বসার ভঙ্গির মধ্যে, মুখ বুজে চিন্তা-ভাবনা করার মধ্যে সাধু, পণ্ডিত, পূজারী আর বাবুদের সঙ্গে সাদৃশ্যের যেটুকু ইঙ্গিত আছে সেটা এদের সংস্কারকে পীড়ন করে। রামপাল রাগারাগি, হানাহানি, অশ্লীল আলাপ, হাসাহাসি আর বাহাদুরী সকলের সঙ্গে সমান তালে করে না বলে তাকে কেমন বেজাত ভেবে এরা বিদ্বেষ অনুভব করে। তবে মাঝে মাঝে ধেনো খেলে রামপাল বেশ ভালরকম মাতামাতি হৈ হুল্লোড় করে, বিদ্বেষের ভাবটা সাময়িকভাবে একেবারে উপে যায় এবং পরে আবার ফিরে এলেও জোরালো হতে পায় না। নির্বিরোধী স্বভাবের জন্য রামপালের প্রতি অনেকের একটু টানও আছে, যারা নিজেরাই নিরীহ গোবেচারী মানুষ এবং যারা শেষ পর্যন্ত মানুক না মানুক সব বিষয়ে বুড়োদের পরামর্শ নিতে ও হিতোপদেশ শুনতে চায়, বুড়োদের জ্ঞানী ও গুণী বলে জেনে শ্রদ্ধা করে। রামপালের মধ্যে এরা স্থবিরের গুণাবলীর প্রতিফলন অনুভব করে।

মাঝে মাঝে কিন্তু অকারণে তার মধ্যে অদ্ভুত একটা অস্থিরতা দেখা দেয়, দেশী মদ খেয়ে হৈ চৈ করার সঙ্গে যার কোন মিল নেই। বড় সে ছটফট করে, কাজ কামাই করে সহরময় ঘুরে বেড়ায়, কখনো কখনো সামান্য কারণে মারামারি পর্যন্ত করে বসে। তবে দু'চার দিনেই এভাবটা তার কেটে যায়।

উমাপদ কারখানার মালিক লোকনাথের ভাগ্নে। বড়লোক মামাটামার চেয়ে তাদের ভাগ্নেটাগ্নেরা চিরকালই বেশী দড় হয়। উমাপদর কর্তালিতে সমস্ত কারখানা জুড়ে জোরালো অসন্তোষ গুমরে বাড়ছিল, একদিন সে নাথু করাতিকে মেরে বসায় হাঙ্গামা বেধে গেল।

করাতিরা স্বভাবতই বদমেজাজী আর অপমান-কাতর হয়। বিশেষত দোষ না করে অন্যায় গালাগালি শুনতে তাদের বেশী লাগে। বেমাপে চিরে দামী কাঠ নষ্ট করেছে বলে উমাপদ তাকে গাল দিতে আরম্ভ করায় নাথুর সইল না।

'খর্পদার বাবু, মুখ সামলে।'

পায়ের কাছে কাঠের একটা গোঁজ পড়ে ছিল। উমাপদ সেটা তুলে ছুঁড়ে মারল। লাগল নাথুর মাথার পাশে। রক্তারক্তি হয়ে গেল।

উমাপদ সেদিন হয়তো খুন হয়ে যেত, তাকে বাঁচালো রামপাল। নিজের দেহ দিয়ে তাকে আড়াল করে সে হাঁকতে লাগল ঃ 'খুন হয়ে যাবে, সবাই মিলে মারলে খুন হয়ে যাবে...খুন। পুলিশ হাঙ্গামা! হুঁশিয়ার!'

উমাপদ ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে কোন রকমে আপিস ঘরে পালাল।

করাতি ও মিস্ত্রীরা কাজ বন্ধ করে আরম্ভ করল জটলা। ক্রুদ্ধ উত্তেজিত অবস্থায় রামপালের কাজে তারা বিরক্ত হয়েছে। নাথু তার চাটগাঁ'র ভাষায় অকথ্য গালাগালি দিতে লাগল রামপালকে।

রামপাল কৈফিয়ত দিয়ে বলল, 'একটা লোক মেরে দু'চার জন ফাঁসি গিয়ে, দশ বিশজন জেল খেটে লাভ কি হত শুনি!'

'খুন কিসের? খুন কিসের? দু'চার ঘা খেত শালা।'

এ অবস্থাতেও রামপালের মুখে হাসি দেখা দিল।

'ভদ্দরলোকের ব্যাটা—তোমরা দু'চার জন এক ঘা করে দিলেই রক্ত হেগে মরে যেত।'

কথাটা সকলে ভাল লাগল। উমাপদকে এ একটা গাল দেওয়ার সামিল। এ একটা ঘোষণা—উমাপদর জীবন ঠুনকো, তারা কিন্তু সহজে মরে না।

'নাথুকে যে মারল তার কি হবে?' শ্রীপতি মিস্ত্রী শুধোল।

'মাপ চাইবে।'

হ্যাঁ, মাপ চাইতে হবে উমাপদকে। হেড মিস্ত্রী গণি সাক্ষী, বেমাপে চিরে নাথু কাঠ নষ্ট করেনি, গণি যেমন বলেছিল সেই মাপে চিরেছে। নিজে ভুল করে উমাপদ গাল দিয়েছে নাথুকে, মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। মাপ না চেয়ে সে আজ যাক দিকি কারখানার বাইরে। মাপ তাকে এখুনি চাইতে হবে। তাকে কারখানা থেকে না সরালে কেউ কাজ করবে না।

উমাপদকে সরাবার কথাটা শুধু ভাসা ভাসা ভাবে উঠে রইল, দু'চারজন বলাবলি করতে লাগল নিজেদের মধ্যে। সকলের সায় পেয়ে সমবেত দাবীর স্পষ্ট রূপ নেওয়া স্থগিত রইল উমাপদর মাপ চাওয়া চুকে যাবার জন্য। ওটা আগে চাই, এখুনি চাই।

দায়িত্বটা আপনা থেকে পড়ল গিয়ে রামপালের ঘাড়ে। সে উমাপদকে বাঁচিয়েছে, মাপ চাওয়ার কথা পেড়েছে, ঘটনাস্রোতকে এ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করেছে। বিনা নির্বাচনেই সে তাই মধ্যস্থ নির্বাচিত হয়ে গেল। শুধু মধ্যস্থ নয়, দায়ী হল। মুখে কেউ কিছু না বললে এটা স্পষ্ট হয়ে রইল যে তাকেই উমাপদকে দিয়ে মাপ চাওয়াতে হবে।

এটা নেতা হওয়ার সামিল। পনের কুড়ি মিনিটের মধ্যে রামপাল করাতি ও মিস্ত্রিদের নেতা হয়ে গেল। উমাপদর কাছ থেকে মাপ চাওয়া আদায় করার ভারটা তার এবং এই কাজটা করার জন্য সে কারখানায় আগুন ধরিয়ে দিতে বললে এখন সবাই তা পালন করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজটা সম্পন্ন করতে না পারলে অবশ্য তার মুশকিল আছে।

ভেবে চিন্তে রামপাল উমাপদর কাছে গেল।

'ওরা কি বলছে, রামপাল?'

'বড় হাঙ্গামা হয়েছে, বাবু। নাথুকে না মারলেই পারতেন। ওর দোষ নেই। গণি মিস্ত্রি সোয়া ইঞ্চি বলেছিল, নাথু সেই মাপে চিরেছে। আপনার ভুল হয়েছিল।'

উমাপদ চটে বলল, 'তাই কি? ভুল হয়েছিল বলে আমার মুখের ওপর হুমকি দেবে?'

রামপাল তখন অবস্থাটা বুঝিয়ে দিল। মাপ না চাইলে উমাপদকে কারখানা থেকে বার হতে দেওয়া হবে না। রাগের মাথায় সবাই হয়তো আপিস-ঘরে এসেই—

'অ্যাঁ!' উমাপদর মুখ আবার শুকিয়ে গেল। 'নাথুকে মেরেছি তো ওদের সকলের কি?'

'সবাই ক্ষেপে গেছে।'

টেবিলে টেলিফোনটার দিকে চেয়ে দামী পেনের মসৃণ গোড়াটা ঠোঁটে বুলিয়ে বুলিয়ে উমাপদ ভাবে। আক্রোশ আর ভয়ের উত্তেজনায় মনে তার আলোড়ন চলতে থাকে অনিশ্চয়তার। কি করবে? কি করা যায়? লোকনাথ দত্তের বড় ভাগ্নে হয়ে, কারখানার বড় ম্যানেজার হয়ে মাপ চাইবে একটা করাতির কাছে? সকলের সামনে মাপ চাইবে! কিন্তু খুন হওয়ার চেয়ে এখনকার মত মাপ চেয়ে বাঁচা কি ভাল নয়? পরে নয় দেখা যাবে কার ঘাড়ে কটা মাথা। অথবা যদি—

'কি করি বল তো রামপাল।'

'আজ্ঞে মাপ না চেয়ে রেহাই নেই।'

রেহাই নেই! রেহাই নেই! ছোটলোক কুলিমজুরের কি আস্পর্ধা! 'আচ্ছা, বলোগে আমি আসছি।'

রামপাল বেরিয়ে যাওয়া মাত্র উমাপদ পুলিশে ফোন করে দিল।

পুলিশ আসতেও সময় লাগে। প্রতীক্ষা করতে করতে সকলের উত্তেজনা বাড়তে থাকে, তারা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। মিনিট কুড়ি পরে রামপাল তাগিদ দিতে এল।

'বলোগে আসছি। নাথুর খুব লেগেছে, না? বলোগে নাথুকে আমি একশো টাকা দেব—ক্ষতিপূরণ দেব। এই হিসাবটা দেখেই আসছি।'

এখন এই অবস্থায় উমাপদ হিসাব দেখছে!

খানিক পরেই লরী বোঝাই পুলিশ এসে কারখানা দখল করে বসল। করাতি ও মিস্ত্রীরা পুলিশের সঙ্গে লড়াই করত না, ক্ষমাপ্রার্থী উমাপদর বদলে হঠাৎ পুলিশের আমদানী হওয়ায় সকলেই অল্পবিস্তর হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

সময় দিলে করাতি ও মিস্ত্রীরা আপনা থেকেই চলে যেত; তবে জনতা পালাতে আরম্ভ করলেও জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার কর্তব্য রীতিমত পালন করার প্রথা পুলিশ মেনে চলে। গোটা কয়েক মাথা একটু ফাটল, কয়েকজন ঘা কতক মার ও গুঁতো খেল।

রামপাল মধ্যস্থ, তাই দলে ভেড়েনি। একটু তফাতে একটা কাঠের গুঁড়িতে বসে বিড়ি টানতে টানতে আপিস-ঘরের দিকে তাকিয়ে ছিল, কখন উমাপদ বেরিয়ে আসে। অঙ্গন সাফ হয়ে যাবার পর দেখা গেল সে একা তখনও কাঠের গুঁড়িটার ওপর বসে আছে।

উমাপদ বেরিয়ে এসেছিল। রামপালকে দেখিয়ে সে বলল, 'ওই ব্যাটা পালের গোদা, ওই সকলকে ক্ষেপিয়ে আমায় ডাকতে গিয়েছিল। অ্যারেস্ট করুন।'

অপরাহ্নে লোকনাথ নিজে গিয়ে রামপালকে ছাড়িয়ে আনলেন এবং পুলিশের হাঙ্গামা

চাপা দেবার ব্যবস্থা করে এলেন। কারখানার হাঙ্গামা তিনিই মেটাবেন, সে পর্যন্ত কারখানায় পুলিশ পাহারা থাকলেই হবে, আর কিছু দরকার নেই।

উমাপদ মামার কাছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কল্পনায় গেঁথে ব্যাপারটা জানিয়েছিল। কারখানার কর্মচারীদের কাছে লোকনাথ আসল ব্যাপারের খুঁটিনাটি সব শুনেছিলেন। তাঁর কাছে মিথ্যা বলার জন্য উমাপদকে তিনি বকলেন এবং পুলিশে ফোন করার জন্য তার বুদ্ধির তারিফ করলেন। তাঁর আরও কারবার ও কারখানা আছে। এটা তাঁর জানাই ছিল কারখানা চালাতে গেলে মাঝে মাঝে লোকদের সঙ্গে গোলমাল হয়। অশিক্ষিত নেশাখোর ছোটলোক তো সব। বাড়ীতে একটা চাকর থাকলে তার সঙ্গে পর্যন্ত খিটমিটি না বেধে যায় না, কারখানায় অমন কতলোক কাজ করে।

রামপালকে তিনি একেবারে বাড়ীতে নিয়ে এলেন। উমাপদকে বাঁচাবার জন্য প্রশংসা করলেন এবং দশটাকা পুরস্কার দিলেন।

জিজ্ঞাসাবাদ করে বললেন, 'কাল আমি সব মিটিয়ে দেব।'

লোকনাথ জানতেন শ্রীপতি মিস্ত্রী তাঁর কাঠের কারখানার লোকদের দলপতি, সকলের হয়ে সেই এতদিন অভাব অভিযোগের কথা জানিয়েছে, কথাবার্তা চালিয়েছে। রামপালকে হঠাৎ ওদের নেতা হতে দেখে তিনি একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন।

রামপালকে জলখাবার দেবার হুকুম হয়েছিল। প্রজা জমিদার-বাড়ী এলে তাকে খেতে দেবার সেকেলে প্রথাটা লোকনাথের বাপ মেনে চলতেন, ব্যবসায়ী হলেও লোকনাথের আমলে সেটা টিকে আছে। খিদেও রামপালের পেয়েছিল প্রচণ্ড। চাকরের সঙ্গে সে বাড়ীর আনাচে খেতে গেল। রামপালের শ্রেণীর লোকদের খাওয়াবার জন্য মুড়ি, চিড়ে, ছাতু আর আটার রুটির স্থায়ী বরাদ্দ আছে। গুড় দিয়ে যা খুশী খেতে পারে। সর্বোচ্চ পরিমাণ বাঁধা আছে। অবশ্য সে পরিমাণ সকলে পায় না, খায়ও না।

'কি নেবে?'

'দাও যা খুশী।'

হঠাৎ সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে রামপালের, বিতৃষ্ণা জেগেছে। গারদে বসে উমাপদর চালাকি আর প্রাণ বাঁচানোর প্রতিদানে তাকে পুলিশে ধরিয়ে দওয়ার কথা ভাবতে গিয়ে ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে তার বিস্ময় আর ক্রোধের সীমা থাকে না। হঠাৎ লোকনাথ স্বয়ং গিয়ে তাকে মুক্ত করে নিজের গাড়ীতে চাপিয়ে আদর করে বাড়ী আনায় রাগ দুঃখ তার চাপা পড়ে গিয়েছিল। একটা ভুল হয়েছিল, সেটা সংশোধন হল ভেবে সে পরম স্বস্তিও বোধ করেছিল। পুরস্কারের দশটা টাকা সে নিয়েছিল, গারদে গিয়ে কষ্ট পাওয়ার মজুরি হিসাবে। এখন হঠাৎ তার খেয়াল হয়েছে যে এ তো শুধু তার প্রতি ভুল করার প্রতিকার হল, এতে তার তো খুশী হওয়া উচিত হয়নি। নাথু মার খেয়েছে, উমাপদ মাপ চায়নি, ফাঁকি দিয়ে পুলিশ ডেকেছে, কয়েকজন আহত হয়েছে—এসবের কোন প্রতিকার হয়নি।

লোকনাথ বলছে, কাল সব মিটিয়ে দেবে।

কিন্তু তাকে তো দেখতে হবে ঠিকমত মিটমাট যাতে হয়? ঠিকমত মিটমাট কি হওয়া উচিত তাকে তো স্থির করতে হবে ভেবেচিন্তে আর সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে? এমন একটা মীমাংসা চাই তো লোকনাথ যা মেনে মেবে এবং ওরাও যাতে খুশী হবে?

হঠাৎ নেতা হয়েই রামপাল ঠিক নেতার মতই ভাবতে শিখেচে। মুড়ির সঙ্গে বাতাসা পেয়েও খেয়ে সে স্বাদ পেল না। কেবল খিদের তাগিদে মুড়ি চিবিয়ে গেল।

এমন সময় বাপের সঙ্গে চিড়িয়াখানা দেখে রম্ভা ফিরে এল। অন্য অনেকের মতই রামপাল তাকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল। কিন্তু রম্ভার মনে হল এ যেন সেভাবে দেখা নয়।

আনাচের অন্দর থেকে খানিক পরে রম্ভা একবার বেরিয়ে এল রামপালকে আরেকবার দেখবে বলে। বাড়ীর কত পুরুষের চোখে সে দেখেছে তার পরিহিত শাড়ী সেমিজ ভেদ করা চাউনি। তার মধ্যে উমাপদর চাউনিটাই সবচেয়ে তেজী, চোখ দিয়ে সে যেন তার সর্বাঙ্গ আঁচড়ায়। রামপালের মত মানানসই একটি পুরুষের মিষ্টি দৃষ্টি দেখে তাই রম্ভার চেতনায় ঘা লেগেছিল। অন্দরে গিয়ে তার কেবলি মনে হচ্ছিল লোকটাকে আরেকবার না দেখলে তার চলবে না, ভুল দেখেছে কি না এ সংশয়টা মেটাতেই হবে।

খাওয়া শেষ করে রামপাল তখন চলে গেছে।

লোকনাথের প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ীতে লোক অনেক, আত্মীয় কুটুম্ব আশ্রিত আশ্রিতা চাকর ঠাকুর দাই দাসী মালী ঝাড়ুদার দারোয়ান ইত্যাদি নানা জাতের হরেকরকম মানুষ। মানুষ পুষে লোকনাথ সুখ পায়, তার কাছে সংসারে যত পোষ্য যত সমারোহ কর্তা হবার বাহাদুরিও ততখানি। বাজে লোকের ভিড়ে সংসারের আসল মানুষদের কোন অসুবিধা হয় না। এক বাড়ীতে বাস করলেও তাদের মধ্যে ব্যবধান অনেক। আসলেরা ভিড়ের সান্নিধ্য শুধু ততটুকু মঞ্জুর করে, তাদের জীবনযাত্রার কলরব ঠিক ততটুকু কানে আসতে দেয়, যা বরদাস্ত করতে কষ্ট নেই, গর্ব আছে। বাড়ীর যে পরিমাণ স্থান এরা পেয়েছে এদের দাবীর জোরে তা এদের প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশী। এত বড় বাড়ীতেও তাই অন্যদের স্থানের অকুলান হয়, বাস করতে হয় একটু ঘেঁষাঘেঁষি কোণঠাসা হয়ে। অবশ্য তাও কি কম ভাগ্য?

নানা গণ্ডীতে, নানা প্রক্রিয়ায় বিচিত্র শব্দ তুলে এ বাড়ীর জীবনধারা বয়ে যায়। ভোর চারটে থেকে মানুষের ঘুমই ভাঙ্গে বেলা দশটা এগারটা পর্যন্ত। যাদের কাজ করতে হয় তারা কাজ আরম্ভ করে। আর যাদের কোন কাজ নেই তারা আরম্ভ করে সময় কাটাবার চেষ্টা, শুয়ে বসে হাই তুলে আড্ডা দিয়ে গল্প করে তাস খেলে রেডিও শুনে। সাধারণ কথার একটানা গুঞ্জন ছাপিয়ে কানে আসে ডাকাডাকি, ধমকানি, কলহ, ছোট ছেলের কান্না, ঠাকুর ঘরে আরতির শঙ্খঘণ্টা প্রভৃতির শব্দ। উপরের ঘরের মেয়েপুরুষদেব জীবন সব সময়েই শ্লথ মন্থর, সকালের দিকে আরও ঝিমিয়ে থাকে। পুরুষেরা তবু লোকনাথের বিভিন্ন আপিসে মোটা বেতনে হাল্কা কাজের চাকরী করতে যায়, মেয়েদের কাজের অভাবটাই সাংঘাতিক। সকলের চেয়ে নিশ্চল জবুথবু ও শব্দহীন লোকনাথের তিরানব্বই বছরের বুড়ী মা, এদের অলস জীবনের চরম প্রতীকের মত।

বাড়ীতে দু'বেলা সবচেয়ে সমারোহ হয় চারটি রান্নাঘরে। এক ঘরে লোকনাথ ও তার আপনজনের, এক ঘরে পরের পর্যায়ের সম্পর্কিতদের, এক ঘরে নিরামিষ এবং এক ঘরে বাকী সকলের। শেষের রান্নাঘরে অন্নব্যঞ্জনের বৈচিত্র্যবিশেষ কিছু না থাকলেও পরিমাণটা হয় বিপুল। তবু সকলের শেষে যারা খায়, শেষে ছাড়া খাবার অধিকার যাদের নেই, তাদের প্রায় সব জিনিস কম পড়ে। কোনদিন থাকে শুধু আধপেটা ভাত আর একটু ডাল, কোনদিন থাকে শুধু দুটি শুকনো নুন ভাত, কোনদিন কিছুই থাকে না। হিসেব করেই দেয়া হয় সব জিনিষ. কিন্তু সেটা মাথা পিছু হিসেব, খিদের হিসেব নয়।

পোষ্য পোষা নিয়ে বড় ছেলে হীরেনের সঙ্গে লোকনাথের একটু মতানৈক্য আছে। তবে হীরেনের পক্ষে অনৈক্যটা সম্পূর্ণ নীতিগত ব্যাপার। এই আবেষ্টনীতে মানুষ হওয়ার ফলে

বাড়ীর অবস্থাটা তার এমন গা সওয়া হয়ে গেছে যে পরিবর্তন ঘটানোর বিশেষ জোরালো তাগিদ সে অনুভব করে না। কেবল এই এক বিষয়ে নয়, বেশ খানিকটা পিতৃভক্তি থাকলেও বাপের সঙ্গে তার তেমন বনে না। ভক্তির সঙ্গে মনের মধ্যে একটা সমালোচনার ভাব থাকাটা তার কারণ। বাপকে সে পুরোপুরি অনুমোদন করতে পারে না। প্রচুর বাৎসল্য থাকা সত্ত্বেও লোকনাথের মনেও ছেলের সম্বন্ধে পুরাপুরি সায় নেই। তবে মতানৈক্য থাকলেও বাপ ছেলের মধ্যে এ পর্যন্ত তেমন মনোমালিন্য ঘটেনি ; অমিলের মধ্যেও মিল থাকায় খানিকটা সামঞ্জস্য হয়েছে, মতামত ও পছন্দ-অপছন্দের অতীত পিতৃভক্তি আর বাৎসল্য বাকীটা সামলে রেখেছে।

সম্প্রতি উমাপদকে উপলক্ষ করে দু'জনের মধ্যে খাঁটি একটা মনোমালিন্য ঘটবার উপক্রম দেখা দিয়েছে। কাঠের কারখানায় গোলমাল হবার আগে থেকেই উমাপদর ক্ষমতার অপব্যবহারের কথা তার কানে আসছিল ; একটা কিছু ব্যবস্থা করার জন্য চাপও পড়ছিল তার উপর। চাপ দিচ্ছিল কৃষ্ণেন্দু আর মমতা। দু'জনের মধ্যে যে কোন একজনের বলাটাই হীরেনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এদের দু'জনের চাপের সঙ্গে তার নিজের মনের সঙ্গতি ঘটায় ব্যাপারটা গুরুত্ব পেয়েছে অনেক বেশী। উমাপদকে সে পছন্দ করে না। কেবল অপছন্দ নয়, এই পিসতুতো দাদাটির উপর তার মনে একটা ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাবও বহুদিন থেকে সঞ্চারিত হয়ে এসেছে। বাড়ীর মানুষগুলির অমার্জিত স্থূল মানসিকতা সে শুধু অবজ্ঞা আর উদাসীনতা দিয়ে বরদাস্ত করে যায়, তার আগেকার যুগের মানুষ বলে ক্ষমা করে কিন্তু প্রায় সমবয়সী ও সুশিক্ষিত উমাপদর রুচিহীন কৃষ্টিহীন ভোঁতা অনুদার জীবনযাপন তাকে পীড়ন করে।

কিন্তু মুখে উপদেশ বা ধমক দিতে লোকনাথের আপত্তি না থাকলেও উমাপদর স্বভাবের সংশোধন হওয়ার মত শাসন করতে লোকনাথ রাজী নন। উমাপদর ব্যবহারে তিনি দোষের বিশেষ কিছু দেখতে পান না বলে শুধু নয়, তাকে শাসন করার একটু মুশকিলও আছে।

জীবনবীমার কোম্পানী খুলে লোকনাথ প্রথম ব্যবসায় জীবন আরম্ভ করেন তাঁর ভগ্নীপতি রাখালের সঙ্গে, উমাপদ যার ছেলে। সে কোম্পানীর অর্ধেক অংশীদার ছিল রাখাল। কোম্পানী যখন দাঁড়িয়ে গিয়ে দিন দিন বড় হচ্ছে এবং পরামর্শ চলছে অন্য কারবার পত্তন করবার তখন রাখাল মারা যায়। তারপর অন্য কারবার লোকনাথ একাই কয়েকটা গড়ে তুলেছেন, সেগুলিতে উমাপদর কোন অংশ না থাকলেও জীবনবীমা কোম্পানীটির সে অর্ধেকের মালিক। কোম্পানী আরও অনেক ফেঁপেছে, বহু টাকার কারবার দাঁড়িয়েছে।

রাখালের মৃত্যুর সময় উমাপদ ছোট ছিল। যতদিন পারা যায় লোকনাথ তাকে লেখাপড়া নিয়ে মাতিয়ে রেখেছিলেন, তারপর তাকে ব্যাপৃত রেখেছেন অন্য কারবার চালাবার কাজ শিখিয়ে, দায়িত্ব দিয়ে। জীবনবীমা কোম্পানীর ধারে কাছেও তাকে ভিড়তে দেয়নি। সে ইচ্ছাও তাঁর নেই। ওই একটি কোম্পানীর ভিতরের ব্যাপার তিনি উমাপদকে জানতে দিতেও চান না, পরিচালন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে দিতেও চান না।

উমাপদ মাঝে মাঝে আজকাল একটু গম্ভীর মুখে এই কোম্পানীটি সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করতে সুরু করেছে, নানা প্রশ্ন করেছে। দু'একবার আপনা থেকে কোম্পানীর আপিসে ঘুরেও এসেছে ইতিমধ্যে। লোকনাথ জানেন, একদিন এই ব্যাপার নিয়েই ভাগ্নের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাধবে, উমাপদ পাওনা দাবী করবে। কিন্তু তার এখনো দেরী আছে। আরও কতকগুলি বছর তিনি উমাপদকে সামলে চলতে পারবেন। এখন অকারণে ওর স্বাধীনতা খর্ব করার চেষ্টা

করতে গিয়ে ওর স্বাধীন হবার প্রবৃত্তি উস্কে দিয়ে লাভ কি হবে? তাও কুলী মজুরদের সঙ্গে একটু কড়া ব্যবহার করার জন্যে।

হীরেন এটুকু বোঝে না। বুঝবার মত বুদ্ধিও তার নেই ভেবে লোকনাথের আপসোস হয়—রাগও হয়। ভয় হয় এই ভেবে যে সঙ্গ দোষে ছেলেটার বুদ্ধি একেবারে বিগড়ে না যায়।

কৃষ্ণেন্দু আর মমতার সঙ্গে হীরেন পাটনায় এক কনফারেন্সে যোগ দিতে গিয়েছিল। এসব কনফারেন্সে হীরেন কেন যায় লোকনাথের মাথায় ঢোকে না,—যারা জেল খেটেছে আর দরকার হলে আবার জেলে যাবে তাদের এই কনফারেন্সে? তবে হীরেন কলকাতায় না থাকায় এক বিষয়ে রক্ষা পাওয়া গেছে। কাঠের গোলার ঘটনাটা নিয়ে সে নিশ্চয় বাড়াবাড়ি করত।

ফিরে এসে গোলমাল করবে। কিন্তু তিনি নিজে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়েছেন আর উমাপদকে আচ্ছা করে শাসন করে দিয়েছেন বলে হয়তো অল্পেই তাকে ঠাণ্ডা করা যাবে। শ্রীপতি যে কৃষ্ণেন্দুকে টেলিগ্রাম করে দেবে লোকনাথের জানা ছিল না। রামপাল কিছু করতে পারবে এ বিশ্বাস শ্রীপতির ছিল না। সেই সঙ্গে কারখানায় তার পদটিতে রামপাল উড়ে এসে জুড়ে বসবে এ ভয়ও ছিল।

শ্রীপতিকে মধ্যস্থ করেই অনেক রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা হল ঃ বাকী রাতটা এক রকম ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়ে ভোরবেলাই রামপাল হাজির হল লোকনাথের বাড়ী। রাত্রির আলোচনায় কি হলে তারা খুসী হবে স্থির করে ফেলা হয়েছিল, লোকনাথকে শর্তগুলি জানিয়ে দিতে তার তর সইছিল না। শ্রীপতি জানলে রামপালকে আটকে রাখার চেষ্টা করত, নতুবা তার সঙ্গে যেত। রামপাল একা লোকনাথের সঙ্গে কথা চালাবে পরামর্শ-সভায় এমন কোন কথা হয়নি।

সাড়ে ন'টা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হল। ন'টার আগে লোকনাথ কারো সঙ্গে দেখা করেন না,—নিজের দরকারে অথবা বিশেষ লোক ছাড়া।

অস্থিরতা চেপে বসে থাকতে থাকতে রামপালের আবার খিদে পায়। জলখাবার নিয়ে খেতে গিয়ে আবার সে স্বাদ পায় না। তার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করে কৌতূহলী বীরেশ্বর। রম্ভা যোগ দেয় পরে।

'হাজত যাওনি তুমি?' বীরেশ্বর দরদের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে।

'যাই বা না যাই।' উদাসভাবে রামপাল জবাব দেয়।

তাই বলছিলাম। ওই এক কাজ জানে পুলিশ, ধরে ধরে হাজতে পোরা। আমি জানিনে? ঘুরে আসিনি কবার জেল থেকে?' বীরেশ্বর গরম হয়ে ওঠে। তার জেলে যাওয়ার কাহিনী শুনতে শুনতে রামপালের উদাসীন ভাব কেটে যায়।

'কর্তা ভাল করেছেন তোমায় ছাড়িয়ে এনে। কর্তা লোক ভাল।'

এ কথায় রামপাল সায় দিতে পারে না। কাল রাত্রে সকলের আলোচনা শুনে এই জ্ঞানটুকু তার জন্মেছে যে তার ওপর যে অন্যায় করা হয়েছিল তার প্রতিকারের জন্য লোকনাথ তাকে ছাড়িয়ে আনেননি, হাঙ্গামাটা চাপা দেওয়াই ছিল তাঁর সকল উদ্দেশ্য।

'ভালো? হ্যাঁ, ভালোই বটে! কেউ বলে না ভাল।'

'সূর্যবাবুও তাই বলেন। বড়লোকেরা লোক ভাল না।' রম্ভা তার উত্তেজিত জোরালো সমর্থন জানায়। তার চোখ দুটি বিস্ময়কর দীপ্তিতে চক চক করে। নিশ্বাস তার কিছুক্ষণ

আগে থেকেই একটু দ্রুত হয়ে উঠেছে। রামপালের চোখে মুখে আজ উদাসীন নির্বিকার ভাব নেই, চাপা অস্থিরতা এক অদম্য রুদ্ধ শক্তির থমথমে অভিব্যক্তি এনে দিয়েছে। কথা তার ঝাঁজালো কিন্তু মানে বোঝা সহজ। গরীব মিস্ত্রিমজুরদের হয়ে সে লড়াই করেছে বড়লোক বাবুদের সঙ্গে, হাজতে গিয়েছে, তারপর বাড়ী বয়ে লড়াই করতে এসেছে স্বয়ং বড় কর্তার সঙ্গে! রম্ভার কেবলি মনে হতে থাকে এ লোকটি যেন ঝুমুরিয়ার জীর্ণশীর্ণ অশক্ত শ্রীহীন সূর্যের সুস্থ সবল রূপবান প্রতিনিধি—শক্তিশালী, সক্ষম। সহরের আলো দেখে রম্ভার মনে হয়নি এ তার গাঁয়ের প্রদীপ আর ডিবরির আলোরই উজ্জ্বল চোখ ঝলসানো রূপ। ঝুমুরিয়ার কালো সূর্যের ক্ষয়িষ্ণু প্রাণশক্তি দিয়ে জীইয়ে রাখা শিখাটিই আজ রামপালের প্রদীপ্ত অগ্নিমূর্তি হয়ে তাকে অভিভূত করে দিল।

লোকনাথ রামপালকে দর্শন দিলেন সাড়ে ন'টার সময়। বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল আবার?'

রামপালের বক্তব্য শুনে বললেন, 'বটে? আগে মিটমাট না করে দিলে কেউ কাজ করবে না? ওদের বলগে বাবু, ওসব ওস্তাদি চলবে না আমার সঙ্গে। কাজ যদি বন্ধ করে তো কিছুই করব না আমি।'

রাগে লোকনাথ গরগর করতে থাকেন। তার কথা শুনতে শুনতে রামপালেরও মনে হয় কথাগুলি তিনি খাঁটিই বলছেন। খোঁজখবর না নিয়ে, জিজ্ঞাসাবাদ না করে, ব্যাপারটা ভালরকম বিবেচনা করে না দেখে, হঠাৎ কি করে তিনি মিটমাট করে দেন! তিনি ব্যস্ত মানুষ, কিছুদিন সময়ও তো লাগবে তাঁর সব বুঝে শুনে নিতে। ততদিন কি কাজ বন্ধ হয়ে থাকবে কারখানায়? তিনি কথা দিয়েছেন মিটিয়ে দেবেন, কারো নালিশ করার কিছু থাকবে না, তাই কি যথেষ্ট নয়?

'আজ্ঞে তাই বলি গে' বুঝিয়ে।'

লোকনাথ শান্ত হয়ে নরম সুরে বললেন, 'কি বলে ওরা কাল জানিয়ে যেও।'

রামপালের কথা শুনে কেবল শ্রীপতি নয়, আরও অনেকেই হাসল। কারো কারো চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিও দেখা গেল। এখানে এদের কথা শুনতে শুনতে রামপালেব মনে হল, এরাও তো ঠিক কথাই বলছে। বোকার মত সে-ই লোকনাথের সহজ চালটি ধরতে পারেনি। তাই বটে, কাবখানায় কাজ বন্ধ কবা এখন খুব কঠিন নয়, কিন্তু কয়েকদিন কাজ করার পর আস্তে আস্তে সকলেব মাথা ঠাণ্ডা হয়ে এলে সেটা তো সহজ হবে না! তখন দুটো মিষ্টি কথা বলেই হয়তো লোকনাথ ব্যাপাবটা মিটিয়ে দিতে পারবেন। মীমাংসার শর্ত সম্পর্কে মোটামুটি প্রতিশ্রুতি না পেয়ে কাজ আরম্ভ করা তো উচিত হবে না।

ন'টাব আগে লোকনাথের সঙ্গে দেখা হবে না জেনেও রামপাল পরদিন সাতটার খানিক পরেই আবার তার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হল। টের পেয়ে খুশী হল যে রম্ভাও তার অপেক্ষা করছিল।

বীরেশ্বরের এখানে থাকতে আর ভাল লাগছিল না। ইতিমধ্যেই বাড়ীর একজন ড্রাইভারের সঙ্গে তার একচোট ঝগড়া হয়ে গিয়েছে। ড্রাইভারটিকে সে হয়তো মেরেই বসত কিন্তু তার আগেই উমাপদ নিজে এসে ড্রাইভারটিকে ধমকে দেওয়ায় ব্যাপারটা বেশীদূর গড়াতে পারেনি। অতিথির মান আরও বাড়াবার জন্য উমাপদ বলেছিল, 'তুমি বললে ওকে ডিসমিস করে দিই বীরেশ্বর!'

বীরেশ্বর তাতে একটু অপমান বোধ করেছিল। এরকম পিঠচাপড়ানো খাতির তার সহ্য হয় না। সে যেন অসহায়, অরক্ষিত মানুষ, উমাপদর অধীন। ড্রাইভারকে ধমকে বড়ই সে অনুগ্রহ করল তাকে। এরকম অনুগ্রহ উমাপদ তাকে আরও করবার চেষ্টা করেছে, তাতেও অপমান বোধ করেছে বীরেশ্বর। তাছাড়া, এখানে বড় বেশী পরাধীন শান্তশিষ্ট জীবন যাপন করতে হয়। লোকনাথের কাছে যে ব্যবহার আশা করেছিল তাও সে পায়নি। কোন ব্যবহারই পায়নি।

মেয়ে সায় দিতেই সে ঝুমুরিয়া ফিরে যাবার আয়োজন করল। রম্ভারও এখানে বড় খারাপ লাগছিল। বড়লোকের বাড়ী বলেই প্রথম থেকে তার বিতৃষ্ণা জাগেনি, এখানে বাস করতে করতে তার অস্বস্তি বাড়ছিল। রামপালের সঙ্গে জানাশোনা হবার পর থেকেই তার কেবলি মনে হয়েছে যে সে শত্রুপুরীতে বাস করছে. অস্বস্তি যেন পরিণত হয়েছে বিদ্বেষে।

খবর শুনে উমাপদ বিষণ্ন হয়ে শশাঙ্ককে বলল, 'ওরা আর কিছুদিন থেকে যাক না শশাঙ্ক?'

শশাঙ্ক বয়সে বড়। কিন্তু লোকনাথের সঙ্গে উমাপদর সম্পর্ক বেশী ঘনিষ্ঠ কিনা, তাই সে তাকে তুমি বলে।

শশাঙ্ক চিন্তিত হয়ে বলল, 'থাকবে কি?'

'বীরেশ্বরকে একটা কাজে লাগাব ভাবছি। ভাল মাইনে।'

'কাজ করবে কি?'

'বলেই দেখ না?'

'বলে লাভ হবে কি কিছু?'

রক্ত-মাংসের দেবতাদের প্রশ্ন ও প্রস্তাবকে নাকচ করা জবাব দ্বিধাসন্দেহ ভরা প্রশ্নের দ্বারা দেওয়াই শশাঙ্কের স্বভাব!

তার ধারণা, এতে উভয় পক্ষেরই সম্মান বজায় থাকে।

'বললে দোষ কি?'

'কি দোষ?'

শশাঙ্কের রকম দেখে উমাপদ দমে যায়। অতি উদাসীন ভাব অবলম্বন ক'রে বলে, 'থাকগে তবে, বলে কাজ নেই। একটা লোক দরকার ছিল তাই, নইলে বীরেশ্বর থাকলো বা গেল, আমার কি?'

উমাপদ নিজেই বীরেশ্বরকে বলতে পারে। কিন্তু সে যদি অনুরোধ না রাখে? তাতে বড়ই অপমান হবে।

শশাঙ্ক চলে গিয়েছিল, খানিকপরেই জুতো জামা পরে সে ফিরে এল। সলজ্জ একটু হেসে বলল, 'পাঁচটা টাকা হবে ভাই?'

'টাকা নেই।'

মুখখানা ম্লান করে শশাঙ্ক ফিরে যাচ্ছে, উমাপদ হঠাৎ ডেকে বলল, 'শশাঙ্ক, দাঁড়াও টাকা দিচ্ছি।'

দাঁড়াতে বললেও উমাপদ তাকে দাঁড় করিয়ে রাখে না। শোবার ঘরের পাশে তার বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায়। পাঁচ টাকার একখানি নোটের বদলে দশটাকার কয়েকখানা নোট নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

'তোমার স্ত্রী তোমার কথা শোনে শশাঙ্ক?'

শশাঙ্ক গাল উথলানো হাসি হাসে।—'শোনে না? চোখ কান বুজে শোনে। সহুরে মেয়ে নাকি যে কথা শুনবে না?'

বলি বলি করে বলতে উমাপদর বাধে। মনটা বড় তিতো হয়ে যায়। ভয় ও ভদ্রতার বাধায় বলতে না পারার তিক্ততা। দু' একদিনের মধ্যে রম্ভা নাগালের বাইরে চলে যাবে, —হয়তো চিরদিনের জন্য। রম্ভা হয়তো ভাববে, কি কাপুরুষ বাবুটা, কি ভীরু।

কথাটা বলতে শেষের চিন্তাটাই তাকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করল।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার আগে শশাঙ্ক রম্ভাকে বলে গেল সে যেন আজ দিগম্বরীব ঘরে শোয়। রাত্রে সে বাড়ী ফিরবে না।

উমাপদর বৌ লিলি বড় ঘুমকাতুরে। মাস আষ্টেকের একটি তার ছেলে আছে, অন্ধ ছেলে। দশটার আগেই ঘরে এসে ছেলেকে মাই দিতে দিতে দশ মিনিটের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ে। উমাপদ ঘুম ভাঙ্গালে কান্নার একেবারে বন্যা বইয়ে দেয়। ছেলেটা নির্জীব, বেশী জ্বালাতন করে না। চি চি করে একটু সে কাঁদলেই ঘুমের মধ্যেই লিলি আবার তার মুখে মাই গুঁজে দেয়। একটা দাই আছে ছেলে রাখার, কিন্তু লিলি তাকে ছেলে দিতে চায় না। ছেলে ছাড়া তার ঘুমোতে কষ্ট হয়। নেহাৎ যেদিন বেশীরকম জ্বালাতন করে, অসুখের জন্য মাই না টেনে কাঁদে, শুধু সেদিন দাইকে ডেকে এনে তার জিম্মা করে দেওয়া হয়। দাইয়ের কাছে ছেলে কাঁদে কি না কাঁদে লিলি বা উমাপদ কেউ টেরও পায় না, দাইয়ের ঘব অনেক তফাতে ঘুমের ঘোরে লিলি শুধু মাঝে মাঝে বিছানাটা হাতড়ায়।

আজ লিলি ঘরে এল প্রায় সাড়ে দশটায়। নিজের খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে উমাপদ তখন বই পড়ছে, বিলাতের নতুন যুগের এক আদর্শ বীরেব কাহিনী—কপর্দকশূন্য বেকার এক তরুণ বুদ্ধি খাটিয়ে বাছা বাছা ধনী ঠকিয়ে কি করে নিজে বড়লোক হয়ে প্রতারণার চালবাজিতে হারমানা এই এক~~জন~~ ধনীর মেয়েকেই ভালবেসে বিয়ে করে সুখী হল। বইখানার একুশটি এডিশন হয়েছে—চাব বছরের মধ্যে।

ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে তাকিয়ে ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে লিলি বলল, 'শুনছ? ডাক্তার দেখাবে বলেছিলে যে আজ?'

'মনে ছিল না।'

'তা কেন মনে থাকবে? কেমন ঘায়ের মত হয়ে গেছে প্যাঁচড়াগুলো, নিজের হলে বুঝতে। খোকারও হচ্ছে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, কাল ডাক্তার ডাকব।'

'বড় ডাক্তার ডেকো।'

'ডাকব।'

ঘুম-কাতুরে লিলিব মান অভিমান কলহ বিলাপের জের টানার ক্ষমতা নেই, শুতে পারলেই সে বাঁচে।

সে শুয়ে পড়তেই বই রেখে উমাপদ বেরিয়ে যায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে সিগারেট টানে। একতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে শশাঙ্কের ঘরে যেতে হলে এই বারান্দা পার হতে হয়।

প্রায় আধঘন্টা পরে রম্ভা এল।

সমস্ত বাড়ী তখনো সজাগ। এ বারান্দা দিয়ে লোক যাওয়া আসা করছে। কোন ঘরের আলোই প্রায় নেভেনি।

'আমার স্ত্রী তোমায় একবার ডাকছিলেন রম্ভা।'

'এত রাতে? শুনে আসি যাই তবে।'

উমাপদ তাকে শয়নঘরের বদলে বসবার ঘরে নিয়ে গেল।

বলল, 'বোসো, একটু আলাপ করি তোমার সঙ্গে। তোমরা নাকি চলে যাচ্ছ আজকালের মধ্যে?'

রম্ভা বলল, 'উনি কই?'

উমাপদ সংক্ষেপে বলল, 'বোসো। ভয় কি?'

ভয়? কথাটা রম্ভার ভাল লাগল না। এ বাড়ীর এরকম অনেক ঘরেই ঢুকে সে একটু অভিভূত হয়ে পড়ে। তাই বলে পালিশ করা মেঝে রঙীন দেয়াল ঝালরপর্দার আর চকচকে ঝকঝকে আসবার আলোয় ঝলমল করছে দেখে সে ভয় পেয়েছে ভাবল লোকটা!

ভয় পাওয়াব অন্য মানেটা রম্ভা তখনো আন্দাজ করতে পারেনি। তারপব উমাপদ এসে তার বাঁ হাতটি ধরে অতি মৃদু ও মিহি এবং একটু ধরা গলায় কথা বলতে সুরু করায় চকিতে রম্ভা সব আন্দাজ করে নিল। একটা তার ভয় হল এবার। গোলমাল হলে একটা কেলেঙ্কারি না হয়! হাত নিয়ে হঠাৎ টানাটানি করতে তার সাহস হল না। উমাপদর মুখ দেখে আরো বেশী ভয়ে ও বিস্ময়ে সে হতবাক হয়ে গেল। প্রথম এসে উমাপদর যে মুখখানা তার এত সুন্দর আর কোমল মনে হয়েছিল সে মুখে যেন ঝুমুরিয়ার নিতাই পাগলার মুখের ছাপ পড়েছে, চোখ দুটি অবিকল এক রকম। বিনানুমতিতে পুরুষ হঠাৎ হাত ধরেছে এ অভিজ্ঞতা রম্ভার ছিল। ঝুমুরিয়ার কালী বর্ধনও পুকুরঘাটের নির্জন গাছতলায় এর চেয়েও জোবে তার হাত চেপে ধরেছিল, তার মুখ তো এমন দেখায়নি, বরং সে মুখেব তীব্র আকাঙ্ক্ষা বুকের মধ্যে নাড়া দিয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকে প্রায় অবশ করে রেখেছিল। কালী বর্ধনের বেলা রাগ হয়েছিল, ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাড়ী চলে যাবার পরেও বহুক্ষণ গা জ্বালা করেছিল রাগে। এখন রম্ভার কেমন ঘেন্না করতে লাগল, মনে হল উমাপদর স্পর্শ যেন অশুচি।

উমাপদর মুখের দিকে রম্ভা আর তাকাতে পারল না। মাথা নামিয়ে আস্তে আস্তে তার হাত ছাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দিগম্বরী বারান্দার এদিকের কোণের ছোট ঘরখানিতে দরজাব সামনে যেন রম্ভাব প্রতীক্ষাতেই দাঁড়িয়েছিল। ঘরে ঢুকেই সে জিজ্ঞেস করল, 'উমা ঠাকুরপো কি বলছিল রে তোকে?'

'কিছু না।'

'কিছু না কি লো ছুঁড়ি? তোকে ঘরে ডেকে নিয়ে গেল দেখলাম না নিজেব চোখে?'

'শুধোচ্ছিলেন আমরা কবে যাব।'

দিগম্বরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রম্ভার মুখের দিকে চেয়ে সন্দিগ্ধ ভাবে বলল, 'একথা শুধোবার জন্য একটা সোমত্থ মেয়েকে ঘরে নিয়ে যাবার দরকার! উমা ঠাকুরপোর কাণ্ড জ্ঞান নেই সত্যি।'

দিগম্বরীকে সব খুলে বলার জন্য রম্ভার মনটা আকুলি বিকুলি করছিল। কিন্তু একথা বলা যায় না। উমাপদকে খাতির করে নয়, মমতা করেও নয়। জানাজানি হয়ে বীরেশ্বরের কানে উঠলে আর রক্ষা থাকবে না। ভাগ্নেবাবুকে কীচক বধ করে হয়তো সে ফাঁসি যাবে। একজন তার হাত ধরেছে বলে বাপ তার ফাঁসি যাবে, এটা রম্ভার মোটেই সঙ্গত মনে হল না।

'এত রাতে তুই যে ওপরে এলি?'

'তোমার কর্তাই তো আসতে বলল দিগুদিদি?'

দিগম্বরী আশ্চর্য হয়ে বলল, 'উনি আসতে বললেন?'

আজ রাত্রে ফিরবে না বলে শশাঙ্ক রম্ভাকে তার কাছে শুতে বলে গেছে শুনেও দিগম্বরীর বিস্ময় কমে না। কথাটা সে বিশ্বাস করতে চায় না।

'রাতে ফিরবেন না? আমায় তো বলেননি কিছু।'

'বলেননি?'

'না। তুই ভুল শুনেছিস রম্ভা। রাতে উনি বাড়ী ফিরবেন না সেকথা আমায় না বলে তোকে বলে যাবেন? তোর মাথা খারাপ হয়েছে। কি শুনতে কি শুনেছিস তুই!'

রম্ভার কথা সে কানেই তুলিতে চায় না। বলে, 'আমি বলে ভাত এনে ঢেকে রাখলাম ওঁর জন্যে, উনি ফিরবেন না!'

রম্ভা মুচকি হেসে বলে, 'বলে যেতে সাহস হয়নি হয়তো।'

দিগম্বরী চটে বলে, 'চোপাসনি রম্ভা। সাহস আবার কি? স্ত্রীকে বলে যেতে সোয়ামীর সাহস। এমনি বাইরে গিয়ে কোথাও আটকে গেলেন, সে হল ভিন্ন কথা। রাতে ফিরবেন না ঠিক করে গেলেন, তোকে বললেন আর আমায় বললেন না, এ কখনো হয়?'

দিগম্বরী দিশেহারা ভাব দেখে রম্ভা চুপ করে থাকে। একটা সহজ সাধারণ কথাকে দিগম্বরী কেন এত বাড়িয়ে তুলছে তাও সে ভেবে পায় না। সমস্ত দুপুরটা সহর দেখে বেড়িয়ে সে শ্রান্তি বোধ করছিল। হাই তুলে সে জিজ্ঞেস করে, 'খেয়ে এসেছো তো দিগুদিদি?'

দিগম্বরী গালে হাত দিয়ে বলে, 'শোন মেয়ের কথা। ওনার আগে খাবো কি লো?'

রম্ভা চেয়ে দেখে, একটি আসনের সামনে একটি মাত্র থালা এবং গেলাস। পাশে অল্প ব্যঞ্জনের পাত্রগুলি আছে, কিন্তু আর থালাও নেই, গেলাসও নেই। বুঝেও সে না বোঝার ভান করে।

'পাতে খাবে বুঝি কত্তার?'

দিগম্বরী জবাব দেয় না।

'ভাতে যদি কম পড়ে দিগুদিদি?'

দিগম্বরী চুপ করে থাকে।

স্বামীই হোক আর যেই হোক একজন আরেকজনের পাতে বসে খাবে এটা কিছু খাপছাড়া ব্যাপার নয় রম্ভার কাছে, সে নিজেও কতবার কতজনের পাতে খেয়েছে। দিগম্বরীর নীরবতার মানে সে বুঝতে পারল না।

'সোয়ামীর পাতে না খেলে কি হয় দিগুদিদি?'

'পাপ হয়।'

'কেন? ভুক লাগলে মানুষ খাবেনি?'

'সোয়ামীর আগে মেয়েমানুষের ভুক লাগবে কেন লো ছুঁড়ি? আগে সোয়ামী হোক, তখন বুঝবি।'

'চাইনি বাবা!' বলে এত দুঃখেও রম্ভা হেসে ফেলল। তখন ফিরে এল শশাঙ্ক। তার অবস্থা একটু টলমল, যা দেখে জয়ের গর্বে রম্ভার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাবার মুখটা দিগম্বরীর ফসকে গেল।

'আপনি বলে ফিরবেন না?'

'একটা কথা কইতে এয়েছি।'

বলে শশাঙ্ক ইসারা করে দিগম্বরীকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। মিনিট দুই পরে উমাপদ ঘরে ঢোকামাত্র বাইরে থেকে কে যেন শিকল তুলে দিল দরজায়।

'তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম রম্ভা।'

রম্ভা অনড় অচল হয়ে বসে তাকিয়ে রইল।

'একটা উপহার এনেছি তোমার জন্য।'

উমাপদ একটি ঝলমলে সোনার নেকলেশ রম্ভার সামনে মেলে ধরল। বিদ্যুতের আলোয় প্রতি মুহূর্তে শত তীক্ষ্ণ চমক চমকাতে লাগল।

রম্ভার মনে হল, এ লোকটা চোখ আর গয়না দিয়ে খুঁচিয়ে আর আঁচড়িয়েই শুধু কেবল পীড়িত করতে জানে, আর কোন পথ জানে না।

'নাও? এটা তোমার। তোমায় দিলাম।'

রম্ভা নীরবে মাথা নাড়ল।

যতক্ষণ পারা যায় নিজেকে সে সংযত রেখে চলবে। লাথি যদি মারতে হয় মানুষটাকে মারবে একেবারে শেষ মুহূর্তে। বিশ্রী একটা ফাঁদে যে সে পড়েছে রম্ভা সেটা ভাল ভাবেই টের পাচ্ছিল। গণ্ডগোল এড়িয়ে যাবার ভরসা তার বিশেষ ছিল না। এ লোকটার লজ্জাশরম নেই, কেলেঙ্কারির ভয়ও বোধহয় বিশেষ করে না। শশাঙ্ক আর দিগম্বরী এর দলে জুটে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। এ এখন ধীরে সুস্থে যা খুশী করে যাবে। সে অবশ্য সহ্য করে যাবে যতক্ষণ পারে, কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে। বন্ধ ঘরে এ যখন তাকে একা পেয়েছে, কতক্ষণ আর লাগবে সে অবস্থার সৃষ্টি হতে যখন গোলমালের ভয়ে চুপ করে থাকলে তার চলবে না! ভয় দেখাবে? উমাপদকে ভয় দেখিয়ে দেখবে কি হয়?

এই সব ভাবছে রম্ভা, শিকল খুলে দিগম্বরী ঘরে ঢুকল। সমস্ত ষড়যন্ত্র সমস্ত কদর্যতা হাল্কা হাসিতে শূন্যে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে বলল, 'চটলেন ঠাকুরপো, বৌদির তামাশায়?'

উমাপদ বলল, 'না।'

দরজার বাইরে থেকে শশাঙ্ক চাপা গর্জন করে ডাকল, 'শুনছো? বাইরে শুনে যাও।'

দিগম্বরী বলল, 'ঠাকুরপো বসুন।'

শশাঙ্ক আবার ডাকল, 'এই! শুনে যাও বাইরে—শুনে যাও বলছি।'

দিগম্বরী প্রাণপণে হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'কি হল ঠাকুরপো, বসুন না?'

তখন উমাপদ নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। শশাঙ্ক ঘরে ঢুকেই দিগম্বরীর গালে বসিয়ে দিল একটা চড়। রম্ভার দিকে তাকিয়ে দিগম্বরী ধমকে উঠল, 'কি দেখছিস হাঁ করে? পালাতে পারিস নে বোকা হাবা ছুঁড়ি? বেরো—বেরো আমার ঘর থেকে।'

শশাঙ্ক আবার চড় মারে আর বলতে থাকে, 'তোর তাতে কি? তোর তাতে কি এলো গেলো হারামজাদী মাগী?'

দিগম্বরী তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে, 'তোমার অকল্যাণ হবে যে গো। এ পাপ তোমার সইবে না, অকল্যাণ হবে তোমার।' নত হয়ে শশাঙ্কের পায়ে হাত দিয়ে বলে, 'আমায় মেরে ফ্যালো, আমি পারব না।'

শশাঙ্কের লাথি খেয়ে সে মেঝেতে একটা গড়ান দিয়ে ওঠে। গায়ে লেগে কাঁসার পিকদানিটা যায় উল্টে। সঞ্চিত পানের পিক মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ায় মনে হয় যেন রক্তারক্তি

হয়ে গেল।

শশাঙ্কের চোখ পিট্‌পিট্‌ করে। বিছানায় উঠে উল্টানো পিকদানিটার দিকে চেয়ে সে গুম্‌ খেয়ে বসে থাকে। দিগম্বরী মেঝে সাফ করা সুরু করলে তাকে দেখতে দেখতে শশাঙ্কের মনে হয়, বৌটা তো তার মন্দ নয় দেখতে! খাসা গড়ন, কোমল রঙ, মোলায়েম মুখ। রূপসী তো এমন কিছু কম নয় দিগম্বরী! আর ভাল যে কত তার তুলনা হয় না। সাত বছর তাকে নিয়ে তন্ময় হয়ে আছে—দেবতার মত পূজা করে। তার অকল্যাণ হবে বলে তাকে অন্যায় পর্যন্ত করতে দেয় না। সাত বছর ধরে দিগম্বরী—এখন যাকে আশ্চর্যরকম সুন্দরী দেখাচ্ছে—দৈনন্দিন অসংখ্য পূজার কথা ভাবতে ভাবতে গর্বে শশাঙ্কের বুক ফুলে ওঠে। কে বলে সে মানুষ নয় মানুষের মত, পুরুষ নয় পুরুষের মত?

কলসীর জলে মেঝে ধুয়ে ঘরের নালা দিয়ে দিগম্বরী জল বার করে দেয়, ন্যাতা দিয়ে মেঝে মুছে ফেলে, দরজা খোলে না। শশাঙ্ক তাকে দেখছে, শশাঙ্ক চিন্তামগ্ন হয়েছে, এসব সে না তাকিয়েই টের পায়। সে শশাঙ্কের কথার প্রতীক্ষা করে থাকে। সে জানে শশাঙ্কই প্রথমে কথা বলবে।

‘লেগেছে নাকি?’

সজল চোখে হাসি-মুখে মৃদু উদাসীনতা অভিমান ও অভিযোগ মেশানো সুরে দিগম্বরী জবাব দেয়, ‘না।’

‘সহরে এসে বিলিতী খাবার সখ হল একটু।’

‘দিশি বিলিতী কিছুই ওসব তোমার সয় না। যা খাও না, যা সয় না, কেন খেয়ে কষ্ট পাও?’

এই স্নেহের অনুযোগের জবাব শশাঙ্ক দিতে না পারায় দিগম্বরী সুর পালটে বললে, ‘ভাত খাবে না এখন?’

শশাঙ্ক খায়। খেতে খেতেই বাঁ হাতে একবার দিগম্বরীর গাল টিপে দেয়। কৃতার্থ হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে দিগম্বরী বলে, ‘ধেৎ।’

খাওয়া দাওয়া চুকবার পর শোয়া। দিগম্বরীকে বুকে টেনে নিয়ে শশাঙ্ক বলে, ‘তুমি বড় ভাল দিগু।’

রোমাঞ্চিত দিগম্বরী গদগদ ভাষায় বলে, ‘কাল কালীঘাটে পূজো দিয়ে আসব তোমার জন্যে। তোমার সময়টা যাতে ভাল হয়।’ বলতে বলতে অসহ্য আবেগে দিগম্বরী যেন ক্ষেপে যায়, হু হু করে কেঁদে বলে, ‘তোমার জন্যে আমি মরতে পারি, জানো? জানো তোমার জন্যে আমি লাখোবার মরতে পারি?’

বাইরে পা দেওয়ামাত্র দিগম্বরীর ঘরের দরজা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রম্ভা জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে। রাগে ক্ষোভে বুকটা তার জ্বলে যেতে থাকে। হাত পা থর থর করে কাঁপছে টের পেয়ে এগিয়ে গিয়ে বেলিংটা দু'হাতে শক্ত করে চেপে ধরে। চুপচাপ সব সয়ে যাবার কষ্টটাই এখন তার অসহ্য মনে হয়। উমাপদর চেয়ে রাগটা তার বেশী হয়েছিল শশাঙ্কের উপর। উমাপদ কেঁচো শ্রেণীর অপদার্থ জীব, এখনো রম্ভার মনের গভীর অবজ্ঞা ঠেলে তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ মাথা তুলতে পারছিল না। একটা বঁটি এনে শশাঙ্ককে কেটে ফেলবার সাধটা তার প্রায় অদম্য হয়ে উঠেছে।

দিগম্বরী ধমকে ঘর থেকে বার করে না দিলে সে হয়তো গেলাস বাটি ছুঁড়ে শশাঙ্ককে

মেবে বসত।

শশাঙ্কের পায়ে ধরে দিগম্বরীর নাকি-কান্নার কথা কানে আসতে রম্ভা সেখান থেকে সরে গেল। শশাঙ্ক যখন ফিরে এসেছে, নীচে গিয়ে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়তে তার বাধা নেই। রম্ভা দেরী করছিল দম নেবার জন্য। একটু শান্ত হয়ে নীচে না গেলে বীরেশ্বর হয়তো তার মুখ দেখে আর কথা শুনে কিছু সন্দেহ করে বসবে। গায়ের জ্বালায় ঝোঁকের মাথায় নিজেই হয়তো সে বাপের কাছে সব বলে বসবে। সত্য কথা বলতে কি, বীরেশ্বরকে সব জানিয়ে উমাপদকে যত না হোক, শশাঙ্ককে শাস্তি দেবার জন্য রম্ভার ভিতরটা আকুলি বিকুলি করছিল। বাপের বদমেজাজের জন্য বাপের কাছে কোন কোন কথা গোপন করার প্রয়োজনটাও রম্ভা অল্পকাল হল অনুভব করতে আরম্ভ করেছে, গোপন করা এখনো অভ্যাস হয়নি।

বারান্দা প্যাসেজ আর সিঁড়িতে বাড়ীটা রম্ভার কাছে গোলকধাঁধার মত ঠেকে। তেতলায় অন্দরের পিছন দিকে পূর্বোত্তর অংশটি নির্জন। দুতিনটি পাক দিয়ে রম্ভা সেখানে পৌঁছল। চাঁদ ছিল বাড়ীর এই পিছন দিকে, সরু বারান্দাটি জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। একপ্রান্তে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি, একেবারে নীচে থেকে উঠে সেটা ছাদে চলে গেছে। বারান্দার অন্য প্রান্তটি শেষ হয়েছে একতলা বন্ধ ঘরের দরজায়। নীচের ছোট উঠানটিতে পড়েছে সামনে গায়ে গায়ে লাগানো বাড়ী দু'টির ইঁট বার করা পিছনের দেওয়ালের ছায়া। ভেসে আসছে ঘর ধোয়া আর বাসন মাজার শব্দ। এত জোরে এরা ঝাঁটা চালায়! এত আওয়াজ তোলে বাসনপত্রের! লোকনাথের ছোট ছেলেটির বাঁশী এখনো বেজে চলেছে। উপরের খোলা ছাদ থেকে ভেসে আসছে লোকনাথের সন্ন্যাসী ভাই সোমনাথের গম্ভীর উঁচুগলার সাধন সঙ্গীত। ঝুমুরিয়ায় এখন গভীর রাত, ঘরে ঘরে সব ঘুমিয়ে আছে। এ বাড়ীতে অর্ধেক মানুষ এখনো জেগে। ঘরে গিয়েছে, হয়তো, শুয়েও পড়েছে, কিন্তু চোখে ঘুম নেই।

ঘুমের কথা ভাবতে গিয়ে রম্ভার ধীরে ধীরে ঘুম পায়। গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে আসে। লোহার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যাবে ভাবছে, কোণের অন্ধকার ঘরের দুয়ার খুলে বেরিয়ে আসে লোকনাথের বিধবা বোন কালীতারা। সেখানে খানিকটা স্থানে জ্যোৎস্না পড়েনি। প্রতিফলিত স্তিমিত আলোয় একখানা সাদা ধবধবে থান কাপড় যেন ডাইনীর মায়ায় আপনা থেকে ভাঁজ খুলে মানুষের রূপ নিয়ে রম্ভাকে আঁতকে দিতে চেয়েছে।

'কে ওখানে?' কালীতারা কাছে এগিয়ে আসে।

'আমি রম্ভা।'

'রম্ভা কে? নতুন ঝি? এখানে কি করছিস?'

'ঝি নই। ঝুমুরিয়া থেকে এয়েছি শশাঙ্কবাবুর সাথে।'

'তা বেশ করেছো। এখানে কি করছ শুনি এত রাতে?'

কি ঝাঁঝ কালীতারার কথার। যেন কামড়ে দিতে চায়।

'কি আর করব? দাঁড়িয়ে আছি।'

ঝাঁঝালো গলায় ফোঁস করা জবাব দিয়ে ক্রুদ্ধ ও বিমর্ষ রম্ভা গট গট করে লোহার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। দু'দিন আগে এই কালীতারাই তার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলেছিল। কি মিষ্টিই লেগেছিল কথাগুলি রম্ভার কাছে! কি ভালোই লেগেছিল সেদিন মানুষটাকে।

সিঁড়ির শেষে শুধু একজনের সঙ্গে রম্ভার দেখা হল,—ঝাড়ুদার সুখলাল। মাত্র কয়েক ধাপ ওপর উঠেছিল, রম্ভাকে নামতে দেখে নেমে গিয়ে পথ ছেড়ে দাঁড়াল। ঝাড়ুদার সুখলাল আশ্চর্যরকম সুপুরুষ। কোন রাজা মহারাজা কিম্বা দেশী বা বিদেশী সম্ভ্রান্ত ঘরের রূপবান

পুরুষের ঔরসে তার জন্ম হয়েছে সে জানে না। জানবার দরকারও নেই। কিছু এসে যায় না। সমাজ তাকে এ বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। যে স্তরে তার স্থান তার চেয়ে নীচু স্তর তো আর নেই, কারো তাই ক্ষমতাও নেই তাকে নীচে নামায় বা বর্জন করে। আস্তাকুঁড় থেকে আবর্জনাকে বর্জন করার ঠাঁই কই?

পিসী জেগে ছিল। রম্ভা ডাকতেই উঠে দরজা খুলে দিল। বীরেশ্বর ঘুমিয়ে পড়েছিল তার ঘুম ভাঙ্গল না। শুয়ে পড়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে রম্ভাও ঘুমিয়ে পড়ল।

কালীতারা রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে, মুখ উঁচু করে আকাশের দিকে চেয়ে। রম্ভার বেয়াদপিতে তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। সামান্য একটু আঘাত পেলেই নিজের জন্য কালীতারার কান্না পায়। খানিকটা সীমাবদ্ধ আকাশে কিছু ছড়ান সাদা মেঘে জ্যোৎস্নার ছোঁয়া দেখতে দেখতে সে যেন হৃদয় জুড়ে ছেঁড়া ছেঁড়া হালকা ব্যথার অস্তিত্ব স্পষ্ট অনুভব করে চোখ দু'টি তার সজল হয়ে আসে।

ওপরে উঠে এসে এদিক ওদিক চেয়ে সুখলাল সন্তর্পণে কালীতারার অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে কালীতারাকে তন্ময় দেখে বেরিয়ে এসে তার বাহুমূলে টোকা দিল।

'আজ যা। যা বলছি।'

কালীতারার গলা আবেগের শ্লেষ্মায় ভেজা। চোখ তার চাঁদমাখা ওপরের চাঁদোয়ায়। মুখ তার ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে, যেন ওপর হতে সুধার ধারা মুখে পড়বে তারই তৃষ্ণার্ত প্রতীক্ষায়—কাত করা শিশি থেকে রোগীর হাঁ করা মুখে ওষুধ ঝরে পড়ার সেই বিজ্ঞাপনের ছবির মত। সুখলালের দিকে সে চেয়েও দেখল না। সুখলাল চকিতে উধাও হয়ে গেল

কালীতারা তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করে চলল তার ভাবাবেগ। সে মাঝবয়সী। তার দেহ মোটা। অন্তহীন অবসরের মৃদু শৌখীন একটানা ঘষায় মনের তার ছালচামড়া উঠে গেছে অনেককাল, তার আত্মদর্শনে কাঁচা মাংসের লালিমা। কোথায় গেলে কি করলে তাঁকে পাওয়া যায় যিনি জীবনদেবতা—এ ব্যাকুলতা একবার জাগলে আর রক্ষা নেই, কালীতারার নেশা ধরে যায়। এবং নেশা একবার ধরলে চড়্‌চড়্‌ করে নেশা চড়তেই থাকে।

প্রায় যখন আর সইছে না কালীতারার, তখন হঠাৎ সে নীরেনের বাঁশী আর সোমনাথের সাধন সঙ্গীত সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। গটগট করে নীরেনের ঘরে গিয়ে হাত থেকে বাঁশীটা ছিনিয়ে নিয়ে গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়।

'গলায় রক্ত উঠে মরবি?'

ভাইপোকে শাসন করে কালীতারা যায় ছাতে।

পরদিন সকালে কৃষ্ণেন্দু, হীরেন, মমতা ও আরিফ কলকাতা পৌঁছল। আরিফ মমতার বাবার অতিশয় প্রিয় ছিল। মমতার বাপ বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপক, নাম আছে। একালের বৈজ্ঞানিকদেরও সেকেলে ঋষিদের মত সমসাময়িকদের সম্পর্কে দারুণ ঈর্ষা থাকলেও ছাত্রের মেধা থাকলে তাকে প্রায় ছেলের মতই ভালবাসতেন। কিন্তু হঠাৎ ডক্টরেটের চেয়ে দেশের স্বাধীনতাকে বেশী মূল্যবান মনে করে রিসার্চ বন্ধ করে স্বদেশীপনা আরম্ভ করার পর থেকে আরিফকে তিনি বড় অপছন্দ করছেন।

আরিফ বলেছিল, 'দেশে বড় বড় বৈজ্ঞানিক আছেন। নোবেল প্রাইজ পর্যন্ত পেয়েছেন কেউ কেউ। কিন্তু আমার দেশের কি লাভ হয়েছে?'

মমতার বাবা বলেছিলেন, 'দেশের মর্যাদা বেড়েছে—পৃথিবীর লোক জেনেছে আমরা তুচ্ছ নই। আমাদের মাথা আছে।'

আরিফ বলেছিল, 'তার তো কোন প্রমাণ পাই না। পৃথিবীর লোক জানে আমরা অসভ্য—জংলী। ইংরেজ আমাদের সভ্য করেছে। আমরা এমন অসভ্য যে ধর্ম নিয়ে হানাহানি করি। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাই বাধ্য হয়ে আমাদের সামলে চলেছে। আমার কি মনে হয় জানেন? আমরা যখন আমাদের দু'চারজন বড় বড় লোককে নিয়ে গৌরব করি—সমস্ত জগৎ হাসে! আমাদের গৌরব করার যদি কিছু সাজে সেটা শুধু গান্ধী, জিন্না, জহরলালের দৌলতে—অবিশ্যি এঁদেরও নাম করা যায়। ওঁরা কেউ বৈজ্ঞানিক নন।'

মমতার বাবা বলেছিলেন, 'আরিফ, তুমি ভুল করেছ। দেশকে স্বাধীন করার দায়িত্ব সকলের তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে সবাই কি পলিটিক্স নিয়ে মেতে থাকবে? দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য চুলোয় যাবে? স্কুল কলেজ উঠে যাবে?

মমতা মাঝখান থেকে মন্তব্য করেছিল, 'আপনি সত্যি ভুল করেছেন। আপনার ব্রিলিয়াণ্ট ফিউচার—'

আরিফ ভুরু কুঁচকে বলেছিল, 'ব্রিলিয়াণ্ট? ডক্টরেট ডিগ্রি পাব, একটা প্রফেসারি পাব, ছেলেখেলার একটা ল্যাবরেটারীতে কাজ পাব। হয়তো ভিটামিন সম্পর্কে মস্ত একটা আবিষ্কার করে নোবেল প্রাইজ পেয়ে যাব। আমার দেশের কোটি কোটি কঙ্কালের গায়ে এক আউন্স মাংস বাড়বে?'

মমতার প্রতিরোধ শুনেও তার বাবা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'তুমি মমতার মত তর্ক করতে শিখেছ আরিফ।',

আরিফ মমতার মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়নি। তার দৃষ্টি দেখে মমতার মনে হয়েছিল তার অজান্তে সে ফকির হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যের চেয়ে বড় আগামী দিনের এক জ্ঞানের রাজ্য—সম্রাটের চেয়ে বড় জ্ঞানীর গৌরব—ত্যাগ করার ফকিরী নিয়েছে আরিফ।

পরে আরিফ তাকে বলেছিল, 'উনি ভেবেছেন তুমি আমার মাথা বিগড়ে দিয়েছ মমতা।'

মমতা গম্ভীর মুখে বলেছিল, 'তা কি সত্যি নয়?'

আরিফ একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল।—'বোধহয় সত্যি, বোধহয় সত্যি। হ্যাঁ, সত্যি বৈকি, নিশ্চয় সত্যি বৈকি, নিশ্চয় সত্যি।' তারপর সামলে নিয়ে হেসে বলেছিল, 'সায়াণ্টিস্ট হয়ে এই বা বলি কি করে! আমার কোন দোষ নেই—আমার বেলা তুমি শুধু ক্যাটালিটিক এজেণ্টের কাজ করেছো। মাথা তুমি বিগড়ে দিচ্ছ হীরেনবাবুর।'

মমতা তখন আরিফের দু'কাঁধে দু'হাত রেখে বলেছিল, 'আরিফ!'

'বেগম সাহেব?'

'তোমার একটা বিশ্রী বদখত ধারণা আছে। আমি জানি আছে।'

'কি ধারণা?'

'আমি তোমায় ভালোবাসি কিন্তু তুমি মুসলিম বলে—'

'ভালোবাসো না?'

'তা নয়। তোমার ধারণার কথা বলছি। তুমি ভাবছ, তোমায় আমি ভালোবাসি। কিন্তু তুমি মুসলিম বলে তোমায় বিয়ে করতে রাজী নই।'

'বিয়ে? বিয়ের কথা কোনদিন বলিনি।'

'তাইতো বলছি।'

মেধাবী উচ্চাভিলাষী আরিফের যে কি বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে মমতা সেটা টের পেয়েছ পাটনা কনফারেন্সে তার বক্তৃতা শুনে। হীরেন বক্তৃতা দিয়ে বেশ হাততালি পেয়েছিল। মমতা অবাক হয়ে গিয়েছিল যে হীরেন এমন ঘষামাজা যুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিতে পারে। গর্বের তার সীমা থাকেনি। সমসাময়িক মানব সভ্যতার পটভূমিকায় ভারতের সমস্যাগুলির এমন নিখুঁত বিশ্লেষণ সে খুব কম শুনেছে। আরিফের বক্তৃতা হাততালির তারিফ পেল না। সভা যেন চাবুক খেয়ে সম্বিত পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল—সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের ভাবরাজ্য থেকে মাটির পৃথিবীতে নেমে এল। পুলিশ রিপোর্টাররা এতক্ষণ অনেকটা গা-ছাড়া ভাবে টুকছিল, তারা চমকে উঠে জোরে পেন্সিল চেপে ধরল। প্রথমে মমতার মনে হয়েছিল আরিফ বড় তীব্র বড় ঝাঁঝালো কথা বলছে। মাথা গরম হয়ে উঠছে আরিফের। তারপর সে বুঝতে পারল, আরিফ উত্তেজিত হয়নি, মার্জিত সুশ্রাব্য সাজানো গোছানো ভাষার বদলে সোজা স্পষ্ট কাটা কাটা বলছে বলেই এত রূঢ় আর তীব্র শোনাচ্ছে তার কথা।

সেই থেকে সভার সুর যেন বদলে গেল। পরে যাঁরা বললেন বক্তৃতা অনেকটা মাটির পৃথিবী ঘেঁষে ঘেঁষেই চলতে লাগল। সভার শেষে মমতা দু'হাতে আরিফের হাত চেপে ধরল

'আরিফ, আর দু'একবার এরকম বক্তৃতা শোনালে আমি তোমায় ভালবেসে ফেলব।'

বলতে বলতে সে তাকিয়ে দেখল, হীরেনের মুখখানা ঈর্ষায় একটু লম্বা হয়ে গেল।

কাজেই খানিক পরে মমতা তাকে বলল, 'তুমি সুন্দর বলেছ।'

কৃষ্ণেন্দু কাছে ছিল। সে একটু হাসল।

মমতা তাকে বলল, 'তুমি কিছুই বলতে পার না কেষ্টদা। ঠিক যেন অফিসিয়াল রিপোর্ট পড়ছ মনে হয়, একটানা একঘেয়ে। এরা সব নতুন, তুমি পাকা লোক হয়েও এদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পার না। লোকে তোমার কথা শোনে কেন তাই ভাবি।'

'লোকের কথা বাদ দাও। তুমি শোন কেন?'

'তোমার মনে ব্যথা লাগবে বলে।'

কথা বলতে বলতে দুজনে কয়েক হাত তফাতে সরে গিয়েছিল। কৃষ্ণেন্দু মমতার বাহুতে আঙুল দিয়ে আঘাত করে বলল, 'মানুষের মনে কষ্ট দিতে বড় কষ্ট হয়, না? হীরেন দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাও না? না, ও মানুষ নয়?'

'তাই ভাবছি।'

'কতকাল ভাববে? ভাবতে ভাবতে তো বছর কেটে গেল।'

'তুমি কি ওর হয়ে ঘটকালি করছ কেষ্টদা?'

'তোমার কাছে ঘটকালি? তোমায় চিনিনে আমি? বেচারার যদি বা কোন চান্স থেকে থাকে, কেউ বলতে এলে তুমি বেঁকে বসবে না? বন্ধুর হয়ে একটু ওকালতি করছি বলতে পার। একটু অন্যায় হচ্ছে মমতা। এবার ওকে তোমার রেহাই দেওয়া উচিত।'

'তোমার হুকুমে?'

রাগ হলে মমতা মুখ উঁচু করে একটু সামনে হেলে দাঁড়ায়। কোমরে আঁচল ছড়িয়ে গাল দিয়ে কলহ করতে দাঁড়াবার মেয়েলী ভঙ্গিতে।

কৃষ্ণেন্দুর মুখে জয়ের ছাপ দেখে ঠোঁট কামড়ে মমতা শরীর আলগা করে দিল। বলল, 'সম্পত্তি জ্ঞানটি বেশ টনটনে ভাবছ তো?'

কৃষ্ণেন্দু সায় দিয়ে বলল, 'তা তোমার একটু অহঙ্কার আছে বৈকি!'

'সম্পত্তিজ্ঞান আর অহঙ্কার বুঝি এক?'

'কিছু না থাকলে কি নিয়ে অহঙ্কার হবে? হীরেন ফসকে যেতে পারে জানলে কবে তুমি মন স্থির করে ফেলতে।'

'তা ঠিক। বলতাম ফসকে যাও।'

'কিন্তু ও দিকে তুমি নিশ্চিন্ত, তাই ওর কথা না ভেবে কেবল নিজের হিসেব করছ। ছেড়ে দিতে সাধ নেই, ধরা দিতেও ভরসা পাচ্ছ না। হীরেনকে জানতে বুঝতে তোমায় বাকী নেই—থাকা উচিত নয়। এতকাল মেলামেশা করেও ওকে যদি না বুঝে থাকো, কোনদিন বুঝতে পারবে না। আসল কথা তা নয় মমতা। তোমার সমস্যা ভিন্ন। তুমি বেশ ভাল করেই জানো তোমার এখানকার জীবনকে কতটুকু কাটছাঁট করতে হবে, কতটুকু কম্প্রোমাইজ, কতটুকু ত্যাগ দরকার হবে। এ দাম দেবে কিনা, যা পাবে এ দাম দিয়ে তা কেনা উচিত কিনা সেটাই তুমি ঠিক করতে পারছ না। ভেবে পাচ্ছ না ঠকবে না জিতবে।'

কথা কইতে কইতে তারা প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে এসে পড়েছিল। মমতা জোরে নিশ্বাস টেনে মুখোমুখি হয়ে বলল, 'তুমি যে আমায় সোসাইটি বাজারের মেয়ে বানিয়ে দিলে কেষ্টদা! মস্ত বড় লোকের ছেলে বলে ওকে খেলিয়ে তুলছি এটুকু বলতে ছাড়লে কেন?'

কৃষ্ণেন্দু হেসে ফেলল, 'খেলাবার দরকার ফুরিয়ে যাবার পরেও ওকে খেলাচ্ছ বলে।'

মমতা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আমার হৃদয়টা তো উড়িয়ে দিলে। আমি শুধু হিসেব করি!'

কৃষ্ণেন্দু হাসি মুখেই বলল 'তোমায় গাল দিইনি ভাই। হৃদয় উড়িয়ে দেওয়া দূরে থাক বরং বলেছি তোমার জোরালো একটা হৃদয় আছে। কোন্ জমিতে বন্যা আসে জানো তো? নীচু সেঁতসেঁতে জমিতে। প্রেমের বন্যা আসাটা হৃদয়ের পক্ষে মোটেই গৌরবের কথা নয়। সে বন্যায় ভেসে যাওয়া তো রীতিমত ছ্যাবলামি করা। হিসেব করবে না? এত বড় একটা ব্যাপারে? একেবারে খাতাপত্র নিয়ে বসে হিসেব করবে। তাছাড়া এ তো ফ্রি লাভের কথা নয়, বিয়ের ব্যাপার। তাও আবার হিন্দুমতে। আমি বলতে চাই, হিসেব হয়ে গেছে, এবার ইতস্ততঃ না করে মন স্থির করে ফেল।'

কৃষ্ণেন্দু ফিরবার জন্য পা বাড়াতে মমতা তার জামা ধরে আটকে রাখল। বলল, 'তুমি কিছুই বোঝনি কেষ্টদা। ওসব হিসেব বহুদিন চুকে গেছে। আমার আসল সমস্যা ছিল ভিন্ন। আমার বাসনা হল, ওকে আমার সঙ্গে কাজে নামাতে পারবো কি না। আমার সঙ্গে মানে, আমাদের কাজে। আমি চাষী মজুরদের জন্য খাটব আর আমার স্বামী মিলের মালিক হয়ে তাদের রক্ত শুষবেন, তাতো হয় না।'

'তুমি কি চাও বাপের সম্পত্তি ত্যাগ করে এসে হীরেন আমাদের সঙ্গে কাজ করবে?'

'তা কেন? আমরা কি মিল তুলে দিতে চাইছি? ও আদর্শ কারখানা করবে, মজুরদের অধিকার স্বীকার করে নেবে, সংগঠন গড়ে তুলতে কাজ করবে, আন্দোলন চালাবে—হাসছো নাকি কেষ্টদা?'

'না ভাই, হাসিনি।'

কৃষ্ণেন্দু একটা সিগারেট ধরাল। মমতা তার মন্তব্য শুনবার প্রত্যাশা করছে টের পেয়েও চুপ করে রইল।

খানিক অপেক্ষা করে মমতা বলল, 'শুনবে তবে? আমি মন এক রকম ঠিক করে ফেলেছি। ওর মধ্যে একটা প্রচণ্ড শক্তি আছে কেষ্টদা, একটা বিদ্রোহের ভাব আছে, তুমিও

বোধহয় যার পরিচয় পাওনি। দেশের জন্য সত্যিকার দরদ আছে, আমাদের কাজে সহানুভূতি আছে। আমি জানি, ওকে দিয়ে অনেক কিছু করিয়ে নিতে পারব।'

কৃষ্ণেন্দু তর্ক না করে সংক্ষেপে বলল, 'পারবে না।'

মমতা মৃদুস্বরে জবাব দিল, 'ও আমার জন্য সব করবে।'

আত্মবিশ্বাসের জ্যোতিতে মমতার টানা চোখ দুটি জ্বল জ্বল করতে থাকে। তার মুখ উজ্জ্বল দেখায়। কৃষ্ণেন্দুর মনে হয়, মমতাকে এত সুন্দর সে কখনো দেখেনি। বেতনাদিতে তার বাপের মাসিক আয় হাজার দেড়েক টাকা। কিন্তু মমতা কখনো সাধারণ মিলের শাড়ী ছাড়া দামী কাপড় পড়ে না। সুন্দরী মেয়েকেও যে সাজসজ্জা রূপপ্রসাধনের অভাবে দর্শকের অনভ্যস্ত চোখে তেমন সুন্দরী দেখায় না, মমতা যেন তাব প্রমাণের মত। একটু দ্বিধা করে কৃষ্ণেন্দু অন্তরের প্রতিবাদ জোর কবে অবহেলা করে বলে, 'মমতা, জগতে এমন পুরুষ নেই যে প্রেমের জন্য নিজেকে বদলাতে পারে। একটি মেয়েকে ভালবেসে তার জন্য মানুষ হাসিমুখে প্রাণ দিতে পারে কিন্তু নতুন মানুষ, ভিন্ন মানুষ হতে পারে না। পুরুষটির মধ্যে যা আছে তাকেই মেয়েটি বিকাশ করতে পারে, পরিণত করতে পারে, নতুন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। স্ফুলিঙ্গ থাকলে আগুন জ্বালাতে পারে, কিন্তু স্ফুলিঙ্গটি থাকা চাই। এখানে প্রেমের শক্তির সীমা। হীরেন তোমায় ভালবাসে, তুমি মজুরদের ভালবাসো। শুধু এইজন্য মজুরদের ভালবাসার ক্ষমতা হীরেনের কোনদিন হবে না। হীরেনের মধ্যে অনেক কিছু আছে, ওকে দিয়ে তুমি অনেক কিছু করিয়ে নিতে পারবে সত্যি, কিন্তু তুমি যে সব অনেক কিছুর কল্পনা করছ তা কল্পনাই থেকে যাবে।'

মমতা চোখে চোখে তাকিয়ে বলল, 'দেখবে? প্রমাণ চাও? কাঠের কারখানায় হাঙ্গামার ব্যাপারটাতেই প্রমাণ দেব চল।'

'কি প্রমাণ দেবে?'

'তুমি কিছু কোরো না। আমি হীরেনকে দিয়ে মিস্ত্রীরা যা চায় তার চেয়ে বেশী পাইয়ে দেব।'

'তাতে কি প্রমাণ হবে?'

'দেখো। দেখে নিও।'

কৃষ্ণেন্দু চুপ করে গেল। মমতা এখন বুঝেও বুঝবে না। সে বুঝতে চায় না। আত্মবিরোধের আপোষ মীমাংসাব শর্ত নিজে স্থির করে নিজেই সে গ্রহণ করেছে। এতদিনের সঞ্চিত আবেগ মুক্তির পথ পাবে। উৎসাহে উত্তেজনায় মমতা হঠাৎ টগবগিয়ে উঠেছে।

এ দিকে রামপালেব অস্থায়ী নেতৃত্ব ও দায়িত্বেব অবসান ঘটে গেল। শ্রীপতির ঈর্ষা ও আশঙ্কার ফলে নয়, লোকনাথের সঙ্গে রামপালের আলোচনার ব্যর্থতায়। এসব ব্যাপারে রামপাল যে নেহাৎ কাঁচা, নেহাৎ ছেলেমানুষ এটা টের পেয়ে সকলে আস্থা হারিয়েছে। রাগ কেউ করেনি, অনেকে বরং তার সরলতা বনাম বোকামিতে বেশ খানিকটা কৌতুক বোধ করেছে।

রামপালকে সকলে বারণ করে দিয়েছে সে যেন আর লোকনাথের কাছে দরবার করতে না যায়। অপমানে অভিমানে মাথা ঝিমছিম করে উঠেছে রামপালের। এ নিষ্ঠুর অবিচারের মানে সে বুঝতে পারেনি। একেবারে সুরু করা থেকে, সকলের হাতে উমাপদর খুন হয়ে যাওয়া নিবারণ করা থেকে, এ ব্যাপারটা সে নিয়ন্ত্রণ করে আসেনি এ পর্যন্ত? একমাত্র সেই

কি হাজতে যায়নি এ ব্যাপারে? কেন তবে তাকে বাদ দেওয়া হবে? যে কাজ সে আরম্ভ করেছে কেন তা শেষ করতে দেওয়া হবে না? রামপাল অনুরোধ জানিয়েছে, আরেকবার তাকে সুযোগ দেওয়া হোক। কেউ কানে তোলেনি। রামপাল উত্তেজিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে লোকনাথকে পটাতে না পারলে সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে উমাপদকে মেরে আধমরা করে দশ বছর জেল খাটবে। তার আস্ফালনে কেউ বিশ্বাস করেনি, অনেকে টিটকারি দিয়েছে। শ্রীপতি তাকে জানিয়ে দিয়েছে,পরদিন কৃষ্ণেন্দু আসছে, যা করবার সেই করবে, রামপালের আর বাহাদুরী করবার দরকার নেই। সে কেরামতি দেখিয়েছে অনেক, আর না দেখালে চলবে। তখন রামপাল ক্রুদ্ধ ও বিমর্ষ হয়ে চুপ করে গেছে। খানিক পরে নীরবে উঠে চলে গেছে আসর ছেড়ে।

শ্রীপতি ও গণি কৃষ্ণেন্দুদের আনতে স্টেশনে এসেছিল। দিনটা সুরু হয়েছে বাদলায়। কাঠগোলার কাছে মিস্ত্রী ও করাতিরা অপেক্ষা করছিল। স্টেশন থেকে যাবার পথে ট্যাক্সিতে শ্রীপতি সব জানাল। তাকে প্রশ্ন করল মমতা। কৃষ্ণেন্দু প্রায় আগাগোড়াই নির্বিকার ভাবে শুনে গেল। মমতা আগেই তাকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বারণ করে দিয়েছিল। রামপালের সম্বন্ধে সে কেবল কয়েকটি প্রশ্ন করল। উমাপদকে রামপাল সকলের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিল শুনে সে যেন ভারি আশ্চর্য হয়ে গেছে মনে হল। শ্রীপতি এই তুচ্ছ ঘটনাটি উল্লেখ করাও দরকার মনে করেনি, কিন্তু কৃষ্ণেন্দু হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, 'নাথুকে মারবার পর সকলে কি করল? চুপ করে রইল?'

'সবাই ক্ষেপে গিয়েছিল। তাইতো বলছি কেষ্টবাবু, নাথুর অপমান সবাই গা পেতে নিয়েছে।'

'তখন কেউ কিছু করেনি? নাথুকে মারবার সময়?'

গণি উৎসাহিত হয়ে বলল, 'করেনি? সবাই তেড়ে গিয়েছ মারতে। উমাবাবু খুন হয়ে যেতেন।'

শ্রীপতি অনুযোগের সুরে বলল, 'রামপাল কিন্তু করতে দিলে না কেষ্টবাবু। সবাইকে ঠেকিয়ে রাখল। ওর জন্যে, নইলে পুলিশ আনতে পারে? উমাবাবু উদিকে পুলিশকে ফোন করেছেন, ও এসে আমাদের ভাঁওতা দিয়ে বসিয়ে রাখলো চুপচাপ—উমাবাবু আসছেন, উমাবাবু মাপ চাইবেন, উমাবাবু নাথুকে একশো টাকা দেবেন, আরও কত কি।'

কৃষ্ণেন্দুর ভ্রূকুটি দেখে গণি আরেকটু ভাল ভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলল, 'রামপাল নিজে ভাঁওতা দেয়নি। ও লোক ভাল, বুদ্ধি একটু কম। উমাবাবু যা বলে দিয়েছেন, ও এসে আমাদের তাই বলেছে। ওর দোষ নেই।'

শ্রীপতি খোঁচা দিয়ে বলল, 'দোষ নেই কিসের? ফফরদালালি করতে আসে কেন যেচে?'

কৃষ্ণেন্দু প্রশ্ন করল, 'রামপাল সবাইকে ঠেকাল কেন গণি? উমাবাবুকে খাতির করে?'

গনি জবাব দিল, 'না, খুন হয়ে যাবেন বলে। খুন হলে পুলিশ আসবে, দু'চারজন ফাঁসিতে লটকাবে—কাজটা ঠিক করেছিল।'

'ওর বুদ্ধি কম বলছ কেন তবে?' মন্তব্য করে কৃষ্ণেন্দু তখনকার মত চুপ করে গেল। কিন্তু পরে আবার প্রশ্ন করল, 'পুলিশ শুধু রামপালকে অ্যারেস্ট করল কেন?'

গণি বলল, 'বোকা তো, সবাই মার খেয়ে পালাল, ও ঠায় বসে রইল। উমাবাবু ওকে

ধরিয়ে দিলেন।'

মমতা হীরেনের বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'শুনছ? রামপাল ওর প্রাণ বাঁচাল, রামপালকে ভুলিয়ে উনি পুলিশ ডাকলেন, শেষে রামপালকেই ধরিয়ে দিলেন। এর একটা বিহিত করা চাই। তুমি যদি কিছু না কর—'

একবার তার চোখে চোখ মিলিয়ে বাইরে তাকিয়ে হীরেন কাঠ হয়ে বসে রইল। আরিফ স্টেশন থেকেই বাড়ী চলে গেছে। একটা ট্যাক্সিতে তারা গাদা হয়ে বসেছে—শ্রীপতি ও গণির সঙ্গে। গণি বসেছে মমতার পাশে, গা ঘেঁষে, চেপে। তার দোষ নেই। সে নিরুপায়। মমতা ঠেলে সরে এসে শেষ প্রান্তে একটু স্থান করে গণিকে ডেকে সেখানে নিজের পাশে বসিয়েছে। মমতার কোমল দেহের কতখানি অংশের কত নিবিড় স্পর্শ গণি পাচ্ছে এ পাশে বসে নিজের একটানা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা থেকেই হীবেন তা অনুমান করতে পারছিল। জেদি একগুঁয়ে শক্ত মমতার শরীরটা যে এত নরম এতদিন হীরেন ভাবতেও পারেনি, এতদিন সে ছিল প্রাণের প্রাচুর্যে স্বতোৎসারিত সদা উৎফুল্ল সুন্দর একটি অনিবার্য তীব্র আকর্ষণ, মর্মান্তিক রূপে কাম্য।

ফাঁদে যেন আটকা পড়েছে মনে হয় হীরেনের। তাকে বেঁধে কয়েকটা বিপরীত শক্তি একসঙ্গে বিভিন্ন দিকে টানছে। শ্রীপতি ও গণি এমন ভাবে কথা বলছে, সে যেন উপস্থিত নেই। মমতা ও কৃষ্ণেন্দু সায় দিয়ে যাচ্ছে। কাঠের কারখানা যেন তার বাপের নয়, উমাপদ যেন তার ভাই নয়, তার বাপ-ভাইয়ের বিরুদ্ধে শ্রীপতি ও গণির যা খুশী বলে যাওয়া যেন মোটেই অসঙ্গত নয়! প্রথমে একান্তে ওদের কাছে সব শুনে নিয়ে মমতা তাকে বলতে পারত, কৃষ্ণেন্দু বলতে পারত। তার সামনে ওরা কি বলে এ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে?

কৃষ্ণেন্দুকে সিগারেট ধরাতে দেশলাই দিতে গিয়ে গণি কি মমতার বুকে কনুই ঠোকাবে?

'এই রোখকে।'

ফুটপাথ ঘেঁষে ট্যাক্সি দাঁড়াল,আইন বাঁচানো পাতলা কাপড়ে ঢাকা অকথ্য যৌবনের ফোলা একটি ন্যাংটো স্ত্রীলোকের বিজ্ঞাপন টাঙ্গানো পুরুষত্বহানির অব্যর্থ ওষুধ বিক্রী এক দোকানের সামনে! হীরেন লক্ষ্য করল, কুঁজো হয়ে বসে টাকওলা চোখা নাক ঘুমন্ত শকুনির মত দোকানদারটি মোটর থামার শব্দে হঠাৎ জীবন্ত হয়ে খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে আশার ঔৎসুক্যে সিধা হয়ে বসেছে। হীরেনের ইচ্ছা হল, হাসে। এগার বছর আগে কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়বার সময় এদিন এমনি ভাবে, হয়ত প্রায় এমনি সময়ে, কলেজ যাবার পথে এইখানে গাড়ী থামিয়ে এই লোকটির কাছ থেকে বশীকরণ কবচ কিনেছিল। ক্লাসের একটি মেয়েকে বশ করতে চেয়ে। মেয়েটির নাম আজ মনে নেই। চেহারাও কল্পনা হয়ে গেছে। শুধু মনে আছে তার সর্বাঙ্গের স্পষ্ট উদ্ধত আহ্বান, হাসি কথা বিতরণের প্রাণঘাতী কার্পণ্য আর অন্তহীন অবহেলা। কবচ ধারণ করে আলাপ জমাতে গিয়ে সে পাত্তা পায়নি। তারপর একদিন, অত্যন্ত হঠাৎ একদিন তাকে গাড়ীতে উঠতে দেখে মেয়েটি এসে বলেছিল, আপনার নিজের গাড়ী? বাড়ী পৌঁছে দেবেন আমায়? তৃতীয় দিন বাড়ী পৌঁছে দেবার পথে সে হঠাৎ গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার কাঁধে মাথা রেখে গা এলিয়ে দিয়েছিল। বশীকরণ কবচের এই অব্যর্থ ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে সে সেইদিন সন্ধ্যায় দশটাকার নোট ভরা খাম এই মহাপুরুষ দোকানীর হাতে দিয়েই পালিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটিকে আর কোনদিন গাড়ীতে তোলেনি। তিন দিন তার কাছে অর্থহীন বাজে কৈফিয়ৎ শোনার পর মেয়েটি মুখ গম্ভীর করে তার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছিল। কৃষ্ণেন্দু সে ঘটনা জানে।

'মনে আছে কেষ্ট? সেই বশীকরণ কবচ?'

তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করে সে কথা ঘুরিয়ে নিল। বলল যে শ্রীপতি আর গণি নেমে গিয়ে কাঠের কারখানায় চলে যাক, সকলকে কাজে লাগতে বলুক। আজকেই মীমাংসা হয়ে যাবে—। 'তুমি বলেছিলে না বিহিত করতে হবে? বাড়ী গিয়ে এখুনি বিহিত করছি।'

মমতা খুশী হয়ে বলল, 'সব কথা শোনা হল না কিন্তু।'

হীরেন প্রায় ধমক দিয়ে বলল, 'আর শুনতে হবে না।'

কিছু দূরে খালের ব্রিজ দেখা যাচ্ছিল। ওখানে মোড় ঘুরে খাল-পাড়ের রাস্তা ধরে খানিক এগোলেই লোকনাথের কাঠের কারাখানা।

কৃষ্ণেন্দু মৃদুস্বরে বলল, 'একেবারে ঘুরে গেলে হত না পাঁচ মিনিটের জন্যে, সবাই অপেক্ষা করছে।'

হীরেন সংক্ষেপে বলল, 'দবকার নেই।'

লোকনাথ তাঁর সদর বৈঠকখানায় তিনজনকে অভ্যর্থনা করলেন। মমতাকে বললেন, 'এসো মা বোসো।' কৃষ্ণেন্দুকে বললেন, 'কেষ্টবাবু যে!' দমক মারা ভঙ্গিতে মুখ তুলে ছেলের দিকে একনজর তাকিয়ে সামনের দেওয়ালে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া অথবা তার পাশে সম্রাট এডয়ার্ডকে সম্বোধন করে বললেন, 'হঠাৎ কোথায় চলে যাও, বলে যাও না একবার যাবার আগে।'

'বাড়ীতে সবাই জানে। আপনাকে বলেনি?'

'আঁ?' লোকনাথ গড়াগড়ার নলে একটি মাত্র টান দিলেন, 'হ্যাঁ, বলেছে বৈকি। চলে যাবার পরে শুনলাম। আমায় জানিয়ে যাবার কথা বলছিলাম। দরকারী কথা থাকে, পরামর্শ থাকে। বড় হয়েছ, দায়িত্ব গ্রহণ করছ, সব তো বুঝে শুনে নিতে হবে তোমাকেই। আমি আর কদিন?' আরেকবার নলে টান দিলেন, 'যাক গে।'

ধীর, স্থির, শান্ত, গম্ভীর, উদার, মহৎ, আত্মপ্রতিষ্ঠ মানুষ, কুটিল, সাবধানী ও হিংস্র। এতগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির সমবেত ওজন একা আয়ত্ত করে যেন লোকনাথ ভারিক্কি হয়েছেন। আধহাত উঁচু চৌকিতে বিছানো ফরাসের এককোণে হীরেনকে মাথা নীচু করে সন্তর্পণে বসতে দেখে মমতার বুকটা একবার ধড়াস করে ওঠে, মনে হয় কোন আশা নেই, সব ভুল। ঘরের সাজ-সজ্জা আসবাব-পত্র সমস্তই যেন লোকনাথের পক্ষ নিয়ে নিঃশব্দ মাহাত্ম্যে তাদের দমন করতে চায়। প্রকাণ্ড ঘরে বসবার ব্যবস্থা দু'রকম। ভিতরের দিকের দেওয়াল ছুঁয়ে একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত মস্ত ফরাস। ঘরের মাঝামাঝি বিরাট এক টেবিল, তার চওড়া প্রান্তের একদিকে লোকনাথের নিজস্ব গদি আঁটা একটি এবং বাকী তিনদিকে গদিহীন গোটা দশেক চেয়ার। দেয়াল ঘেঁষে তিনটি সোফা। আসবাবগুলি সব লোকনাথের কারখানায় তৈরী কিন্তু আশ্চর্য বকম সাদাসিধে, মোটা এবং ভারী।

মমতার আশঙ্কা বাতিল হয়ে যেতে কিন্তু বেশী দেরী হল না। সে যে প্রমাণ দেখাবে বলেছিল। আসল কথা আরম্ভ হবার দশ মিনিটের মধ্যে সে প্রমাণ সাংঘাতিক রূপ ধারণ করে বসল। হীরেন ও লোকনাথের মধ্যে এমন সংঘর্ষ বাধল যে মনে হল বাপ-ব্যাটার বুঝি চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ হয়ে যায়। বাইরে তখন ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। জানালার সার্সিতে আওয়াজ হচ্ছে চিঁড়ে ভাজার। লোকনাথ ফরাসে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে গড়গড়ার নল টানছিলেন, গরম হতে হতে নিজের অজান্তেই সরতে সরতে কখন ফরাসের প্রান্তে এসে পা নামিয়ে বসেছেন। হাতের সঙ্গে গড়গড়ার নলটা কাঁপছিল, হঠাৎ সেটা তিনি ছুঁড়ে দিলেন।

দু'হাতে ফরাসের প্রান্ত চেপে ধরে মিনিট খানেক চুপ করে রইলেন। মেঝে মাত্র আধহাত নীচে। হাঁটু দুটি উঁচু হয়ে রইল। হাতে ভর দিয়ে তিনি যেন দোল খাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, দোল খেতে খেতে ডিগবাজী খাবার কসরত দেখাবেন, কুর্তা গায়ে সরুপাড় কোঁচানো ধুতি পরা অভিনব এক অভিজাত অ্যামেচার ম্যাজিকওয়ালার মত হঠাৎ-জাগা খেয়াল-খুশীতে একটু তামাশা করবেন। শুধু বসবার ভঙ্গিতেই হঠাৎ তিনি যেন ওজনে হালকা হয়ে গেলেন। এটা দেখবার চোখ অবশ্য ছিল শুধু কৃষ্ণেন্দুর। সে একটু নিশ্চিত হল।

লোকনাথ কথাও বললেন ভিন্ন সুরে। অত্যন্ত গম্ভীর ও মর্মাহত ভঙ্গিতে। 'তুমি ভয় দেখিয়ে হুমকি দিয়ে আমায় কাবু করতে চাও?'

'না—ভয় দেখানো হুমকি দেবার কোন কথা নেই। একটা বিশ্রী অন্যায় হয়েছে, আমি তার প্রতিকার করতে চাই। আমি আপনার বড় ছেলে, আমার ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে, আমার নিশ্চয় এটুকু অধিকার আছে। আপনি যদি তা স্বীকার না করেন, বিদায় হয়ে যাওয়া ছাড়া আমার উপায় কি আছে বলুন?'

লোকনাথ হঠাৎ শান্ত হয়ে যাওয়ায় হীরেনও খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছিল। একটু থেমে সে বুদ্ধিমানের মত যোগ দিল, 'উমাপদ সোজাসুজি কাউকে মেরেছে শুনলে আমার এত রাগ হত না বাবা। একজনকে মেরে সবাইকে ধাপ্পা দিয়ে ফের আবার পুলিশ আনিয়ে সবাইকে সে মার খাইয়েছে। কি বীভৎস নোংরা কাণ্ড।'

'নিজেকে বাঁচাবার জন্য ওরকম অবস্থায় পড়লে তুমিও পুলিশ ডাকতে।'

'না। পুলিশ না ডেকে গলায় দড়ি দিতাম। কিন্তু এও জানবেন, ওরকম অবস্থাতে উমাপদরাই পড়ে, আমি কখনও পড়তাম না। একজনকে কেন, আমি আপনার যে কোন কারখানায় গিয়ে অন্যায় করে যদি দশজনকেও জখম করি, অপমান করি, তারা আমার কাছেই নালিশ করবে, আমাকে মারতে আসবে না।'

মমতা সগর্বে কৃষ্ণেন্দুর দিকে তাকাল। কৃষ্ণেন্দু পেন্সিল কাটা ছুরি দিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলের নখ চাঁচছিল, মুখে হাসির ভাব ফুটিয়ে মাথাটা বার কয়েক অর্থহীন অনির্দিষ্ট ইঙ্গিতে নেড়ে দিল।

লোকনাথ বললেন, 'যাই হোক, অন্যায় করে থাকলেও উমাকে তো আর চাবুক মেরে শাসন করা যাবে না। তুমি কি নিয়ে তর্কাতর্কি রাগারাগি করছ বুঝতে পারছি না হীরেন। আমি তো অনেক আগেই ঠিক করেছি উমা আব ওখানে যাবে না।'

তিনজন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল। এতক্ষণ লড়াইয়েব পর লোকনাথ এত সহজে লড়াইয়ের আসল কারণটাই এমন আচমকা উড়িয়ে দিতে পারেন, এ যেন তাদের বিশ্বাস হতে চাইল না।

লোকনাথ নির্বিকাব। বলে চললেন, 'আমি তো পাগল নই। সব ব্যাটা ওখানে এমন ধারা ক্ষেপে রয়েছে, উমাকে আমি যেতে দেব কোন্ ভরসায়? মাথায় যদি একজন লাঠিই মেরে বসে হঠাৎ?' পিছু হটে গিয়ে তাকিয়ার হেলান দিয়ে গড়গড়ার নল তুলে নিয়ে লোকনাথ প্রায় চোখ বুজে ফেললেন।

হীরেন বলল, 'আরও দুটো দাবী আছে। যাদের চোট লেগেছে তারা একমাসের মাইনে কম্পেনসেশান পাবে। আর—'

লোকনাথ বাধা দিয়ে বললেন, 'ওতে আমায় টানো কেন? তুমি অর্ডার দিলেই তো হবে। যাকে যা দেবার তুমিই দিও!'

'উমাপদকে মাপ চাইতে হবে।'

লোকনাথ ধীরে ধীরে উঠে সোজা হয়ে বসলেন। মুখের চেহারায় স্পষ্ট সঙ্কেত দেখা গেল, ক্রোধে তিনি এইবার ফেটে যাবেন। কিন্তু ফেটে তিনি গেলেন না। হীরেনের বদলে কৃষ্ণেন্দুকে উদ্দেশ্য করে তিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'কেষ্টবাবু, একি পাগলামি আপনাদের? উমা আর কারখানায় যাবে না স্বীকার করলাম, তবু তাকে মাপ চাইতে হবে? আপনি ওদের জানেন, আপনাকেই বলি। যে কারণেই আমি উমাকে কারখানায় যেতে না দিই, ওরা জানবে ওরাই তাকে সরিয়েছে। এতে ওদের পায়া কত ভারী হয়ে যাবে বলুন তো?'

কৃষ্ণেন্দু মৃদুস্বরে বলল, 'পায়া ভাবী হবে না, তবে ভবিষ্যতে এরকম অন্যায় আরেকটু কম সহ্য করবার সাহস জন্মাবে।'

লোকনাথ বললেন, 'তার মানেই তাই। মাপটাপ উমা চাইবে না। আপনারা যদি বাড়াবাড়ি করেন, আমি পুলিশ পাহারা বসিয়ে উমাকে কারখানায় পাঠাব।'

কৃষ্ণেন্দু মৃদু হেসে বলল, 'না দত্ত মহাশয়, উমাবাবুকে মাপ চাইতে হবে না। এ ক'দিন কারখানায় যায়নি, আব যখন যাবেনও না, মাপ চাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কি বল মমতা?'

মমতা সায় দিয়ে বলল, 'তা ঠিক ।'

হীরেন কি বলতে গিয়ে চুপ করে বসে রইল, ঘরে এসে প্রথমে যেমন শিথিল ভঙ্গিতে অপরাধীর মত মাথা নীচু করে বসেছিল, তেমনি ভাবে। লোকনাথ উঠে অন্দরে যাওয়ামাত্র সেও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মমতা বা কৃষ্ণেন্দু কারো সঙ্গে একটি কথাও বলল না।

'এ আবার কি?' কৃষ্ণেন্দু শুধোল।

মমতা হাসি মুখে বলল, 'কিছু না।'

বাড়ীর জনসাতেক মানুষকে এড়িয়ে দ্রুতপদে গিয়ে মমতা হীরেনের নাগাল ধরল তার ঘরে।

খানিক পরে হীরেন এসেছে শুনে কালীতারাও হন্তদন্ত হয়ে সে ঘরে এল।

'হীরেন এলি?' বলতে বলতে পর্দা সরিয়ে কালীতাবা দেখল, হীরেন আর সেই তেজী বদ মেয়েটা পরস্পরকে জাপটে ধবে আছে।

'হীরু! এসব কি? মমতা ! ছি বাছা ছি।' বলতে বলতে মাথা ঘুরে কালীতারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

চেয়ারে পা তুলে একটা সিগারেট ধবিয়ে কৃষ্ণেন্দু সবে একটু চিন্তা করবার আয়োজন করছে, মমতার মতই সাধারণ মিলের শাড়ী পরা একটি জমকালো গেঁয়ো মেয়েকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে পা নামিয়ে বসল। ট্রেনের লম্বা জার্নি ও অতিরিক্ত সিগারেট টানার ফলে চোখ দুটি তার একটু জ্বালা করছিল, রম্ভাকে দেখে যেন জুড়িয়ে গেল চোখ। হৃদয়ে বিস্মৃত স্বস্তি ও শান্তি আসার মতই বাইরে যেন আবির্ভাব হল রম্ভার। রম্ভাকে তার মনে হল চেনা। এ বাড়ীতেই কি আগে কোন দিন রম্ভাকে দেখেছে? অথবা চোখে ভাল লাগায় মনে হচ্ছে চেনা, প্রকৃতির কোন এক অদেখা পটের শোভা দেখে মুগ্ধ হলে যেমন ভাললাগা মানুষ, ভাললাগা সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত. জ্যোৎস্না রাত, ভাললাগা পাহাড় বন নদী সাগর সব কিছু মনে পড়তে থাকে? সার্সি বন্ধ ঘরে তামাক ও সিগারেট পুড়ছে, রম্ভা নাক সিঁটকে বলল, 'মাগো কি দুর্গন্ধ! আমি রম্ভা, কেষ্টবাবু। ঝুমুরিয়ার সেই বীরেশ্বর মাইতির মেয়ে। সেই যে

সেবারের বন্যায়—'

'ও, তুমি সেই রম্ভা?'

কৃষ্ণেন্দু উঠে দুটি জানালার সার্সি খুলে দিল। চার বছর আগে সে বন্যায় রিলিফ কাজ করার জন্য ঝুমুরিয়া গিয়েছিল, ঝুমুরিয়ায় একটি কেন্দ্র খুলেছিল। বীরেশ্বর তাদের আদর করে ডেকে নিজের বাড়ীতে রেখেছিল, নিজে সপরিবারে এবং লোকজন জুটিয়ে রিলিফের কাজে তাদের সাহায্য করেছিল অনেক। বীরেশ্বরের বাড়ীতে ছোট একটা হাসপাতাল খোলা হয়েছিল। রম্ভা তখন কর্মীদের আর হাসপাতালের অসংখ্য খুঁটিনাটি প্রয়োজন মেটাতে সারাদিন ছুটোছুটি করত। তার অদ্ভুত উৎসাহ ও আগ্রহের কথা কৃষ্ণেন্দুর মনে আছে। আর মনে আছে তার একটি বিশেষ আবদারের কথা। নীলিমা হাসপাতালে কাজ করার সময় শাড়ীর ওপর একটি অ্যাপ্রন লাগিয়ে নিত। একদিন রম্ভা এসে চুপি চুপি কৃষ্ণেন্দুকে বলেছিল, আমায় এরকম একটা দেবেন, আমি আরো বেশী কাজ করব? নীলিমার একটি অ্যাপ্রন পেয়ে খুশীতে ডগমগ হয়ে সে সেটিকে কোমরে বেঁধেছিল, কেচে সাফ করে শুকোতে দেওয়ার সময় ছাড়া বোধ হয় দিনরাত্রি কখনো সেটি সে খুলতো না, ঘুমোবার সময় পর্যন্ত সঙ্গে থাকত। রম্ভা তখন ছোট ছিল, অনেক ছোট।

'তুমি খুব বেড়ে গেছ রম্ভা।'

'বয়স হয়নি?'

কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে পুরানো আলাপ ঝালাই করতে রম্ভা আসেনি, এসেছে রামপালের হয়ে কলহ করতে। মেঘলা ভোরে রুক্ষ এলোমেলো চুল খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর ক্রুদ্ধ গম্ভীর মুখ ও রাতজাগা চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে রামপাল এসে হাজির হতে মনটা তার ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল, ভয়ানক একটা কিছু ঘটেছে কিম্বা ঘটবে ভেবে। রামপালের কাছে সব শুনে তারও রাগের সীমা থাকেনি। একি অন্যায় লাঞ্ছনা একটা মানুষের ওপর, আকাশে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলা নিজের কর্তালি বজায় রাখার জন্য" নিজে এসে সব করবে বলে তার করে রামপালকে সকলের কাছে এভাবে অপদস্থ করার অধিকার কে দিয়েছে কৃষ্ণেন্দুকে? কি অন্যায় কৃষ্ণেন্দুর, কি আস্পর্দা!

রামপাল অবশ্য রম্ভার কাছে দুঃখ জানাতে আসেনি। উমাপদকে সে মারবে। এই বাড়ীতে বাড়ী-ভরা আত্মীয়স্বজন লোকজনের মধ্যে উমাপদকে মারতে মারতে আধমরা করে ছাড়বে। কেউ ঠেকাতে পারবে না তাকে। মিস্ত্রীরা দেখুক তাকে তারা যা ভেবেছে সে তা নয়। কৃষ্ণেন্দু এসে শুনুক দলের সমর্থন বা সাহায্য রামপালের দরকার হয়নি, একাই সে উমাপদকে শাস্তি দিয়ে মিস্ত্রীদের মান রেখেছে, কৃষ্ণেন্দুর না এলেও চলত।

রম্ভার মনে হয়েছিল মিস্ত্রীদের মান রাখতে নয়, গত রাত্রির অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে তারই মান রাখতে এসেছে রামপাল। বুকে আলোড়ন উঠেছিল রম্ভার। চুপি চুপি বলবে নাকি রামপালকে কাল রাত্রির কথা, উমাপদর সঙ্গে শশাঙ্কও যাতে কিছু শাস্তি পায়? রামপালের সবল বাহু দুটির দিকে চেয়ে চোখে তার কিছুক্ষণ পলক পড়েনি, মনে হয়েছিল সে বুঝি দ্রৌপদী, তার ভীম এসেছে দুটি কীচককে বধ করতে।

কিন্তু না, তা হয় না। রম্ভা মৃদু একটি নিশ্বাস ফেলেছিল বীরেশ্বরের কথা শুনে। বীরেশ্বর বলেছিল, 'তুমি খ্যাপা না পাগল? উমাবাবুকে মারবে কেন? তোমার কি করেছে উমাবাবু? গোলমাল মিস্ত্রীদের সঙ্গে, দশজনের সাথে। মিটমাট হবে দশজনের সাথে, যা করার তারা করবে দশজনে মিলে। তুমি গায়ে পড়ে এসে হাঙ্গামা কেলেঙ্কারি করবে কি জন্য? হাঁ, তোমায়

যদি অপমান করতেন কি মারতেন তখন তুমি দু'ঘা বসিয়ে দিতে, সে ভাল কথা। কদিন কেটে গেল, তুমি কবার এলে গেলে এবাড়ী, আজ বলা নেই কওয়া নেই উমাবাবুকে হঠাৎ মারতে যাবে কি রকম?'

তাই বটে। রম্ভাও সায় দিয়েছিল এ কথায়। দলের কাছে নিজের মান বাঁচাতে উমাপদকে মারা চলে না রামপালের। তার গত রাতের অপমানের ঝালও বাড়ানো যায় না রামপালকে দিয়ে। রম্ভার মনে পড়ে, ভীমকে পর্যন্ত কীচক বধ করতে হয়েছিল কৌশলে, গোপনে। রামপালকে তো আর বলা যায় না তুমি সেই রকম কোন উপায়ে চুপি চুপি উমাবাবু আর শশাঙ্ককে কিছু শাস্তি দিও—মেরে ফেলো না, কিন্তু খুব মেরো, দুজনে যাতে কেঁদে ককিয়ে পায়ে ধরে মাপ চায়, রম্ভার কাছে। না, রামপালকে এ সব বলা যায় না, ওকে ভজানো যায় না তার ব্যাপারে।

কৃষ্ণেন্দুকে কিন্তু জিজ্ঞেস করা যায়, যে সে কেমন ধারা মানুষ, রামপালের সঙ্গে তার শত্রুতা কেন।

রম্ভার কথা ধাঁধার মত ঠেকে কৃষ্ণেন্দুর কাছে।

'আমি রামপালের কি করলাম রম্ভা? দু'একবার দেখেছি মাত্র, ভাল করে ওকে চিনি না আমি, আমার কেন শত্রুতা থাকবে ওর সঙ্গে? আমি ছিলাম পাটনায়—'

'আপনি তো তার করে সবাইকে বারণ করে দিলেন ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে, ওকে অপদস্থ করলেন। অন্য কেউ আজে বাজে লোক হলে কথা কইতাম না কেষ্টদা। এমন লোক কিন্তু খুঁজে পাবেন নাকো আর একটা। জানেন, পুলিশ আসতে সবাই পালালে, ও একা দাঁড়িয়ে রইল, ধরা দিল। হাঙ্গামা মেটাবার জন্য কত করেছে জানেন? মিটমাট না করলে উমাবাবুকে মেরে দশ বছর জেল খাটতে পর্যন্ত রাজী আছে। আপনি না আপসোস করতেন খাঁটি লোক, কাজের লোক মেলা বড় কষ্ট? আরও কত কি বলতেন বড় বড় কথা মনে নেই ভাবছেন? —সব মনে আছে। আপনিই কিনা শেষে নিজের কর্তালি বজায় রাখতে হিংসে করে ওর মন ভেঙ্গে দিলেন, দমিয়ে দিলেন মানুষটাকে।'

ব্যাপার খানিকটা বোধগম্য হওয়ায় এবার কৃষ্ণেন্দু প্রশ্ন করে, 'রামপাল তোমার কোন ভাই রম্ভা? তোমার ভাইদের নাম ভুলে গেছি।'

রম্ভা রাগ করে বলে, 'ভাই? ভাই হতে যাবে কেন আমার? আমার কেউ হয় না। এই তো কদিন আগে চেনা হল কলকাতায় এসে। বেশ মানুষ আপনি।'

রম্ভা কলহ করে আর তাকে দেখে কৃষ্ণেন্দুর মনে পড়ে যায় স্টেশনে মমতার কলহের ভঙ্গি ও কথা। রম্ভা সত্যই কোমরের কাপড় জড়িয়েছে। কলহ করার জন্য এখানে এসে নয়, আগে থেকেই জড়ানো ছিল, মনের মধ্যে ঝগড়া ভাঁজতে ভাঁজতে মশগুল হয়ে আসায় জড়ানো আঁচল খুলতে ভুলে গেছে। ছোট কথা নিয়ে, মিছে নালিশ ধরে, ছেলেমানুষী কলহ করছে রম্ভা কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর মনে হয় মমতার নিজেকে নিয়ে কলহ করার চেয়ে জোরালো আর জমজমাট হয়ে উঠেছে পরের জন্য রম্ভার ঝগড়া। রম্ভার বিরোধ তেজী, আন্তরিকতায় সহজ ও স্পষ্ট, আত্মবিশ্বাস দ্বিধাসংশয়হীন অ-টলমল, জিদ সহিষ্ণু। এত অল্প সময়ের মধ্যে রম্ভার সম্বন্ধে এতবড় ব্যাপক একটা আন্দাজ করা কৃষ্ণেন্দুর পক্ষে অবশ্য মমতার জন্যই সম্ভব হয়েছে। মমতার বিরোধিতা, আন্তরিকতা, আত্মবিশ্বাস আর একগুঁয়েমির স্বরূপ তার জানা ছিল বলে।

যা বলার ছিল প্রাণ ভরে বলে নিয়ে খানিক অপেক্ষা করে রম্ভা বলে, 'কথা কন না

যে? কীই বা বলবেন, বলার কিছু থাকলে তো!'

কৃষ্ণেন্দু তখন আত্মসমর্পণ করে কৈফিয়ৎ জানায়, বলে, 'আমার দোষ নেই রম্ভা, আমি কিছু করিনি। রামপালের কথা আমি কিছুই লিখিনি টেলিগ্রামে। এসব কিছু জানলে তো লিখবো? আমি শুধু কবে আসব জানিয়েছিলাম। দুঃখ করো না, আমি রামপালের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কইব।'

'ক'ন না কথা। সে তো বসেই আছে ওঘরে। ডাকব?'

রামপালকে না ডাকিয়ে কৃষ্ণেন্দু নিজেই বীরেশ্বরের ঘরে গেল। বীরেশ্বরের সঙ্গেও আলাপ করবে! মাঝখানে বহুদিন কেটে গেলেও এই স্বাধীনচেতা এবং চাষীর পক্ষে আশ্চর্যরকম সংস্কার-মুক্ত খাপছাড়া লোকটিকে সে ভোলেনি।

পরিচয় হবার পর প্রথমে ভেবেছিল ঝুমুরিয়ায় একটি কেন্দ্র স্থাপন করে বীরেশ্বরকে ভার দেবে। বীরেশ্বরের মেজাজ আন্দাজ কবার পর কৃষ্ণেন্দুর ভরসা হয়নি। আত্মকেন্দ্রিক আদর্শবাদী লোক দিয়েও কাজ চলে কিন্তু তীব্র অভিমানের তাপে এত বেশী মাথা গরম হলে বিপদ হয়। বীরেশ্বরকে কৃষ্ণেন্দু কাজে লাগাতে পারেনি, কিন্তু ভুলতেও পারেনি তাকে।

কৃষ্ণেন্দু আলাপ করতে জানে চমৎকার। অচেনা লোকের সঙ্গে অল্প সময়ে সে ভাব জমাতে পারে। নানা আবেষ্টনীর নানা ধাঁচের মানুষের বিচিত্র মন ও আচরণের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার অভিজ্ঞতায় তার অকারণ সমালোচনার আদিম প্রবৃত্তি এত বেশী চাপা পড়ে গিয়েছে যে তার কথা ও ব্যবহার মানুষের মধ্যে অমিল বা বিরোধিতার অনুভূতি জাগায় না। অসহায় অসুস্থ জরাজীর্ণ ও দুর্বল হৃদয় মনের অসংখ্য বিকার আর ছদ্মবেশ প্রথমে বয়সে মানুষ জাতটার উপরে কৃষ্ণেন্দুর অশ্রদ্ধা জন্মিয়ে দিয়েছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ হবার দাওয়াই পেয়ে সেই আবেগজ্বরের উপশম হয়েছে এবং সৃষ্টি হয়েছে সমস্ত মানুষের সম্পর্কে খানিকটা নির্বিকার ও প্রায় নির্বিচার বন্ধুত্ববোধ। কোন মানুষকেই সে বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধাও করে না, তুচ্ছও ভাবে না। একক ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে মানুষের কাজ ও অকাজ করার বিস্ময়কর প্রচ্ছন্ন প্রেরণা মোটামুটি অনুমান করতে শিখে মানুষ সম্বন্ধে বিস্ময়বোধ তার কমে গিয়েছে।

ভুল বোঝা আর অর্থহীন অকারণ ছেলেমানুষী অভিমানের জন্য রামপালকে সে একটু তিরস্কার করল, কিন্তু এত পরিষ্কার করে তার ভুলটা বুঝিয়ে দিয়ে এমন বন্ধুর মত এটা সে করল যে রাগ করার বদলে নিজের অপদার্থতায় বিমর্ষ হয়ে গেল রামপাল। তার হয়ে ওকালতি করার পাগলামির জন্য রম্ভার করতে লাগল লজ্জা, রামপালের সম্পর্কে আজ এই প্রথম ক্ষীণ একটু সংশয় জেগে মনটাও তার খারাপ হয়ে গেল খানিক । বেশী বড় কি ভেবেছে সে রামপালকে, সে যা নয়? কৃষ্ণেন্দু নতুন একটা পরিচয় পাইয়ে দিল রামপালের। এখনো ওকে চিনতে কি বাকী আছে তবে?

রামপালকে উৎসাহ দেবার জন্য কৃষ্ণেন্দু তখন বলল, 'দুঃখ করো না ভাই। তোমার যদি নিষ্ঠা থাকে, দরদ থাকে, ওরা নিজে থেকেই তোমায় একদিন মানবে। আজ তোমাকে ভুল বুঝেছে, কাল ভুল ভেঙ্গে যাবে। নিজেই ভেবে দ্যাখো, উমাবাবুকে মারতে দাওনি বলে সবাই রাগ করেছিল। কিন্তু রাগ করলে কি হবে, মনে মনে তো সবাই টের পেয়েছিল কাজটা তুমি ঠিক করেছ, আপনা থেকে সকলে তাই তোমায় মেনে নিয়েছিল। কারো বলে দিতে হয়নি। ব্যাপারটা শুনে আমি বড় খুশী হয়েছি রামপাল, তোমার প্রশংসা করেছি।'

শুনে রামপালের বিমর্ষভাব কেটে গেল, রম্ভা মনে স্বস্তি পেল এবং দু'জনের চোখে চোখে

তাকানো দেখে কৃষ্ণেন্দুর লাগলো চমক। ধীর স্থির শান্ত মানুষ সে, কত অভিজ্ঞতায় গড়া আবেগহীন বাস্তববোধ, হঠাৎ তীব্র আলো লাগা চোখের মত মন কিনা তার ঝাঁকি খেয়ে অন্ধ হয়ে গেল এদের ভালবাসার চাহনির ছোঁয়াতে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও নিজের স্নায়ুমণ্ডলীতে এই আকস্মিক উত্তেজনা ঘটায় ব্যাপারটা কৃষ্ণেন্দুর কাছে প্রথমে বড় দুর্বোধ্য মনে হল। এটা কোন আঘাতের প্রতিক্রিয়া? দুটি মানুষের প্রেম হয়েছে জানাটা তো এমন কিছু অঘটন নয় যে হঠাৎ আবিষ্কার করেছে বলেই এমন ভাবে নাড়া লাগবে? এ রহস্য কোনদিনই কৃষ্ণেন্দুর সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয়নি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করার মত সময়ও তার ছিল না। আগে মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন ও আয়ত্ত না করে ওরকম বিচার-বিশ্লেষণ বিশেষ কাজেও লাগত না। অন্ততঃ নিজেকে সন্তুষ্ট করার মত করে নিজস্ব রহস্য ভেদ করার তাগিদটা কৃষ্ণেন্দুর মধ্যে চিরদিনই জোরালো। অবসর মত ভেবেচিন্তে পরে কয়েকটি যোগাযোগ খুঁজে বার করে সে বুঝেছিল যে খাপছাড়া অনৈসর্গিক কিছু ঘটেনি। হীরেন ও মমতার প্রেম নিয়ে সে খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়েছিল। অনাত্মীয়, সদ্য-পরিচিত রামপালের হয়ে রম্ভার হৃদয়গ্রাহী সতেজ কলহ তার মনে একটা রহস্য সৃষ্টি করেছিল। দু'জনের ভালবাসা হয়েচে জানামাত্র সে রহস্য গিয়েছিল কেটে। কেবল তাই নয়, তার স্মরণ আছে, দুজনের মুখের ভাব ও দৃষ্টিবিনিময় দেখে সে অনুভব করেছিল যে একটা কল্পনাতীতরূপে নাটকীয় ব্যাপার ঘটেছে। দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে এমন প্রচণ্ড উন্মাদনার সঙ্গে ওরা দু'জন পরস্পরকে কামনা করেছে যা তার কাছে অবিশ্বাস্য, অসম্ভব।

একজন মনোবৈজ্ঞানিক ডাক্তার বন্ধু আছে কৃষ্ণেন্দুর। নাম মৃন্ময় সরকার। কথাপ্রসঙ্গে একদিন কৌতূহলের বশে কৃষ্ণেন্দু তাকে তার এই অভিজ্ঞতার বিবরণ জানাল।

বন্ধু হেসে বলল, 'তোমার আন্দাজটা মিথ্যে নয়, তবে গৌণ। আসল কারণ ভিন্ন।'

'কি কারণ?'

'তুমি একজন জোয়ান মদ্দ পুরুষ এবং এককালে ঘোরতর রোমাণ্টিক ছিলে, এই কারণ। কাজের নেশায় আত্মভোলা হয়ে থাক কিনা, তাই আচমকা সহানুভূতির ঝনঝনানিতে মাথা ঘুরে গিয়েছিল। অভ্যাস তো নেই।'

ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে কৃষ্ণেন্দুর একটা সাম্প্রতিক অস্পষ্ট ধারণা সমর্থন পেয়েছিল। সমস্ত স্বীকৃত সত্যগুলিকে নতুন দৃষ্টিতে বিচার করার, যাচাই করে নেবার দিন এসেছে। দার্শনিকের নয়, বৈজ্ঞানিকের। মনকে, আত্মাকে নিছক মস্তিষ্কের ক্রিয়া বলে মানতে হলে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের হৃদয় আজ নৈরাশ্যের ভারে টনটন করবে। কিন্তু এই নৈরাশ্যও একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল বলে মেনে নিয়ে মানুষকে শিখতে হবে অন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটিয়ে উৎফুল্ল হবার কায়দা। নিজেকে যন্ত্র বলে জানতে—তা সে যত জটিল, যত কোমল, যত বিস্ময়কর যন্ত্রই হোক—ও মানতে না শেখা পর্যন্ত মানুষের নিস্তার নেই।

কত দিনে মানুষের এই সহজ বুদ্ধি আসবে কে জানে। যন্ত্র বলতে বেঁচে থাকার প্রয়োজন মেটাতে মানুষেরই সৃষ্টি করা কলকব্জার কথা মনে আসে, বাধা শুধু এইটুকু। স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির পার্থক্যটাই যেন সব!

বেলা প্রায় বারোটার সময় কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে রামপাল চলে গেল। তাড়াতাড়ি

নাওয়া-খাওয়া সেরে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাপের সঙ্গে রম্ভা রওনা হল ঝুমুরিয়া, বেলা তিনটের গাড়ী। জীবনে কখনো এতটুকু স্বাদ পায়নি এমন এক দুঃসহ ব্যাকুলতায় রম্ভার দেহমন তখন অস্থির করছে। এ কি অসুখ রম্ভা জানে না। জ্বর আসছে?

'বমি বমি লাগছে বাবা। পান কেনো।'

বীরেশ্বর মেয়েকে পান কিনে দেয়। বলে, 'শুবি? শো একটু। কমে যাবে।'

পান তিতো লাগে। চিবানো পান ফেলে দিয়ে রম্ভা আরও জড়ো-সড়ো হয়ে জানালা ঘেঁষে বসে বাইরে তাকিয়ে থাকে। চোখে চোখে চাওয়া ছাড়া আর কোন ইঙ্গিতটুকুও তো বিনিময় হয়নি তার আর রামপালের মধ্যে , সে কেন বুঝতে পারবে তার শরীর আর মনে কেন এই দুরন্ত বিপ্লব। রামপালের সঙ্গে আর তার কোন দিন দেখা হবে না ভেবে শুধু মন কেমন করলে সে তার মানে বুঝতে পারত। মন কেমন করার অভিজ্ঞতা তার আছে। এই কটা দিন কি তার মন কেমন করেনি ঝুমুরিয়ার আপনজনদের জন্যে, বিশেষ করে ভাইপো ভাইঝিগুলির জন্যে, আরও বিশেষ করে বড় ভায়ের ছোট ছেলে পচাটার জন্যে? রামপালকে তার বড় ভাল লেগেছে। হ্যাঁ, কামনাও সে করেছে রামপালকে। আলিঙ্গন কল্পনা করে রোমাঞ্চ হয়েছে তার। এ সব সহজ-বোধগম্য কথা। সুতরাং রামপালের সঙ্গ পাবার জন্য মন খারাপ হওয়া, এ গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে ভিন্নমুখী গাড়ীতে চেপে আবার কলকাতা ফিরে যাবার অদম্য সাধ জাগা, এ সব রম্ভা বুঝতে পারত। সে সুস্থ সবল মেয়ে, এখনো বিষাদের চর্চা করেনি, তবু ব্যথার্তা মেয়েগুলির মত হতাশ কান্না হৃদয়ের কূলে কূলে ছাপিয়ে উঠলেও সে ধারণা করতে পারত ব্যাপারখানা কি,—সে কি আর পীরিতের, মিলন ও বিরহের কথা জানে না, বর্ণনা শোনেনি রাধার বিরহ-বেদনার? কিন্তু এ তো তা নয়। তার শুধু অসহ্য উদ্বেগ আর অস্থিরতা। একটা মানুষের জন্য কেউ এমন ভয়ানক অশান্ত হতে পারে যে ধৈর্য ধরে বসে থাকা পর্যন্ত তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে, এটা কল্পনা করার ক্ষমতা রম্ভা কোথায় পাবে?

ঝুমুরিয়ায় পৌঁছে রম্ভা একটু শান্ত হল। সে বড় গম্ভীর হয়ে পড়েছে আর এ কদিনে কালি পড়েছে তার চোখের নীচে।

রামপাল ও রম্ভার আর কোন দিন দেখা পর্যন্তও না হতে পারত কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর ঘটকালিতে তাদের একেবারে বিয়ে হয়ে গেল। তাকে দিয়ে ঘটকালিটা করাল কিন্তু মমতা। রম্ভা ঝুমুরিয়া চলে যাবার দিন তিনেক পরে কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে মমতা যাচ্ছে খালধারের মজুর বস্তিতে মেয়েদের এক সাপ্তাহিক মজলিস গড়বার আয়োজন করতে, রামপাল ও রম্ভার কাহিনী শুনে সে উল্লসিত হয়ে উঠল। সম্প্রতি সে কারণে-অকারণে উল্লাস বোধ করছিল।

'ওদের বিয়ে হয় না?'

'কি জানি? হয় বোধ হয়।'

'এক কাজ কর। মেয়েটির বাবার কাছে চিঠি লিখে দাও।'

'রামপালকে একবার জিজ্ঞেস করব না?'

'ওকে জিজ্ঞেস করেই লেখো।'

কৃষ্ণেন্দু একটু ভেবে বলল, 'চিঠি লিখে কাজ নেই, বীরেশ্বর শীগগির কলকাতা আসবে আরেকবার, মুখেই বলব তখন।'

মমতা অসহিষ্ণু হয়ে বলেছিল, 'না না, কালকেই তুমি চিঠি লিখে দাও কেষ্টদা। আমার মতলব আছে।'

'মতলব?'

'আছে। আমাদের বাড়ীতে একদিনে দু'টি বর বিয়ে করতে যাবে—হীরেন আর রামপাল। ঝুমুরিয়া থেকে ওদের সকলকে আমি আনাব। সে দিন সব একাকার করে দেব আমি। পাশাপাশি বিয়ে হবে, এক আসরে সবাই একত্র বসবে, পাশাপাশি বসে খাবে—ভদ্রলোক, মজুর, চাষী সবাই। ওঃ, আমার ধৈর্য ধরছে না কেষ্টদা! কালকেই তুমি চিঠি লেখো।'

মমতার এ পাগলামিতে কৃষ্ণেন্দু সায় দেয়নি, রামপালের সঙ্গে কথা বলে বীরেশ্বরকে চিঠি লিখেছিল। বীরেশ্বর কলকাতা এসে বিয়ের প্রস্তাব পাকাপাকি করে গেল কিন্তু মমতার মতলব মানতে সে কিছুতেই রাজী হল না। বিয়ে যদি হয়, বিয়ে হবে ঝুমুরিয়ায়,বীরেশ্বরের নিজের বাড়ীতে। কলকাতায় এসে পরের বাড়ীতে সে মেয়ের বিয়ে দেবে না।

মমতা দমে গিয়েছিল। কৃষ্ণেন্দুকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ও কেন আপত্তি করল কেষ্টদা? ওর তো লাভ হত সব দিক দিয়ে, সব খরচ আমি দিতাম।'

কৃষ্ণেন্দু জবাব দিয়েছিল, 'সবাই তো লাভ চায় না মমতা। ওকে তুমি চেনো না। তোমার প্রস্তাব শুনে অপমান বোধ করে যে রেগে ওঠেনি তাই অনেক ভাগ্যি বলে জেনো।'

হীরেন ও মমতার বিয়ে হল আশ্বিনের গোড়ায়, পুজোর দিন সাতেক আগে। লোকনাথের বাড়ীতে খুব ধুমধামের সঙ্গে পুজো হয়, শিল্পচাতুর্যে অপরূপ দামী প্রতিমা আসে। এবার বিয়ের সমারোহ শেষ হতে না হতে পুজোর সমারোহ আরম্ভ হওয়ায় আনন্দ-ক্লান্ত উৎসব-শ্রান্ত বাড়ী বোঝাই মানুষগুলির কাছে বিজয়া যেন মুক্তির স্বস্তি নিয়ে এল। লোকনাথের কারখানাগুলির সমস্ত লোকেরা এবং মমতার নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসা মজুর ও ধাঙড়রা সবশুদ্ধ তিনদিন পাত পেতে খেয়ে গেল।

রামপাল ও রম্ভার বিয়ে হল আশ্বিনের শেষ দিকে, পুজোর পর। কৃষ্ণেন্দু, মমতা, হীরেন, আরিফ ও দীনেশ নামে কুড়ি একুশ বছরের উৎসাহী ছেলে এই পাঁচজন ভদ্রলোক বর রামপাল ও তার মজুর মিস্ত্রী সঙ্গীদের সাথে বরযাত্রী এল ঝুমুরিয়ায়।

দুই

স্বামীর ঘর করতে এসেই রম্ভা টের পায়, সে এক নতুন জগতে এসে পড়েছে, ঝুমুরিয়ায় তার এত দিনের পরিচিত জগতের সঙ্গে যা'র মিল বড়ই কম। স্থানের সংকীর্ণতা আর আলো বাতাসের অভাবটাই প্রথমে যেন তার দম আটকে দিতে চায়। দিনের বেলাতেও ছায়ান্ধকার এতটুকু সেঁতসেঁতে বাড়ীতে একগাদা পাকাপোক্ত হৃদয়হীন অদ্ভুত খাপছাড়া মানুষের ভিড় তাকে সারাদিন অনুভব করায় যে সে যেন হাটবাজারের জেলখানাতে বন্দিনী। ঝুমুরিয়ার খোলা মাঠঘাট বন-প্রান্তরের জন্য তার মন কাঁদে না। উঁচু মাটির ভিটায় বড় বড় ঘর, মস্ত উঠানে সকাল থেকে সন্ধ্যাতক রোদের ছড়াছড়ি, দেহের অনাবৃত অংশের ত্বকে ক্ষীণতম বায়ু সঞ্চালনের অনুভূতি আর বাড়ীভরা গেঁয়ো আপনজনগুলির সাহচর্য, এই সমস্তের অভাবটাই তার প্রায় অসহ্য মনে হয়। গৃহের চারিদিকে গাঁ অথবা সহর, সদরে দাঁড়িয়ে জানালায় তাকিয়ে মাটি তৃণ গাছপালা খড়ো ঘর আর দিগন্ত প্রসারিত আকাশ কেন চোখে পড়ে না, খোয়া-তোলা গলি ও নোংরা নর্দমা পেরিয়েই খোলার ঘরে দৃষ্টি কেন আটকে যায় এসব বড় কথা নয় রম্ভার কাছে, বাপের বাড়ীর সঙ্গে স্বামীর বাড়ীর পার্থক্যটাই তার পক্ষে

মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। এখানে সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ঠেলে তার নড়তে চড়তে কষ্ট হয়, গুমোটের মত ভারি বাতাস টেনে টেনে শ্বাস নিতে নয়, ধোঁয়াটে অস্বচ্ছতা দৃষ্টিকে ঝাপসা করে রাখে।

রামপাল ব্যাকুল হয়ে বলে, 'কি হল, কি হল তোমার বৌ?'

'কই না। কিছু তো হয়নি।'

'কাঁদ কেন?'

'কই কাঁদলাম?'

'মুখ যে ভার ভার?'

'ধেৎ।'

রামপাল তার হাত ধরে। রোয়াক কি উঠান কি ঘর খেয়াল থাকে না রামপালের। রম্ভা ঘরে পালায়। ছোট সোঁদা-গন্ধী আধ অন্ধকার ঘর, সেখানে রামপাল তাকে মহাসমারোহে ভালবাসে, তাকে ভালবাসায়। কে জানে তখন সকাল কি দুপুর কি সন্ধ্যা, রম্ভা গা ধুতে যাচ্ছিল কি দুর্গার রান্নাঘরে রাঁধছিল কিম্বা আনমনে ভাবছিল ঝুমুরিয়ার কথা। গোড়ায় ক'দিন রামপাল কাজে যায়নি, তারপরেও মাঝে মাঝে কামাই করছে। রম্ভার আবেগে ও আগ্রহ কম থাকে না, কিন্তু রামপালের উদ্দাম ভালবাসায় আত্মহারা হয়ে যেতে পারে না বলে নিজেকে সে ধিক্কার দেয়। বাড়ীটা পছন্দসই নয় আর বাড়ীর মানুষগুলি একটু খাপছাড়া বলে তার আপসোস হবে কেন? ঝুমুরিয়ার বাড়ীতে তো তার রামপাল ছিল না, মিলনের এই পরম উৎসব ছিল না, তাদের দু'জনের জীবন তো এভাবে ভরাট হয়ে উঠবার সুযোগ পায়নি অবর্ণনীয় রসে, আনন্দে, উপভোগে? তবে কেন সে বিশ্ব-সংসার ভুলে যেতে পারে না রামপালের মত? সে কি স্বার্থপর? মনটা কি তার ছোট? একসঙ্গে সব কি সে চায় তার নিজের জন্য—বিয়ের আগে যা ছিল তাও থাকবে, বিয়ের পরে যা পেয়েছে তাও থাকবে?

'তুমি বড় কঠিন বৌ।' রামপাল সখেদে নালিশ জানায়।

'কেন গো?'

'এত করে মন পাই না।'

'যাঃ, মন তো নিয়ে নিয়েছো সেই কবে।'

ত্রুটি হচ্ছে? অন্যায় করছে? যতটা সাড়া দেওয়া উচিত ছিল দিতে পারছে না, যতটা খাপ খাইয়ে নেওয়া উচিত ছিল নিতে পারছে না? অথবা বাপের বাড়ী থেকে স্বামীর ঘরে এলে প্রথমটা এরকম হয় মেয়েদের?

মানিয়ে নেবার জন্য খাপ খাইয়ে নেবার জন্য রম্ভা উঠে পড়ে লেগে যায়। রামপালকে আরও বেশী করে জানবার বুঝবার চেষ্টা করে, বাড়ীর মানুষগুলির সঙ্গে মিতালি জমায়।

বাড়ীর ধাঁচটা অদ্ভুত—গলি থেকে লম্বা হয়ে এসে চ্যাটালো গোলাকার হয়ে গেছে। লম্বা অংশে দু'হাত চওড়া উঠান, চব্বিশ ঘণ্টা ভিজে থাকে। দুপাশে আধ হাত উঁচু আর দেড় হাত চওড়া দাওয়া এবং দু'খানি করে ঘর। ভিতরের দিকে চ্যাপ্টাকোণ ত্রিভুজের মত প্রায় গোলাকার কিছু বড় উঠান ঘিরে আরও কতগুলি ঘর আছে। একখানা করে নিয়েই অধিকাংশ ভাড়াটে বসবাস করে, কেবল পরেশ আর গোপালের ঘর দু'খানা করে। গোপালের রোজগার একটু ভাল এবং সংসারটিও বড়। একটি ছোটখাট দর্জির দোকান তার আছে। এ বাড়ীতে পরেশের সঙ্গেই রামপালের ভাব বেশী। পরেশের স্ত্রী দুর্গা এতকাল রামপালকে রেঁধে খাইয়েছে স্বামী আর দেওরদের সঙ্গে, রামপাল খরচ দিয়ে এসেছে মাসে মাসে। রম্ভা আসবার পরে দ্বিতীয় মাসেও এই ব্যবস্থা বজায় আছে, যদিও রম্ভার ভিন্ন সংসার পাতার কথাটা

কয়েকবার উঠেছে ভাসাভাসা ভাবে। দেশে রামপালের বাপ মা ভাই বোন কেউ না থাকলেও আত্মীয়স্বজন ছিল, বিয়েতে কিন্তু সে তাদের কাউকে ডাকেনি। দুর্গাই রম্ভাকে বরণ করে ঘরে তুলেছে, আচার নিয়ম পালন করেছে, আদর যত্ন দেখিয়েছে, নতুন বৌয়ের জন্য শাশুড়ী ননদের যা কিছু করার থাকে সব সে করেছে একা। বয়স তার বেশী নয়, দুটি ছেলের মধ্যে বড়টির বয়েস হবে বছর তিনেক, ছোটটি এখনো মাই টানে, কিন্তু ক'বছর একা সংসার চালিয়ে তার রকম-সকম হয়েছে পাকা গিন্নীর মত। রম্ভাকে ভালবেসে দরদ করতে শিখলেও প্রাণের সখি সে হয়ে উঠতে পারেনি, তার ব্যবহারে একটু গুরুজন গুরুজন ভাব রয়ে গেছে।

পরেশের দু'ভায়ের নাম সুরেশ আর নরেশ। সুরেশ একটু গম্ভীর রগচটা ধরনের যুবক, সুবালা নামে তার চেয়ে চার-পাঁচ বছর বয়সে বড় পাড়ার একটি হাফ-গেরস্ত মেয়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে ভাব জমিয়ে দিন কাটাচ্ছে। লোকনাথের কাঠের কারখানাতে সেও মিস্ত্রীর কাজ করে। রোজগারের অর্ধেক এনে দেয় দাদার হাতে, বাকী অর্ধেক সম্ভবতঃ খরচ করে সুবালার পিছনে। ভাল একটি মেয়ে দেখে তার বিয়ে দেবার জন্য পরেশ ও দুর্গার চেষ্টার বিরাম নেই দু'বছর ধরে, কিন্তু সুরেশ নির্বিকার। অথচ আশ্চর্য এই, সুবালার প্রেমে হাবুডুবু খাবার কোন লক্ষণও তার দেখা যায় না। রাতগুলি বেশীর ভাগ তার বাড়ীতেই কাটে। মাঝে মাঝে শুধু দেখা যায়, রাতে সে বাড়ী ফেরেনি, কিশোর নরেশ দুয়ার না দিয়েই একা ঘরে ঘুমিয়ে রাত কাটিয়েছে।

নরেশ ছেলেটা বড় চঞ্চল, চালাক আর অবাধ্য। এই বয়সে ছেলেটা যে কি করে এমনভাবে পেকে গিয়েছে রম্ভা ভেবে পায় না। আরও সে ভেবে পায় না কি করে এর সঙ্গে এত সহজে তার এমন ভাব হয়ে গেল যে শাসন করার বদলে ছোঁড়াটার পাকামিকে প্রশ্রয় দিতে তার ভাল লাগছে।

এখানে আসবার পরদিন বিশেষ দরকারে রামপাল বেলা তিনটের সময় অনিচ্ছার সঙ্গে বেরিয়ে গেছে, খালি ঘরে রম্ভা তাকিয়ে আছে মাটি লেপা দেয়ালে বসানো একরত্তি জানালা দিয়ে গলির ওপারের দুটি বাড়ীর ফাঁকে খানিক তফাতের খালের অংশটুকুর দিকে। বিড়ির গন্ধে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ভাবল, একটু সময়ের জন্যও তবে কি রামপাল তাকে ছেড়ে যেতে পারল না, ফিরে এল বেরিয়ে গিয়ে! তারপর রম্ভা চেয়ে দ্যাখে কি পাশ থেকে রোগা একটি হাত এগিয়ে এসে তার হাতের মুঠোয় গুঁজে দিচ্ছে ছোট একটি কৌটো!

ফিরে তাকাতে বিড়িতে জোরে টান দিয়ে যেন প্রায় বুক ফুলিয়ে নরেশ বাহাদুরীর হাসি হাসল। নতুন বৌকে সে ছ'পয়সার এতটুকু একটি কৌটো উপহার দিয়েছে— কৌটোর ওপরে আবার একরত্তি আর্শি আঁটা!

'টেঁপিকে দেখিও না। এ্যাঁ? মেয়েটা ভীষণ হিংসুটে।'

'টেঁপি কে?'

'ওই যে ও বাড়ীর সোনামাসীর মেয়ে টেঁপি। বোলো না ওকে।'

'এটা টেঁপির নাকি? নিয়ে যাও বাবু তোমার টেঁপির জিনিস। আমি চাই নে।'

নরেশ উদারভাবে বলেছিল, 'তাতে কি, নাও না। কিছু হবে না।'

পরে রম্ভা সোনামাসীর পরিচয় পেয়েছিল, তার আহ্লাদী মেয়েরও। সোনামাসী গলির আরও ভিতরে কয়েকটা বাড়ী পেরিয়ে এক বাড়ীতে থাকে। কাবুলীওয়ালার ব্যবসা চালিয়ে সোনামাসী নিজের সংসার চলায়। পুঁজি তার সামান্য, স্বামী মরবার পর গায়ের সব গয়না আর ঘরের সব বাড়তি বাসনকোসন বেচে দিয়ে টাকা কটা সংগ্রহ করেছিল। সংসার বলতে

সে নিজে আর তার ওই মেয়ে টেঁপি, খরচ বেশী নেই। একটি টাকা তার বাইরে গেলে কদিনের মধ্যে পাঁচ সিকে হয়ে ফিরে আসে। দশ বছর ধরে সোনামাসী মেয়েকে দুধ-ভাতও খাইয়েছে, পুঁজির টাকাও বাড়িয়েছে। ব্যবসাটা সে আয়ত্ত করেছে অদ্ভুত অধ্যবসায়ের সঙ্গে। প্রথম প্রথম দু'চার টাকা তার মারা গিয়েছিল, লোক চিনতে ভুল করেছিল, বেশী সুদের লোভ সামলাতে পারেনি। এখন সে আর ঠকে না, তাকে ঠকিয়ে পার পাবার ক্ষমতা আছে এমন লোককে সে টাকা কখনো ধার দেয় না, বাজে লোকের সঙ্গে কারবার করে না। কার কাছ থেকে কি ভাবে টাকা আদায় করতে হবে তাও সে নির্ভুলভাবে জানে। কারো কাছে ধন্না দেয়, কারো কাছে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে, কাউকে দেয় গলা ফাটিয়ে অকথ্য গালাগালি আর কাউকে দেখায় ভয়। আবার কারো কারো বেলা সময় পার হয়ে গেলেও কখনো তাগিদ দেয় না। সে জানে যে তার তাগিদের চেয়েও এ সব লোকের কাছে চক্ষুলজ্জার তাগিদ ঢের বেশী জোরালো। হাতে এখন টাকা নেই বলেই তার টাকা ফেরৎ দিচ্ছে না, এখন গিয়ে টাকা চেয়ে চক্ষুলজ্জা ভেঙ্গে দিলে তারই বিপদ।

এমন যে সোনামাসী, গায়ের রঙ যার খাদ মেশানো পেতলের মত, তার বারো বছরের ট্যাবটেবে ছিচকাঁদুনে মেয়ে টেঁপির সঙ্গে নরেশের বড় ভাব।

দুর্গা বারণ করে, ভয় দেখায়। বলে, 'তোর কি মরণ নেই রে লক্ষ্মীছাড়া, সোনামাসীর ঘরে আদর খেতে যাস? ঘরের আদরে পেট ভরে না তোর? ও মেয়ে দিয়ে ব্যবসা করবে সোনামাসী, তাও কি টের পাসনে তুই হাড়হাবাতে? ফের যাবি তো তোর দাদাকে বলে হাড় গুঁড়িয়ে দেব বলে রাখছি।'

নরেশ অম্লান বদনে মিথ্যা বলে, 'যাই না তো। তোমার খালি বাজে সন্দ।'

এরা ছাড়া আছে মোটা শিবু, রোগা শরৎ, বুড়ো গগন, ক্ষান্ত পিসী, রাণীর মা, পাগলা ইত্যাদি আরও কয়েকজন ভাড়াটে।

গোপালের সাতটি ছেলে-মেয়ে, বড়টির বয়স পনের বছর। গোপালের বৌ ন' মাস পোয়াতি। তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে তাক লেগে যায়, ভাবা যায় না পেটের ভারে সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়া সে কিসের জোরে ঠেকিয়ে রেখেছে। চুল ওঠা মাথায় টাকের মত চওড়া সীঁথিতে ছটাক খানেক সিঁদুর, কপালের ফ্যাকাসে ঢিলে কালো চামড়ায় চওড়া সিঁদুরের ফোঁটা. সাদাটে গভীর চোখ, ঠিক যেন যন্ত্রণায় জোরে চাপা কোঁচকানো ঠোঁট আর জীর্ণশীর্ণ পেটমোটা কঙ্কালসার দেহ দেখে পাড়ায় কানাকানি চলে যে ছেলে বিয়োবার সুখ ভোগ করতে কোন উপদেবী—হয়তো বা গর্ভটর্ভ নষ্ট করার পাপে উপদেবী হয়েছিল এমন কেউ—মা হবার সুখ ভোগ করতে গোপালের স্ত্রীকে ভর করে আছে। বছর বছর ছেলে মেয়ে হয় অনেকের, জীর্ণশীর্ণ রুগ্ন মায়েরও কোন অভাব নেই কিন্তু এমন চেহারা নিয়ে এত ছেলে বিইয়ে যে কেউ নিজেও বেঁচে থাকে, বিয়োনো ছেলে-মেয়েগুলিও সবকটা বেঁচে থাকে—এমন অদ্ভুত ব্যাপার কেউ কখনো দ্যাখেনি।

মা ও ছেলেমেয়েগুলি সবাই যেন এই মরে তো এই মরে—অথচ একটাও মরে না! এ রহস্য কি মাগ্‌না সম্ভব হয়?

শুধু কি তাই? গোপালের বৌ যে অমন তেজের সঙ্গে ঝগড়া করে সে তেজ সে পায় কোথায়?

ক্ষান্ত পিসীর ছেলে বিন্দেও মিস্ত্রী। বিশেষ কোন দক্ষতা নেই; সাধারণ মজুর মিস্ত্রির বেতন পায়। বছর খানেক বিয়ে করেছে। একখানার বেশী ঘর ভাড়া নেবার ক্ষমতা তার নেই, বিয়ের

পর মাকে কোথায় যেন কোন আত্মীয়ের কাছে সরাবার ফিকিরে ছিল, পেরে ওঠেনি। ক্ষান্ত পিসীর দু'একটা গয়না আর সত্তর আশী টাকা নগদ আছে। জোর তাই খাটানো চলেনি একেবারেই। প্রায় সত্তর বছরের বুড়ী, আজ মরে কি কাল মরে ঠিক নেই, তার ওপর জোরই বা খাটানো যায় কি করে? ছেলের বিয়ের পর বর্ষা নামা পর্যন্ত ক্ষান্ত পিসী এখানে সেখানেরাত কাটিয়েছে, তারপর মাঝখানে একটুকরো চট টানিয়ে ক্ষান্ত পিসীর বিছানা করতে হয়েছে বিন্দে ও তার নতুন বৌয়ের বিছানার ঠিক আড়াই হাত তফাতে। কদিন মড়ার মত নিঃশব্দ হয়ে থেকেছে বিন্দে আর তার বৌ। তারপর শোনা গেছে তাদের চাপা গলায় ফিসফিসানি প্রেমালাপ ও প্রেমের মৃদু ইঙ্গিত। তারও পরে ছেলেবৌয়ের চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া অভ্যস্ত হয়ে গেছে ক্ষান্ত পিসীর।

শিউশরণের বাড়ী গয়া জেলায়। প্রায় আট ন'বছর ধরে সে এ বাড়ীতে থেকে একনিষ্ঠভাবে দু'টি সাধনা করে গেছে, গোঁফ পাকানো ও টাকা জমানো। মাঝে মাঝে সে দেশে যেত, সম্প্রতি দেশে গিয়ে একটি চতুর্দশী মোটাসোটা বৌ নিয়ে ফিরে এসেছে। গলায় হাঁসুলি, পায়ে মল, হাতে চারটি রূপার ও গণ্ডা দুই কাঁচের চুড়ি পরা, হলদে কাপড় জড়ানো ছিটের জামা গায়ে বিশালস্তনী বৌটিকে শিউশরণ যে অত্যন্ত ভালবাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায় বৌয়ের প্রতি তার একান্ত আনুগত্যে।

ঘরের কাজ আর বৌয়ের সেবা করায় তার উৎসাহের যেন অন্ত নেই।

পাশের ঘর থেকে রাণী রাত্রে তাদের প্রেমালাপ শোনে এবং সকালে সকলকে শুনিয়ে খিল খিল করে হাসে।

সরযূ প্রায় ধমকের সুরে অবজ্ঞা ভরে বলে, 'নেহি নেহি। মেরা তবিয়ৎ আচ্ছা নেহি হ্যায়।'

শিউশরণ মিনতি করে, পায়েও নাকি ধরে। তারপর সব চুপচাপ। গাঁজার উৎকট গন্ধ ভেসে আসে খানিক পরে! তারও পরে উদাস কণ্ঠে শিউশরণ ভজন গান ধরে। আহা, তার করুণ ভজন শুনে চোখে নাকি জল আসে রাণীর।

শিউশরণের ভজন থামার পর চোখে প্রায় ঘুম নেমে এসেছে রাণীর, সরযূর ভর্ৎসনা শুনে সে সজাগ হয়ে ওঠে।

'ইয়ে কা জবরদস্তি? সরম নাহি তুমারা?'

'চোপরও!'

প্রচণ্ড চড়ের শব্দে রাণী নাকি চমকে যায়। ভাবে, সরযূ কি শেষে চড় পর্যন্ত মেরে বসল স্বামীর গালে? সরযূর কান্না কানে আসতে সে বুঝতে পারে, না, শিউশরণই বিদ্রোহ করেছে?

'মাগী যেন কি, না রম্ভাদি?'

রম্ভা আসল খবর জানে। রাণীর মত সস্তা মজা পাওয়ার বদলে মনটা তার খারাপ হয়ে যায়। সরযূ একটু উঁচু বংশের মেয়ে শিউশরণের চেয়ে। টাকার জোরে শিউশরণ তাকে বিয়ে করে এনেছে। প্রায় সত্তর টাকা বেশী খরচ করে। শিউশরণের স্পর্শে এখনো অপমান বোধ হয় সরযূর, বিতৃষ্ণা জাগে। রম্ভা নিঃশ্বাস ফেলে ভাবে, বয়সটা শিউশরণের কম হলেও হয়তো নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া সহজ হত সরযূর পক্ষে।

অপস্থান, নর্দমা ও পচা আবর্জনার দুর্গন্ধ—কলকাতায় জলের জন্য, ছেলেমেয়ের ঝগড়ার জন্য, বেসামাল মেয়েমানুষের দিকে পুরুষের একটু তাকানোর জন্য, নিছক হিংসার জন্য

আর শুধু ঝগড়াটে স্বভাবের জন্য কোন্দল, পরস্পরের বাঁচনমরণে ব্যঙ্গাত্মক উদাসীনতা আর ছলচাতুরী হীনতা দীনতা নির্মম পাশবিকতায় বিষাক্ত তার এই নূতন আবেষ্টনীতে মায়া মমতা উদারতা, আত্মনাশী নির্বাক সহিষ্ণুতা আর মহত্তর বৃহত্তর কিছুর কামনা খুঁজে খুঁজে আবিষ্কার করে রম্ভা আত্মরক্ষা করে।

রম্ভা যখন প্রথম জেনেছিল তাদের পাশের বাড়ীর পরের বাড়ীতে সাতটি মেয়ে থাকে—কেউ কেউ নিজের মা কিম্বা ভায়ের সঙ্গেই থাকে—সে সাতটা মেয়ের যে কোন একজনকে যে কোন পুরুষ এসে একটি টাকা দিয়ে সম্ভোগ করে যেতে পারে, রম্ভার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। পাগলের মত সে রামপালকে বলেছিল, আমায় নিয়ে চলো—অন্য কোথাও নিয়ে চলো—আমি মরে যাব এখানে থাকলে।

তাঁকে বুঝিয়েছিল দুর্গা।

'কোথায় যাবি? ভদ্রপাড়ায়? কলকাতায় ভদ্রপাড়া নেই।'

উমাপদর কথা, কালীতারা সুখলালের কথা মনে পড়ে যায়, রম্ভার গা জ্বালা করে।

'কোথাও নেই?'

'আছে। বাবুদের পাড়া আছে। বাবু বর একটা জুটিয়ে নিলেই পারতিস—দেখতিস পাড়াশুদ্ধ সতীলক্ষ্মীরা একটা স্বামী নিয়ে ঘরকন্না করছে? খোলার বাড়ীর পাড়ায় ওরকম বাড়ী দু'চারটে থাকবেই বোন।' দুর্গা ভ্রুকুটি করে, খোঁচা দিয়ে বলে, 'আমি তো একজনকে নিয়ে এ বাড়ীতে কাটালাম পাঁচ ছ'বছর। ওসব হতভাগীদের সবাইকে জানি আমি। ওদের কষ্ট দেখে দয়া হয়—ঘেন্না তো হয় না বাছা তোমার মত!'

রম্ভা সব তেজ হারিয়ে কাতরভাবে বলে, 'ঘেন্না নয় দুগ্‌গাদি, ঘেন্না নয়। বড় কষ্ট হচ্ছে আমার, বুক ফেটে যাচ্ছে।'

ভাবপ্রবণতার আক্রমণে রম্ভাও কাবু হয়ে পড়ে! কিন্তু সামলে নেয়, সইয়ে নেয় রম্ভা, চারিদিকের সঙ্কীর্ণ কুঁকড়ে যাওয়া বিকৃত জীবনের কুৎসিত কদর্যতাকেই একমাত্র চরম সত্য বলে মেনে না নিয়ে সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য খুঁজে বার করার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে যায়। তখন সে সাহস পায়, তার ধৈর্য আসে। বিরোধ ও বিতৃষ্ণা উবে যায়। কষ্ট থাকে, মনের মধ্যে প্রতিবাদের নিরুপায় নালিশের কষ্ট, কিন্তু তাতে আর তীব্র জ্বালা থাকে না। গাঁয়ের জীবনে নোংরামি কম নেই। তবে সেখানে মানুষ ছড়িয়ে থাকে, ধীরে সুস্থে গড়িয়ে বাঁচে, জীবনের গ্লানি ও আবর্জনাও ছড়িয়ে থাকে তফাতে তফাতে। এখানে সংকীর্ণ স্থানে গাদাগাদি করে আছে ঊর্ধ্বশ্বাস স্বার্থপর নিষ্পিষ্ট মানুষ। এই স্তূপীকৃত পাপ ও বিকারের মধ্যে এসে পড়ায় প্রথমে রম্ভা দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল, ক্রমে ক্রমে সে ভাবটা তার কেটে যায়। একদিন দুপুরবেলা যেচে পাড়ার কয়েকটি দেহবেচা মেয়ের সঙ্গে আলাপ করে এসে সে অনেকটা স্বস্তি বোধ করে। এদের সম্বন্ধে তার একটা উদ্ভট, বীভৎস ধারণা ছিল, তার মনে হত এদের কাছাকাছি দাঁড়ালেই বুঝি পচা গন্ধ এসে নাকে লাগবে। বরং দেখে সে অবাক হল, গেরস্ত অনেক মেয়ের চেয়ে এরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, অন্য মানুষের মতই এদের সুখ-দুঃখ স্নেহ মায়া আছে, ভাল-মন্দ উচিত-অনুচিত বোধ আছে, এমন কি উদারতা পর্যন্ত আছে খানিকটা!

বাড়ীর সকলকে আর পাড়ার অন্য বাড়ীর যে ক'জনকে পারে একদিন ডেকে এনে একত্র করে সামাজিক সম্পর্কের ভূমিকা স্থাপনের একটা উপলক্ষ খুঁজছিল রম্ভা। ভোজ দেওয়া যায় না, সে অনেক খরচ, বিয়ে-টিয়ের মত মস্ত ব্যাপার ছাড়া চলে না। অকারণে বা খাপছাড়া

কারণে সকলকে ডেকে এনে শসা-বাতাসাও খাওয়ানো যায় না, সবাই কি ভাববে। ভেবে চিন্তে এক পূর্ণিমায় রম্ভা সবাইকে সিন্নী খাওয়াবার আয়োজন করল। পাকা কলা আর ময়দা দিয়ে রম্ভা সাদাসিদে সিন্নী বানাল। পঁচিশজনের সিন্নীতে দুধ পড়ল সের দেড়েক। তবু, তাই অনেক বলতে হবে। পঁচিশ ত্রিশ জনকে এই সিন্নীই বা খাওয়াতে পারে কজন? ক'জনের ঘরে ছেলেপিলে বিশেষ বিশেষ তিথিতেও এক ঢোঁক দুধ গিলতে পায়?

সিন্নী খাওয়ানো উপলক্ষে রামপাল সকলকে কীর্তন গেয়ে শোনায়। অন্য গানও গায়,—প্রেমের গান, বিরহের গান, মিলনের গান। শুধু যাত্রা পাঁচালী আর বোষ্টম ভিখারীর গান নয়, রবীন্দ্রনাথের দু'চার খানা গান রামপাল জানে। সে গান ইথারে স্পন্দিত হয়, প্রাসাদ-শিখরের আলো-ঝলমল কক্ষের বাতায়ন থেকে ফুটপাতের কুষ্ঠরোগীর কানে ভেসে আসে, স্বামী-শিবের তপস্যার অঙ্গ হিসাবে ঘরে ঘরে কুমারী মেয়ে ডাল-সিদ্ধ হবার অবকাশে যে গান গেয়ে গলা সাধে, গান জানলে কাঠচেরা করাতিও আপনা থেকে সে গান দু'চারখানা শিখে ফ্যালে। দেশী-বিলাতী মেশানো সুরের বদলে হয়তো রামপ্রসাদী সুরে গায়—গানের সুরেতে পরাণখানিরে পাতি পথের 'পরে,—কিন্তু গায়। উপরের স্তর থেকে এমনিভাবে চুঁইয়ে চুঁইয়ে সবকিছু নীচের স্তরে পৌঁছায়।

রামপালের হারমোনিয়ম নেই, বাঁয়া তবলা আছে। হারমোনিয়ম ভাড়া করে আনা হয় পাড়ার গিরি বাড়ীউলির কাছ থেকে, ঝাঁঝালো আওয়াজের হারমোনিয়ম। রামপাল তবলা বাজাতে জানে না, তবলা বাজায় নগেন অথবা বিষ্টু। বিষ্টুর হাতটাই বেশী মিঠে, তাকেই প্রথমে সকলে অনুরোধ জানায়, সে যদি নেহাৎ বাজাতে রাজী না হয়, বিনিয়ে বিনিয়ে কেবলি বলে যে আঙ্গুলে তার বড্ড ব্যথা, নগেনকে তখন বাজাতে বলা হয়।। নগেন যেন বাজাবার জন্য ওৎ পেতে থাকে, প্রত্যাশায় উত্তেজনায় ঘন ঘন ঠোঁট চাটে আর চোখ মিট মিট করে। ডাকামাত্র উঠে এসে জোরে তবলায় চাঁটি দেয়, শুধু গজদন্ত দু'টির বদলে দু'সারি দাঁত হাসিতে প্রকাশ হয়ে পড়ে, যতক্ষণ বাজায় সে দাঁত আর ভাল করে ঢাকা পড়ে না। আগাগোড়া চোখ বন্ধ করে মাথা দোলায়, রামপালের গান অথবা নিজের বাজনার তালে সে মশগুল ঠিক করে বলার উপায় থাকে না।

আজও হয়তো তারই বেতালা বাজনার সঙ্গে রামপালকে গাইতে হত, কারখানায় বিষ্টুর হাতে চোট লেগেছে। পরেশের ঘর থেকে লণ্ঠন এনে এ ঘরের দাওয়ায় পুরুষ শ্রোতাদের কাছে নামিয়ে রেখে দুর্গা বলল, 'আজকের দিনটি তুমি বাজাও গো বিষ্টু দাদা, শুনছো? ওস্তাদি ক্ষয়ে যায় তো যাবে, বল্লে দিনু এই কথা।'

মেয়েদের মধ্যে বসে বিষ্টুর বোনের সঙ্গেই রম্ভা কথা বলছিল। এক নজর তার দিকে তাকিয়ে বিষ্টু উঠে এসে বাঁয়া তবলার সামনে বসল।

চাঁদ উঠেছে কিন্তু উঠানে দাওয়ায় এখনো জ্যোৎস্নার ছায়া, শুধু এক ফালি রূপালী আলো নিমাই-এর ঘরের পাশ কাটিয়ে কলতলায় এসে পড়েছে। দু'টি লণ্ঠনের আলোয় গান শুরু হল। রম্ভার ঘরের দাওয়ার আর দাওয়ায় নীচে উঠানে পুরুষেরা বসেছে, পরেশের ঘরের সামনে মেয়েরা। দশ-বারটা বিড়ি একসঙ্গে জ্বলছে, তবলা বাঁধতে বিষ্টু এত সময় নিয়েছে যে অনেকে বিড়ি না ধরিয়ে পারে নি। তা সময় নিক বিষ্টু, কারো তাতে আপত্তি নেই, গুণীর মর্যাদা তারা জানে। শুধু কড়া পোড়া ভোঁতা ভাদগুল জীবনে রস জোটে এত কম যে লজ্ঞেঞ্জুস-লোভী শিশুর মত ধৈর্য ধরা কঠিন হয়ে পড়ে। উদাসী-আবেগের চর্চাটা এদিকে কম নয় কিনা, ধর্মে কর্মে পুরাণে গাথায় ঘরকন্না আত্মীয়তার বন্ধুত্বে কলহে বিবাদে ভাবপ্রবণতার

ছড়াছড়ি। এখন লণ্ঠনের আলোয় ভালো করে বোঝা যায় না, দিনের আলো হলে দেখা যেত, গান শুনতে শুনতে মেয়ে-পুরুষের মুখে যে ভাব ফুটেছে পুরানো কলসীর শ্যাওলাটে সিক্ততার কথাই তা মনে পড়িয়ে দেয়। ঘামের মত প্রতি লোমকূপ থেকে যেন অবিরত চুঁয়োচ্ছে ভাব।

রামপাল আজ পুরানো সুরে একটি নতুন গান ধরেছে—

রাই পাগলিনী পণ করেছে গো
যে কাঁদায় তারে কাঁদাতে হবে।
পায়ে ধরে ঢের মান ভেঙ্গেছে গো
(আজ) কেঁদে কেঁদে মান ভাঙ্গাতে হবে।
নিজে সে কাঁদে না বাঁশীরে কাঁদায়
প্রেম তার খেলা রাধা মরে যায়—

মোটা শিবু চোখ বুজে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, যেন কার অনুরোধ উপরোধ নীরবে প্রত্যাখ্যান করছে। খাদ্যের অভাবে এদের কারো দেহ পুষ্ট হয় না, দু'একজন শুধু শিবুর মত মুটিয়ে যায়। তাদের উন্মাদনার অভিব্যক্তি এই রকম ধীর স্থির শিথিল। অন্য সকলের মধ্যে অস্থিরতা জাগে। গগন নড়ে নড়ে বসে, জগু ঘন ঘন পলক ফেলে, শরৎ মুখ ফাঁক করে ঠিক গ্রীষ্মকালের কুকুরের মত হাঁপায়, বিন্দে পা নাচায়, অভ্যাসে উবু হয়ে বসায় ফেলনার হাঁটু ঠক ঠক করে কাঁপে, গোপালের শরীরটা আধ মিনিট অন্তর শক্ত আর ঢিল হয়ে যায়। রম্ভার কোল থেকে ঘুমন্ত ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে জাগিয়ে দুর্গা তার মুখে স্তন গুঁজে দেয়, মুখে আঙ্গুল গুঁজে পুটু আঙ্গুলটা কামড়ে থাকে, সৌরভী অবিরাম পান চিবোয়, মিনিটে মিনিটে ক্ষান্ত পিসী দোক্তা গুঁড়ো মুখে ফেলতে থাকে, রাণী তার সই পুষ্পের গায়ে শুধু ঠেস দিয়ে নয় রীতিমত চাপ দিয়ে বসে থাকে, জগদম্বা বার বার রাণীর মার কানে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলে যায়, মনটা ক্যামোন করছে গো—মেয়েটার তরে মনটা ক্যামন করছে। গান ভুলে এদিকে মন দিলে শোনা যায়, ফিস্ ফিস্ কথার শব্দ, নিঃশ্বাসের শব্দ, নড়াচড়ার শব্দ, সোনারূপা কাঁচের চুড়ি আর সোনা তামা পিতলের বালায় ঠোকা-ঠুকির টিন্‌টিন্ শব্দ, সমস্ত মিলে এক অদ্ভুত মৃদু গুঞ্জন সৃষ্টি করেছে।

ভাসা ভাসা ছাড়া ছাড়া ভাবে রম্ভা রামপালের গান শুনছিল, আসরে বসে তাকে আসর মাতানো গান গাইতে সে আগে কখনো দ্যাখেনি। শুধু শুনেছিল, স্বামী তার চমৎকার কীর্তন গাইতে পারে। রামপাল গান ধরবার কিছুক্ষণ পর থেকে রম্ভা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে রামপালের মুখের দিকে। গানের সুরে গা তার রি-রি করে, প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা হয় এই বুঝি রামপালের আধ-বোজা চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়বে। এ ন্যাকামি রম্ভার সয় না। এত বড় জোয়ান মদ্দ পুরুষ কি করে যে নিজে গান গেয়ে নিজে এমন কাতর হয়ে পড়ে মেয়েহ্যাংলা রোগা প্যাঁটকা মন-উড়ু-উড়ু ন্যালাক্ষ্যাপা ছোঁড়ার মত। হঠাৎ সে উঠে চলে যায়। এক অকথ্য বিষাদে তার বুক ঠেলে কান্না আসতে চায়।

নতুন জীবনের নতুন আবেষ্টনীকে জেনে বুঝে সইয়ে নেবার সঙ্গে রামপালকেও সে জানতে বুঝতে থাকে—মানুষটা ক্রমে ক্রমে নানা দিকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার কাছে। এবং এই দিক দিয়ে তার আঘাত আসে সব চেয়ে কঠিন। কাঠগোলার গোলমালের ব্যাপারে রামপালের ছেলেমানুষি দেখিয়ে দিয়ে কৃষ্ণেন্দু যখন ভর্ৎসনা করেছিল, একটা খটকা বেধেছিল রম্ভার মনে। রামপালের মেয়েমানুষের মত অভিমানী খেয়ালী শিল্পীমনের ঘনিষ্ঠ

পরিচয় পেয়ে এখন সে বুঝতে পারে সেদিন তার ভুল হয়নি। বুঝেও কিছুদিন রম্ভা বুঝতে চায়নি। জোর করে মনে করতে চেয়েছিল পিরীতের প্রথম দিশেহারা খেলার আবেগে মানুষ এরকম ভাবপ্রবণ স্বপ্নবিলাসী আর আরামপ্রিয় হয়, খেয়ালী হয়, এলোমেলো চিন্তা করে। কিন্তু দিবারাত্রি যার সঙ্গে বসবাস দহরম, মহরম তার আসল প্রকৃতি কদিন না চিনে থাকা যায়। ঝুমুরিয়ার সূর্যকে পর্যন্ত একদিন রামপালের তুলনায় তুচ্ছ মনে হয়েছিল রম্ভার, ভেবেছিল সূর্য মুখে যেসব কথা বলত তার রামপাল সেই সব কথা কাজে পরিণত করবে। এখন সে টের পেয়েছে, ও সব চিন্তাই রামপালের নেই। কাঠগোলার ব্যাপারটাতে অবস্থার ফেরে জড়িয়ে গিয়ে দু'দিনের জন্য তার একটু নেতৃত্ব করার ঝোঁক চেপেছিল মাত্র। দেশ ও দশের জন্য বড় কাজ করে গৌরব অর্জন করার তাগিদ সে অনুভব করে না। তার চেয়ে কাঠের শৌখীন জিনিস তৈরী করা আর কীর্তন গাওয়ার দিকে তার ঝোঁক বেশী।

হতাশায় কালো হয়ে যায় রম্ভার দিনগুলি, মনে হয় জীবনটা ভেস্তে গেল চিরদিনের জন্য, পায়ের নীচে আর সে মাটি পাবে না, অর্থহীন, সস্তা আর পচা জীবনটা টেনে চলতে হবে দিনের পর দিন কৃত্রিম অবাঞ্ছিত শূন্যতায়। কি বিশ্রী ভুল, কি ক্রুর তামাশা! ক্ষোভে রম্ভার বুক জ্বলে যায়, রামপালের সান্নিধ্য পীড়ন করে তাকে, তার বুকভরা ভালবাসা যেন বিরাগে পরিণত হয়ে গেছে।

ভয়ে ভাবনায় উদ্বেগে অভিমানে রামপাল ম্লান হয়ে যায়, তার আদর নেয় না রম্ভা, সাড়া দেয় না, এক অভূতপূর্ব ভীতিকর গাম্ভীর্যে তার চোখ মুখ থমথম করে,—একি সর্বনাশ! কাতর হয়ে বার বার জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে বৌ, কি হয়েছে? তার এই ছেলেমিপনার বাড়াবাড়ি আরও খারাপ লাগে রম্ভার, আরও তার মন খারাপ হয়ে যায়। আবেষ্টনীর চাপে একবার তার মনে হয়েছিল জেলখানায় কয়েদ হয়েছে। এ অনুভূতিকে আমল না দিয়ে দমন করে প্রায় কাটিয়ে উঠেছিল। এবার আরও প্রবল হয়ে ওঠে তার ফাঁদে আটকা পড়ার, চিরজন্মের জন্য আটকা পড়ার, প্রাণান্তকর অনুভূতি। বন্দীত্ব বোধের পীড়নটাই তার কাছে চিরদিন সবচেয়ে অসহ্য।

কারো কাছে খুলে বলবার উপায় নেই। কেউ বুঝবে না। তার পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়। সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলতে সাধ যায়। নিজের হাত পা কামড়ে, দেয়ালে মাথা ঠুকে, মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে, চীৎকার করে তার নালিশ জানাতে ইচ্ছা করে ভাগ্যের এই কুৎসিত জুয়াচুরির বিরুদ্ধে।

কিন্তু কিছুই রম্ভা করে না। দাঁতে দাঁত কামড়ে ভাবে, না, না, না। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কিছু করা হবে না। যদি ভুল হয়, যদি অন্যায় করে বসে? নিজের জীবনটা যদি তার নষ্ট হয়ে থাকে, হোক। রামপাল তাকে ধরে বেঁধে বিয়ে করে নি, 'আমি এই' আর 'আমি ওই' বলে ভুলায়ওনি তাকে। তার কি অধিকার আছে রামপালের জীবনটা নষ্ট করার? আত্মীয়স্বজনের মনে কষ্ট দেবার? বড় কোন উদ্দেশ্যের জন্য যদি হত, রামপালের জীবন বা আত্মীয়বন্ধুর অশান্তির চেয়ে যার দাম বেশী, তা হলেও কথা ছিল। ওরকম কোন সুযোগ বা পথ যদি কখনো পাওয়া যায়, সে ভিন্ন কথা। নিজের তার যোগ্যতা কতটুকু তাই তার জানা নেই, তার কি সাজে বাহাদুরী করা? শুধু তার নিজের ভাল লাগছে না বলে? নিজের পছন্দ-অপছন্দের খাতিরে?

না, না, না। সে ধৈর্য ধরে থাকবে।

রামপালের সঙ্গে সে তাই সামান্য কথা কাটাকাটি পর্যন্ত করে না, বিতৃষ্ণার ভাব দেখায়

না। বাইরে কথাবার্তায় চালচলনে অতিমাত্রায় ধীরস্থির শান্ত হয়ে থাকে। সেটা বড়ই খাপছাড়া ঠেকে রামপালের কাছে। অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য রম্ভা দূর করতে পারে না, যাতে রামপাল ভয় পায়। রামপালের সোহাগ সে দূরে ঠেলে দেয় না, কিন্তু নিজে যথেষ্ট উদ্দীপ্ত হয়ে সাড়া দেবার ক্ষমতাও তার হয় না, যাতে তার আদর নিচ্ছে না ভেবে রামপাল কাতর হয়ে পড়ে।

পরের পূর্ণিমায় দুর্গা সিন্নী খাওয়াবার এবং রামপালের গানের আসর বসাবার আয়োজন করল। ঘটনা ঘটল একটা। যে সম্পর্কে কৃষ্ণেন্দু এসে আশার আলো দেখিয়ে রম্ভাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

রামপালের গান যখন বেশ জমেছে, উপস্থিত সকলের মধ্যে দেখা দিয়েছে যথারীতি প্রতিক্রিয়া, ছেলের মুখে মাই গুঁজে দুর্গা আচ্ছন্ন অভিভূত হয়ে পড়েছে সুরের নেশায়, হঠাৎ গানে বাধা পড়ল।

পাগলা ও আরেকজন অচেনা মানুষ নরেশকে ধরাধরি করে এনে দাওয়ায় বসিয়ে দিল। থামে ঠেস দিয়ে বসে বুকের কাছে মাথা নামিয়ে নরেশ ধুঁকতে লাগল। তার মুখে রক্ত, গেঞ্জি ও কাপড়ে রক্তের দাগ।

এক মুহূর্তের স্তব্ধতার পর সকলে প্রায় একসঙ্গে কলরব করে ওঠে। এ অবস্থায় দ্যাওরকে দেখেও দুর্গা এতক্ষণের গা ঝিমঝিম করা গানের নেশা কাটিয়ে কিছু বুঝতে পারেনি, সকলের ফেটেপড়া কোলাহল যেন ঝাঁকি দিয়ে তাকে সচেতন করে দেয়। ছেলের মুখ থেকে স্তনের বোঁটা ছিনিয়ে নিযে তাকে সেইখানে দড়াম করে আছড়ে ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে সে সকলের আওয়াজ ছাপিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে, 'ওগো, মাগো! ইকি!'

এর গা-মাড়িয়ে ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে পরক্ষণে সে গিয়ে হাজির হয় নরেশের কাছে।

পাগলা বলে, 'কেষ্টবাবু মেরে লাশ করেছেন।'

দুর্গার ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে রম্ভা কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে আশ্চর্য হয়ে বলে, 'কেষ্টবাবু?'

পাগলা সায় দিয়ে বলে, 'হাঁ, কেষ্টবাবু। বাপরে বাপ, কি আথালি পিথালি মারটা লাগালে! ভয় হল কি মেরেই বুঝি ফেলেন!'

শুনে কলরব থামিয়ে সকলে স্তব্ধ হয়ে যায়। পাগলার কথা কারো বিশ্বাস হতে চায় না। কৃষ্ণেন্দুকে এরা মেয়েপুরুষ সকলেই জানে, অনেকদিন থেকে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জানে। বড় সে ভালবাসে তাদের, তাদেব ভালর জন্য চেষ্টার তার কামাই নেই, একবার সে জেলে গেছে তাদের জন্য। আজ নিজে সে নরেশকে মেরে আধমরা করে দিয়েছে!

'কেন মারলেন?' পরেশ শুধোল।

পাগলা এদিক ওদিক তাকায়, হঠাৎ একবার মুচকে হেসেই গম্ভীর হয়ে যায়, মাথা নেড়ে বলে, 'দোষঘাট নইলে কি এমনি মেরেছে, তেমন লোক কেষ্টবাবু নয়। যাক্ গা মারুক, ও কথা বাদ দাও।' পাগলাব সঙ্গী মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার সে বলে, 'সে বড় কেলেঙ্কারির কথা। এ ছোঁড়া বড় বজ্জাত। আজ দুপুরে সোনামাসীর ঘরে ঢুকে—'

আজ দুপুরে সোনামাসী তাগাদায় বার হয়েছিল, টেঁপি ঘরে ছিল একা। নরেশ নাকি তখন ঘরে ঢুকে কেলেঙ্কারী করেছে। কৃষ্ণেন্দু তাকে এই অপরাধে মেরেছে।

'কখন মারলেন?' 'কোথায়?' 'কে কে ছিল?' 'কেষ্টবাবু কই?' চারিদ্দিক থেকে প্রশ্ন আসে একঝাঁক। পাগলাব সঙ্গী বলে, 'সোনামাসী দুজনকে নিয়ে নালিশ করতে গিয়েছিল কেষ্টবাবুর

বাড়ী। কেষ্টবাবুর এই খানিক আগে বাড়ী ফিরলেন। টেঁপিকে সব শুধোলেন, তারপর পিটিয়ে দিলেন নরেশকে।' সে থামতেই আবার এক ঝাঁক প্রশ্ন ওঠে।

জেরায় বিব্রত পাগলার সঙ্গী হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, 'আমি আর কিছু জানিনে বাবু, পাগলকে শুধোও।'

পাগলাও আর কিছু জানে না। সকলে হতাশভাবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। এরকম কেলেঙ্কারী সংসারে অনেক ঘটে, শোনামাত্র টের পাওয়া যায় কি ঘটেছে। এ ব্যাপারের মাথামুণ্ড কিছুই যে বোঝা গেল না। কৃষ্ণেন্দু মেরে আধমরা করে দেয় এমন একটা কাণ্ড করল নরেশ দুপুরবেলা, আবার সন্ধ্যার সময় সোনামাসী মেয়েকে নিয়ে কৃষ্ণেন্দুর কাছে নালিশ করতে গেলে সেও সঙ্গে গেল। তাছাড়া, সোনামাসী ঘরে না থাক, বাড়ীতে আরও অনেক ভাড়াটে বাস করে, দুপুরবেলা একটা হৈ চৈ হয়ে থাকলে এতক্ষণ পাড়ার কারো তো সেটা অজানা থাকার কথা নয়। জগু আর সৈরভী ও-বাড়ীর বাসিন্দা। জগু নয় কাজে গিয়েছিল, তার বৌ আর বোন এবং সৈরভী তো মরে থাকেনি! সারাটা দুপুর সে বাড়ীতে এমন একটা কাণ্ড ঘটল তবু ওরা কিছু টের পেল না, গান শুনতে এসেই সবিস্তারে গল্প করল না ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে ফোঁড়ন দিয়ে? সকলে এদের প্রশ্ন করে, এরা হতভম্বের মত বলে যে কিছুই তারা জানে না! শুধু সৈবভীর কাছ থেকে শোনা যায়, নরেশকে সে দুপুরবেলা বাড়ীতে ঢুকতে দেখেছিল। তাও, ও ছোঁড়া তো আজকাল যখন তখন ও বাড়ীতে যায়, সোনামাসী বেশ খাতির করে ওকে।

'ও মাগীর পেটে পেটে প্যাঁচ, ভগবান জানে কি মতলব করেছে। সাতবচ্ছর এক বাড়ীতে রইছি, চার গণ্ডা পয়সা চাইলে একটি পয়সা সুদ নেয়, ও মাগী পারে না কী!'

দুর্গা ইতিমধ্যে জল এনে নরেশকে কুলকুচো করিয়েছে, মুখ ধুইয়ে ঘাড়ে মাথায় জল থাপড়ে দিয়ে পাখা হাতে বাতাস করছে। কানে তার যাচ্ছে সব কথাই কিন্তু দ্যাওরের শুশ্রূষা ছাড়া সব বিষয়ে সে যেন উদাসীন, কারো দিকে তাকাবারও সময় নেই! সুরেশ এতক্ষণ গুম্ খেয়ে ছিল, মুখ না ফিরিয়ে থেকে থেকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল ভাই-এর দিকে। কৃষ্ণেন্দু এমন মার মেরেছে যে দু'টো চড়চাপড় দেবারও তার উপায় নেই, এই আপসোস গুমরে উঠছিল তার মনে। হঠাৎ তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়, ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে সে বার করে নিয়ে আসে মোটা একটা বাঁশের লাঠি, নরেশের সামনে দাঁড়িয়ে পাগলের মত চীৎকার করে ওঠে, 'এই শুয়োর হারামজাদা! বল কি করেছিস? সব্বায়ের সামনে বল—কেষ্টবাবু রেয়াৎ করেছে, আমি তোকে খুন করব।'

দুর্গা ফোঁস করে ওঠে, 'না জেনে না শুনে তোমার অত চোটপাট কিসের গো? নিজে কত সাধু। খুন করবে! ভাইকে যে খুন করেছে তাকে খুন করগে যাও না, বুঝি কেমন মরদ?'

একজন লাঠি ছিনিযে নেয়, দু'তিন জন সুরেশকে টেনে নিয়ে যায় দূরে। দুর্গা তখনও চেঁচাচ্ছে, 'ইবার আসুক তোমার কেষ্টবাবু, একবারটি পা দিক উঠোনে, গাল দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দোব। জজ ম্যাজিস্টর। মেয়্যা করবে ছেনালি, সবটুকু দোষ চাপবে ছেলের ঘাড়ে। দারোগাবাবু! জজ ম্যাজিস্টর!...

গজ্ গজ্ করতে করতে দ্যাওরকে ধরে তুলে দুর্গা তাকে ঘরে নিয়ে যায়। রম্ভা সকলকে শুনিয়ে বলে, 'তা আমিও বলি, অত কথায় কাজ কি তোমাদের! যা শুনবার সব শুনবে, আজ নয় তো কাল, চাপা তো রইবে না কিছু, চুপ মেরে যাও না সবাই এখন?'

চুপ অবশ্য কেউ করে না, সেটা অসম্ভব। রামপাল আবার গান আরম্ভ করে, কিন্তু গান আর জমে না। রামপাল নিজে কিছুক্ষণের মধ্যে মশগুল হয়ে যায় এবং তারি মত ভাববিলাসী কয়েকজন মেয়েপুরুষ মন দিয়ে তার গান শোনে, অন্য সকলে চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালিয়ে যায়। থেকে থেকে এখানে ওখানে চাপা হাসি ধ্বনিত হয়ে ওঠে। কৌতূহল চাপতে না পেরে মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ দুর্গার ঘরের দরজায় গিয়ে উঁকি দেয়, কেউ একেবারে ভেতরে গিয়ে বিছানায় বসে, আত্মীয়তা জমাবার চেষ্টা করে। কিন্তু দুর্গা তাদের আমল দেয় না। চুপি চুপি অন্তরঙ্গ জিজ্ঞাসাব জবাবে বলে, 'কি হয়েছিল জেনে তোমার দরকার?' বলে, 'বাইরে গিয়ে গান শোন না, ছেলেটা জিরোক?'

দুর্গা নিজেই কি জানে কি হয়েছে যে দশজনকে বলবে? জানবার জন্য তার নিজের মনটাই করছে ছটফট। নিরিবিলি যে দুটো কথা কইবে দ্যাওরের সঙ্গে তারও কি উপায় আছে ছাই! মেজাজ তাব ক্রমেই চড়ছিল। পাঁচসাত জনকে বিদেয় করার পর ক্ষান্তপিসী ঘরে আসতেই তাকে ঠেলে বার করে সে দড়াম করে দরজা লাগিয়ে খিল চড়িয়ে দিল। শুধু রম্ভা রইল ঘবে। দুর্গাব ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে সে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে। গেঞ্জি ছেড়ে কাপড় বদলে নরেশ চৌকির শেষপ্রান্তে সরে গিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ছিল, এখন আর সে ধুঁকছে না, কিন্তু মাথাটা ঝুঁকিয়েই রেখেছে। হয়তো মারের জন্য নয়, লজ্জাতেই মাথা তুলতে পারছে না ছেলেটা। দুর্গা চৌকিতে উঠে সাগ্রহে তার কাছে এগিয়ে গেল। একবার সে তাকায় রম্ভার দিকে, চোখে চোখে দু'জনের কথা হয় আর রম্ভার মুখে ফুটে ওঠে মৃদু কৌতুকের হাসি।

তখন নীচু গলায় দুর্গা বলে নরেশকে, 'হল তো? কাণ্ড করলে তো দিনদুকুরে? কত করে বললাম, অত ব্যাকুল হোয়ো না গো ছোটকত্তা, টেঁপির সাথে বিয়ে তোমার ঘটিয়ে দেব। সবুর বুঝি সইল না?'—হাসি চাপতে না পেরে খিলখিল করে হেসে উঠেই দুর্গা মুখে আঁচল গুঁজে দেয়। তার আর জিজ্ঞাসা করা হয় না ব্যাপারটা কি হয়েছিল, নিজের জিজ্ঞাসার ভূমিকাতেই কাবু হয়ে পড়ে নিজে।

রম্ভা বলে, 'হেসো না দিদি, এ হাসির কথা নয়। এ নিয়ে কাণ্ড হবে ঢের, সোনামাসী ছাড়বেনি, উঁহু! শোন বলি নরেশ, খুলে বল দিকি সবকথা, ঢেকোনি কিছু—ডর লাগছে আমার। সোনামাসী বুঝি হঠাৎ ঘরে ফিরে এল? কি বললে এসে?'

নরেশ মুখ তুলে তাকায় কিছু বলে না। এখনো তার বিহ্বল ভাব কেটে যায়নি। চোখ দুটি তার অল্প লাল হয়ে উঠেছে। দুর্গা আর রম্ভার কৌতূহল সে মেটায় না, একটি কথাও তার কাছ থেকে আদায় করা যায় না। পালা করে দু'জনে জেরা করে, তোষামোদ করে, ভয় দেখিয়ে চেষ্টা করে অনেকক্ষণ, নরেশ কিন্তু মুখ খোলে না কিছুতেই, কোণঠাসা প্রহৃত অবোধ শিশুর মত ভীত অসহায় দৃষ্টিতে শুধু তাকাতে থাকে, একবার দুর্গা একবার রম্ভার মুখের দিকে।.....

ঘরের চালা থেকে দেয়াল বেয়ে জ্যোৎস্না উঠানে নামতে নামতেই আজ গানের আসরে ভাঙ্গন ধরল। একজন দু'জন করে উঠে যেতে যেতে আধ ঘণ্টার মধ্যে আসর একরকম হয়ে গেল খালি। মেয়েদের মধ্যে শুধু রইল রাণী, পুষ্প আর জগদম্বা এবং পুরুষদের মধ্যে রইল শরৎ, বিন্দে, ফেলনা আর গোপাল। রামপাল গেয়েই চলেছে। গোড়ায় বেশী লোক উপস্থিত না থাকলে রামপাল নিরুৎসাহ বোধ করে, কিছুক্ষণ গান গাইবার পর আসর আস্ত কি ভাঙ্গা এটা তার খেয়ালও থাকে না। অঙ্গন যদি এখন জনহীন অরণ্য হয়ে যায় তবু সে

আপন মনে গেয়ে চলবে।

কিন্তু গানে আবার বাধা পড়ল। হঠাৎ গান বাজনা সব বন্ধ হয়ে যেতে সকলে তাকিয়ে দ্যাখে, কৃষ্ণেন্দু এসে দাঁড়িয়েছে।

এ বাড়ীতে এবং এ পাড়ার অনেক বাড়ীতে মাঝে মাঝে বিনা খবরে হাজির হওয়া তার নতুন নয়। অন্যদিন কেউ ব্যস্ত বা বিস্মিত হত না। আজ তাকে দেখেই আকস্মিক উত্তেজনা অনুভব করে সকলে অতিমাত্রায় সজাগ হয়ে উঠল আর সেই সঙ্গে বোধ করতে লাগল অস্বস্তি। দোষ করুক আর যাই করুক, এ বাড়ীর একটি ছেলেকে সে অমানুষিক প্রহার করেছে, এখনো দু'ঘণ্টা হয়নি।

রম্ভা মোড়া এনে দিল। বসে কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞেস কবল, 'নরেশ মরেনি তো রম্ভা?'

রম্ভা বলল, 'না।'

কৃষ্ণেন্দু উঠোনে পা দিলেই দুর্গা তাকে গাল দেবে বলেছিল। মনে হয়েছিল, ছ'মাস এক বছর পরেও যদি কৃষ্ণেন্দু আসে, মনে সে রাগ পুষে রাখবে, গাল না দিয়ে ছাড়বে না। দু'ঘণ্টার মধ্যে কৃষ্ণেন্দু হাজির হল, দুর্গার কিন্তু সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। অন্যদিন খাতির করতে এগিয়ে আসে, একটু ব্যস্ত হয়, আজ দাওয়ায় কাঠ হয়ে বসে রইল— এই মাত্র।

নরেশ আর টেঁপির ব্যাপারটা জানা গেল কৃষ্ণেন্দুর কাছে।

সুরেশকে সম্বোধন করে সে বলল, 'ভাইটিকে তো তোমার মারলাম আচ্ছা করে সুরেশ, ভাবলাম, মেরেছি বেশ করেছি, তোমায় একবার বলে যাওয়া উচিত।'

ব্যাপারটা বিশ্রী, তবে এতক্ষণ সকলে যা অনুমান করছিল সেরকম কিছু নয়। সোনামাসীর জমানো টাকা আর সোনামাসীর' মেয়েকে নিয়ে নরেশ পালিয়ে যাবার আয়োজন করেছিল। শুধু টেঁপিকে নিয়ে পালিয়ে যাবার মতলব থাকলে হয়তো বাধা পড়ত না, টেঁপি চুপি চুপি বেরিয়ে আসত আর দু'জন চলে যেত যেদিকে দু'চোখ যায়। কিন্তু টাকা তো চাই! সন্ধ্যা থেকে সোনামাসী ঘর আগলে বসে থাকে, আদায়ে বার হয় শুধু দিনের বেলা। বাড়ীতে লোক থাকে অনেক। দুপুর বেলা শুধু যে যার ঘরে ঘুমোয়। তাই আজ দুপুরে সোনামাসী তাগিদে বেরিয়ে যাওয়াব পর নরেশ গিয়ে সোনামাসীর টিনের তোরঙ্গ ভেঙ্গেছে, চৌকির নীচে গর্ত খুঁড়েছে, টেঁপির কাছে জেনে নিয়ে আরও যেখানে যেখানে টাকা লুকানো ছিল, সব খুঁজে বার করেছে। জগুর বৌ কি করতে তার ঘরের বাইরে এসেছিল, সে ঘরে ফিরে গেলেই দু'জনে বেরিয়ে যাবে বলে অপেক্ষা করছে, হঠাৎ সোনামাসী এসে হাজির। বিকেল পর্যন্ত ঘরে খিল দিয়ে সোনামাসী নরেশকে আটকে রেখেছে, একটু একটু করে জেনে নিয়েছে সব কথা, তারপর ঘরে তালা দিয়ে দু'জনে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণেন্দুর কাছে গিয়েছে নালিশ করতে। পথে নরেশ একবার পালাবার উপক্রম করেছিল, সোনামাসী তাকে শাসিয়েছে, পালাস যদি তো পুলিশ ডাকব। কৃষ্ণেন্দুর বাড়ী গিয়ে দু'জনকে আগলে ঠায় বসে থেকেছে তার বাড়ী ফিরবার অপেক্ষায়।

'ছোঁড়াকে মারতাম না সুরেশ। চোর তো নয়, জবরদস্তিও করেনি মেয়েটার ওপর। ভাবলাম দু'জনের মধ্যে যখন এই ব্যাপার দাঁড়িয়েছে দু'জনের বিয়ে দিলে মন্দ হবে না। সোনামাসীও রাজী হল। আমি সেই কথা বুঝিয়ে বলতে গেলাম ওকে যে এসব কুবুদ্ধি করে হাঙ্গামা বাধাস নে, এই মাসে তোদের বিয়ে দোব। তা উনি কি জবাব দিলেন শুনবে? যে মেয়ে বেরিয়ে যায় তাকে উনি বিয়ে করবেন না, ও নষ্ট মেয়ে।'

সকলে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। খানিক পরে উঠানের এক প্রান্ত থেকে প্রশ্ন আসে, 'এটা কি আপনার উচিত হল গো কেষ্টবাবু?'

কানাই-এর বৌ লক্ষ্মী কখন ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ার ধাপে বসেছে কেউ লক্ষ্য করেনি। লক্ষ্মী কখনো গানের আসরে আসে না, গল্প করতেও নয়। হয় ঘরে কাজ করে, নয় তফাতে ওই ধাপে চুপ করে বসে থাকে।

'কেন রোগা বৌ?'

'সব যে জানাজানি করে দিলেন, কলঙ্ক রটল না মেয়েটার?'

কৃষ্ণেন্দু হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না। এক মুহূর্তের জন্য তাকে বড়ই বিপন্ন মনে হল। তারপর গলা সাফ করে কৃষ্ণেন্দু বলল, 'কলঙ্ক রটাই ভাল রোগা বৌ।'

'ওমা, ইকি কথা বলেন কেষ্টবাবু?'

'মেয়েটা কম পাজী নয় রোগা বৌ। পীরিত করেছে, পালিয়ে যেত, সে ভিন্ন কথা। মাব টাকাগুলি বাগিয়ে পালাচ্ছিল কি বলে, এত আদর-যত্নে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছে না? নরেশকে আমি মারলাম, মেয়েটারও তো সাজা হওয়া উচিত।'

'সাজা হল সোনামাসীর।'

'তাও হওয়া উচিত। মেয়েকে অমন আহ্লাদী করল কেন? তাছাড়া কি জান রোগা বৌ সোনামাসীর শয়তানী বুদ্ধি কম নয়। বিয়ে হলে পণের টাকা পাবে বেশী, মেয়েটা থাকবে কাছাকাছি, তাই না মেয়েটাকে লেলিয়ে দিয়েছিল।'

লক্ষ্মী আর কিছু বলল না। তার মুখে শুধু ফুটে উঠল অবজ্ঞার হাসি, অল্প আলোয় যা কারো চোখে পড়ল না।

যাওয়ার আগে কৃষ্ণেন্দু রম্ভাকে জিজ্ঞেস করে, 'শরীর ভাল নেই?'

রম্ভা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

'ও! মন ভাল নেই তবে। কষ্ট হচ্ছে বাপের বাড়ীর জন্যে?'

রম্ভার চোখ দিয়ে হঠাৎ জল গড়িয়ে পড়ে দু'ফোঁটা। লক্ষ্য করে কৃষ্ণেন্দু নড়েচড়ে বসে। ভাল করে তাকায় রম্ভার দিকে। খানিক ভেবে বলে, 'চলো তোমার ঘরে যাই।'

উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে শুনিয়ে বলে, 'আমরা ভাইবোন দুটো ঘরোয়া কথা বলব। কেউ যেন এসো না।'

খোলা দরজার কাছেই কৃষ্ণেন্দু বসে। সবাই যাতে তাকে দেখতে পায়। এটা সাধারণ দরকারী সতর্কতা। মেয়ে-পুরুষের সম্পর্ক এখানকার জগতে বড় ঠুনকো। যতই তাকে শ্রদ্ধা করুক সবাই, অন্তরালে যুবতী মেয়ের সঙ্গে মাখামাখি করলে অন্ততঃ দু'চারটা মনে খটকা লাগবেই। কিছু বলবে না কেউ, বাতিলও করবে না তাকে। ধর্মের বিকারে সংস্কার জন্মেছে একটা। গুরু মোহন্ত সাধু মহাপুরুষ খেলাচ্ছলে মেয়ে বৌকে সম্ভোগ করলে সেটা তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেওয়া যায়। গোপাল ভাঁড়ের সে গল্প তো আকাশ থেকে মাগনা নামেনি যে গুরু এসে গেরস্ত বাড়ীর বৌয়ের কানে মন্ত্র দেয়—তুমি রাধা আমি শ্যাম। বিশেষ ভক্তিভাজনদের সম্পর্কে যৌন ঈর্ষা নির্জীব। তবু মিছামিছি দু'চারটা মনেও খটকা বাধিয়ে লাভ কি?

'কি হয়েছে রম্ভা?' জানবার জোরালো সস্নেহ দাবীর সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু বলে, 'খুলে বল। স্পষ্ট করে বল। তুমি দশটা মেয়েব মত নও। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দশবার দশরকম ভাবে জিজ্ঞেস করতে হলে মনে দুঃখ পাব। ভাবব, তোমায় যা ভেবেছিলাম, তুমি তা নও। বলো কি হয়েছে।'

'কার সঙ্গে বিয়ে দিলেন আমায়?'

'সে কি?'

'আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। আমারি ভুল হয়েছিল।'

'দোষ দাও বা না দাও তোমার খুশী। ভুলটা কিসের?'

এই সেদিন কোমরে আঁচল জড়িয়ে পিছনে ঘাড় বাঁকিয়ে রম্ভা গায়ে পড়ে কলহ করেছিল তার সঙ্গে, আজ সে মাথা নীচু করে আঁচলের প্রান্ত জড়ায় আঙ্গুলে। কত শঙ্কার কাঁটা যে ফোটে, কৃষ্ণেন্দুর বুকে।

রম্ভা ধীরে ধীরে বলে, 'খালি গাইয়ে বাজিয়ে আল্‌সে লোক তা জানতাম না। দেশের কাজে এতটুকু ঝোঁক নেই। আপনি যেমন খাঁটি লোক খোঁজেন, ও তেমনি বলে ঝগড়া করেছিলাম না আপনার সঙ্গে? ও ঠিক তার উল্টো। দশজনকে দিয়ে কিছু করাবে দূরে থাক, নিজে কখনো কিছু করবে না। আপনি সভা করলেন সেদিন খালপারে, কত বললাম নিয়ে যেতে। বললে পিত্যয় যাবেন? হেসে উড়িয়ে দিলে, ও সভাটভা নাকি সব বাজে হাঙ্গামার ব্যাপার। সিদ্ধি খেয়ে হৈ চৈ করলে দুগ্‌গাদির সোয়ামীর সাথে।'

আরও নানা কথা বলে রম্ভা, বক্তব্য তার ক্রমে স্পষ্ট হয়, কৃষ্ণেন্দু যতটা আশা করেছিল তার চেয়েও অনেক বেশী। কৃষ্ণেন্দু বিস্ময়ের সঙ্গে শোনে। শুধু আদর্শ নয়, এতখানি জোরালো স্বভাবগত আদর্শনিষ্ঠা সে যেন রম্ভার মধ্যে প্রত্যাশা করেনি, তাকে আর দশটি মেয়ের মত মনে না করা সত্ত্বেও।

কে যেন কাঁদছে পাশের বাড়ীতে, রোগে ভুগে কে বুঝি মরেছে তার জন্য। খাঁকারি দিয়ে গলা শানিয়ে কে গালাগালি দিচ্ছে। খানিক তফাতে বিশৃঙ্খল কোলাহল। আশে পাশে উচ্চকণ্ঠ, শিশুর কান্না। বেসুরো বাঁশের বাঁশী আর হারমোনিয়মের আওয়াজ ছাপানো ঘুঙুরের আওয়াজ। বুড়ো সাতকড়ি কাশছে ওপাশের বাড়ীতে।

'তুমি ভুল করছ রম্ভা। ছি। স্বপ্ন দেখা বন্ধ কর।' ইচ্ছে করে কৃষ্ণেন্দু গলার আওয়াজ অতিরিক্ত কড়া করে। রম্ভা মুখ তুলে চোখ মেলে সোজা তাকায়।

'রামপাল খাঁটি চিজ। সব মাল মশলা আছে ওর মধ্যে। শুধু ঠিকমত গড়েপিটে ওঠেনি। সবাই তো সুযোগ পায় না। ওকে তুমি হাল্কা ভাবছ, মোটেই তা নয়। মনের মোড়টা ওর ঘুরিয়ে দেওয়া দরকার। ওকে যদি তৈরী করে নেওয়া যায় রম্ভা—', কৃষ্ণেন্দুকে উত্তেজিত, উদ্দীপ্ত মনে হয়, '—জাগিয়ে দেওয়া যায় ওকে, ওর তুলনা থাকবে না। তাই তো ভাবছিলাম আমি, তোমার সঙ্গে বিয়ে হল, তুমি ওর চেতনা এনে দেবে। একটা দুটো তিনটে বছরবাদে ওর মধ্যে আমি একজন আদর্শ কর্মী পাব। তুমি এর মধ্যে হাল ছেড়ে হতাশ হয়ে বসে আছ?'

কৃষ্ণেন্দু চলে যায়, রামপাল লাউ-চিংড়ি দিয়ে ভাত খায়, নিজে খেয়ে দুর্গাকে রান্নাঘর ধুয়ে মুছে রাখতে সাহায্য করে রম্ভা ঘরে যায়, পান সেজে নিজে খেয়ে রামপালের মুখে একটা গুঁজে দিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, 'কি সুন্দর তুমি গাইতে পার।'

তাই বটে, তাই বটে। রম্ভার দেহ মন সায় দেয়, তাই বটে, তাই বটে। এ খাঁটি মানুষ। সে যে অনেক বড় বড় কাজের কথা ভাবে, এই মানুষটাকে কাজের মানুষে পরিণত করানোর চেয়ে বড় কাজ আর কি থাকতে পারে?

মাঝখানে কিছুদিনের ব্যবধানের পর রামপালের আলিঙ্গনে আবার তার রোমাঞ্চ হয়। রম্ভা তাকে অনেক দিন পরে আগের মত জোরে বুকে চেপে ধরেছে অনুভব করে রামপালের

সুস্থ সবল দেহ উল্লসিত হয়ে ওঠে।

'ও রম্ভা, ও বৌ। ঝুমুরিয়া নিয়ে যাব তোকে। দু'চার দিনের মধ্যে নিয়ে যাব।'

'কেন গো মশায়, কেন?'

'ঘুরে আসবি। মন খুশী করে আসবি। তোকে আমি খুশী করতে চাই বৌ।'

রম্ভা বলে, 'শোন। ঝুমুরিয়া যাব'খন এমাসে। কাল যাও দিকিন একবার কেষ্টবাবুর কাছে; বলবে রম্ভা ডেকেছে আরেক দিন।'

এদিকে হীরেন বলে, 'না মমতা, তা হয় না। তোমার বন্ধুদের এনে আড্ডা দাও, পার্টি দাও, এখানে যাও, ওখানে যাও, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা ভদ্র অভদ্র কুলি মজুর তোমার কাছে যাতায়াত করবে, এ বাড়িতে তা কি চলে?'

'ওরাই তো আমার বন্ধু।'

'ওদের নিয়ে অন্য কোথাও মিটিং কর, ওদের বস্তিতে যাও, কোথাও একটা অফিস মর্ত করে সেখানে দু'এক ঘণ্টা ওদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা কর, এসবে আমি তো আপত্তি করছি না। কিন্তু যতই হোক তুমি এ বাড়ীর বৌ। এ বাড়ীতে কি তোমার হৈ চৈ করা চলে?'

ঐশ্বর্যের নিশীথ গুঞ্জন, নীরেনের বাঁশী, সোমনাথের সাধন সঙ্গীত, রঙ্গীন ঘর, দামী আসবাব, বিস্ফুরিত আলো। মমতার পরনে শুধু সাদা মিলের শাড়ী, কানে শুধু ছোট দুটি দুল। মমতার চোখে বিদ্যুৎ খেলে যায়। সে ঠোঁট কামড়ে থাকে। দু'জনের স্তব্ধতা গমগম করতে থাকে ঘরের মধ্যে।

'তবে চলো আমরা অন্য বাড়ীতে যাই।' মমতা বলে।

'অন্য বাড়ীতে?'

'এ বাড়ীটা পচা, সেকেলে। চলো ভিন্ন একটা বাড়ীতে আমরা নিজের মনে স্বাধীনভাবে থাকবো।' হীরনের গলা জড়িয়ে মমতা আলগোছে তার কপালে চুমু খায়, 'আমাকে গড়ে তুলতে হবে তো তোমায়? অনেক বড়লোকী চাল ভোলাতে হবে তোমায়। তোমায় আমি বিপ্লবী করে ছাড়ব।' হীরেনের গালে গাল ঠেকিয়ে রেখে সে যোগ দেয়, 'দ্যাখো, বলেছিলাম পাঁচ বছর বন্ধ রাখবো—তোমার কথায় রাজী হলাম তো একটা ছেলে হওয়া পর্যন্ত, যখনি হোক? তুমিও আমার কথা রাখো। ভিন্ন একটা বাড়ী নাও। এখানে আমার দম আটকে আসছে। কত কি করব ভেবে রেখেছি, এখানে থাকলে কিছুই হবে না। এমন করে সবাই এখানে তাকায় আমার দিকে।'

মমতার নিবিড় স্পর্শে কোটি বসন্তের উম্মাদনা ঘনিয়ে আসে, সব তুচ্ছ হয়ে যায় জগতে। কত দীর্ঘ সাধনার পর, কত বিষণ্ন দিন ও বিনিদ্র রজনী যাপনের পর মমতাকে সে লাভ করেছে! তা ছাড়া, বড় অশান্তিও সৃষ্টি হয়েছে বাড়ীতে নতুন বৌয়ের চালচলন নিয়ে।

অন্তঃপুরের অলস-বিলাসী মেয়েলি জীবনের মৃদু শান্ত ছন্দ সে মেনে নেবে কেউ তা আশা করেনি, কলেজে পড়া একেলে চপল মেয়ে হিসেবেই তাকে মেনে নিতে সকলে প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু একি মেয়ে রে বাবা! বাড়ীর কারো সঙ্গে দুদণ্ড কথা কইবার তার সময় হয় না, অথচ বাইবের আজে বাজে লোকের সঙ্গে তার আলাপ-আলোচনার অন্ত নেই, যত ভবঘুরে বয়াটে ছোঁড়া আর কুলি মজুরের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা। যখন ইচ্ছা বেরিয়ে যাচ্ছে, একা কিম্বা যার তার সঙ্গে, যখন ইচ্ছা ফিরে আসছে, রাত যে কত হয়েছে গ্রাহ্যও নেই। আব

দিই বা দুটো কথা বলে কারো সঙ্গে, কি সে কথা বলার ঢং! যেন কোথাকার মহারাণী এসেছেন চাষাভূষোর ঘরে দয়া করে বেড়াতে।

লোকনাথের মুখ অন্ধকার, আত্মীয় কুটুম্বের মুখ বাঁকা, ছোটদের মুখ বিষণ্ণ, দাসদাসীর মুখ শয়তানি কৌতুকে উজ্জ্বল। চারিদিকে অবিরাম গুজগুজানি ফিসফিসানি ও ক্রুদ্ধ তীব্র মন্তব্য—হীরেন জানে সমস্তই মমতার সমালোচনা।

সে তাই একটা বাড়ীভাড়া নেয় পার্ক স্ট্রীটে। লোকনাথ তার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেন।

কোনো মধ্যবিত্ত পাড়ায় অল্প টাকায় সাধারণ একটি ছোটখাট বাড়ী বা বাড়ীর অংশ ভাড়া নেবার ইচ্ছা ছিল মমতার। কিন্তু এ আব্দার শুনে এমন করে তাকিয়েছিল হীরেন, যেন বলতে চাইছে, তোমার জন্যে আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে ভিন্ন হলাম, তাতেও তুমি সন্তুষ্ট নও? ছোট বাড়ীতে গরীবের মতো থাকবার সাধটা মমতা তাই চেপে যায়।

সব বিষয়ে মমতার বাড়াবাড়ির জন্য একটু যা জর্জরিত থাকে হীরেন, নতুবা সে পরম সুখেই দিন কাটায় নতুন বাড়ীতে।

মমতার কাছ থেকে অযাচিতভাবে একটু স্নেহভরা সেবা-যত্ন পাবার জন্য তার মনের গহনে সে লালায়িত হয়ে থাকে,—যে সেবা-যত্নের স্বাদ পেয়েছিল মায়ের কাছে, তার বাড়ির মেয়েরা যা আজো স্বামী পুত্রকে দিচ্ছে, দিগম্বরী যার নমুনা দেখিয়েছে চমকপ্রদ। কান গরম হয়ে ওঠে হীরেনের। স্ত্রীকে দাসীভাবে পেতে সাধ যায়, একি অসভ্য অসংস্কৃত মন তার, ওরকম দশ-বিশটা মেয়েকে সে তো বিয়ে করতে পারত, মমতাকে বিয়ে করার তবে তাব কি দরকার ছিল? এত ভালবাসে মমতা তাকে, তাতেও তার মন ওঠে না? মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তি অতিক্রম করে আসার অহঙ্কারকে তুষ্ট করতে হীরেন সব বিষয়ে মমতাকে স্বাধীনতা দেয়, তার কোনো কাজের সমালোচনা করে না। স্ত্রী তার সাথী, তার বন্ধু।

মমতার সঙ্গে একা থাকার সময় ছাড়া নিজেকে তার সাথীহীন বন্ধুহীন একাকী মনে হয়, পরিত্যক্ত মনে হয়। মমতা ও তার মেয়ে-পুরুষ বন্ধুদের মধ্যেই যেন তার এই নিঃসঙ্গতার অনুভূতি চরমে উঠে যায়। নিজেকে মনে হয় অন্য এক জগতের মানুষ। অথচ দূরে সরে থাকবার উপায় তার নেই। মমতা চায় সে তার পরিচিত সকলের সঙ্গে মেলামেশা করুক, নবযুগের এত যে নতুন চিন্তাধারা সে সঞ্চয় করেছে বই থেকে, বাস্তব উপলব্ধিতে সার্থক হোক সে-সব।

মমতা বলে, 'তোমার মুখ ভার কেন?'

হীরেন বলে, 'কই না? শরীরটা ভাল নেই।'

মমতার মুখের ভাব পরিবর্তন এক মুহূর্তে হীরেনকে কৃতজ্ঞ, কৃতার্থ, উল্লসিত করে দেয়। এবং হৃদয় মন হঠাৎ জুড়িয়ে যাওয়ায় সে ভাল করে টের পায় হৃদয় মন তার কেমন জ্বালায় জ্বলছিল।

'শরীর খারাপ? কি হয়েছে? আমায় বলোনি কেন আগে?' মমতা ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করে। বলে, 'তোমার আজ বেরিয়ে কাজ নেই, আমি কোথাও যাব না।'

সব এনগেজমেন্ট বাতিল করে, যে আসুক তাকেই সে বাড়ী নেই বলে দেবার জন্য দারোয়ানকে হুকুম দিয়ে, মমতা নিজে সঙ্গে থেকে হীরেনকে বিশ্রাম করায়।

মমতার রূপ ও আকর্ষণ হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে মনে হয় হীরেনের। প্রেমের নদীতে জোয়ার এসেছে ভাঁটার পর কলোচ্ছ্বাসে। সস্তা ছিটের ব্লাউজ ঢাকা ও—দুটি স্তনের দাম কি কোটি

টাকা? এ মক্ষি কোমর কোথায় পেল সে? মোটা মিলের রঙিন শাড়িতে সে কি ইচ্ছে করে ঢেকে রাখে নিজের কোমর থেকে পা তক্, কামনায় যাতে পুড়ে না যায় তার প্রিয়তম-
গলায় কলসী বাইন্ধ্যা গংগায় ডুইব্যা গ্যাছে।

দীর্ঘনিশ্বাসে যেন হৃৎপিণ্ডটা বেরিয়ে আসে হীরেনের। শরীর ভাল নেই, তার শরীর ভাল নেই! ভাল না থাকা শরীরটা এখন যদি চায় মমতার শরীরটাকে, কি ভালগার না জানি তাকে ভাববে মমতা!

এর চেয়ে মরণ ভাল নয় কি? অথবা লাথি মেরে চুরমার করে ফেলা এই নিষ্ঠুর রূপসীকে?

সাদা আলো নিভিয়ে নীল আলো জ্বালিয়ে মোটা মিলের রঙীন শাড়ি আর ছিটের ব্লাউজ খুলে সিল্কের সূক্ষ্ম রাত্রিবাস গায়ে চাপিয়ে বিছানায় এসে অভিমানের ভানে মমতা বলে, 'নিজেকে কেন এত চেপে রাখ বল তো? চোখ দেখে টের পাই-না আমি? বড্ড ছেলেমানুষ তুমি! হ্যাভলক এলিসের ক'খানা বই তোমার জন্য কিনে আনব।'

'শরীরটা ভাল নেই।'

'ও!'

শরৎ শেষের স্নিগ্ধতা তপ্ত সহরের নিশ্বাস শুষছে। কুয়াসায় সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে ধোঁয়াতে, তার বেশির ভাগ খাঁটি ধোঁয়া, কয়লা খনির কয়লার ধোঁয়া, যেখানে মেয়ে মজুর পুরুষের সঙ্গে কয়লা কাটতে কাটতে কয়লা-কালো ছেলে বিইয়ে ফেলে। আরিফ এলো একদিন সন্ধ্যার সময় মমতার বাড়িতে, সঙ্গে তার পুলিশের লোক।

সিঁড়ির নীচের হলে দাঁড়ালো তার মুখোমুখি।

মমতা বলল, 'আরিফ! কি হয়েছে আরিফ?'

আরিফ বলল, 'যাচ্ছি মমতা।'

'যাচ্ছ? যাচ্ছ মানে?'

'জেলে যাচ্ছি।'

'কেন?'

'দেশের লোককে জাগতে বলে পরপর কটা লেকচার দিয়েছি বলে বোধ হয়। ঠিক জানিনে। বিচার-টিচার হবে না। উনি খুব ভদ্রলোক—ওই যে উনি, যিনি আমায় নিতে এসেছেন। তোমার সঙ্গে একবার দেখা করব বলামাত্র রাজী হলেন। দাখো, হাতকড়া পর্যন্ত পরাননি। অতদূরে দাঁড়িয়ে আমার ওপর শুধু চোখের নজর রেখেছেন। আমি ভেতরে ঢুকে খিড়কি দিয়ে পালিয়ে গেলে বেচারী কি বিপদেই পড়বেন। কিন্তু উনি নাকি আমাদের বিশ্বাস করেন। নিজেই বললেন, আমরা যদি কথা দি, মরে গেলেও নাকি সে কথা রাখি। রীতিমত যেন শ্রদ্ধা করেন আমাদের!—কেমন আছো?'

'আরিফ!'

দুহাতে আরিফকে জড়িয়ে ধরে তার মুখে চুমু খেয়ে মমতা বলে, 'আরিফ! আমায় শক্ত করে জড়িয়ে ধরো! আমায় চুমু খাও।'

মমতা জানত, হীরেন বাড়ী আছে। হীরেন যে তার পিছু পিছু নেমে আসবে, তাও সে জানত। কিন্তু আদর্শবাদী মেয়ে বলে জানত না, কিসে কি হয়।

সিঁড়ির মাথায় হীরেন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, নামবার জন্য উঁচু করা পাটিকে উঁচু করে

রেখেই। তাকিয়ে দ্যাখে মমতার আলিঙ্গন ও চুম্বন, আরিফের নাম ধরে তাঁর আবেগভরা ব্যাকুল ডাক শোনে। হঠাৎ কি করে বসবে এই ভয়ে দিশেহারা হয়ে তারপর সে ঘরে চলে যায়। ইজি-চেয়ারে তাকে চিৎ হয়ে পড়তে হয়। বুঝতে পারে, তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। বিরাট একটা এলোপাথাড়ি আন্দোলন তাকে গ্রাস করেছে সম্পূর্ণরূপে, তার রক্তমাংসে অস্থিমজ্জায় প্রমত্ত অস্থিরতা অথচ কি যেন একটা স্তব্ধ হয়ে গেছে ভেতরে, মরে গেছে। উঠে গিয়ে একেবারে গোটা চারেক অ্যাসপিরিন গিলে হীরেন আবার ইজিচেয়ারে গা ঢেলে দেয়। বন্যতা, গুণ্ডামি চলবে না। সে সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। অ্যাসপিরিন খেয়ে হোক, শিরা কেটে রক্ত বার করে হোক, ভদ্র তাকে থাকতেই হবে।

চোখের জলে ঝাপ্সা চোখ নিয়ে মমতা ঘরে আসে, ধপ করে বসে পড়ে একটা চেয়ারে।

'আরিফ এসেছিল।'

'জানি।'

'একবার গেলে না নীচে? ওকে অ্যারেস্ট করেছে!'

'অ্যারেস্ট করেছে? ও!' সন্ধ্যার সময় প্রকাশ্য হল-ঘরে নির্ভয় নিশ্চিন্তভাবে মমতার ওরকম আচরণের মানেটা হীরেন বুঝতে পারছিল না। এতবড় বাড়ী, এতগুলি নির্জন ঘর, আরিফকে কোন ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেই হত। এবার সে বুঝতে পারে, আত্মহারা হয়ে মমতা সতর্কতা ভুলে গিয়েছিল। এখানকার প্রায় অসহনীয় মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যেও এক সিনিক ফাজিল বন্ধুর বিশেষ প্রিয় একটি তামাশার কথা হীরেনের মনে পড়ে যায়—সিফিলিস আর প্রেম গোপন থাকে না। একদিন হাসি পেত কথাটা শুনে। আজ শব্দগুলি যেন ভারি ধারালো শাবল হয়ে মনের মধ্যে দাপাদাপি করে বেড়ায়, খুঁড়ে ফেলতে থাকে তার মন।

'এমন খারাপ হয়ে গেছে মনটা। কান্না পাচ্ছে সত্যি।'

হীরেন কথা বলে না। এবার সচেতন হয়ে ভাল করে তার দিকে তাকিয়ে মমতা জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছে তোমার?'

'মাথা ধরেছে।'

'অ্যাসপিরিন খাবে?'

'খেয়েছি।'

মমতা ব্যথিত চোখে খানিকক্ষণ তাকে লক্ষ্য করে। মৃদুস্বরে বলে, 'আরিফকে তুমি পছন্দ কর না।'

'সেটা কি আমার অপরাধ? তোমার সঙ্গে ওর ছেলেবেলা থেকে ভাব, ভালবাসা। আমার সঙ্গে দুদিনের পরিচয়।'

'আমার সঙ্গেও তো তাই, আমায় পছন্দ হল কি করে তোমার?'

'তোমার কথা ভিন্ন।'

কথা বলতে তার কষ্ট হচ্ছিল। মমতা উঠে এসে আলগোছে ইজিচেয়ারের হাতায় বসে হীরেনের একটি হাত দু'হাতের মধ্যে নিয়ে বলে, 'তা নয়। আরিফকে পছন্দ কর না কেন বলব? ওর সম্বন্ধে তোমার ভীষণ জেলাসি ছিল।'

কথায় ব্যবহারে কি করে এত সহজ, এত অন্তরঙ্গভাব বজায় রেখে চলেছে মমতা? আরিফের বুক থেকে খসে তার কাছে এসে আপন হওয়া কি এতই পুরানো আর অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে মমতার? কিন্তু তাই বা কি করে হয়? এতকাল প্রতিদিন গ্রেপ্তার হয়ে হাজতে যাবার পথে আরিফ তো তার সঙ্গে দেখা করে যেতে আসেনি। নিজে আরিফের বেদনায়

কাবু হয়ে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য স্বামীকে পরিহার করে তার কাছ থেকে দূরে থাকাই তো স্বাভাবিক ছিল মমতার পক্ষে, আরিফের জন্য বুকভরা দুঃখ নিয়ে তার কাছে এসে প্রতিদিনের মত তার আপন সে হচ্ছে কি করে? হীরেন অনুভব করে, মমতা তার সহানুভূতি চায়। আরিফের জন্য মনে সে ব্যথা পেয়েছে, তাই স্বামীর কাছে সমবেদনা আশা করছে, সান্ত্বনা খুঁজছে! মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে হীরেনের। একেবারে চারটে অ্যাসপিরিন খাওয়ার জন্য কিনা কে জানে।

হাত ছাড়িয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'একটু ঘুরে আসি।' জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে আবার বলে, 'ঘুরে আসি একটু।'

'আমিও যাব চলো। বড় বিশ্রী লাগছে।'

'না, না। একটা দরকার আছে আমার।'

প্রায় আর্তনাদের মত শোনায় হীরেনের কথা। প্রায় সে ছিটকে পালিয়ে যায় ঘর থেকে।

শুধু ঘর থেকে নয়, মমতার নাগালের সীমা থেকেও যেন চিরদিনের জন্য। মমতাকে ঘিরে উপগ্রহের মত পাক খাওয়াই ছিল যেন তার জীবনের গতি, মাধ্যাকর্ষণের মত অদৃশ্য বাঁধনটা ছিঁড়ে যাওয়ায় ছিটকে সরে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে। কোথায় সে থাকে কি সে করে মমতা জানতে পারে না। কথা সে কয় ভাসা ভাসা, অল্প দু'চারটে কথা। কাজ করার ছুতোয় কাজের ঘরে ঢোকে বাড়ী ফিরে, রাত বারটা একটায় খোঁজ নিতে গিয়ে মমতা দ্যাখে সেই ঘরেই বাড়তি বিছানাটিতে সে ঘুমিয়ে আছে। মাথা ঘুরে যায় মমতার। তার সঙ্গ পাবার জন্য কাজ যার চুলোয় গিয়েছিল, গভীর রাত্রে ঘুম পেলে যে তার কাছে ছেলেমানুষের মত নালিশ জানাত মানুষের ঘুম পাওয়ার বিরুদ্ধে, তাকে ছাড়াই তার দিবারাত্র কাটছে, ঘুম আসছে মমতাহীন শূন্য বিছানায়!

মমতা জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছে তোমার? আমায় বলো। বলতে হবে আমাকে।'

'কি হবে? কিছু হয়নি।'

'কিছু হয়নি? একি অন্যায় কথা। তুমি ভাব আমার ধৈর্যের সীমা নেই?' মমতার স্বর কড়া, ঝাঁঝালো।

'আমি তো কিছু করিনি তোমার? আমি নিজের মনে আছি।'

'হঠাৎ কেন তুমি নিজের মনে থাকবে? কারণ আছে নিশ্চয়। আমার জানবার অধিকার আছে কারণ কি!'

ধৈর্যের একটা সীমা আছে! কারণ জানবার অধিকার আছে! দিগম্বরীর কথা ভাবে হীরেন, শশাঙ্কের মত স্বামীকেও যে দেবতার মত পূজা করে। তার বাড়ীর বৌদের কথা ভাবে হীরেন, যাদের স্বামী-অন্ত প্রাণ। অঙ্গ স্পর্শ করতে দেওয়া দূরে থাক, প্রেমালু চোখে পরপুরুষ তাকালে পর্যন্ত যারা ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। মমতার ম্লান বিবর্ণ মুখ আর সকাতর চোখে কঠিন আত্মনিষ্ঠার, অনমনীয় আত্মমর্যাদার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখে জ্বালাভরা উদ্ধত বেদনার সঙ্গে হীরেনের মনে হয়, সে যদি ওদের মত হত!

শেষে একদিন রাত এগারটার সময় হীরেন মদ খেয়ে বাড়ী ফিরে আসে। কাজের ঘরে গিয়ে শূন্য বিছানায় শোয়ার বদলে শোয়ার ঘরে যায়। মমতা বলে, 'তুমি ড্রিঙ্ক করেছ!'

'করেছি।'

'কেন?'

'তোমার জন্য।'

'তার মানে?'

'মানেই তো বলতে এলাম। স্ত্রী যদি হতে না পারবে, আমার স্ত্রী হয়েছিলে কেন? আমি কে তোমার ক্রীতদাস?'

'হেঁয়ালি কোরো না। আজ ঘুমোও, যা বলবার কাল বোলো। এসো। শোবে এসো। ও আলোটা জ্বেলেছ কেন? নিভিয়ে দিয়ে এসো। আমি তোমায় ঘুম-পাড়িয়ে দিচ্ছি।'

মমতার খোলা কাঁধ, আধ ঢাকা বুক, কোমরেব বাঁকা ভাঁজ দেখে হীরেন চোখ বোজে। ভাবে, এত মদ খেয়েও একটু বেপরোয়া হবার সাহস তার হল না মমতার কাছে। নেশা তিতো হয়ে যায়, জীবন বিষাক্ত।

'এখানে থাকতে আমার ভাল লাগছে না মমু। কাল আমরা ওবাড়ীতে চলে যাব। বাবাকে দুঃখ দিয়ে, সবার মনে কষ্ট দিয়ে—'

মমতা চুপ করে থাকে।

'এসব তোমায় ছাড়তে হবে মমু।'

'কোন সব?'

'এই যার তার সঙ্গে মেশা, যেখানে সেখানে যাওয়া। মমু, আমার চেয়ে এসব কি তোমার কাছে বড়, আমি তোমায় এত ভালবাসি?'

মমতা চুপ করে থাকে বিছানায়, মাতাল হীরেন চুপ করে থাকে চেয়ারে। হীরেন ভাবে, মমতা তাকে শুতে ডাকবে। মমতা ভাবে, হীরেন এসে তাকে বলবে, নেশার খেয়ালে কি বলেছি, আমায় মাপ কর।

পরদিন নেশা কেটে গেলে হীরেন কথা ফিরিয়ে নেবে, এ আশাও মমতার পূর্ণ হয় না। নেশার ঝোঁকে হঠাৎ খেয়াল করা কথা তো সে বলেনি যে নেশার সঙ্গে কথাগুলিও উড়ে যাবে অর্থহীন বিকার গুঁড়োনো ধুলোর মত। কদিন ধরে মনের মধ্যে যে চিন্তা পাক খাচ্ছিল কিন্তু প্রকাশ করতে পারছিল না হীরেন, মদের নেশা শুধু সেটা প্রকাশ করার প্রেরণা জুগিয়েছে তাকে।

মমতা তবু অবিশ্বাসের সুরে বলে, 'সত্যি সত্যি তুমি আমায় ফেলে ওবাড়ী চলে যাবে?'

'তোমায় ফেলে কেন? তুমি যাবে না?'

'সাধ করে কেউ জেলে যায়? তুমি যে বিধিনিষেধ জারি করেছ সে সব মানতে হলে আমায় পর্দানশীন হয়ে থাকতে হবে ওখানে। সেটা কি তুমি সম্ভব মনে কর আমার পক্ষে? আমি অবাক হয়ে গেছি হীরেন, বুঝতে পারছি না তুমি কি করে এমন হয়ে গেলে। মনে হয় তামাশা করছ। কিন্তু তোমার মুখ দেখলে টের পাই ভেতরে সত্যি যন্ত্রণা ভোগ করছ তুমি। তারপর কাল ড্রিঙ্ক করে এলে। কেন? এমন তো নয় যে আমায় তুমি জানতে না চিনতে না। আমি তো বদলাই নি, যেমন ছিলাম তেমন আছি। আমি কি ভাবি, কি করি, কি চাই সব জেনে শুনেই আমায় বিয়ে করেছিলে। আজ তোমার মতিগতি বদলে গেল কেন হঠাৎ?' মমতার ঠোঁটের দুটি প্রান্ত কাঁপতে থাকে। সে-ই না ভেবেছিল হীরেনের মতিগতি বদলে দেবে—অন্যদিকে? তার যেটুকু রক্ষণশীলতা আছে ধীরে ধীরে ভেঙ্গে ফেলবে, বৈপ্লবিক অভিসন্ধি সঞ্চার কববে তার চিন্তার উৎসে, কত কাজ করিয়ে নেবে তাকে দিয়ে-—তার সঙ্গে মিলে, দু'জনে একসঙ্গে। আরম্ভ হতে না হতে কি সব শেষ হয়ে যেতে বসেছে?

নিজেকে অপরাধী মনে হতে থাকায় হীরেনের রাগ হয়। মমতাকে সে পাগলের মত

ভালবেসেছিল, কথায় ব্যবহারে ইঙ্গিতে সঙ্কেতে একনিষ্ঠ আনুগত্য ঘোষণা করেছিল অসংখ্যবার, সম্মতি না পেলেও পরম অধ্যবসারের সঙ্গে সে-ই বারবার মমতাকে ভিক্ষা চেয়েছিল,—এই যুক্তি তুলে মমতা আজ তাকে কাবু করতে চায়। প্রমাণ করতে চায় সে অন্যায় করেছে, সে-ই অপরাধী।

'আমি ভেবেছিলাম', হীরেন বলে, 'বিয়ের পর এসব ঝোঁক তোমার কমে যাবে।'

'তাই নাকি?' ঝাঁঝালো ব্যঙ্গের সুরে মমতা বলে, 'তুমি ভেবেছিলে আর পাঁচটি ফ্যাশনে মেয়ের মত ছেলেমানুষী করছি, বিয়ে হলে সেরে যাবে? সব ছেড়ে দিয়ে শান্ত হয়ে ঘর-কন্না করব?' মমতা সজোরে মাথা নাড়ে, বলে, 'না, তুমি তা ভাবোনি হীরেন। ওরকম ভাববার কোন সুযোগ তোমাকে আমি দিইনি। তুমি বরং জানতে বিয়ে করলে আমার কাজের ক্ষতি হতে পারে ভেবেই আমি অনেকদিন তোমার প্রস্তাবে রাজী হইনি। আমার প্রকৃতিও তুমি জানতে। বাধা দেওয়ার বদলে আমার কাজে তুমি সাহায্য করবে মনে করেই শেষে আমি রাজী হই, তাও তুমি জানতে।' বলতে বলতে মমতার মুখের কাঠিন্য মিলিয়ে গিয়ে গভীর বিষাদের ছাপ ঘনিয়ে আসে, চোখ বুজে একবার ঢোক গিলে সোজা হীরেনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'এক হতে পারে, আমায় তুমি ভালবাসনি। এমন জোরালো আকর্ষণ বোধ করেছিলে যে তোমার ভুল হয়েছিল। এখন সেটা কেটে গেছে। ওরকম হয়। তাই যদি হয়ে থাকে, খুলে বল না? সব পরিষ্কার হয়ে যাক। জোড়াতালি দিয়ে লাভ কি?'

হীরেন গোঁযারের মত বলে, 'তোমায় আমি আগের চেয়েও এখন বেশী ভালবাসি। তাই না আজ আমার এই দশা। তোমার খেয়ালে বাঁদর নাচছি।'

মমতার মুখ লাল হয়ে যায়।

হীরেন আবার বলে, 'আমি ভালবাসি কিন্তু তুমি ভালবাসো না। আমি বুঝেছি, তুমি আমায় ভালবাসো না। তুমি ভালবাসো আরিফকে।'

'তুমি কি পাগল?' মমতা বলে হতভম্বের মত।

'পাগল হতেই বসেছি মমু।'

মমতা আত্মসম্বরণ করে। বিচিত্র চিন্তা ও অনুভূতির প্রবল আলোড়ন চলতে থাকলেও এতক্ষণে হীরেনের অদ্ভুত পরিবর্তনের কারণটার হদিস পেয়ে তার যেন ধাঁধা কেটে যায়। সামনে ঝুঁকে সাগ্রহে সে বলে, 'এই ভাবনা মাথায় ঢুকিয়ে কদিন তুমি এ রকম পাগলামি করছ? মুখ ফুটে বলতে পারনি আমায়? তুমি এমন সেন্টিমেন্টাল তাতো জানতাম না হীরেন! শোন বলি। আরিফ আমার ছেলেবেলার বন্ধু, সকলের চেয়ে ঘনিষ্ঠ, আপন বন্ধু, তার বেশী কিছু নয়। তুমি কি মনে কর ওকে ভালবাসলে ওর বদলে তোমায় বিয়ে করতাম?'

হীরেন উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে, 'ভুল তো হয় মানুষের। সব সময় নিজের মন—'

মমতা জোর দিয়ে বলে, 'না, আমার ভুল হয়নি। আমি নিজের মন জানি।' একটু দ্বিধা ভরে মমতা তাকায় হীরেনের দিকে, একটু ইতস্ততঃ করে। হীরেনের দৃষ্টিভঙ্গী কতখানি সংস্কারমুক্ত ও বাস্তবধর্মী সে বিষয়ে তার যথেষ্ট সন্দেহ জন্মে গেছে গত কয়েকটা দিনের অভিজ্ঞতায়। হঠাৎ মন স্থির করে সে বলে, 'খোলাখুলি সব বলছি শোন। আগে, অনেকদিন আগের কথা বলছি, দু'একবার আমারও খটকা লেগেছিল, আরিফকে ভালবাসি কি না! কিন্তু সে সন্দেহ অল্পদিনেই মিটে গেছে। দু'চারবার এমনও হয়েছে যে ওর জন্য জোরালো সেক্স্ আর্জ অনুভব করেছি। যোগাযোগ হলে হয়তো কিছু ঘটেও যেতে পারত আমাদের মধ্যে। আর এও বলছি, কিছু ঘটলে আমি আপসোস করতাম না, মনে করতাম না পাপ করেছি।'

হীরেন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে।

মমতা মৃদু হেসে বলে, 'বুঝলে তো এবার? আরিফ শুধু ঘনিষ্ঠ আপনজন, বন্ধু। ভালো আমি তোমাকেই বাসি।'

'আমাকে ভালবাসো? তবে তার প্রমাণ দাও।'

'প্রমাণ দেব?'

হীরেন হঠাৎ উঠে এসে পাগলের মত মমতাকে প্রায় চেয়ার থেকে ছিনিয়ে বুকে তুলে নেয়, এলোপাথাড়ি বিশ পঁচিশটা চুমু খায় তার মুখে মাথায় ঘাড়ে—'ও বাড়ীতে যাও বা না-যাও, এইটুকু তুমি কর আমার জন্যে। দেশের কাজ সমাজের সেবা তোমায় ছাড়তে বলি না, এভাবে না করে অন্যভাবে কর? রেবা, মালতী, মিসেস সেন, এরাও তো কাজ করছে? ওদের মত একটু শুধু সংযত কর নিজেকে। ঘরের দিকে একটু মন দাও, আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে একটু ভাব কর, সামাজিক জীবনটা একটু আমায় ভোগ করতে দাও তোমার সঙ্গে। তুমি তো জানো মমু, কখনো কোন বিষয়ে তোমার ওপর আমি জোর খাটাব না? এ জীবন আমার সইছে না। আমার মুখ চেয়ে এইটুকু তুমি কর আমার জন্যে।'

মমতা ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়।

'এইটুকু!' কঠিন বিদ্রূপের তীব্র তীক্ষ্ণ হাসি ঝলকে ওঠে তার মুখে: 'আমার সব কিছু ছেঁটে ফেলতে হবে—সে হল তুচ্ছ সামান্য এইটুকু! দশজন হালকা অপদার্থ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে, পার্টি দিয়ে, গান বাজনা গল্পগুজব পরচর্চা করে আর তোমাদের ফ্যামিলি পলিটিক্স নিয়ে মেতে থেকে জীবন কাটালে তুমি আমার ভালবাসার প্রমাণ পাবে? তুমি তো ভারি সস্তা ভালবাসা চাও! এ-রকম ভালবাসা দেবার মত মেয়ের তো অভাব ছিল না হীরেন? ও-রকম একজনকে বেছে নিলে না কেন? উথলে ওঠা ভালবাসায় তোমায় সে ভাসিয়ে দিত।'

মমতা কেঁদে ফেলে। হীরেন স্তব্ধ হয়ে থাকে।

তিন

ঝুমুরিয়ার ক্রোশ দুই তফাতে একখানি বিচ্ছিন্ন শালবন। এটি ছাড়া এ অঞ্চলে আশেপাশে শালবন একরকম নেই। পথের ধারে মাঠে প্রান্তরে এখানে ওখানে এলোমেলোভাবে ছড়ানো গাছ চোখে পড়ে, বড়জোর কোথাও উঁচু ডাঙ্গায় ছোট একটি চাপড়া, বন না বলে যাকে শালের বাগান বলা চলে। চারিদিকে বহুদূর বিস্তৃত ক্ষেত্র ও ফাঁকা মাঠের মধ্যে এই ছোট শালবনটি যেন পৃথিবীর গায়ে নয়নাভিরাম প্রাগৈতিহাসিক জন্মচিহ্নের মত।

বন কাটার কাজ চলছে কিছুদিন ধরে। উত্তরের খানিকটা অংশ ইতিমধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে। ডালপালা ছাঁটা ডগা কাটা সিধা লম্বা দৈত্য-দানবের লাঠির মত শত শত শালের স্তূপ জমেছে একস্থানে, শত শত গাছ সবুজ শাখাপত্র নিয়ে হুমড়ি খেয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে মাটিতে। সারাদিন গাছ কাটা, ডালপালা ছাঁটা, জ্বালানি কাঠের টুকরোগুলি কাটা, আগে কাটা আধশুকনো কাণ্ডগুলি দুটি লরী আর অনেকগুলি গরুর গাড়ীতে বোঝাই দেওয়ার কাজ চলেছে অবিরাম, ঊর্ধ্বশ্বাসে। আধ মাইল তফাতে পাকা রাস্তা, এদিকে রেল স্টেশন থেকে ওদিকে চলে গেছে সাগরতীরের বালিয়াড়ি বহুল সহরে। মাঠ ও ফসলভরা ক্ষেতের বুকের

উপর দিয়ে ওই রাস্তা পর্যন্ত লরী ও গাড়ী চলাচলের একটা পথ গড়ে উঠেছে দু'টি সমান্তরাল গভীর রেখায়। দরকার মত ক্ষেতের আল ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চাকার দাগের সঙ্কীর্ণতা আঁকা বাঁকা গতি দেখে অনুমান করা যায় ক্ষেতের ফসল যতদুর সম্ভব কম নষ্ট করার দিকে নিয়ামকদের নজর আছে খানিকটা!

গাছ কেটে চালান দেওয়ার কাজ সাধারণতঃ ধীরে সুস্থে শিথিল গতিতেই চলে। কিন্তু গোড়ায় মজুরের অভাবে এবং কনট্রাক্টর হেরম্ব চক্রবর্তী অন্যত্র বিশেষ ব্যস্ত থাকায় এতদিন কাজ ভাল এগোয়নি। খতে লেখা হিসাব মত সময় গুরুতর রকম সংক্ষিপ্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, সময় কিছু বাড়িয়ে নেবার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে, তাই এত তাড়াহুড়ো। গাছগুলি কাটার পর ভাল করে শুকোলে রস মরে হাল্কা হয়, গাড়ীতে বেশী বোঝা চাপানো চলে। কিন্তু সে সময়ও নেই—মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধান রাখা হয়েছে গাছ কাটা আর চালান দেওয়ার মধ্যে। চেষ্টা চলেছে আরও গোটা দুই লরী ও কতগুলি গরুর গাড়ী সংগ্রহের।

অগ্রহায়ণের সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। দূরে তাকালে দেখা যায় অস্পষ্ট কুয়াশা রূপ নিচ্ছে। আজকের মত কাজ শেষ। স্থানীয় মজুররা ঝুমুরিয়া, নিতাইপুর, মহিষালী প্রভৃতি কাছাকাছি গাঁয়ে তাদের কুঁড়ের উদ্দেশে পা বাড়িয়েছে। কয়েকজন বিহারী মজুরও গাঁয়ের দিকে চলেছে। এরা গাঁয়ের লোক নয়, ঘর-টান এদের নেই, কিন্তু বনের ধারে এখানে বিনা ভাড়ায় অস্থায়ী কুটির তৈরী করে দিতে চাইলেও তারা এখানে রাত কাটাতে রাজী নয়, লোকালয়ে ঘর ভাড়া নিয়ে তারা বাস করতে ভালবাসে, এক বাড়ীতে নয়তো এক ঘরে যতজন মিলে একসঙ্গে থাকা সম্ভব। মেয়ে-পুরুষ সাঁওতাল মজুররাই শুধু এখানে অস্থায়ী ঘর-সংসার পেতে বসেছে। ডালপালা লতাপাতা দিয়ে নিজেরাই তারা তিন চার হাত উঁচু ছোট কুঁড়ে বেঁধে নিয়েছে, ঠিক যেন বয়স্ক শিশুদেব খেলার ঘর। ফাঁকায় মাটির হাঁড়িতে ভাত রাঁধে, বাঁশের চোঙায় তেল রাখে, পুরু কাগজের মত ঘন মোটা কাপড় কোমরে জড়ায় আর পিঠে ছেলে বাঁধার বা গায়ে দেবার চাদর করে, কাঠের চিরুনীতে চুল আঁচড়ায়, খোঁপায় ফুল গোঁজে আর বাবরিতে লাল কাপড়ের ফালি জড়ায়, শালপাতার মোটা বিড়ি বানিয়ে টানে, মেয়েপুরুষে ভাত বা মহুয়ার মদ খায় আর আগুন জেলে মাদল বাজিয়ে নাচে গায়—সুস্থ সবল সুশ্রী কালো দেহ আর সরল স্বাধীন দৃঢ় মন নিয়ে হিংসাদ্বেষহীন নির্ভয় নিশ্চিন্ত নির্লোভ শান্তিপূর্ণ জীবন কাটায়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে, ব্যক্তিগত সম্পদের বোধ নেই, ভেদাভেদ বোঝে না। দলের যে প্রধান সে সম্মান দলেরই দান, দলের ইচ্ছায় সে প্রধান, অনিচ্ছায় নয়। মেয়েরা স্বাধীন, সমান, প্রধান সম্মানীয়া—সভ্য জগতের স্বাধিকারচ্যুতা সমস্ত নারী যখন পরাধীন পণ্যা মাত্র।

চেরা তক্তার মেঝে ও দেয়ালের উপর খড়ের পাতলা ছাউনী দেওয়া চারকোণা ঘরটির সামনে ক্যাম্প-চেয়ারে বসে হেরম্ব চক্রবর্তী সরু একটা চুরুট টানতে টানতে চোখ কুঁচকে বনের দিকে চেয়ে ছিল। তার নিজের চোখের নেশার কুয়াশার দৃষ্টি একটু ঝাপসা হয়ে গেছে। দিনে সে কখনো মদ ছোঁয় না, আজ মনটা বড় বেশী বিগড়ে থাকায় অনেক দিনের অভ্যাসটাও বিগড়ে গেছে।

পিঠে বাঁধা শিশুকে সামনে ঘুরিয়ে এনে তার মুখে মাই গুঁজে দিয়ে সাঁওতাল রমণী সামনে দিয়ে চলে যায়, হেরম্বের নেশায় টনটনে কল্পনা দৃষ্টির সামনে ভেসে আসে তার সাত ছেলের মা আগুনের মত উজ্জ্বলবর্ণা সুন্দরী স্ত্রীর আবছা মূর্তি। তার দশ বছরের বিয়ে করা বৌ, এত দিনের এত শান্ত, এত ভাল, এত কোমল বৌ হঠাৎ তার সঙ্গে এমন বেয়াদবী সুরু করেছে যে মনটা খিঁচড়ে গিয়েছে হেরম্বের। সতীরাণী যে কি করে এমন অবাধ্য, এত

শক্ত হল হেরম্ব কল্পনাও করতে পারে না। পাঁচ ছ'মাস দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না, তারপর দেখা হবার প্রথম দিন থেকে গত পনের ষোল দিন ধরে একটানা একগুঁয়ে অবাধ্যতা। আষাঢ়ের প্রথমে ভারি মাসে সতীরাণী প্রসব হতে এসেছিল পচেটদলে তার বাপের বাড়ীতে, তখন থেকে হেরম্ব বনখালির কনট্রাক্ট আর ট্রেডিং সিণ্ডিকেটের সঙ্গে মামলা নিয়ে ব্যস্ত ও বিব্রত হয়েছিল, একদিনের জন্য পচেটদলে আসতে পারেনি, কিন্তু নিয়মিত টাকা পাঠিয়েছে সতীরাণী আর শ্বশুরের নামে। সতীরাণীকে বাপের বাড়ী পাঠালেই তার বাবা মেয়ে আর নাতী-নাতনীর জন্য যত খরচ হওয়া উচিত তার অনেক বেশী টাকা বরাবর নানা ছলে তার কাছ থেকে আদায় করেন। টাকা সে পাঠিয়ে দেয় তৎক্ষণাৎ, মনে মনে শুধু একটু হাসে পঞ্চাশ পঁচাত্তরটা টাকা ফাঁকি দিয়ে নেবার জন্য শ্বশুরেব সুদীর্ঘ ফাঁকা কৈফিয়ৎ পড়ে। এবারও সে চাওয়ামাত্র টাকা পাঠিয়েছে। দ্বিধা করেনি, প্রশ্ন করেনি, দেরী করেনি। এ-কথাটা বোধ হয় সতীরাণীর মনে নেই। বোধ হয় সে ভুলে গেছে যে হেরম্ব টাকা না দিলে বাপের বাড়ীর অসীম আদর তার কবে বিষিয়ে যেত—এখন থেকে টাকা পাঠান যদি সে বন্ধ করে দেয়, কয়েক মাসের মধ্যেই সে টের পাবে বাপ ভাই আর স্বামী এদের মধ্যে কে তার বেশী আপন।

ছেলে হবার ভয়?

সাত ছেলের মার ছেলে হবার ভয়?

সাতবার যে গর্ভধারণ করেছে বিনা দ্বিধায়, আট ন'মাস পূর্ণ হলে হেরম্ব বুদ্ধি বিবেচনা পূর্বক যার নিজের ও গর্ভের সন্তানদের অনিষ্ট হওয়া নিবারণের জন্য বৈঠকখানায় শুয়েছে, বাইরে রাত কাটিয়েছে, বলা মাত্র যাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে, কোন প্রয়োজন না থাকলেও কলকাতা থেকে ট্রেইনড় নার্স আনিয়ে যার কাছে থাকবার ব্যবস্থা করেছে প্রসবের অনেক আগে থেকে—সে, কিনা আজ তার সঙ্গে এক ঘরে এক বিছানায় শুতে অস্বীকার করছে আবার সন্তান ধারণ করবার ভয়ে।

সতীরাণী যে বছর-বিয়োনী নারী, এ দোষ যেন হেরম্বের!

স্বাস্থ্য যদি তার খারাপ হত, প্রসব হতে যদি সে কষ্ট পেয়ে থাকতো, তা হলেও হেরম্ব তার আতঙ্কের মানে বুঝতে পারত। কোন কারণ থাক বা না থাক, নিছক অর্থহীন আতঙ্ক হলেও হেরম্ব তা মেনে নিত। সতীরাণী এসে যদি আবদার করত তার কাছে, কেঁদে যদি তার পায়ে ধরত, কিম্বা তার মানটা শুধু বজায় রেখে যদি বলত যে কিছুকাল তারা তফাৎ থাকবে, হেরম্ব হাসি-মুখে সায় দিত। প্রসব হতে ছ'মাস করে সতীরাণী যে তফাতে থাকে, কাজের চাপে হেরম্ব যে মাঝে মাঝে মাসে দু'চারদিনের বেশী এবং কখনো দু'তিন মাস বাড়ী আসতে পারে না, সতীরাণীকে ছাড়া কি চলে না হেরম্বেব? মেয়েমানুষের কি অভাব আছে জগতে?

এই জ্বালাটাই হেরম্ব ভুলতে পারে না যে বিয়ের দশ বছর পরে সতীরাণী তাকে এতখানি ছোটলোক ভেবেছে যে স্ত্রী ও সন্তানের জননীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যে আলাদা এটুকু সে জানে না! আজ আছে কাল নেই মেয়েমানুষের মতই সে যেন ব্যবহার করে এসেছে সতীরাণীর সঙ্গে দশ বছর ধরে! এত কষ্ট করে এত টাকা সে যে রোজগার করেছে তা যে শুধু সতীরাণীর জন্য, এতটুকুও কি সে বোঝে না? আর ইচ্ছা করলে সে যে প্রচণ্ড শাস্তি দিতে পারে তাকে, চিরদিনের জন্য ত্যাগ করতে পারে, একটা মাসোহারা দিয়ে আরেকটা বিয়ে করতে পারে সাত দিনের মধ্যে, এ জ্ঞানও কি সতীরাণীর নেই?

নেই বলেই তো মনে হয়।

'ত্যাগ করো। করো ত্যাগ।' এই জবাব দিয়েছিল সতীরাণী, বলেছিল, 'করো বিয়ে। বিয়ে করো। আমি বাঁচি।'

হেরম্ব ঝগড়া করেনি, ভয়ও দেখায়নি। সতীরাণীকে শুধু এই সত্যটা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল যে যার সঙ্গে তার চিরকাল কাটাতে হবে, যার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর তার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, তার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করা উচিত নয়। এই জবাব দিয়েছিল সতীরাণী সেই উপদেশের!

কি স্পর্ধা একটা গরীবের মেয়ের যাকে সে দাসদাসী আত্মীয় কুটুম্ব ভরা অট্টালিকার কর্ত্রী করেছে, যার কোন শখ কোন আবদার সে অপূর্ণ রাখেনি!

পরাজয়ের জিদ্ বজায় না থাকায়, অসহ্য আক্রোশে হেরম্বের মন পুড়ে যেতে থাকে। একবার, শুধু একটিবার যদি সতীরাণী নত হত, হুকুম মানত! পাঁচ বছরের জন্য সে রেহাই দিত তাকে—দশ বছরের জন্য রেহাই দিত। গৃহিনীর সমস্ত অধিকার দিয়ে এতদিন যেমন রেখেছিল তেমনি মাথায় করে রাখত কিন্তু নিজে কোনদিন স্বামীর অধিকার দাবী করত না।

খানিক তফাতে নতুন বসানো টিউবওয়েল থেকে একটি সাঁওতাল মেয়ে হাঁড়িতে জল ভরে, হেরম্ব চেয়ে থাকে তার দিকে। অল্পদিনের মধ্যে মেয়েটির সন্তান হবে, প্রথম সন্তান। মেয়েটির বয়স ঊনিশ কুড়ির কম নয়। সাঁওতালদের সঙ্গে হেরম্বের ঘনিষ্ঠতা বহুদিনের। কম বয়সে কোন সাঁওতাল মেয়েকে সে মা হতে দ্যাখেনি। সারা জীবনে ছ'সাতটির বেশী ছেলে-মেয়ে হয়েছে এমন সাঁওতাল রমণীও দেখেছে কদাচিৎ। পূর্ণগর্ভা মেয়েটির জলতোলা দেখতে দেখতে এ-সত্যটা হেরম্বের মনে পড়ে যায় যে সাঁওতাল মেয়েদের দুটি সন্তানের মধ্যে কম করেও সাধারণতঃ দু-তিন বছরের ব্যবধান থাকে।

মেয়েটিকে সে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকে। খাঁটি সাঁওতালী ভাষায় জিজ্ঞেস করে, 'তোর পুরুষ কে?'

'নানকু।'

নানকু দলের প্রধান কানাইয়ার ছেলে! বয়স তার চব্বিশের কাছে। তখন হেরম্বের মনে পড়ে যায় নানকু ও এই মেয়েটির বিবাহোৎসবের কথা। মধুজোলের বনে শাল কাটাতে সে তখন সাঁওতালী গাঁ গড়পায় আস্তানা করেছিল। মধুজোলের বনের ছোট একটা অংশ পেয়েছিল কিন্তু সেই অংশটুকুও ঝুমুরিয়ার এই বনের প্রায় সাতগুণ বড় ছিল এবং এবারের মতই সময়ের টানাটানিতে বিব্রত হয়ে তাকে কাজ চালাতে হয়েছিল ঊর্ধ্বশ্বাসে। গড়পার স্থায়ী বাসিন্দা হেমন্ত সাঁওতালের এই মেয়েটির সঙ্গে তখন যাযাবর দলের নানকুর ভালবাসা হয়। কেবল মেয়ের বাপ নয়, গড়পার গাঁয়ের সাঁওতাল সমাজ এ বিয়েতে আপত্তি করেছিল। কিন্তু এমনি এক মৃদু শীতল সন্ধ্যায় নানকুর সঙ্গে মেয়েটি চলে আসে বনের প্রান্তে এ দলের শিবিরে। তীর বর্শা বা টাঙ্গির আঘাতে ঘায়েল হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নানকু গড়পার শেষ মাটির ঘরখানার পঁচিশ হাত তফাতে জামগাছের নীচে শিয়ালকাঁটার ঝোপে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। বিয়েটা হয়েছিল যথারীতি এবং যথেষ্ট উৎসবের সঙ্গে কিন্তু দু'পক্ষের ঝগড়াটা সামলাতে হয়েছিল হেরম্বকে। মিটমাট সে করতে পেরেছিল কিন্তু সেটা তার টাকার জোর, গণ্যমান্যতার জোর বা দারোগা পুলিশের খাতিরের জোরে সম্ভব হয়নি। সাঁওতাল সমাজের একজন বলে গণ্য হবার অধিকার আগে থেকে পাওনা না থাকলে মধ্যস্থ হয়ে মিটমাটের চেষ্টা করার সুযোগও সে পেত না। বছর দুই আগে সাঁওতালদের এক বড় পরবের দিনে সাঁওতালদের এক বিরাট মেলায় তাকে সাঁওতাল হবার অধিকার দেওয়া হয়—প্রায় পনের

বছর ওদের সঙ্গে মেলামেশার পর।

উগ্র প্রতিক্রিয়ার বদলে হেরম্বের মন আত্মনিগ্রহের জ্বালাময় বিষাদে ভরে যায়। প্রথম জীবনে প্রথম গুরুতর নৈতিক বা ব্যবহারিক অন্যায় করার পর যেমন হত তেমনি অস্থিরতা তাকে আকুল করে তোলে। চুরুট ছুঁড়ে ফেলে সে ডাকে, 'ভরত!'

কাঠের ঘর থেকে ছিটের গলাবন্ধ কোট গায়ে শীর্ণকায় মাঝবয়সী ভরত বেরিয়ে আসে। বসন্তের ছাপের মত মুখভরা অসংখ্য ব্রণর দাগ, চোখা নাকের নীচে বাবুয়ানি ছাঁটা গোঁফ, লোমবহুল মোটা ভুরু শোভিত কোটরগত একজোড়া গোল কটা চোখ। পায়ে বাদামী ক্যাম্বিশের জুতো, চলাফেরায় শব্দ হয় না। হেরম্বের পুরানো বিশ্বাসী অনুচর ও সেবায়েৎ।

'আরও খানিকটা চোলাই মদ চেয়ে আন দিকি।'

'হুইস্কি খান না?'

'না না, চোলাই নিয়ে আয়।'

'ব্রাণ্ডির বোতলটা খোলাই হয়নি, শখ করে আনলেন। খুলব? চোলাই-টোলাই আপনার সয় না বাবু। পাঁটখানেক তো হয়েছে, আর কেন?'

'যা যা, বকিসনে বেশী!'

হেরম্ব মিঠে ভাবেই ধমক দেয়। ভরতের ওপর সে কখনো রাগ করে না। প্রভুভক্ত প্রসাদলোভী উচ্ছিষ্টভোজী এই লোকটির প্রতি তার একটা বিশেষ স্নেহার্দ্র প্রশ্রয়ের ভাব আছে। ভরত যে তাকে সত্য-সত্যই দেবতা মনে করে এবং মদ থেকে তাব সব রকম উচ্ছিষ্ট দেবতার প্রসাদ বলে ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করে, অল্পদিন আগে তার এক চমকপ্রদ প্রমাণ পেয়ে হেরম্ব অভিভূত হয়ে গিয়েছিল।

গত ফাল্গুনের কথা। বনখালিতে সে নিজে উপস্থিত থেকে বন কাটাচ্ছে। যত টাকাই আজ তার হয়ে থাক, যত লোকজন রাখাই সম্ভব হোক, হেরম্ব কখনো পরকে ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দূরে থাকে না, যেখানে তার কাজ সেখানে সে সব সময় হাজির। এই একটি নিষ্ঠা তাকে সাফল্য দিয়েছে, সাফল্য লাভের পরেও এ নিষ্ঠা সে হারায়নি। নইলে পুলিশেব এক জমাদারের ছেলে হয়ে জন্মে, প্রথম বয়সে দু'শো একশো টাকার ছোট ছোট কনট্রাক্ট নিয়ে আরম্ভ করে আজ মাঝ বয়সে লাখ টাকার কণ্ট্রাক্ট নিয়ে কারবার করাব সৌভাগ্য সে কোথায় পেত?

ভরত নিজেই যোগাড় যন্ত্র করে কান্তপুর গাঁয়ের এক গরীব গেরস্ত ঘরের রাধা নামে একটি মেয়েকে জুটিয়ে এনে দিয়েছে। রাধার বাপ ছিল না, সৎ ভাইদের কাছে সে মানুষ। একদিন এই রোগা ছিপছিপে মেয়েটির চুলের মৃদু রুক্ষতা আর মুখের বিষাদকরুণ শ্রী দেখে হেরম্বের মনে হয়েছিল কলকাতার বিশেষ এক শ্রেণীর মেয়েদের একজন বুঝি প্রসাধনের বালাই চুকিয়ে শুধু রঙচটা ছেঁড়া একখানা তাঁতের শাড়ীতে গা ঢেকে গায়ে এসে একটি জীর্ণ শীর্ণ গরুর গলায় বাঁধা দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। লিভার একটু খারাপ ছিল হেরম্বের, বনের মধ্যে তাঁবুতে বাস করছিল একা, তায় আবার বসন্তকাল! চাপা পড়া মর্চে ধরা প্রাথমিক কাব্য কল্পনার আবর্জনার স্তূপ নাড়া খেয়ে একটু উতলা ও উৎসুক করে তুলেছিল হেরম্বকে। রাধাকে নিয়ে সে চলে গিয়েছিল কলকাতায়, বাড়ীভাড়া করে দিলে বালীগঞ্জে, বাড়ী আর রাধাকে সাজিয়েছিল হাল ফ্যাসানে। কত কল্পনাই সে করেছিল ওই মিঠে একটা অপ্রাপ্য কোন কিছুর জন্য হঠাৎ জাগা পিপাসায়। ভেবেছিল, দু'দিনে ফুরিয়ে যেতে দেবে না রাধার সঙ্গে সম্পর্ক, ওকে সে পড়াবে, গান শেখাবে, নাচ শেখাবে, আদব-কায়দা শেখাবে, দাঁড়

করাবে আশে-পাশের বাড়ীগুলির তরুণীগুলির চেয়েও অপূর্ব বস্তুতে। আর ওকে গড়ে তোলার সঙ্গে গড়ে তুলবে ওর হৃদয়ের সঙ্গে তার হৃদয়ের মিহি মধুর কারবার।

কিন্তু রাধা শুধু কাঁদে। তাঁবুতে এসে ঢোকা থেকে রেলগাড়ীতে চড়া থেকে, বালীগঞ্জে বাড়ীতে ঢোকা থেকে, পুতুলের মত সাজা থেকে হাপুস নয়নে শুধু কাঁদে। হেরম্বের আদর-আহলাদে ভোলে না, উজ্জ্বল রঙীন ভবিষ্যতের বর্ণনায় কান দেয় না,—হেরম্বের লোমশ বুকে, স্প্রিং-এর খাটের কোমল শয্যায়, সোফায় চেয়ারে, কার্পেট ও ঝকঝকে তকতকে মেঝেতে সে শুধু ককিয়ে ককিয়ে কাঁদে! আর শুধু কি তার কান্না, কাছে এনে সাজিয়ে গুজিয়ে নেবার পর কোথায় যে উপে গিয়েছিল তার মুখের সেই হাইক্লাস কালচারী পেলবতার ছাপ! প্রথম দিন সাবান ঘষবার সময় যে ময়লা উঠেছিল তার মুখ থেকে তার সঙ্গেই বোধ হয় সেই ম্লানিমাটুকুও উঠে গিয়েছিল।

সাতদিনে হতাশ ও বিরক্ত হয়ে হেরম্বের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। শুধু একটি আকর্ষণ তাকে আরও কয়েকটা দিন রাধার জন্য কলকাতায় আটকে রেখেছিল, তার আলিঙ্গনে রাধার বিস্ফারিত চোখে অতি অদ্ভুত এক ভয়ার্ত বিহ্বলতা। জীবনে একবার একজনের চোখে শুধু হেরম্ব এই দৃষ্টি দেখেছিল—মৃত্যু ঘনিয়ে আসবার সময় তার এক সচেতন আত্মীয়ের চোখে। প্রথমদিন এই দৃষ্টি দেখে এক অনির্দিষ্ট ভয়ঙ্কর আতঙ্কে হেরম্বের হৃদ্‌স্পন্দন স্থগিত হয়ে গিয়েছিল, এত জোরে সে চেপে ধরেছিল রাধাকে যে মুখ তার কালি হয়ে গিয়েছিল, চেতনা হারিয়ে চোখ বুজে এসে তার সেই সাংঘাতিক দৃষ্টি অন্তর্হিত হয়েছিল।

রাধার চোখে মৃত্যুকে আরেকবার দর্শন করার কৌতূহল কী জোরালো বিকারেই যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল হেরম্বের। নবদীক্ষিত তান্ত্রিক শব-সাধকের মত সে ক্রন্দনরতা রাধাকে দেখে ভেবে পেত না তার এই ক্ষীণ দুর্বল দেহে কোথায় লুকিয়ে আছে সেই অতল গভীর ভয়ানক রহস্য, দেখা শেষ হলেই যার স্বরূপ সে নিজে আর মনে করতে পারে না। শেষে একদিন কাছে টানা মাত্র অস্ফুট শব্দ করে রাধা চোখ বুজে অচেতন হয়ে গিয়েছিল, বুকে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ স্পন্দন অনুভব করতে না পেরে হেরম্বের মনে হয়েছিল সে বুঝি মরেই গিয়েছে। পরদিন হেরম্ব জোর পালিয়ে গিয়েছিল তার বনখালির তাঁবুতে।

আসবাবপত্র ইতিমধ্যেই কিছু বেচা হয়ে গিয়েছিল, বাকী সব তার বাড়ীতে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ভরতের ওপর ভার ছিল ভেলায় করে রাধাকে জীবন-সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবার অর্থাৎ শহরের বিশেষ কোন একখানা ঘর ঠিক করে কিছু জিনিসপত্র আর টাকা দিয়ে তাকে ফেলে পালাবার ব্যবস্থা করা। কয়েকদিন পরে রাধাকে সঙ্গে নিয়ে ভরত একেবারে বনখালির তাঁবুতে উপস্থিত হওয়ায় তাই বড় রাগ হয়েছিল।

'ওকে আবার নিয়ে এলি যে শূয়ার?'

'একটা কথা আছে বাবু।'

'ওরে ব্যাটা! ওরে শালা! ওরে হারামজাদা।'

'বাবু, আপনি যদি অনুমতি করেন, ওকে আমি বিয়ে করব।'

বিয়ে করবে! ভরতের হাতেই রাধাকে হেরম্ব ছেড়ে দিয়ে এসেছিল, শখ হয়ে থাকলে যতদিন ইচ্ছে রাধাকে ভোগদখল করার কোন বাধাই ভরতের ছিল না, কিন্তু তাতে ভরতের মন ওঠেনি। হেরম্বের এই উচ্ছিষ্ট মেয়েটিকে ভরত যথারীতি মন্ত্র পড়ে বিয়ে করবে। বৌ করে নিয়ে যাবে দেশের বাড়ীতে তার মা-বোনের কাছে, সংসার পাতবে ওকে নিয়ে। কত পাগল যে থাকে সংসারে।

রাধার সৎমা ও ভাইদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ভরত রাধাকে বাড়ীতে রেখে এসেছিল। কয়েকদিন পরে দেশের গাঁ থেকে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে এসে যথারীতি রাধাকে বিয়ে করেছিল ; ভোজ খাইয়েছিল গাঁ শুদ্ধ লোককে। বিয়ের জন্য হেরম্ব তাকে টাকা দিয়েছিল পাঁচশো।

রাধার নাকি আবার ছেলেপিলে হবে। ক'মাস আগে মার চিঠিতে খবর পেয়ে ভরত এমন ব্যস্ত হয়ে ক'দিনের ছুটি নিয়ে বৌকে দেখতে দেশে ছুটেছিল যে মনে মনে হাসি পেয়েছিল হেরম্বের।

চোলাই মদ চালায় হেরম্ব ভরতকে চমকে দিয়ে, ভয় পাইয়ে। চড়া কড়া নেশার চেয়েও অদ্বিতীয় কিছু একটা চাইছে হেরম্ব, অজ্ঞান হতে চায়? ভরত জানে, না দিয়ে উপায় নেই। যখন সে আপত্তি করেছিল, তখন বন্ধ করলে করতে পারত, তারপর আরও কিছু চোলাই যখন দিয়েছে তখন আর ঠেকানো যাবে না বাবুকে। ভয়ে বুক কাঁপে ভরতের। দেবতার মধ্যে শিবের মত, মানুষের মধ্যে এই হেরম্ব। আজ সে ক্ষেপেছে। প্রলয় ঘটে যাবে আজ পৃথিবীতে—ঝুমুরিয়ার উত্তরে এই অর্ধেক পালক-তোলা পাখার মত শালবনের ধারে।

বলে, 'বাবু, শোবেন?'

'আন্ তোর বৌকে, শোব। ছেলে হবে! শূয়ারকা বাচ্চার ছেলে হবে। ওটা কার ছেলে জানিস?'

'আমার সে তো ভাগ্য বাবু!'

হেরম্বের প্রচণ্ড হাসি ছড়িয়ে যায় চারিদিকে—অসভ্য, কুৎসিত, অশ্লীল হাসি। টিউবওয়েলের কাছে সাঁওতাল মেয়েটার মনে পড়ে যায়—সর্বাঙ্গে কাদা মাখা দুটো মহিষের ফোঁস্ফোঁসানি লড়াই। তার রাগ হয়। হেরম্বও সাঁওতাল। সাঁওতাল হয়ে সে এমন অসভ্যতা করে, বর্বর পশুর মত হাসে!

'জল নেয় কে?' ভরতকে শুধোয় হেরম্ব।

ভরত ভাবে, সর্বনাশ! বলে, 'কে জানে কে। যাক না বাবু, থাক না বাবু।'

'তুই আমার চাকর না মুনিব রে শালা?'

'চাকর, হুজুর। চাকর।'

'বল্ তবে, জল নেয় কে।'

'কুনাইয়ের মেয়ে ওপা।' ভরত ঢোঁক গেলে, 'মান্‌কের সাথে ওর বিয়ে হবে ও মাসে।'

'ওপা? শোন এদিকে, শুনে যা।' হেরম্ব ডাকে, হঠাৎ জাগা ভদ্র চালাকিতে গলা সংযত করে।

ওপা এসে দাঁড়ায়। হেরম্ব সাঁওতাল, তাদেরই দলের সাঁওতাল, ওপার ভয় নেই। সাঁওতাল মেয়ের চেয়ে সুন্দর দেহের গড়ন পৃথিবীর কোন দেশের কোন মেয়ের নেই। সতীরাণী অবশ্য ফরসা, দুধে আলতা রঙ। ওপার মত সাঁওতালী ছাঁচের একটু যেন ইঙ্গিত ছিল সতীরাণীর দেহে—বিয়ের সময়। মদের নেশায় চাঁদের আলোয় মৃত্যুর চেয়ে অবশ্যম্ভাবী একটা সীমান্ত যেন ওপা হয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে। হেরম্বের বিয়ের শানাই বাজছে সাঁওতালী বাঁশের বাঁশীতে।

'ভিতরে চল্। আয়।'

'না।'

পালাতে চাইলে ওপা পালাতে পারত। কিন্তু সে পালাবে কেন? মুখ ফিরিয়ে চলে যাবার উপক্রম করেছে, হাত ধরে টেনে তাকে হেরম্ব নিয়ে গেল তাঁবুর ভেতরে। ওপার চকচকে

দাঁত লাল হয়ে গেল হেরম্বের গলার বাঁ দিকের রক্তে। এক কামড়ে নেশা কেটে গেল হেরম্বের। হেরম্ব ছেড়ে দিতে ওপা তারই রক্ত মেশানো লাল থুথু ফেলল তার মুখে।

ঘাড় হেঁট করে হেরম্ব বলল, 'যা তুই ওপা! যা, প্রধানকে বলিস বেশী মদ খেয়েছি।'

হেরম্ব জানে, এসব বাজে ওজর। মদ খেয়ে মরে গেলেও কোন সাঁওতাল কোনদিন কোন অনিচ্ছুক মেয়ের হাত ধরে টানে না—মনেও থাকে না, মানেও বোঝে না, এ রকম হাত ধরে টানবার। ওপা তাঁবুর পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে যায়। এবার টাঙ্গি হাতে আসবে তার বাপ, ভাই অথবা ভবিষ্যৎ স্বামী। কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে তাকে।

'ভরত, বন্দুক দে।'

'বাবু, এক কাজ করেন, পায়ে পড়ি আপনার। লরীটা নিয়ে পালিয়ে যান।'

'পালাব? কেন পালাব? ওরে শূয়ার, কটা সাঁওতালের ভয়ে আমাকে তুই পালাতে বলিস্!' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হেরম্ব, ভরতকে বুঝি মেরেই বসে। গলায় দাঁতের স্পষ্ট দাগ আর গর্ত—রক্ত চুঁইয়ে ঘাড়ে নেমেছে। হঠাৎ মেজাজ বদলে যাওয়ায় ভরতকে ছোট চাপড় মেরে বলে, 'তুই বুঝি ভাবলি ভয়ে ওপাকে ছেড়ে দিলাম? শোন ব্যাটা বলি শেখ। বাঙ্গালী মেয়ে কি করে? চেপে ধরলেই ভয়ে নয় রে ব্যাটা, প্রেমে—যত ভয় থাক, বিতিষ্ঠা থাক, ঘেন্না থাক, চেপে ধরলেই সব ভুলে যায়, এলিয়ে পড়ে। বুঝলি? তাইতে হঠাৎ কেমন খেয়াল হল, দেখি সাঁওতাল মেয়ে কি করে। দেখলি তো কি করে? খেয়ালটা না জাগলেই ভাল ছিল রে ভরত! দে বন্দুক।' রাত গভীর হয়, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে, বন্দুকটা বালিশের পাশে রেখে হেরম্ব শোয়। আসুক ওপার বাপ ভাই হবু স্বামী, কাটুক তাকে। মরণের চেয়ে ঘুম এখন বড়, অনিবার্য। হয়তো আজ রাতে ওরা কেউ আসবে না। কাল বিচার হবে তার।

খুব ভোরে ওঠাই হেরম্বের অভ্যাস। নেশা করে রাত জাগলেও ছাড়া ছাড়া এলোমেলো উদ্‌ভ্রান্ত স্বপ্নে সতীরাণীর নাগাল পেয়ে পেয়ে না পাবার পর ঘুম ভেঙ্গে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ানো মাত্র সব যেন এক মহূর্তে ফাঁকা হয়ে গেল হেরম্বের কাছে। সন্ধ্যায় উগ্র নেশার প্রতিক্রিয়া যেন সুরু হল অভাবনীয় শূন্যতায়।

রাতারাতি সাঁওতালরা চলে গেছে। তাদের কুকুর নেই, মুর্গী নেই, গাছের ডালে বাঁধা হাঁড়ি নেই, সকলের ডাকাডাকি নেই, শুধু দাঁড়িয়ে আছে ডগায় ন্যাকড়া জড়ানো মাটিতে পোঁতা কচি বাঁশটি। লতাপাতা ডালপালার কুঁড়েগুলি তারা ভেঙ্গেচুরে মাটিতে লুটিয়ে রেখে দিয়ে গিয়েছে!

হেরম্বকে ওরা ত্যাগ করেছে, বর্জন করেছে। নিজের জটিল কৃত্রিম ভারাক্রান্ত জীবন-যাপনের সাথে সাথে সরল সহজ ও সংযত একটা জীবন সে যাপন করে চলেছিল অনেকগুলি বছর ধরে ওদের সঙ্গে, সে এক রীতিমত সুদীর্ঘ সাধনায়। ওদের দলের একজন হবার অধিকার পেয়েছিল তারই পুরস্কার স্বরূপ। ওরা তাকে আজ বাতিল করে দিয়েছে। সে আর সাঁওতাল নয়।

তাকে কিছু না বলে, বোঝাপড়ার সুযোগ না দিয়ে, সবাই চলে গেল? সতীরাণীর অবাধ্যতার চেয়ে একদল অসভ্য নরনারীর এই নির্বিরোধ নিঃশব্দ অবজ্ঞা যেন আরও বেশী অসহ্য মনে হয় হেরম্বের। সতীরাণীকে নোয়ানো যায়। হ্যাঁ হেরম্ব জানে, হুকুমে না আসুক, হাত ধরে টানলে না আসুক, দাবী করার বদলে একটু সকাতর ব্যথাজীর্ণ অসুস্থতার ভান করলেই সতীরাণী ছিটকে এসে তার বক্ষলগ্না হবে। কিন্তু এই সব অসভ্য বুনো মানুষগুলির কাছে ওসব উঁচুদরের ভাবপ্রবণতার কোন দাম নেই, সত্য সত্যই অসুস্থ হয়ে সে যদি গিয়ে

পড়ে ওদের মধ্যে, তার জন্য যা দরকার সব ওরা করবে এখনো। পৌঁছে দেবে কোনো সভ্য ভদ্রলোকের বাড়ী কিম্বা সদরের হাসপাতালে কিন্তু ওদেরই একজন হবার অধিকার আর সে পাবে না। পায়ে ধরে কাঁদলেও নয়।

মুহ্যমানের মত হেরম্ব বনের দিকে তাকায়। কি আরক্ত সূর্য উঠছে বনের কর্তিত অংশের ফাঁকে, না কাটলে এখনো ওই শাল গাছের আড়ালে থাকত মৃদু কুয়াশায় ক্রুদ্ধ টকটকে লাল এই সূর্য।

জীবনে আজ প্রথম হেরম্ব অনুভব করে সে বড় একা, বড় অসহায়, বড় দুর্বল, বড় দুঃখী। বাকী শালবনের দিকে চেয়ে জীবনে আজ তার প্রথম কর্মোন্মাদনার বদলে জাগে গভীর অবসাদ, আলস্যের অনুরাগ। এ বন কাটতে হবে তাকে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাটতেই হবে! কেন? কার কাছে সে কি অপরাধ করেছে যে কনট্রাক্টের পর কনট্রাক্টের মর্যাদা রাখতে তাকেই খাটতে হবে ঊর্ধ্বশ্বাসে, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত? কে সে? কে আছে তার? কার জন্য, কিসের জন্য এই কঠোর সংগ্রাম?

জীবনে এই প্রথম বলেই হয়তো বেলা বাড়ার সঙ্গে এই সহৃদয় বৈরাগ্যের ভার হেরম্বের কমে আসে, শুধু থেকে যায় একটা অনভ্যস্ত অস্থিরতা, অজানা বিষাদের ছাপ।

বন কাটতে হবে বৈকি; বাপ্ রে, এত টাকা খরচ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, এখন সময়মত কাজটা না করলে কি লোকসানটাই দিতে হবে তাকে। দু'সপ্তাহ সময় বাড়াবার জন্য দরখাস্ত পাঠিয়ে হেরম্ব লোকের সন্ধানে ঝুমুরিয়ায় যায়। ঝুমুরিয়া ও তার আশেপাশের গাঁ থেকে লোক সংগ্রহ করে সাঁওতালদের অভাব পূরণ করতে হবে। মুশকিল এই যে এখন ধান কাটার সময়। গেঁয়ো নিষ্কর্মা মজুররা পর্যন্ত ধান কাটার কাজে লেগে গেছে। ধান পাকলে তা ঘরে তুলতে দেরী করলে চলে না। গরীব তো চাষীরা। বড় গরীব।

ধান কাটতে হবে বৈকি। তা, হেরম্বের বনটাও তো কাটতে হবে তাড়াতাড়ি। বনটা কাটা হোক, তারপর সবাই মিলে সারাবছর ধরে ধান কাটুক, কোন আপত্তি নেই হেরম্বের।

আপত্তি বীরেশ্বরের। এবং যেহেতু ঝুমুরিয়ায় বীরেশ্বরের প্রতিপত্তি কম নয়, আপত্তি অনেকের, দু'চারজন ছাড়া। বীরেশ্বর মাথা নেড়ে বলে, 'তা হয় না। ধান নষ্ট হয়ে যাবে। বন তো রইল, ধান কেটে সবাই যাবে'খন বন কাটতে।

'নবাব খাঞ্জা খাঁর মত কথা কইছ দেখি তুমি?'

'গাল দেবেন না জামাইবাবু। ওটা সয় না।'

হেরম্ব চোখ পাকিয়ে তাকায়। বীরেশ্বর চোখ পাকায় না, সোজা তাকিয়ে থাকে তার চোখের দিকে। চোখের তার পলক পড়ে কিন্তু পাল্লায় হার মেনে চোখ নামে না। হেরম্বের মনে হয়, বীরেশ্বরের পিছনে দাঁড়ানো জন ষাটেক লোকের প্রায় ষাট জোড়া চোখ যেন বীরেশ্বরের চোখের মারফতে তার দিকে উদ্ধত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। জমিদারের জামাই সে, একজন প্রজা তাকে তুমি সম্বোধন করছে! কারো তাতে বিস্ময় নেই, আতঙ্ক নেই! চটে উঠে বজ্জাত কথাটা বলা বোধহয় উচিত হয়নি লোকটাকে। অবশ্য, পা থেকে জুতো খুলে লোকটার গালে বসিয়ে দেওয়াই তার কর্তব্য, তবে কিনা গরজটা এখন তার। আপাততঃ এ পাগলাকে না চটানোই বোধহয় উচিত।

হেরম্ব রাগ সামলে বলে, 'ধান কাটো না তোমরা, কে বারণ করছে। আমার শুধু জন কুড়ি পঁচিশ লোক দরকার। বাকী সবাই ধান কাটো।' বীরেশ্বরকে ডিঙ্গিয়ে অন্য সকলকে শুনিয়ে সে বলে, 'চড়া মজুরী দেব—দেড়া বাড়তি টাইম। রোজ বাড়তি টাইম পাবে।'

ক্ষেত মজুর যারা উপস্থিত ছিল তারা উসখুস করে। ক্ষেত তাদের নেই, ধান কাটা আর শালবন কাটা তাদের কাছে সমান। উদ্ধত দৃষ্টিতে তারা কেউ হেরম্বের দিকে তাকায়নি, ওটা হেরম্বের কল্পনা মাত্র। হেরম্বের সঙ্গে বীরেশ্বরের কথা কাটাকাটির স্পর্ধায় তারা ভয়ে বিস্ময়ে থ' বনে গিয়ে হাঁ করে তাকিয়েছিল। হেরম্বের মনে হয়েছিল ওরা বুঝি বীরেশ্বরের চাউনিকেই নকল করছে।

জালালুদ্দিন দাঁড়িয়েছিল বীরেশ্বরের পাশে। বীরেশ্বরের চেয়ে তার বয়স বেশী, চুল দাড়ি প্রায় সাদা হয়ে গেছে। তরুণ কিশোরের মত ছিপছিপে ঋজু দেহ, গেঞ্জিহীন দেহে ফুলকাটা পাতলা কাপড়ের ময়লা পাঞ্জাবী, লাল ও সবুজের চেককাটা লুঙ্গি, লোমের মত মোলায়েম সাদা বাবরি চুল, টানা দুটি চোখে মোলায়েম স্বগত কৌতুক। এই স্থূল জগৎ আর গুরুভার জীবন যেন অতিশয় মজার ব্যাপার। এত কালের বেঁচে থাকা অতীতের সঞ্চিত সুখ দুঃখ আশা নিরাশা আনন্দ বেদনায় স্তূপাকার অভিজ্ঞতা যেন একটি মাত্র সরল অনুভূতিতে পরিণত হয়ে বুড়োবয়সের প্রতিটি মুহূর্তের বর্তমানকে তাজা তামাশা করে রেখেছে। জালালুদ্দিনের আটটি ছেলেমেয়ে, বাইশটি নাতি নাতনি আর তিনটি পুতি পুতনি—মরাহাজা বাদ দিয়ে। কাছে সবাই থাকে না, জীবিকার জন্য ছড়িয়ে গেছে কাছে ও দূরে। যারা আছে তাদের নিয়েই তার মস্ত সংসার, বীরেশ্বরের সংসারের মত।

সাংসারিক মিলের জন্যই হয়তো দু'জনের মিতালি, নয়তো দু'জনের প্রকৃতিতে মিল বড় কম। বীরেশ্বর রগচটা বদমেজাজী, জালালুদ্দিন ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির মানুষ। এমনিতে মনে করাই কঠিন যে জালালুদ্দিনের মধ্যে তেজ বলে কিছু আছে। গাঁয়ের জীবনে, চাষীর জীবনে, ছোটখাট সংঘর্ষ লেগেই থাকে এর সঙ্গে অথবা ওর সঙ্গে। বিবাদ করতে বড়ই নারাজী জালালুদ্দিন।

বিবাদ বাধার কারণগুলিকেই সে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে, বিবাদের সূত্রপাতে কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকার করেও অপর পক্ষকে জিতিয়ে দিয়ে নিজে হার মেনে আপোষ রফা করে, বড় স্বার্থের সংঘাতেও তার স্বার্থই বরাবর বাতিল হয়ে যায়। সন্দেহ জাগে যে মানুষটা বুঝি অপদার্থ, ভীরু। বিস্ময়ের সঙ্গে মনে হয় যে এই নরম দুর্বল সাদাসিদে মানুষটা এতকাল ধরে এত প্যাঁচ আর এত চালাকিভরা হৃদয়হীন কঠোর জীবন সংগ্রামে অনেকের চেয়ে বেশ খানিকটা ভালভাবেই টিঁকল কি করে! কিন্তু দু'চার বার গুরুতর ব্যাপারে এই মাটির মানুষটিকেই যারা আগুনে পোড়া লোহার চেয়ে শক্ত হতে দেখেছে, কৌতুকভরা দৃষ্টির বদলে দু'চোখে আবিষ্কার করেছে জেহাদ ঘোষণা, তাদের সন্দেহ সমস্যা সব মিটে গেছে। নায়েব দীনু সরকারকে এই জালালুদ্দিন একবার হাটের চালার খুঁটিতে বেঁধে হাটশুদ্ধ লোকের কাছে তার বদ মতলবের খুঁটিনাটি সব কথা স্বীকার করিয়ে প্রায় জেলে যেতে বসেছিল। ভয় আর লোভ দেখিয়ে ঝুমুরিয়ার তিনটি মুসলমান যুবককে দিয়ে এমন একটা কাজ করাতে যাচ্ছিল দীনু সরকার, যার ফলে গাঁয়ের হিন্দু মুসলমানে একটা বড়রকম মারামারি কাটাকাটির ব্যাপার ঘটে যেত। জালালুদ্দিনকে সেই নায়েবের শত্রুতায় অনেক অন্যায় অত্যাচার সইতে হয়েছে। হঠাৎ একদিন সন্ন্যাস রোগে নায়েব মারা না গেলে কোথাকার জল কোথায় গড়াত বলা যায় না। এ ধরনের কীর্তি আরও আছে জালালুদ্দিনের। লোকে এখনো গল্প করে।

কথা সে কম বলে। গলার আওয়াজ গুরুগম্ভীর।—'চারগুণ মজুরি দিলেও এ গাঁয়ের কেউ যাবে না। যে যাবে তার মুশকিল আছে।'

সবাই শুনল। ক্ষেত মজুরদের উসখুসানি থেমে গেল। কয়েকজনের চোখে শুধু ফুটে

উঠল কুটিল, দ্বিধাগ্রস্ত প্রতিবাদ।

ধনা মাইতি নীচু গলায় বলল, 'জবরদস্তি বটে বাবা।'

কাদের সায় দিল।

হেরম্ব কি ভাবল সেই জানে, বীরেশ্বর ও জালালুদ্দিনের সঙ্গে আর কথা কাটাকাটি না করে জোর গলায় হাঁক দিয়ে বলল, 'তোমাদের কোন ভয় নেই। কোন মুশকিল হবে না। যে জুলুম করবে তাকে আমি দেখে নেব। ডবল পয়সা পাবে সবাই, চলে এসো।'

এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে সে জোরে জোরে পা ফেলে চলে গেল জোতদার নিতাই চক্রবর্তীর বাড়ীর দিকে। নিতাইয়ের বাড়ী থেকে সে গেল আবদুল-এর বাড়ী।

নিতাই চক্রবর্তী নথিপত্র দেখছিল, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হিসাব করছিল কার কাছ থেকে কতটা বেশী আদায় করা সম্ভব হতে পারে। শুভদিন, লক্ষ্মীর আশীর্বাদ কুড়িয়ে গুছিয়ে ছিনিয়ে সংগ্রহ করবার দিন আসন্ন, চাপা উত্তেজনায় নিতাই চক্রবর্তীকে রীতিমতো উন্মনা দেখাচ্ছে। তার গোলায় পড়েছে গোবর মাটির নতুন প্রলেপ। উজ্জ্বল দেখাচ্ছে কপালে চন্দনের ফোঁটা।

'বীরেশ্বর?' জিভে ক্রোধ ও বিরক্তির টকাস্ আওয়াজ করে নিতাই বলে, 'ও ব্যাটা চিরকাল জ্বালালে। অনাথ মণ্ডল ওদের প্রধান, সে পর্যন্ত ব্যাটাকে ডরায়। তা আপনি ভাববেন না জামাইবাবু, লোক পাবেন।' চিন্তিতভাবে নিতাই মাথা দোলায়, 'ধান কাটা সুরু হয়ে গেছে, এই যা অসুবিধে। নয় তো লোকের অভাব কি! তা আপনি ভাববেন না জামাইবাবু। লোক পাবেন।'

আবদুল হাই-এর বয়স চল্লিশের ওপর, গোলগাল চর্বি-স্নিগ্ধ লাবণ্যময় চেহারা, হাসিখুশী অমায়িক ব্যবহার। অত্যন্ত চালাক ও প্রতিহিংসাপরায়ণ গ্রাম্য রাজনীতিতে, মামলা-মোকদ্দমায় এ অঞ্চলে তার জুড়ি নেই।

হাসিমুখে কথা বলতে বলতেই একবার হাই তুলে এক মুহূর্তের জন্য সে আড়চোখে খাপছাড়া দৃষ্টিতে তাকাল হেরম্বের দিকে, মনে মনে বলল, হুঁ, ফ্যাকড়া বাধাতে এসেছ আমাদের মধ্যে। তোমাকে লোক যোগান দিতে জালাল মিঞার সাথে লড়াই বাধাব আমি!

মুখে বলল, 'হাঁ, হাঁ, চেষ্টা করব বৈকি বাবু। তবে কি জানেন , বীরেশ্বরকে সবাই ডরায়! জালাল মিঞার সাথে বড় ভাব। ফের দেখুন, ধান কাটাও সুরু হয়ে গেছে—এই যা মুশকিল আর কি।'

ঝুমুরিয়া আর তার আশপাশের পাঁচনিখে, সাতাইখুনী, গদাধরপুর এসব গ্রাম থেকে যে কজন লোক পেল হেরম্ব তাদের সংখ্যা আঙ্গুলে গোনা যায়। এ যে শুধু বীরেশ্বরের প্রভাবে হল তা অবশ্য নয়, চার পাঁচটি গ্রাম দূরে থাক, শুধু ঝুমুরিয়ার সিকি ভাগ লোককেও বুঝিয়ে শুনিয়ে ভয় দেখিয়ে হুকুম মানাবার ক্ষমতাও তার ছিল কিনা সন্দেহ। সময়টাই গেল হেরম্বের বিপক্ষে। ফসল কাটায় শুধু চাষীর নয়; জমিদার, জোতদার, ভাগীদার, মহাজন সকলের স্বার্থই জড়িয়ে আছে। অন্য সময় হলে একা নিতাই চক্রবর্তী একদিনে বিশ-ত্রিশজন লোক জুটিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারত বন কাটতে, এখন সে তিনজন প্রায় অকেজো বুড়োকে পাঠিয়ে হেরম্বের মান ও নিজের কথা বজায় রাখল। বনটা বড় হলে বেশীদিন মোটা মজুরিতে কাজ করার সম্ভাবনা থাকলেও হয়তো অনেকে লোভে পড়ে কারো হুমকি না মেনে মাঠের কাজ ফেলে চলে যেত। কয়েকটা দিনের ডবল মজুরির লোভে যাদের সঙ্গে চিরদিনের স্থায়ী সম্বন্ধ তাদের চটানো অনেকেরই ভাল মনে হল না। বাইরে থেকে যারা এসেছিল ধান কাটার মরসুমে মাঠের কাজ করতে, এখানে যাদের কেউ নেই, তারাই শুধু বন কাটতে গেল। এখানে যাদের

ঘর কিন্তু ফসলের সময় ছাড়া সারাটা বছর যারা বিদেশে জীবিকা অর্জন করে তারাও প্রা কেউ হেরম্বের ডাকে সাড়া দিল না। হেরম্ব কিন্তু দায়ী করল বীরেশ্বরকে। যারা সাহায্য করতে পারত তারাও যে মুখে তাকে কথা দিয়েও কাজের বেলায় অনুগত লোকজনকে বারণ করে দিয়েছে এবং এদের মধ্যে অনেকেই বীরেশ্বরের বিরুদ্ধে বেশ জোরালো বিদ্বেষ পোষণ করে এসব হেরম্বের মনে এল না। বীরেশ্বর ছাড়া আর কেউ সোজাসুজি স্পষ্টভাবে তার বিরোধিতা করেনি বলেই একা বীরেশ্বরই দায়ী হয়ে রইল তার মনে।

শ্বশুরের কাছে সাহায্য চাইতে যাওয়ার ইচ্ছা হেরম্বের ছিল না। সেখানে সতীরাণী আছে কিন্তু অন্যভাবে চেষ্টা করারও সময় ছিল না। শ্বশুরের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হওয়ায় বীরেশ্বরের উপর রাগটা তার আরও কয়েক ডিগ্রি চড়ে গেল।

হুকুম ধমক আর লাঠির গুঁতোয় দুদিনের মধ্যে শ'খানেক মানুষকে হেরম্বের বন কাটতে যেতে হল। ঝুমুরিয়ার মানুষেরাই লাঠির গুঁতো খেল বেশী—ঝুমুরিয়া থেকেই বেশী লোককে যেতে হল মাঠ ছেড়ে বনে।

পাঁচনিখের দারোগা শৈলেন দাস বীরেশ্বর ও জালালুদ্দিনকে এ দুদিন থানার গারদে আটকে রেখে সদরে চালান দিল, দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধানোর চেষ্টা এবং মারপিটের অভিযোগে। পুলিশকে মারপিট নয়—ধনা, কাদের ও আরও কয়েকজনকে।

ধনা ও কাদেরকে বীরেশ্বর সত্যই মেরেছিল। জালালুদ্দিন বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল শুধু প্রতিবাদ করতে—জ্বর গায়ে।

শৈলেন দাসের বয়স আটাশ বছর। ফর্সা রঙ, ছিপছিপে গড়ন, সুশ্রী চেহারা। শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের ছেলে, সতর্ক, বুদ্ধিমান, উৎসাহী। একটা কথা শৈলেন জানে ও বিশ্বাস করে যে কোন বিষয়েই বাড়াবাড়ি করতে নেই, যতটুকু প্রাপ্য হেরম্বের তার বেশী খুশী তাকে করার গরজ শৈলেনের ছিল না।

শৈলেনের ভেবেচিন্তে হিসেব করে লেখা রিপোর্টে তাই ব্যাপারটা বিশেষ গুরুতর রূপ নিল না। বীরেশ্বরের সাজা হল একমাস জেল এবং একশো টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও একমাস হাজতবাস। জালালুদ্দিনের শুধু তিন সপ্তাহ হাজতবাস। তার বিরুদ্ধে মারপিটের অভিযোগ ছিল না। বীরেশ্বরের কাছ থেকে জরিমানা আদায় হলে অর্ধেক টাকা ধনা ও কেদার পাবে ক্ষতিপূরণ হিসাবে।

ধনা ও কেদার পাবে তার জরিমানার টাকার ভাগ। শুনেই মাথা বিগড়ে গেল বীরেশ্বরের। জরিমানা দিতে সে অস্বীকার করল। ছেলেদের বলে দিল, তারা যদি জরিমানার টাকা দাখিল করে, হাজত থেকে বেরিয়ে সে তাদের মুখদর্শন করবে না।

রম্ভা ঝুমুরিয়া এল দিন শুনে, হাজত-ফেরত বাপকে আদর করে ঘরে তুলবে। খবর সে পেয়েছিল যথাসময়েই, তাকে নিয়ে অবিলম্বে ঝুমুরিয়া রওনা হবার জন্য রামপালের আগ্রহও কম ছিল না। রম্ভা দিন পিছিয়ে দিয়েছিল। বাপ নেই, সে কিসের বাপের বাড়ী। বাপের কথা ভেবে মিছিমিছি কান্না পাবে শুধু।

কলকাতায় বাপের কথা ভাবেনি রম্ভা, তার কান্না পায়নি? সত্য কথা বলতে কি, খবর শুনে বেশ ভালরকম কান্নাই তার পেয়েছিল। চালাক একগুঁয়ে মেয়ে কিনা, কান্নাটা তাই সে গিয়েছিল চেপে। মুখখানা একটু ম্লান পর্যন্ত করল না। ভাবল, রামপাল দেখুক এবং শিখুক যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে জেলে যাওয়ার গৌরব কত, কেমন ওটা সৌভাগ্যের

বিষয়।

'কষ্ট হচ্ছে না তোমার?'

রম্ভা সগর্বে বলেছিল, 'কিসের কষ্ট?'

বলে', রামপাল একেবার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে দেখে শুধরে নিয়ে বলেছিল, 'ওমা, কষ্ট হচ্ছে না? তোমার বাবা জেলে গেলে কষ্ট হয় না তোমার? কিন্তু কি বুকের পাটা ভাবো দেখি বাবার! গাঁয়ের কেউ কথাটি কইলে না, শুধু আমার বাবা জমিদারের লোক পুলিশের লোক সবার সামনে তাল ঠুকে দাঁড়াল। বাবা সকলের পুজো পাওয়ার যুগ্যি নয়?' এতক্ষণে চোখ ছল ছল করে এসেছিল রম্ভার, পট পট করে কবার পলক ফেলে ধরা গলায় বলেছিল, 'কষ্ট হলে করছি কি বলো? সূর্য্যিদা বলত, এদেশে মানুষের মত মানুষ যে হবে জেলে তাকে যেতে হবেই, এমনি দেশ এটা। সত্যি না কথাটা? গান্ধীজী থেকে সুরু করে নাম কর দিকি একটা বড় মানুষের, আদ্দেক জীবন যে জেলে কাটায়নি?'

রম্ভা আজকাল অনবরত এইরকম সোজা স্পষ্ট প্রোপাগাণ্ডা চালাতে আরম্ভ করেছিল, কোন একটা উপলক্ষ পেলেই হল। কেবল রামপাল নয়, বাড়ীশুদ্ধ লোকের কাছে। জানাশোনা কথারই পুনরাবৃত্তি রম্ভার আন্তরিকতায় আবার নতুন করে সকলের মন স্পর্শ করে, একটা অস্পষ্ট দুর্বোধ্য অস্বস্তিবোধ জাগায় সকলের মধ্যে, পাশবালিশ তাকে তোলা নালিশগুলি আবার কিছুক্ষণের জন্য গুমরে ওঠে বুকের মধ্যে. কেউ মুচকে হেসে বলে, 'ও বাবা, স্বদেশী মেয়ে নাকি?' আগে হয়তো রম্ভা রেগে যেত হাসি দেখে এবং মন্তব্য শুনে, আজকাল সেও হেসে জবাব দেয়, 'নয় তো কি বিদেশী মেয়ে? মেম?'

ঝুনুরিয়া পৌঁছেই রম্ভা শুধোয়, 'বাবা ছাড়া পাবে কবে?'

শ্যামলাল বলে, 'আরও একমাস।'

ব্যাপার শুনে আগুন হয়ে ওঠে রম্ভা। বীরেশ্বর বারণ করেছে বলে জরিমানার টাকা জমা দেওয়া হয়নি। এমনি সব বাপ-ভক্ত উপযুক্ত ছেলে বীরেশ্বরের ! বাপ একটু রাগ করবে, এসে দুটো মন্দ কথা বলবে বলে ভয় হয়েছে সবার! এই একটা ছুতো পেয়ে বাপকে ছেলেরা জেলে পচাচ্ছে একশোটা টাকার জন্যে —ভোগ করছে সেই বাপের টাকাপয়সা জমি-জমা।

'বাবা যদি আত্মঘাতী হতে যেত, ঠেকাতে না বাবাকে? রাগের ভয়ে আত্মঘাতী হতে দিতে বাবাকে?'

মুখ কালো করে সবাই শোনে। এ বিষয়ে যে অনেক আলোচনা হয়েছে বাড়ীতে, বীরেশ্বরের বারণ অমান্য করেও যে জরিমানা দেবার কথাটা তারা ভেবেছে অনেকবার কিন্তু মনস্থির করতে পারেনি শেষ পর্যন্ত, এসব রম্ভাকে কেউ বলে না। দ্বিধাসংশয়হীন তীব্র ভাষায় এমন জোরের সঙ্গেই রম্ভা বলে দিয়েছে তাদের কি করা উচিত ছিল যে মনস্থির করতে না পারাটাই মস্ত অমার্জনীয় অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বটে। তাই বটে। রাগ না হয় করতই বীরেশ্বর, এসে দুটো গাল মন্দই দিত, তাই বলে বুড়ো বাপকে জেল থেকে খালাস করে না আনার কোন মানে হয়? মেরে তো আর সে ফেলত না বাড়ীর সবাইকে।

সকলে চুপ করে থাকে। ছোট ভাই মোহনলাল, এ বাড়ীতে সে সকলের চেয়ে রোগা আর বেঁটে, সেই একা প্রতিবাদ করে রম্ভার ঝাঁঝালো সমালোচনায়, বলে, 'অত চোটপাট করিস নে ছোড়দি, বাবা তোর একার বাবা নাকি? আমরা ছাড়িয়ে আনতাম বাবাকে, বাবার মনে কষ্ট হবে বলে আনিনি।'

'কিসের কষ্ট?' রম্ভা শুধোয় অবাক হয়ে।

'ধনা আর কাদের যে জরিমানার টাকা পাবে?'

'ধনা পাক মনা পাক কাদের পাক ফাদের পাক, মোদের তাতে কি?'

এ প্রশ্নের লাগসই নতুন জবাব মোহন খুঁজে পায় না। সে শুধু বলে, 'বাবার মনে কষ্ট হবে।'

পরদিন শ্যামলাল জরিমানার টাকা জমা দিতে সদরে গেল। টাকা জমা হয়ে গেল সেই দিন, ছাড়পত্র পেয়ে বীরেশ্বরের বাড়ী ফিরতে লেগে গেল পাঁচ দিন। কার অত খরচ পড়েছে পুরানো নথিপত্র ঘাটবার? হবে, সব হবে, ধীরে সুস্থে। এতই যদি ব্যস্ত তারা, এতকাল জমা দেয়নি কেন টাকা? পুরো একটা মাস কি ঘুমোচ্ছিল তারা?

শেষে দেবনারায়ণ উকীল বললেন, 'দাও দিকি দশটা টাকা।'

তৈলাভাবেই শেষ চাকা ঘুরছিল না। তেল পাওয়া মাত্র চাকা ঘুরে গেল। বীরেশ্বর ছাড়া পেল সেইদিন।

দেখা গেল বীরেশ্বর রাগ করেনি। সে শুধু একবার আফসোস করে বলল, 'কি দরকার ছিল অতগুলো টাকা নষ্ট করার? কটা দিন বেশ কেটে যেত।'

'বড্ড রোগা হয়ে গেছ বাবা।' রম্ভা বলে।

বীরেশ্বর হাসে।—'তবে কি মোটা হব?'

রম্ভা এক বাটি দুধ এগিয়ে দেয়। 'দুধটা খাও দিকি আগে।'

দুধের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করে, 'কত ধান বরবাদ গেল?'

'এই গেছে কিছু।' শ্যামলাল জবাব দেয়।

'মোদের কথা শুধোইনি। গাঁ শুদ্ধ ধরে?'

'তা মোটমাট মন্দ যায়নি। সবচেয়ে বেশী গেছে ভূতো, নদী, কালীপদ আর রহমতের। আদ্দেকও ঘরে তুলতে পারেনি। কম বেশী সবারি গেছে।'

'এত গেল?' বীরেশ্বর এক চুমুকে জাম বাটি ভরা দুধ শেষ করে ফেলে।—'মোদের কত গেল?'

'এই গেল কিছু।'

'কত?' বীরেশ্বর গর্জন করে ওঠে, 'ছাপাসনে কিছু। সোজা কথা বলতে শিখিসনি?'

শ্যামলালের বদলে জীবনলাল জবাব দেয়, 'ডাঙ্গা জমির প্রায় সব নষ্ট। হেরম্ববাবু সারাদিন লরী চালাল কিনা ক্ষেতের ওপর।'

'দখিন জমির আল ডিঙ্গোতে লরীর একটা চাকা ভেঙ্গেছে বাবা।' মোহনলাল যোগ দেয়। সাত বিঘে জমির পাকা ফসল চাকায় পেষার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ একটা চাকা যে অন্ততঃ লরীটার জখম হয়েছে তাতে মোহনকে বেশ সন্তুষ্ট মনে হয়।

বীরেশ্বরের বাড়ীর সামনে লাউ কুমড়ো মাচা। ডাইনের মাচায় ঝুলছে অনেকগুলি বড় আর কচি লাউ। এই সবুজ সফল মাচা থেকে চোখ তুলে উত্তরে তাকিয়ে কেমন একটা শূন্যতার অনুভূতি জাগে বীরেশ্বরের। অনেক দিনের চেনা মানুষ যেন গোঁফদাড়ি কামিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। উত্তরে শাল বনের চিহ্ন নেই, পৃথিবীর উত্তুরে মুখটা যেন চেঁছে সাফ করে ফেলা হয়েছে।

মনটা নুয়ে বাঁকা হয়ে যায় বীরেশ্বরের। জীবনে আর কখনো সে এমন জগদ্দল পাষাণের মত ভারি জমাট বাঁধা বিষাদ অনুভব করেনি। আজ তার প্রথম মনে হয় মানুষটা সে সুস্থ স্বাভাবিক নয়, সে সত্যই খ্যাপা, পাগলাটে, খাপছাড়া। লোকে যে বলে তাই ঠিক, মাথায়

তার পোকা আছে। এতদিন কার সঙ্গে সে লড়াই করে এল, কিসের সঙ্গে? ভগবান জানেন, লড়াই করেছে অবিরাম। বাইরে বড় সংঘর্ষের সুযোগ তার বেশী জোটেনি, দৈনন্দিন জীবনের অনেক অনিয়ম, অনাচার, অবিচার, অন্যায়ও সে সয়ে গেছে নিরুপায় ধৈর্যের সঙ্গে, কিন্তু মন তার মহত্তর অসঙ্গতিকেও মেনে নেয়নি, উদ্যত, উদ্ধত প্রতিবাদ গুমরে গুমরে গর্জন করেছে। সব তার মাথার বিকারের লক্ষণ—চড়া বায়ুর প্রমাণ। কি এসে গেছে তার প্রতিবাদে? যা ঘটবার সবই ঘটেছে, কেউ ঠেকাতে পারেনি। এই হয়তো নিয়ম জগতের। ঝড় এসে ঘর ভাঙ্গে বলে ঝড়ের নামে নালিশ করে কে যে এটা উচিত নয়, এ অন্যায়, এ অত্যাচার? পাগল করে। মাথা যার খারাপ বীরেশ্বরের মত।

সূর্য এসে সামনে দাঁড়ায়।

'খবর পেয়ে দেখতে এলাম।'

মাঘের মিঠা রোদে কেমন প্রাণশূন্য মনে হয় সূর্যের রক্তহীন শীর্ণ ফ্যাকাশে মুখ, তার স্তিমিত নিবু নিবু চোখ।

'খপর অনেকেই পেয়েছে।'

সূর্য হাসে। সত্যই হাসে। কি করে যে হাসে ভগবান জানেন।

'আসবে। সবাই আসবে। বাজারে আদ্দেক দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। স্কুলের আদ্দেক ছেলে বেরিয়ে এসেছে। দল বেঁধে প্রসেসন করে সবাই আসবে। আসবে কি, আসছে।'

বিষণ্ন রোদ দীপ্ত হয়ে ওঠে বীরেশ্বরের চোখে। অসীম শূন্যতা পূর্ণ হয়ে যায় অদৃশ্য মানুষের অশ্রুত কলরবে। নিতাই, সুদেব, বলাই, রামপদের বাড়ীর জানালা দিয়ে অনেকগুলি চোখ যে তার দিকে তাকিয়ে আছে, এতক্ষণে খেয়াল হয়। খেয়াল হয় রম্ভা সঙ্গে আছে গোড়া থেকে।

'প্রসেসন?' বীরেশ্বর বলে।

'আপনি বলেছেন সবাইকে প্রসেসন করতে। এ কাজ আপনার।' কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে রম্ভা বলে।

'একজন দুজন করে এলোমেলো ভাবে আসত, আমি ভাবলাম, সবাই দল বেঁধে আসুক। আমার কোন বাহাদুরী নেই রম্ভা।'

'আপনি বড্ড রোগা হয়ে গেছেন। দুধ খাবেন একটু?'

'একদিন একটু দুধ খাইয়ে মোটা করে দেবে?'

'একদিন কেন, রোজ খাবেন। দুধ খান না বুঝি? তাই এমন চেহারা হয়েছে। কেন খান না দুধ?'

'কে খাওয়াবে দুধ?'

আধঘণ্টা পরে শোভাযাত্রা আসে, রাঘব মহান্তির বাড়ী ও দোকানের সামনে রাস্তার বাক ঘুরে। দূর থেকেই শোভাযাত্রার লোকসংখ্যা আন্দাজ ক'রে বীরেশ্বর অভিভূত হয়ে পড়ে, রম্ভার বুক দশহাত হয়ে ওঠে। অপ্রশস্ত মেটে রাস্তা, পাঁচ দু'জনের বেশী পাশাপাশি হাঁটতে পারে না, শোভাযাত্রা তাই অত্যন্ত লম্বা হয়ে পড়েছে। বীরেশ্বরের বাড়ীর পাশে আমবাগান পেরিয়েই তার খুড়তুতো ভাই কাশীশ্বরের বাড়ী, শেষ প্রান্ত রাস্তার বাঁক ঘুরে আসতে আসতে শোভাযাত্রার মাথা প্রায় কাশীশ্বরের বাড়ীর সামনে এসে পড়ে। শোভাযাত্রার নিঃশব্দ অগ্রগতি রম্ভার বড়ই অদ্ভুত মনে হয়। ছেলে-বুড়ো মিলে, এতগুলি গেঁয়ো মানুষ দল বেঁধে আসচে বীরেশ্বরকে সম্বর্ধনা করতে, তাদের সারি দেওয়াতে শৃঙ্খলা নেই, পদক্ষেপও এলোমেলো

অথচ হৈ চৈ চেঁচামেচি দূরে থাক, এতগুলি লোকের শুধু কথা বলাবলিতে যে কলরব গড়ে উঠত, তা পর্যন্ত শোনা যায় না। বীরেশ্বরের মুক্তি যেন পরম শোকাবহ ঘটনা, আনন্দের বদলে সকলে শোক প্রকাশ করতে আসছে।

শোভাযাত্রার সামনে জালালুদ্দিনের ভাই মহীউদ্দিনকে এবং তার পিছনে গ্রামের অনেক পরিচিত মুসলমানকে দেখে বীরেশ্বর সকলের স্তব্ধতার মানে বুঝতে পারে। তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য গাঁয়ের অর্ধেকের বেশী হিন্দু মুসলমান একত্র হয়েছে কেন তাও সে টের পায়। জালালুদ্দিন তার জন্য এই সম্মান ও সহানভূতি সৃষ্টি করে রেখে গেছে।

জ্বর গায়ে জালালুদ্দিন জেলে গিয়েছিল। দিন পনের পরে সে নিম্যুনিয়ায় মারা যায়।

চার

কৃষ্ণেন্দু থাকে নরোত্তম দাস লেনে ছোট একটি বাড়ীতে, তার দাদা পূর্ণেন্দুর সঙ্গে' বয়সে পূর্ণেন্দু তার চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড়, পড়াশোনা করেছেন অনেক, এককালে কিছুদিন দেশের কাজে উৎসাহের আতিশয্যে প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন। এখন ধীর স্থির সংসারী নিরীহ ভালমানুষ। ছোট ভাইটিকে তিনি অনেকটা বড়দাদার মত শ্রদ্ধা করেন। চাকরী করে সংসার চালিয়ে একঘেয়ে জীবন-যাপন করার জন্য তাঁর মনে বিশেষ কোন ক্ষোভ নেই, কারণ তিনি সত্যই বিশ্বাস করেন এবং অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকারও করেন যে বড় কিছু করার ক্ষমতা তাঁর নেই, তিনি উপযুক্ত নন। বলেন, 'আমরা তো অপদার্থ, আমাদের জীবনের দাম কি? কলেজে পড়ার সময় জোয়ান বয়সে একবার জেল খাটলাম ছ'মাস, বাস্, খতম হয়ে গেল দেশের কাজ। কেষ্ট তেমন নয়। ও একটানা চালিয়ে যাচ্ছে। বিয়ে যখন কবল, ভেবেছিলাম এবার বুঝি ঢিল্ পড়বে। ও কি সেই ছেলে? বিয়ের এক মাসের মধ্যে বৌমাকে পর্যন্ত কাজে লাগিয়ে দিল। ওর সঙ্গে আমাদের তুলনা?'

পূর্ণেন্দুর স্ত্রী কনক বিয়ের সময় কলেজে পড়ার আলস্যে বেশ মোটা সোটা ছিল, পাঁচটি ছেলেমেয়ে বিইয়ে আর সংসারের কাজে অবিশ্রাম খেটে খেটে মেদ ক্ষয়ে গিয়ে এখন বেশ ছিপছিপে চেহারা হয়েছে।

সে হেসে বলে, 'ওটা ঠাকুরপোর গায়ের ঝাল ঝাড়া, আমায় টানতে পারেনি কিনা।'

আজ সে হেসে একথা বলে, কিন্তু একদিন গায়ের জ্বালাতে সংসারে তীব্র অশান্তি সৃষ্টি করেছিল, শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণেন্দু আর সন্ধ্যাকে তাড়িয়েই দিয়েছিল বাড়ী থেকে। তাড়িয়ে দিয়েছিল সন্ধ্যাকে নীচু করার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর। একদিন বানিয়ে সে একটা গল্প বলেছিল কৃষ্ণেন্দুকে। হীরেন তখন সর্বদা এ বাড়ীতে আসত যেত। স্বচক্ষে সে দেখেছে হীরেন আর সন্ধ্যা--

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'তাই নাকি? তবে তো মুশকিল।'

মুশকিল" শুধু মুশকিল? কনকের এটা সহ্য হয়নি।

'আমার বাড়ীতে এসব চলবে না ঠাকুরপো। তুমি অন্য কোথাও যাও।'

তারপর কৃষ্ণেন্দু যখন জেলে, একটি মেয়েকে জন্ম দিয়ে সন্ধ্যা মরে যায়। সন্ধ্যা কাছে থেকে যে বিকার সৃষ্টি করেছিল কনকের মনে, তার প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছিল সন্ধ্যা দূরে যাবার পর থেকেই। সন্ধ্যা মরে গেছে শুনে কনকের প্রায় মাথা খারাপ হবার উপক্রম হয়।

একদিন জেলে দেখা করতে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে কৃষ্ণেন্দুর কাছে সে স্বীকার করে আসে তার বজ্জাতির কথা। কৃষ্ণেন্দুর মেয়েকেও একরকম ছিনিয়ে নিয়ে আসে তার দিদিমার কাছ থেকে। কনকের মাই টেনেই সে বড় হয়েছে। এখন তার বছর চারেক বয়স, সবাই পুতুল বলে ডাকে। কৃষ্ণেন্দুর চেহারা যেমন হোক, সন্ধ্যার রূপ দেখে চোখে পলক পড়ত না মানুষের, মনে হত সে বুঝি মাখন দিয়ে গড়া পুতুল। মেয়েটাও অনেকটা মায়ের মত হয়েছে।

সেদিন আকাশে মেঘের সঞ্চার হয়ে আছে বিকাল থেকে কিন্তু বৃষ্টি নামছে না। রাত সাড়ে এগারোটার সময় বাড়ী ফিরে কৃষ্ণেন্দু জামা খুলতে যাবে, উত্তেজনার একটা ঝাপটার মত হাজির হল মমতা।

পাশের ঘরে কনকের কাছে বসেই সে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। তবু সে হাঁপাচ্ছে। এটুকু আসার পরিশ্রমে অবশ্য নয়, উত্তেজনায়। 'দাঁড়াও বলছি। দম নিয়ে নিই।'

কৃষ্ণেন্দু আর জামা খুললো না।

কৃষ্ণেন্দু অত্যন্ত লম্বা, যেরকম লম্বা হলে লোকে তালগাছ বলে থাকে। রোগা বলে তাকে আরও বেশী লম্বা দেখায়। রোগাও সে এক অদ্ভুত ধরনের, মোটা মোটা হাড় ছাড়া গায়ে তার কোথাও মাংস নেই। দেহের স্বাভাবিক গড়নটাই তাব এইরকম, রোগে ভুগে মাংসের অপচয় ঘটে রোগা হয়নি বলে এবং শরীরের সঙ্গে মানানসই ধাঁচের লম্বাটে মুখে শীর্ণতা চোখে পড়ে না বলে, জামা গায়ে থাকলে তাকে বিশেষ খারাপ দেখায় না, খালি গায়ে তাকে দেখায় হাড়গিলের মত। মানুষের সামনে এজন্য সহজে সে জামা খুলতে চায় না— এত যে সে তেজী, আত্মবিশ্বাসী, ন্যাকামি-অভিমান-বিরোধী মানুষ, এই একটি তুচ্ছ বিষয়ে দুর্বলতা সে জয় করতে পারেনি। গায়ে তার খানিকটা হাফ-পাঞ্জাবী ও খানিকটা ফতুয়ার মত হাতকাটা জামা—সর্বদা ও সর্বত্র এই রকম জামাই সে পরে। এও একটা দুর্বলতা বৈকি। সাধারণ শার্ট পাঞ্জাবীর চেয়ে এই জামাতে যে তাকে ভাল মানায়, বেশ দেখায় তাকে এই জামা পরলে, লোকের ধারণা হয় সে বিলাসিতাবিমুখ ফ্যাশন-বিদ্রোহী সহজ মানুষ, ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ, আনমনে সে নিজেই তা জানে। চওড়া কপালের দুটি প্রান্তের বাঁক তার সুডৌল, বড় বড় টেরি না কেটে সে তাই সোজাসুজি পিছনে ঠেলে চুল আঁচড়ায়। লম্বাটে চিবুক, খাড়া নাক দিব্যি মানানসই, কিন্তু বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ দুটি অত্যন্ত খাপছাড়া দেখায়।

এদিকে দম নিতে নিতে কি হয় মমতার, হুস করে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে আর নিজের অনভ্যস্ত কান্নায় নিজেই কেমন ভড়কে গিয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে সেটা থামাতে চেষ্টা করে। হাতের চাপেই কান্নাটা যেন থামে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে শান্ত হয়।

বলে, 'এটা কি হল?'

কৃষ্ণেন্দু বলে, 'একটু কাঁদলে, আর কিছু নয়। চাপা না দিয়ে প্রাণভরে কেঁদে নিলে পারতে মমু।'

মমতা আর একবার চোখ মুছে বলে, 'না আর দরকার নেই। আমারও কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল, কি যেন হওয়া উচিত, হচ্ছে না, জোলাপ নেবার পর যেমন হয়।' বলে গম্ভীর হয় মমতা। গুরুতর কথা গম্ভীর না হয়ে বলা যায় না, বলা উচিতও নয়।—'শোন। ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে। হীরেন আমায় ত্যাগ করেছে। মানে, ও আমার ত্যাগ করেছে, আমিও ওকে ত্যাগ করেছি। আমাদের বনল না।'

কৃষ্ণেন্দু বলতে যায়, 'প্রথম কলহ হলে—'

মমতা প্রায় ধমক দিয়ে বলে, 'চুপ কর। দাম্পত্য কলহ কাকে বলে আমি জানি। এ

তা নয়। তোমার কথাই ঠিক হল কেষ্টদা। ওকে গড়ে নিতে পারলাম না, আরও বিগড়ে গেল। মানুষ ভেবেছিলাম ওকে, বেরিয়ে পড়ল অমানুষ।'

'ও তো অমানুষ নয়?'

'নয়? শোন তবে!'

অনেক সময় লাগে বলতে। অতি বোধগম্য কথাও বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে না দিলে কি কৃষ্ণেন্দু বুঝতে পারবে। কনক ধৈর্য হারিয়ে বার বার এসে উঁকি দিয়ে যায়, বলে যে কৃষ্ণেন্দু খেয়ে নিলেই পারত, এ রকম অনিয়মে কদিন তার শরীর টিকবে। শেষে সে রীতিমত রাগ করেই বলে যায়, 'বেশ, গল্প করো তোমরা সারারাত । আমি গিয়ে শুলাম।'

খিদেয় ঝিমিয়ে আসে কৃষ্ণেন্দুর শ্রান্ত শরীর। সহানুভূতির বদলে বোধ করে বিরক্তি, জাগে একটা ভাষাহীন কঠিন প্রতিবাদ। মমতার সঙ্কটের বিবরণ সে শোনে সমালোচকের মত, দরদী বন্ধুর মত নয়। তার মনে হয়, মমতা যেন তাকেও জড়িয়ে ফেলতে চইছে তার দাম্পত্য জীবনের দুর্ঘটনার সঙ্গে, দায়িত্ব আরোপ করতে চাইছে তার ঘাড়ে। মমতা তাকে সব বলছে সেই ভাবে, নালিশ না করেও মানুষ যেভাবে দুর্ভাগ্যের জন্য নালিশের ভঙ্গিতেই ভগবানকে জানায়, আমার তো কোন দোষ নেই, তবে কেন এমন হল ভগবান?

'কেন তুমি অত ব্যস্ত হয়েছিলে কেষ্টদা? কেন তুমি অত করে বলতে গিয়েছিলে ওর হয়ে? আর কিছুদিন গেলে হয়তো ওকে ঠিকমত চিনতে পারতাম।'

শুনে বড় রাগ হয় কৃষ্ণেন্দুর। মমতার নরম গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেবার জন্য হাতটা তার নিসপিস করে ওঠে। ফুটন্ত ক্রোধের বুদবুদের মত কতগুলি গাল মনের মধ্যে ফুটে উঠে ফেটে যায়—বড়লোকের স্বার্থপর খেয়ালী হতভাগা নচ্ছার মেয়ে—ন্যাকা মেয়ে!

'তোমায় দোষ দিচ্ছি না কেষ্টদা। আমিই ভুল করেছিলাম। আমি শুধু বলছি কি—'

রম্ভাও বলেছিল। এরকম হিসাব করে নয়, গোড়াতে প্রাণের আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে—'কার সঙ্গে বিয়ে দিলেন আমার?' নালিশ রম্ভাও করেনি, তাকে আত্মীয় ভেবে ওভাবে কথাটা বলেছিল, তার বিয়ের ব্যাপারে কোন সংস্রব ছিল না এমন আপন জনের কাছেও সে ওভাবেই দুঃখ নিবেদনের ভূমিকা করত। মমতাও হয়তো নালিশ করছে না, দোষ দিচ্ছে না। নিজের দায়িত্বে এতবড় ভুল করার চিন্তাটা শুধু তার সইছে না। ভুল করার সমর্থনে যত পারে যুক্তি আবিষ্কার করে সে শুধু দায়িত্ববোধটা একটু হালকা করতে চায়। নিজের ওপর এবার বিরক্তি জাগে কৃষ্ণেন্দুর। দায়িত্ব আছে বৈকি তার, নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে সে কি কাজ করতে দেয়নি এদের হৃদয় মনের ওপর, যারা আকৃষ্ট হয়েছে তার দিকে, আপন বলে জেনেছে তাকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে তার বুদ্ধি-বিবেচনাকে, আপদে বিপদে সঙ্কটে সমস্যায় ছুটে আসছে তারই কাছে সমবেদনার দাবী নিয়ে, পরামর্শ চেয়ে?

'বড় খিদে পেয়েছে মমু।'

'খিদে পেয়েছে!'

'সারাদিন ঘুরছি। চান করে খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে আলোচনা করব।'

'আলোচনা করার কিছু নেই। কি করব তা আমি ঠিক করে ফেলেছি। কিন্তু তুমি খেয়ে নাও। আমি সত্যি বড় স্বার্থপর—খালি নিজের কথা ভাবি।' মমতা থামে।—'নাইবে? নেয়ো না এত রাত্রে। মুখ হাত ধুয়ে নাও শুধু।'

দ্বিধাহীন স্পষ্ট নির্দেশ। নিজের অধিকার মমতা সত্যই জানে—একটু বেশী রকম জানে।

কৃষ্ণেন্দু চান করে খেতে বসলে মমতা তাকে জানায়, সব সে ছেড়ে দেবে ঠিক করেছে চির জীবনের মত—স্বামীকে, বাপকে, আত্মীয়-স্বজনকে, ভদ্রলোকের সংসর্গকে। আর আপসোস নয়, একসঙ্গে দুটি জগতে বাস করার মিথ্যা চেষ্টা নয়, যাদের নিয়ে তার কাজ তাদের মধ্যে সে নেমে যাবে এবার। বাড়ী পর্যন্ত সে আর ফিরে যাবে না। না, আজ রাত্রের জন্যেও নয়। নিজের বাড়িতেও দু'রাত্রি সে ঘুমাতে পারেনি। আজ সে এখানে ঘুমোবে—কৃষ্ণেন্দুর বাড়িতে। তারপর বস্তিতে হোক, গ্রামে হোক, যেখানে কৃষ্ণেন্দু তাকে কাজে লাগাবে সেইখানে চলে যাবে।

না, দু'নৌকায় আর সে পা দেবে না। বাকী জীবনের খানিকটা নয়, সবটা সে খরচ করবে চাষী-মজুরদের জন্য। ওদের মধ্যে ওদের মত হয়ে থাকবে, ওদের সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়ে ওদের একজন হয়ে কাজ করবে ওদের জন্য। মমতা শান্ত হয়েছিল, আবার তার মধ্যে উত্তেজনা ঘনিয়ে আসে। কিন্তু কথা সে বলে ধীর ভাবেই, উত্তেজনা প্রকাশ পায় শুধু তার চোখে আর যুদ্ধ-ঘোষণার উদ্ধত ভঙ্গিতে।

কনক গিয়ে রাগ করে শুয়েছিল, কিন্তু ছিল সজাগ হয়েই, কান পেতে। উঠে এসে বাড়া ভাত সে-ই কৃষ্ণেন্দুর সামনে ধরে দিয়েছে। গেলাসের জল ফেলে নতুন করে জল গড়িয়ে দিয়েছে। মমতার কথা শুনতে শুনতে তার মুখ হাঁ হয়ে আসে।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ভাই? কি বলছ এসব?'

মমতা বিরক্ত হয়ে বলে, 'চুপ কর বৌদি। তুমি এসব বুঝবে না।'

মমতা কোনদিনই কনককে বিশেষ কেয়ার করে না, এসব রাঁধা-বাড়া ছেলেমানুষ করা সঙ্কীর্ণমনা সাধারণ আত্মপরিতৃপ্ত মেয়েদের প্রতি তার একটা দারুণ অবজ্ঞার ভাব আছে—বিশেষতঃ যে সব মেয়ের কিছু করার সুযোগ ছিল। এরকম হবার জন্যেই যারা মানুষ হয়েছে ঘরের মধ্যে, তাদের বরং সে ক্ষমা করতে পারে, সইতে পারে, কিন্তু নামকরা কংগ্রেস নেতা নিরঞ্জন বসুর মেয়ে হয়ে, পূর্ণেন্দুর স্ত্রী আর কৃষ্ণেন্দুর বৌদি হয়ে যে স্বেচ্ছায় সাগ্রহে ঘরের কোণে এই স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক জীবন বেছে নিতে পারে, তাকে পছন্দ করা মমতার পক্ষে অসম্ভব। অথচ মাঝে মাঝে বেশ ভালই লাগে কনককে তার! নিজের স্বামী-পুত্র-দ্যাওরকে স্নেহ করার তার অদ্ভুত ক্ষমতা সময় সময় অসতর্ক মুহূর্তে মমতার অবহেলার বর্ম ভেদ করে মর্ম স্পর্শ করে তাকে একেবারে মুগ্ধ করে দেয়। পরক্ষণে মনে মনে হেসে সে অবশ্য সামলে নেয় নিজেকে। এতো উচ্ছ্বাস, এতো ভাবপ্রবণতা, নিছক দাসীর মনোবৃত্তি।

কথাপ্রসঙ্গে কৃষ্ণেন্দু একদিন একথা স্বীকার করেছিল, বলেছিল, 'নিশ্চয়। তবে কি জানো, ওদের পক্ষে এই ভাল। এইরকম প্রকৃতি দাঁড়িয়ে গেছে, এভাবে স্নেহ করতে না পারলেই বিগড়ে যাবে, এমনি তীব্রতার সঙ্গে তখন সবাইকে হিংসা করবে—নিজের লোককে শুধু নয়, পৃথিবীশুদ্ধ সবাইকে। কত মেয়ে ওরকম হয়ে যায়, তুমি নিজেও তো দেখেছ। রমেশ বসুর স্ত্রীকে মনে নেই? দিনরাত ঝগড়া করছে বাড়ীর আর পাড়ার লোকের সঙ্গে, স্বামীকে এক মুহূর্তের জন্য স্বস্তি দিচ্ছে না, ছেলে-মেয়েরা সবসময় সন্ত্রস্ত হয়ে আছে, ছেলের বৌ দিনরাত কাঁদছে আর গলায় দড়ি দেবার কথা ভাবছে—ওর স্নেহ করার নেশা মিটলে এমন হত না। ওরকম হওয়ার চেয়ে স্নেহপাগল হওয়া কি ভাল নয়? যার যেমন প্রকৃতি, উপায় কি বলো!'

মমতা বলেছিল, 'নিজের প্রকৃতি বদলাতে-পারে না মানুষ ? চেষ্টা করলে সংযত করতে পারে না নিজেকে?'

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'পারে বৈকি, কিন্তু সে বড় কঠিন চেষ্টা। ভাবের আবেগে ফাঁসি যাওয়া বরং সহজ, ভাবপ্রবণতা সংযত করার চেয়ে। রীতিমত সাধনার ব্যাপার। নিজে নিজে একা এ-কাজ কি সম্ভব সকলের পক্ষে? একজন মহাপুরুষ বহুকাল একটানা চেষ্টা করলে তবে এসব মানুষের স্বভাব বদল করতে পারেন।'—কৃষ্ণেন্দু হেসেছিল, 'যদিও মহাপুরুষ নই, আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম বৌদিকে বদল করে দলে টানতে। শেষে দেখলাম, সব কাজ বন্ধ করে অর্ধেক জীবন বৌদির পেছনে লেগে থাকলে তবে যদি কিছু করতে পারি। তার চেয়ে বৌদি যেমন আছেন তেমনি থাকতে দেওয়াই ভাল।'

কৃষ্ণেন্দু নীরবে খেয়ে যায়। কতকগুলি কাজ কৃষ্ণেন্দু বড়ই আস্তে আস্তে অনেক সময় নিয়ে করে, তার মধ্যে খাওয়া একটা। তিন জনেই চুপচাপ। ঘুম ভেঙ্গে পুতুল এসে বাপের গা ঘেঁষে বসে পড়ে। পাতে তখন অবশিষ্ট আছে তিনটি পটলের মোরব্বা। পুতুল গাল ঘষে কৃষ্ণেন্দুর বাহুতে। মুখ তুলে চেয়ে একটু হাসে।

কনকও হাসে—'দুষ্টু মেয়ে!'

কৃষ্ণেন্দু মাথা নাড়ে।—'না।'

কনক বলে, 'দাও না ঠাকুরপো আধখানা ভেঙ্গে? তুমি যেন কি।'

কৃষ্ণেন্দু বলে, 'না।'

কনক বলে, 'দাঁড়া পুতুল, আমি দিচ্ছি তোকে।'

আস্ত একটি মোরব্বা এনে সে বাড়িয়ে দেয় পুতুলের দিকে, বলে, 'নে। ধর।'

পুতুল নড়ে না, হাতও বাড়ায় না। কৃষ্ণেন্দুর গায়ে ঠেস দিয়ে তেমনি ভাবে বসে থেকে একান্ত নির্বিকার ভাবে বলে, 'খাব না তো।'

মুখ লাল হয়ে যায় কনকের। বাড়ানো হাত ধীরে ধীরে গুটিয়ে এনে সে মর্মাহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

কৃষ্ণেন্দু বলে, 'খাও পুতুল, নাও। জেঠিমা দিচ্ছে যে?'

তখন পুতুল সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দেয়। হাতের মোরব্বাটি উঠানে ছুঁড়ে দিয়ে কনক উঠে চলে যায় ঘরে। পাতের একটি মোরব্বা মেয়ের হাতে দিয়ে কৃষ্ণেন্দু বলে, 'খেয়ে নিয়ে জেঠিমাকে হাত ধুয়ে দিতে বলবে, কেমন?'

মমতা মন্তব্য করে, 'তোমার মনটা তো বড় দুর্বল কেষ্টদা? দেবে না বলে আবার দিলে, 'বৌদির একটু ছেলেমানুষী অভিমান হয়েছে বলে? ডিসিপ্লিন নষ্ট করলে?'

কৃষ্ণেন্দু আনমনে বলে, 'হ্যাঁ, দুর্বল বৈকি। নিশ্চয় দুর্বল। মানুষের মনটা কি জানো'—হঠাৎ সে সচেতন হয়,—'কি বলছিলে? ডিসিপ্লিন নষ্ট করলাম? ওইটুকু মেয়ের আবার ডিসিপ্লিন কিসের?'

'গোড়াতেই দিলে না কেন তবে?'

কৃষ্ণেন্দু যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মমতার মুখের দিকে। —'আমাকে তুমি কি ভাব বল দিকি মমু? মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানো? আমাকে তুমি মানুষ ভাবো না, যন্ত্রটন্ত্র মনে কর। আমি যাই বলি যাই করি, সব কিছুর একটা বিশেষ মানে থাকা চাই তোমার কাছে, উদ্দেশ্য থাকা চাই। কেন বল তো?'

'কি জানি। সত্যি ওরকম ভাবি নাকি তোমাকে?'

'মনে তো হয়। বেশী মিষ্টি খেলে পুতুলের পেট কামড়ায়, তাই প্রথমে না বলেছিলাম। একটা মোরব্বা খেলেই যে পেট কামড়াবে তার কোন মানে নেই। তাই শেষে বললাম, খাও।

অত কড়াকড়ি করা যায় না খুঁটিনাটি সব বিষয়ে।'

'তাই নাকি?' খোঁচা দিয়ে মমতা বলে, 'কড়াকড়ি কিছু কম করা হয়েছে বলে তো মনে হয় না? তুমি বললে, নিও না, বাস, ওইটুকু মেয়ে বৌদির কাছ থেকে খাবার নিলে না। তুমি বললে, নাও। অমনি ও হাত বাড়িয়ে নিলে। এ তো প্রায় মিলিটারি ডিসিপ্লিন। এটা আপনা থেকে শিখেছে মেয়েটা, না?'

এবার কৃষ্ণেন্দুর মুখ কৌতুকের হাসিতে ভরে যায়,—'বৌদি ঠিক বলেছে মমু, তুমি পাগল হয়ে গেছ। তুমি ভাবছ আমার ভয়ে পুতুল বৌদির কাছে খাবারটা নিতে চায়নি? কি বুদ্ধি তোমার! আমি দেব না বলায় ওর অভিমান হয়েছিল। আমি হার মেনে নিতে না বললে ও কি করে মোরব্বা নেয়? ছোট ছেলেমেয়ের অভিমানও চেনো না? চিনবে, নিজের হোক, তখন টের পাবে—'

'এ জন্মে আর আশা নেই টের পাবার।'

ঘরে এসে তারা বসেছে। পুতুলের সঙ্গে কনক এসে বলে, 'তোমার মেয়েকে নিয়ে আর পারি নে ঠাকুরপো। মাথা তো খেলে ওর তুমি আস্কারা দিয়ে দিয়ে? এত করলাম, কিছুতে শোয়াতে পারলাম না মেয়েকে!'

কৃষ্ণেন্দু কড়া গলায় বলে, 'পুতুল! শীগগির শুয়ে থাক গে।'

'শোব না যাও!' সোজা এগিয়ে এসে পুতুল কৃষ্ণেন্দুর কোল দখল করে বসে পড়ে। মমতার দিকে চেয়ে কৃষ্ণেন্দু অসহায়ের মত বলে, 'একদম ডিসিপ্লিন মানে না মমু।'

'খুঁচিও না কেষ্টদা, ভাল হবে না। আমার বলে মাথা ঘুরছে বোঁ বোঁ করে, তুমি তামাশা জুড়লে আমার সঙ্গে। নিজে তো খেলে পেট ভরে, আমি যে এখনো—'

কনক বলে, 'খাওনি এখনো? বেশ।'

কৃষ্ণেন্দু বলে, 'বলতে পারনি?'

'খেয়াল ছিল নাকি যে বলব?'

'কি এখন খাওয়াই তোমাকে আমি।' বলতে বলতে কনক লুচি আর বেগুন ভাজতে যান। একটু পরেই স্টোভের আওয়াজ কানে আসে। মমতার এতক্ষণে খেয়াল হয়, তার জীবনের এত বড় ওলটপালট সম্বন্ধে কৃষ্ণেন্দু এ পর্যন্ত একটি কথাও বলেনি।

'কই, কিছু ত বললে না তুমি?'

'কি বলব?'

'কি বলবে! কিছুই বলার নেই তোমার? তুমি বুঝি এখনো ভাবছ আমি ঝোঁকের মাথায় কাজটা করে বসেছি, দুদিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে?'

'ঝোঁকের মাথায় কিনা জানি না মমু। তবু আমার মনে হয় তুমি ভুল করেছ!'

মমতা ঠোঁট কামড়ে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। কৃষ্ণেন্দু তাকে সমর্থন করবে না, ভুল সংশোধনের চেষ্টাকে ভুল মনে করবে, এটা সে কল্পনাও করতে পারেনি। স্টোভের আওয়াজের মতই একটা সশব্দ ক্ষোভ যেন পাক দিয়ে উঠে তার সমস্ত সংযমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়, মনে হয় এই মুহূর্তে উদ্ভট খাপছাড়া কিছু একটা না করলে সে বাঁচবে না। হীরেন তাকে সস্তা মনে করে, তাকে হার মানায়। কৃষ্ণেন্দু মনে করে ভুল করাই তার স্বভাব।

মমতার ক্ষোভটা অভিমানে পরিণত হতে হতে কৃষ্ণেন্দু বলে, 'কি আর তোমায় বলব মমু, আমি নিজেই থতমত খেয়ে গিয়েছি। ভেবেছিলাম তুমি বুঝি এড়িয়ে যেতে পারবে।

তা হল না। এতদিন ভাসা ভাসা ভাবে চলছিল, শখ করে নিজেকে কষ্ট দেবার মজা টের পাওনি, এবার বুঝবে । মনটা ঘুরিয়ে নিতে পার না মমু? আমি জানি, তুমি একটু মন বুঝে চললে, একটু প্রশ্রয় দিলে, হীরেন বদলে যাবে।'

'তুমি আমায় কি ভাব বল তো?'

'তুমি জান না তোমায় আমি কি ভাবি?'

'জানতাম, আজ খটকা লাগছে। শখ করে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছি মানে? সব আমি ছেড়ে দিয়ে আসছি, এ হল আমার শখ! এরকম শখ কটা মেয়ের মধ্যে তুমি দেখেছ কেষ্টদা? শখ দুদিনে মিটে যাবে। তুমি বুঝি তাই ভাবছ? ভাবছ আমি পারব না? শখ মিটে গেলে ফিরে যাব? কি ধারণা তোমার আমার সম্বন্ধে। সুপ্রভা, কুন্তলা, কল্যাণী এরা যা পারছে, আমি তা পারব না।'

'তুমি পারবে না বলিনি। কি ভাবে পারবে সেটাই ঠাউরে উঠতে পারছি না। সুপ্রভারা যতটা পারে ততটা করছে—আনন্দেব সঙ্গে করছে। ওদের সব সময় নিজের সঙ্গে লড়াই করতে হয় না। নিজেকে পীড়ন করার দরকার হয় না। তুমি ওদের মত সহজভাবে স্বচ্ছন্দে কাজ করতে পারবে না মমু, যতই চেষ্টা কর। হয় তুমি ওদের ছাড়িয়ে অনেক ওপরে উঠে যাবে, অসাধারণ কাজ করবে, নয় তোমার কাজের বিশেষ কোন মূল্য থাকবে না আমার, জিদের বশে মনের জোরে কোন মতে নিজেকে টেনে নিয়ে যাবে। আদর্শের জন্য হঠাৎ ত্যাগ করা আর আদর্শের জন্য হাসি মুখে দিনের পর দিন খেটে যাওয়া ভিন্ন জিনিস। ত্যাগ করলেই যে কাজও করা যাবে এমন কোন মানে নেই। ত্যাগেব দুঃখ বরণ করা যায়, সওয়া যায়। মনে দুঃখ নিয়ে কাজ করা যায় কি ? কাজ করে সুখ পাওযা চাই—আনন্দ থাকা চাই, উৎসাহ থাকা চাই কাজের পিছনে।'

'হীরেনের জন্য খুব কষ্ট হবে সত্যি কিন্তু—'

'শুধু হীরেনের জন্য নয়। ও দুঃখের কথা বলিনি। এ দুঃখ তো কাজের আনন্দই বাড়ায় —কাজটাই অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় মানুষের —অবশ্য যদি কাজের দিকে মন যায়। আমি বলছি নতুন জীবনের দুঃখ-কষ্টের কথা। তোমার হয়তো ভাল লাগবে না, তবু তোমাকে জোর করে চালিয়ে যেতে হবে। তখন তোমাকে দিয়ে যেটুকু কাজ হবে, যে কেউ তা পারবে।'

'ভাল লাগবে না? এতদিন যা করছি তা ভাল লাগবে না?'

'এতদিন যে একভাবে করেছ। এখন অন্যভাবে করতে চাইছ।'

'অন্যভাবে মানে?'

'মানে? এই যেমন ধর, কানুর ছেলে আর বৌটার বসন্ত হয়েছে শুনে ছুটে দেখতে গিয়েছিলে, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে টাকা দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এসেছিলে। তুমি চাইছ এবার থেকে ও অবস্থায় শুধু ওইটুকু না করে একেবারে শিয়রে বসে সেবা করবে।'

'তাই যদি হয়? সেবা করতে পারব না ভাবছ তুমি?'

'পারবে না কেন? কিন্তু ভাল লাগবে কি না তাই ভাবছি।'

'তার মানে তুমি বলতে চাও ওদের জন্য আমার আসলে দরদ নেই?'

'দরদ থাকাটাই সব নয় মমু। হীরেনের জন্য তোমার দরদ কম নয়, কিন্তু ওর জন্য তো—'

মমতা অধীর হয়ে বলে, 'এসব আজে-বাজে তর্ক রাখো কেষ্টদা। কাল থেকে আমায় কাজে লাগিয়ে দাও।'

সিগারেট ধরিয়ে কৃষ্ণেন্দু একটু ভাবে।

'নিজের বাড়ী ফিরে যাবে না কেন মমু? তোমার বাবা কি দোষ করলেন?'

'তুমি বুঝতে পারছ না। হীরেন কি মনে করে জানো? আমার বাবার অনেক টাকা আছে বলে আমার এত তেজ, কাউকে গ্রাহ্য করি না। তোমার মত হীরেনও বিশ্বাস করে না, আমি সত্যি কুলি মজুরকে ভালবাসি, ওদের জন্য প্রাণ দিতে পারি। বড়লোকের মেয়ে হয়ে জন্মে যেন মস্ত অপরাধ করেছি।'

হীরেনের জন্য? হীরেনকে মমতা দেখাতে চায় তার মধ্যে ভেজাল নেই, সে খাঁটি সোনা? কৃষ্ণেন্দু জানে এটা খাপছাড়া কিছু নয়, দোষেরও নয় মমতার পক্ষে। নিজেদের কক্ষচ্যুত করার সাধ মমতাদের এইরকম কারণ থেকেই জাগা স্বাভাবিক। এরকম একটা অথবা কতগুলি সাধারণ কারণ না থাকলে নতুন আবেষ্টনীতে নতুন জীবনে নতুন সার্থকতা খুঁজবার কথাটা এদের মনেই বা পড়বে কেন। তার নিজের বেলাতেও ঠিক এই ব্যাপার ঘটেনি? অভাগাদের চেয়ে তাকে বেশী টেনেছিল ওদের হয়ে লড়াই করার রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার, বাহাদুরীর মোহ। তবু মানুষের কাছে অকস্মাৎ নৈর্ব্যক্তিক আচরণ প্রত্যাশা করার মত বোকামি যে কিছু নেই, কৃষ্ণেন্দু আজ যেন তা ভুলে যায়। মমতাকে তার মনে হয় নিজের মনের মোহের বাষ্পে ফাঁপিয়ে তোলা ফানুষ। মনে হয়, মমতাকে সে চিনতেই পারেনি এতকাল—চিনতে চায়নি বলে। নিছক নিজের প্রয়োজনেই সে এই সুন্দরী শিক্ষিতা ভাবময়ী বুদ্ধি-বিলাসিনী বালীগঞ্জী ধাঁচের সাধারণ ধনীকন্যাটিতে অসাধারণত্ব আরোপ করে কাছাকাছি রেখেছে। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমেব পর যেমন রেখেছে এই নিরালা গৃহের কোণে কনকের ঘরোয়া স্নেহ যত্ন, পুতুলের মায়া আর ঘুমের বিশ্রাম, তেমনি রেখেছে রূঢ় বাস্তবতার ঘষায় ছড়ে যাওয়া মনের জন্য মমতার সাহচর্যের মলম। মমতার মধ্যে যেটুকু খাপছাড়া সে শুধু তারই প্রভাবের প্রতিক্রিয়া। ওর জগতের অন্য যে কোন মেয়ে এভাবে তার সংস্পর্শে এলে মমতাব মত হতে পারত!

সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে হাকিমের রায় দেওয়ার সুরে কৃষ্ণেন্দু বলে, 'বেশ। কাল সুপ্রভা চাটগাঁ যাবে। তুমিও ওর সঙ্গে যেও।'

কিন্তু বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে করতে ধাতস্থ হয়ে কৃষ্ণেন্দু মত বদলায়। নিজেকে বড় অপদার্থ মনে হয় তার। এত দিন কেটে গেল এত কাজে, এত জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হল, এখনো তার এ দুর্বলতা রয়ে গেছে! কবে আর তবে সে জয় করতে পারবে মনের এই দীনতা? কবে সংশোধন হবে? মন যার গড়ে উঠতে সে দেয় নি, কেন সে তার কাছে অসম্ভব প্রত্যাশা রাখে, তাকে বিদায় করে হিংস্র সমালোচকের মত? শাস্তি দিতে, ভেঙ্গে ফেলতে চায়? অনেকক্ষণ ছটফট করে কৃষ্ণেন্দু ঘুমায়। নরেশকে যেদিন সে মেরেছিল, সেদিন রাত্রেও বিছানায় শুয়ে সে এমনিভাবেই ছটফট করেছিল।

তাই, বাস্তবের কষ্টিপাথরে নিজেকে যাচাই করে নেবার সুযোগ মমতাকে দেওয়া কৃষ্ণেন্দু উচিত বিবেচনা করল বলে, অজানা অচেনা চাটগাঁর বদলে মমতা বাস করতে এল রম্ভাদের বাড়ী। বস্তি তার চেনা, বস্তির মানুষের সঙ্গে তার কারবার ছিল। এদের সঙ্গেই তাঁর আগে ঘনিষ্ঠতা হোক।

এটা বড়ই বাড়াবাড়ি হল সন্দেহ নেই। কিন্তু বাড়াবাড়িই করতে চাইছিল মমতা। রাতারাতি একটা বিপ্লব না হলে তার চলছিল না—নিজের জীবনে। হীরেনকে তার বুঝিয়ে দিতে হবে

তার জীবনে আপোস নেই, জোড়াতালি সে চায় না। কৃষ্ণেন্দুর কাছেও প্রমাণ দিতে হবে প্রাসাদের চেয়ে খোলার ঘর তার প্রিয়।

'তুমি মিথ্যে ভাবছ। মিছে তর্ক তুলছ আমার শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার রুচি অভ্যাসের। দেখো, সাতদিনের মধ্যে আমি ওদের সঙ্গে একেবারে এক হয়ে যাব।'

'তা হলে তো মুশকিল। শেষে তোমায় না ঘণ্টার পর ঘণ্টা বোঝাতে হয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার দরকার। গা রগড়ালে মাটি উঠবে না তো মমু?'

বাড়ীতে ঘর খালি ছিল না একটিও। সুরেশ আর নরেশকে ঘর ছেড়ে দিতে হয় মমতার জন্য। নরেশের থাকার ব্যবস্থা হয় দুর্গার ঘরে। দর্জি গোপালেরও দু'খানা ঘর, তার পরিবারের মেয়েপুরুষ কজনকে চেলে নিয়ে একটা ঘরে তার দুই ছেলে আর জামাইয়ের সঙ্গে সুরেশকে থাকতে দেওয়া হবে স্থির হল। কাজ থেকে বাড়ী ফিরে খবর শুনে সুরেশ গেল চটে।

'ধুত্তেরি যতো সব—ওই শালী এসে থাকবে এখেনে, ওই বেম্মো মাগী? থাকো তোমরা—আমি বাবা চললাম।' বলে সে সুবালার ওখানে চলে গেল। দিন তিনেক সত্যই তার টিকিটি দেখা গেল না।

মমতা নিজে এসেছিল। মিষ্টি করে হেসে সুন্দর করে সবাইকে জানিয়ে গিয়েছিল যে তাকে যেন সবাই আপন মনে করে। ভদ্রলোকদের সে ঘেন্না করে, তাই একেবারে ছোটলোক বনে গিয়ে এদের সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়।

সে চলে যাবার পর লক্ষ্মী সকলের মনের ভাবকে প্রথমে ভাষা দিল, 'মোরা ছোট লোক।'

দুর্গা বিশদ করে বলল, 'খালি ডিঙ্গি মেরে বেড়ালে বিগড়ে যাবে না মাথা মেয়েলোকের? বাপ সোয়ামীর টাকায় মোটর চাপেন, পুরুষ চাখেন, কিচির-মিচির করেন দিনরাত। কতকাল আর ভাল লাগে বল? এমনি ঢং করতে হয় তখন।'

'মোদের তরে জীবন দেবে গো জীবন দেবে!' বলে বিন্দের বৌ।

'এখানে জীবন দিতে আসা কেন?' পুষ্প শুধোয়।

'টাকার গরম বড় গরম।' ক্ষান্ত পিসী মন্তব্য করে।

রম্ভা মোড় ঘুরিয়ে দেয় কথার।—'কি যে বল সব তোমরা? ছি ছি! বড়লোকমি দেখলে কোথা ওর, টাকার গরম? কেষ্টবাবুর শিষ্য উনি জানো না? নিজে গড়ে পিটে মানুষ করেছেন ওকে কেষ্টবাবু?'

সবই চেপে গেল তারপর, শুধু লক্ষ্মী ছাড়া। 'রাজা করেছেন।' বলল লক্ষ্মী।

ধুয়ে মুছে সাফ করে রাখা হল ঘরখানা মমতার জন্য। জিনিষপত্র সামান্যই সঙ্গে আনল মমতা। একটি বড় আর একটি মাঝারি চামড়ার স্যুটকেশ, বিছানাপত্র এবং বেতের বাস্কেটে একজনের মত সদ্য কেনা কম দামী বাটি ঘটি গেলাস কেটলি চায়ের কাপ ইত্যাদি তৈজসপত্র। আসবার এলো না একটিও। পায়ার নীচে ইট দিয়ে উচু করা পুরানো যে তক্তাপোষটি ছিল ঘরে, তাতেই পাতা হল বিছানা। দড়ি টাঙ্গিয়ে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা হল কাপড় জামা গামছা। ভুল করে মমতা মস্ত ভারি তোয়ালে এনে বসেছিল, কিন্তু স্যুটকেশ থেকে সেটা বার না করে একটা গামছা কিনে আনিয়ে ভুলটা সে সংশোধন করে নিল সঙ্গে সঙ্গে। আসবাবের অভাবের দিক দিয়ে একটা বাড়াবাড়ি হল মমতার। রম্ভার ঘরে, দুর্গার ঘরে, গোপালের ঘরে কাঠের আলনা আছে, দু'একটা চেয়ার আছে কাঠ আর লোহার, টেবিলও যে নেই কেরোসিন কাঠের তাও নয়।

কোথায় খাবে মমতা? কি খাবে?

রম্ভার সংসারে, তারা যা খায়।

সকালে পৌঁছেই কথাটা খোলসা করে নিল মমতা।—'শোন বলি, দুজনে আমরা ভাগাভাগি করে রাঁধব। তোমরা যা খাচ্ছ আমিও তাই খাব, বেশী কিছু আয়োজন করতে পাবে না আমার জন্যে। আমি খাব বলে যদি একটা পদও বেশী রান্না কর ভাই, ভারি রাগ করব কিন্তু বলে রাখছি।'

'কি করে জানবেন আমরা কি খাই, কি খাওয়াই আপনাকে?'

'সে আমি টের পাব। তুমি বলতে বললাম যে আমাকে?'

'বলব—বলব। অভ্যেস কি সহজে কাটান যায়? কিন্তু এত কষ্ট করবেন কেন? নিজের পয়সায় খাবেন যখন, ভাল জিনিস খাবেন। আমাদের খাওয়া আপনার সইবে কেন?'

'সইবে। যত ভাবছ, অত দুধ ঘি পোলাও খাই না আমি। শাক চচ্চড়ি খেতে জানি।'

কিন্তু আসবারহীন সোঁদাগন্ধী আধো-আঁধার ঘরে তক্তাপোষে বিছানা পেতে দড়িতে কাপড় ঝুলিয়ে শাকচচ্চড়ি খেয়ে থাকবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এলেও সকলের খাপছাড়া অভ্যর্থনা তাকে অপ্রস্তুত করে দিল। কাল এ বাড়ীতে আসামাত্র সকলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, মৃদু উত্তেজনা, হাসি মুখ আর নিরীহ সম্মানসূচক ভঙ্গি দিয়ে নীরব অভ্যর্থনা জানিয়েছিল ঃ এসেছেন? আমরা খুশী হয়েছি। আজ সে ভাবে সবাই তো এল না। রম্ভা, দুর্গা, নরেশ, রামপাল এরা ক'জন মাত্র এল। চৌকাঠ ডিঙ্গোবাব সময় ভিতর থেকে কলরব কানে এসেছিল, ভিতরে ঢোকা মাত্র সে কলরব হঠাৎ গিয়েছিল স্তব্ধ হয়ে। তার আবির্ভাব যে সবাই শুধু টের পেয়েছে তা নয়, মমতা বুঝতে পেরেছিল, সবাই রীতিমত প্রতীক্ষা করছিল কখন সে আসে! অথচ যে যার কাজেই আটকে রইল, কাছে এল না। উঠানে কলতলায় যাবা ছিল তারা শুধু ঘাড় ফিরিয়ে দেখল দু'চারবার। বাসন হাতে সামনে দিয়ে যাবাব সময় বিন্দের বৌ দাঁড়ালো না, একটু হাসি দেখিয়ে চলে গেল।

পরে অবশ্য সকলেই এল, ঘণ্টাখানেক ঘণ্টা দেড়েক পরে। এক সঙ্গে নয়, একে দু'য়ে। তাব অপকর্মের সূচনার সময় এরা যেন দায়ভাগী হবাব ভয়ে কাছে ঘেঁষেনি, নিজেব দায়িত্বে তাকে আরম্ভ করার অবসর দিয়ে কর্তব্য পালন করতে এসেছে,—দু'চার মিনিটের জন্য। আসে আর দু'চার কথা বলে চলে যায়। সকলের অস্বস্তিবোধ, তাকে এড়াবার চেষ্টা, মমতাকে বিস্মিত এবং আহত করে।

দুর্গা এক সময় গম্ভীর মুখে তাকে জানায় ঃ 'এখানে আসা ঠিক হয়নি আপনার। ক'দ্দিন গা ঢাকা দিতে পারবেন এখানে? পাড়ায় জানাজানি হবে, পুলিশের কানে খবর যাবে। দূর দেশে পালিয়ে যেতে পারতেন কোথাও।'

'পুলিশের ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছি ভেবেছ নাকি তোমরা?'

'দ্যাননি?' দুর্গাব গলার সুরে চোখের দৃষ্টিতে অবিশ্বাস।

'ও! তাই তোমরা ভয় পেয়েছ! কিন্তু কাল যে তোমাদের বলে গেলাম, তোমাদের সঙ্গে ভাব করতে এসেছি?'

'বলে তো গ্যালেন।'

রম্ভাকে মমতা বলল, 'এরা এসব কি ভাবছে রম্ভা?'

এরা ভাবতেই পারছে না আপনি কেন এখানে এসে থাকবেন। কাল বিন্দে পুলিশের কথাটা তুলল, সবাই ভাবল তাই হবে বুঝি তাহলে। সত্যি- নয়, না?'

উদ্‌গ্রীব প্রশ্ন। সত্যি হলে যেন ভারি খুশী হয় রম্ভা!

না না, সত্যি নয়। কি সব আজগুবি কথা! তুমি এক কাজ কর তো ভাই, সবাইকে ডাকো একবার। ভাল করে বুঝিয়ে বলি।'

রম্ভা ভেবেচিন্তে বলল, 'থাক না কি দরকার? যে যা ভাবছে। আপনা থেকে ঠিক হয়ে যাবে দুদিনে।'

কিন্তু মমতার কি ধৈর্য ধরে। সে ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না, না তুমি ডেকে আনো ওদের

তবু ইতস্ততঃ করে রম্ভা।—'কি লাভ হবে বলুন? এ কথাটা বুঝিয়ে দেবেন, ওরা আরেকটা কথা ভাববে! একটা লাগসই কারণ তো থাকা চাই আপনার এখানে আসার? মিছিমিছি এমন কেউ আসে?'

'কারণ তো বলেছি সবাইকে?'

'ওটা সবাই ঠিক ধরতে পারছে না।'

মমতা স্তম্ভিত হয়ে যায়। এত করে বুঝিয়ে দেবার পরেও তার এখানে আসার সহজ সরল সঙ্গত ও মহান কারণটা সবাই ধবতে পারছে না! খাপছাড়া উদ্ভট কারণ আবিষ্কারের প্রয়োজন হচ্ছে এখানে তার আবির্ভাবকে স্বীকার কবতে!

'তুমিও বোধ হয় পারছ না ধরতে?'

'তা নয়, মানে আর কি, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

খানিক গুম্‌ হয়ে থেকে মমতা বলল, 'ডাকো তো সবাইকে।'

নিজেকে ব্যাখ্যা করে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিল মমতা। তাদেব জন্য সে স্বামী ছেড়েছে, স্বামীর ঘর ছেড়েছে, বাড়ী ছেড়েছে, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে ছেড়েছে, তাদের সঙ্গে সে যে এক হয়ে যেতে চায় এবং কেন চায়, সমস্তই সে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিল সকলকে।

তবু, এমন হাঁ করে তাকিয়ে থেকেই সবাই শুনল কথাগুলি যে তারা বুঝল কি বুঝল না এ বিষয়ে বেশ একটু খটকা রয়ে গেল মমতার মনে।

তারপর রম্ভার বান্নাঘরে গিয়ে মমতার মনটা হোঁচট খেল নোংরামিতে। ব্যথায় কনকনিয়ে উঠল মনটা। এসব বাড়ীতে সে এসেছে অনেকবার কিন্তু কারো রান্নাঘরে ঢোকেনি কোনদিন প্রথমে মনে হল, ধোঁয়ার কালচে মারা সেঁতসেঁতে নিরন্ধ্র সঙ্কীর্ণতাটাই বুঝি চরম নোংরামি। তারপর চোখে পড়ল চলটা তোলা এবড়ো খেবড়ো মেঝে, শীতকালে পথে পড়া ভিখিরির চামড়ার মত দেয়ালের ফাটল ধরা ফোঁড়া ওঠা গোবর মাটিব চোলকা, ধূলো তেল কালি ল্যাপটানো হাড়ি কলসী, তেলমসলার পাত্র রাখার আধ হাত উঁচু বেদী, জল বেরোবার নালা, ভাতের হাড়ি, তরকারীর ঝুড়ি, কয়লা রাখার ভাঙা কড়াই, মাকড়সা, টিকটিকি, আর্শোলা

রম্ভা কথা কয়। মমতা ঠায় বসে থাকে পিঁড়িতে। ক্রমে ক্রমে তার চোকে ধরা পড়ে, রীতিমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে রান্নাঘরটি, যতটা সাধ্য ও সম্ভব ততটা। নোংরামি যা আছে সেটা স্বাভাবিক, কারো ক্ষমতা নেই সেটা দূর করে, কয়লা ধুয়ে কালি সাফ করার মত। বাসনগুলি মেজে ঝকঝকে করেছে রম্ভা, কিন্তু এই গর্ত আর ফাটল ধরা মেঝেকে সে ধুয়ে মুছে কি করে মার্বেল পাথর করবে, কি করে তাড়াবে আনাচে কানাচে নিরাপদ আশ্রয়ের মধ্যে থেকে যে আর্শোলার দল শুঁড় নাড়ছে তাদের!

স্নানের আগে মমতা গেল পায়খানায়। ফিবে এল বিবর্ণ মৃতপ্রায় হয়ে। দশ বছর বয়সে প্রৌঢ় প্রাইভেট টিউটর ধরণীবাবু অত্যাচার করার পর যে অবস্থা হয়েছিল তেমনি দেহমন নিয়ে।

সাবান হাতে স্নান করতে গেল কলতলায়। পুরো পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে! মুখ! চারিদিকে চোখ!

দাঁতে দাঁত লাগিয়ে কাঁপতে কাঁপতে গায়ের জোরে সায়া ব্লাউজ খুলে ফেলল। গুমোটের গরমে সর্বাঙ্গ ঘেমে গেছে, কিন্তু জল ঢালতে ঠিক যেন জ্বরতপ্ত গায়ের মত ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল তার গা।

ছারপোকার কামড়ে রাত্রে তার ঘুম হল না। তক্তাপোষ আর মনের ছারপোকার কামড়ে।

সারাদিনে একজনকেও সে আপন মনে করতে পারেনি। নিজের টনটনে স্নায়ুগুলিকে স্বস্তি দিতে সে ঘরে ঘরে ঘুরেছে সারাটা দুপুর। মেয়েপুরুষের আসর বসিয়ে সন্ধ্যার পর, সকলের সঙ্গে গল্প করেছে, নিজে গান গেয়ে শুনিয়েছে আর রামপালের গান শুনেছে, কথা কইবার চেষ্টা করেছে ভোঁতা অমার্জিত ভাষায়, হাসবার চেষ্টা করেছে অভদ্র রকমে। ঘরে ঘরে সবাই হয়ে থেকেছে ভীত, সন্ত্রস্ত, সন্দিগ্ধ, আসরে সবাই হয়ে থেকেছে কাঠ। যদি দুচার জন হেসেছে কখনো, সে হাসি হয়েছে সম্মানীয়া একজনের হাস্যকর পাগলামী দেখে ঝি-চাকর যেভাবে হাসে। আর লণ্ঠনের আলোয় সে কি বিষণ্ন হতাশ সন্ধ্যা —বিষণ্নতার ঘনায়মান রাত্রি। কোনমতেই মমতা শেষপর্যন্ত সেই গুরুভার গভীর নিরাশার ক্রমিক সঞ্চারকে ঠেকাতে পারেনি। ঝিমিয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল শেষের দিকে।

আরও কি ভয়ানক শ্বাসরোধ করা ফাঁদে সে পড়েছে দ্যাখো। হার মানা মানে দাঁড়িয়ে গেছে শুধু হীরেন আর কৃষ্ণেন্দুর কাছে নয়, এদের কাছেও হার মানা। এদের আপন না করে এখন পালিয়ে গেলে এরা তাকে টিটকারি দেবে, কোন মর্যাদাই আর থাকবে না তার এদের কাছে। রাতদুপুরে কি অসহায় যে নিজেকে মনে হয় মমতার! সুযোগ পেয়ে শৈশবের ভূতের ভয় পর্যন্ত যেন ভিড় করে আসে তাকে কাবু করতে।

পরদিন সকালে কৃষ্ণেন্দু আসে। বলে, 'একি চেহারা হয়েছে তোমার মমু? ছি, কত করে তোমায় বললাম—'

মমতা উদ্ধত ভঙ্গিতে বলে, 'কি বললে? দোহাই তোমার, উপদেশ দিও না। আমি জানি, তুমি আমার মন ভাঙতে এসেছো। প্রমাণ করতে এসেছ তোমার কথাই ঠিক। তা হবে না কেষ্টদা, আমায় তুমি তেমন মেয়ে পাওনি।'

'তাই দেখছি।'

'কি দেখছো? চেহারা খারাপ হয়ে গেছে একদিনে? চোখের নীচে কালি পড়েছে? আমিও আয়নায় দেখেছি নিজের চেহারা। এটুকু তো হবেই। আমি কি আরাম করতে এসেছি এখানে?'

কৃষ্ণেন্দু চলে যাবার আগে কি যেন সব রম্ভা তাকে বলে চুপি চুপি। বুকটা জ্বলে যায় মমতার। রম্ভা নিশ্চয় কৃষ্ণেন্দুকে তার কালকের পাগলামির বর্ণনা শোনাচ্ছে।

পাগলামি? কিসের পাগলামি! এরা তো মনে করবেই এদের ভালো করার চেষ্টাকে পাগলামি, সেজন্য তার দমে গেলে তো চলবে না! অন্ধকারের বঞ্চিত জীব এরা, এরা কি করে প্রত্যাশা করবে যে আলোর জগৎ থেকে কেউ তাদের এই নরকে নেমে আসতে পারে তাদের আলো দেবার জন্য। চোখ এদের ঝলসে গেছে, এরা চমকে গেছে, ভড়কে গেছে, ভয় পেয়েছে, অবিশ্বাস করছে।

'কদিন তুমি এসো না কেষ্টদা। আমি না ডাকলে এসো না।'

'বেশ।'

আহত ও ব্যাহত একগুঁয়ে জেদী অভিমানী মানুষের উদ্দীপ্ত উদ্যমে মমতা আবার লড়াই শুরু করে। নতুন করে ভাবে। মনে হয় তার আত্মবিশ্বাসে যেন জোয়ার এসেছে নতুন করে। সোজাসুজি আপন করা আর আপন হওয়ার স্পষ্ট মুখর অনাবৃত চেষ্টা সে ছেড়ে দেয়। ভাবে যে কাজের মধ্যে এদের কাছে টানতে হবে, এদের ভালো করার চেষ্টা দিয়ে, সংস্কার ও সংশোধনের সাহায্যে। এখানকার জীবনটা সইয়ে নেবার পক্ষে তার নিজেরও তাতে সাহায্য হবে।

চোখ মেলে তাকায় মমতা আর চারিদিকে ছোটবড় অসংখ্য ত্রুটি চোখে পড়ে, কথার, কাজের, ব্যবহারের, স্বভাবের, জ্ঞানের, বুদ্ধির, চিন্তার, ধারণার, ভাবের, অনুভূতির—সব কিছুর খুঁত! তার খাতিরে একটা দুটো দিন সকলে সংযত হয়ে থাকে, অত্যন্ত রূঢ় ও স্থূল স্বরূপগুলির প্রকাশ চেপে রাখে কোনমতে, কিন্তু তারপর আর ধৈর্য থাকে না কারো। কতদিন থাকবে মমতা তারো তো ঠিক নেই, তার মুখ চেয়ে কাঁহাতক মানুষ স্বভাব এড়িয়ে বাঁচিয়ে ভদ্রভাবে চলতে পারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য? ঝগড়া, গালাগালি, হীনতা, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, দুর্নীতি, মাতলামি সব একে একে আবির্ভূত হতে থাকে সাময়িক ও সংক্ষিপ্ত অন্তর্ধানের প্রয়োজন শেষ করে, সঙ্কোচের বাধা ঠেলে।

মমতা স্তম্ভিত হয়ে যায়। বুঝতে পারে, মাঝে মাঝে এসে আর মাঝে মাঝে কাছে ডেকে যাদের সে চিনত, এরা তারা নয়। ধরা এরা তার কাছে কোনদিন দেয়নি। নিজে সে যে পরিচয় নির্দিষ্ট করে দিতে চেয়েছে এদের জন্য, এরা নির্বিবাদে সেই পরিচয়ই গ্রহণ করছে তার কাছে পরিচিত হবার জন্য। বাছা বাছা দুঃখের কথা বলেছে, নিরীহ ভীরু হয়ে থেকেছে, সায় দিয়ে গেছে তার কথায় ও ইচ্ছায়। এদের সে যেমন ভাবতে চেয়েছিল এরা তাকে তেমনি ভাবতে দিয়েছে। কখনো প্রতিবাদ করেনি। নিজেদের আসল জীবন থেকে এমন একটি টুকরোও তার সামনে উপস্থিত করেনি, তার ধারণার সঙ্গে যা খাপ খায় না। কত কথাই এদের মত শত শত মেয়ে-পুরুষ বলেছে তার কাছে, তবু কেন যে কোনদিন কেউ নিজেকে চিনিয়ে দেবার জন্য একটি কথাও বলেনি, সেটাও মমতা এখন বুঝতে পারে। এরা জানে না পরিচয় দিতে। এরা জানে না পরিচয় দেবার প্রয়োজন। এরা মানেই জানে না পরিচয় দেবার। এরা জানেও না নিজেদের পরিচয় কি!

কি সে ভেবেছিল এদের! বঞ্চিত নিপীড়িত দুঃখী ও নিরীহ একদল মানুষ, ধুঁকতে ধুঁকতে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে প্রাণহীন ভোঁতা শূন্য জীবন যাপন করে। আঘাত পেলে কাঁদে, দু'হাত শূন্যে তুলে আকাশের দিকে মুখ করে বলে, ভগবান!—আবার ঝিমিয়ে যায়। অথচ চোখের সামনে আজ সে দেখেছে এদেরই একটানা বিস্ফোরণের মত সংশয়হীন প্রাণপূর্ণ প্রচণ্ড সংঘাতময় আত্মঘাতী জীবনের লীলা।

পাড়ার কয়েকটি বাড়ী ঘুরে এসে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়ে যায় তার কাছে। আগে যেমন জানত তেমনি যেন হয়ে গেল ওসব বাড়ীর মানুষগুলি তার সামনে, জীবনটা তাদের চলে গেল নেপথ্যে—অন্য জগতের অপরিচিত মানুষের সামনে রুগ্ন শিশুর যেমন যায়।

মমতার মনে হল, এদের সঙ্গে তার ব্যবধান বেড়ে গেছে—অনেক দূরে চলে গেছে এরা। ব্যবধান অবশ্য যা থাকবার তা ছিলই—মমতার কাছে সেটা ধরা পড়েছে মাত্র। কিন্তু সেজন্য বিব্রত বা বিচলিত হওয়ার বদলে সে যেন খুশীই হল ভেবে চিন্তে। একটা গুরুতর সত্য সে আবিষ্কার করেছে, কৃষ্ণেন্দুও হয়তো যার হদিস পায়নি। সে উৎসাহ বোধ করে। কোমর বেঁধে উঠে পড়ে কাজে লেগে যায়। বলে, 'না। কলতলায় জল নিয়ে ঝগড়া চলবে

না। ঝগড়া করে লাভ কি বলো? জলের পরিমাণ কি তাতে বাড়বে? সবারি জল চাই—সবাই যাতে জল পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। এক বাড়ীতে মিলেমিশে শান্তিতে থাকতে হলে কি কে আগে এসেছে কে পরে এসেছে এই নিয়ে ঝগড়া করা চলে? তুমি তো দু'কলসী নিয়েছ ক্ষান্ত পিসী, এবার রাণীর মাকে দু'কলসী নিতে দাও। গোপাল, তুমি পুরুষ হয়ে ঝগড়া করতে এসেছ মেয়েদের সঙ্গে? তোমাদের বেশী জল দরকার তা জানি। আমি আজ হিসেব করে নিয়ম বেঁধে দেব, কার পর কে নেবে, কতটা করে নেবে। দু'তিন দফায় জল নিতে হবে তোমাদের। একজন হাড়ি কলসী বালতি সব ভর্তি করবে আর আরেকজনের জলের জন্য রান্নাবান্না বন্ধ হয়ে থাকবে, সেটা তো ভাল নয়।'

গোপালের বৌ বলে, 'ওতে কি টানাটানি কমবে দিদিমণি? সবার কুলোয় না জলে। ক'বাঁক জল যদি আনিয়ে দ্যান মালীকে দিয়ে রাস্তার কল থেকে—'

'বেশ তো। সবাই মিলে চাঁদা তুলে—'

'চাঁদা? এর জন্যে আবার চাঁদা?' রাণীর মা তোয়াজের হাসি হেসে বলে, 'দুটো কি তিনটে টাকা তো নেবে মালী। ঘরে আপনার লাখ টাকা পচছে, দুটো তিনটে টাকার জন্যে চাঁদা তুলবেন কি বলছেন, মাগো মা হাসির কথা!'

সুযোগ পেয়ে মমতা তাদের দশ কথা শুনিয়ে দেয়। ভাল ভাল কথা, খাঁটি উপদেশ। নিজেদের উপর নির্ভর না করে পরের ভরসায় থাকলে যে কোনদিন কিছু হবে না এই বিষয়ে উপদেশ।

'জল আনার ব্যবস্থা আমি করিয়ে দিচ্ছি কিন্তু তোমরা নিজেরা মিলে মিশে ব্যবস্থাটা করে নিলেই আমি খুশি হতাম।'

সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন ওঠে চারিদিকে।

'ও বাবা, কাজ নেই জলে মোদের, খুশী মনে না দিলে।'

'তিনটে টাকার জন্য এত!'

'এতকাল চলেনি মোদের? মিলেমিশে চালাইনি মোরা?'

মমতা ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, 'তোমরা রাগ করছ কেন? কথা বুঝছ না কেন আমার? তোমাদের কি এই একটা অভাব? এটা মিটলেই সব দুঃখ-দুর্দশা শেষ হয়ে যাবে? সবাই মিলে না করলে দুঃখ তোমাদের কোনদিন ঘুচবে না। কিসে মিলবে তোমবা? এই সব অভাবের প্রতিকার চেয়ে কাজ করার তাগিদেই মিল হবে তোমাদের। প্রথমে এ বাড়ীর সবাই মিলবে, তারপর পাড়ার সবাই, তারপর দেশ জুড়ে। তখন কে ঠেকাবে তোমাদের? এই কথাটাই বোঝাতে চাচ্ছি তোমাদের। আবোল-তাবোল কথা মনে আসছে কেন তোমাদের?'

'মনটাই যে মোদের আবোল-তাবোল গো দিদিমণি!' বলে লক্ষ্মী হাসে।

পরদিন ভোরে উঠে মমতা খালধারে একটু বেড়াতে গেছে, ফিরে এসে দ্যাখে, কলতলায় কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। তার তালিকা অনুসারে প্রথম দফায় প্রয়োজন মত প্রত্যেক পরিবারের কে এক থেকে তিন বালতি বা কলসী জল পাবার কথা। গোপালের বৌ বিরাট একটি বালতি এনেছে কোথা থেকে, রাণীর মা এনেছে তার চাল রাখার মাটির জালাটি। এই হল ঝগড়ার একটা কারণ। আরেকটি কাবণ হয়েছে শিউশরণ। বিতরণের প্রথাটা কাল মেনে নিলেও আজ সে গোলমাল সুরু করে দিয়েছে। লোক কম হলেই জল কম লাগবে কেন তার মানে সে বোঝে না। লোক কম বলে ঘরের ভাড়া কি কম নেওয়া হয় তার কাছে? গোড়ায় বেশী তেজ দেখায়নি শিউশরণ, জগদম্বা আর পুষ্প তার পক্ষ নেওয়ার পর সে একেবারে

মারমুখো হয়ে উঠেছে।

দু'বাঁক জল দিয়েই মালী চলে গেছে, আর সে জল দিতে পারবে না। চার টিন জলের মধ্যে রম্ভা আর দুর্গা নিয়েছিল দু'টিন, গোপালের বৌ নিয়েছিল দেড় টিন। অন্যেরা আড় চোখে দেখেছিল চেয়ে চেয়ে। আধটিন জল নিয়ে মালী যেই গেছে বিন্দের ঘরের দিকে, সে কি রাগ আর গালাগালি বিন্দের! টিন উল্টে দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে সে বলেছে, 'যা যা ওদের দিগে যা। দিদিমণির পেয়ারের লোককে দিগে যা। ওখানে টিন টিন জল দিয়ে দু'ঘটি জল নিয়ে কুলকুচো করাতে এসেছো ব্যাটাচ্ছেলে? ফের জল দিতে এসে অপমান করবি তো মাথা ফাটিয়ে দেব তোর।'

বিবরণ শুনে কথা সরে না মমতার মুখে, সে থ' বনে যায়। মনে মনে বলে, এরা শিশু না শয়তান? অ্যাঁ, শিশু না শয়তান এরা?

মমতা বলে, 'রোজ সন্ধ্যার পর আমি তোমাদের এক ঘণ্টা করে বই পড়ে শোনাব। সকলে হাজির থাকবে কিন্তু।''

প্রথম দিন প্রায় সকলেই হাজির থাকে। বেশ উৎসাহ দেখা যায় সকলের। রামপালের কীর্তন শোনাব মত উৎসুক মনে হয় সকলকে। পরদিন আসর প্রায় খালি পড়ে থাকে, রম্ভা, দুর্গা, পবেশ, নরেশ আর লক্ষ্মী ছাড়া কেউ আসে না মমতার মূল্যবান পড়া শুনতে। ডাকতে গেলে বলে, 'আসছি, দিদিমণি আসছি।' কিন্তু আসে না।

মমতা বলে, 'তোমবা এত বোকা কেন? এক বাড়ীতে এতগুলি উনুন জলে, কত পয়সা নষ্ট হয়। এতগুলি হাঁড়িতে ভাত সেদ্ধ হয়, মিছিমিছি কত বেশি খাটুনি। সবাই মিলে একসাথে রান্নার ব্যবস্থা করলে কত পয়সা আর পরিশ্রম বাঁচে বল দিকি? আচমকা এটা করা যাবে না জানি। ক'টা দিন যাক, আমি সব ঠিক করে দেব। এ ব্যবস্থা করে তবে আমি নড়ব এখান থেকে।'

শুনে আশঙ্কায় সকলেব মুখ লম্বা হয়ে যায়।

এমনি কত কথাই যে বলে মমতা, কত সংশোধন ও পরিবর্তন আনবার চেষ্টাই সে যে করে।

সমষ্টিগত জীবনেই শুধু নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও। সর্বদা সে যেন ওৎ পেতে থাকে কখন কে কি অন্যায় করেছে. কার কি ভুল হচ্ছে। কদর্যতা আর বীভৎসতা যত অসহ্য হয়ে উঠছে তার কাছে, তত সে মরিয়া হয়ে মেতে যাচ্ছে এই সব হতভাগা-হতভাগিনীদের জীবনের আবর্জনা সাফ করার কাজে। এদের কিছু করলে তবে তো তাব মুক্তি, তবে তো সে এখান থেকে চলে গিয়েও বলতে পারবে, দেখলে তো পালিয়ে আসিনি, আমি এই করেছি আর ওই করেছি ওদের জন্য। তার জন্য তাই এখানে কেউ সাধ মিটিয়ে অকথ্য ভাষা উচ্চারণ করতে পারে না. প্রাণ কেঁদে ওঠে সকলের সেই অনুচ্চারিত শব্দ গ্যাসে। ছেলে মেয়েকে মারতে পাবে না, গা চুলকোতে পারে না, পিক ফেলতে পারে না, খোস প্যাঁচড়ায় ওষুধ না মাখিয়ে রেহাই পায় না ; রান্নায় ঝালমশলার স্বাদ পায় না, মুখরোচক অখাদ্য খাওয়া হয় না, নেশা করা যায় না, আবও কত কি।

তাছাড়া, সবাই টের পেয়েছে এতটুকু উপকার পাবার ভরসা তার কাছে নেই। একে একে কয়েকজন নানাভাবে দুঃখ ও প্রয়োজন জানিয়ে টাকা চেয়ে গেছে তার কাছে। টাকা দিয়ে কারো উপকার করতে মমতা অস্বীকার করেছে। বলেছে, 'আমার কি টাকা আছে যে দেব? আমি যে তোমাদের মত গরীব।'

তাছাড়া, তার কথা শুনে মেয়েরা কিছু অবাধ্য হতে শেখায় আর মেয়েদের উচিতমত শাসন করতে না পারায় পুরুষরা বিরক্ত হয়েছে। মেয়েরা বিরক্ত হয়েছে পুরুষদের এক একজনের সঙ্গে যখন তখন একা একা সে গুজগুজ ফিসফাস করে বলে।

কয়েকদিনের মধ্যে তাই চারিদিকে বিদ্রোহ মাথা তুলতে আরম্ভ করে। কেবল কথা না শোনার বিদ্রোহ নয়, ঝাঁঝালো আক্রমণ। হৃদয়ে হৃদয়ে গভীর বিদ্বেষ গুমরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ দ্বিধা ভয় সঙ্কোচের বাঁধন ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। মমতা চমকে উঠে দিশেহারা হয়ে যায়।

বিন্দের বৌ দশমাস পোয়াতি। বিন্দের বৌকে দু'চারটে কথা জিজ্ঞেস করে মমতা, লজ্জায় কাঠ হয়ে জবাব দেয় বিন্দের বৌ, মানে বুঝতে পারে না তার প্রশ্নের ; মনে মনে ভাবে এ পাগল নাকি মানুষটা? তারপর মমতা লাগে বিন্দের পিছনে। তাকে বোঝায় যে, বৌকে তার এখন বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া উচিত, নয় তো ভিন্ন শোয়া উচিত তাদের। এটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই বিন্দের? সে কি পশু? বিন্দের কাছে ব্যাপার শুনে বিন্দের বৌ বোঝাপড়া করতে আসে।

বলে, 'কত আর ঢং করবে দিদি? ঢং দেখে বাঁচিনে তোমার।' তুমিই তাকে বলে বিন্দের বৌ। এখানে এসে অনেক চেষ্টা করেও 'মমতা' তাকে তুমি বলাতে পারেনি, আজ বিন্দের বৌ নিজে থেকেই অন্তরঙ্গ সম্বোধনটা ব্যবহার করে। 'গড় করি তোমার পায়ে দিদি, ধম্মো দেখালে বটে মেয়েমানুষের। একসাথে শুই বা না শুই তোমার তাতে কি শুনি? মতলব বুঝিনে তোমার আমি? সে গুড়ে বালি তোমার দিদি, ওদিকে নজর দিও না। বাপের বাড়ী যাই তো ওকে সাথে নিয়ে ঢাক বাজিয়ে যাব, তোমার খপ্পরে রেখে যাব ভেবো না। নিজের সোয়ামী ছেড়ে পরের সোয়ামী নিয়ে টানাটানি, দড়ি জোটে না গলায়?...'

সৈরভীকে তার স্বামী মারে। কোনদিন সোহাগ করে, কোনদিন মারে। কোনদিন সোহাগ করে মারে, কোনদিন মেরেও সোহাগ করে। একরাত্রে সে কবজী আর কনুই ধরে ভেঙ্গে ফেলবার চেষ্টা করেছে সৈরভীর হাত, সৈরভী প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে 'বাবাগো, মাগো, মেরে ফেল্লে গো।' বাড়ীর লোক কেউ শুনছে কেউ শুনছে না, কেউ হাই তুলে তুড়ি দিচ্ছে— মমতার মাথাটা গেল বিগড়ে।

রামপালকে সঙ্গে নিয়ে সে গিয়ে সৈরভীর ঘরের দরজা খোলাল। রঙ্গমঞ্চের বাণীর মত জিজ্ঞেস করল, 'তোমায় মারছিল সৈরভী?'

হাতের অসহ্য যন্ত্রণায় সৈরভীর মাথাটাও তখন বিগড়ে গেছে। সে কেঁদে কঁকিয়ে বলল, 'একেবারে মেরে ফেলেছে দিদিমণি, মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েছে হাতটা।'

এতকাল মমতা শুধু গুজব শুনেছে যে পুরুষমানুষ মেয়েমানুষকে মারে। সর্বাঙ্গ তার ঝিম ঝিম করছিল, প্রাণে উথলে উঠছিল ফুটন্ত প্রতিহিংসা, হীরেনকে আঘাত করতে হবে। রামপালকে সে হুকুম দিল, 'ওর হাতটা মুচড়ে দাও তো রামপাল। জোরে মুচড়ে দাও।'

রম্ভা রামপালের গেঞ্জি ধরে টেনে রেখে বলল, 'আপনার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে দিদিমণি? তুমি এর মধ্যে যেও না।'

রামপালের তখন চড়া নেশার অবস্থা। গুমোটের গরমে শুতে গিয়ে মমতা গায়ে জামা রাখেনি। শুধু শাড়ীর আঁচলা সে ভাল করে জড়াতেও জানে না গায়ে। বিহুল উদ্ভ্রান্ত চোখে রামপাল তার অর্ধ অনাবৃত পিঠ আর বাহুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

মমতা প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে : 'ওর হাতটা মুচড়ে দিলে না রামপাল? কথা শুনতে

পাও না?'

বাঁ হাতে রামপাল একটু ঠেলে দেয় রম্ভাকে, রম্ভা পাঁচ হাত পিছু হটে যায়। এগিয়ে গিয়ে রামপাল সৈরভীর স্বামীর হাতটা ধরে মুচড়ে দেয়। মট করে হাতটা ভেঙ্গে যায়। হাঙ্গামার হদিশ পেয়ে অনেকেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে জমা হয়েছিল দুয়ারের কাছে। সৈরভীর স্বামীর হাত ভাঙ্গার শব্দটা শুনতে পায় সকলেই।

স্বামীর গগনভেদী আর্তনাদে বোধ হয় জ্ঞান ফিরে আসে সৈরভীর। বোধ হয় তার মনে পড়ে যায় যে এই লোকটা তাকে খাওয়ায় পরায়—ভাল রোজগার করে, ভাল খাওয়ায় পরায়, সোহাগ করে, ভালবাসে—কষ্টের মাঝে শুধু একটু মারে। ঝড়ের মত ছুটে এসে স্বেচ্ছায় সে মমতাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়, কামড় বসায় রামপালের হাতে। তারপর আরম্ভ করে আহত স্বামীকে বুকে আগলে নিয়ে হৈ-চৈ হা-হুতাশ। মেঝে থেকে উঠতে উঠতে তাদেব দুজনকে এভাবে একান্ত কাছাকাছি দেখে মমতা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। চোখেব পলকে সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে গোপাল ভাঁড়ীয় কমিকে পরিণত হয়ে যায়। লম্বা চওড়া স্থূলকায়া সৈরভীর পাশে এমন বেঁটে রোগা ক্ষীণকায় দেখায় তার স্বামীকে!

হাঙ্গামা মিটতে রাত আড়াইটে বেজে গেল। হাঙ্গামা কি কম। ডাক্তার এনে সৈরভীর স্বামীর ভাঙ্গা হাড় সেট করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, কত টাকা পেলে সৈরভী আর তার স্বামী মেনে নেবে আজ রাতে কিছুই ঘটেনি সেটা স্থির করা, উত্তেজনা কমিয়ে হৈ চৈ থামিয়ে সকলের ঘরে যাওয়া—বড় বড় গুরুতর সব ব্যাপারের জের।

এ পর্যন্ত রম্ভা উপস্থিত থাকে, হাঙ্গামা মেটাতে সাহায্যও করে। তারপর হেঁটমাথা মমতাকে বলে, 'কাল আপনি চলে যাবেন এখান থেকে।'

জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই সে গট গট করে চলে যায়।

তক্তাপোষে মাথা হেঁট করে বসে থাকে মমতা। সামনে দাঁড়িয়ে থাকে রামপাল। ইতিমধ্যে গণ্ডগোলের ফাঁকে শ্রীপদর সঙ্গে সে আরও খানিকটা দেশী মদ খেয়েছে।

'শোবে যাও বামপাল।'

'যাই।'

বলে মমতাকে টেনে দাঁড় করিয়ে রামপাল তাকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে। সৈরভীর চেয়েও উঁচুগ্রামের তীক্ষ্ণ আর্তনাদে রাত্রির স্তব্ধতা চিরে যায়। রাগ করে চলে গেলেও রম্ভা শোয়নি, দুয়ারের বাইরেই ছিল। বিয়ের পর আজ দ্বিতীয়বার রামপাল মদ খেয়েছে। মাতাল রামপালকে ভগবানের নামে ছেড়ে দিয়ে বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নেবার ভরসা তার ছিল না।

'খাটাসের মত চেঁচিও না দিদিমণি।' মমতাকেই রম্ভা ভর্ৎসনা করে। তার গলার আওয়াজেই শিথিল হয়ে যায় রামপালের আলিঙ্গন। মমতাকে ছেড়ে দিয়ে পিছু হটতে গিয়ে টলে পড়বার উপক্রম করে মমতার কাঁধ ধরে সে সামলে দেয়। ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে বিছানায় শুইয়ে রম্ভা ফিরে আসে।

সে বোঝাপড়া করতে এসেছে ভেবে মমতা বলে, 'এই নিয়ে তুমি রামপালের ওপর রাগ কোরো না রম্ভা। ওর মাথাটা নিশ্চয় হঠাৎ—'

'ও আবার কি দোষ করল?'

মমতা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।—'তুমি তবে রাগ করনি রম্ভা?'

'রাগ যদি করি আপনার ওপর করব, ওর ওপর করব কেন?'

'ও। তুমি তাই ভাবছ?'

রম্ভা একটু চুপ করে থাকে।

'দিদিমণি, আপনার মোটে কাণ্ডজ্ঞান নেই। ওদের কাছে আপনি হলেন আকাশের পরী, রূপকথার রাজকন্যে। এমনিতে কি ওরা ভাবতেও পারে আপনার হাতটি ধরার কথা? কিন্তু আপনি যদি এসে গায়ে পড়ে যা-তা সুরু করে দ্যান, মাথা ঘুরে যাবে না ওদের? ও আজ মদ খেয়েছে আপনার জন্যে। কদিন থেকে অস্থির চঞ্চল হয়ে ছিল, শ্রীপদ খাওয়াতে চাইলে না বলতে পারেনি। বাড়ীর সবাই জানে, আপনার মাথায় ছিট আছে। ভদ্রলোক আপনার বোচে না, মনের মত পুরুষ খুঁজতে আপনি এখানে এসেছেন, ওকে আপনার পছন্দ হয়েছে। নইলে ওর সঙ্গে এত কি হাসি-মস্‌করা আপনার?'

'হাসি-মস্‌করা? আমি কারখানার কথা আলোচনা করেছি।'

মমতার সকাতর ভাব দেখে রম্ভা হেসে ফেলে।—'তা জানি। আপনার মন জানতে বাকী আছে আমার? বড় বোকা আপনি। আপনার মনে কি আছে এখানে কে জানতে যাবে? এরা দেখবে আপনার ব্যাভার। কোন পুরুষের সঙ্গে ওভাবে কখনো দেখেছেন আমাদের কাউকে মিশতে? পাঁচ সাত জনের সামনে করলেই হত আলোচনা!'

রম্ভা ঘবে গেল। ধুক ধুক বুক বেজে রাত্রি কাটল মমতার। সকালে যখন সূর্য উঠল, সবাই জাগল, তখনও সে ঘুমে অজ্ঞান হয়ে রইল।

ঘুম ভাঙ্গল শান্ত, স্তব্ধ মন নিয়ে। সব কাজ, সব উদ্যম, সবরকম নড়াচড়া আর চিন্তা ভাবনার বিরুদ্ধে গভীর বিতৃষ্ণা। আলস্যই শান্তি, আলস্যই জীবন—নিশ্চিন্ত মনে গা ঢেলে দেওয়া। শুয়ে থাকার আরাম কি নিবিড়।

মেঝেতে মাদুরে বসে কৃষ্ণেন্দু কথা বলছিল রম্ভার সঙ্গে। রম্ভা তাকে খবর দিয়ে ডেকে এনেছে।

রম্ভা বলল মমতাকে, 'আপনার সাহস আছে। কত কাণ্ডের পর দরজা বন্ধ না করেই ঘুমিয়েছেন? জ্বরের রুগীর মত দেখাচ্ছে আপনাকে। বসুন, চা আনি। চা খেয়ে চাঙা হয়ে নিন।'

রম্ভা বেরিয়ে গেলে বিনা ভূমিকায় কৃষ্ণেন্দু বলল, 'তোমায় তো যেতে হবে এখান থেকে।'

'যেতে হবেই?'

'তাই মনে হচ্ছে। এরা কেউ চায় না তুমি এখানে থাকো। সবাইকে এমন চটালে কি করে বল তো?'

'আমি সত্যি অপদার্থ কেষ্টদা।'

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'দাঁড়াও দাঁড়াও। ওসব বিচার করব আমি। আমার ওখানেই যাই চলো?'

'চলো।'

দুজনকে চা এনে দিয়ে রম্ভা কৃষ্ণেন্দুর মুখের দিকে তাকাল। কৃষ্ণেন্দু নীরবে মাথা হেলাতে সে যেন স্বস্তি বোধ করল। স্পষ্ট বোঝা গেল, তার মনে আশঙ্কা ছিল জিদের বশে মমতা হয়তো এখান থেকে নড়তে রাজী নাও হতে পারে। একবার ফুঁসিয়ে উঠেই আবার নির্জীব হয়ে গেল মমতার মনটা।

রম্ভা বলল, 'ও তোমায় বলতে বলে গেছে দিদিমণি, নিজে গিয়ে মাপ চেয়ে আসবে তোমার কাছে। কাজে যেতে হল কিনা, নইলে আজকেই মাপ চেয়ে যেত।'

মমতা হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'তোমার কাছে মাপ চেয়েছে তো?'

'শুধু মাপ চাইবে? প্রাচিত্তির করবে।' রম্ভাও হেসে জবাব দিল।

বস্তি এলাকা পার হয়ে তাদের গাড়ি বড় রাস্তার গাড়ির ভিড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে মমতা বলে, 'ব্যাপারটা রম্ভা এত সহজ ভাবে কি করে নিল ভেবে পাই না। ভান করছিল নিশ্চয়।'

'ভান করবে কেন? আমাদের দেখাতে যে ওর মনটা খুব উদার? না, আমাদের খাতির করতে?'

'তুমি কি তবে বলতে চাও এই নিয়ে ওদের ঝগড়া হবে না? অশান্তি সৃষ্টি হবে না?'

'ঝগড়া হতে পারে, অশান্তি সৃষ্টি হবে না। ওরা বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে ব্যবহারের সঙ্গতি-অসঙ্গতি বিচার করে। ওর কাছে রামপালের আচরণটা শুধু অসঙ্গত নয়, অস্বাভাবিক। অস্বাভাবিক অবস্থায় একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড করে ফেলেছে, আর কিছু নয়। এর মধ্যে আর কোন জটিলতা নেই ওর কাছে।'

কৃষ্ণেন্দু ব্যস্ত মানুষ, সারাদিন তার দেখা পাওয়া গেল না। রাত্রে বাড়ি ফিরে স্নান করে সে খেতে বসলে, মমতা সামনে বসল, শিষ্যার মত অনুগত ভাবে। এবার কি করা যায়। তার সব কাজ ফুরিয়ে গেছে। কোন কাজের যোগ্যতাই তার নেই। সারাদিন ভেবেও সে আবিষ্কার করতে পারেনি পৃথিবীতে কি দরকারে সে লাগতে পারে।

কৃষ্ণেন্দু তাকে ভরসা দেয়।

'আমি তোমাকে কাজ দেব। জগতে কাজের অভাব আছে? অত হতাশ হয়ো না। নিজেকে অপদার্থ মনে করার কোন কারণ ঘটেনি। একটা প্রবাদ আছে জানো তো, যার কাজ তারে সাজে অন্যে করলে লাঠি বাজে? যে কাজ তোমার নয়, তাই তুমি করতে গিয়েছিলে, লাঠি বেজেছে। বলা যায়, তুমি ভুল করেছ! কিন্তু এতে প্রমাণ হয় না কোন কাজের যোগ্যতা তোমার নেই। মন খারাপ করো না। কত বড় একটা অভিজ্ঞতা হল বল দিকি? তার দাম কি কম?'

'কেমন ধাঁধা লেগে গেছে সব বিষয়ে। যে রকম ভেবেছিলাম কিছুই যেন সেরকম হল না। হীরেনের জন্যও তো সে রকম মন খারাপ হল না? এটা অদ্ভুত ঠেকেছে কেষ্টদা, সবই কি ফাঁকি আমার মধ্যে?'

'বিষাদ জমজমাট হয়নি, না? কি করে হবে বলো? বিরহ-বেদনাকেও জোরালো করতে হলে কালচার করা দরকার হয়। রীতিমতো সাধনার ব্যাপার। তোমারও হত, কিন্তু তুমি তো মোটে সুযোগ দিলে না। নিজেকে নিয়ে আড়ালে সরে যেতে, একলাটি নিজের মনে শুধু ভাবতে যে বিচ্ছেদ যখন হয়েছে একজনের সঙ্গে আর বাঁচা কেন, দেখতে বিরহ কেমন চড় চড় করে চড়ে যায়, কি অসহ্য হতে পারে বিরহ।'

'ভালবাসা, বিরহ এসব তবে মনের বিকার তোমার কাছে? প্রশ্রয় দিলে বাড়ে, নইলে নির্জীব হয়ে থাকে?'

'পাগল, ভালবাসাকে বিকার ভাবতে পারি, ভালবাসার ক্ষমতাই যখন মানসিক সুস্থতার সব চেয়ে বড় লক্ষণ? কিন্তু ভালবাসাও তো মনেরি ধর্ম। অনুশীলনের নিয়মটা ভালবাসার বেলাতেও বাদ পড়ে না, বিরহের বেলাতেও নয়।'

'কিন্তু আর একটা মুশকিল হয়েছে। বিরহের অভাবটা নয় বুঝলাম। কিন্তু বিতৃষ্ণা। বিরহ না হলে কি বিতৃষ্ণা হয়? ওর কাছে ফিরে যাব কিনা ভাবছিলাম। ভাবতেও এমন বিশ্রী লাগছে!'

কৃষ্ণেন্দু ভাতের গরাস মুখে তুলছিল, নামিয়ে রাখল।

মমতা হাই তুলে বলল, 'আরও শুনবে? আরিফের জন্য আমার মন কেমন করছে।'

কৃষ্ণেন্দু মাথা নীচু করে খেয়ে যায়। তাদের এখন আর মোটেই গুরু ও শিষ্যার মত মনে হয় না।

'কেন মন কেমন করছে জানি না। কিছুই বলার নেই?'

'না।'

'ভাবনার কথা কিন্তু। ভালবেসে বিয়ে করা স্বামীর জন্যে বিতৃষ্ণা, ভাল না বেসে বিয়ে না করা বন্ধুর জন্য মন কেমন করা। ব্যাপারটা বোঝা দরকার।'

'কি হবে বুঝে?'

'আগে তো বুঝি, তারপর ওটা বিবেচনা করা যাবে।'

'হীরেনকে একটা খবর দেবে, আমায় এসে নিয়ে যাবার জন্যে? বলে দিও এসে একটু যেন সাধাসাধি করে।'

পুতুল এসে বসে কৃষ্ণেন্দুর কাছে। মমতা হাত বাড়িয়ে দেয়। পুতুল সরে যায় কৃষ্ণেন্দুর আরও গা ঘেঁষে।

'পুতুলও চায় না আমাকে।'

'মন খারাপ কোরো না মমু। এসব মুডকে প্রশ্রয় দিতে নেই।'

মমতা শুনতে পায় না। বলে, 'উঃ, আমি কি অসুখী কেষ্টদা। আমি যদি রম্ভা হতাম!'

মাসখানেক পরে একদিন কৃষ্ণেন্দু গিয়ে মমতাকে জানাল, রম্ভা তাকে সন্ধ্যার পর সিন্নী খাবার নেমন্তন্ন করেছে।

'রম্ভা নেমন্তন্ন করেছে, না তুমি রম্ভাকে দিয়ে করিয়েছ?'

'রম্ভাই করেছে। তবে আমায় জিজ্ঞেস করেছিল তোমায় বলা উচিত হবে কিনা, তুমি রাগ করবে কিনা।'

'আমায় নেবে সঙ্গে? তোমার অজ্ঞাতবাসের জায়গাটি দেখে আসব।' হীরেন বলল।

'তুমি যাবে? সবাই অবাক হয়ে যাবে তোমায় দেখে।' মমতা বলল উৎসাহিত হয়ে।

সন্ধ্যার পর তারা পৌঁছল। গানের আসর বসেছিল কিন্তু গান আরম্ভ করা হয়নি, এদের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছিল। হীরেনকে দেখে চোখের পলকে আসর স্তব্ধ হয়ে গেল। সকলে শুধু অবাক নয় একেবারে যেন হয়ে হতভম্ব।

দাওয়ায় তাদের জন্য বসবার বিশেষ ব্যবস্থা করা ছিল। রম্ভা তাদের সিন্নী আর ফল এনে দিল। তারপর শুরু হল রামপালের গান।

রামপাল আজ স্বদেশী গান ধরেছে।

কৃষ্ণেন্দু চেয়ে দেখল, হাসি আর গর্ব মুখে ফুটিয়ে রামপালের দিকে তাকিয়ে রম্ভা গান শুনছে।

দুটি গানের পর কৃষ্ণেন্দু উঠে দাঁড়াল, বলল, 'কাছেই একটা কাজ আছে, সেরে আসছি এক্ষুণি।'

হীরেন বড়ই অস্বস্তি বোধ করছিল। সে বলল, 'চল, আমি যাব।'

দু'জনে যখন রাস্তায় পৌঁছল, অধিকাংশ গেরস্থ বাড়ী আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভেতরের দিকে গলির ডাইনে বাঁয়ে এবং দু'পাশের সরু সরু শাখাগলির মধ্যে নিম্নশ্রেণীর অনেক রূপজীবিনী বাস করে। এই বাড়ীগুলি এখনো পুরোদস্তুর সজাগ। মানুষের আসা যাওয়ার বিরাম এখনো হয়নি, গানবাজনা চেঁচামেচিতে খোলার ঘরগুলি হুল্লোড়িত হয়ে আছে। গলির মোড়ে পথের ধারে এবং বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে অনেক স্ত্রীলোক এখনো প্রতীক্ষা করছে। বেচাকেনা চলছে পান বিড়ি আর ডিম মাংসের দোকানে। পুলিশ মন্থর পদে হাঁটছে, টুংটাং শব্দে রিক্সা আনাগোনা করছে, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক চোখে পড়ছে অনেক।

'এসব মেয়ের অনেকের স্বামী আছে জানিস হীরেন? স্বামীপুত্র নিয়ে ঘর সংসার করে। স্বামীর উপার্জনে চলে না, স্ত্রীও তাই এভাবে কিছু উপায় করে। সন্ধ্যার পর রাস্তায় এসে দাঁড়ায়, কেউ এলে দরদস্তুর ক'রে ঘরে নিয়ে যায়, স্বামী আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করে। হয়তো ঘরের সামনেই বারান্দায় বসে বিড়ি টানে, ছেলেমেয়ে সামলায়। ভাবতে পারিস, চোখের সামনে আরেকজন পুরুষ স্ত্রীকে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করল?'

'পারি। এরা তো অশিক্ষিত ছোটলোক, আমায় একজন নিজে ডেকে নিয়ে আদর করে ঘরে বসিয়ে স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিত, সে শিক্ষিত ভদ্রলোক, পাড়ায় মানসম্ভ্রম আছে, মোটামুটি উপার্জনও আছে। বাপ মেয়েকে, ভাই বোনকে, স্বামী স্ত্রীকে ভাড়া দিয়ে টাকা রোজগার করে, সংসারে এটা তোর এই পাড়ায় প্রথম ঘটছে না।'

'ওসব ভদ্র পাষণ্ডের কথা বলিনি। এ পাড়ায় অশিক্ষিত ছোট লোকের মধ্যেও ওরকম মানুষ আছে। আমি যাদের কথা বলছি, তারা আলাদা জাতের লোক, নিরীহ, শান্ত, ভালোমানুষ। কোন রকমে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারলে এরা খুশী থাকে, টাকার জন্য পাপ করার তাগিদ এদের মধ্যে নেই। আমি কয়েকজনকে জানি, বিয়ের পর কয়েকবছর এভাবে টাকা রোজগারের কথা স্বামী-স্ত্রী কল্পনাও করতে পারত না। দু'তিনটি ছেলেমেয়ে হবার পর যখন আর উপায় রইল না, তখন বাধ্য হয়ে এই পথ নিল। এদের প্রবৃত্তি নীড় বাঁধবার, ভাঙবার নয়। শুধু ঘর গেরস্থালি বজায় রাখবার জন্য এসব মেয়ে পাপ করে, স্বামী মুখ বুজে থাকে। এতবড় পাপ হজম করে সুখে-শান্তিতে সংসার করার সাধ্য তোমার আমার নেই, ওদের সয়ে যায়, গরীব কিনা। সব চেয়ে আশ্চর্য এইটুকু। ওই দিকটা বাদ দিয়ে এদের দ্যাখো, অবিকল আর দশটি গরীব গৃহস্থের মত জীবন কাটাচ্ছে, না জানা থাকলে দেখে কিছু টেরও পাবে না। স্বামী বাজার করছে, ঘরের কাজে সাহায্য করছে, কাজে যাচ্ছে, বৌ রান্না করছে, বাসন মাজছে, ছেলেমেয়ে মানুষ করছে, স্নেহমমতা মান-অভিমানের পালা চলছে, সব একরকম। ঘরকন্নাকে বড় করে পাপকে ছোট করে নিয়েছে বলেই বোধ হয় এটা সম্ভব হয়েছে। পুরুষ যেমন কলকারখানায় গতর খাটিয়ে রোজগার করছে বৌও তেমনি গতর খাটিয়েই রোজগার করছে, সেটা পরপুরুষের আলিঙ্গন সইতে গতর খাটানো হোক, আর যাই হোক। ব্যাপারটা ওরা বোধহয় এই ভাবে নেয়।'

'সহরের বস্তিটস্তিতে এরকম ঘটে।'

'সহরের বস্তি? গাঁয়ে এমন কত দেখেছি! তোদের একটা ধারণা আছে সহরের বস্তিতে জগতের যত নোংরামি জড়ো হয়েছে, বস্তির বাইরে কোথাও দারিদ্র্য নেই, দুর্নীতি নেই। গাঁয়ে যারা সত্যি গরীব, সমাজের নীচুস্তরের জীব, তাদের মধ্যে কিছুদিন থেকে আয়, দেখতে পাবি বেঁচে থাকার জন্য তাদেরও নীতির বাঁধন কত ঢিল করতে হয়েছে। আমাদের দেশের দারিদ্র্যের চেহারা দেখিসনি। গড়পড়তা আমাদের কত রোজগার তার হিসেবটা পড়ে মাথা চুলকে শুধু

ভাবিস, তাইতো, আমরা সত্যি বড় গরীব। গরীব হওয়ার মানে যেন শুধু গরীব হওয়া—আর কিছু নয়। ছেঁড়া কাপড় পরা, পেট ভরে খেতে না পাওয়া, কঙ্কালসার দেহ নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে বেঁচে থাকা— এই হল দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ রূপ। দেশে যেন কোটি গরু ছাগল বাস করে, ঘাস বিচালির অভাবে তাদের শুধু হাড়গোড় বেরিয়ে পড়েছে—আর কিছু হয়নি।'

পাঁচ

লোকনাথ কয়েকমাস আগে একটি রঙেব কারখানা কিনেছিলেন। কারখানায় যারা কাজ করত তাদের মধ্যে সাতজন ছিল মুসলমান, তিনমাসে একে একে তাদের তিনজনকে বিদায় করা হয়েছিল। কদিন আগে বাকী চারজনকে হঠাৎ তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপারটা নিয়ে গোলমাল বাধার আগেই খবর পেয়ে কৃষ্ণেন্দু লোকনাথের সঙ্গে দেখা করেছিল। লোকনাথ অজুহাত দিয়েছেন, ওই সাতজন দল বেঁধে ঘোঁট পাকিয়ে নানা ভাবে কাজে অসুবিধা ঘটাচ্ছিল, তাই তিনি ওদের ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

'ঘোঁট পাকাচ্ছিল কেন?'

'ওসমান আলির জন্য।'

কারখানার আগে যিনি মালিক ছিলেন, তিনি নিজেই ছিলেন ম্যানেজার,—নামে। ওসমান আলি ছিল একাধারে তাঁর সহকারী ও কারখানার শ্রমিক ও কর্মচারীদের সর্দার। মালিক হিসাবেই হোক আর ম্যানেজার হিসাবেই হোক আগেকার মালিক-ম্যানেজার সমস্ত ব্যাপারে নির্দেশ দিতেন ওসমানকে, কারখানার কাজে সোজাসুজি হস্তক্ষেপ করতেন না। লোকনাথ কাঠের কারখানার হাঙ্গামার পর এখানে উমাপদকে ম্যানেজার নিযুক্ত করেছেন। অফিসে বসে ওসমানের মারফত উমাপদ ম্যানেজারি করলে কোন গোলমাল হবার কারণ ছিল না, যেমন কাজ চলছিল তেমনি চলত, কিন্তু নিজের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছেঁটে ফেলে, কারখানার উন্নতির চেষ্টা না করে, নিজের চোখে কাজকর্ম না দেখে, পুতুল সেজে বসে থাকতে উমাপদ রাজী হল না। যুক্তির দিক থেকে, উমাপদর ম্যানেজারির বিরুদ্ধে ওসমানের বলবার কিছু ছিল না, প্রথম থেকে এই ব্যবস্থায় কাজ করে এলে তার ক্ষোভও জাগত না। কিন্তু শুধু যুক্তি নিয়ে মানুষের চলে না, দায়িত্ব ও ক্ষমতা অকারণে আইনসঙ্গত ভাব কেড়ে নিলেও মানুষ জ্বালা বোধ করে। তাছাড়া কাগজে কলমে ম্যানেজার হবার আশাও ওসমানের ছিল। সে আই. এস-সি পাশ করেছে, এতকাল কারখানায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, তাকে ম্যানেজার নিযুক্ত করা অসঙ্গত হত না। তার বদলে তার মাইনে শুধু পাঁচটাকা বাড়িয়ে দেওয়া হল।

লোকনাথ বললেন, 'মুসলমান বলে একজনকেও তাড়াইনি কেষ্টবাবু। ওরা ভাল কাজ করছিল, আমার কাজ নিয়ে কথা। প্রত্যেকে দোষ করেছে, তবে বিদেয় দিয়েছি।'

কৃষ্ণেন্দু বললে, 'আপনি ভারি অন্যায় করেছেন।'

লোকনাথ চটে গেলেন।

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'গোড়ায় ওসমানের সঙ্গে বুঝাপড়া করে নেওয়া আপনার উচিত ছিল। নতুন ম্যানেজার আসবে, নতুন ব্যবস্থা হবে, ওসমানকে কি অবস্থায় কি কাজ করতে হবে, এসব ওকে আগে বলে দিতেন। সোজাসুজি এসব না করে আপনারা ওর সঙ্গে আরম্ভ করলেন

লড়াই,—যেমন চলছিল তেমনি চলতে দিলেন কিছুদিন, তারপর আস্তে আস্তে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ওকে অপদস্থ করতে লাগলেন। কি দরকার ছিল তার? ভাবলেন বুঝি যে আপনার কারখানা, আপনার মাইনে করা লোক, যা ব্যবস্থা করবেন তাই চলবে?'

হীরেনকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণেন্দু ওসমানের খোঁজে গেল। খাল আর ট্রাম লাইনের মাঝামাঝি ওসমানের ছোট পাকা বাড়ী, ট্রাম লাইন থেকে চওড়া যে গলিটা এঁকে বেঁকে দক্ষিণে চল্‌তে চল্‌তে ক্রমেই সরু আর নোংরা হয়ে এ অঞ্চলর দরিদ্রতম মুসলমান পাড়ায় পৌঁচেছে, তারই ধারে। ওসমানের বাড়ীটি আগাগোড়া সাদা চুনকাম করা। পাশেই একটি পুকুর। পুকুরের অপর তীরে কতকগুলি ছোট ছোট খোলার বাড়ী কেমন যেন তিন দিকের বাড়ীগুলি থেকে পৃথক হয়ে আছে। ওখানে একদল ধাঙ্গড় বাস করে। একটি পাকা বাড়ীর পিছন দিকে উঁচু দেয়াল, খানিকটা আবর্জনা ভরা পতিত জমি, ভাঙ্গাচোরা রাস্তা, এইসব মিলে এত কাছে রেখেও অন্য সব বাড়ী থেকে ধাঙ্গড়দের ঘরগুলিকে কত যেন দূরে সরিয়ে রেখেছে।

ওসমান আগে গলি ধরে আরো এগিয়ে মুসলমান পাড়ার একটি খোলার ঘরেই থাকত। অবস্থা ভাল হওয়ায় খানিকটা তফাতে সরে এসে দেড় কাঠা জমি কিনে একতলা বাড়ীটি করেছে। এখানে দাঁড়ালে এই গলির মোড়ে ট্রাম রাস্তার উপরে উঁচু প্রাচীর ঘেরা বিস্তৃত বাগানের মাঝখানে একজন ধনী মুসলমান ব্যবসায়ীর প্রকাণ্ড বাড়ীর খানিকটা চোখে পড়ে। ওসমান হয়তো মবারক সাহেবের ওই বাড়ীটির পাশে ওইরকম আরেকটি বাড়ী তুলবার স্বপ্ন দ্যাখে তার ওই একতলা বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে।

ওসমান বাড়ীতেই ছিল, সদর দরজা খুলে বেরিয়ে এসে কৃষ্ণেন্দুকে দেখে বলল, 'কেষ্টবাবু! আসেন, আসেন। ছালাম।'

হীরেনের দিকে সে তাকিয়েও দেখল না। অবজ্ঞাটা এতই স্পষ্ট যে হীরেনের ফর্সা মুখখানা লাল হয়ে গেল। কৃষ্ণেন্দুর মত সে উদার নয়, নির্বিকারও নয়। কৃষ্ণেন্দু ঠিক এই অবস্থায় পড়লে ওসমানের ব্যবহারকে অপমান বলে গ্রহণ করতেই অস্বীকার করত, যেচে হাসিমুখে তার সঙ্গে কথা বলত, প্রথমেই তাকে জানিয়ে দিত যে জটিল ব্যাপারটার একটা মীমাংসার জন্য তার সঙ্গে সে পরামর্শ করতে এসেছে বন্ধুভাবে। তবে হীরেনের সহ্যশক্তি আছে। কোন অবস্থাতেই সহজে সে বিচলিত হয় না। কৃষ্ণেন্দুকে ওসমানের সম্মান দেখানোর বহর দেখে তার মত অন্য কেউ হয়তো বলে বসত, তোমরা কথা বলো ইন্দু, আমি চললাম,—বলে, গটগট করে হাঁটতে আরম্ভ করে দিত! হীরেন চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল!

কৃষ্ণেন্দুকে বসতে দেবার জন্য ওসমান ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কোথায় বা বেচারী বসতে দেবে অতিথিকে! বাড়ীর সামনে তার একহাত চওড়া একটু রোয়াক। তাড়াতাড়ি ভেতর থেকে সে একটা কাঠের চেয়ার নিয়ে এল। কিন্তু চেয়ার পাতবে কোথায়, বাড়ী তার রাস্তার ঠিক ওপরে, রাস্তায় ছাড়া চেয়ার পাতবার জায়গা নেই। বাড়ীর কোণে পুকুরের দিকে একটু ঢালু জায়গা আছে, ওখানেই চেয়ারটা সে পাতবে কি? কিন্তু ওখানে বাড়ীর ছায়া পড়েনি, এই কড়া রোদে কি মানুষকে চেয়ার পেতে বসতে দেওয়া যায়? লজ্জিত অপদস্থ ওসমান অসহায় ভাবে জায়গাটুকর দিকে তাকাতে লাগল, হাত থেকে চেয়ারটা নামিয়ে রাখবার খেয়ালও তার হল না।

কৃষ্ণেন্দু হেসে বলল, 'চলুন ভেতরে গিয়ে বসি। আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ হবে। দেবেন তো আলাপ করিয়ে?'

বলতে বলতে সে রোয়াকে পা ঝুলিয়ে বসে পড়ল, হীরেনকেও ডেকে বসাল। আহত

করুণ চোখে ওসমান তাকিয়ে রইল তার দিকে। দেখে মনে হতে লাগল, এতবড় একটা সবল তেজী মানুষ গৃহে সমাগত ভদ্রলোককে মনের মত সমাদর করতে না পেরে যেন ক্ষোভে দুঃখে লাঞ্ছিত শিশুর মত কাতর হয়ে পড়েছে।

কত কষ্টে এই বাড়ীটুকু সে তুলেছে কেউ তা জানে না। জমি কিনে দু'খানা ঘর তুলতে তার নগদ টাকা ফুরিয়ে গেছে, সামনের এই দেয়াল আর রোয়াক করেছে টাকা ধার নিয়ে। এখন তার মনে হতে থাকে, এসব না করলেই হত। তার খোলার বাড়ীর সামনে চওড়া বারান্দায় চৌকি থাকত, নতুন একখানা পাটি বা মাদুর বিছিয়ে মানুষকে বসতে দিলে না হত ভদ্রতার ত্রুটি, না হত বেমানান।

'তামাশা করছি আলি সা'ব।'

'নিশ্চয়! তামাশা বুঝি না কেষ্টবাবু?' ওসমানও হাসবার চেষ্টা করল।

'তবে পর্দা একদিন আপনাদের ঘোচাতে হবে। আমার ছেলের কাছে আপনার ছেলের বৌ পর্দা রাখবে না।'

'ঠিক কথা। কি জানেন কেষ্টবাবু, আমারও একদিন ঝোঁক ছিল। কলেজ ছেড়ে বেরিয়েছি, সাদি করেছি তিন কি চার সাল। বাবার এক ধমকে ঝোঁক কেটে গেল।'

'আপনার ছেলের ঝোঁক কাটবে না। তারা বাবা তাকে ধমক দেবে না। কি বলেন?'

'খোদা জানেন। ধমক না দেই, হয়তো স্রেফ মার লাগাব।'

ওসমান অনেকটা সামলে উঠেছে। কৃষ্ণেন্দুর কথা ও ব্যবহার নিজের অজ্ঞাতসারেই তার মনে কাজ করছিল, সে শুধু বুঝতে পারছিল মানুষটাকে আজ তার বিশেষ করে ভাল লাগছে। মানুষের সহজ ও শান্ত ভাব অতিশয় সংক্রামক, অন্যের গভীর উত্তেজনাও অল্প সময়ে ফুরিয়ে দিতে পারে। ঝির ঝির করে অপরাহ্নের বাতাস বইতে সুরু করেছিল, তিনজনেরই ঘামে ভেজা শরীর স্নিগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাসন হাতে একটি মাঝবয়সী স্ত্রীলোক মাটির খাঁজে বাঁশ বসানো ধাপে পা দিয়ে তালগাছের গুঁড়িতে তৈরী পুকুরের ঘাটে নেমে গেল। ওসমান সরে এসে তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

'এঁকে চেনেন না?' কৃষ্ণেন্দু শুধোল।

ওসমান সায় দিয়ে শুধু বলল, 'চিনি।' তারপর এক মুহূর্ত কি ভেবে অমায়িক ভাবেই হীরেনকে জিজ্ঞেস করল, 'ভাল আছেন?'

হীরেন সম্পর্কে ওসমানের ভদ্রতার অভাবটা কৃষ্ণেন্দু ঠিক মত বুঝে উঠতে পারছিল না। শত্রু বাড়ীতে এলে তাকে খাতির করে, এই প্রকৃতি ওসমানের। এতক্ষণে সে টের পেলে যে হীরেনকে শত্রু ভেবে নয়, সে তার ভূতপূর্ব মনিবের ছেলে বলে ওসমানের ভয় হয়েছে তার বিনয়কে হয়তো সে তার বাপের বেতনভোগী মানুষের স্বাভাবিক দীনতা হিসাবে গ্রহণ করবে, প্রভু যে ভাবে ভৃত্যের নম্রতাকে গ্রহণ করে সেই ভাবে।

শঙ্কিত দৃষ্টিতে কৃষ্ণেন্দু হীরেনের দিকে তাকিয়ে থাকে। এত দেরী করে কেন রাস্কেলটা, ওকি ওসমানের কথার জবাব দেবে না? যদি ও তুমি বলে বসে ওসমানকে।

হীরেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ সে যেন সচেতন হয়ে উঠল। বলল, 'ভালই আছি। আপনার খবর ভাল?'

চোখের পলকে ওসমানের মুখের ভাব বদলে গেল। খুশী হয়ে তার মধুর গম্ভীর আওয়াজে সে বলল, 'চলছে একরকম। আপনি যে গরীবের বাড়ী পায়ের ধুলো দেবেন—'

হীরেন আর টানতে পারল না, ক্লিষ্টভাবে একটু হেসে সংক্ষেপে শুধু বলল, 'বলেন কি।'

কৃষ্ণেন্দুর ওপর রাগে তার গা জ্বলে যাচ্ছিল। মমতা ফিরে আসবার পর থেকে হীরেন যেচে কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে অনেক জায়গায় গিয়েছে, কুলিমজুরদের আরেকটু ঘনিষ্ঠভাবে জানবার জন্যে। তার এই পরাজয়ের উদারতায় মমতা যদি খুশী হয় এই উদ্দেশ্যে। কিন্তু সে আলাদা ব্যাপার। ওসমান তো গরীব নয়, কথায় ভুলিয়ে ফাঁকি দিয়ে এখানে কৃষ্ণেন্দু কি বলে তাকে নিয়ে এল?

তারপর তারই সামনে ওসমানের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু যখন কারখানার গণ্ডগোলের বিষয় আলোচনা শুরু করল, রাগে হীরেনের রক্তে যেন আগুন ধরে গেল একেবারে। কয়েক মূহূর্তের জন্য একথা পর্যন্ত তার মনে হল যে, কৃষ্ণেন্দু তার বন্ধু নয়, আর দশটি বড়লোকের ছেলের মত তাকেও কৃষ্ণেন্দু ঘৃণা করে, তাকে নিয়ে এই রকম মজা করবার জন্যই সে বন্ধুত্বের ভানটা বজায় রেখে চলে তার সঙ্গে।

লোকনাথকে যেমন বলেছিল, ওসমানকেও তেমনি ভাবেই কৃষ্ণেন্দু বলল, 'আপনি বড় অন্যায় করেছেন, আলি সা'ব। এত হাঙ্গামা করবার কি দরকার ছিল আপনার? আপনার কদর ওরা বুঝল না, আপনি কাজ ছেড়ে দিলেন, হাঙ্গামা চুকে গেল। আপনার কি কাজের অভাব হত কিছু? বেলেঘাটার বসাকবাবু আজ গেলে কাল আপনাকে কাজে লাগিয়ে দেবে। ম'বুব, আজিজ, আমিরুদ্দীন, এদের নিয়ে ঘোঁট পাকাতে গেলেন কি বলে?'

ওসমান মুখ অন্ধকার করে বলল, 'কেষ্টবাবু, আপনি যদি বলেন আমি মুছলমান ওরাও মুছলমান, তাই ওদের বেছে নিয়ে ঘোঁট পাকিয়েছি—'

'তা জানি। অন্য সবাই এলে তাদের নিয়েও ঘোঁট পাকাতেন, তারা যদি নিজে থেকে আসত। তাদের আপনি ডাকেননি, এদের ডেকেছেন।'

'আমি ডাকলে ওরা আসবে কেন? আমি মুছলমান।'

'এবার জবাব দিন আলি সা'ব। আপনাকে ছাড়িয়ে দিয়ে লোকনাথবাবু তবে কি দোষ করেছেন? পাঁচ সাত বছর চল্লিশ বিয়াল্লিশ জন লোককে দিয়ে আপনি কাজ করালেন, তারপর যখন নতুন মালিক এসে আপনাকে ছাড়িয়ে দিল, সাতজন মুছলমান ছাড়া আর কেউ আপনার দলে গেল না। কেমন কাজ করেছিলেন আপনি সাত বছর? জাতভাইদের দিকে টেনে বাকী সকলের ওপর অন্যায় করেছিলেন নিশ্চয়। আপনি যদি এমন লোক, আপনাকে কি করে রাখা চলবে বলুন?'

ওসমান কথা বলতে যাচ্ছিল, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে কৃষ্ণেন্দু বলে চলল, 'আরেকটা মানে হতে পারে। আপনি ব্যবহার করতেন ভাল কিন্তু ওই বাকী লোকগুলি খারাপ লোক, আপনি মুছলমান শুধু এইজন্য আপনাকে দেখতে পারত না। বেশ কথা তাই ধরে নিলাম। কিন্তু তাহলেও লোকনাথবাবু আপনাকে বহাল রাখতেন কি করে বলুন? চল্লিশ-বিয়াল্লিশ জন লোকের মধ্যে ত্রিশ জনের বেশী যাকে পছন্দ করে না, তাকে সর্দার রেখে কি কারখানা চলে? আপনার সব বাজে অজুহাত আলি সা'ব। আপনার রাগ হয়েছিল, রাগের জ্বালায় ম'বুব, আজিজদের ক্ষেপিয়ে আপনি গায়ের জ্বালা মেটাতে চেয়েছেন। আপনি চুপচাপ চলে এলে ওরা কাজ করে যেত, এমন কষ্টে পড়ত না। ওদের ইজ্জৎ রাখতে আপনি কোথায় জান দেবেন, নিজের ফাঁকা ইজ্জৎ রাখতে, গায়ের ঝাল ঝাড়তে আপনি ওদের মারলেন।'

ওসমান অনেকক্ষণ গুম খেয়ে রইল। তারপর ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'আপনি বড় কড়া কড়া কথা বলেন কেষ্টবাবু।'

'খাঁটি খাঁটি কথা বলি আলি সা'ব। এমনি ওদের প্রাণটুকু ধুক ধুক করছে, নিজেদের

ভুলের জন্য ওদের দিয়ে কিছু করানো প্রাণান্ত ব্যাপার, আপনি আমি যদি আপনার আমার রোজেবাজে কাজে ওদের প্রাণটুকু ফুঁকে দিই ওরা যায় কোথায় বলুন? কটা লোক দরদ করে ওদের? আপনার একটু দরদ আছে, আপনিও যদি ওদের কথা আগে না ভেবে নিজের কথা ভাবেন, দুদিন পরে ওরা কবরে যাবে। না আলি সা'ব, আপনার আমার মান-অপমান নেই। আপনাকে তাড়ালে চুপ করে আপনি চলে আসবেন। নজর রাখবেন যারা রইল তাদের দিকে। ওদের একজনকে যখন অন্যায় করে তাড়াবে, তখন ফোঁস করে উঠে বলবেন—খবর্দার!'

'ওদেরও তাড়িয়েছে।'

'কাজের বদলে ঘোঁট করায় তাড়িয়েছে, কাজ করতে গেলেই ফিরিয়ে নেবে। হীরেনবাবুকে তাই তো সঙ্গে আনলাম। জিজ্ঞেস করুন।'

ওসমান কিছু জিজ্ঞেস করল না। হীরেন চুপ করে বসে রইল। এ বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য না করে এতক্ষণের আলোচনাকে একেবারে যেন বাতিল করে দিয়ে কৃষ্ণেন্দু হঠাৎ বলে গেল, 'এক গেলাস জল দিন তো আলিসা'ব।' ওসমান ব্যস্ত হয়ে ভিতরে চলে গেল।

জল আসতে কিন্তু দেরী হতে লাগল অদ্ভুত রকম। চাপা গলায় ওসমান ও দুটি নারীকণ্ঠের বাদানুবাদ মাঝে মাঝে কানে ভেসে আসতে লাগল। জল আনতে গিয়ে ওসমান কি বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করে দিয়েছে? গেলাস নেই বলে তাড়াতাড়ি গেলাস মেজে জল দিতে বলেছে? অথবা শুধু জল না দিয়ে অতিথিকে আর কিছু দেবার হাঙ্গামা নিয়ে তর্ক আর আলোচনা শুরু হয়েছে?

কৃষ্ণেন্দু ও হীরেন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, ওসমান এসে সবিনয়ে বলল, 'ভেতরে আসবেন একবার?'

শুধু কৃষ্ণেন্দুকে নয়, হীরেনকেও সে ভেতরে যাবার আহ্বান জানাল।

ওসমান যে সত্যসত্যই তাদের বাড়ীর মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে, দুজনে তা কল্পনাও করতে পারেনি। এমন কয়েকজন মুসলমান বন্ধু কৃষ্ণেন্দুর আছে, নতুন জগতের চিন্তাধারার সঙ্গে যাদের ওসমানের চেয়ে শতগুণ ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তার চেয়ে যারা ঢের বেশী দুঃসাহসী। মনে-প্রাণে পর্দার বিরোধী হয়েও তারা আত্মীয়-পরিজন পাড়াপ্রতিবেশীর মতামতকে উপেক্ষা করতে পারেনি।

ছোট উঠানটি পরিচ্ছন্ন। এক কোণে একটি মাত্র মাটির টবে একটি অজানা চারা, ফুল ফোটেনি। একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত টাঙ্গানো লোহার তারে একটি দু'রঙা লুঙ্গি ও একটি গাঢ় হলুদ রঙের পাতলা ফিনফিনে শাড়ী শুকোচ্ছে। একটি ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, জানালার পাট অল্প একটু ফাঁক করে একজন কেউ উঁকি দিচ্ছে বোঝা যায়। ওসমান তাদের অন্য ঘরটিতে নিয়ে গেল। খাটে শুধু তোষকের ওপর রঙীন সুতোয় বোনা সস্তা চেক চাদর পাতা। খাটটা বহুকালের পুরানো, অতিরিক্ত বাহারের কাজ ও বাহুল্য নক্সায় ভরা। এখন রঙ চটে গেছে, নানা স্থানে মেরামত করা হয়েছে, একটি পায়া একদম বাদ দিয়ে সাধারণ কাঠের সাধারণ একটি পায়া বসাতে হয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় খাটটি নিলামে কেনা। এ ছাড়া, ছোট একটি টেবিল, কাঠের একটি চেয়ার ও সস্তা একটি ক্যাম্প চেয়ার ঘরের আসবাব। ইটের ওপর কাঠের তক্তা বসিয়ে ঘরে তৈরী পাড়ের ঘেরাটোপ দেওয়া দুটি বাক্স একপাশে দেয়াল ঘেঁষে রাখা হয়েছে। দেয়ালে তিনটি ছবি টাঙ্গানো, তিনটিই মাসিক পত্র থেকে সংগ্রহ করা। একটি নূরজাহানের, একটি রঙিন পাখীর, অন্যটি রক্তগোলাপ হাতে

ওমর খৈয়ামের।

বাইরে যে চেয়ারটি নিয়ে গিয়েছিল, ওসমান সেটিও নিয়ে আসে। ব্যস্তভাবে সে ঘরে-বাইরে আনাগোনা করে, সমাদর জানানোর চেষ্টায় অর্থহীন কথা বলে। ছেলেমানুষের মত সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তার এই উত্তেজনার আসল কারণটি তখনো কৃষ্ণেন্দু অনুমান করতে পারেনি, একসময় সে হাসিমুখে অনুযোগ দিয়ে বলে, 'অত খাতির করবেন না, আমি সা'ব। মুশকিলে ফেলে দিচ্ছেন যে আমাদের!'

বলতে বলতে সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল, বাইশ তেইশ বছরের একটি মেয়ে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে ঘরে ঢুকছে। পাতলা ছিপছিপে গড়ন, মুখখানা সুশ্রী ও কোমল, গায়ে কব্জি-হাতা জামা, পরণে ফিকে সবুজ শাড়ী, পায়ে জরি বসানো চটি। ঘরে ঢুকেই দ্বিধাভরে সে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর আর দু'পা এগিয়ে এল। মেঝের দিকেই সে তাকিয়ে রইল, একবার শুধু চকিতের জন্য তার গভীর কালো চোখের দৃষ্টি তাদের দিকে ঝিলিক দেওয়ার মত খেলে গেল।

ওসমান পরিচয় করিয়ে দিল, 'ইনি আমার স্ত্রী। ইনি কৃষ্ণেন্দুবাবু, ইনি হীরেনবাবু।'

ব্যস্ত-সমস্ত ভাব কেটে গিয়ে ওসমান এখন শান্ত ও গম্ভীর হয়ে উঠেছে। উৎকণ্ঠার সঙ্গে সে আমিনার ভাব-ভঙ্গি লক্ষ্য করে। আমিনার অবস্থা সে ভাল করেই বুঝতে পারছিল ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত হাস্যকর হয়ে না যায়, এখন ওসমানের এই আশঙ্কা। বেশী কিছু আশা করে না সে আমিনার কাছে। পাঁচ ছ'মাস। আগে কৃষ্ণেন্দুর বাড়ীতে তার বৌদিদি কেমন সহজভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, তার সঙ্গে আলাপ করেছিল, ওসমানের মনে পড়তে থাকে। ওদের অভ্যাস আছে, ওদের কথা আলাদা। জীবনে আজ এই প্রথমবারের চেষ্টায় আমিনা কেন ওদের মত হতে পারবে। সে যেন শুধু ভেঙে না পড়ে, হঠাৎ যেন পালিয়ে না যায়!

কৃষ্ণেন্দু তার চেয়ারটি আমিনার কাছে এগিয়ে দিয়ে এসে বলল, 'বসুন।'

আমিনা অস্ফুটস্বরে কি বলল বোঝা গেল না। চেয়ারের পিঠে একটি হাত রেখে সে দাঁড়িয়ে রইল।

কৃষ্ণেন্দু অধ্যবসায়ী, সহজে হার মানে না।

'বাড়ীর ভেতর চড়াও হয়ে আপনাকে বড়ই জ্বালাতন করলাম।'

আমিনা একবার চোখ তুলে তাকাল।

'উপেনবাবু আর জলধরবাবুর মেয়েদের সঙ্গে আপনি খুব মেলামেশা করেন শুনেছিলাম। ওঁরা আমায় বলেননি, আমার সামনে ওঁরা বার হন না। আমার বৌদির কাছে শুনেছি।'

আমিনার মুখে ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল।

'আমাদের বাড়ীটা একটু দূরে। আপনি তো আর যাবেন না, বৌদিকে একদিন নিয়ে আসব।'

আমিনা মৃদুস্বরে বলল, 'আনবেন। আনবেন তো?' সংক্ষিপ্ত বিরামের পর সে আবার যোগ দিল, 'আমিও যাব।'

আমিনার কথার সুর আশ্চর্য রকম মিষ্টি। মিহি গলার মৃদু উচ্চারণে ক্ষীণ একটু ঝঙ্কারের আভা। মিশে থাকায় তার কথা পাখীর কূজনের মত অপূর্ব শোনায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বিধাসঙ্কোচের ভাব তার অনেকটা কেটে গেল। লেখাপড়া সে বিশেষ জানে না, বাইরের জগৎকে একরকম চেনে না। ওসমান নিজে তাকে কিছু কিছু পড়তে শিখিয়েছে, তারই

মারফত বাইরের জগতের দুটি একটি খবর সে পায়। অতিথি দু'জনকে সে আম আর দোকানের খাবার খেতে দিল। বার বার কৃষ্ণেন্দুকে মনে করিয়ে দিল, বৌদিকে নিয়ে সে যেন একদিন বেড়াতে আসে। আধ ঘণ্টা একটি অপরিণত শৈশব-আশ্রয়ী মনের সংস্পর্শে কাটিয়ে হীরেন মুগ্ধ ও কৃষ্ণেন্দু বিমর্ষ হয়ে বিদায় নিল।

'ম'বুব, আজিজদের বলে আসি চলুন আলি সা'ব, কাল থেকে ওরা যেন কাজে লাগে।' কৃষ্ণেন্দু বলল।

ওসমান বলল, 'আপনি কেন যাবেন? ডেকে পাঠাচ্ছি ওদের।'

'চলুন না আমরাই যাই। তাতে দোষ নেই আলি সা'ব।'

অনিচ্ছুক ওসমানকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণেন্দু গলি ধরে এগিয়ে চলল। ক্রমে ক্রমে পথ হয়ে এল সঙ্কীর্ণ ও অপরিচ্ছন্ন পথের ধারে জলের কলের কাছে বালতি কলসী নিয়ে পাঁচ-সাতটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে। রুক্ষ চুল, রুগ্ন দেহ, সায়া সেমিজের অভাববশতঃ ময়লা শাড়িখানিই দুফেরতা জড়ানো। পথের ধারে চাল ডাল তেল মসলার দোকানে নারী পুরুষ দৈনিক সওদা কিনছে, দু'এক, আধ-পয়সার। এরা তেল, নুন পর্যন্ত দিন কিনে দিনের প্রয়োজন মেটায়, একসঙ্গে কয়েকটা দিনের সওদা কিনে রাখবার পয়সা নেই। একটি খোট্টা মেয়ে তিনটি ছাগল তাড়িয়ে ডাইনের একটি বাড়ীতে ঢুকে পড়ল, তকমা আঁটা এক চাপরাসী এলুমিনিয়ামের পাত্র হাতে বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কোন এক বাবুর ছেলে ছাগলের দুধ খায়। কোথা থেকে ভিজে কাপড়ে আবির্ভূতা হয়ে একটি স্থূলাঙ্গী বাঙ্গালী যুবতী ওই বাড়ীতেই প্রবেশ করার সময় কৃষ্ণেন্দুর সামনে নির্ভীক নির্লজ্জতার সঙ্গে চাপরাসীকে বিলোল কটাক্ষ হানল, অকারণে থমকে দাঁড়িয়ে ভাল করে নিজেকে ঢাকবার ছলে মুহূর্তের জন্য বুকের আবরণ সরিয়ে দিল, তারপর ক্রুদ্ধ উপেক্ষার ভঙ্গিতে নাক সিঁটকে মুখ উঁচু করে ভেতরে চলে গেল।

হীরেনের চোখ কপালে উঠে গেছে দেখে কৃষ্ণেন্দু একটু হাসল।

'এটা বিজ্ঞাপন ভাই। পাঁজীর বিজ্ঞাপনের চেয়ে অশ্লীল ঠেকল? চাপরাসীটা যদি কেনে, আজ ওর আট আনা রোজগার হবে, কাল কুঁচো চিংড়ি আনিয়ে পেট ভরে ভাত খাবে। জোরালো শরীর বলে ওর খিদের তাগিদটা একটু বেশী। ব্যায়রামে ভুগে যখন শরীরটা ভেঙ্গে পড়বে, খিদে কমে যাবে, তখন আর এরকম অভদ্রতা করবে না।'

'ওকে চিনিস?'

'চিনি। ওর নাম কালী। ভীষণ দজ্জাল। বেচারীর কপালটা বড় মন্দ। না খেয়ে না খেয়ে স্বভাবটা বেশ নরম হয়ে আসে, একজন কাউকে পাকড়িয়ে তার সঙ্গে কয়েকদিন খুব ভাল ব্যবহার করে। পেটভরে খেয়ে গায়ে জোর হলে আবার আসল মূর্তি বেরিয়ে পড়ে। কাউকে নিজে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়, কেউ আপনার থেকে পালায়।'

বাঁ দিকে দু'হাত চওড়া একটা গলির মধ্যে প্রথমেই ম'বুবের বাড়ী। তিনজনে গলিতে ঢুকতেই কয়েকটা মুরগী উচ্চকিত হয়ে পালিয়ে গেল। গলির দুদিকেই টিন আর খোলার ঘর, পুরানো এবং জীর্ণ। আবরু রক্ষার জন্য দু'পাশের বাড়ীতেই এখানে ওখানে জীর্ণ চটের পর্দা ঝুলছে। তবু দরজার ফাঁক দিয়ে ম'বুবের উঠানের খানিকটা চোখে পড়ে। সেখানে কতগুলি ঘুঁটে গাদা করা, কাছে শুয়ে হাঁপাচ্ছে একটা লোমওঠা ঘেয়ো কুকুর। চোখ ফিরিয়ে নিতে কৃষ্ণেন্দুর নজরে পড়ল, এদিকের বাড়ীর ঠিক সামনের ঘরখানার ভেতরে একটি পনের ষোল বছরের ছেলে এই অবেলায় পড়াশোনা করছে। ঘরটি খুব ছোট, ভেতরে আবছা অন্ধকার। বেড়ার গায়ে ছোট জানালাটিতে বাঁশের বাতা বসানো। মাটির মেঝেতে চাটাই-

এর আসন পেতে ছেলেটি বসেছে, সামনে একটি কেরোসিন কাঠের চৌকো বাক্স হয়েছে তার টেবিল, তাতে কয়েকটি বই খাতা আর দোয়াত কলম। একটি বই খুলে অল্প আলোর জন্য বইয়ের পাতার ওপর ঝুঁকে ছেলেটি একমনে পড়ে চলেছে।

বাড়ীটা নেওয়াজের। কৃষ্ণেন্দু আনমনে বাঁশের বাতা বসানো জানালার ফাঁকে অধ্যয়নরত ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইল। কার কাছে সে শুনেছিল নেওয়াজের ছেলে থার্ড ক্লাসে উঠেছে। এতদিন খবর নেয়নি কেন?

ম'বুব, আজিজ, নেওয়াজের গোলমালটা মিটেও মিটল না। ওসমান বেলেঘাটার বসাকদের কারখানায় ঢুকেছে, এদের সাতজনকে লোকনাথের কারখানায় ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এরা আর কোন গোলমাল করতে চায়নি, কিন্তু উমাপদ ছাড়বার ছেলে নয়, সে এদের পেছনে লেগেছে। এদের ফিরিয়ে নেবার ইচ্ছা তার ছিল না, কৃষ্ণেন্দু আর হীরেন লোকনাথকে বুঝিয়ে রাজী করানোয় সে আর কিছু বলতে পারেনি। সেই রাগটা সে ঝাড়তে আরম্ভ করল এই বেচারীদের ওপর। ওই ছোট কারখানার সামান্য ব্যাপারটা যে কতখানি গুরুতর হয়ে উঠেছিল, হিন্দু-মুসলমান মজুরদের মধ্যে ধর্মগত একটা বড় রকম হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা তলে তলে আরম্ভ করে দিয়েছিল হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মেরই কয়েকজন ওস্তাদ ব্যক্তি, সেটা বুঝবার ক্ষমতা উমাপদর ছিল না। বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে কৃষ্ণেন্দু ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল।

লোকনাথের সঙ্গে দেখা করলে তিনি বললেন, 'কেষ্টবাবু, দয়া করে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবেন না।'

সেদিন সকালে ভারতের হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গের লাভজনক ব্যাপারে উৎসাহী একজন নাম করা ধনী হিন্দু নেতা যে লোকনাথের সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিলেন, কৃষ্ণেন্দু তা জানত না।

ভেবে-চিন্তে সে কারখানার সব মজুরকে জড়ো করে হীরেনকে সঙ্গে নিয়ে যায়।

হীরেন যায় অনিচ্ছার সঙ্গে কিন্তু বিনা প্রতিবাদে।

প্রতিবাদ করে না, কিন্তু আপসোস জানায়। নিশ্বাস ফেলে বলে, 'ঘরে বাইরে এত অশান্তি আমার সয় না কেষ্ট।'

'অশান্তিটা কিসের?' কৃষ্ণেন্দু শুধোয়।

'এই ঘরে মমতাকে নিয়ে, বাইরে তোকে নিয়ে।'

বলে সে একটু হাসবার চেষ্টা করে। ভীরু অপরাধীর মত কেমন এক ধরনের হাসি। তার জীবনে অশান্তি কথাটা যেন অন্যায়, তারই দোষ। এ ভাবটা হীরেনের দিন দিন বাড়ছিল। মমতা আর কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে কথা বলার সময় নিজেকে যতদূর সম্ভব লোপ করে দেয়—তার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ ভাল-লাগা ভাল-না-লাগার কথা মুখে এলে উচ্চারণ করেই গিলে ফেলে। ভেতরটা তার পুড়ছে। ঘুঁটের মত ধীরে ধীরে গোপনে। এটাও সে মানতে চায় না—জ্বালাটা পর্যন্ত। সে কি ছোট লোক, অমার্জিত, অসভ্য, স্বার্থপর যে আরিফ জেলে আছে, মমতা শান্ত হয়ে ফিরে এসে সন্ধি করেছে, তবু সে ঈর্ষায় জ্বলবে, সর্বদা মনে হবে মমতা তাকে ঠকিয়েছে, ঠকাচ্ছে, ঠকাবে।

যদি সে ভাবতে পারত যে মেয়ে জাতটাই এরকম। এটা ভাবতে গেলেই দিগম্বরীর কথা মনে ভেসে আসে—গেঁয়ো অশিক্ষিতা দিগম্বরী, স্বামী ছাড়া যার জগতে দ্বিতীয় পুরুষ নেই,

সেবা আর শ্রদ্ধা যার স্বভাব।

কৃষ্ণেন্দু হয়তো তাকে তুচ্ছ অনাবশ্যক মনে করে এ সন্দেহের জ্বালাটা যখন বেড়ে যায়, নিজেকে বড় একা মনে হয় হীরেনের, গভীর বিষাদ ঘনিয়ে আসে।

সন্দেহ সত্য হয়ে দাঁড়াবার ভয়ে সে কৃষ্ণেন্দুর ওপরে বন্ধুত্বের জোর খাটায় না, নির্বিরোধ ব্যবহারের চেষ্টা করে।

তাই, কৃষ্ণেন্দুকে চটাবে না বলে হীরেন মজুরদের সভায় গেল। দু'চার জন ছাড়া লোকনাথের কারখানার সকলে প্রায় একসময়েই মিস্ত্রীঘরে এসে জড়ো হল। কারখানা থেকে ওরা সোজা এখানে এসেছে। কৃষ্ণেন্দু তাদের জন্য খাবার জোগাড় করে রেখেছিল,—রুটি, তরকারী আর একটি করে গুড়ের সন্দেশ। পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত মানুষগুলি এই খাদ্য উদরস্থ করে ঢক্ ঢক্ করে এক ঘটি জল খেল, স্পষ্ট অনুভব করা গেল তাদের উপস্থিতির প্রকৃতিই যেন বদলে গেছে। অধীর উত্তেজনাপ্রবণ মানুষগুলি কয়েক মিনিটের মধ্যে হয়ে গেল ধীর ও শান্ত। এ বিষয়ে কৃষ্ণেন্দুর অভিজ্ঞতা আছে। সে জানে, পেট ঠাণ্ডা না করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে আলোচনা করার ক্ষমতা এদের হয় না।

আলোচনার গোড়াতেই জানা গেল, ম'বুব আজিজদের সম্পর্কে কারখানার অন্য সকলের মনে এতটুকু বিরুদ্ধভাব নেই, অনেকদিন তারা একসঙ্গে কাজ করছে। প্রতিবাদ না করলেও ওদের প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা তারা সমর্থন করে না। ক্ষমতা থাকলে প্রতিবাদও তারা করত।

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'তাই তোমাদের করতে হবে।'

এদের মধ্যে দীননাথ সবচেয়ে বিচক্ষণ, মাথায় কাঁচাপাকা চুল আর গায়ের ফতুয়াটির জন্য তাকে আরও বিচক্ষণ দেখায়। হীরেনের দিকে এক নজর তাকিয়ে সে উদাসভাবে বলল, 'আমরা কি করতে পারি বলুন?'

'এরা সাতজন যা করে, তোমরাও তাই করবে। এদের একজনকে উমাপদবাবু অপমান করলে বাকী ছ'জন গা পেতে নেয়, এবার থেকে তোমরা সবাই গা পেতে নেবে। দরকার হলে ওদের সঙ্গে তোমরাও বেরিয়ে আসবে কাজ ছেড়ে দিয়ে।'

কেউ কথা বলে না। কৃষ্ণেন্দুর কথা শুনতে শুনতে বার বার সকলের দৃষ্টি পড়তে থাকে হীরেনের ওপর। এই সভায় হীরেনের উপস্থিতি তাদের কাছে ধাঁধার মত হয়ে উঠেছে, সকলেই দারুণ অস্বস্তি বোধ করছে ; প্রথমে সকলে ভেবেছিল মধ্যস্থ হয়ে ব্যাপারটা মীমাংসা করে দেবার জন্য সে এসেছে, কর্তৃপক্ষ থেকে সে তাদের ভরসা দেবে যে ভবিষ্যতে কারখানার কারো প্রতি কোনরকম দুর্ব্যবহার করা হবে না। আপোস-আলোচনার পরিবর্তে যখন প্রতিকারের ব্যবস্থার কথা উঠল, হীরেনের সামনেই অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উমাপদর সমালোচনা করে কৃষ্ণেন্দু যখন বুঝিয়ে দিতে লাগল, ওই একটি লোকের গোঁয়ার্তুমির জন্যই বিশ্রী ব্যাপারটা সৃষ্টি হয়েছে এবং সে আর লোকনাথের একগুঁয়েমির জন্যই ব্যাপারটা মেটানো যাচ্ছে না, সকলে তখন এমন বিব্রত হয়ে পড়ল বলবার নয়। কারো কারো একথাও মনে হল যে এমনিভাবে বাপভাই-এর নিন্দা শুনিয়ে অপমান করবার উদ্দেশ্যেই হয়তো কৃষ্ণেন্দু ভুলিয়ে-ভালিয়ে হীরেনকে সভায় এনে হাজির করেছে।

হীরেনও প্রথমে কল্পনা করতে পারেনি তাকে ডেকে এনে কৃষ্ণেন্দু এভাবে অপদস্থ করবে। তারও ধারণা ছিল, সকলের অভিযোগ শুনে প্রতিকারের ব্যবস্থা করবে বলে সে কথা দেবে, এইটুকু কৃষ্ণেন্দু তার কাছে আশা করে। এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে যতই

সে অস্বীকার করুক তাকে দিয়েই কৃষ্ণেন্দু যে একটা মীমাংসা করিয়ে ছাড়বে, তাও হীরেন জানত।

প্রথমে অসহ্য বিস্ময় জাগল, তারপর অপমানে দুটি কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। কৃষ্ণেন্দুর দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই। লোকনাথ বা উমাপদর নিন্দায় যেন হীরেনের কিছু এসে যায় না, তার সামনে কারখানায় স্ট্রাইক শুরু করার পরামর্শ করতে যেন বাধা নেই, সে তাদের লোক, সে বিভীষণ। আগেও অনেকবার মনে হয়েছে, এখন আবার হীরেনের মনে হয়, এই অত্যধিক লম্বা, হাড্ডিসার কুদর্শন পুরুষটি তার সবচেয়ে নির্মম, সবচেয়ে হিংস্র শত্রু, এমনিভাবে ফাঁদে ফেলে তাকে আঘাত করার তীব্র আনন্দের জন্য দিনের পর দিন তার বন্ধু হয়ে থাকে; নিকটতম, প্রিয়তম বন্ধু। হৃদয়মন রামময় করে রাখতে চেয়ে, রামের হাতে মরতে চেয়ে, রাবণ রামের শত্রু হয়েছিল। সেও শত্রুতার ভান করেনি। জগতের ধনী আর স্ববের প্রতিনিধি হিসাবে সব সময় তাকে ঘৃণা করতে চেয়ে, তাকে আঘাত করার আনন্দ চেয়ে, কৃষ্ণেন্দু নিজেকে তার মিত্র করেছে।

'চুপ কর! স্টুপিড, রাস্কেল, চুপ কর বলছি।'

হীরেন উঠে দাঁড়িয়েছে! আকস্মিক স্তব্ধতায় কৃষ্ণেন্দুর বিস্মিত প্রশ্ন কি যে কর্কশ শোনালো বলবার নয় ঃ 'কি হয়েছে?'

হীরেন তার প্রশ্নের জবাব দিল না। উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে বলল, 'শোন বাপু, সকলে মন দিয়ে শোন। এসব বাজে ছেলেমানুষী বুদ্ধি ছেড়ে দাও। ম্যানেজারবাবু তোমাদের কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন না।'

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'তুমি যদি সেটা করে দিতে পার, তাহলে তো ভালই হয়।'

এ মন্তব্যও হীরেন কানে তুলল না। ম'বুব সকলের সামনে বসেছিল, তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি ম'বুব। দু'তিন মাস ধরে কারখানায় তোমরা নানা রকম গোলমাল করেছিলে, ম্যানেজারবাবুর যদি একটু রাগ থাকে তোমাদের ওপর, সেটা কি অদ্ভুত ব্যাপার কিছু? আবার যখন কাজে লাগলে, সবাই মিলে একবার গেলে না কেন ম্যানেজারবাবুর কাছে, নরমভাবে বললে না কেন ম্যানেজারবাবুকে, আগের কথা মনে করে তিনি যেন রাগ না রাখেন? মানিয়ে চলতে শেখোনি তোমরা।'

এধার থেকে ওসমান বলে উঠল, 'দু'দিন মাস ধরে কেউ কিছু অন্যায় কাজ করেনি হীরেনবাবু। যেচে ম্যানেজারবাবুর কাছে ঘাট মানতে যাবে কেন?'

হীরেন চটে গেল।—'তা যদি বলো—'

'এবার তুই চুপ কর।' কৃষ্ণেন্দু বলল, 'আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই আলিসাব। হীরেনবাবু যখন কথা দিলেন ম্যানেজারবাবু আর খারাপ ব্যবহার করবেন না, বাস্, এই খানে সব কথা খতম হোক।'

সকলে চলে যাবার পর অনেকক্ষণ গুম খেয়ে থেকে হীরেন জিজ্ঞেস করল, 'এটা কোনদেশী রসিকতা হল?'

'কোন্‌টা?'

'আমার কারখানার কুলিমজুরের কাছে আমায় অপমান করা?'

'অপমান কিসের? কারখানা তোর নয়। ওরা তোর কুলিমজুর নয়। তুই ওদের।'

'আমার হয়ে সেটা বুঝি ঠিক করেছিস তুই?'

'আমি তাই ধরে নিয়েছি।'

'বেশ করেছিস। ঘরে মমতা, বাইরে তুই। বেশ বাঁদর নাচাচ্ছিস দু'জনে আমাকে।'

আজ আবার একগাদা মদ খেল হীরেন। সেবার হোটেল থেকে মাতাল হয়ে বাড়ী ফিরে মমতার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল, আজ একটা বেঁটে লোকেব সঙ্গে মদ খেতে গেল একটা মেয়ের বাড়ী। তিনদিন সেখানেই তার কাটল।

মমতা ড্রাইভারের হাতে চিঠি পাঠিয়ে দেওয়ায় তাকে উদ্ধার করে আনল কৃষ্ণেন্দু।

তাবপর থেকে হীরেন মাঝে মাঝে মদ খায়।

দিন কাটতে থাকে, হীরেনের মধ্যে মদের পিপাসা জাগবাব কোন লক্ষণ দেখা যায় না। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় পাঞ্জাবীর দু'পকেটে নোট বোঝাই করে কোন এক মেয়েব ঘরে গিয়ে হাজির হয়। তাকে দেখেই মেয়েটির দু'চোখ লোভে জ্বল জ্বল কবে ওঠে, বাড়ীর ঘবে ঘরে অন্য মেয়েদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়, পাড়ায় খবব রটে যায়, সেই তিনি এসেছেন।

মেয়েটি তাকে ঘরে নিয়ে বসাতে-না বসাতে বেঁটে ফর্সা নিরীহ একটি লোক হাজিব হয়। আনন্দ জানায় না, উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে না, একবার জিজ্ঞাসাও কবে না—কেমন আছেন। কাল যেন তার হীরেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

তারপর সে ফিরে গিয়ে মদ পাঠাতে থাকে, ছোট বড় নানা আকারের নানা বোতলে। একে একে পাঁচ সাতটি দিন কেটে যায়, হীবেন বাড়ী ফেরে না, এ বাড়ীর বাইরেও পা দেয় না। মেয়েটির ঘরে মদ খায় আর ঘুমায়, ঘুমায় আর মদ খায়। দু'একদিন কাটবাব পরেই কয়েকটি বিশিষ্ট বন্ধু কি ভাবে যেন আন্দাজ করে নিয়ে আসা শুরু করে, কোন কোনদিন সন্ধ্যার পর মেয়েটির ঘরে ডজনখানেক মানুষের সমাবেশ পর্যন্ত ঘটে যায়। নিরীহ বেঁটে লোকটি ইতিমধ্যে একবারও দেখা দেয় না। দুপুরে হোক, সন্ধ্যায় হোক, রাত্রি তিনটেয় হোক, খবব পাঠানো মাত্র বোতল পাঠিয়ে দেয়।

তারপর খবর আসে কৃষ্ণেন্দুব কাছে। খবর যে দিতে আসে তাকে কৃষ্ণেন্দু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করে, 'আর দু'চার দিন চালালে মববে মনে হয়? যদি মরতে পাবে দু'চার দিনে, তবে কটা দিন পরেই যাব।'

আধঘন্টার মধ্যে কৃষ্ণেন্দু মেয়েটির ঘরে গিয়ে পৌঁছয়। হয়ত দেখা যায় মেয়েটি তার চেনা, আগেও দু'একবাব এর ঘর থেকেই হীরেনকে সে উদ্ধার কবে নিয়ে গেছে।

'কখানা গয়নার দাম তুললে ভাই?' কৃষ্ণেন্দু তাকে জিজ্ঞেস কবে।

'বন্ধুকেই শুধোন না?' মেয়েটি হাসে, 'মদের দেনা দাঁড়িয়েছে।'

মদের দেনা, তোমার দেনা, সব মিটিয়ে দেবে ভাই, ভেবো না।'

'তা দেবে। আনা পাই হিসেব কবে দেবে। মদের দামেব একশো ভাগের এক ভাগ যদি আমি বখশিস চাই, বলবে, তোমায় দেবো কেন? তুমি তো কমিশন পাবে।' বলে তুড়ি দিয়ে মেয়েটি মুখে শব্দ কবে, 'ফুস!'

হয়তো কয়েক ঘন্টার বিরাম গেছে, হীরেনের নেশা তখন কম। কৃষ্ণেন্দুকে দেখে বালিশ থেকে মাথা তুলবার চেষ্টা করে সে শুধু হাসে। খাটে উঠে জোড়াসন হয়ে বসে কৃষ্ণেন্দু বলে, 'কিরে হতভাগা!'

'শনি এলে তো?' হীরেন বলে।

'গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, দয়া করে গা তুলুন।'

আগে থেকে অনুমান করে টাকা কৃষ্ণেন্দু সঙ্গে নিয়ে যায়, বন্ধুকে নিয়ে চলে আসবাব

আগে সব দেনা সে মিটিয়ে দেয়। টাকা সে পরে হীরেনের কাছ থেকে আদায় করে নেবে, নিজের কাজে তার অনেক টাকা দরকার, মদের দাম মিটিয়ে সে-টাকা চেয়ে নিতে ভুলে যাওয়ার মত খাতির এ জগতে কারো সঙ্গে তার নেই। বেঁটে ফর্সা নিরীহ লোকটি আসে, টাকা বুঝে নিয়ে চলে যায়।

কৃষ্ণেন্দু মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমায় কত দেব ভাই?'

মেয়েটি বলে, 'যা খুশী দিন।'

হীরেন হয়তো এতক্ষণ চোখ বুজে থাকে, কৃষ্ণেন্দু কাকে কত দিচ্ছে সে বিষয়ে তার কিছুমাত্র মনোযোগ আছে মনে হয় না। এইবার হঠাৎ সে সজাগ হয়ে ওঠে।

'আজ কি বার?'

'বুধবার।'

'আরেক মঙ্গলবার এসেছিলাম। আজ ধরে ন'দিন। প্রথম দিন ত্রিশ টাকা, তারপর পঁচিশ টাকা করে। ওকে দুশো ত্রিশ টাকা দে।'

মুখ কালো করে কৃষ্ণেন্দুর দিকে চেয়ে মেয়েটি বলে, 'দেখলেন?'

হীরেন বলে, 'দেখলেন কি? যা কথা হয়েছে তোমার সঙ্গে তাই দেওয়া হচ্ছে। এক পয়সা কম দিচ্ছি যে ওকে সাক্ষী মানছ?'

কৃষ্ণেন্দু নিঃশব্দে দুশো ত্রিশ টাকা গুণে মেয়েটির হাতে দেয়। নোটগুলি হাতে নিয়ে ভয় বিস্ময় ও বিদ্বেষ মেশানো এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে মেয়েটি তাকিয়ে থাকে হীরেনের দিকে।

হীরেনকে ট্যাক্সিতে বসিয়ে কৃষ্ণেন্দু হঠাৎ একবার নেমে যায়। চট করে বাড়ীর ভেতর গিয়ে কতকগুলি নোট মেয়েটির হাতে গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে আসে।

হীরেন সন্দিগ্ধ মনে বলে, 'তুই ওকে টাকা দিয়ে এলি ইন্দু।'

কৃষ্ণেন্দু বলে, 'না। কিছু ফেলে এসেছিস কিনা দেখে এলাম!'

এতক্ষণ পরে তাকে ভয়ানক গম্ভীর দেখায়। হীরেন আজে বাজে কথা বলে, সে গুম খেয়ে থাকে। বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে কৃষ্ণেন্দু বলে, 'টাকা দেবার জন্যে, কিছু ফেলে এসেছ কিনা দেখবার জন্যে, তোকে আর ফিরে যেতে হবে না। মনে থাকবে?'

তখন হীরেন কাতরভাবে তার চিরন্তন কৈফিয়ত জানায়। বলে, 'ঘরে বাইরে এত অশান্তি আমার সয় না ইন্দু।'

ছয়

কয়েকটি ছোট বড় হাঙ্গামার ব্যাপার নিয়ে কৃষ্ণেন্দু বিব্রত হয়ে ছিল। সবগুলিই শ্রমিক সংক্রান্ত ব্যাপার। এক সময়ে ছোট বড় এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন কল-কারখানায় এত বিভিন্ন কারণে গোলমাল শুরু হতে সে কখনো দ্যাখেনি। নতুন চেতনার লক্ষণ আবিষ্কার করে পুলকিত হবার চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়ে যায়। চেতনা কই? জোরালো একটা অসন্তোষ সাড়া দিচ্ছে, রূপ নিচ্ছে, এইটুকু শুধু সে অনুভব করতে পাবে। অধিকারের দাবী কেউ তুলছে না। কয়েকটি অন্যায় ও অবিচারেব প্রতিকার শুধু চাইছে। তাও আবার পুরোপুরি নিজেদের ভেতরকার তাগিদে নয়।

অনেক সঙ্ঘ ও সমিতি তাদের ব্যাপারে কৃষ্ণেন্দুর হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না। চেষ্টা করেও

কৃষ্ণেন্দু সেখানে আমল পায় না।

'এই নিয়ে ধর্মঘট করবেন না। অনর্থক শক্তি ক্ষয় হবে।' কৃষ্ণেন্দু বলে।

'আপনি ওসব বুঝবেন না।' বলে খদ্দর পরিহিত সোনাব চশমা লাগানো ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িযুক্ত সমিতি।

'বুঝব বৈকি। কাল পরশু শুরু করে দিন সাতেক স্ট্রাইক চালাতে পারলে ফণ্ডে কিছু টাকা আসবে।'

'তবে তো বুঝতেই পারছেন। টাকা সম্পর্কে আপনার মত জানি না, আমবা টাকাটা খুব দরকাবী মনে করি। আমরা দেখেছি, টাকা দিযে এদের যত ভাল করা যায়, বক্তৃতা দিযে উপদেশ শুনিয়ে তার সিকিও হয় না। প্রোপাগাণ্ডার পেছনেও আমবা টাকা খবচ করি না যে তা নয়।'

'চিন্তামণি মিল কি খুব বেশী টাকা দেবে?'

'মন্দ দেবে না। তাই বা পাচ্ছি কোথা বলুন?'

'কিন্তু এরা যদি অর্ডারটা না পায়—স্ট্রাইক সুরু হলে পাবেও না—এদের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে ভেবেছেন কি? এদের কাজ কমিয়ে ফেলতে হবে। বহু লোক ছাড়িয়ে দেবে।'

'তেমনি চিন্তামণি যদি অর্ডারটা পায়, ওদের কাজ বাড়াতে হবে। বহু লোকও নেবে।'

'খুব বেশী নেবে কি? বাজার মন্দা চলছে, ওরা অন্য কাজ কমিয়ে দেবে। আপনারা কার লাভ দেখছেন বুঝতে পারছি না।'

'আপনি বুঝবেন না।'

এই সময় ঝুমুরিয়া থেকে বীরেশ্বব একদিন তাব সঙ্গে এসে দেখা করল। তাব সাহায্য ও পরামর্শ চায়।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে একটা পাকা রাস্তা শ্রীনাথপুব হয়ে সদরে চলে গেছে। মাইল দশেক পশ্চিমে খড়গপুরের পথ। শ্রীনাথপুব থেকে একটি নতুন বাস্তা ঝুমুবিয়ার পাশ দিয়ে নিয়ে খড়গপুরের রাস্তায় মিলিযে দেওয়া হবে। ঝুমুবিয়ার আগের ও পরের মাইল পাঁচেক পথ তৈরী করে দেবার কনট্রাক্ট হেরম্ব চক্রবর্তীব। অন্য কাজেব ভিড়ে নিজে সে প্রথমে রাস্তা তৈরীর কাজটার দিকে বিশেষ নজর দিতে পাবেনি, এতদিন কাজও এগোয়নি একেবাবেই। সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে আসায় হেবম্ব এবার প্রবল বেগে কাজ আবম্ভ কবে দিয়েছে। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে নানা অত্যাচার। বাস্তাব বাকী অংশ যারা ঠিকে নিয়েছে প্রথম থেকে আশেপাশেব সাঁওতাল কুলীদের তারা কাজে লাগিযে দিয়েছিল। হেবম্ব আসা মাত্র তাবা কাজ ছেড়ে চলে গেছে। দূর থেকে লোক এনেও হেরম্ব কুলোতে পাবছে না। ঝুমুবিয়া আর আশেপাশের গ্রামের তার প্রজাদের ধবে বেঁধে কাজে লাগিয়ে দিচ্ছে। যেখানে যার গরুব গাড়ী পাচ্ছে তাই দখল করছে। বর্ষার আগে এখন চাষের জন্য জমি ঠিক করতে হবে, জমি ফেলে বেখে বহু লোককে গাছ আর মাটি কাটতে হচ্ছে, গরুর গাড়ীতে রাস্তার মালমশলা বইতে হচ্ছে! যেখানে একটু তফাৎ থেকে মাটি আনবার দরকার হয় সেখানে কাছাকাছি ফসলের জমি খুঁড়ে মাটি তোলা হচ্ছে, জমির মালিককে দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া হচ্ছে খতে। কুলিদের জন্য কম দামে জবরদস্তি চাল কেনা হচ্ছে। এইবকম আবও অনেক কিছু।

বীরেশ্বর এবং আরও কয়েকজনেব সঙ্গে হেবম্বের বাড়তি ঠোকাঠুকি চলছিল। তাদের কিছু ভাল ডাঙ্গা জমি রাস্তার কবলে পড়েছে। চার বছর আগে যখন এই জমি কেনা হয়েছিল,

চাষের যোগ্য দামী ডাঙ্গা জমি গণ্য করেই তখন দাম ঠিক হয়। পতিত মেঠো জমিকে চাষের জমি বলে ঘোষণা করার জন্য বীরেশ্বর এবং আরও তিনজনের নামে হঠাৎনালিশ হয়েছে। হেরম্ব শ্বশুর জমিদার, সে স্বীকার করেছে এই জমিতে কোনদিন চাষ হত না। বীরেশ্বর যে দলিল-পত্র দাখিল করেছিল সেগুলি কাছাকাছি অন্য জমি সম্পর্কে। রাতারাতি ওইসব জমিতে হেরম্ব ছোট ছোট কয়েকটি ঘর তুলে কয়েকজন লোক বসিয়ে দিয়েছিল, তারা ঘোষণা করছে যে বহুকাল ওইখানে তাদের বসবাস. এই জমিতে কখনো লাঙল পড়ে না, ঘর তুলবার জন্য বছরে তারা এত এত খাজনা দেয় বীরেশ্বরকে। এই যে খাজনার রসিদ।

একরাত্রে ঘেরা জাল ফেলে বীরেশ্বরের পুকুর থেকে দেড়শ' দু'শো টাকাব মাছ তুলে হেরম্ব কুলি মজুরদের বিলিয়ে দিয়েছে।

আশেপাশে আরও কুয়ো আছে। বীরেশ্বরের বাড়ির ভেতরের উঠানের কুয়ো থেকে সারাদিন খাবার জল নেবার জন্য লোক আসছিল। দু'তিন দিন চুপচাপ সহ্য করে কাটাল বীরেশ্বর, তার দুই ছেলে আর গাঁয়ের কয়েকটি লোক দা' লাঠি হাতে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের ভেতরে ঢুকতে দেয়নি। এবার কি হবে ভগবান জানেন!

'হেরম্ব চক্রবর্তীর এত রাগ হবার কারণ কি?'

'কারণ তো সব বললাম। আমরা গাঁয়ের অনেকে একত্র হয়ে অন্যায় অত্যাচারে বাধা দিচ্ছি, এইটাই আসল রাগ। মেয়েমানুষ সংক্রান্ত একটা ব্যাপারও আছে।'

দু'এক দিনের মধ্যে একবার ঝুমুরিয়া যাবে কথা দিয়ে কৃষ্ণেন্দু তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিল। যেতে যেতে তার দেরী হয়ে গেল দিন পাঁচেক। বিকাল চারটার সময় ঝুমুরিয়া পৌঁছে শুনল, দুদিন আগে বীরেশ্বর খুন হয়ে গেছে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে দাঙ্গা বাধো বাধো অবস্থায় পুলিশ এসে পড়ে। বীরেশ্বরের দলকে ছত্রভঙ্গ করবাব জন্য পুলিশ বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে– তারপরই দেখা যায়, বন্দুকের গুলি লেগে বীরেশ্বর শেষ হয়ে গেছে। পুলিশের গুলিতে নয়, পুলিশ ফাঁকা আওয়াজই করেছিল, গাদা বন্দুক দিয়ে বীরেশ্বরকে মারা হয়েছে। পরীক্ষার পর জানা গেছে বন্দুকটি বহু পুরানো ধাঁচের, গুলি বা ছর্‌রাব বদলে পেরেক, লোহার টুকরো, পাথরের কুচি দিয়ে গাদা হয়েছিল। বন্দুকটি কার, কে ছুঁড়েছিল, কিছুই জানা যায়নি। আওয়াজ হওয়ার পর হৈ চৈ গণ্ডগোলের মধ্যে অনেকক্ষণ কেউ একা খেয়ালও করতে পারেনি যে অন্য বন্দুক ছুঁড়ে কেউ বীরেশ্বরকে খুন করেছে।

কৃষ্ণেন্দু গাঁয়ে থাকবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেনি। পরদিন বেলা বারোটার গাড়ীতে সে চলে এল। অন্ততঃ এক সপ্তাহ ঝুমুরিয়ায় থাকবার জন্য প্রস্তুত হয়ে তাকে ফিরে যেতে হবে। বাড়ী পৌঁছল সে রাত দশটায়।

কনক বলল, 'রম্ভা দু'বার তোমার খোঁজ করে গেছে ঠাকুরপো।'

'রম্ভা খবব পেয়েছে নাকি?'

'খবর জানতে এসেছিল।'

রামপালের বাড়িতে খবর দিতে যাওয়ার আগে হীরেনকে সে ফোন করল। বলল, 'কিছু টাকা খসাতে হবে ভাই। কাল বারোটার মধ্যে হাজার খানেকের একটা চেক ভাঙ্গিয়ে রাখিস।'

'আমার টাকা নেই।'

'রম্ভাব বাবা খুন হয়েছে।'

'রামপালের বৌ রম্ভা? কবে? কোথায়?'

খবর দিতে কৃষ্ণেন্দু এত রাতে রামপালের বাড়ী যাবে শুনে হীরেন একটু ভেবে বলল, 'দাঁড়া আমিও আসছি।'

কৃষ্ণেন্দুর গলার আওয়াজ পেয়ে রম্ভা বিছানা ছেড়ে উঠে এসে বলল, 'ভিতরে আসেন মেজবাবু।'

একটি মাত্র বেতের মোড়া রম্ভার সম্বল। মোড়াটি হীরেনকে দিয়ে সে পিঁড়ি পেতে কৃষ্ণেন্দুকে বসতে দিল। রামপালকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, আবার সে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার উপক্রম করছে দেখে জোবে জোরে ঠেলা দিয়ে কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'ক্যামনধারা মানুষ তুমি?'

উঠে বসে হাতের আড়ালে রামপাল মস্ত হাই তুলল, কৃষ্ণেন্দু আর হীরেনের সম্মান রাখতে চৌকি থেকে নেমে মেঝেতে বসে নিদ্রালস চোখে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল।

রম্ভার চোখে গভীর ঔৎসুক্য এবং উৎকণ্ঠা। বারবার সে কৃষ্ণেন্দুর মুখের দিকে তাকাতে লাগল, কিন্তু হঠাৎ কিছু জিজ্ঞাসা করতে তার সাহস হল না। মুখচোখের ভাব একান্ত নির্বিকার রেখে কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞেস করল রামপালকে, 'তোমার শরীর কি ভাল নেই রামপাল?'

মাথায় একটি ঝাঁকি দিয়ে লজ্জিতভাবে বলল, 'আজ্ঞে, যা বলেন।'

'সিদ্ধি গিলেছ, না?'

রামপাল চুপ।

'তুমি একটি অদ্ভুত জীব, রামপাল।' কৃষ্ণেন্দু মৃদু ও অমায়িক হাসির সঙ্গেই বলে, 'তোমার মত আর দেখলাম না। এমন আলসে অকর্মণ্য হয়ে থাক কেমন করে?'

'দিন ভর কাঠ চিরি মেজবাবু।'

'আর কেউ চেরে না?, তারা তো তোমার মত নিঝুম মেরে যায় না?'

এসব বাজে কথা। রম্ভার আশঙ্কা বাড়তে থাকে। কৃষ্ণেন্দুকে সে জানে। যত গুরুতর বিষয় হয়, কথা আরম্ভ করতে তার ব্যস্ততা দেখা যায় তত কম, তুচ্ছ কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে তত বেশী। ভেতরে সে যে খুব উদাসীন হয়ে থাকে তা নয়, বাইরে এই ভাব দেখায়। অন্যদিন হয়তো তার এই খেয়ালকে রম্ভা প্রশ্রয় দিত, আজ সে আর সবুর করতে পারল না।

'খবর পেয়েছেন কেষ্টবাবু?'

'খবর ভাল নয় রম্ভা।'

শুনে মুখ পাংশু হয়ে যায় রম্ভার:

'জানি বাবাকে জেলে দিবে, ছাড়বেনি।'

'জেল নয় রম্ভা, তোমার বাবার জেল হলে তো বলতাম, খবর ভাল। তোমার বাবা, কি জান রম্ভা,—' কৃষ্ণেন্দুকে একবার ঢোক গিলতে হয়,—'বেঁচে নেই।'

রম্ভার বাবা ভাল আছে এই খবরটা যেমন তাচ্ছিল্যভাবে জানানো চলে তার বাবার অপমৃত্যুর সংবাদটাও ঠিক তেমনি ভাবে জানিয়ে দেবে ভেবেছিল, রম্ভা যাতে বুঝতে পাবে যে কেবল ছোটখাট ব্যাপারে নয়, মৃত্যুর মত ভয়ানক ব্যাপারেও ভাবপ্রবণতা তার কাছে প্রশ্রয় পায় না, সে পাথরের মত কঠিন। বলার সময় দ্বিধা বোধ করে, রম্ভার বাবাকে খুন করে ফেলা হয়েছে বলতে চেয়ে শুধু সে বেঁচে নেই বলে, নিজের মুখের চেহারা বদলে গেছে টের পেয়ে, কৃষ্ণেন্দু অনেকদিন পরে নিজের কাছে গ্লানিকর লজ্জা বোধ করল। নিজের তার ভাব প্রবণতা নেই, নিজের সম্বন্ধে এই ধারণা যে তার ভাবপ্রবণতা থেকেই জন্ম নিয়েছে,

এটা আর কোন মতেই অস্বীকার করা গেল না। বরং রামপালের অবিচলিত, সম্পূর্ণ না হোক প্রায় অবিচলিত, ভাব দেখে সে মনে মনে একটু ঈর্ষাই যেন বোধ করতে লাগল।

কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে থেকে ডুকরে কেঁদে উঠল রম্ভা। এ আশঙ্কাও তার মনে মনে ছিল, তাই বাপকে যে তার মেরে ফেলা হয়েছে, স্বাভাবিক মরণ তার ঘটেনি, এটুকু তাকে আর বলে দেবার দরকার হল না। কৃষ্ণেন্দু কি কি বলতে যাচ্ছিল, হীরেন বাধা দিয়ে বলল, 'চুপ। কাঁদতে দে।'

রম্ভা শুনতে পেয়ে কান্নার মধ্যেই বলল, 'এট্টু কেঁদে নি—এট্টুখানি কেঁদে নি।'

দুর্গা ও লক্ষ্মী একটু পরেই ঘরে ঢুকে রম্ভাকে ঘিরে বসল, নিমাই ও পরেশ দাঁড়িয়ে রইল দুয়ারের কাছে। ব্যাপারটা তাদেরও জানা ছিল, রম্ভার মড়া কান্নার অর্থদ্যোতক শব্দগুলি শুনেই তারা মোটামুটি অনুমান করে নিতে পারল কি ঘটেছে। ঘটনা নয়, ফলাফলটি।

রম্ভা একা কাঁদলে হয়তো অল্পক্ষণের মধ্যেই কান্না স্থগিত করে দরকারী কথা আলোচনার সুযোগ দিতে পারত, লক্ষ্মী আর দুর্গা তার সঙ্গে যোগ দেওয়ায় কান্নার আবেগ তার ফুলে ফেঁপে উথলে উঠতে লাগল। কান্নায় ভাঁটা পড়ার অপেক্ষায় বসে থাকলে রাত ভোর হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে দেখে কৃষ্ণেন্দু এক সময় বাধা দিয়ে বলল, 'শুধু কেঁদে আর কি করবে রম্ভা, 'কেঁদো না। এর একটা বিহিত করা চাই।'

'আর কি বিহিত করবেন কেষ্টবাবু।' রম্ভা বলল কাঁদতে কাঁদতে।

'সেই কথাই বলছি রম্ভা। কান্না থামিয়ে শোনো।'

বার কয়েক জোরে জোরে শ্বাস টেনে রম্ভা থামল। তবু, থেকে থেকে নাক আর ঠোঁট তার ফুলে ফুলে উঠতে লাগল, ভেতর থেকে শোক ঠেলে উঠতে চাইছে। লক্ষ্মী ও দুর্গা মাঝে মাঝে অস্ফুট স্বরে আপসোসের আওয়াজ করতে লাগল, হৃদয়ের কোমল অস্থি যেন বেদনার ভারে মচ মচ করছে। হীরেন ভেবেছিল, বাপকে তার গুলি করে মারা হয়েছে শুনে রম্ভা না জানি কি কাণ্ডটাই করবে, এদের শোক করার রকম দেখে সে একটু থ'-ই বনে গেল। রামপালের ব্যাপারটা সে মোটেই বুঝতে পারছিল না। চোখ দুটি রামপালের এতক্ষণ ছল ছল করছিল, মুখখানা অত্যন্ত করুণ করে সে তাকিয়েছিল রম্ভার দিকে। আগাগোড়া সে চুপ করে আছে, কোন প্রশ্ন করে নি, মন্তব্য জানায়নি। বৌ-এর শোক দেখে সে যদি হৃদয়বেদনাতে কাতর হয়ে থাকে, উদ্যোগী হয়ে কিছু জানবার বুঝবার কৌতূহল তার নেই কেন? এবার সে বিছানার হাতখানেক পিছনে সরে বেড়ায় খুঁটিতে ঠেস দিয়ে চোখ দু'টি অর্ধেকের বেশী বুজিয়ে দিল। মুখে তার ফুটে রইল সেই অসহায় করুণ ভাব, দীনতার ব্যথা প্রকাশের ভঙ্গির মত। রম্ভার দুঃখে তার সমবেদনা জেগেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই অনুভূতিরই আবেশে নিজে সে যেন হয়ে গেছে বিভোর।

'তুমি যে একেবারে চুপ করে গেলে রামপাল?' হীরেন শুধোল।

'কি বলব বলুন?' রামপাল বলল, ভেজা করুণ গলায়।

'তোমার রাগ হয় না? গা জ্বালা করে না?'

'রাগ হলে আর করছি কি!'—চোখ মেলে রামপাল যেন একটু সজাগ হয়ে উঠল, জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'তাও বলি বাবু, শ্বশুরমশায়েরও বাড়াবাড়ি ছিল খানিক। হেরম্ববাবু লোক কি সোজা না মানুষটা সে হেজিপেজি যে তার সাথে গায়ে পড়ে লাগতে যাওয়া? লাখোপতি লোক। সবাই তার বশ—পুলিশ তক্। পেটে পেটে তার প্যাঁচ। নয়তো পুলিশের ফাঁকা আওয়াজের সাথে পুরানো গাদা বন্দুক ছুঁড়বার বুদ্ধি কি যার তার মাথায়

আসে? সে সনাক্ত হবে না। হয়তো লাইসেন্স নেই, কিছু নেই, কেউ জানে না সে বন্দুকের খবর।'

কৃষ্ণেন্দু ব্যঙ্গ করে বলল, 'তুমি তবে সব শুনেছ রামপাল ? আমার মনে হচ্ছিল তুমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছ, এসব কথা শুনতে তোমার ভাল লাগে না।'

রামপাল নির্লিপ্তভাবে বলল, 'মুখ বুজে থাকলে কানে শুনতে বাধা কি কেষ্টবাবু? কথা না কইলে তো কালা হয়ে যায় না মানুষ।'

কৃষ্ণেন্দু রেগে বলল, 'কথা কইতে হয় রামপাল। বৌয়ের বাপকে একজন কুকুর বেড়ালের মত গুলি করে মেরেছে শুনলে কথা কইতে হয়। মনে মনে যদি বুঝতেও পেরে থাক বীরেশ্বর বোকামি করেছে, যেমন কর্ম তেমন ফল হয়েছে তার, তবু কথা কইতে হয়।'

শুনে রামপাল দমে গেল। ডান হাতের তালুতে একবার মুখ মুছে বিড়বিড় করে বলল, 'কি জানি কেষ্টবাবু, জানি না । হাঁ, দুঃখু হয় বৈকি আজ্ঞা, নিশ্চয় হয়। শুনলে মনটা খারাপ হয়ে যায়।'

তারপর রামপাল আর মুখ খুলল না। কথা কইল কৃষ্ণেন্দু। নিষ্ঠুর সরলতার সঙ্গে কাঁটাছেঁড়া সহজ ভাষায় সে বলে গেল মানুষের ব্যবহারের কথা। বীরেশ্বরের অপমৃত্যু যার নমুনা। এর চেয়ে ভীষণ, এর চেয়ে বীভৎস, এর চেয়ে মর্মান্তিক আলোচ্য বিষয় মানুষ তো আজ পর্যন্ত কল্পনাতেও আবিষ্কার করতে পারেনি। কৃষ্ণেন্দু নিজেকে সামলাতে পারল না। মানুষ ভাগ হয়ে গেল হেরম্ব আর বীরেশ্বরে ঃ যুগযুগান্ত ধরে হাজার হাজার হেরম্বের চোরা গুলিতে কোটি কোটি বীরেশ্বর মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে লাগল। অহরহ যে গভীর ক্ষোভ থমথম করে কৃষ্ণেন্দুর মনে, বস্তার শোকের তাড়নে আজ বুঝি তাতে ঢেউ উঠেছে, কি যে ম্যাজিক এসেছে তার কথায়। রামপালের খোলার ঘরে আজ মাঝ রাত্রে অনায়াসে যে অদ্ভুত এক প্রভাব সে সৃষ্টি করল, উৎসাহী, চিন্তাশীল, দরদী মানুষের বড় বড় আসরে প্রাণপণ চেষ্টাতেও সে তা কোনদিন পেরে ওঠেনি। সে চুপ করে যাবার পরেও কিছুক্ষণ পর্যন্ত মনে হতে লাগল, পুরানো লণ্ঠন থেকে যেমন অবিরাম ক্ষীণ লালচে আলো ঘরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তেমনিভাবে এই মানুষটার ভেতর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সারা বিশ্বের নিপীড়িত আত্মার, শুধু আজকের নয় গত এবং আগামী কালেরও, অফুরন্ত স্পন্দন। তার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘরের নরনারী ক'জন স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। আজ তাদের প্রথম ভারবাহী পশুর জীবনের উপলব্ধি এসেছে।

প্রতিবাদ করল রামপাল। সে বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

'এমন করে শোকটা কি উস্কে দিতে হয় কেষ্টবাবু? রাত ভোর গোঙাতে লাগবে।'

দমকা বাতাসে যেমন ধোঁয়া উড়ে যায়, রামপালের মন্তব্যে তেমনি উড়ে গেল এতগুলি হৃদয়ের তীব্র তপ্ত অনুভূতির বাষ্প। মুখে মৃদু হাসি দেখা দিয়েছে খেয়াল হওয়া মাত্র হীরেন তাড়াতাড়ি মুখখানা অত্যধিক গম্ভীর করে ফেলল। চোখ বুজে আবার চোখ ছলছলিয়ে এল বস্তার। খাল ধার থেকে ফুরফুরে হাওয়া আসছে ছোট জানলাটি দিয়ে, জানলার পাটে লেজ বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে পোকা ধরছে একটা টিকটিকি। ওদিকে ঘুম ভেঙে কাঁদছে দুর্গার ছেলে।

কথা কইতে মনে হল কৃষ্ণেন্দুর গলাটা যেন একটু ভোঁতা হয়ে গেছে।

'বেশী কাঁদাকাটা কোরো না বস্তা। কাল এখানকার সব ব্যবস্থা করে পরশু ঝুমুরিয়া যাব। তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি, তোমার বাবার মরণের একটা বিহিত না করে ফিরব না।'

শুনে রম্ভা আবার কাঁদবার উপক্রম করে বলল, 'আমিও যাব ঝুমুরিয়া।'

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'আমি তো আর তোমায় নিয়ে যেতে পারব না রম্ভা, রামপালকে বল।'

রম্ভা সজল চোখে রামপালের দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণের জন্য মনে হল রামপাল বুঝি কোন জবাব দেবে না। তারপর ধীরে ধীরে সে বলল, 'তা একবার নিয়ে যেতে হবে বৈকি।'

খানিক পরে কৃষ্ণেন্দু আর হীরেন বিদায় নিল, নরেশ ঘরের বাইরে দুয়ারের কাছে উবু হয়ে বসে ছিল, সেদিন মার খাওয়ার পর থেকে সহজে সে কৃষ্ণেন্দুর ধারে কাছে ভিড়তে চায় না। যাবার সময় হঠাৎ সে আজ কৃষ্ণেন্দুর দু'পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বসল। তার মনের বাষ্প তখনো উপে যায়নি।

'এ আবার কি?'

'কিছু না মেজোবাবু।'

'তুমি একটি আস্ত উল্লুক, নরেশ। ওসব ভক্তি-টক্তি আমার কাছে চলবে না।'

'আজ্ঞে না।'

তখন নরম হয়ে কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় ছিলি এতদিন?'

নরেশ ঢোঁক গিলে বলল, 'হেথায় হোথায় ছিলাম। আমাকে ঝুমুরিয়া লেবেন সাথে? আমিও একচোট লড়ব মেজোবাবু।'

'কার সাথে লড়বি?'

'হেরম্ববাবুর সাথে।'

কৃষ্ণেন্দু মৃদু হেসে হীরেনকে বলল, 'হুকুম দিলে ও এখন হারাকিরি পর্যন্ত করতে পারে হীরেন।'

হীরেন মাথা নেড়ে বলল, 'আমার সন্দেহ আছে। ছুরিটা পেটে ঠেকাতে পারবে, তারপর কি করবে বলা কঠিন। আমি ভাবছি রামপালের কথা। লোকটা এমন অপদার্থ জানতাম না।'

'ওরা সবাই এরকম। কত চেষ্টায় ওদের কাছে কতটুকু সাড়া পাই জানলে চোখে তোর জল আসত। চেহারা দেখে মনে হয় রামপালের মধ্যে বুঝি কিছু আছে, অন্ততঃ থাকা উচিত, ওর সম্বন্ধে তাই বেশী হতাশা জাগে। নয়তো আর দশজনের চেয়ে বেশী অপদার্থ লোকটা নয়।'

দাওয়া থেকে নামবার আগে দু'জনেই মুখ ফিরিয়ে একবার ঘরের মধ্যে তাকাল। রামপাল শুয়ে পড়েছে। গানের মত মিহি সুরে রম্ভা আবার শোক শুরু করেছে। নরেশের আবেদনের জবাব দিতে ভুলে গিয়ে হীরেনের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু চলে গেল।

ঘন্টা দুই পরে রামপালের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঠেলে ঠেলে তাকে জাগিয়েছে রম্ভা। জাগিয়েই একটু তফাতে সরে গিয়ে সে বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না শুরু করে দিল। একবার সে রামপালের বুকে আসতে চায়, একটু সহানুভূতি চায় তার কাছে।

রামপাল তাকে হঠাৎ সজোরে বুকে চেপে ধরল। আবেগে অথবা ঘুম ভাঙ্গানোর রাগে, বুঝতে না পেরে রম্ভা একটু ভয় পেয়ে গেল, আলিঙ্গনে দম আটকে আসায় কান্নাও বন্ধ হয়ে গেল আচমকা।

'এখন তক্ কাঁদছিস্ সোনা? আহা রে। চুক্ চুক।'

'মুই সইতে লারছি গো, সইতে লারছি।'

'চুক্ চুক।'

'কাল মোকে নিয়ে চল ঝুমুরিয়া। পরশু তক থাকতে লারব।'

'কাল ঝুমুরিয়া যাবি? নিয়ে যাব। সোনাটি আমার কাঁদিস নে, ঝুমুরিয়া তোকে নিয়ে যাব কাল।'

তখন নিশ্চিত হয়ে রম্ভা গা এলিয়ে দিল। রামপাল তার চুলের ঘ্রাণ নিচ্ছে। এখন কয়েকদিন, হয়তো সাতদিন, হয়তো তারও বেশীদিন, রামপাল তাকে পাগলের মত ভালবাসবে।

সাত

পরদিন রম্ভাকে সঙ্গে নিয়ে রামপাল ঝুমুরিয়া গেল। নিষুতি রাতে রম্ভাকে কথা দিয়েছিল বলে নয়, নিজে সে হিসেব করে দেখল, কৃষ্ণেন্দুর একদিন আগে ঝুমুরিয়া যাওয়াই ভাল। বীরেশ্বরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ঝুমুরিয়ার সব হাঙ্গামা যে চুকে গেছে এ ভরসা রামপালের ছিল না। হেরম্ব চক্রবর্তী কেবল বীরেশ্বরকে নিপাত করেই ভালমানুষ হয়ে গেছে কিনা বলা কঠিন। বীরেশ্বরের জোয়ান জোয়ান ব্যাটা আছে তিনটি, বাপের অপমরণকে তারা কি ভাবে গ্রহণ করেছে, একদম চুপচাপ হয়ে গেছে অথবা প্রতিশোধের জন্য কোমর বেঁধে হৈ চৈ কাণ্ড শুরু করেছে, দূর থেকে তাও ঠিক মত অনুভব করা অসম্ভব। বড় ছেলে শ্যামলাল হিসেবী ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ, তার ওপর চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে থাকায় বিশেষভাবে সংসারীও বটে। সে হয়তো কিছু করবে না। মেজো ছেলে জীবনলাল একটু ভাবুক ধরনের, একবার সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিল, তারপর বাড়ী ফিরে বিয়ে করে আবার সংসারী হয়েছিল বটে কিন্তু ছেলে বৌটা তার সম্প্রতি মরে গেছে। তার এই আত্মহারা অবস্থায় সব কিছুই সম্ভব। ছোট মোহনলালের কোন সাংসারিক বন্ধন নেই, বুদ্ধি বিবেচনা আছে কিনা সন্দেহ, রক্তও যে তার অত্যধিক গরম রামপাল তা ভাল করেই জানে। চুপচাপ অন্যায় অত্যাচার সহ্য করার ছেলে সে নয়। সে যে কি আরম্ভ করেছে ভগবান জানেন। বীরেশ্বর ছাড়া ঝুমুরিয়ার আরও কয়েকজন হেরম্ব চক্রবর্তীর সঙ্গে শত্রুতা করেছিল, তারা অবশ্যই ইতিমধ্যে তার অনুগত হয়ে যায়নি। সুতরাং ঝুমুরিয়ার অবস্থা এখন বিপজ্জনক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

এই অবস্থায় কৃষ্ণেন্দু সেখানে চলেছে বীরেশ্বরের অপমরণের বিহিত করতে। রম্ভাকে সে কথা দিয়েছে। তার গোঁ রামপালের অজানা নয়। ঝুমুরিয়ার মানুষগুলি যদি ঝিমিয়ে পড়ে থাকে, সে গিয়ে তাদের ক্ষেপিয়ে তুলবে। নিবু নিবু আগুনে বাতাস দিয়ে দিয়ে, নেভা আগুনের ছাই-এ তেল ঢেলে, সে আবার দাউ দাউ করে আগুন জ্বালিয়ে দেবে। তখন ঝুমুরিয়ায় বাস করা মোটেই সঙ্গত হবে না।

রম্ভাকে একবার না নিয়ে গেলেও নয়। সর্বদিক বিবেচনা করে রামপাল তাই কৃষ্ণেন্দুর একদিন আগে ঝুমুরিয়া গিয়ে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করাই ভাল মনে করেছে। যদি বোঝে ব্যাপার সুবিধের নয়, একরাত্রি সেখানে বাস করে কৃষ্ণেন্দু গিয়ে পৌছবার আগেই রম্ভাকে নিয়ে কলকাতা ফিরে আসবে। যদি রম্ভা আসতে না চায়, জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। কাঁদাকাটা যদি একটু করে তো করবে, উপায় কি।

এত সব চিন্তা করে সকাল আটটার গাড়ীতে রম্ভাকে নিয়ে রামপাল ঝুমুরিয়া রওনা হল।

গাড়ীতে ছিল অসম্ভব ভিড়, প্রত্যেকটি থার্ডক্লাস কামরায় গরুছাগলের মত গাদাগাদি করে মানুষ উঠেছিল, চিরদিন যেমন ওঠে। ভিড় ঠেলে উঠবার সময় রম্ভা একবার এঁকে বেঁকে দুলে উঠে বিশ্রীভাবে মুখ বাঁকিয়েছিল।

দাঁতে দাঁত চেপে রামপাল শুধিয়েছিল, 'কে রে? কোন্ লোকটা?'

রম্ভা জবাব দেয়নি। শুধু মাথা নেড়েছিল।

'দেড়া ভাড়ার টিকিট কিনি?'

'না।'

একদিকের লম্বা বেঞ্চের শেষ প্রান্তে বসেছিল মাঝবয়সী একটি স্ত্রীলোক এবং তাকে পুরুষের স্পর্শ থেকে বাঁচাতে তার এ-পাশে ছিল কানে আধপোড়া সিগারেট গোঁজা টেরিকাটা তার সঙ্গী। মোলায়েম হাসির সঙ্গে রামপাল সকরুণ আবেদন জানাতে সে রম্ভাকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে দু'টি বেঞ্চের মাঝখানে নিজের বোঁচকার ওপর বসল। রামপাল কৃতজ্ঞতাও বোধ করল না, খুশীও হল না। লোকটার চাউনি সাপের মত—মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত। স্ত্রীলোকের পাশে বসবার সুযোগ রম্ভা পেয়েছে কিন্তু এপাশে তার গোঁফওয়ালা জোয়ান মদ্দ পুরুষ। বিব্রত হয়ে পাশের মানুষকে ঠেলা দিয়ে লোকটি তার আর রম্ভার মধ্যে ব্যবধান বাড়াবার চেষ্টা করেছে বটে, একটু কাত হয়ে রম্ভার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বসেছে, তবু গায়ে গায়ে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে আছে খানিকটা।

এত করে বলে রামপাল, মেয়েদের গাড়ীতে রম্ভা কিছুতে যাবে না। কি যে মতিগতি ওব কে জানে। মনে মনে হয়তো সে এইসব চায়, ভিড়ের চাপ, অজানা পুরুষের বজ্জাতি লোভাতুর দৃষ্টিপাত। মেয়েমানুষকে বিশ্বাস নেই!

ঘন ঘন রামপাল তার মুখের দিকে তাকায়। কিছু নেই রম্ভার মুখে। গভীর বিষাদ ছাড়া আর কিছুর হদিস মেলে না। কে ছোঁয় আর কে চায় যেন গ্রাহ্যই নেই তার, ওসবে কিছু যেন আসে যায় না, মানুষর এই সব অপব্যবহার যেন উচিত-অনুচিত বিবেচনার পর্যায়েই পড়ে না। এসব কৃষ্ণেন্দু ওকে শিখিয়েছে। অন্দর বাহির একাকার হয়ে যাওয়া ভাল, স্ত্রীলোকের দিকে পুরুষের তাকানো খাবারের দিকে মানুষের তাকানোর মতই স্বাভাবিক, খাদ্যে ক্ষুধাতুর, নারীতে কামাতুর। মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে এগোবে, ধাক্কা খেলে ধাক্কা দেবে, মাথা উঁচু করে চোখ তুলে তাকাবে। কৃষ্ণেন্দুর কাছে এই সব কথা শুনে মাথাটা রম্ভার বিগড়ে গেছে। ওই শিক্ষা সে কাজে লাগাচ্ছে মাত্র। আর কিছু নয়।

অপরাহ্নে তারা ট্রেন থেকে নামল। স্টেশন থেকে ঝুমুরিয়া প্রায় দু'ক্রোশ পথ, গরুর গাড়ীতে যেতে হয়। পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। গাড়ী চলতে শুরু করলে রম্ভার মনে হল গাড়োয়ান তার চেনা।

'ঝুমুরিয়া ঘর বটে না?'

'নাহক। মোর ঘর পাঁচনিখে। তুমাকে চিনি তালেও মেয়্যা।'

দিবব্ গাড়োয়ানের কাছে ঝুমুরিয়ার খবর পাওয়া গেল। অন্য সব কৃষ্ণেন্দুর কাছে শোনা পুরানো খবর নতুন খবর শুধু এই যে ঝুমুরিয়ায় এখন কোন গোলমাল নেই। হাঙ্গামার দিন পুলিশ কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করেছিল, দু'দিন পরে আরও তিনজনকে ধরে নিয়ে গেছে। না, রম্ভার ভাই তারা নয়, রম্ভার ভায়েরা তিনজনেই সুস্থ শরীরে কাজকর্ম করছে। গাঁ এখন শান্ত, সকলে শিষ্ট ভালমানুষ হয়ে আছে।

শুনে রামপাল অনেকটা নিশ্চিন্ত হল কিন্তু পুরোপুরি খুশী হতে পারল না। মনে তার

কি যেন একটা প্যাঁচ আছে, মানুষের এই নিষ্ক্রিয় ভালোমানুষি চিরদিন তার মধ্যে অসমর্থন জাগিয়ে তোলে, মৃদু অসন্তোষ সৃষ্টি করে। কেবলি মনে হয়, এরকম হওয়া যেন উচিত ছিল না। নিজে সবরকম হাঙ্গামা এড়িয়ে চলতে ভালবাসে কিন্তু অন্যের বীর্যহীন সহনশীলতা তার সয় না। তার দিক থেকে ভালই হয়েছে যে ঝুমুরিয়া চুপ করে গেছে, রম্ভাকে ক'দিন বাপের বাড়ী থাকতে দেওয়া চলবে, কাল পরশু টেনে হিঁচড়ে তাকে কলকাতা নিয়ে যাবার দরকার হবে না, কিন্তু রম্ভার ভাইগুলি, বীরেশ্বরের জোয়ান মর্দ ছেলেগুলি? ঝুমুরিয়ার পুরুষগুলি? ছি!

নতুন রাস্তা ঝুমুরিয়ার কাছাকাছি স্টেশনের এই পথকে অতিক্রম করে ঝুমুরিয়ার গা ঘেঁষে গেছে। মোড়ের কাছাকাছি নতুন রাস্তার কাজ এখনো কিছু কিছু চলছে। মোড়ে দাঁড়ালে দেখা যায়, রাস্তা কতদূর এগিয়েছে। প্রায় সিকি মাইল দূরে বাঁকের কাছে দু'পাশে সারি সারি খোয়ার স্তূপ, আধ পেশা রাস্তায় ছোট বড় তিনটে রোলার, বাঁকের ওদিকে হয়তো আরও আছে। নবীন সামন্তের আমবাগানের প্রান্তে তিনটি ছোট ছোট তাঁবু আর তালপাতার ছাউনি দেওয়া অস্থায়ী ঘর। একটি তাঁবুর সামনে ভূর করে রাখা দুরমুস, গাঁইতি কোদাল প্রভৃতি যন্ত্রপাতি। পথের ওপাশে এক সারি গরুর গাড়ী, গাড়োয়ানেরা গরু খুলে প্রকাণ্ড এক শিমুল গাছের নীচে তাদের বেঁধে খড় ও জল দিচ্ছে, গলার বাঁধা ঘণ্টার সমবেত টুংটাং শব্দ কানে আসছে অনেক মন্দিরে অনেক সন্ধ্যারতির ইঙ্গিতের মত। একটা লরী এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, এবার সশব্দে সমুখ দিয়ে স্টেশনের দিকে চলে গেল। আজকের মত কাজ শেষ হয়েছে, কুলীরা অনেকে চলে গেছে, অনেকে এখনো যাচ্ছে। বাঁকের কাছে রাত্রির বিরামের ব্যবস্থায় কতকগুলি মানুষ ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক চলাফেরা করছে। এখানে ওখানে জ্বলছে ছাড়া ছাড়া কয়েকটা আগুন।

এই মোড় আর ওই বাঁকের মাঝামাঝি এক অনির্দিষ্ট স্থানের দিকে হাত বাড়িয়ে কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব শোচনীয় করে দিব্বু বলল, 'ওই হোথা সামন্ত মশায় গুলি খেয়েছে।'

গাড়ী থেমেছিল, আবার চলতে আরম্ভ করল। রম্ভা একটু কাঁদল। গভীর উপভোগ্য বিষাদ ঘনিয়ে এসে রামপালের মন হয়ে গেল উদাস। চর্চা করে করে তার অল্পশিক্ষিত মনের কল্পনা আশ্চর্যরকম উর্বর হয়ে উঠেছে। সামান্য ও সংক্ষিপ্ত বিবরণকে আশ্রয় করে তার মানসচক্ষে ঘটনা ও আবেষ্টনীর ছবি ফুটে ওঠে। আসন্ন সন্ধ্যার এই গেঁয়ো পরিবেশ, রম্ভার মনোবেদনার ছোঁয়াচ আর সেই সঙ্গে কল্পনায় আম জাম শাল পিয়ালের সবুজ দৃশ্যপটে দিনান্তের আবছা আলোয় মুখোমুখি দু'দল মানুষ। বীরেশ্বরের বাড়ীর দুয়ারে গাড়ী দাঁড়ানো পর্যন্ত রামপালের চোখের সামনে বীরেশ্বর কেবলি অতর্কিতে গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে ছটফট করতে লাগল।

গাড়ী থেকে নেমে রম্ভা বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভেতরে যাবার ক্ষণেক পরেই চার-পাঁচটি নারী-কণ্ঠে কান্না ধ্বনিত হয়ে উঠল। কারা কাঁদে? কেন কাঁদে? ও, বীরেশ্বরের মেয়ে, বৌ ও ছেলের বৌরা শোক করছে। অন্যমনা হওয়ার জন্য লজ্জিত হয়ে রামপাল তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে পড়ল।

পিঠোপিঠি দু'ভায়ের মধ্যে বয়সের তফাৎ যত কম হওয়া সম্ভব, শ্যামলাল ও জীবনলাল ততটুকু ছোটবড়, কিন্তু দু'জনের চেহারা থেকে সেটা অনুমান করা যায় না। বত্রিশ বছর বয়সে শ্যামলাল ভুঁড়ি বাগিয়ে মাংসপেশী ঢিল করে মুখে ভারিক্কি ভাব এনে নিজের চেহারাটি দাঁড় করিয়েছে চল্লিশ পেরোনো গেরস্তের মত, জীবনলালকে তার চেয়ে অনেক ছোট দেখায়। বাপের মত তার শক্ত বাঁধুনির জোরালো দেহ। মোহনলাল রোগা এবং লম্বা। নতুন গোঁফ

তার এখনো তামাকের ধোঁয়ায় বিবর্ণ হয়ে যায়নি। অশৌচের খাওয়া, জামাই বাড়ী এলেও অল্পসময়ের মধ্যেই সংক্ষেপে সব চুকে গেল। বড়ঘরের দাওয়ায় চাটাই পেতে তারপর কথা বলতে বসল রামপাল, রম্ভার তিন ভাই এবং তাদের খুড়ো কাশীশ্বর। ছোট কলাবাগানটির ওপাশেই কাশীশ্বরের ঘর। তার অপরিপুষ্ট শীর্ণ দেহে আর পরণের ছেঁড়া ময়লা কাপড়ে দারিদ্র্যের ছাপ অতি স্পষ্ট। একটু ভাল অবস্থার ভাইপোদের সঙ্গে বসে আলাপ করার ভঙ্গিটাও খাপছাড়া রকমের বিনয়াপন্ন।

খুড়োর দিকে পিছন ফিরে তামাক টানতে টানতে শ্যামলাল ধীরে ধীরে গোড়া থেকে সমস্ত ব্যাপারের ইতিহাস রামপালকে বিশদভাবে শুনিয়ে দিল। শুনতে শুনতে রামপালের মনে হল, সে যেন একটু হেরম্ব চক্রবর্তীর দিকে টেনে কথা কইছে, একেবারে সমর্থন করতে না পারলেও খুব বেশী দোষ দেখতে পাচ্ছে না লোকটার। আহা, হেরম্ব চক্রবর্তী কি আর ভালমানুষ দেবতা, তা বলছে না শ্যামলাল । ওসব লোক ওইরকম হয়। বীরেশ্বর বেশীরকম বাড়াবাড়ি করেছিল। অতটা না করলেই হ'ত।

'বাড়াবাড়ি হয়েছিল কিছুটাক্।' কাশীশ্বর সায় দিল।

'কিসের বাড়াবাড়ি?' ঝাঁঝালো সুরে মোহনলাল জিজ্ঞেস করল। শ্যামলাল একবার তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, কোন জবাব দিল না। হুঁকোটা কাশীশ্বরের কাছে বেড়ায় ঠেস দিয়ে নামিয়ে রেখে উঠে একেবারে ঘরের ভেতর থেকে ঘুরে এল।

না, হেরম্ব চক্রবর্তীকে পিতার হত্যাকারী বলে ধরে নিতে শ্যামলাল রাজী নয়। কার বন্দুক কোথা থেকে কে ছুঁড়েছিল না জেনে আন্দাজে একজনের ঘাড়ে দোষ চাপালেই তো হয় না। দোষ কার সঠিক জানা গেলে তাকে শাস্তি দেবার জন্য যথাসর্বস্ব ব্যয় করে পথের ভিখারী হতে সে রাজী আছে। জীবনটাই নয় দিয়ে দেবে। কিন্তু অন্ধকারে ঢিল সে ছুঁড়বে কোনদিকে, কার দিকে?

'সে নয় তো কে ছুঁড়বে বন্দুক?' মোহনলাল মন্তব্য করল।

শ্যামলাল মাথা নেড়ে বলল, 'কে জানে কে ছুঁড়বে। শত্তুর কি একটা ছিল, লোকের পেছনে লাগা রোগ ছিল বাবার।' সজোরে শ্যামলাল নিঃশ্বাস ফেলল। —'ভগবান আছেন। মোদের যে সর্বনাশ করেছে সে ধরা পড়বে। পুলিশ খোঁজ করছে।'

'পুলিশ। পুলিশ ও ব্যাটার দলে।'

মোহনলাল এক একটা ছাড়া ছাড়া কাটা কাটা ঝাঁঝালো মন্তব্য করে আর মুখ ঘুরিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে অন্ধকার উঠানের দিকে। মনের জ্বালার তাপে মুখ-চোখের যে অবস্থা হয়েছে ছেলেটার, একশো পাঁচ ডিগ্রি জর হলে তেমন হয়। একটু উস্কে দেবার কেউ থাকলে যে কোন মুহূর্তে সে গিয়ে হেরম্বকে খুন করে আসতে পারে।

জীবনলাল কম কথা কয়। সে বলল, 'মোরাও তলে তলে সাক্ষী প্রমাণ খুঁজছি। কেষ্টবাবু এসে পড়লে শলা পরামর্শ মিলত। দাঙ্গার ব্যাপারটাতে মোদের জড়িয়ে দিলে মুশকিল হয়ে যাবে।'

শ্যামলাল যেন একটু জোর দিয়েই বলল, 'মন করে যে তা জড়াবে না। অ্যাদ্দিনে তবে টেনে নিয়ে যেত।'

দাঙ্গা হয়নি, বাধবার উপক্রম শুধু হয়েছিল। মোট যে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের নাকি দাঙ্গা করার অভিযোগেই চালান দেওয়া হবে। ওরা আটজনই অবশ্য হেরম্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু সেদিন ঘটনাস্থলে সকলে তারা উপস্থিত ছিল না। শ্যামলালের

তিন ভাইকে কেন যে ধরা হয়নি এটা বড় আশ্চর্য ব্যাপার মনে হয়েছে সকলের।

শ্যামলাল সেদিন গাঁয়েই ছিল না সত্য কিন্তু বৈকুণ্ঠ দাসও তো ছিল না গাঁয়ে, তাকে দু'দিন পরে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জীবন ও মোহন বাপের সঙ্গেই ছিল, ওদের দু'জনকে পুলিশ অনায়াসে ধরতে পারত। সত্য কথা বলতে কি, বীরেশ্বরের ছেলেরা রেহাই পাওয়ায়—লোক, বিশেষ করে যাদের ধরা হয়েছে তাদের আত্মীয়স্বজন, তাদের ওপর নাকি একটু চটে গেছে। পুলিশের এই পক্ষপাতিত্বের মানে তারা বুঝতে পারছে না।

কিছুক্ষণ পরে দু'একজন করে গ্রাম থেকে আটদশজন লোক এসে বীরেশ্বরের ঘরের দাওয়ায় জড়ো হল। তাদের মধ্যে কেউ কৃষ্ণেন্দু কবে আসবে জানতে এসেছে, কৃষ্ণেন্দু এসে পড়েছে শুনে কেউ এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে। সকলে উদগ্রীব হয়ে কৃষ্ণেন্দুর প্রতীক্ষা করছে টের পেয়ে রামপাল একটু আশ্চর্য হয়ে গেল। গ্রামে কৃষ্ণেন্দুর যাতায়াত খুব বেশী নয়, গ্রামের লোকের ওপর তার এতখানি প্রভাব সে কল্পনা করতে পারেনি। অনেক দিন থেকে মুখে মুখে কৃষ্ণেন্দুর বিষয়ে নানা কথা গ্রামে রটেছে, তার সম্বন্ধে গ্রামের লোকের ধারণা গড়ে উঠেছে সেই সব শোনা কথাকে ভিত্তি করে। কৃষ্ণেন্দুর অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি ত্যাগ ও ক্ষমতায় এদের বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস নেই, কল্পনায় বড় হতে হতে কৃষ্ণেন্দু এদের কাছে প্রায় মহাপুরুষ হয়ে উঠেছে। সকলের কথায় এই মনোভাবটাই প্রকাশ পেতে লাগল যে কৃষ্ণেন্দু একবার এসে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। যেখানে থেকে যাদের জন্য কৃষ্ণেন্দু কাজ করছে, এদের মত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তাদের মধ্যেও রামপাল কখনো দেখতে পায়নি। নিজেদের গোলমাল মিটিয়ে দেবার ভার কৃষ্ণেন্দুর হাতে তুলে দেবার জন্য এমন আগ্রহও তাদের দেখা যায় না।

মন দিয়ে সকলের আলাপ-আলোচনা শুনতে শুনতে একটা ব্যাপার রামপাল টের পেয়ে গেল। কৃষ্ণেন্দু এসে হেরম্বের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা করবে বলে সকলে তার পথ চেয়ে নেই। অত্যাচার যা হয়ে গেছে তার প্রতিকারের জন্য সকলে তারা বিশেষ উৎসুক নয়। আর যেন অত্যাচার না হয়, শান্তিতে ও স্বস্তিতে তারা যেন দিন কাটাতে পারে, এইটুকু শুধু সকলে চায়। কৃষ্ণেন্দু এসে এ ব্যবস্থাটুকু করে দিক।

কৃষ্ণেন্দু এসে সন্ধির বদলে লড়াই করতে চাইলে এরা সেটা কি ভাবে গ্রহণ করবে ভাবতে ভাবতে বিছানায় শুয়ে অনেক রাত্রে রামপালের চোখ ঘুমে জড়িয়ে এসেছে, শ্যামলাল এসে নীচু গলায় বলল, 'ঘুমুলে নাকি হে?'

'নাহুঁক।'

শ্যামলাল বিছানার ধারে বসল।

'সবার সামনে বলতে পারিনি, ভেতরে ব্যাপার আছে অনেক। ধরে আমাদের নিয়ে যেত তিনজনাকে, অনেক কষ্টে সামলেছি। হেরম্ববাবুর কাছে গেছলাম।'

'বটে?'

'বাবার জন্যে আপসোস করলেন ঢের। আর বললেন, মোদের মাপ করেছেন। পুলিশকে সামলেছেন উনি। নয়তো তিন ভাইকে মোদের ঘানি টানতে পাথর ভাঙ্গাতে হত পাঁচ সাত বছর।'

খানিক অপেক্ষা করে রামপালের সাড়া না পেয়ে শ্যামলাল আবার বলল, 'কি করি বল? সংসার এখন ঘাড়ে চাপল মোর, আমি ছাড়া দায়িত্ব কার! সবাই মিলে উচ্ছন্ন যাব, ভেবে চিন্তে গিয়ে তাই ঘাট মেনে এলাম বাবুর কাছে। না তো করার কি ছিল বল?'

'বটে তো।'

কিছুক্ষণ বসে শ্যামলাল চলে গেল। সেই যে ঘুম চটে গেল রামপালের, মনে হল ঘুম বুঝি আর আসবে না। রম্ভাও আসেনি। আসবার ভরসাও আর নেই। কোন ঘরে মেয়েদের সঙ্গে সে গল্প করছে অথবা কথা কইতে কইতে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাপের বাড়ী এলে এই রকম করে রম্ভা। অন্ধকার ঘরে খালি বিছানায় একা শুয়ে থেকে রম্ভার ওপরে রামপালের রাগ ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল। অন্য কোন চিন্তা মনে তার স্থান পেল না।

কৃষ্ণেন্দুকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্য ঝুমুরিয়ার কয়েকজন অপরাহ্লে স্টেশনে যাবে ভেবেছিল। তাদের মনে আশাভঙ্গের বেদনা দিয়ে সকালবেলাই কৃষ্ণেন্দুরা গাঁয়ে এসে হাজির হল। একটা গোটা দিনের চেয়ে একটা রাত ট্রেনে নষ্ট করা ভাল ভেবে হীরেন আর নরেশকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণেন্দু সন্ধ্যার প্যাসেঞ্জারে রওনা হয়ে গিয়েছিল।

নরেশকে সে ডাকেনি। নরেশ কিন্তু তাকে তাকে ছিল। ট্রেন ছাড়বার মিনিটখানেক আগে সে একগাল হাসি নিয়ে তাদের কামরায় উঠে দুজন যাত্রীর মধ্যেকার তিন ইঞ্চি ফাঁকটুকু বসবার মত প্রশস্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়ে গেল।

'টিকিট করেছিস?'

'ইস! টিকিট্! পিলেটফারম টিকিট কেটেছি একটা তাই ব্যাটাদের ভাগ্যি!'

রেল কোম্পানীকে ফাঁকি দেওয়ার ঝোঁকটা নরেশের চিরন্তন। পয়সা বাঁচানোটা অবশ্য তার আসল উদ্দেশ্য নয়, সর্বদা সতর্ক থাকতে আর এক দরজা দিয়ে চেকারকে উঠতে দেখে আরেক দরজা দিয়ে নেমে যেতে বড়ই তার মজা লাগে। তার মনের বাসনা কৃষ্ণেন্দুর জানা আছে। বিনা টিকিটে একদিন সে দেশদেশান্তর বেড়িয়ে আসবে, —দিল্লী বোম্বাই পুরী মাদ্রাজ সিমলা দার্জিলিং, যেখানে যেদিকে যতদূর রেলগাড়ী যায়, বজবজ ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত বাদ দেবে না। এরকম পাগলামি না থাকলে কি টেঁপিকে নিয়ে এ ছেলে পালাতে চায় কিন্তু ঘরে বসে সর্বসম্মতিক্রমে টেঁপিকে পাওয়ার সুযোগ প্রত্যাখ্যান করে। টেঁপিকে সে চায় নি, চেয়েছিল টেঁপিকে নিয়ে শুধু পালাতে। পরে এটা বুঝতে পেরেছিল বলেই একে মারার ক্ষোভটা এত কড়া হয়ে উঠেছিল কৃষ্ণেন্দুর।

বড় একটা স্টেশনে গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়ায়, টিকিটও দেখা হয়। নীচে নেমে গাড়ী ছাড়া পর্যন্ত প্লাটফর্মে পায়চারি করাই নিরাপদ ভেবে নরেশ উঠতে যাবে, কৃষ্ণেন্দু তাকে চেপে ধরে জোর করে বসিয়ে দিল। আলপাকার জীর্ণ মলিন কোট গায়ে চেকারকে গাড়ীতে উঠতে দেখে নরেশ আরেকবার ব্যাকুলভাবে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর এক হাতের জোরের সঙ্গেই বা সে পারবে কেন! মৃদু হেসে মাথা নেড়ে কৃষ্ণেন্দু বলল, 'পালালে চলবে না। বসে থাক্।'

হতভম্ব হয়ে নরেশ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। অল্পদিন আগে কৃষ্ণেন্দু তাকে মারতে মারতে প্রায় বেহুঁশ করে দিয়েছিল, সে তো ভুলবার কথা নয়। আজ আবার তাকে নিয়ে সে কি নিষ্ঠুর খেলা খেলবার মতলব করেছে অনুমান করবার ব্যাকুলতায় দৃষ্টি যেন তার সেঁটে রইল কৃষ্ণেন্দুর মুখে।

চেকার কাছে এলে কৃষ্ণেন্দু তাকে ছেড়ে দিল।

'আমরা তোমার টিকিটের দাম দিতে পারব না, নরেশ, চেয়ো না কিন্তু। গোড়ায় বললে টিকিট কিনে দিতাম, এখন একটি পয়সা দেব না।'

চেকার টিকিট চায়, নরেশ একদৃষ্টে কৃষ্ণেন্দুর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। এতক্ষণে সে কৃষ্ণেন্দুর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে। দুচোখে তার তাই ভর্ৎসনা ও অনুযোগের যেন সীমা নেই। তার এই নিঃশব্দ অভিযোগের ঔদ্ধত্য এত বেশী স্পষ্ট ও অভিনব যে কৃষ্ণেন্দু মৃদু বিস্ময়ের সঙ্গে একটু অস্বস্তিও বোধ করতে থাকে।

'বেশ লোক আপনি!'

কৃষ্ণেন্দুকে এই কঠোর মন্তব্য শুনিয়ে নরেশ ধাঁ করে তার শার্টের পকেট থেকে এইটুকু একটি চামড়ার ব্যাগ বার করল এবং তার ভেতর থেকে অনেক ভাঁজে ছোট করা আস্ত একটি পাঁচ টাকার নোট বার করে চেকারকে শুধোল, 'চেঞ্জ হবে মশাই?'

সেই থেকে কি যে হল নরেশের, সব উৎসাহ উদ্দীপনা নিভে গিয়ে মনমরা হয়ে চুপচাপ বসে রইল। মাঝে মাঝে ক্ষণেকের জন্য কৃষ্ণেন্দুর দিকে তাকায় আর মুখ ফিরিয়ে নেয়। ছোট স্টেশনে একদল যাত্রী নেমে যেতে জানালার ধারে গিয়ে মাথাটা বাইরে গলিয়ে বহুক্ষণ একভাবে বসে রইল। হীরেন বাড়ী থেকে দশ বার জনের খাবার সঙ্গে এনেছিল, পথে উপোস করে মারা যাওয়ার আতঙ্কটা তার অতিশয় প্রবল। খাবারের ভাগ নিয়ে নরেশ আনমনে ভেঙ্গে মুখে পুরতে লাগল। খিদেও যেন তার পায়নি।

কি যে খাপছাড়া মনের গতি এসব পাগলাটে ছেলের! মেরে রক্তপাত করে দেওয়ার পর দেখা হতে যে ভক্তি-গদগদ চিত্তে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বসেছিল, সামান্য একটু শিক্ষা দেবার চেষ্টা করায় আজ সে অভিমানে আত্মহারা হয়ে গেছে। কিন্তু অভিমান যদি করে থাকে অভিমানের কথাই কিছু বলুক, অনুযোগ দিক। কৃষ্ণেন্দু ধৈর্য হারিয়ে ফেলল।

'টাকা কোথায় পেলি?'

'চুরি করেছি।'

ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে কৃষ্ণেন্দুর মুখে কথাটা সরল না।

'পরের স্টেশনে পুলিশ ডাকবেন না?'

এ তো অভিমান জানানো নয়, রীতিমত গায়ের ঝাল ঝাড়া। নরেশ যে মুখের ওপর ওভাবে কথা বলতে পারে কৃষ্ণেন্দুর, দুঃস্বপ্নেও তা সম্ভব হতে পারত কি না সন্দেহ। ছেলেটার কথার ঝাঁঝে হীরেনও থ' বনে রইল। থেমে থেমে মন্থর গতিতে প্যাসেঞ্জার গাড়ী চলেছে। লোকাল প্যাসেঞ্জার নেমে গিয়ে একটু জায়গা হয়েছিল গাড়ীতে, গুটিসুটি হয়ে কোন রকমে শোয়া চলে। শোয়ার আগে কৃষ্ণেন্দু হঠাৎ আশ্চর্যরকম মোলায়েম গলায় বলল, 'কাজটা একটু অন্যায় হয়ে গেছে নরেশ। অত ভেবে দেখিনি।'

নরেশের কাছে এইভাবে একরকম ক্ষমা চেয়ে কৃষ্ণেন্দু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে চোখ বুজল। ঘন্টা দুই পরে একবার ঘুম ভেঙ্গে দ্যাখে, নরেশ ওপাশের বেঞ্চে গিয়ে শুয়েছে। কৃষ্ণেন্দুর মনে হয়, ছেলেটা তাকে জন্মের মত ত্যাগ করেছে, এ জীবনে কখনো সে আর তার মন পাবে না। সে গভীর বিষাদ অনুভব করে, সেই সঙ্গে অপরাধ করার একটা কষ্টকর অনুভূতি। ভগবানের মত ভক্তকে কষ্ট দেয়ার স্বভাবটি সে কেমন চমৎকার আয়ত্ত করেছে! কত অন্যায়ের পাশ কাটিয়ে চলে, তাকে যে মানে না তার ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের চেষ্টা কখনো করে না, শুধু যে অনুগত তার ভাল করার উগ্র চেষ্টায় চটকে চটকে সম্পর্কটা তিতো করে দেয়। কত সে সাবধানী আর হিসেবী! যেখানে অধিকার আছে জানে, যেখানে ধরে মারলেও প্রতিবাদ আসবে না জানে, সেইখানে দেখায় বাহাদুরী। শুধু কথা বলে যদি কাজ হয় তাতে তার মন ওঠে না, জমকালো প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।

সকালে দেখা গেল, কৃষ্ণেন্দুর আশঙ্কাটাই ঠিক, ক্ষমা চেয়ে নরেশের মন ভেজানো যায়নি। কাছে থেকেও সে যেন এক যোজন দূরে সরে গিয়েছে। ঝাঁঝালো কথা সে আর বলল না, অবিশ্বাস্য গাম্ভীর্যের সঙ্গে সমালোচকের দৃষ্টিতে কৃষ্ণেন্দুকে থেকে থেকে নিরীক্ষণও করল না। কথাবার্তা চালচলন তার প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এল। তবু বেশ বোঝা গেল কৃষ্ণেন্দুর বিরুদ্ধে মন তার ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে তার অতিরিক্ত ভদ্র ও সংযত ব্যবহারে পদে পদে তার প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগল।

কৃষ্ণেন্দুর একটি হাসির কথার হীরেন হেসে আকুল হয়ে গেল, নরেশের মুখের একটি রেখাও বাঁকল না। তখন আর কোন ভরসাই রইল না যে কৃষ্ণেন্দুকে সে আর কোনদিন ভক্তি করবে।

সারাটা দিন সময় আছে ভেবে শশাঙ্ক কৃষ্ণেন্দুদের অভ্যর্থনার কোন আয়োজনই করেনি। আয়োজন আর কি, দাড়িটা কামিয়ে ফর্সা একখানা কাপড় পরে নিজে একটু ফিটফাট হয়ে থাকত, বাগান ও সদরটা একটু সাফ করিয়ে রাখত। অতিথির আদর-যত্নের অন্য সব আয়োজন করবার ক্ষমতা কই, সে অক্ষম, তার উপার্জন নেই। হীরেনরা কেউ দু'চার দিনের জন্য দেশে এলেও বাড়ীতে পা দিয়েই খরচপত্রের কয়েকটা টাকা শশাঙ্কের হাতে দেয়। শশাঙ্ক তাই দিয়ে তাদের খাতির যত্ন করে। সবটা দিয়ে নয়, কিছু পারিশ্রমিক সে রাখে বৈকি! এবার কৃষ্ণেন্দু তাকে বড় বিপন্ন করল। বাড়ী ঢুকে দু'দণ্ড বসল না, খরচপত্র বাবদ টাকাপয়সা দিল না, পারিবারিক কুশল প্রশ্নাদির জবাবগুলি ভাল করে দিতে না দিতে সঙ্গী দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে আবার বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। বেলা বাড়তে লাগল, তার দেখা নেই। চা-জলখাবারের আয়োজন করতেও তো সময় কম লাগে না গাঁয়ে। দুধ চিনি চা সব কিছুই সংগ্রহ করে আনতে হয়। কেনার লোক কম বলে সহরের চেয়ে গাঁয়ে দুধ অনেক সস্তা, কিন্তু দুধের বড় অভাব গাঁয়ে। গরু যদি বা থাকে দু'চারটা, রোগা প্যাঁটকা মুমূর্ষু গরু, দুধ দেয় এই এতটুকু। বেশী বেলা হলে দুধও হয়তো শশাঙ্ক একেবারেই যোগাড় করতে পারবে না। দুপুরের খাওয়ার জন্য মাছ-তরকারী কিনতে দেড় ক্রোশ দূরে লোক পাঠাতে হবে, সে সব কিনে এলে তবে চড়বে রান্না। শাক চচ্চড়ি দিয়ে তো অতিথিদের ভাত দেওয়া যাবে না! শশাঙ্ক এখন করে কি?

শেষ পর্যন্ত শশাঙ্ক বাড়ীর মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে গেল। দিগম্বরী সকলের সকাল বেলা জলখাবারের ফেন-ভাত নামাচ্ছিল, মুখ না ফিরিয়ে বলল, 'নিজের পয়সা খরচ করেই সব আনো। ঠাকুরপো তাড়াতাড়ি দরকারী কাজে চলে গেছেন, ফিরে এসে তো টাকা দেবেন? অত ভাববার কি আছে!'

তাই বটে! এই সহজ কথাটা তো তার খেয়াল হয়নি! শশাঙ্ক নিশ্চিন্ত হয়ে দুধের জন্য লোক পাঠিয়ে নিজেই রাঘব মহান্তির দোকানে চা চিনি প্রভৃতি সওদা আনতে গেল।

বীরেশ্বরের বাড়ী বেশী দূরে নয়, এইটুকু পথ অতিক্রম করতে সম্ভাষণ ও প্রশ্নের বাধায় বার বার হীরেন ও কৃষ্ণেন্দুকে থামতে হল। কখন এল, কতদিন থাকবে, কোথায় যাচ্ছে, বাড়ীর খবর কি ইত্যাদি সব কিছুই প্রত্যেকে জানতে চায়, পথে দাঁড় করিয়ে ধীর মন্থর অন্তরঙ্গ আলাপের মধ্যে জানতে চায়। এরা ঝুমুরিয়ার ভদ্র অধিবাসী। গরীব চাষী মজুরেরা শুধু প্রণাম জানায়, দাঁড় করিয়ে আলাপ করায় স্পর্ধা তাদের নেই। নরেশ এক সময় কোথায় সরে পড়ল জানা গেল না। কৃষ্ণেন্দু আর হীরেন যখন বীরেশ্বরের বাড়ী পৌছল তখন বেলা হয়েছে,

দ্বিতীয় দফা চায়েও আদা দেওয়ার জন্য রামপাল নিন্দে করছে গ্রাম্য রুচির।

কথার অনিবার্য অপচয় যথাসম্ভব সংক্ষেপে চুকিয়ে নিয়ে কৃষ্ণেন্দু কাজের কথা পাড়ল। 'সবার আগে তোমাদের সঙ্গে দু'চারটে কথা কয়ে নেওয়া দরকার মনে করছি শ্যামলাল। তোমাদেরি সর্বনাশ হয়ে গেছে বেশী। তারপর অন্য সকলের সঙ্গে আলাপ করব।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। চা'টা আনিয়ে দি কিছু ?'

'গাড়ী থেকে নেমে স্টেশনে আমরা খেয়ে নিয়েছি, ওসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ো না। তোমরা কি করবে ঠিক করেছ?'

'কিছুই ঠিক করিনি।'

'কিছুই না? কোন পরামর্শ হয়নি তোমাদের?'

'আজ্ঞে না। আপনার পথ চেয়ে ছিলাম।'

কৃষ্ণেন্দু অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করনি, এ কি একটা কথা হল?'

হীরেন বলল, 'আহা, অত কথার মারপ্যাঁচ ধ'রো না। সেরকম পরামর্শ হয়েছে বৈকি, অনেক হয়েছে। ও বলতে চায়, পরামর্শের কোন ফল হয়নি।'

শ্যামলাল কৃতজ্ঞ হয়ে বলল, 'ঠিক বলেছেন বাবু। আপনা-আপনির ভিতরে উই ছাড়া কি কথা আছে মোদের, কিন্তু কথা কয়ে থই মিলছে না কো।'

কথা কয়ে কৃষ্ণেন্দুও থই পাবে মনে হল না। বাপের মৃত্যুকে এরা তিন ভাই কি ভাবে গ্রহণ করেছে, সেই অত্যাচারের কিরকম প্রতিকার এরা চায়, সে জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে এরা রাজী আছে, এসব মোটামুটি আন্দাজ করে নেবার ইচ্ছা কৃষ্ণেন্দুর ছিল। বহুক্ষণ চেষ্টা করে একটি স্পষ্ট ধারণাও সে আয়ত্ত করতে পারল না। তিন ভাই কথা কয় তিন রকম, আবার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধরলে প্রত্যেকের কথা উল্টো-পাল্টা, পরস্পরবিরোধী, অর্থহীন। এখন একজন তার যে কথায় সায় দেয় একটু পরে একেবারে তার বিরুদ্ধ কথাতে সে-ই আবার সর্বাঙ্গীণ সমর্থন জানিয়ে বসে। ক্রমে ক্রমে যখন গাঁয়ের অনেকে এসে পৌঁছল এবং বিশেষ ভাবে বীরেশ্বরের মৃত্যুতে সীমাবদ্ধ না থেকে হেরম্ব চক্রবর্তীর অনাচার অত্যাচার সম্পর্কে সাধারণ ভাবে আলোচনা আরম্ভ হল তখনও কৃষ্ণেন্দু কারো মনের কূলকিনারা খুঁজে পেল না । প্রতিশোধের বদলে নিছক প্রতিকারের ব্যবস্থাই যে এরা তার কাছে প্রত্যাশা করছে এটুকু বুঝতে অবশ্য তার রামপালের চেয়ে বেশী সময় লাগেনি। এটা বুঝতে তার ঝুমুরিয়া আসবার দরকার ছিল না, দূর থেকেই অনুমান করে নিতে পারত। বর্তমান অরাজকতায় যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এদের দেহমনের কোনরকমে শান্তিতে থাকার উপায় না খুঁজে লড়াই করতে চাইলেই এদের পক্ষে বিস্ময়কর হত। সে কথা নয়। আরও বেশী হাঙ্গামার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাক, হেরম্বের প্রতি একটা নির্দিষ্ট মনোভাব তো এদের আছে? ক্রোধ ক্ষোভ ঘৃণা বিদ্বেষের জ্বালা তো এরা অনুভব করে? মনে মনে কামনা তো এরা করে যে হেরম্বের সর্বনাশ হোক, সে উচ্ছন্ন যাক? সকলের এই মানসিক বিরুদ্ধতার গভীরতা আবিষ্কার করতে গিয়ে কৃষ্ণেন্দু যেন দিশেহারা হয়ে গেল। রাগ দুঃখ হিংসা দ্বেষ ক্ষোভ বিরক্তি অসন্তোষ সব আছে এই মানুষগুলির মধ্যে, কিন্তু দু'একজন ছাড়া— কমবয়সী দায়িত্বজ্ঞানহীন উত্তেজনাপ্রবণ দু'একজন ছাড়া, সকলেই যেন ক্ষমা করেছে হেরম্বকে। বীভৎস রোগে অকথ্য যন্ত্রণা পেয়ে আজ যদি হেরম্ব মরে যায়, শিয়াল কুকুরে যদি টেনে ছিঁড়ে খায় তার দেহ, সকলের হাড়ে বাতাস লাগবে। তবু তাকে আঘাত করতে কেউ চায় না।

জগৎ দাসের একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে। ছেলেটা হাঙ্গামার দিন বাড়ী থেকেই বের হয়নি, সর্দি জ্বর হয়েছিল। জগৎ বলল, 'দশঘর সাঁওতাল প্রজা আছে, তাদের ছাড়িনিকো। সেই রাগে ছেলেটাকে ধরিয়েছে। বড় চড়া রাগ মানুষটার। চোখ যেন লাল হয়ে আছে জবাফুলের নাখান চব্বিশ ঘণ্টা। মাথা-টাথা বিগড়ে যাবে এবারে, পাগলা হয়ে যাবে। ঘরে বসে ওসব তন্তর সাধন কি সয় মান্ষের, বিষয়ী মান্ষের, কারবার চলে ডাকিনী যোগিনী নিয়ে!'

বিপিন কুমার সায় দিয়ে বলল, 'ঠিক কথা। মানুষটা, জানো কেষ্টবাবু, নেহাৎ মন্দ ছিল নাকো। ওই করে বেঠিক হয়ে গেছে গা মাথাটা।' শিবু নন্দী সেদিন মার খেয়েছিল, বাঁ হাতটা জখম হয়েছে। পুলিশের টানাটানির ভয়ে জখমের কথা সে কাউকে বলে না, সর্বদা গায়ে চাদর জড়িয়ে গোপন হয়ে রাখে। শিবু বলল, 'মোর কথাও তাই। বলি, সংসার যদি করবে তো সংসারী হয়ে সংসারে থাকো, না তো সন্নেসী হয়ে বসে শ্মশানে গিয়ে করো ওসব। রাতভোর মড়ার বুকে আসন-পিঁড়ি বসে থেকে ভোরে সিন্দুকের পয়সা গোনা, ও হয় নাকো।'

আগেও আলোচনা বহুবার বিপথে চলবার উপক্রম করেছিল, কৃষ্ণেন্দুর জন্য হয়ে ওঠেনি। এবার সে বাধা না দেওয়ায় পুরাদমে তন্ত্রমন্ত্র সাধনভজন সাধু সন্ন্যাসীর গল্প শুরু হয়ে গেল। কৃষ্ণেন্দুর কাটাকাটা কথা আর জেরায় সকলে একটু শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। দশটা আজে বাজে খেই ছাড়া কথার মিশাল না দিয়ে এতক্ষণ একমনে কেবল একটা বিষয়ে তারা কথা বলতে পারে না, তা সে যতবড় গুরুতর বিষয়ই হোক। হেরম্বের একটি গুরু ছিলেন, একজন বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধু। এখন তিনি দেহরক্ষা করেছেন। তার অলৌকিক শক্তি ও ক্রিয়াকলাপের কাহিনী শুনতে শুনতে সকলে আরাম বোধ করে। অন্যমনে সেকথা ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণেন্দু খানিক শোনে খানিক শোনে না।

স্নানাহারের তাগিদে একসময় বৈঠক খতম হয়ে যায়। বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে সকলের মুখপাত্র হিসাবে জগৎ দাস বলে, 'তবে ওই কথা রইল কেষ্টবাবু?'

'কোন্ কথা?'

হীরেন তাড়াতাড়ি বলল, 'হ্যাঁ ওই কথাই রইল বৈকি। চারিদিকের অবস্থা দেখে বুঝে শুনে কেষ্টবাবু যাহোক একটা ব্যবস্থা করবেন।'

এত বেলায় গাঁয়ের পথঘাট নির্জন হয়ে এসেছে। গাছে গাছে শুধু হনুমানের লাফালাফি। এ অঞ্চলে খুব হনুমান দেখা যায়। কৃষ্ণেন্দু গম্ভীর বিমর্ষ হয়ে পথ চলছিল, বড় একটা নিমগাছের কাছে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ সে একপাল হনুমানের লীলাখেলা চেয়ে দেখল। তিনটি হনুমতী উকুন বেছে বেছে পালের গোদার অঙ্গসেবা করছে। সে দুই হাঁটুতে হাত রেখে আরামে চোখ বুজে বসে আছে। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই কি অপরাধে একটি সেবিকাকে সে সজোরে চড় বসিয়ে দিল। লাফিয়ে তফাতে সরে খানিকক্ষণ কিচির মিচির করে সেবিকাটি যেন অভিমান করেই গোদার দিকে পেছন করে বসল এবং সন্তানকে বুকে নিয়ে অবিকল মানুষের ভঙ্গিতে স্তন দিতে লাগল।

হীরেন বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে।'

কৃষ্ণেন্দু চলতে আরম্ভ করে বলল, 'লিভারের যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, খিদে তোর কখনো পায় না। মনটা খারাপ হয়ে গেল ভাই। হেরম্বকে ওরা এত ভয় করে কেন বুঝতে পারলাম না। আমাকে দেখে ওরাও কেমন হতাশ হয়ে গেছে মনে হল শেষের দিকে।'

'আগাগোড়া শুধু ছ্যাবলামি করলি, ওদের দোষ কি? হেরম্বকে কেন এত ভয় করে সেটা

তো ওদের কথাবার্তা শুনেই বোঝা যাচ্ছিল।'

'আমি তো পারলাম না বুঝতে।'

'হেরম্ব ধার্মিক বলে তাকে ওরা ঘাঁটাতে চায় না।'

'হেরম্ব ধার্মিক নাকি?'

'অতবড় একজন তান্ত্রিক সাধুর শিষ্য, নাম করতে লোকের গা ছম ছম করে। নিজেও নাকি সাধন-টাধন করে, অমাবস্যার রাত্রিগুলি মড়ার বুকে আসন-পিঁড়ি হয়ে কাটিয়ে দেয়। ওদের কাছে সে ভয়ঙ্কর ধার্মিক।'

কৃষ্ণেন্দু থমকে দাঁড়াল। ডাইনে পথের ধারে মাইলের সংখ্যা লেখা মাটিতে পোঁতা শিলের মত পাথরটিতে কে যেন তেলসিঁদুর মাখিয়েছে। একটু দূরে পুকুরের ধারে ছোট একটি মন্দির,—পুরানো, ভাঙ্গা এবং বটগাছে ধরা।

'তাই হবে। ঠিক!'

হীরেনের অনুমানে সায় দিয়ে হিংস্র চোখে কৃষ্ণেন্দু তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সিগারেট ধরিয়ে নিতে হীরেনের হাতে বার বার সিগারেটটা কেঁপে কেঁপে যায়।

'আমি পারলাম না, তুই ধরতে পারলি কেন কথাটা এত সহজে?'

'তুই ওদের সঙ্গে কথা বলছিলি, আমি ওদের কথা শুনছিলাম।

কৃষ্ণেন্দু বিমর্ষ ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে হীরেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

'দেশ সম্বন্ধে কতগুলি কথা তুই ভুলে থাকিস ভাই। ধর্ম আর সংস্কার যে এদেশের মন কি ভাবে গ্রাস করে আছে খেয়াল থাকলে কেন ওকে সকলে এত ভয় আর খাতির করে তুইও সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারতিস। এদেশে ধর্ম ছাড়া কথা নেই। চারিদিকে তার প্রমাণ তো দেখতেই পাস সর্বদা। ধর্মের দোহাই ছাড়া এদেশে রাজনীতি হয় না, আন্দোলন চলে না। এদেশে নেতাকে হতে হয় মহাত্মা। আধ্যাত্মিকতার স্তরে টেনে তুলতে না পারলে এদেশে কিছুই করার উপায় নেই। এটা তোরা ভুলে থাকিস্। ধর্ম আর সংস্কারের কথা শুনলে অবশ্য তোরা বাস্তবপন্থীরা অসন্তুষ্ট হোস, কিন্তু যা আছে তা আছে।'

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'অসন্তুষ্ট হই কিন্তু ভুলে থাকি না। উপেক্ষা করি। আমরা বলি, অন্নহীন, পরাধীন অত্যাচারিতের ধর্ম নেই। আমরা বলি, সমস্ত সংস্কার ভাঙ্গতে হবে।'

হীরেন বলল, 'কেন বলিস? ভাষা শুধু বকবক করার জন্য সৃষ্টি হয়নি, বোঝারও কাজে লাগে। নিজের মন যা বলে শুধু সেই কথা না বলে, যাদের জন্য বলা তারা যা জানে বোঝে আর মানে সে কথা বললেই হয়! শ্রোতার ভাষা না জেনে বক্তৃতা দিয়ে লাভ কি? অন্নহীন পরাধীন অত্যাচারিতের ধর্ম নেই বললে যখন কেউ কানে তোলে না তখন বললেই হয় ওরকম হয়ে থাকা অধর্ম, মহাপাপ—বললেই হয় অন্নাভাব, পরাধীনতা, অত্যাচারের প্রতিবাদ আর প্রতিকারই ধর্ম।'

'তফাৎ কি হল?'

'যারা ধর্ম-খ্যাপা তারা বুঝতে পারে, সাড়া দেয়। এদেশে ধর্ম আর সংস্কারের সর্বব্যাপী প্রভাব যখন অস্বীকার করা যায় না, সে সত্যটাকে মেনে নিয়ে কাজে লাগানোই তো বুদ্ধিমানের লক্ষণ। কিন্তু তোদের কথা আলাদা। ওসব কাজে লাগাতে তোদের সঙ্কোচ হয়। পাছে তার মানে দাঁড়ায় যে তোরাও মেনে নিয়েছিস, প্রশ্রয় দিয়েছিস। স্বর্গে যেতে হবে, কিন্তু ফাশনেবল পথটি ছাড়া অন্যপথে তোরা চলতে রাজী নোস্।'

কৃষ্ণেন্দু একটু হাসল। নীরবে কিছুক্ষণ পথ চলে বিনা ভূমিকায় হঠাৎ বলল, 'দূরে দূরে না থেকে কাজে নেমে যা না হীরেন? আমার চেয়ে তুই ভাল কাজ করতে পারবি। আমার শুধু শখ, তোর দরদ আছে, ওদের তুই আমার চেয়ে ভাল বুঝিস।'

'আমার সত্যি খিদে পেয়েছে ইন্দু।'

নিঃশব্দে বাকী পথ অতিক্রম করে বাড়ীর সামনে পৌঁছে দু'জনে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে, যেন একই তাগিদে।

'কাজে নামার ইচ্ছে তোর আছে। আমি জানি।'

'তা আছে।'

'তবে?'

'ইচ্ছে থাকলেই কি হয়। আমার সংযম নেই, সহিষ্ণুতা নেই, ধৈর্য নেই। কাজে নামতে ভয় করে ভাই।'

'আজ পর্যন্ত বার দশেক প্রশ্ন করেছি। আজ তবু একটা জবাব দিলি।' বলে হীরেনকে ফেলে কৃষ্ণেন্দু হন হন করে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল।

মাথায় কাপড় তুলে দিগম্বরী বলল, 'চান করবেন না ঠাকুরপো? তবে খেতে বসুন।'

শশাঙ্ক আমতা আমতা করে বলে, 'হাতে একটি পয়সা নেই, খাবার-দাবারের ভাল ব্যবস্থা করতে পারিনি ভাই।'

হীরেন টাকা বার করলে শশাঙ্ক হাত বাড়িয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। টাকা চাইতে তার লজ্জা করেনি, টাকা চেয়ে হাত পেতে নিতে সত্যি তার লজ্জা করছে। চাইতে তো হয়নি কোনবার।

হীরেন টাকা বার করলে বরাবর সে বিস্মিত হয়ে গেছে, টাকা নিয়ে অনুযোগ দিয়ে বলেছে, 'কি দরকার ছিল বল তো?'

দুপুরে ঝুমুরিয়ার কয়েকটি ছেলে দেখা করতে এল। তাদের সঙ্গে দেখা গেল নরেশকে। এ পর্যন্ত নরেশের কোন পাত্তা মেলেনি, কোথায় খাওয়া দাওয়া করেছে সেই জানে। অচেনা গাঁয়ের সমবয়সী অচেনা ছেলেদের দলেই বা সে কি করে ভিড়ে গেল ঠিক বোঝা গেল না। সকলের সঙ্গে ভাবটাও যেন বেশ জমিয়ে নিয়েছে এইটুকু সময়ের মধ্যে।

কৃষ্ণেন্দুকে নিয়ে ছেলেরা একটা শোভাযাত্রা করতে চায়। এখানে থেকে শোভাযাত্রা শুরু করে সমস্ত গ্রাম ঘুরে তাদের লাইব্রেরীতে গিয়ে শেষ হবে। সেখানে সভা করে ছেলেরা তাকে অভিনন্দন দেবে।

'এই দুপুর রোদে?'

'আজ্ঞে না। বিকেলে।'

'তোমাদের লাইব্রেরীতে কত বই আছে?'

'একাত্তরখানা হবে। দু'টো ম্যাগাজিন নিই।'

হীরেনের দিকে চেয়ে কৃষ্ণেন্দুর মৃদু হাসি মিলিয়ে গেল।

'আজ নয় ভাই, কাল শোভাযাত্রা করব। দুপুরবেলা। শোভাযাত্রা করে একেবারে নতুন রাস্তায় গিয়ে হাজির হব।'

ঘরের অন্যপ্রান্তে হীরেন তাকিয়ায় পিঠ দিয়ে কাত হয়ে ছিল, ধীরে ধীরে উঠে বসল।

'তাই তবে ঠিক করলি?'

'হ্যাঁ।'

'প্রথমে আপোসের কথাবার্তাও বলে দেখবি না?'

'না। তাতে কোন লাভ হবে না জানি। ওরা পেয়ে বসবে, এরা আরও ঝিমিয়ে পড়বে।'

'কে জানে!'

হীরেন আর কথা কইল না। ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিল, হঠাৎ যেন বিপাকে পড়ে গেছে। দু'টি ছেলে কৃষ্ণেন্দুর মুখ-চেনা, কিছুদুর পড়া শোনা করে বাড়ীতে বসে আছে। দলের হয়ে তারাই এতক্ষণ কথা বলছিল। অনাথ নামে পাঞ্জাবী গায়ে ছেলেটি বন্ধুদের সঙ্গে খানিক পরামর্শ করে দু'পা সামনে এগিয়ে এল।

'এরা' আপনার কাছে একটা কথা জানতে চায় কেষ্টদা। আপনি কোন্ দলে?'

'দল? কিসের দল?'

'আপনি যদি মোহনলালের দলে হন, এরা কালকের শোভাযাত্রায় যোগ দিতে পারবে না বলছে। আপনাকে নিয়ে আমরা তাহলে বরং আরেকদিন মিটিং করব।' কৃষ্ণেন্দুর দৃষ্টি দেখে অনাথ তার দলের প্রতিনিধির উপযুক্ত গাম্ভীর্য ও ধীরতা বজায় রাখতে পারল না, একটা ঢোক গিলে ছেলেমানুষেরই মতই আব্দারের ভঙ্গিতে যোগ দিল, 'আজ বিকেলেই চলুন না আমাদের ওখানে?'

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'বোসো দিকি সবাই। তোমরা কারা জেনে নি একটা পাটি বিছিয়ে দে তো নরেশ।'

নরেশ সকলের পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। পাটি আনতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে না যেতে দিগম্বরী নিজেই একটা পাটি এনে বিছিয়ে দিল। একগাল হেসে বলল, 'বোস বাবারা, বোস। কেষ্টবাবুর কথা শোন।'

হীরেন থতমত খেয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। খাওয়ার সময় দিগম্বরী ঘোমটা দিয়ে নীরবে পরিবেশন করেছিল, তাকে এখন বাড়ীর বুড়ী গিন্নীর ভাষা সুর ও ভঙ্গিতে কথা কইতে দেখে সে অবাক হয়ে গেল।

বেরিয়ে যাবার আগে হীরেনের দিকে চেয়ে বুড়োমানুষের মতই নিঃসঙ্কোচে দিগম্বরী বলল, 'বড়-মানুষ, নামকরা-মানুষ কেউ গাঁয়ে এলে ছেলেরা বড় খুশী হয়। পোড়া গাঁয়ে কেউ তো আসে না সাত জন্মে!'

কৃষ্ণেন্দু ছেলেদের জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের দল কোন্টা?'

'এই এটা। আরও কয়েকজন আছে, তারা আসতে পারেনি।'

গাঁয়ের পনের ষোলটি কিশোর ও তরুণকে নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ করার সে এক বিচিত্র ও গৌরবময় কাহিনী। অনাথ আর সহদেবেরই গৌরব, তারাই দলটা গড়েছে। আগে কিছুই ছিল না ঝুমুরিয়ায়। নমো নমো করে একটিমাত্র বারোয়ারী পূজো হত, সভাসমিতি, খেলাধূলার ব্যবস্থা, লাইব্রেরী, নাইট স্কুল, কিছুই ছিল না। এরা সব কিছু গড়ে তুলেছে। বছরে এখন পাঁচ ছটি পূজা পার্বণ উপলক্ষে উৎসব হয়, দুর্গাপূজায় এত সমারোহ হয় যে আশেপাশের সব গ্রাম হার মেনেছে। সদর থেকে বিখ্যাত ব্যক্তিদের আনিয়ে মাঝে মাঝে গাঁয়ে এরা সভা করায়। হেরম্বের কাছ থেকে একটি খেলার মাঠ আদায় করেছে, তাদের টিম এবার সদরে কাপ খেলায় প্রথম রাউণ্ডে জিতেছিল। পালা করে এরা পাহারা দেওয়ায় গাঁয়ে এখন আর চুরি হয় না। নাইট স্কুলে চাষাভুষাদের পড়ায়। অসুখ বিসুখে সেবা করতে যায়। জঙ্গল সাফ করে, মশা নষ্ট করে, আরও কত কি যে তারা করে হিসাব হয় না।

'আগে কিছুই ছিল না কৃষ্ণেন্দুবাবু! সব আমরা করেছি।'

দুঃখের বিষয়, মোহনলালও একটা দল করেছে, চাষাভুষো ছেলেদের নিয়ে। কাজ তারা কিছুই করে না, অনাথদের দলের সঙ্গে শুধু শত্রুতা করে আর তাদের টিটকারী দেয়।

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'এই ব্যাপার? তা, তোমাদের ভিলেজ পলিটিক্স নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই ভাই। হেরম্ববাবু বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছেন, তার একটা বিহিত করতে আমি এসেছি। আমি কোন দলে নেই। তোমাদের দলেও নয়, মোহনলালের দলেও নয়। কাল কোন দলের প্রশেসন হবে না, গাঁয়ের লোকের প্রতিবাদের প্রশেসন হবে। এতে দলাদলির কোন কথাই নেই। আশেপাশের গাঁ থেকেও লোক আসবে। তোমরাও এসো।'

'আমাদের একটু অসুবিধা আছে।'

'কিসের অসুবিধা?'

'আমরা—আমাদের মতবাদ অন্যরকম।'

কৃষ্ণেন্দু অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'মতবাদ? এর মধ্যে আবার মতবাদের কথা আসে কোত্থেকে? একটা লোক যাচ্ছেতাই অত্যাচার করছে, ধরে বেঁধে সকলকে দিয়ে মজুরের কাজ করাচ্ছে, জমি কেড়ে নিয়ে রাস্তা বানাচ্ছে, মাটি তুলে নিচ্ছে, এসবের যাতে প্রতিকার হয় আমরা সে চেষ্টা করব। তাতে মতবাদের কি আছে?'

'আমরা বিশ্বাস করি, গ্রামের উন্নতির জন্য ভাল রাস্তাঘাটের দরকার আছে। রাস্তাটি তৈরী হলে আমাদেরই উপকার হবে।'

কৃষ্ণেন্দু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'রাস্তা তৈরী করতে আমরা বাধা দেব না। আমরা অত্যাচারের প্রতিবাদ করব।'

সহদেব রোগা ছিপছিপে ভারি সুদর্শন ছেলে। মুখখানা দেখলেই ভাল বলতে ইচ্ছা করে। সে বলল, 'ও একই কথা। রাস্তা তৈরীতে বাধা দেওয়া হচ্ছিল বলেই হেরম্ববাবুকে একটু আধটু অত্যাচার করতে হয়েছে। আর বিনা মজুরিতে তিনি তো কাউকে খাটাচ্ছেন না, প্রত্যেককে মজুরি দিচ্ছেন। অবশ্য যারা গোলমাল করে তাদের বেলা—'

অনাথ বলল, 'আপনাকে সত্যি কথা বলি কৃষ্ণেন্দুবাবু, হেরম্ব চক্রবর্তীকে আমরাও পছন্দ করি না। তবে এক্ষেত্রে আমাদের পলিসি হচ্ছে, চুপ করে থাকা। রাস্তাটা হচ্ছে, হয়ে যাক। অন্য ব্যাপার হলে হেরম্ববাবুর অত্যাচার আমরাও সহ্য করতাম না। অনেক আগে আমরাই একটা বিহিত করতাম। আমবা রাস্তা চাই। বর্ষাকালে তিন চার মাস এখানকার রাস্তায় সাইকেল পর্যন্ত চালান যায় না।'

'কি হবে সাইকেল চালিয়ে? রাস্তা দিয়ে? গরু ছাগলের চলতে ফিরতে সাইকেল লাগে না, ভাল রাস্তারও দরকার হয় না।'

ছেলেরা চুপ করে থাকে। কৃষ্ণেন্দু মনে মনে নিজের ওপর বিরক্ত হয়। এদের মেজাজ দেখিয়ে, কড়া কড়া কথা শুনিয়ে লাভ কি?

আবার সে বলে, 'এই সোজা কথাটা কি তোমরা বুঝতে পার না? রাস্তাঘাটের উন্নতি, লাইব্রেরী, নাইট স্কুল, পূজাপার্বন এ সবের কোন মানে হয় না, গাঁয়ের লোক যদি মানুষ না হয়, যদি শুধু মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করে যায়? রাস্তাটা কি হেরম্ব তৈরী করে দিচ্ছে? ঘরের পয়সা খরচ করে? না, গাঁয়ের লোকের সুবিধার জন্য তৈরী হচ্ছে? ওদের সুবিধার কথা কর্তারা ভাবলে অনেক আগেই রাস্তা তৈরী হয়ে যেত। রাস্তা হচ্ছে ভালই। কিন্তু ওটা হেরম্বের অনুগ্রহ বা দান ভাবছ কেন? হেরম্ব তো কনট্রাক্টে মোটা টাকা লাভ করবে। রাস্তার

জন্যে সকলের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় হবে। এতকাল যে রাস্তাটা হয়নি সেটাই তো হয়েছে ওদের মস্ত অন্যায়। আজ রাস্তা তৈরীর নামে কড়া জুলুম চলবে আর তোমরা মুখ বুজে থাকবে? দলাদলি বড় হবে তোমাদের? যে গাঁয়ে—' একমুহূর্ত থেমে সে যোগ দেয়, 'যে গাঁয়ে অন্যায়ের সঙ্গে লড়তে জালালুদ্দিন প্রাণ দিল, বীরেশ্বর প্রাণ দিল, ক'জন জেলে গেল?'

ছেলেরা মুখ ভার করে চলে গেল। নরেশ গেল না, যেখানে বসে ছিল সেইখানে বসে পাটি খুঁটতে লাগল। কেউ কথা কয় না। দিগম্বরী এসে মুখ খুলতে গিয়ে কিছু না বলেই আবার চুপচাপ চলে যায়।

'গাঁয়ের ভদ্রলোকের ছেলে এরা। বড় হয়ে এরা ভদ্রলোক হবে।'

'ওরা তো খারাপ ছেলে নয়?' দিগম্বরী বলে।

হীরেন বলে, 'সবাই ওরকম ভদ্রলোক হবে না ইন্দু। সূর্যও এ গাঁয়ের ভদ্রলোকের ছেলে।'

'সূর্য? সূর্য এদের দলে থাকত না—মোহনলালের চাষাভূষোর দলে যেত।'

•

চারিদিকে দুপুরের মাটিফাটা চড়া রোদ। বাইরে তাকালে দেখা যায় পাক খেয়ে খেয়ে তাপ ওপরে উঠছে, দূরত্ব দুলে দুলে চোখে লাগিয়ে দিচ্ছে ধাঁধা। এই দুপুরবেলা কৃষ্ণেন্দু শোভাযাত্রা করবে, গাঁ সুদ্ধ লোককে দু'মাইল পথ হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে হেরম্বের রাস্তায়, গরু ছাগল যখন গাছের নীচে আর ঘরের কানাচে ছায়া খুঁজে নিয়ে ধুঁকতে থাকে। প্রকৃতিকে হিসাবে ধরতে কৃষ্ণেন্দুর চিরদিন ভুল হয়ে যায়। গরমে ঘেমে, বর্ষায় ভিজে, শীতে কেঁপে আর বসন্তে হঠাৎ সঞ্জীবিত হয়েও সে যেন স্রেফ ভুলে থাকে সূর্য এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই।

'আঁ? রোদ? হোক' রোদ। রোদে সকলের তেজ বাড়বে।'

'সেরেছে!' বলে হীরেন নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসে, মিট মিট করে তাকায় বন্ধুর দিকে। 'বীরেশ্বর দাঙ্গা বাধাবার উপক্রম কবেছিল, তুই বুঝি দাঙ্গা বাধাতে চাস?'

'বীরেশ্বরের পথটা নেওয়া কি ভাল নয়? শহীদ হতে পারব—বীরেশ্বরের কাজটাও হবে।' কৃষ্ণেন্দু পাল্টা প্রশ্ন করল তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে। কৃষ্ণেন্দুর কথা শুনে হঠাৎ হীরেনের মাথার মধ্যে ঝিমঝিম্ করে উঠল। কিছুদিনের অকথ্য অত্যাচারের প্রতিবাদেই তার দেহমনের স্বাস্থ্য এই শোচনীয় কৌতুক শুরু করেছে তার সঙ্গে, হৃদয়মন একটু গভীরভাবে নাড়া খেলেই মাথার মধ্যে যেন কেমন করে ওঠে। ব্যাকুল হয়ে সে বলে, 'এদের তুই জানিস না, বুঝিস না। এরা কি-ভাবে, কেন ভাবে, কি চায়, কেন চায়—কিছু না জেনেই তুই এদের নেতা হতে চাস। নিজের খেয়াল মত যা তা একটা কাণ্ড করে এদের সর্বনাশ করে বসবি?'

কৃষ্ণেন্দু বলে, 'পাগল হয়েছিস? আমি ইচ্ছে করে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাতে চাইব? ওটা কথার কথা বলছিলাম—যদি কোন কারণে হাঙ্গামা একটা হয়ে যায়, আমি যদি সামলাতে না পারি। আমার উদ্দেশ্য হল, সকলকে একত্র করে জোরালো আন্দোলন সৃষ্টি করা। মিটিং আর প্রশেসনটা যদি সফল হয়, একদিকে হেরম্ব ভয় পেয়ে যাবে, অন্যদিকে এদের ভরসা বাড়বে, জোর বাড়বে। ক্ষেপে আছে অনেকে, কিন্তু তারা আছে ছড়িয়ে—বীরেশ্বর ওদের একসঙ্গে আনতে পারেনি। মানুষটা রগচটা —দশজনের দাঙ্গা করার চেয়ে যে একশো জনের ধমকের জোর বেশী তা ও জানত না। এই কথাটাই মিটিং-এ ভাল করে বুঝিয়ে দেব, কোন রকম হাঙ্গামা না করেও হেরম্বকে অনায়াসে কাবু করা যায়। আমি কি আশা করছি জানিস?

যারা চুপ করে আছে, যারা ভয়ে রাস্তায় খাটছে, পরশু তারা আমাদের দলে আসবে।'

'কিন্তু হেরম্ব যদি দাঙ্গা বাধায়? প্রসেসনে কি বীরেশ্বরের মত রগচটা কেউ থাকবে না?

'সে ভয় তো আছেই।' হীরেন ভরসা পায় না। সে জানে, কৃষ্ণেন্দু আদর্শবাদী। নতুন যুগের পুরানো আদর্শবাদী। তার মত মানুষের এরকম মনোভাব জাগলে ফলাফলটা ভাল হয় না। আদর্শবাদীর নিজেকে আঘাত না করতে পারলে স্বস্তি জোটে না কিছুতেই। কৃষ্ণেন্দু তাই করবে। ঝুমুরিয়ার লোকেদের কি উপকার হবে সেটা এখন জানেন ভগবান, কৃষ্ণেন্দু ভয়ানক একটা কিছু করবেই। এমন একটা আঘাত সে হেরম্বকে দেবে যার প্রতিঘাত অন্য কাউকে স্পর্শ করুক বা না করুক তার গায়ে এসে লাগবেই।

কলকাতা থেকে কৃষ্ণেন্দু গাঁয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল দাঙ্গা। পুলিশকে বলে দিতে হবে না কার জন্য দাঙ্গা হয়েছে। দাঙ্গাটাও কৃষ্ণেন্দু ভালভাবেই বাধাতে চায়। দুপুরের রোদকে পর্যন্ত সে লোকের মাথা গরম করার কাজে লাগাবে।

'ব্যাপার কি ভয়ানক দাঁড়াতে পারে ভেবেছিস?'

'ভেবেছি বৈকি। ওই ভয়ে তো চুপচাপ বসে থাকা যায় না?'

'দশ-বিশটা খুন হতে পারে।'

'তা হতে পারে। নাও হতে পারে।'

ঘরের ঠিক বাইরে টুপ্ করে একটা আম খসে পড়ার শব্দ কানে এল। সিগারেট টানতে টানতে দু'বার কথা বলতে গিয়ে হীরেন চুপ করে গেল। সেও বাইরে থেকে এসেছে, দাঙ্গাকারীদের নেতা কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে। অন্ততঃ আগামী দশটা বছর হাজতবাস না করে তার আর বোধহয় উপায় নেই। মুখ থেকে সিগারেট নামাতে গিয়ে হাতটা থরথর করে কাঁপছে দেখে হীরেন একটু আশ্চর্য হয়ে গেল। ক্ষুণ্ণও হল। এত বেশী ভয় তো সে পায়নি! অথবা মনের মধ্যে যে অদ্ভুত প্রক্রিয়া চলছে তাকেই ভয় বলে?

এমন সময় নরেশের সঙ্গে এল রম্ভা। হেরম্ব সম্পর্কে কৃষ্ণেন্দু ঠিক কি ঠিক করেছে জানবার জন্য সে উতলা হয়ে উঠেছে, বেলা পড়ার জন্য ঘরে বসে অপেক্ষা করতে পারেনি। কদিনে তার মুখখানা শুকিয়ে গেছে, সেই মুখ রোদের ঝাঁঝে লাল হওয়ায় লাবণ্যের এমন ক্ষতি হয়েছে যে দেখলে আপসোস জাগে। রুক্ষ চুল এলোমেলো হয়ে আছে। গায়ে জামা দেয়নি, আঁচলটাও জড়িয়েছে অসতর্কভাবে। রম্ভার এমন মূর্তি হীরেন কখনও দেখেনি। হঠাৎ সে মদের পিপাসা অনুভব করে, যে পিপাসা আজকাল মন নাড়া খাবার সঙ্গে এমনি হঠাৎ ক্ষীণ ভাবে জাগে আর মিনিটে মিনিটে জোরালো হতে হতে একেবারে অদম্য হয়ে দাঁড়ায়, অকথ্য যন্ত্রণায় কেবলি সাধ হতে থাকে মদের পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করবার। এক মুহূর্তে হীরনের মুখ পাঁশুটে হয়ে যায়, স্নায়ুগুলি শিরশির করে ওঠে। কাল যদি তার কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে জেলে যেতে হয়, মদ সে পাবে কোথায়! মদ না খেলে তার চলবে না। আজ তার সব খেয়াল আছে, কালও হয়তো কিছু কিছু থাকবে, কিন্তু পিপাসা বাড়তে বাড়তে পরশু তো আর কাছে আত্মীয় বা বন্ধু বলে কিছু থাকবে না, সমাজ সংসার শূন্যে মিলিয়ে যাবে। মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে থেকে সে নিজের সাময়িক অসহ্য যন্ত্রণা সারায়, মদ তার ওষুধ, চিকিৎসা। মদ না পেলে সে যে পাগল হয়ে যাবে একেবারে!

'শোভাযাত্রা করে কি করবেন কেষ্টবাবু?' রম্ভা জিজ্ঞেস করল।

'দেখি কি করি।'

'দশজনে মিলে চেঁচিয়ে গাঁয়ে পাক দিয়ে এলে লোকটার কি হবে! মোর বাপের মরণের

আসল বিহিত কিছু করুন কেষ্টবাবু, পায়ে ধরি আপনার।'

'আসল বিহিত? আসল বিহিত মানে কি রম্ভা ?'

'ওকে—ওকে—, ওর নাক কান কেটে দিন, দু'চোখ কানা করে ফেলুন, সবার সামনে খোঁটায় বেঁধে চাবকে দিন। দু'রাত ঘুমোইনি কেষ্টবাবু, ও লোকটার কথা ভাবলে মাথায় আগুন ধরে যায়।'

রম্ভার দু'চোখ জ্বলজ্বল করে, সত্যই যেন চোখের আড়ালে মাথার মধ্যে তার আগুন ধরে গেছে। মুখপোড়া ভগবান তাকে মেয়েমানুষ করেছে, তার ভাইগুলোকে করেছে মেয়েমানুষের বাড়া, নইলে কুকুর বেড়ালের মত তার বাপকে মেরে হেরম্ব কি আজও বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াতে পারে বুক ফুলিয়ে! রম্ভা তাকে দেখে নিত। একচোট দেখে নিত রম্ভা তাকে। ঠোঁটে চেপে, দাঁতে কেটে কেটে রম্ভা বলে আর তার সেই তেজের প্রকাশ দেখে হীরেন মুগ্ধ হয়ে যায়! প্রথমে রম্ভার শুধু ছিল শোক আর বাপের হত্যাকারীর বিরুদ্ধে সাধারণ স্বাভাবিক বিদ্বেষ; সুর করে মড়াকান্নার সঙ্গে কতগুলি ভয়ঙ্কর অভিশাপ দিতে দিতেই যার জ্বালা কমে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রম্ভার জ্বালা যেন হীরেনের মদের পিপাসার মতই ক্রমে ক্রমে বেড়ে বেড়ে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। দিবারাত্রি এই এক চিন্তা তার মনের মধ্যে পাক খেয়ে বেড়ায়, হেরম্বকে শাস্তি দেওয়া। আর কিছু সে ভাবে না, ভাবতে পারে না।

হীরেন বলতে যায় ঃ 'কিন্তু হেরম্ব যে তোমার বাপকে মেরেছে রম্ভা—'

'কে মেরেছে তবে? কে মেরেছে?'

তীব্র তীক্ষ্ণ গলায় রম্ভা যেন আর্তনাদ করে ওঠে। তার চীৎকার শুনে দিগম্বরী ছুটে এসে থমকে দাঁড়ায়। রম্ভা গ্রাহ্যও করে না, গলা একটু নামিয়ে বলতে থাকে, 'আপনারা পুরুষমানুষ, প্যাঁচালো কথা কয়ে এড়িয়ে যেতে সরম লাগে না? সিধে কথা বলুন না, পরের জন্য কেন বিপদ ঘাড়ে করবেন!'

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'আহা মাথা গরম কর কেন? তোমার মনের মত ব্যবস্থা করব।'

'কি ব্যবস্থা?'

'বোসো। বলছি। মাথা ঠাণ্ডা কর আগে।'

দিগম্বরী মুচকে হেসে সরে গেল। সরে গেল বাড়ীর একেবারে অপর প্রান্তে, সেখান থেকে প্রাণপণে চেঁচিয়ে প্রতিবেশিনী কার সঙ্গে কথা বলে গলার আওয়াজ কৃষ্ণেন্দুব কানে পৌঁছে দিল, তারপর নিঃশব্দ দ্রুতপদে ফিরে এল এ ঘরের পাশে ভাঁড়ার ঘরে। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে শুধু বোঝা গেল কৃষ্ণেন্দু কথা বলছে, কথাগুলি শোনা গেল না। হাসিমুখে ঘাড় কাত করে সে কিছুক্ষণ পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু গলা কৃষ্ণেন্দুর চড়ল না। মুখে হাসি নিয়েই দিগম্বরী তখন শোবার ঘরে ফিরে গেল, শশাঙ্ককে বলল, 'ঠাকুরপো কি যেন মতলব আঁটছে! আমরা না বিপদে পড়ি।'

কৃষ্ণেন্দুর কথা শেষ হলে রম্ভা হতাশ ভাবে বলে, 'কিন্তু হেরম্বের কি শাস্তি হবে কেষ্টবাবু? ও নয় আর অত্যাচার না করল, সবাইকে ক্ষতিপূরণ দিল, ওতে ওর কি হবে? মোর বাপকে মেরে ও তো টেক্কা মেরে বেঁচে থাকবে, গায়ে আঁচড়টি লাগবে না।'

'আঁচড় লাগবে রম্ভা। বুকে আঁচড় লাগবে। কেটে কেটে লঙ্কা বাটা লাগিয়ে দেয়ার চেয়ে বেশী জ্বলবে ওর বুকটা—নিজের বুকটা—নিজের জ্বালায় নিজে পুড়ে মরবে। তুমি বুঝতে পার না, এ অঞ্চলে আর কোনদিন ও জুলুম চালাতে পারবে না, মাথা তুলতে পারবে না।

কেউ আর ওকে ভয় করবে না। শুধু হেরম্ব নয়, আর যে কেউ অত্যাচার করতে আসবে, এখানকার লোকেরা জানবে কি করে এক হয়ে তার সঙ্গে লড়ে তাকে হারাতে হয়! হেরম্বকে মারলে তো একটা হেরম্ব মরবে, আর এ ভাবে আমরা সব হেরম্বকে ধ্বংস করার কাজ শুরু করতে পারব। বীরেশ্বরের প্রাণ দেওয়া সার্থক হবে।'

আরও কিছুক্ষণ রম্ভাকে বুঝিয়ে কৃষ্ণেন্দু বাইরে যায়। কয়েকজন লোক তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

ক্ষোভে ও হতাশায় রম্ভাকে নিঝুম হয়ে যেতে দেখে হীরেন বলে, 'নরেশ, তুই একটু বাইরে যা দিকি।'

কুরিয়ে কুরিয়ে তার দিকে চেয়ে নরেশ চলে গেলে হীরেন বলে, 'কেন তুমি ভাবছ রম্ভা? হেরম্বের ব্যবস্থা কেষ্ট করবে। ওর মতলব আছে। সব কথা কি ফাঁস করা চলে? তোমায় তাই বাজে কথা বুঝিয়ে গেল। কাল দেখো কি হয়।'

রম্ভাকে যেন বিদ্যুৎ ছোঁয়। চোখ দুটি তার জ্বলে ওঠে।—'কি হবে ছোটবাবু কাল?'

'দেখো। কেষ্টর মতলব ঠিক আছে।'

'কি মতলব? বলুন মোকে। পায়ে ধরি বলুন।'

একটু ইতস্ততঃ করে হীরেন তাব আশঙ্কার কথা এমন ভাবে বলে রম্ভাকে যে তার মানে দাঁড়ায় এই ঃ দাঙ্গা বাধিয়ে হেরম্বকে বীরেশ্বরের মতই কৌশলে মেরে ফেলবার আশাতেই শোভাযাত্রাটা কৃষ্ণেন্দু বার করছে। কৃষ্ণেন্দুকে চেনে না রম্ভা? হেরম্বকে শেষ না করে সে কলকাতায় ফিরে যাবে?

কৃষ্ণেন্দুর দাঙ্গার পরিকল্পনার কথা শুনে রম্ভার মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল। নাক কান কাটা নয়, চোখ কানা করা নয়, একেবারে খুন হয়ে যাবে হেরম্ব!

'দাঙ্গা যদি না বাধে ছোটবাবু?'

'বাধবে। কয়েকজন মাথাগরম ছেলেকে তালিম দিয়ে নিয়ে যাবে। আরও কি সব আয়োজন করেছে, আমি সব জানি না।'

সুতরাং খানিক পরে কৃষ্ণেন্দু ফিরে এলে সভয় ভক্তিতে গদগদ হয়ে রম্ভা গলায় আঁচল জড়িয়ে তার পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

'আপনি সত্যিকারের মানুষ। আপনাকে গড় করি কেষ্টবাবু।'

কৃষ্ণেন্দু খুশী হয়ে বলল, 'বুঝতে পেরেছ তো আমার কথা? আমি জানতাম তুমি বুঝতে পারবে রম্ভা।'

বিদায় নিয়ে রম্ভা বারান্দায় গেছে, হীরেন উঠে গিয়ে বলল, 'এসব কথা কাউকে বোলো না রম্ভা।'

'তাই কি বলি ছোটবাবু!'

খুশীতে উত্তেজনায় জোরে কয়েকবার শ্বাস টেনে রম্ভা উঠানে নেমে গেছে, কৃষ্ণেন্দু বেরিয়ে এসে তাকে ডেকে বলল, 'মোহনকে একবার পাঠিয়ে দিও রম্ভা।'

থমকে দাঁড়িয়ে রম্ভা কাছে সরে এল।

'আমার ভাই মোহন?'

'হ্যাঁ, একটু দরকার আছে।'

এ দরকার যে কি দরকার অনুমান করা শক্ত নয়। কয়েকজন মাথাগরম ছেলেকে ক্ষেপিয়ে কৃষ্ণেন্দু দাঙ্গা বাধাবে। রম্ভার ভাই মোহনলালের মাথাটা যথেষ্ট গরম, তাকে দিয়ে ভালভাবেই

কাজ চলবে কৃষ্ণেন্দুর। বিবর্ণ মুখে ঠায় দাঁড়িয়ে রম্ভা কৃষ্ণেন্দুর মুখের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

'একাই আসতে বোলো।'

'একা?'

'হ্যাঁ, আগে ওর সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। ওর দলের কোন্ ছেলেটা কেমন আমি তো জানি না।'

রম্ভা বলে, 'ও তো একদম ছেলেমানুষ কেষ্টবাবু?'

কৃষ্ণেন্দু বলে, 'তোমার অন্য ভাইগুলি সত্যি মেয়েমানুষেরও অধম রম্ভা। মোহন সেরকম নয়। ওর মধ্যে খাঁটি জিনিস আছে।'

রম্ভার ভীত সন্ত্রস্ত করুণ মুখভঙ্গি দেখে হীরেন মনে মনে কৌতুক বোধ করে। গোড়ায় রম্ভার উদ্ধত ঝাঁঝালো তিরস্কারের অপমানে মনটা বেশ জ্বালাই করেছিল তখন। পরের জন্য সে বিপদ ঘাড়ে করতে চায় না, পুরুষ বলে প্যাঁচালো কথা কয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, তার সম্বন্ধে এই ধারণা পোষণ করে রম্ভা—রম্ভার ধারণা মিথ্যা নয় বলে, বিপদ সে সত্যই এড়িয়ে যেতে চায় বলে, রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়েছে বলে, রম্ভার কথা ভুলে গেলেও জ্বালাটা আত্মগ্লানি হয়ে জ্বলছিল। এখন রম্ভাকে কাবু হতে দেখে হীরেন একটু আরাম পায়। ভাইকে রেহাই দেবার জন্য রম্ভা এবাব নিশ্চয় কৃষ্ণেন্দুর হাতে পায়ে ধরে কাঁদাকাটা শুরু করে দেবে। আড় চোখে রম্ভার ভাবভঙ্গি দেখতে দেখতে হীরেন তার ভেঙ্গে পড়ার প্রতীক্ষা করতে থাকে।

রম্ভা তিনবার ঢোঁক গিলে বলে, 'গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

হীরেন বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। বন্ধুর দৃষ্টি দেখে কৃষ্ণেন্দু ভাবে সে বুঝি রম্ভার অপূর্ব দেহসম্পদ দেখছে। ভেবে কৃষ্ণেন্দু একটু বিরক্ত হয়।

তারপর প্রথম সুযোগে হীরেনকে একা পেয়ে দিগম্বরী হাসিমুখে সামনে গিয়ে ছলছল চোখে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি আমায় এত অবিশ্বাস করেন ঠাকুরপো? ও বাড়ীর রম্ভাকে যেটুকু বিশ্বাস করেন, আমায় সেটুকু বিশ্বাসও করেন না!'

'তা কেন বৌঠান, তা নয়।'

'তাই ঠাকুরপো, তাই। কেন ঢাকছেন? কোনদিন আপনার কাছে কোন অবিশ্বাসের কাজ তো করিনি ঠাকুরপো আমি!'

মুখে অল্প অল্প হাসি দিগম্বরীর লেগেই রইল, চোখের জল গাল বেয়ে নেমে এল সেই হাসিতে। হীরেন অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার মুখে হাসিকান্নার এই অদ্ভুত সমাবেশের দিকে। মাথা চুলকে বোকার মত একটু হাসল। দিগম্বরী সোজাসুজি কেঁদে ফেললে সে এমন বিব্রত বোধ করত না।

'কি জানেন বৌঠান, শুনুন বলি। রম্ভাকে যা বললাম সে ব্যাপারে ও জড়িয়ে আছে, ওসব কথার সঙ্গে আপনার কোন যোগ নেই। আপনাকে অবিশ্বাস করি বলে গোপন করিনি।'

'বিশ্বাস করেন আমাকে?'

'করি বৈকি, নিশ্চয় করি?'

'তবে বলুন। রম্ভাকে বলবেন, আমাকে বলবেন না, সে হবে না ঠাকুরপো। হিংসায় আমি মরে যাব দম ফেটে।' দিগম্বরী আঁচলে চোখ মুছল।

'কি হবে ওসব শুনে?'

'ওমা! এই বুঝি বিশ্বাস করেন আমাকে? এই বসলাম আমি এখানে, না শুনে উঠছি না।'

হীরেনের সামনে সে জেঁকে জোড়াসন হয়ে বসে পড়ল।—'নিন্ বলুন এবার চট করে। বৌঠানের কাছে কথা লুকানো, কেমনধারা ঠাকুরপো আপনি?'

হীরেনের যেন ধাঁধা লেগে যায়। দিগম্বরী আর প্রৌঢ়া গিন্নির মত কথা বলছে না, ছেলেমানুষি করছে আহ্লাদী কচি খুকীর মত। কথা, সুর, ভঙ্গি সব তার নিখুঁত। এই দিগম্বরীকে যে আবার গিন্নিবান্নী মনে করা কখনো সম্ভব হয়েছিল তা যেন এখন আর কল্পনাও করা যায় না।

'আপনি তো সবাইকে বলে বেড়াবেন।'

'না। সত্যি কাউকে বলব না। মা কালীর দিব্যি।'

হীরেন তখন খুব সংক্ষেপে তাকে মোটামুটি ব্যাপারটা শুনিয়ে দিল। শোভাযাত্রা করে গিয়ে হেরম্বের দলের সঙ্গে তারা মারামারি করবে। দিগম্বরীর চোখ দুটি বড় বড় হয়ে গেল। কিছুক্ষণ ঘাড় কাত করে সে ভাবল।

'রম্ভার বাপ বেচারাও তাই করতে গিয়েছিল, ঠাকুরপো।'

'জানি।'

'এটা কি ঠিক হবে? আবার একজন গুলি খেয়ে মরবে, ধর পাকড় চলবে—'

হীরেন একটু হাসল।—'এইজন্য আপনাকে কিছু বলতে চাইনি বৌঠান।'

এতক্ষণে দিগম্বরীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। তার ব্যাকুলতা দেখে হীরেনের মনের একটা শুকনো দিক একটু ভিজে গেল। পরের জন্য মেয়েদের এমন দরদ খুব কম দেখা যায়। তাকে একটু শান্ত করার চেষ্টায় হীরেন হাল্কা সুরে বলল, 'আমাদের জন্য ভাববেন না, গুলি খেয়ে মরলেও আমরা মরব না।'

'ওঁর যদি কোন বিপদ হয়? ওঁকে নিয়ে যদি টানাটানি করে?'

দিগম্বরী শশাঙ্কের জন্য ব্যাকুল হয়েছে, তার স্বামীর জন্য। তারা মরুক, গাঁয়ের সকলকে ধরে পাকড়ে নিয়ে যাক, সেজন্য দিগম্বরীর অত ভাবনা নেই। শশাঙ্কর কিছু না হয়। হীরেনের মনটা ছাঁৎ করে উঠল। দিগম্বরী কলকাতার বাড়ীতে তাকে অনেক বিস্ময় দিয়েছে, কিন্তু সে সব যেন ছেলেখেলার ম্যাজিক দেখিয়ে ছোট ছেলেকে অবাক করা। এইবারে তার আঁতে ঘা দিয়ে তাকে সে থ বানিয়ে ছেড়েছে।

সে বলে, 'শশাঙ্কদার বিপদ হবে কেন? ওর সঙ্গে এ ব্যাপারের কি সম্পর্ক?'

দিগম্বরী বলে, 'পুলিশ কি তা শুনবে!'

হীরেন সায় দিয়ে বলে, 'তা শুনবে না! আমরা দু'টি নেতা যখন এ বাড়ীতে আছি—'

'ওগো মা, কি হবে!' দিগম্বরী ডুকরে কেঁদে ওঠে।

এবার হীরেন যায় চটে। মনটা তার এমনিই সুস্থ ছিল না।

'দেখুন বৌঠান, ন্যাকামি করবেন না। আমরা এদিকে দশ বিশ বছরের জন্য জেলে চলেছি, হয়তো প্রাণটাও যাবে, শশাঙ্কদার কি হবে না হবে তাই ভেবে এখন থেকে আপনি মূর্ছা যেতে বসলেন। শশাঙ্কদা শোভাযাত্রায় থাকবে না, যেতে চাইলেও ওকে আমরা নেব না, আপনার ভয় নেই। তবু যদি ওকে পুলিশে ধরে, ধরবে। বাড়ী বসে বসে একেবারে অপদার্থ অমানুষ হয়ে গেছে, কিছুদিন জেল থেকে ঘুরে এলে হয়তো একটু মনুষ্যত্ব ফিরে পাবে।'

'মুখ সামলে কতা কইবেন ঠাকুরপো।'

দিগম্বরী ফোঁস করে ওঠে। অসহ্য ক্রোধে কিছুক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে হীরেনের দিকে চেয়ে থেকে যোগ দেয়, 'আপনাদের তুলনায় উনি দেবতা, তা জানবেন।'

'গাঁজাখোর ভিক্ষুক দেবতা।'

'দুশ্চরিত্র তো নন্? বাজারে আর কুলিবস্তিতে মেয়ে চেখে বেড়ানোর চেয়ে গাঁজা খাওয়া ভিক্ষে করা ভাল।' দিগম্বরী গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েই কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ফিরে এসে বলে দিয়ে যায়, 'গাঁজা উনি ছেড়ে দিয়েছেন, ভিক্ষেও আর বেশীদিন চাইবেন না আপনাদের কাছে।'

তার তেজ দেখে হীরেন বলে, 'বাপ্‌স্!'

হীরেন আর কৃষ্ণেন্দু চা খাচ্ছে, শশাঙ্ক একটু লজ্জিতভাবে কাছে এল।

'আমাকে একবার সহরে যেতে হচ্ছে ভাই। কটা জিনিস না আনলেই নয়।'

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'বেশ তো।'

হীরেন জিজ্ঞেস করল, 'কবে ফিরছেন?'

'কাল রাতেই ফিরব, নয়তো পরশু সকালে। কদিন পরে যাব বললাম, তা উনি জোর করে আজকেই পাঠিয়ে দিচ্ছেন। চা ফুরিয়ে গেছে। আর সব পরে আনলে চলত, চা পরশুর মধ্যে চাই। ভাল চা আবার ধারে কাছে পাওয়া যায় না।'

হীরেনের সঙ্গে মস্ত এক প্যাকেট দামী চা ছিল, কিন্তু সে চুপ করে রইল। সহর থেকে তাদের কিছু আনবার দরকার আছে কি না জিজ্ঞেস করে, হীরেনের কাছে কটা টাকা আদায় করে শশাঙ্ক চলে গেল।

'সত্যি সত্যি স্বামীকে তাহলে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিচ্ছে।' হীরেন বলল।

'সরিয়ে দিচ্ছে মানে?'

'কাল যদি কোন হাঙ্গামা হয়, উনি যদি বিপদে পড়েন। স্বামীর জন্য এতটা মাথাব্যথা কখনো দেখিনি।'

'তুই যার স্বামী তার?'

'কখনো দেখিনি।'

হীরেন কথাটা বলে নীরবে কয়েকবার মাথা নাড়ল।

'দেখবার চোখ নেই, ইচ্ছা নেই, তাই দেখতে পাওনি। এরকম নাটুকে স্বামীভক্তি ছাড়া আর কিছু তো পছন্দ হয় না।'

'মমতার নাটুকে স্বামী অভক্তির চেয়ে বোধহয় এটা ভাল।'

ঘনিয়ে আসা সাঁজের ছায়া, গাঢ় হয়ে আসা গুমোট। ধোয়া বারান্দা থেকে পাটি ভেদ করে যেন ভাপসা গরম উঠছে, অঙ্গন থেকে ঝাঁঝ সিধে উঠে যাচ্ছে উপরে খোলা আকাশের দিকে। জীবন আজ গুরুগম্ভীর—দু'জনের কাছে। হীরেনের কাছে গুরুভারও বটে।

'মমতার কথা নিয়ে তোর সঙ্গে কখনো আলোচনা করিনি। কেন জানিস? হয় তুই ভাববি ওর হয়ে ওকালতি করছি, নয় ভাববি আপোস করিয়ে তোদের সুখী করার ইচ্ছায় যা মনে আসে বানিয়ে বলছি। আরেকটা কারণ ছিল। মমতা নিজেই ও ভারটা নিয়েছে। তোকে ও মানুষ করবে, তোকে সুখী করবে, নিজে সুখী হবে।'

'মানুষ করবে? ও আমায় মানুষ ভাবে না জানি। এটা জানিয়ে জানিয়েই তো আমায় মদ ধরিয়েছে, একধাপ এগিয়ে দিয়েছে মানুষ হবার পথে।'

'এটা তুই ভুল করছিস হীরেন। তোর দিগম্বরী বৌদির মত ভক্তিভরে পদসেবা করে না বলে তোর অভিমান জাগে, করলে কিন্তু খুশী হবার বদলে ওকেই তুই অশ্রদ্ধা করতিস। মানুষ তুই চিনিস না। তোর মূল্যজ্ঞান নাই। এর স্বামী ভক্তি দেখে ধাঁধা লেগে গেল? এ তো অন্ধ আবেগ মাত্র! ধাক্কা খেলে অন্য পথ পেলে সেইদিকে চলতে আরম্ভ করবে। মমতা দেশকে ভালবেসে, সর্বহারাদের ভালবেসে, তবে তোকে ভালবেসেছে। ওর কোন কোন বুঝবার মধ্যে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু ওর মধ্যে ফাঁকি নেই, ও অনেস্ট। তোর সঙ্গে সংঘাতটাই তার কতবড় প্রমাণ বুঝতে পারিস না? ভুল বুঝতে পারলে ও সংশোধন করে নেয়, জোড়াতালি দিয়ে চালায় না। ওর মত জেদি একগুঁয়ে তেজী মেয়ে আজ কি ভাবে নিজেকে বদলে ফেলেছে বল্ তো? তুই যতটুকু অধিকার দিয়েছিস ততটুকু বাইরের কাজ করে খুশী আছে—চব্বিশঘণ্টা যে কাজে ও মেতে থাকতে চায়। বাকী সময় তুই যেমন চাস তেমনি হয়ে চলছে—'

'চলছে বৈকি। ধীর স্থির শান্তশিষ্ট হাসিখুশী উদার—আমার মাতলামির জন্য পর্যন্ত ক্ষোভ নেই, ক্ষমা করে চুকিয়ে দেয়।'

'হীরেন তুই মিথ্যুক। নরক থেকে তোকে তুলে নিয়ে যাবার পর আমার সামনে মমু কেঁদে ফেলেছে—তুইও দেখেছিস।'

'সে তো গায়ের জ্বালার কান্না। আমায় মানুষ করতে পারছে না বলে।'

কৃষ্ণেন্দু নিশ্বাস ফেলে বলে, 'আমার বিশ্বাস ছিল মমতা পারবে। আজ খটকা লাগছে। মানুষকেই মানুষ করা যায়, তোর মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়ে গেছে হীরেন।' একটু থেমে বলে, 'মমুর জীবনটাও না নষ্ট হয় তোর জন্যে।'

'কেন? ওর কুলিমজুর আছে, দুদিন বাদে আরিফ ছাড়া পাবে। আমি তো ওকে বলে দিয়েছি দিনরাত যত খুশী কাজ করুক, আমি কিছু বলব না। বৌদির মত বৌ পেলে খুশী হতাম, তাই বলে আমি শশাঙ্কদা নই।'

কৃষ্ণেন্দু নানা কথা ভাবছিল, আরও কিছু চুপচাপ ভেবে সে বলল, 'স্ত্রী কাছে না থাক, তোর বন্ধু আছে। তুইও শশাঙ্কদা'র সঙ্গে চলে যা হীরেন।'

'বটে?'

মনে মনে হীরেনও কথাটা ভাবতে আরম্ভ করেছিল। জেলে যাবার শখটা তার বড়ই কম।

কৃষ্ণেন্দু আবার বলল, 'তুই থেকে আর কি করবি? হাঙ্গামা হলে জড়িয়ে পড়বি শুধু। তার চেয়ে চলে যাওয়াই ভাল।'

'সবাই বলবে ভয়ে পালিয়ে গেল।'

'কেউ তা বলবে না। এ ব্যাপারে তোর সংস্রব কি?'

'দেখি ভেবে।'

এটা ছলনা। চলে যাবে ঠিক করেই হীরেন ভাবতে আরম্ভ করেছিল চলে যাবে কি না।

নিজেকে অপরাধী মনে করবার কোন কারণ নেই জেনেও মনটা হীরেনের খুঁত খুঁত করতে থাকে। শশাঙ্ককে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে তার সতীসাধ্বী স্ত্রী, স্নেহমমতার গরজে, হয়তো বা ভালবাসারই তাগিদে। তার সঙ্গে সেও যদি সরে যায়, সে যাবে নিজের গরজে, নিজেকে বাঁচাতে। সোজা ভাষায় বন্ধুকে বিপদের মুখে ফেলে নিজে সে পিটটান দেবে। অথচ কথাটাও আসলে তা নয়। কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে তার এমন কোন বোঝাপড়া ছিল না, মৌখিক অথবা মানসিক

যে রম্ভার বাপের খুন হওয়ার প্রতিবাদে কৃষ্ণেন্দু যাই করুক তাতে তার যোগ দিতে হবে। সে শুধু সঙ্গে এসেছে, তার নিজের খেয়ালে, বেড়াবার জন্য। টাকা দরকার হবে বলে কৃষ্ণেন্দু টাকা চেয়েছিল, সে টাকা দিয়েছে। এ ব্যাপারের সঙ্গে ওইটুকুই তার সম্পর্ক। সঙ্গে এসেছে বলেই যে মারামারিতেও তার যোগ দিতে হবে এমন প্রত্যাশা কৃষ্ণেন্দুর মনেও নিশ্চয় জাগেনি। তাছাড়া হেরম্ব সম্পর্কে কৃষ্ণেন্দুর এই ব্যবস্থায় তার সমর্থনও নেই। সুতরাং চলে যাওয়াতে তার অন্যায় কি আছে? তাতে ভীরুতার পরিচয় দেওয়া হবে কেন, হীনতার পরিচয়?

এই সময় মোহনকে সঙ্গে নিয়ে রম্ভা আবার এল। হীরেন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে চলে যাবে, আজ অথবা কাল সকালে। মোহনের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দুর পরামর্শ শুনবার ইচ্ছা তার নেই। ওদের শান্ত নির্বিকার আলাপ শুনলে মনটা তার বিষিয়ে যাবে। শশাঙ্ক চলে গেছে কিনা কে জানে! আজ তার একটু মদ চাই, অল্প একটু। শশাঙ্ক নেশাখোর মানুষ, হয়তো বলতে পারবে কোথায় মদ পাওয়া যায় এই ঝুমুরিয়া গ্রামে। আজ একটু মদ খেয়ে কাল কলকাতা রওনা হয়ে যাবে। তারপর বেশী করে খাবে মদ।

রান্নাঘরে দাওয়ায় বসে দিগম্বরী গা খানিকটা উদ্‌লা করে পাখার বাতাস খাচ্ছিল, আনমনে ঠোঁট কামড়ে প্রাচীর-ঘেঁষা পেঁপে গাছের দিকে চেয়ে। লণ্ঠনের আলোয় তাকে দেখে হীরেন একটু বিস্মিত হয়ে গেল। দিগম্বরীর দেহটি তো সুন্দর! এতবার দেখেও এটা তার কল্পনাতে আসেনি। মমতার বাপের বাড়ীতে মমতা একদিন বলেছিল, 'আমার চেয়ে আমার ঝি ঢের বেশী সুন্দর, শুধু রঙ একটু ময়লা। দেখবে?' সে ঝিকে হীরেন কতবার দেখেছিল তার হিসাব হয় না, কিন্তু সে বুড়ী না যুবতী তাও তার কোনদিন খেয়াল হয় নি। পরদিন একটু কৌশল করে মমতা ঝির নিরাবরণ দেহটি দেখিয়েছিল। সে এক রূপ-ধরা শিল্পীর কল্পনা, অবিশ্বাস্য। অথচ মমতা দেখিয়ে না দিলে সে রূপ তার চোখে পড়ত কি না সন্দেহ। তারপর কস্তা-পেড়ে শাড়ী জড়ানো সেই ঝির দেহটি তার সুন্দর মনে হয়নি, ভাল করে চেয়ে দেখে গলা থেকে পা পর্যন্ত ভাল করে ঢাকা সে বেচারীকে তার মনে হয়েছে একটু অশ্লীল। মমতার মত সাজপোশাকে তাকে কি রূপসী মনে হত? সাজ না থাকলে ভিন্ন কথা, কিন্তু একটা বিশেষ ফ্যাশনে শাড়ী জামা গায়ে না জড়ালে মেয়েদের রূপ কি তার কাছে চাপা পড়ে যায়?

উঠানে ঘাস, পায়ের শব্দ হয় না। হীরেনের আবির্ভাব টের পেয়ে শশব্যস্তে দিগম্বরী বলল, 'আসুন ঠাকুরপো, বসুন। চেয়ার এনে দেব? ভাঙ্গা চেয়ার কিন্তু। কেউ দেশে আসেন না, আসবার-পত্তর কিনে দেন না। উনি একবার লিখেছিলেন একটা টেবিল আর কটা চেয়ারের জন্য, জবাব পেলেন, মাদুর আর পাটি হলেই হবে। খুব চটে গেছেন, না? অতটা মেজাজ দেখানো আমার উচিত হয়নি।'

হীরেন জোর দিয়ে বলল, 'বেশ করেছেন। স্বামীর বিপদে স্ত্রীর মাথা গরম হওয়া দোষের নয়। শশাঙ্কদা চলে গেছেন নাকি?'

'আপনাদের বলেই তো গেলেন?'

'এত আগে গেলেন? গাড়ী তো শুনলাম রাত নটায়?'

'দিনে দিনে স্টেশনে পৌঁছে যাবেন। গরমকালে রাস্তায় সাপের ভয়।'

হীরেনের মনে হল, কোনরকমে শশাঙ্ক যদি মরে যেত আর সে যদি দিগম্বরীর শোকটা দেখবার সুযোগ পেত! এই অদ্ভুত সাধের জন্য নিজের কাছেই হীরেন লজ্জা বোধ করল।

কতগুলি অদ্ভুত প্রশ্ন তার মনে ভীড় করে আসছে, দিগম্বরীর স্বামীর ঘর করা সম্পর্কে, কতকগুলি প্রশ্ন, দিগম্বরীকে যা জিজ্ঞাসা করা যায় না। জবাব হয়ত সে জানে না। কোন দিন ভেবেও দেখেনি। জীবনকে যাচাই আর বিশ্লেষণ করে দেখবার শিক্ষা সে পায়নি, প্রচলিত প্রথায় জীবনকে গ্রহণ করে সুখী হওয়াই তার স্বভাব। তবু দু'একটা প্রশ্ন না করে হীরেন পারল না।

একটু তফাতে দাওয়াতে সে বসতে যাবে, দিগম্বরী ব্যস্ত হয়ে বারণ করে আসন এনে পেতে দিল।

'আপনি কতদূর পড়েছেন বৌদি?'

'আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ ঠাকুরপো। বাংলা বইটই একটু যা পড়তে পারি।'

'কি বই পড়েন?'

'এই রামায়ণ মহাভারত। নাটক নভেল যদি কখনো পাই তো পড়ি।'

'নাটক নভেল কি পড়েছেন দু'একখানার নাম করুন না বৌদি?'

'অত কি মনে থাকে ঠাকুরপো? দাঁড়ান, সেদিন একটা বই পড়েছি বটে, ত্রিলোচনবাবুর "সতীর জয়"। পড়েছেন? সুন্দর বই, পড়তে পড়তে চোখে জল আসে। এক চরিত্রহীন লম্পটের সঙ্গে একটি মেয়ের বিয়ে হল, বিনা দোষে সন্দেহ করে স্বামী তাকে ত্যাগ করল। তারপর কত দুঃখ কষ্ট বিপদ আপদ প্রলোভনের সঙ্গে লড়াই করে শেষে মেয়েটি আবার সব ফিরে পেল। স্বামীর বসন্ত হয়েছিল, সবাই তাকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল, মেয়েটি খবর পেয়ে একা যমের সঙ্গে লড়াই করে তাকে বাঁচিয়ে তুলল। ওর স্বামী আবার ওকে গ্রহণ করল, সেই থেকে তার চরিত্রও শুধরে গেল। বইখানা পড়ে দেখবেন ঠাকুরপো।'

'কিন্তু সংসারে কত অসতী মেয়েও তো কখনো দুঃখ কষ্ট না পেয়ে সুখে জীবন কাটিয়ে দেয়।'

'ছাই দেয়। আর দিলেই বা, এ জীবনটাই তো সব নয়, পরজন্মও তো আছে।'

'পরজন্মের কথা ভেবে বুঝি মেয়েরা সতী হয়?'

দিগম্বরী হেসে ফেলল। দিগম্বরীর হাসিটিও বেশ, পানে রাঙ্গা দাঁতগুলির জন্য বড় মোলায়েম আর মিষ্টি। হাসিমুখেই সে বলল, 'সতীত্ব হল মেয়েদের ধর্ম। এমনিই তারা সতী হয়, ভেবে চিন্তে হয় না ঠাকুরপো।'

হীরেন একটা অস্পষ্ট জবাব দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই দিগম্বরী একটু ব্যাকুলতার সঙ্গেই বলল, 'উঠছেন কেন, বসুন না একটু? আপনি বড়লোক মানুষ, গরীবের বাড়ী এসে খুব কষ্ট হচ্ছে, না ঠাকুরপো?'

হীরেন আবার বসে জিজ্ঞেস করল, 'কষ্ট হচ্ছে কে বলল আপনাকে?'

'একি বলে দিতে হয় ঠাকুরপো! পাড়াগাঁয়ে থাকা তো অভ্যাস নেই আপনাদের। না পাওয়া যায় একটা জিনিস, না পাওয়া যায় কিছু। ওখানে আপনার কতগণ্ডা চাকর বাকর, এখানে আমি গেঁয়ো মানুষ—'

'আপনি যা আদর যত্ন করছেন বৌদি—'

দিগম্বরী খুশী হয়ে বলল, 'যান! বাড়াবেন না ঠাকুরপো। আপনার স্ত্রী নাকি কটা পাশ দিয়েছেন? তাই শুধোচ্ছিলেন, আমি কদ্দুর লেখাপড়া করেছি! আমার মত মুখ্যু মেয়েমানুষ দেখে আপনার নিশ্চয় ঘেন্না হয়।'

এমনি আলাপে দিগম্বরী অনেকক্ষণ সময় কাটিয়ে দিল। তার কথা আর সুরে বরাবর

একটা চাপা সম্ভ্রম আর ঈর্ষার ভাব হীরেনকে খুশী করে তুলেছিল। অতি সহজেই সে নিজেকে দিগম্বরীর ঘরোয়া সীমাবদ্ধ মানসিক স্তরে নামিয়ে নিয়ে আলাপ জমিয়ে তুলল। হাঁটু ভেঙ্গে মাটিতে বাঁহাতের উপর ভর দিয়ে একটু কাত হয়ে দিগম্বরীর বসবার ভঙ্গি, ঠোঁটে পানের রসের শুকনো দাগ, কানের মাকড়ি, চোখের নম্রতা, চুল বাঁধার কায়দা এই সব লক্ষণ কখনো ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কখনো মিলিতভাবে তাকে মনে করিয়ে দিতে লাগল, এই মেয়েটি সাধারণ, কিন্তু এ জগতে শশাঙ্ক ছাড়া কারো ক্ষমতা নেই ওকে স্পর্শ করে। একগ্লাস জল চাইতে দিগম্বরী তাকে শরবৎ এনে দিল, তারপর আচমকা বলে বসল, 'একটা কথা বলব ঠাকুরপো? ওর একটা চাকরি-বাকরি করে দিন না? কত চাকরি আপনার গড়াগড়ি যাচ্ছে। আপনি ইচ্ছে করলেই হয়ে যাবে।'

হীরেনের প্রথম মনে হল, কোনদিন কোন অবস্থাতেই দিগম্বরী বোধ হয় শশাঙ্কের কথা ভুলতে পারে না। এতক্ষণ যে তার সঙ্গে আলাপ করেছে তাও স্বামীর কথা ভাবতে ভাবতে করেছে। এক মুহূর্তে চিন্তার ভান করে হীরেন বলল, 'শশাঙ্কদার যদি চাকরি করে দিই, দেড়শো-দুশো টাকার চাকরি হয়, আপনিও কলকাতায় গিয়ে থাকবেন তো?'

দিগম্বরীর মুখের ভাব পরিবর্তনের মানেটা হীরেনের এমন অদ্ভুত রকম স্পষ্ট মনে হল!

'আমাকে কেন?'

'আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব—মেলামেশার একটা লোক পাবে।' কৈফিয়তটা বড়ই খাপছাড়া শোনাল। কলকাতা সহরে তার স্ত্রীর মেলামেশার লোকের কি এতই অভাব যে মেলামেশার জন্য ঝুমুরিয়া থেকে তাকে লোক নিয়ে যেতে হবে। হীরেনের কিন্তু খেয়ালও ছিল না, সে নিজের চিন্তাতেই মশগুল। দিগম্বরী একবার হীরেনের মুখের দিকে চায় আর মুখ নামিয়ে নেয়, গালে রঙ এসে আবার বিবর্ণ হয়ে যায়, যদিও রঙ তার তেমন ফর্সা নয় বলে সেটা তেমন স্পষ্ট হয় না।

'তা উনি কলকাতায় চাকরি করলে আমিও সেখানে থাকব বৈকি। চাকরি দেবেন ঠাকুরপো?'

হীরেন একটু হেসে বলল, 'আপনার বুঝি সন্দেহ হচ্ছে চাকরি করে দিতে পারব কি না?'

'ওমা, আপনি চাকরি করে দিতে পারবেন কিনা তাতে সন্দেহ!' দিগম্বরীও এবার একটু হাসল।

হীরেন বলল, 'চাকরি খালি না থাকে আমার আপিসে চাকরি তৈরী করে দেব। আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি আপনাদের জন্য একটা বাড়ী ঠিক করে রাখব'খন। আচ্ছা, আমাদের বাড়ীতেও তো থাকতে পারেন গিয়ে? আমার স্ত্রী তাহলে সব সময় আপনার সঙ্গ পাবেন?'

'আপনার স্ত্রীর কি কোন অসুখ?'

'মনের অসুখ।'

'ও, বুঝেছি।'

তাদের উপকার করতে হীরেনের আগ্রহের কারণটা এতক্ষণে যেন দিগম্বরী ধরতে পেরেছে মনে হল। শশাঙ্ককে চাকরি দিয়ে তাকে হীরেন বিনা মাইনেতে আরেকটা চাকরি করিয়ে নেবে কিন্তু হীরেনের স্ত্রীর কোন অসুখের কথা তো কৃষ্ণেন্দু বলেনি? একবার জিজ্ঞেস করতে হবে।

হীরেন গম্ভীরমুখে ভাবছিল, নিজের মনে মাথা নেড়ে সে বলল, 'না, আমাদের বাড়ীতে থাকাটা ঠিক হবে না। একটা ভাড়াটে বাড়ীই ঠিক করে রাখব আপনাদের জন্যে।'

দিগম্বরীকে ধাঁধায় ফেলে হীরেন চলে গেল। একটু ভয় ভয় করতে লাগল দিগম্বরীর। হীরেনের পাতলা পাঞ্জাবী ঘামে ভিজে গিয়েছিল। অতি মৃদু, অতি অদ্ভুত একটা সুগন্ধ দিগম্বরীর নাকে লাগছিল, আতর কি এসেন্স কে জানে। বড়লোকের ছেলে ; এমন সুপুরুষ, সে কেন এলোমেলো কথা বলে? তবে চাকরিটা সে নিশ্চয় করে দেবে—দু'শো চাকার চাকরি। এতদিনে কি তার লক্ষ্মীপূজোর ফল ফলল, মা লক্ষ্মী মুখ তুলে চাইলেন? নিজের হাতের দিকে চেয়ে দিগম্বরীর চোখে জল আসে। শুধু সরু দু'গাছি চুড়ি। আর কানে দুটি মাকড়ি। আর কিছুই তার নেই—একে একে সব গেছে। হাতে টাকা হলেই আগে সে চুড়ি গড়িয়ে নেবে, তিনগাছি করে। তারপর হার। বিছে হারই তাকে ভাল মানায়।

মোহনের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দুর আলোচনা তখনো শেষ হয়নি। মোহন কয়েকটা বাস্তব প্রশ্ন তুলেছে, কৃষ্ণেন্দু তার জবাব দিচ্ছে।

রম্ভা একমনে শুনছে, ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছে তার ভাইয়ের দিকে। এবারও নরেশ রম্ভার সঙ্গে এসেছে। সে কিছু শুনছে কিনা সন্দেহ। অদ্ভুত বিহ্বল দৃষ্টি, বদ্ধ পাগলের যেন এসেছে আবেশের বিহ্বলতা। রম্ভাকে দ্যাখে অনেকেই, হীরেনও কতবার দেখেছে। নরেশের দেখাটাতে একটু বেশীরকম বাড়াবাড়ি আছে। আগেও নরেশকে সে এ ভাবে রম্ভার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছে। হয়তো ঠিক এভাবে নয়, এই রকম একাগ্রতার সঙ্গে সকাতর হিংস্র দৃষ্টিতে। আজ তার চোখে যেন উঁকি মারছে হাজার হাজার চাঁদে পাওয়া কিশোর লম্পট।

জামা গায়ে দিয়ে জুতো পরতে পরতে হীরেনের মনে পড়ল টেঁপির ব্যাপারটা। টেঁপিকে নিয়ে নরেশ পালাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু মিলন ঘটিয়ে দিতে চাইলে তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়নি। তার এলোমেলো পাগলামির মানেটা খানিক অনুমান করেছিল শুধু হীরেন। এ তো সংসারে হরদম ঘটে। একজন জ্বালায় আর জ্বালাতন করে, আরেকজনকে তাই দরকার হয়। কৃষ্ণেন্দু নরেশকে ভয়ানক মেরেছিল বলে হীরেনের বড় রাগ হয়েছিল, এ যেন ধাক্কা খেয়ে একজন আছাড় খেয়েছে বলে তাকে শাসন করা! মার খেয়েও কৃষ্ণেন্দুর প্রতি নরেশের টান আর ভালবাসা দেখে হীরেন একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল, একটু ঈর্ষাও তার হয়েছিল বৈকি! আজ জুতোয় পা ঢোকাবার কয়েক মুহূর্তে তার যেন একটা নতুন জ্ঞান জন্মে গেল। নরেশের কৃষ্ণেন্দুভক্তির মূল নেই, মূল্যও নেই। কৃষ্ণেন্দুর প্রতি রম্ভার ভক্তিটাই নরেশ অনুভব করে। রম্ভা তাকে ভক্তি করায়।

'কিরে নরেশ!'

নরেশ বোকার মত একটু হাসল।

'রম্ভা যে চুপচাপ?'

রম্ভা ভুরু কুঁচকেই বলল, 'আপনি নাকি পালাচ্ছেন? পালান—পালান, প্রাণ নিয়ে শীগগির পালান।'

হীরেন রাগ করল না। সহজ ভাবেই বলল, 'পালাচ্ছি না রম্ভা। ফিরে যাচ্ছি।'

'দুদিন পরেই নয় যেতেন! না, ডর লাগছে থাকতে?'

'ডর লাগছে রম্ভা। আমি ভীষণ ভীরু মানুষ।'

রম্ভা একটু ভড়কে গিয়ে চুপ করে রইল। এতক্ষণ বোধ হয় তার খেয়াল হল, সহরে

কতখানি সম্মান করে সে হীরেনের সঙ্গে কথা কইত আর কাল থেকে কি স্পর্ধা সে দেখাচ্ছে তার কাছে। তার বাপ খুন হয়ে গেছে বলে সে যেন রাণী মহারাণী হয়ে গেছে, সকলকে ধমক দিতে আর বাধা নেই।

হীরেনের পিছু পিছু বেরিয়ে গিয়ে সদরের কাছে তাকে সে পাকড়াও করল।

'কিছু মনে করবেন না, হীরেনবাবু। মাথা-টাথা ঠিক নেই মোর।'

'কিছু মনে করিনি।'

'রাগ করেননি?'

রম্ভার বেয়াদবির বদলে এই অন্তরঙ্গতা স্থাপনের চেষ্টা হীরেনকে চটিয়ে দিল। বাড়ীর ঝি অথবা কারখানার মেয়ে মজুরের সঙ্গে কথা বলার মত গম্ভীর মুখে কড়া গলায় সংক্ষেপে বলল, 'না।'

রম্ভা গ্রাহ্যও করল না।—'কখন যাবেন আপনি?'

'কাল সকালে যাব।'

'একটা কাজ তবে করুন হীরেনবাবু। নরেশ ছোঁড়াকে সঙ্গে নিয়ে যান। এখানে থেকে ও কি করবে?'

'ও যায় তো চলুক।' হীরেন বলল উদাসীনভাবে।

রম্ভা মিনতি করে বলল, 'ধমক-ধামক দিয়ে নিয়ে যান হীরেনবাবু। বড্ড জ্বালাতন করছে আমাকে। এইটুকু বয়সে শয়তানের ধাড়ী হয়ে উঠেছে ছেলেটা।'

গাছের একটা পাকা সিঁদুরে আমে চোখ রেখে আরও উদাসীন ভাবে হীরেন বলল, 'তুমি প্রশ্রয় দাও কেন?'

'ওমা! সে কি কথা? কত'গাল দিইছি, ঝাঁটাপেটা করব বলেছি'—নরেশকে আসতে দেখে সে থেমে গেল। তাদের দিকে তাকাতে তাকাতে খানিক তফাৎ দিয়ে কি উদ্দেশ্যে নরেশ কোথায় চলেছিল বলা যায় না, রম্ভা তাকে ডাকল, 'নরেশ শোন, ইদিক আয়! হীরেনবাবুর সাথে তুই কাল কলকাতা ফিরে যাবি, বুঝলি?'

নরেশ কিছু বলার আগেই হীরেন বেরিয়ে গেল। নরেশ কলকাতা যেতে অস্বীকার করলে তার সামনেই হয়তো রম্ভা তাকে ঝাঁটাপেটা করতে চাইবে, সেটা সহ্য করার মত মনের অবস্থা হীরেনের ছিল না।

আবছা অন্ধকারে ঝুমুরিয়ার কুৎসিত গ্রাম্য চেহারা ঢাকা পড়েছে। সকলে বলে তাই হীরেন চিরকাল সায় দিয়ে এসেছে, কিন্তু গ্রামে গিয়ে কোনদিন খুঁজে পায়নি ঘর বাড়ী বন জঙ্গল মাঠ ঘাট পথের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে গ্রামের সেই বিখ্যাত শ্রী। খড় টিন বাঁশ কাঠ মাটি দিয়ে গড়া বাড়ীগুলি আদিম স্থাপত্য শিল্পেরও কুৎসিত ব্যঙ্গ। বদরঙ্গা একটু তলানি জলের দীঘি, ভাঙ্গা ইটের পুরানো শ্রীহীন ঘাট, আগাছা-ভরা পচা মাটির গর্তে পচা ডোবা-পুকুর, এবড়ো খেবড়ো কর্কশ বর্ণহীন মাঠ। আর কি বিশ্রী পোষাক আর চেহারা মানুষগুলির, কি দৃষ্টিকটু সব গরু-বাছুর। এখন ওসব চোখে আড়ালে। হীরেন আরাম পেল।

ধূলোয় ভরা কাঁচা উঁচু পথ দিয়ে চলতে চলতে এক মোড়ে এসে হীরেন দাঁড়াল। গামছা কাঁধে গরু তাড়িয়ে বাড়ী ফিরছিল কার্তিক। মাঝবয়সী জোয়ান মানুষ বুকে পিঠে ছড়ানো দাদ, বাঁদিকের গালেও একটু দাদ হয়েছে, বেশী না ছড়ালেও বেশ জমকালো।

'মদের দুকান? বলতি পারতাম বাবু। ওই যে বুড়ো বটগাছ দেখতিছেন ওনার গায়ে হাট। হাটের পিছে মাগীদের ঘর—দু'রশি তফাতে চরণ সা'র দুকান।'

হীরেন ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। অতি প্রাচীন এক বটগাছের কাছে কতকগুলি শূন্য চালা। আজ হাটবার নয়। পূর্বে একটু তফাতেই গায়ে গায়ে লাগান ছোট আট দশখানা টিনের ঘর, অল্প খানিকটা জমির মধ্যে জমাট করা ঘরগুলির মধ্যে দু'হাত চওড়া গলিও আছে। বাইরে দু'তিনটি স্ত্রীলোক দেখা গেল। দেখলেই বোঝা যায় তারা দেহের ব্যবসা করে, অতি গরীব এবং ছোট জাতের মেয়ে। খোঁপা বেঁধে ফুল গুঁজেছে, পান খেয়ে কালো ঠোঁট রাঙ্গিয়েছে, সেমিজ ছাড়াই সস্তা তাঁতের শাড়ী পরেছে, আর দাঁড়িয়েছে ভঙ্গি করে, যে ভঙ্গি এদের অভ্যাস হয়ে যায়।

কিছু দুরেই বাগ্দী পাড়া! দেখলেই চেনা যায়। বিশ্ব যাদের বর্জন করেছে, চারিদিকে অনেক খালি জমি পড়ে থাকতেও যারা একটুখানি জমিতে ছোট ছোট ভাঙ্গাচোরা কুঁড়ে তুলে গড়ে তোলে নিজেদের পাড়া, কত সঙ্কেত আর চিহ্নই যে থাকে তাদের সেই সীমাবদ্ধ জগতের! মানুষ-সমান উঁচু পচা-খড়ের পুরানো কুঁড়ের লেপামোছা তকতকে একটুখানি মাটির দাওয়া, সেখানে সোনারঙের চেরা বাঁশের শিল্প।

এটা ঝুমুরিয়ার এক প্রান্ত। পূর্বদিকে পথটা খানিক সোজা গিয়ে বেঁকতে বেঁকতে স্টেশন থেকে ঝুমুরিয়ায় ঢুকবার পথে মিশেছে। কতগুলি আলো দেখে ও লোকের কলরব শুনে হীরেন এগিয়ে গেল। চরণ সা'র মদের দোকান দেখে সে গেল ভড়কে। টিনের চাল আর মাটির দেয়ালের একটা ঘর, দেয়ালের গায়ে একটা ফোকর দিয়ে মদ বিক্রী হচ্ছে। এদিকে একটা চালার নীচে ছেঁড়া চাটাইয়ে বসে ক্রেতারা সেই মদ খাচ্ছে। লোক মন্দ হয়নি। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা হয় দেরীতে, সাড়ে আটটায় মদ বিক্রি বন্ধ। দিনের আলো শেষ হবার আগেই তাই অনেকে রাতের নেশার জোগাড়ে ছুটে আসে। কারো গায়ে শার্ট ফতুয়া, কারো শুধু ধুতি বা লুঙ্গি, কারো শুধু গামছার মত ছোট আর ছেঁড়া কিছু কোমরে জড়ান। গেলাস, বাটি, টিনের মগে কেউ মদ নিয়েছে, কারো পাত্রটি মাটির, কেউ বা তৃষ্ণা মেটাচ্ছে সোজা বোতল থেকে। বোতলওয়ালাদের সংখ্যা খুব কম। বোতলের জন্য পয়সা জমা রাখতে হয়।

দেয়ালের ফোকর ঘিরে লোক ছিল, হীরেনকে দেখে ভয়ে বিস্ময়ে পথ ছেড়ে দিল। ফোকরের ওপাশের লোকটির ঘামে ভেজা ভুঁড়িটি শুধু দেখা যায়।

'বিলিতি আছে?'

'নাঃ। এক নম্বর আর দু'নম্বর পাবেন।'

'কোনটা ভাল?'

'এক নম্বর।'

একটা এক নম্বর পাঁইট কিনে হীরেন সরে এল। সবাই তাকে কৌতূহলের সঙ্গে দেখছে। তার মত ভদ্রলোক নিজে এখানে মদ কিনতে আসে না, লোক পাঠিয়ে দেয়। তার চেয়ে অনেক কম দামী জুতো জামা পরা ভদ্রলোক যদি বা কেউ আসে, বোতল কিনেই সে এখান থেকে সরে পড়ে। হীরেন এখানে বসেই খাবে সন্দেহ করে সকলে গভীর বিস্ময় আর অস্বস্তিকর কৌতূহলের সঙ্গে তার চালচলন লক্ষ্য করতে লাগল। এখনো সকলের নেশা জমেনি। ঘণ্টাখানেক পরে হলে হয়ত বেশীর ভাগ লোক তার দিকে চেয়েও দেখত না। দু'চারজন একটু মুচকে হাসত, কেউ পাশেই চাটাই ঝেড়ে বসতে ডেকে তাকে দেখাতে চাইত ভদ্রলোকের খাতির সে জানে।

অসহায়ের মত এদিক ওদিক চাইতে চাইতে হীরেন আবিষ্কার করল রামপালকে। রামপাল গা ঢাকা দেবার চেষ্টায় ছিল, হীরেন নাম ধরে ডাকাতে অপরাধীর মত কাছে এল।

'ও রামপাল, এ যে বড় মুশকিলে পড়লাম। বিলিতি কিছু পাওয়া গেল না।'

'আজ্ঞে এখানে—'

'তুমি এটা খেয়েছো, এক নম্বর না কি?'

'আজ্ঞে আমি—'

হীরেন অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'ওসব রাখো রামপাল। এটা খাওয়া যাবে কিনা তাই বলো।'

রামপাল সবিনয়ে বলল, 'আজ্ঞে জিনিসটা মন্দ নয়, তবে বিলিতির মত কি আর হবে!'

বিক্রীর সময়েই বোতল খুলে দিয়েছিল। আর একবার শুঁকে দেখে হীরেন বলল, 'কিন্তু গন্ধটা একেবারে বিশ্রী। একি খেতে পারব?'

খানিকটা মদ মুখে ঢেলে গিলে ফেলেই হীরেন বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। রামপাল তৎক্ষণাৎ সেটা কুড়িয়ে আনল।

হীরেন উদাসভাবে বলল, 'তুমি খাবে রামপাল? খাও। লজ্জা কি, খাও।'

একটু তফাতে সরে হীরেনের দিকে পিছন ফিরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে রামপাল বোতলটা খালি করে দিল। অর্ধেক মদ পড়ে গিয়েছিল, নয় তো পাঁচ মিনিটে এক পাঁইট মদ গিলবার ক্ষমতা রামপাল অর্জন করেনি। ফোকরে গিয়ে বোতল ফিরিয়ে দিয়ে পয়সাও সে নিয়ে এল।

হীরেন করুণ সুরে বলল, 'কিন্তু আমার কি হবে রামপাল? বিলিতি কোথায় পাব? বিলিতি নইলে তো আমার চলবে না।

রামপাল আপসোস করে বলল, 'এ লক্ষ্মীছাড়া গাঁয়ে বিলিতি কোথায় পাবেন বাবু। কে আর ওসব খায়, অত দামী জিনিস? এক ওই হেরম্ববাবু খায়, সদর থেকে ওর বাক্স বোঝাই মদ আসে।'

দুঃসহ অনিবার্য বিপদের মত রাত্রি বাড়তে থাকে। মাথার মধ্যে আতঙ্ক চাপ দিচ্ছে। আগে জানলে সে সদরে চলে যেত। এখন তাও সম্ভব নয়। কি বোকার মতই সে ভেবেছিল শ্যাম্পেন হুইস্কি ব্র্যাণ্ডি না হোক, দেশী মদ খেয়েই আজ নেশা করবে—তার দরকারী নেশা, অপরিহার্য নেশা। দেশী মদ যে খাওয়াই যায় না সে কি তা জানত!

আরেকবার চেষ্টা করবে?

রামপাল আরেক পাঁইট মদ নিয়ে এল। একটা টুলও কি করে যেন যোগাড় করল। চালার খানিক দূরে টুলে বসে অতি কষ্টে জল মিশিয়ে কিছু মদ হীরেন পেটে চালান করে দিল। তখন মনে হল খেতে কষ্ট যেন আর বেশী হচ্ছে না। ইচ্ছা করলে এইখানে টুলে বসে বোতলের পর বোতল এই দেশী মদ সে চালিয়ে যেতে পারে। আতঙ্ক কমে গিয়ে একটু স্বস্তি সে বোধ করল কিন্তু বিলিতি মদের তৃষ্ণাটা যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

হেরম্বের কাছে বিলিতি মদ আছে।

হেরম্বের কাছে বাক্স ভরা মদ আসে। হেরম্ব যদি বন্ধু হত তাদের! একটু যদি ভাব থাকত তার হেরম্বের সঙ্গে!

চালার নীচে, সাফ করা অঙ্গনে কোলাহল বাড়ছে। ভিড় বেড়েছে এখন। কোথা থেকে এত লোক এল? ঝুমুরিয়া কি খালি হয়ে গেছে, ঘরে ঘরে শুধু নারী আর শিশু? এত লোক মদ খায় কেন, এত গরীব লোক?

'গরীবরা তাড়ি খায়।'

'এরা সব বড়লোক বুঝি?'

'বড়লোক নয় বটে, দু'চার গণ্ডা পয়সা না নিয়ে হেথায় কে আসবে! কিন্তু এসবের চাইতে তাড়ি ভাল বাবু, খাঁটি পচাই ভাল। দেহ ভাল রাখে, গায়ে জোর করে। দিনভর যারা খাটে, খেতে পায় তারা? তাড়ি খেয়ে, পচাই খেয়ে তারা বেঁচে থাকে।' রামপালের বেশ নেশা হয়েছে, বকতে ভাল লাগছে। মুখে অদ্ভুত একটা শব্দ করে সে বলতে থাকে, 'বাবুরা আবার মিটিং করে উপদেশ ঝাড়ে, মদ খেও না, তাড়ি খেও না, পয়সা নষ্ট কোরো না। বলি ওরে ছুঁচো পাজী হারামজাদা, তবে খেতে দে—পচাই খাব না তো পেট ভরে খেতে দে, ওষুধ দে—'

'ওষুধ—?'

'মদ খেলে রোগ বালাই কম হয় বাবু। তেজী জিনিস তো। পটলদা বলে—'

'পটলদা কে?'

'মোর স্যাঙাৎ। হেরম্ববাবুর বেয়ারা। পটলদা বলে, পচাই খা, তাড়ি খা, খবর্দার নম্বুরী মাল ছুঁসনি রাম—ওতে ওষুধ মেশাল দেয়। নেশা জমে কিন্তু দেহের দফা শেষ।'

বিক্রী বন্ধ হবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। ফোকরের কাছে ঠেলাঠেলি, মারামারি। কয়েকজন চলে গেছে, নতুন কয়েকজন এসেছে। চারিদিকের গোলমালে কান পাতা যায় না। সবাই কথা বলছে, হট্টগোলে নিজের কানে পৌঁছে দিতে চেঁচিয়ে কথা বলছে—বন্ধু বান্ধব চেনা অচেনার মধ্যে সে এক প্রচণ্ড কলরব তুলে আলাপ করা।

দু'চারজন শুধু একেবারে চুপচাপ। অতি দুর্বল অক্ষম রুগ্ন তাদের দেহ, মুখে মৃত্যুর অসম্পূর্ণ ছাপ, একটু একটু মদ খাচ্ছে আর ঢুলছে। কোন নেশাই আর এ জীবনে তাদের কয়েক মুহূর্তের জন্যও উত্তেজিত, জীবন্ত করে দিতে পারবে না।

'দশটা পয়সা দাও বাবু। বাবুগো, দশটা পয়সা দাও।'

বছর চল্লিশ বয়সের একটি স্ত্রীলোক, ময়লা আটহাতি একখানা কাপড় পরা, মুখ বুক আমসির মত শুকনো।

রামপাল ধমক দিল, 'ভাগ।'

চালার নীচে থেকে মাটি আর সুরকির ছাপ মারা ছেঁড়া হাঁফ প্যান্ট পরা একটি বিশ বাইশ বছরের ছেলে উঠে দাঁড়াবার টাল সামলে স্ত্রীলোকটির সামনে এগিয়ে এল।

'ফের তুই হেথা এইছিস মাসী?'

'তুই যে এইছিস বড়?'

'তুই আর আমি সমান? তুই পুরুষ? তোর মত বজ্জাতি করতে আসি আমি? যা বলছি এখান থেকে, না যাবি তো তোকে আজ—'

'একটু কিনে দে তবে। ও গোপাল, সোনা মানিকটি আমার, দে বাবা একটু কিনে।'

হীরেন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। বোনপোর অশ্রাব্য গালগুলির প্রত্যেকটি কান দিয়ে ঢুকে মাথার মধ্যে ঝন্‌ঝন্ শব্দে পরিণত হয়ে যায়। তারপর কোথা থেকে উঠে আসে লুঙ্গি পরা জোয়ান এক মরদ। এক ধাক্কায় বোনপোটিকে পাঁচ হাত তফাতে সরিয়ে দিয়ে সে মাসীকে বলে, 'চল যাই।'

'আগে কিনে দে।'

কোমরে গোঁজা পয়সা বার করে লোকটি দু'তিনবার গোনে। পয়সা আছে মোটে তিন গণ্ডা। একটু সে ইতস্ততঃ করে। একবার চোখ বুলিয়ে নেয় স্ত্রীলোকটির সর্বাঙ্গে। তার মনের দ্বন্দ্ব যেন হীরেনের চোখের সামনে ঘটনা হয়ে ঘটতে থাকে, দুই ঘেয়ো কুকুরের মারামারির

মত, দুই বেনের দরদস্তুরের মত। আরও মদ, না এই বুড়ী?—এ সমস্যা যেন দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে লোকটার মুখ। তীব্র অসহ্য কৌতূহলে হীরেন প্রতীক্ষা করে থাকে।

লোকটি ফোকরের কাছে গিয়ে টিনের মগে মদ এনে বলে, 'এক চুমুক খাই?'

স্ত্রীলোকটি বলে, 'আগে আমায় দে।'

মগটা হাতে পেয়েই একচুমুকে সে সবটা মদ গিলে ফেলে, মুখ তুলে মগটা খানিকক্ষণ ধরে থাকে যাতে এক ফোঁটাও না নষ্ট হয়। লোকটি হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, কিছু বলে না। মাথা ঘুরে পড়ে যাবার উপক্রম করে স্ত্রীলোকটি সামলে নেয়, বারকয়েক মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে লোকটির সঙ্গে মিশে যায় চারিদিকের আলোছায়া অন্ধকারে।

হীরেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'কৃষ্ণেন্দুকে দিয়ে কিছু হবে না রামপাল। ও কিস্‌সু জানে না। এক নম্বরের বোকা।'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'এবার যাওয়া যাক।' হীরেন উঠে দাঁড়াল।

রামপাল নিরাশ হয়ে বলল, 'আর খাবেন না?'

'ও, হ্যাঁ। ঠিক। তিনচারটে বোতল কিনে রাখা যাক।'

বগলে এক-একটি বোতল নিয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়ল। কাছে দূরে দু'টি একটি আলো মিটমিট করছে। চাঁদ উঠেছে আধখানা। মৃদু জ্যোৎস্নায় জীবনের রূপ ঢাকা পড়েনি। হাটের পাশে টিনের চালের অনেকগুলি ঘরে আলো। একটা সস্তা হারমোনিয়ামের চেরা চেরা আওয়াজ কানে আসছে। কোথায় তারা যাবে কিছু ঠিক নেই। রামপাল কি ওই ঘরগুলির দিকে এসেছে? রম্ভার স্বামী রামপাল? চলুক যেখানে খুশী। ওটাও তো মানুষের আস্তানা।

কৃষ্ণেন্দুকে বিপদের মুখে ফেলে যাবার সঙ্কোচ আর হীরেনের নেই। মন হাল্কা হয়ে গেছে। লাখপতি বাবার ছেলে আর লাখপতি শ্বশুরের জামাই হীরেন আজ কোথায় এই ঝুমুরিয়ার এক প্রান্তে জীবন দেখে বেড়াচ্ছে, খুঁজে বেড়াচ্ছে জীবনের মূলমন্ত্র, এক হয়ে মিশে গেছে বঞ্চিত নিষ্পেষিত বিকৃত মানুষের সঙ্গে— কৃষ্ণেন্দু নিজেই তো স্বীকার করেছে সে যত সহজে গেঁয়ো অশিক্ষিত মানুষকে বুঝতে পারে, সে তা পারে না। কৃষ্ণেন্দু চুলোয় যাক, তার ভুল পথ, তাকে দিয়ে কিছু হবে না। সে নিজে এবার কাজে নামবে, নিজের সময় দেবে, অর্থ দেবে আর দরকার হলে কৃষ্ণেন্দুর মত জেলে যেতে বা প্রাণ দিতে রাজী থাকবে,—কৃষ্ণেন্দুর মত মাথা গরম করে নয়, যাতে সত্যই কিছু কাজ হয় দেশের। কৃষ্ণেন্দুকে ফেলে সে পালাবে না, সে চলে যাবে কাজ করতে!

বহুদিন ঈশ্বরকে অস্বীকার করে এসে এখন ঝুমুরিয়ার এক প্রান্তে ধূলোভরা কাঁচা রাস্তায় মৃদু জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে হীরেন নিষ্প্রভ তারা বসানো আকাশের দিকে মুখ তুলল। পথ খুঁজে পাবে বলে কি সেই অদৃশ্য শক্তি ঝুমুরিয়ায় আসবার প্রেরণা দিয়েছিল? ভবিষ্যৎ জীবনটা তার যাতে সার্থক হয়, দেশের মানুষকে মানুষ করার চেষ্টায়, নীচে যারা পিষ্ট হচ্ছে তাদের উপর তুলে আর উপরে যারা অভিশাপের মত চেপে আছে তাদের নীচে নামিয়ে আনার সাধনায়?

মদ খাওয়া সে ছেড়ে দেবে। কলকাতায় ফিরে ডাক্তারের চিকিৎসায় নিজের এই পাগলামিকে জয় করবে। ওষুধের পর ওষুধ খাবে, ইনজেকশনের পর ইন্‌জেকশন নেবে, কিন্তু মদ আর ছোঁবে না। জীবনে এই তার শেষ মদ খাওয়া।

মমতা খুশী হবে। তাকে শ্রদ্ধা করবে, ভক্তি করবে, ভালবাসবে। কাজে নামতে চাইলে

মমতাকে সে সঙ্গে নেবে। চিয়াং-কাই-শেক দুজনের মত তারা স্বামী-স্ত্রী—

যাক। এসব ভবিষ্যতের কথা। অনেক দূর ভবিষ্যৎ। রামপাল তাকে টিনের ঘরগুলির কাছে এনে ফেলেছে।

'না, রামপাল। এখানে ঢুকতে পারব না।'

'তবে কোথায় বসে খাবেন?'

হীরেন এ কথার জবাব দিল না। বলল, 'রামপাল?'

'আজ্ঞে?'

'তোমার সেই সাঙাৎ পটলকে দিয়ে কিছু বিলিতি যোগাড় হয় না? যত টাকা চায় দেব। দশটাকার মাল পঞ্চাশ টাকায় কিনব।'

'বলে দেখা যায়। আপনি বসবেন কোথায়? যেতে আসতে সময় নেবে।'

'আমিও সঙ্গে যাব চল। বোতল চারটে কারো ঘরে রেখে এস। বিলিতি না পেলে এখানে আসব।'

রামপাল দু'হাত চওড়া গলির একটাতে ঢুকে দশমিনিটের মধ্যে ফিরে এল। হেরম্বের আস্তানা প্রায় দু'মাইল দূরে। হীরেনের নেশা হয়নি, রামপালের নেশা কেটে গেছে। দুজনে প্রায় নিঃশব্দে সমস্ত পথটা হেঁটে গেল। কার একটা ছোট একতলা বাড়ী হেরম্ব ভাড়া করেছে, বাড়ীটা নতুন। এখানকার কেউ বিদেশে গিয়ে বড় লোক হয়ে শখ করে বাড়ী তৈরী করেছিল, নিজে বিদেশেই থাকে, শখ চাপলে দেশের বাড়ীতে দু'চারদিন এসে শখের বাস করে যায়। বাড়ীর কাছে তিনটে তাঁবুও পড়েছে হেরম্বের। কাছেই একটা লরী, খানিক তফাতে অনেকগুলি গরুর গাড়ী। ছোট আমবাগানের ধারে কতগুলি পাতার ঘরের কাছে মশাল জালিয়ে কুড়ি-বাইশটি স্ত্রীপুরুষ আড্ডা দিচ্ছে। চার-পাঁচটা চুল্লীতে হচ্ছে রান্না।

হীরেন একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। রামপাল গেল তার সাঙাৎ পটলকে খুঁজতে। কিছুক্ষণ পরেই আরও দু'জন লোককে সঙ্গে করে সে ফিরে এল। একজনের হাতে লণ্ঠন, চাকর-বাকর কেউ হবে। আরেকজন মোটাসোটা ভুঁড়িওয়ালা বেঁটে নিরীহ চেহারার বাঙ্গালী ভদ্রলোক, পায়ে চটি, গায়ে হাফশার্ট। হাফশার্টটি এইমাত্র গায়ে চড়িয়েছেন বোঝা যায়, হীরেনের সামনে এসে তৃতীয় বোতামটি লাগানো শেষ করলেন।

রামপাল কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'ইনি হেরম্ববাবু।'

হীরেনের মনে হল রামপাল তামাশা করছে। আলোচনা শুনে শুনে কল্পনায় তাকে সে ভেবে রেখেছিল দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ একগুঁয়ে বদরাগী একটা মানুষ হিসাবে, যে হাণ্টার হাতে ঘুরে বেড়ায় আর মদ খেয়ে যুবতী কুলি মেয়েকে টেনে হিঁচড়ে ঘরে নিয়ে যায়, পুলিশ যাকে খাতির করে, গ্রামশুদ্ধ লোক যার ভয়ে কাঁপে—তার এমন মাঝবয়সী মুদী দোকানের মালিকের মত নিরীহ গোবেচারী চেহারা!

'হীরেনবাবু তো? আমার নাম শ্রীহেরম্ব চক্রবর্তী। নমস্কার।'

'নমস্কার।'

'আপনার চাকরের কাছে শুনলাম, মশায় নাকি বড্ড মুশকিলে পড়ে গেছেন। তা সেটা আশ্চর্য কি! অমনি হয় মশায়। থাকলে দু'ঢোক খেলাম তো খেলাম না খেলাম তো না খেলাম। কিন্তু না থাকলে তখন আলবৎ চাই! কি বলেন? হা! হা!'

জোরালো কিন্তু ক্ষণিকের হাসি।

'তা দয়া করে যদি এলেন, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন? আসুন পায়ের ধুলো দিন গরীবের

বাড়ীতে।'

হীরেন আমতা আমতা করে বলল, 'আমি ভাবছিলাম একটা কি দুটো বোতল কিনে—অবশ্য আপনার যদি বাড়তি থাকে—'

হেরম্ব হাত জোড় করল।

'আমায় লজ্জা দেবেন না হীরেনবাবু। আপনার কাছে দাম নেবো! নেহাৎ যদি এসে বসে গরীবের সঙ্গে খেতে না চান আধ ডজন নিয়ে যান। দামের কথা বলবেন না।'

লোকটা কি ব্যঙ্গ করছে? বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে বিপদে ফেলবার মতলব করছে? কৃষ্ণেন্দু আর সে যে তাকে জব্দ করতে ঝুমুরিয়া এসেছে, এ খবরটা হয়তো ও জানে। এতটুকু গ্রামে এ সব কথা চাপা থাকে না। হীরেনের বুকটা একটু ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল।

বারান্দার কাছে গিয়ে দেখা গেল, ফর্সা তোয়ালে ঢাকা ছোট একটি টেবিলে মদের বোতল গ্লাস আর ডিশ সাজানো রয়েছে। দুদিকে দুটি চেয়ার।

হেরম্ব বলল, 'যাবার সময় যত খুশী নিয়ে যাবেন, কিন্তু অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে বসে একটু খেয়ে আমায় কেতাথ করতে হবে মশায়। লোকনাথবাবুর ছেলেকে একটু এন্টারটেন করবার ভাগ্য যদি হল আমার, বঞ্চিত করতে পারবেন না দাদা।'

'আপনি আমার বাবাকে চেনেন?'

'তাঁকে কে না চেনে? মহাশয় ব্যক্তি—অতি মহাশয় ব্যক্তি। ধূলোমুঠো ধরে সোনা করছেন, আমরা কি তাঁর পায়ের ধূলোর যোগ্য।'

লোকটি ব্রাহ্মণ। ধার্মিক অর্থাৎ সাধন-টাধন কি সব করে বলে গাঁয়ের লোকে ভয়ের সঙ্গে একটু ভক্তিও নাকি করে। কয়েক মিনিটের মধ্যে লোকটার মুখে এতবার তার আর তার বাবার পায়ের ধূলোর উল্লেখ শুনে হীরেন একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। চেয়ারে বসে, রঙীন পানীয় ভরা বোতলটির দিকে একনজর তাকিয়েই সে খুশী হয়ে উঠেছিল। যেখানে যার কাছে যে অবস্থাতেই পাওয়া যাক, সে ত্রাণ পেয়েছে। এত কষ্ট যে তার হচ্ছিল মদের জন্য এতক্ষণ যেন ভাল করে বুঝতে পারেনি।

দ্বিতীয় গেলাস শেষ করে এনে সে বলল, 'আপনি যে এত ভাল লোক তা জানতাম না হেরম্ববাবু। কলকাতা গেলে—'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। সেকথা বলতে! শীগগির একবার কলকাতা গিয়ে আপনার পিতাঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে আসব। একটু পরিচয় করিয়ে দেবেন কিন্তু।'

'নিশ্চয় দেব। বাবা খুব খুশী হবেন। আপনাকে একটু এনটারটেন করার সুযোগও আমি পাব।'

টেবিলে একসঙ্গে মদ খেতে বসলে অল্পসময়েই হৃদ্যতা জমাট বেঁধে যায়। আলাপ-আলোচনা সহজ হয়ে আসে। ভদ্রতা ও অমায়িকতাব সীমা কোন পক্ষেই থাকে না।

'হঠাৎ ঝুমুরিয়া বেড়াতে এলেন ভাই?'

'বন্ধুর সঙ্গে এসেছি। ঝুমুরিয়া তার বাড়ী।'

'হাঁ হাঁ, তাই বটে। দু'জন নতুন ভদ্রলোক গাঁয়ে এসেছেন শুনছিলাম বটে। বন্ধুকে নিয়ে এলেন না?'

'সে এসব খায়-টায় না।'

হেরম্ব হাসল দেখে হীরেনও হাসল। তার হাসি গল্প কমে এল রাত এগারটার সময়। ভেতরে তার একটা উদ্বেগ জেগেছে। নেশা চড়াতে চড়াতে কখন যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে

ঠিক নেই। আরও মদ তাকে খেতে হবে, এ পর্যন্ত খেয়ে সে কোনদিন থামতে পারেনি। কিন্তু এখানে তো আর এগোনো যায় না। এবার তার বিদায় নেওয়াই ভাল। কথা বলতেও আর ভাল লাগছে না। চুপচাপ মমতার কথা ভাবতে ইচ্ছা হচ্ছে। মমতা সতী না অসতী ভেবে ভেবে তার বার করা চাই—আজ রাত্রেই বার করা চাই। চুলচেরা হিসাব করতে হবে সব ঘটনার, মমতার কথাবার্তা আর চালচলনের। কৃষ্ণেন্দু কি যেন সব বলেছে মমতার সম্বন্ধে? কথাগুলি তলিয়ে বুঝতে হবে। মমতা হয়তো ধোঁকা দিয়েছে কৃষ্ণেন্দুকে, যা চালাক মেয়ে মমতা! আর কৃষ্ণেন্দুর মত বোকা তো জগতে নেই।

বিদায় নেবার পালা শেষ হতে সময় লাগল। হীরেনকে বড় ভাল লেগেছে হেরম্বের, আরেকটু বসে যাবে না হীরেন, আরেকটু খাবে না? মদ চেয়ে নিতে হীরেনের বড়ই সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল, হেরম্ব নিজেই কাগজ মোড়া দুটি বোতল রামপালের জিম্মা করে দিল। পথ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আপসোস করে বলল, 'কাল সকালেই যাবেন ভাই? আরেকটা দিন থেকে যান না?'

'আমাকে যেতেই হবে।'

'তবে আর কি বলব! দু'চার দিনের মধ্যে আমিও যাচ্ছি কলকাতা। আপনার বাবার সঙ্গে পরিচয়টা করিয়ে দেবেন।'

ঝুমুরিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। আকাশের কোণে ডুবু ডুবু চাঁদ। কই, কষ্ট তো হীরেনের কমেনি! কড়া আঁচে আবেগের ভিয়ান চড়েছে, আঠার মত যেন ব্যথার তাপে মন জ্বলে গেল। মমতার কথা ভেবে লাভ নেই, চুলচেরা হিসাবে ফল হবে না। মমতা ভাল হোক খারাপ হোক, কিছু তাতে এসে যায় না। সে জানে। তার মন জানে। মমতা তাকে ভালেবাসে না, জগতের অন্য সব মেয়ে তাদের স্বামীদের যেমন ভালবাসে। দিগম্বরী যেমন পূজা করে তার স্বামীকে, স্বামী জ্ঞান, স্বামী ধ্যান, স্বামী সর্বস্ব করে জীবন কাটায়। কি অসহায়, বঞ্চিত জীবন হীরেনের, কি অকথ্য অদ্ভুত তার ভাগ্য! কোন অভাব তার নেই, শুধু সেই জিনিসটি সে পেল না, সকলে যা আপনা থেকে পায়, বিয়ে করা স্ত্রীর শ্রদ্ধা ভালবাসা। শশাঙ্কের মত মানুষ যা পেয়েছে, তার কাছে সেই সুলভ সাধারণ জিনিস আকাশের ওই ডুবু ডুবু চাঁদটির মত অপ্রাপ্য।

না, আরও অনেক মদ খেতে হবে। খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে পড়তে হবে। কৃষ্ণেন্দু বিরক্ত হবে, কিন্তু বাধা দেবে না। কৃষ্ণেন্দু তার ভীষণ যন্ত্রণার কথা জানে। যদিও সে মাঝে মাঝে বলে, এটা তার মাথার একটা দোষ, একটা অসুখ, চিকিৎসা করালে সেরে যাবে, কিন্তু ওসব কৃষ্ণেন্দুর মুখের কথা। মনে মনে কৃষ্ণেন্দু সব বোঝে। কৃষ্ণেন্দুর মত বন্ধু তার নেই।

'রামপাল?'

'আজ্ঞে?'

'হেরম্ববাবুর বাড়ী গিয়েছিলাম এ কথাটা গোপন রেখো।'

'আজ্ঞে, তা আর বলতে! ও কথা কি প্রকাশ করা যায়!'

বড় দীঘিটার কাছে পৌঁছে হীরেন রামপালকে একটা বোতল দিয়ে বিদায় করে দিল।

'বাড়ী তক্ পৌঁছে দি' না বাবু?'

'না, তুমি বাড়ী যাও। এটুকু যেতে পারব।'

দিগম্বরী আজ একলা শুয়েছে। হয়ত তার ঘুম আসছে না। শশাঙ্কের কথা ভাবছে।

শশাঙ্ককে সে চাকরিটা দেবে। লোকটা অপদার্থ, কোন কাজে লাগবে না, পঁচিশ ত্রিশ টাকার বেশী ওর মাইনে হওয়া উচিত নয়। তবু দিগম্বরীর জন্য ওকে সে দুশো টাকা মাইনে দিয়ে রাখবে। মমতার সঙ্গে সর্বদা দিগম্বরীর মেলামেশার ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে হীরেনের আর উৎসাহ ছিল না। এই উদ্ভট কল্পনাকে কি করে প্রশ্রয় দিয়েছিল ভেবে এখন সে বরং আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে। মমতা বদলাবে না। এ জগতে এমন কোন শক্তি নেই মমতাকে যা বদলাতে পারে। অন্যকে দেখে কেউ স্বামীভক্তি শিখতে পারে?

শুধু দিগম্বরীর জন্য শশাঙ্ককে চাকরিটা দেবে। দিগম্বরী স্বামীকে ভালবাসে বলে, ভক্তি করে বলে—তার অপদার্থ নেশাখোর স্বামী তার জীবন-দেবতা বলে।

সদর দরজা বন্ধ ছিল। ধাক্কা দিতে দিতে হীরেনেব মেজাজ চড়ে গেল, কেউ দরজা খুলল না। তখন সে জুতো পায়ে দরজায় লাথি দিতে আরম্ভ করল। খানিক পরে বোঝা গেল আলো নিয়ে কেউ উঠান পার হয়ে আসছে।

বন্ধ দরজার ওপার থেকে ভীতস্বরে দিগম্বরী শুধোল, 'কে?'

'আমি। হীরেন।'

দিগম্বরী দরজা খুলতেই সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'কতক্ষণ ধরে দরজা ঠেলছি, সবাই কি অজ্ঞান হয়ে ছিলেন?'

দিগম্বরী কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলল, 'ভেতরের ঘরের দরজা বন্ধ করে ছিলাম, শুনতে পাইনি। সর্বনাশ হয়ে গেছে ঠাকুরপো, কেষ্ট ঠাকুবপোকে ধরে নিয়ে গেছে।'

সন্ধ্যার একটু পরেই পুলিশ এসেছিল। কৃষ্ণেন্দুর স্যুটকেস খুলে, বিছানাপত্র ঘেঁটে, এদিক ওদিক একটু খোঁজাখুঁজি করে তাকে নিয়ে চলে গেছে। যাবাব সময় নাকি মোহনকেও ধরে নিয়ে গেছে।

'কি সর্বনাশ হল ঠাকুরপো।'

'এ সর্বনাশ তো হতই বৌঠান। এ বরং কম সর্বনাশ হল। কিন্তু পুলিশ খবর পেল কি করে?'

'মোহন একটা দল করেছে না, পুলিশ ওকে নাকি ধরব ধবব করছিল।'

'কিন্তু কৃষ্ণেন্দু? ওকে ধরল কেন?'

'তাতো জানি না ঠাকুরপো।'

কৃষ্ণেন্দুকে আগেও দুবার পুলিশে ধরেছে, কিছুদিন করে জেলও খাটিয়েছে। এত রাত্রে তার ধরা পড়ার ব্যাপার নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। হীরেন দরজা বন্ধ করতে গেল।

দিগম্বরী ভয়ে ভয়ে বলল, 'ঠাকুরপো, এ বাড়ীতে আপনি কেমন করে থাকবেন?'

'কেন?'

'আমি যে একলাটি আছি ঠাকুরপো? পঞ্চুর মাকে আজ রাতে আমার কাছে শুতে বলেছিলাম, সে আসেনি। পুলিশের হাঙ্গামায় ভয় পেয়েছে বোধ হয়।'

'আমি কি তবে এত রাত্রে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াব?'

'একটু যদি সকাল সকাল ফিরতেন ঠাকুরপো।'

'সে কথা ভেবে তো এখন লাভ নেই।'

'লোকে যে নিন্দে করবে ঠাকুরপো, যা তা বলবে।'

হীরেন চটে বলল. 'একটা মাদুর-টাদুর দিন, আমি ওই গাছতলায় ঘুমোইগে।'

দিগম্বরী সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'রাগ করলেন ঠাকুরপো? আপনাকে কখনো গাছতলায় ঘুমোতে দিতে পারি! দিন, দরজাটা বন্ধ করে দিন। লোকে দুকথা বলে তো বলবে। আমরা তো বেশীদিন থাকছি না এখানে, দু'দিন বাদেই কলকাতা চলে যাব!'

সদরের দরজা বন্ধ করে উঠানে নেমে দিগম্বরী কতকটা যেন নিজের মনেই বলল, 'সব শুনলে উনিও রাগ করবেন না।'

'ওনার রাগ করবার কি আছে?'

'ওমা! আপনি যেন ছেলেমানুষের মত কথা বলেন ঠাকুরপো। খালি বাড়ীতে একলাটি পর-পুরুষের সঙ্গে বৌ রাত কাটালে স্বামী কিছু ভাববে না, একটু চটবে না? তবে আপনার কথা ভিন্ন। আপনি তো পর নন্।'

কৃষ্ণেন্দু আর হীরেন দু'জনের বিছানাই ওলটপালট হয়ে আছে। দুটি স্যুটকেস খোলা, জামাকাপড় এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। দিগম্বরী হীরেনের বিছানা ঠিক করে দিল।

'আপনার খাবারটা এনে দি? রান্না কিছু হয়নি, যা হাঙ্গামা গেল। শুধু ভাজা আর মাছের ঝোল। দুধটুধ দিয়ে কোনরকমে খেয়ে নিন।'

'আমি খাব না বৌঠান। খেয়ে এসেছি।'

'ওমা, কোথায় খেলেন?'

'খেয়েছি এক জায়গায়।'

মদের বোতলটার দিকে দিগম্বরী বার বার তাকাচ্ছিল। তারপর চেয়ে দেখছিল হীরেনের মুখ। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে মৃদুস্বরে বলল, 'আপনি মদ খান ঠাকুরপো?'

হীরেন জবাব দিল না। একি বোকার মত প্রশ্ন?

'মদের বোতল নয় ওটা?'

হীরেন বিরক্ত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ওটা মদের বোতল। মদ খেয়েছি, আরও খাব। আপনার কিছু ক্ষতি আছে?'

'খেয়েছেন!' দিগম্বরী যেন চমকে গেল। 'আমিও তাই ভাবছিলাম। না ঠাকুরপো, আমার কোন ক্ষতি নেই। এমনি জিজ্ঞেস করলাম। তবে আমি যাই।'

দরজার কাছে পিছিয়ে গিয়ে অনুমতির অপেক্ষায় দিগম্বরী দাঁড়িয়ে রইল।

'যাই, ঠাকুরপো?'

'দাঁড়ান একটু। এক মিনিট।'

সন্দিগ্ধ, বিস্মিত দৃষ্টিতে হীরেন তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। খালি বাড়ীতে তাকে মাতাল জেনে ভয় পেয়েও দিগম্বরী পালিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে খিল এঁটে দিল না, এত সম্মান তার, এত খাতির! হাত ধরে সে তাকে টানতে পারে এই ভয়কে চাপা দিয়েও তাকে অখুশী না করার প্রয়োজনটা এত বড় দিগম্বরীর কাছে! তবে, এও হতে পারে যে ভয় হয়তো সে বেশী পায়নি। তাকে হয়তো সে বিশ্বাস করে।

'কি ঠাকুরপো? কি বলছেন?'

'বসুন না একটু? একলা থাকতে ভাল লাগছে না।'

'বসব?'

'একটু বসুন। কথাবার্তা বলি।'

'অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন ঘুমোইগে। আপনিও ঘুমিয়ে পড়ুন ঠাকুরপো।'

হীরেন জোর দিয়ে বলল, 'পাঁচ মিনিট বসুন।'

দিগম্বরী ধীরে ধীরে গিয়ে কৃষ্ণেন্দুর এলোমেলো বিছানায় বসল। মুখের ভাব তার ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাচ্ছে। বারবার নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসছে, তুলে তুলে নামিয়ে নিচ্ছে মুখ।

হীরেনের মনে পড়ল, ঝোঁক এলে সে যাদের ঘরে মদ খেতে যায়, তারা এরকম করে না। তবে দিগম্বরী তাদের মত নয়, দিগম্বরীর অভ্যাস নেই। শশাঙ্ক ছাড়া দিগম্বরী কোন পুরুষকে জানে না, চেনে না, তার জগতে শশাঙ্ক ছাড়া কেউ নেই। তাই সে এরকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে, একটু কাঁপছে। তবু তার ডাকে দিগম্বরী ঘরে এসে বসেছে। শশাঙ্ককে সে চাকরি দেবে বলে। মাসে মাসে শশাঙ্কের মাইনের টাকাটা সে ভোগ করবে বলে,—অবশ্য শশাঙ্কের সঙ্গে ভোগ করবে বলে।

এখনো কি তার উপর বিশ্বাস আছে দিগম্বরীর? এখনো সে কি আশা করছে, সত্যি সত্যি সে তাকে কথা বলবার জন্য ঘরে ডেকে বসিয়েছে? আরেকটু এগোনো যাক। আরও স্পষ্ট, আরও নির্ভুল মীমাংসা হয়ে যাক। তারপর এ যন্ত্রণা থেকে সে ও-বেচারীকে মুক্তি দেবে। আর পীড়ন করবে না।

'অত দূরে বসলেন কেন? এখানে এসে বসুন।'

দিগম্বরী সাড়াও দিল না, উঠবার চেষ্টাও করল না।

হীরেন একটা সিগারেট ধরাল। মদের বোতলের কথা তার মনেও ছিল না। সিগারেট ধরাতে গিয়ে এতক্ষণে সে টের পেল তার হাত থর থর করে কাঁপছে।

'আমি ভাবছিলাম কি জানেন? সামনের বুধবার মাসের পয়লা তারিখ, একেবারে বুধবার না হোক, সামনের সপ্তাহের মধ্যে যদি শশাঙ্কবাবু কাজে লাগেন মাসের পুরো মাইনেটা পাবেন।'

'সামনের সপ্তাহেই যাবেন,—সোম মঙ্গলবার।'

'সেই ভাল। এখানে এসে বসুন না?'

ওঠবার চেষ্টা দিগম্বরী করে। ওঠে না। হীরেন সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে জুতো দিয়ে পিষতে থাকে। তারপর জুতো খুলে বিছানায় পা তুলে বসে। তারপর দিগম্বরী উঠে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই থাকে। তারপর এক পা এক পা করে এগিয়ে হীরেনের বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে।

আর একটু বাকী, তারপর হীরেন ওকে মুক্তি দেবে। হাতটি শুধু ধরবে একবার। হাত ধরলে দিগম্বরী কি করে দেখে সে হাসিমুখে সহজভাবে বলবে, 'আচ্ছা, আপনি এবার যান।'

লণ্ঠনের কাছে আসায় দিগম্বরীকে স্পষ্ট দেখাচ্ছে। হঠাৎ তার হাত ধরতে হীরেনের সাহস হল না। তার খেয়াল-খেলার সীমানা পার হয়ে যেন এতক্ষণে দিগম্বরী রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে। হীরেন কোনদিন ভাবতেও পারেনি মানুষ এমন রূপসী হতে পারে! ঝুমুরিয়া ঘুমিয়ে আছে—চারিদিকের সমগ্র ঝুমুরিয়া। এতবড় বাড়ীর একটি ঘরে জেগে আছে শুধু সে আর এই মানবী। এত কাছাকাছি জেগে আছে।

দিগম্বরীর ডান হাতের কব্জি চেপে ধরার পর হীরেনের খেয়াল হল, সে তার হাত ধরেছে।

'বোসো।'

'না।'

'বসবে না?'

'না। আমি যাই।'

হীরেন তার হাত ছেড়ে দিয়ে মাথা নীচু করে বলল, 'আচ্ছা, যান। আমি ভোরে উঠেই চলে যাব।'

দিগম্বরী গেল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'শশাঙ্কদা গেলেই চাকরি পাবেন।'

দিগম্বরী তার পাশে বসল। দু'হাতের মুঠোয় তার হাত ধরে বলল, 'রাগ করলেন?'

তারপর দিগম্বরীই হাত বাড়িয়ে টেবিলের লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিল।

বাইরের ডাকাডাকিতে ভোরে আগে ঘুম ভাঙ্গল দিগম্বরীর। হীরেনকে তুলে দিয়েই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। খিড়কি দিয়ে পালিয়ে গেল কিনা কে জানে। সকলের আগে হীরেনের চোখে পড়ল টেবিলের উপর মদের বোতলটার দিকে। বোতলটা খোলাও হয়নি। তার মদ খাওয়ার ইতিহাসে এটা ঘটল এই প্রথম। মদ না ছুঁয়েও তার বেশ দিন কাটে, কিন্তু যখন আরম্ভ করে তখন বেহুঁস না হয়ে ঘুমিয়ে পড়ার ক্ষমতা তার হয় না।

বাইরে সমানে ডাকাডাকি চলছিল। হীরেন গিয়ে সদর দরজা খুলেই দেখল, পুলিশ। বুকটা তার ধড়াস্ করে উঠল।

তার জন্যই পুলিশ এসেছে। তবে তাকে ধরে নিয়ে যেতে নয়। কিছু খোঁজ-খবর নিয়ে, কৃষ্ণেন্দুর সম্পর্কে তাকে কতকগুলি প্রশ্ন করে, পুলিশ বিদায় নিল। শার্ট গায়ে ধুতিপরা যে এই সব জিজ্ঞাসাবাদ করল, তার কাছেই জানা গেল যে কৃষ্ণেন্দু আর মোহনকে কোন নির্দিষ্ট আইনে গ্রেপ্তার করা হয়নি। আদালতে তাদের বিচার হবে না, জেলও হবে না। কোথাও শুধু আটক রাখা হবে, আর কিছু নয়। ব্যাপার খুব সামান্য।

'কৃষ্ণেন্দু এখানে এসেছে আপনারা খবর পেলেন কি করে?'

সে শুধু একটু হেসেছিল।

হীরেন একেবারে স্নান করে ফেলল। সমস্ত জগৎ কেমন যেন শান্ত, সহনশীল হয়ে গেছে। গভীর সন্তোষ যেন শুধু মন নয় দেহেরও সম্পদ। নতুন দিনের নতুন রোদ, সুন্দর সোনালী রোদ, পৃথিবীর কোথাও ক্ষোভের চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছে না, জীবনের সীমাহীন প্রান্তর কচি ঘাসে ছেয়ে গেছে। ফাঁকি নেই, নালিশ নেই, সন্দেহ নেই, বিচার নেই—সরল হয়ে গেছে বেঁচে থাকা।

দিগম্বরী চা করে দিল। নির্বাক, উদ্‌ভ্রান্ত, চিন্তাময়ী দিগম্বরী—নতুন বৌটির মত লজ্জার ভারে সকাতরা, সুখ-বিহ্বলা দিগম্বরী।

হীরেন উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'আরে এ কি! ওসব কিছু নয়, বৌঠান।'

শুনে দিগম্বরী একেবারে কেঁদে ফেলে নালিশ জানাল, 'আপনার কাছে কিছু নয়।'

'আহা, আপনি বোঝেন না কিছু। ওসব মানুষের জীবনে ঘটে যায়। আমাদের দুজনেরি এটুকু স্বাধীনতা, এটুকু অধিকার আছে। আপনি খারাপ ছিলেন না, খারাপ হয়েও যাননি।'

'আমার যে স্বামী আছে ঠাকুরপো?'

'আমারও তো স্ত্রী আছে।'

'আপনার কথা আলাদা। আপনি পুরুষমানুষ।'

'আপনিও পুরুষ না হন—মানুষ।'

দিগম্বরীও এক কাপ চা খেল। চোখে জল শুকিয়ে গেল চোখেই। উদ্‌ভ্রান্ত ভাব কেটে গিয়ে এল থমথমে ভাব। কোনরকম অন্যমনস্কতা তার দেখা গেল না। কিন্তু মনে হল একটা

কথাই সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উল্টে-পাল্টে ভাবছে।

'আজকেই চলে যাবেন তো?'

'তাই ভাবছি। থেকে আর কি করব!'

দিগম্বরীর চোখে ঝিলিক খেলে গেল।

'না, থেকে আর কি করবেন!'

হীরেন সিগারেট ধরাচ্ছিল, প্রক্রিয়াটা সমাপ্ত হলে খুব অন্তরঙ্গ ভাবে নীচু গলায় আপনজনকে মনের কথা শোনানোর মত সরলতার সঙ্গে বলল, 'কি জানেন, বৌটার জন্য বড্ড মন কেমন করছে। মনটা কেমন বিগড়ে গিয়েছিল, অনেকদিন বৌটার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিনি। সেজন্য আরও তাড়াতাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে।'

'আপনার বৌ খুব সুন্দরী, না ঠাকুরপো?'

'সে তো দেখতেই পাবেন।'

দিগম্বরী রান্না করতে গেল। সকালের গাড়ী আর ধরা যাবে না, একটার গাড়ী ধরতে হলে খেয়ে দেয়ে এগারোটার মধ্যে হীরেনের রওনা হওয়া দরকার। গরুর গাড়ী ঠকর ঠকর করে চলবে। একটার গাড়ীতে গেলেও আজ রাত্রে মমতার সঙ্গে দেখা হবে, তার বাড়ী অথবা বাপের বাড়ী যেখানেই সে যাক। দিনে দেখা হওয়ার চেয়ে একান্তে সমস্ত রাত্রির জন্য দেখা হওয়াই ভাল। তবু দীর্ঘ দিনটা কাটাবার চিন্তায় হীরেন একটু অসহিষ্ণুতা বোধ করে। তার শান্ত সন্তুষ্ট চিত্তে শুধু এই একটি অস্থিরতা দেখা দিয়েছে।

যাবার আগে রম্ভার সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়া দরকার। রম্ভার মনে নিশ্চয় খুব আঘাত লেগেছে। বাপের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে প্রায় ক্ষেপে গিয়েছিল। সে ব্যবস্থা তো ভেস্তে গেলই, বেচাবার ভাইটিকে পর্যন্ত পুলিশে ধরে নিয়ে গেল।

জামা গায়ে দিয়ে হীরেন বেরোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, দিগম্বরী এসে বলল, 'ঠাকুরপো, ওঁকে তো একটা টেলিগ্রাম করে দিলে হয় আজকেই ফিরে আসবার জন্যে?'

'তা হয় বৈকি।'

দিগম্বরী সাগ্রহে বলল, 'তবে একটা টেলিগ্রাম লিখে পাঠিয়ে দিন ঠাকুরপো। ওর স্বভাব কি জানেন, বাড়ী ছেড়ে থাকতে পারেন না, নেশাটেশা আরম্ভ করে দেন। বড্ড ভাবনা হচ্ছে আমার।'

'ঠিকানা জানেন তো? ঠিকানাটা দিয়ে দেবেন, যাবার সময় স্টেশনে টেলিগ্রাম করে দেব।'

দিগম্বরী মাথা নেড়ে বলল, 'সে বড় দেরী হয়ে যাবে। হয়তো আজকে ফেরবার গাড়ী পাবেন না। এখুনি পাঠিয়ে দিন। ও বাড়ীর শম্ভুর সাইকেল আছে, ক'গণ্ডা পয়সা দিলেই যাবে।'

সদরে দিগম্বরীর এক পিসীর বাড়ীতে শশাঙ্ক উঠেছে। শশাঙ্ককে আজকেই ফিরে আসবার জন্য দিগম্বরীর জোরালো তাগিদ জানানোর বার্তা ও ঠিকানা প্রভৃতি একটা কাগজে লিখে হীরেন বলল, 'আমি তো শম্ভুর বাড়ী চিনি না।'

'কাছেই বাড়ী। সদর থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি চলুন।'

'শম্ভু ইংরাজী জানে তো বৌঠান? ফর্মে সব ঠিকমত লিখতে পারবে তো?'

'দুবার ম্যাট্রিক ফেল করেছে, ইংরেজী জানে না! ওনার মত, আপনার মত অবিশ্যি জানে না, তবে মন্দ জানে না।'

শম্ভুকে দেখেই হীরেনের মনটা খুশী খুশী হয়ে উঠল। বছর কুড়ি বয়সের সুশ্রী তরুণ,

সুগঠিত সুন্দর দেহ। সোজা মুখের দিকে তাকায়, নির্লজ্জের মত কথা বলে, কাঁচুমাচু করে না।

'আপনার টেলিগ্রাম হলে এক টাকা লাগবে, দিগুদির হলে ছ'আনা।'

'আমি কি অপরাধ করলাম?'

'আপনি বড়লোক। আপনাকে কনসেশন দেব কেন?'

'বেশ, আমি তা' হলে দু'টাকা দিচ্ছি।'

শম্ভু মাথা নেড়ে বলল, 'এক টাকা। কাজ করে পয়সা নেব, ভিক্ষে তো নিচ্ছি না আপনার কাছে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, এক টাকা নিও। অত মেজাজ করো না ভাই। ভাল মানুষ কখনো মিছিমিছি মেজাজ গরম করে না।'

শম্ভু একটু অবজ্ঞার হাসি হাসল।—'মেজাজ করিনি। আপনার কাছে সবাই মিন মিন করে কথা কয়, কেউ সোজা স্পষ্ট কথা বললে আপনার মনে হয় মেজাজ দেখাচ্ছে।'

'বিনয় মানে না? ভদ্রতা?'

'বিনয় মানে তো ন্যাকামি? একেবারে নেতিয়ে পড়া? ওসব বিনয় আর ভদ্রতার ধার ধারি না মশায়। বেশী বিনয় করতে গিয়েই তো আমরা গেলাম, কেবল সেলাম ঠুকতে ইচ্ছে হয়।'

হীরেন দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ শম্ভুর সাথে আলাপ করল। শম্ভুর বাবা সম্প্রতি মারা গেছেন। মা মাসী ভাই বোন ভাগ্নে-ভাগ্নীরা আছে। আর আছে কিছু জমি। শম্ভু জমি চাষ করায় আর তার সাইকেল চেপে গ্রামে গ্রামে ঘুরে অর্ডার সংগ্রহ করে, তারপর একদিন সদরে গিয়ে সব কিনে আনে।

হীরেন মনে মনে ভেবে রাখল, কিছুদিন পরে একবার এই ছেলেটির খবর নিতে হবে।

তারপর খানিকটা ভদ্রতার খাতিরে আর খানিকটা কর্তব্যবোধে হীরেন দেখা দিতে গেল রম্ভাকে। একটু সহানুভূতি জানাবে। টাকা-পয়সার দরকার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করবে।

নিজের ভাবেই সে মশগুল। জীবনটা ভাল লাগছে। একরাত্রে ফুৎকারে উড়ে গিয়েছে সব ক্ষোভ। মন পাক খাচ্ছে বিরহিনী মমতাকে কেন্দ্র করে। মমতা অবাক হয়ে চমকে যাবে, খুশীতে নেতিয়ে পড়বে তার বুকে, হাসি-মুখে আর ছল ছল চোখে। আনমনে সে পথ চলে। গাঁয়ের চাপা উত্তেজনা আর চাঞ্চল্য কিভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, একক মানুষের মুখে, ঘরের দাওয়ায়, ফকিরের মুদি দোকানের সামনে, রাম ঘোষের বাড়ীব দক্ষিণে বটগাছ তলায় দু'চার দশজনের জমায়েৎ হয়ে আলাপ করার ভঙ্গিতে, কৃষ্ণেন্দুর বন্ধু সে—তার দিকে চাউনির রকমে—এসব কিছুই তার চোখে পড়ে না।

বাইরে ছিল জীবনলাল। রম্ভাকে ডেকে দিতে বলায় সে ইতস্ততঃ করে বলল, 'আপনিই বরং ভেতরে আসুন বাবু। ওর মেজাজটা ভাল নেই। মোরা কথা কইতে গেলে কামড়ে দিতে আসে।'

রম্ভাকে দেখাল থমথমে। দাওয়ায় উঠবার সিঁড়িতে পা রেখে সে বসেছিল, হীরেনকে দেখে নড়ল না, কথাও বলল না। মুখ বাঁকিয়ে ভুরু পাকিয়ে কোণাচে চোখে চেয়ে রইল একটি কলাগাছের আধলুকানো মোচাটির দিকে। দাওয়ার কোণে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে নরেশ নতুন একটি খড় চিবোচ্ছিল। এখানে এসে নতুন খড়ের বিচিত্র স্বাদে তার মন ভুলেছে। যখন তখন খড় মুখে পুরে চিবোতে থাকে।

'আমি তো আজ যাচ্ছি রম্ভা।'

রম্ভা সাড়া দিল না।

'ভারি দুঃখের ব্যাপার হল রম্ভা। এমন হবে কে ভাবতে পেরেছিল বল। পুলিশ এমন আচমকা ওদের ধরে নিয়ে যাবে—'

রম্ভা একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।

হীরেন দরদ বোধ করল অসীম। রম্ভার দুঃখের সত্যই তুলনা নেই। ও যে এমন মুহ্যমান হয়ে পড়বে তা আর আশ্চর্য কি। সান্ত্বনা দেবারও কিইবা আছে ওকে!

'মন খারাপ কোরো না রম্ভা। সব অবস্থাতে শক্ত থাকবে এই তো চাই আমরা তোমার কাছে। আমার যা করার আছে তা আমি করব। কেষ্ট আর তোমার ভায়ের জন্য যত টাকা লাগে খরচ করব। তুমি বরং কিছু টাকা রেখে দাও—দরকার হতে পারে।'

এবার রম্ভা ফেটে গেল।

'আপনার টাকায় আমি মুতে দি। লজ্জা করে না? বেহায়া, বজ্জাত, কোথাকার। মাতাল, বিশ্বাসঘাতক!'

হীরেনের দুটি কান দুটি ভাঙ্গা কাঁসির মত ঝন্ ঝন্ করে বাজে। মানসিক ভূমিকম্পে হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়তে থাকে তার আত্মতৃপ্তির বিরাট মহল। মাতাল! বিশ্বাসঘাতক! রামপাল রম্ভার স্বামী। কাল সে রামপালকে সঙ্গী করে মদ খেতে গিয়েছিল হেরম্বের বাড়ী। সে মাতাল, সে বিশ্বাসঘাতক।

কি বিশ্বাসঘাতক রামপাল। একসঙ্গে তারা মদ খেয়েছে তবু রামপাল প্রকাশ করে দিয়েছে তার গত রাত্রির উন্মত্ততার কথা। কিম্বা অন্য ভাবে প্রকাশ পেয়েছে? হেরম্বের চাকর হয়তো গল্প করেছে। গাঁয়ের কেউ হয়তো দেখেছে। গাঁয়ের সবাই হয়তো জানে তার অপকীর্তির কথা—হেরম্বের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দুর বন্ধুব দহরম মহরমের কাহিনী হয়তো ছড়িয়ে গিয়েছে দিগদিগন্তে!

'চুপি চুপি ছুরি মারলেই হত কেষ্টবাবুর পিঠে? বজ্রাঘাত হয় না আপনার মত লোকের মাথায়? সাপে কামড়ায় না আপনাদের? কুষ্ঠ হয় না?'

হীরেন প্রায় কাতর ভাবেই প্রতিবাদ জানায়, 'তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ রম্ভা। আমি মাতাল হতে পারি, বিশ্বাসঘাতক নই।'

রম্ভা ব্যঙ্গ করে বলে, 'নন? শত্তুরের সঙ্গে চুপি চুপি ভাব করে বন্ধুকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া কেন বিশ্বাসঘাতকতা হবে! ও খুব ভাল কাজ।'

হীরেনের মনে কথা জাগে ঃ 'আমার জন্য কেষ্টর এতটুকু ক্ষতি হয়নি রম্ভা। আমি শুধু হেরম্বের সঙ্গে মদ খেয়েছি' কিন্তু মুখে তার শব্দগুলি উচ্চারিত হয় না। মনের মধ্যেই সে যেন রম্ভার ঝাঁঝালো জবাব শুতে পায় ঃ 'তা বৈকি। বন্ধুর শত্তুরের সঙ্গে, খুনের সঙ্গে বসেই তো লোকে মদ খায়! বন্ধু যাকে শাস্তি দেবে পরদিন, তার সঙ্গে রাত্তির বেলা চুপি চুপি আড্ডা দিতে যায়।'

হীরেন ধীরে ধীরে চলে যায়, রম্ভা তাকে শুনিয়ে বলে, 'যান, যান্। কোথায় পালাবেন? সবাইকে বলব আপনার কীর্তির কথা। কলকাতা গিয়ে চাদ্দিকে রটাব, সবাইকে চিনিয়ে দেব আপনি কেমন ধারা লোক, যে যেখানে আছে।'

কত কল্পনা নিয়ে আজ ঘুম ভেঙ্গেছিল হীরেনের। কি তেজ সঞ্চার হয়েছিল তার রক্তে, কি উৎসাহ জেগেছিল মনে, সব বাধা সরিয়ে কিভাবে উৎসারিত হয়ে উঠেছিল নিজের

মধ্যে। ফিরে পেয়েছিল বিশ্বাস, পথ খুঁজে পেয়েছিল অভ্রান্ত আত্মোপলব্ধিতে। সব এখন ভেস্তে গেছে, ফেঁসে গেছে, চুপ্‌সে গেছে, উবে গেছে।

মমতা শুনবে তার এই অমার্জনীয় অপরাধের কথা। আরো বেশী তাকে ঘৃণা করবে মমতা।

না শুনলেই বা কি। তার মত অপদার্থ, অসংযত, কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষকে এমনিই ঘৃণা করবে মমতা। ঘৃণা সে করছে— চিরদিন করবে। ঘৃণাটা মনের জোরে চেপে রেখেছে এখন, তার এই কাণ্ডের কথা শুনলে সেটা ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবে, জন্মের মত তাকে সে ছেড়ে যাবে।

হীরেন বুঝতে পারে যে এতদিনে সে বুঝতে পেরেছে মমতা কত উঁচুতে আর সে কত নীচুতে, মমতার কাছে সে কত হীন, কি স্বর্গ ও নরকের পার্থক্য তাদের মধ্যে। অশ্রদ্ধা ছাড়া আর কি তার পাওয়া সম্ভব মমতার কাছে?

হীরেন দুঃখ পায়, তার অনুতাপ হয়। হতাশায় বিষাদে ঝিমিয়ে পড়ে। রাগে অভিমানে ফুঁসে ওঠে। হিংসায় জ্বলে যায়! তাই যদি হয়, এমন যদি সে অমানুষ, দেবতা কৃষ্ণেন্দু কেন এল তার জীবনে, কেন বন্ধু করল তাকে? কেন দেবী মমতা তাকে বরণ করল স্বামীর পদে? কি দরকার ছিল ওদের এভাবে কষ্ট দেবার, তার জীবনটা নষ্ট করবার? খারাপ লোক সে, খারাপ হয়েই থাকত। খারাপ লোকের সঙ্গে মিশে, খারাপ কাজ করে, মনের ফূর্তিতে জীবন কাটিয়ে দিত হেসে খেলে।

সবাই ষড়যন্ত্র করেছে তাকে অসুখী করতে। বিশ্বসংসার তার বিরুদ্ধে। সে একা, তার কেউ নেই। হায়, কেন সে বেঁচে আছে!

বাড়ীর কাছাকাছি সাঁ সাঁ করে সাইকেল এসে তার নাগাল ধরে ব্রেক কষে থেমে যায়। শম্ভু টেলিগ্রামের টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বলে, 'আজ যেতে পারলাম না হীরেনবাবু, মাপ করবেন। জরুরী কাজ পড়েছে।'

দিগম্বরীর টেলিগ্রামের সঙ্গে হীরেন নিজেও একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে চেয়েছিল মমতার নামে, সে যাচ্ছে এই খবর দিয়ে। কাগজ দুটি সে ছিঁড়ে ফেলে।

শম্ভু বলে, 'আপনি তো বুঝতেই পারছেন। চাদ্দিকে হৈ চৈ পড়ে গেছে। আমি জানতাম না, এইমাত্র খবর পেলাপ। অরাজকতা সত্যি আর সয় না হীরেনবাবু। বিনা পথ্যে, অযত্নে অচিকিৎসায় সূর্যদা মারা গেল। মহীউদ্দীনের বাবা মরল জেলে। মোহনের বাবা খুন হল। তারপর কাল রাতে কেষ্টবাবু আর মোহনকে অ্যারেস্ট করা হল। ওরা কি খেলা পেয়েছে? আমরা আর সইব না। আমি মোহনের দলের মেম্বার। মহীউদ্দীন আমাদের সেক্রেটারী। ও আমায় গাঁ ছেড়ে কোথাও যেতে বারণ করেছে।'

শম্ভু দম নিয়ে যোগ দেয়, 'আপনিও থেকে যান না হীরেনবাবু? এ সময়ে চলে যাবেন?'

'দেখি ভেবে।'

ভেবে দেখবার কিছু ছিল না। কৃষ্ণেন্দু আর মোহনেব গ্রেপ্তারে গ্রামে যদি উত্তেজনার সঞ্চার হয়ে থাকে, প্রতিহিংসা নিতে রম্ভা তার বিশ্বাসঘাতকতার গল্প প্রচার করার আগেই তার চলে যাওয়া ভাল গ্রাম ছেড়ে। মিথ্যা হলেও রম্ভার কথা সবাই বিশ্বাস করবে।

গরুর গাড়ীর কিচ ক্যাঁচ শব্দ করে ছি ছ্যা, ট্রেনের আওয়াজে প্রতিধ্বনিত হয় পালান, পালান! ইউরোপীয় স্বামী স্ত্রী দুটি শ্লথ সংক্ষিপ্ত ভাষায় গল্প করছে, ঠিক কোন্ দেশের লোক

তারা অনুমান করা যায় না। পাঁচ ছ'বছরের ছেলেটি জানালায় কনুই পেতে দু'হাত তালুতে মুখ রেখে একভাবে তাকিয়ে আছে বাইরের চলমান জগতের দিকে। বেশ একটু ঝুঁকেই আছে। ভয় করে না ওর বাপ-মার? হঠাৎ যদি পড়ে যায়?

সরে গিয়ে কাছে বসাটা মোটেই অস্বাভাবিক হবে না। তারপর ছেলেটাকে আরেকটু উঁচু করে চোখের পলকে বাইরে ঠেলে দেওয়া, চীৎকার করে লাফিয়ে উঠে চেন টেনে গাড়ী থামানো। কত সহজ, কত সংক্ষিপ্ত। স্বামী প্রায় চোখ বুজে কথা বলছে, মুখে পাইপ ঝুলছে শিথিল ভাবে, স্ত্রী তাকিয়ে আছে স্বামীর দিকে। কত নিরাপদ, কত স্বাভাবিক ছেলেটাকে বাইরে ঠেলে দেওয়া!

কিন্তু অসম্ভব। একেবারেই অসম্ভব।

মনে দাঁড়িপাল্লা খাড়া করে হীরেন ছেলেটিকে এক পাল্লায় আর হেরম্বকে অন্য পাল্লায় চাপায়। কোন দিকে পাল্লা নামে না—নির্মল নিষ্পাপ একটি কচি ছেলে আর অত্যাচারী খুনে হেরম্বের সমান ওজনের টানে দাঁড়িপাল্লা থর থর করে কাঁপে; নিরপেক্ষ মৃত্যুকে জীবনের হিংসা ও প্রেমের আপেক্ষিক বাজী খেলায় হীরেন যোগ দেওয়াতে পারে না।

খড়গপুরে নেমে মেল ধরেছে। চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে হীরেন ডাইনিং কারে যায়। জরিমানা দিয়ে মদ খাবে। হেরম্বের দেওয়া বোতল দিগম্বরীর বাড়ীতেই রয়ে গেছে। ভালই হয়েছে। নইলে কি এই অ্যাড়ভেঞ্চার জুটত—মদ খাবার জন্য গাড়ী থামিয়ে গণ্ডগোল সৃষ্টি করা।

হাওড়ায় নেমে হোটেলে যায়। আরও মদ খেয়ে চেনা মেয়েটার ঘরে যাবে। রাত নটায় তার খেয়াল বদলে যায়। মমতার জন্য মায়া জাগে। মমতার ঝাপসা মুখ বুক কাঁধ পিঠ কোমর নিতম্ব উরু বড় কাম্য, বড় কামনার মনে হয়। নিজের বোকামির কথা ভেবে তার হাসি পায়। কি ছেলেমানুষিই সে করেছে, সারাদিন—সংসার-অনভিজ্ঞ ভাবপ্রবণ কিশোর প্রেম-পাগলের মত। পুরুষ হয়ে একটা মেয়েমানুষকে, নিজের বিয়ে করা বৌকে, বশ করার কৌশল যদি না জানে তবে সে কিসের পুরুষ! অন্যের কাছে মমতার শুনবার অপেক্ষায় তার থাকবার দরকার? নিজেই সে মমতার কাছে সব খুলে বলবে। বলবে, মমু, তোমার জন্য আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে মমু। তোমার জন্য আমি মদ ধরেছি, তোমার জন্য দিগম্বরীর মত স্ত্রীলোককে প্রশ্রয় দিয়েছি। আমি ডুবে যাচ্ছি মমু, আমায় বাঁচাও।

শুনে মমতা নিশ্চয় গলে যাবে।

•

আরিফ মোটে ক'দিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। ছাড়া পাবার আগে তাব সারা গায়ে অনেকগুলি ছোট বড় ফোড়া উঠেছিল। কতগুলি বসে গিয়েছে, কতগুলি পেকে ফেটে গিয়েছে, দু'একটা যা আছে সেগুলি বসে যাবে না পাকবে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ফোড়ার জন্য নিজেকে আরিফের সব সময় কেমন নোংরা মনে হয়, দিনে সে তিন চার বার স্নান করে। মাঝখানে একটু জ্বর হয়েছিল, তখনও বাদ দেয়নি।

সকালে সবে সে স্নান করে উঠেছে, মমতা এল। কয়েকটি ফোড়ার ঘা তখনো ভাল করে শুকোয়নি। মমতাই গরম জলে ধুয়ে ঘায়ে আর ফোড়ায় মলম লাগিয়ে দিল।

'আমি মুসলমান হতে পারি না আরিফ?'

'না। মুসলমানী হতে পার।'

'কত শীগগির হতে পারি?'

'যত শীগগির তোমার খুশী।'

'তাহলে চট্‌পট্‌ আমাকে মুসলমান করে নাও। তারপর চলো আমরা একবার ঝুমুরিয়া যাই।'

জেলে আরিফ গোঁফ রেখেছিল সখ করে। গোঁফের জন্য তার মুখের চেহারা আশ্চর্যরকম বদলে গেছে। যাবার সময় আঙ্গুল বুলিয়ে তার গোঁফটা পরীক্ষা করে মমতা বলে, 'কাল গোঁফটা কামিয়ে ফেলো।'

কৃষ্ণেন্দু আর মোহনলালের গ্রেপ্তারের খবর মুখে মুখে ছড়িয়ে গিয়ে চারিদিক সরগরম হয়ে উঠল। সকলের মধ্যেই কম বেশী তীব্র প্রতিবাদ গুমরে উঠল, একি অন্যায়! একি অবৈধ, বেআইনী আচরণ পুলিশের, হেরম্বের। দেশভক্ত ত্যাগী একজন নেতা এলেন তাদের গাঁয়ে তাদের ভালর জন্য, বিনা কারণে চুপিচুপি তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া তাদের মধ্য থেকে। কোন হাঙ্গামা হয়নি, কোন বেআইনী ব্যাপার ঘটেনি, একটা সভা পর্যন্ত করা হয়নি। কেন তবে গ্রেপ্তার হবে কৃষ্ণেন্দু আর মোহনলাল, আটক থাকবে বিনা বিচারে? কেন চলবে হেরম্বের এ কারসাজি? সরকার কি হেরম্বের হাতের পুতুল? কৃষ্ণেন্দু আগে একবার এসে লড়াই করে গিয়েছিল চাষীদের জন্য। মোহনলাল চাষীদের মধ্যে কাজ করছিল। দু'জনে ধরা পড়ায় চাষীদের মধ্যে রীতিমত উত্তেজনা দেখা দিল। জালালুদ্দীন মারা গিয়েছিল নিমুনিয়ার। কিন্তু জেলে মারা যাওয়ায় সকলের মনে সে শহীদের স্থান পেয়েছে। এ মনোভাব সকলের মনে আরও স্পষ্ট হয়েছে বীরেশ্বরের কারামুক্তির দিন সূর্যের নেতৃত্বে জালালুদ্দীনের স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে যে শোভাযাত্রা ও সভা হয়েছিল তার ফলে। সূর্যও আজ বেঁচে নেই। শোভাযাত্রার সামনে ছিল জালালুদ্দীনের ভাই মহীউদ্দীন। মোহনলালের দল তাকে নেতা করে কোমর বেঁধে লেগে গেছে সকলের অসন্তোষকে আরও গভীর, আরও তীব্র করে তুলবার কাজে।

বীরেশ্বরের অপমৃত্যুতেও চারিদিকে এমন সাড়া জাগেনি। চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল যথেষ্ট, কিন্তু এমন উত্তেজনা দেখা দেয়নি। ও যেন খানিকটা ছিল হেরম্ব ও বীরেশ্বরের ব্যক্তিগত কলহের ব্যাপার। হেরম্ব অত্যাচার করছিল সত্য, বীরেশ্বর একা নিজের জন্য লড়তে যায়নি তাও সত্য, কিন্তু তবু হাঙ্গামাটা হয়েছিল বীরেশ্বরের জন্যই। হেরম্বের মত অত্যাচারীকে প্রকৃতির একটা অনিবার্য উৎপাতের মত মেনে নেবার সংস্কার আজও লোকের কেটে যায়নি। জমিদার, ধনী আর প্রতিপত্তিশালীদের সঙ্গে আজও তো লড়াই একরকম হয়নি, দেশের লোকের, ওদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়বার প্রেরণাও যোগাননি নেতারা। সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু হেরম্বদের সঙ্গে সংগ্রামের ঐতিহ্য তো নেই-ই, বরং আছে মুখ বুজে সব সয়ে যাবার অভ্যাস। তারপর ছিল এই যুক্তি যে দাঙ্গা বাধবার উপক্রম সেদিন সত্যই হয়েছিল এবং বীরেশ্বরের মৃত্যু ছিল রহস্যজনক, ঠিক কে তাকে মেরেছিল নিঃসন্দেহে জানা যায়নি। বীরেশ্বরের মৃত্যু নিয়ে তাই হৈ চৈ হয়েছিল কিন্তু ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি। নেপথ্যে ছিল।

কিন্তু কৃষ্ণেন্দু নেতা। মোহনলাল প্রিয় এবং একটি জনপ্রিয় দলের নেতা।

অনাথের দলের কয়েকজন ছেলে মোহনলালের দলে এসে যোগ দিয়েছে। হেরম্বের কাছে খেলার মাঠের জন্য টাকা নেওয়া আর ভবিষ্যতে এটা ওটার জন্য আরও টাকা পাবার ভরসা পাওয়া তারা পছন্দ করেনি। টাকা নেওয়ার ব্যাপারেও অনাথ ও সহদেব কেমন যেন রহস্যময়, হিসাবের ব্যাপারে শিথিল। কৃষ্ণেন্দুর আগমনে এরা ক'জন ছাড়াও দলের আরও অনেকে

উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, যোগ দিতে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে। নেহাৎ দলপতিদের খাতিরে পেরে ওঠেনি। কৃষ্ণেন্দুর গ্রেপ্তারের খবর পেয়েই এরা ক'জন মহীউদ্দীনের কাছে গিয়ে জানিয়ে দিয়েছে তারা এদলে আসতে চায়। তারপর একে দু'য়ে আরও কয়েকজন আসতে আরম্ভ করেছে।

ক্রমে ক্রমে খবর ছড়ায়, বেলা বাড়ার সঙ্গে উত্তেজনাও বাড়ে। প্রথমে বিচ্ছিন্ন ভাবে, ছোট ছোট জমায়েতে।

দু'জনের গাড়ী পাশ কাটাবার সময় কার্তিক বলে পাঁচুকে, 'খবর জানিস পাঁচু?'

'হাঁ। শুনলাম খবর। কাজে যেতে মানা করেছে।'

'কে মানা করেছে?'

'কানাইবাবু। সিদে কথা বলে দিয়েছে, রাস্তায় খাটতে যাসনি পাঁচু, খর্বদার।'

'বটে? তবে তো কাণ্ড হবে আজ!'

গাড়ী থামিয়ে দু'জনে উত্তেজিত ভাবে আলোচনা করে। কল্কেয় তামাক দিয়ে নারকেল ছোবড়া তাল পাকিয়ে আগুন করে তামাক খায়। ভদ্রলোক যেতে দেখলে সবিনয়ে সাগ্রহে জানতে চায় ঘটনা কি আর স্বদেশী বাবুরা কি করবে আজ, জানা কথা আরেকবার মন দিয়ে শোনে, ঠিক কি ঘটবে জানতে না পারায় কল্পনা করে বীরেশ্বর যেমন শুরু করেছিল তেমনি একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা, নয়তো ক'বছর আগে পাঁচনিখের থানা পুড়িয়ে দেবার মত কোন ব্যাপারের সম্ভাবনা!

জগৎ দাসের ছেলে শিশু, বীরেশ্বরের হাঙ্গামার দিন সর্দি জ্বরের জন্য বাড়ী থেকে বার না হলেও যে ধরা পড়ে জরিমানা দিয়ে ছাড়া পেয়েছিল, হঠাৎ সে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে জগৎ ডেকে বলে, 'কোথা যাস্? এই শিশু! কোথা যাস্ তুই?'

'দেখে আসি কি ব্যাপার।'

'না, তোর যেতে হবে না। ওসব ব্যাপারে তোর গিয়ে কাজ নেই। বাড়ীতে বসে থাক। ছাপ মারা হয়ে আছিস, খেয়াল নেই? কিছু হলে পুলিশ সবার আগে তোকে ধরবে।'

'সে তো বাড়ী বসে থাকলেও ধরবে।'

শিশু উধাও হয়ে যায়। বাপের প্রাণের শঙ্কা নিয়ে জগৎ যতক্ষণ দেখা যায় তার দিকে চেয়ে থাকে, তারপর সামনে দাঁড়ানো কারো প্রস্তাবে সায় দেবার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে নিজের মনে বিড় বিড় করে বলে, যাকগে। এমনিও যা, ওমনিও তাই। যাকগে। সেই থেকে ক্ষেপে আছে ছেলেটা এই যা ভাবনা। যাকগে।

খানিক ভেবে আবার বলে, আমিও যাই তবে। দেখে আসি। ধরে তো আমায়ও নয় ধরবে।

সুদেবের দাওয়ায় বলাইচরণ, রামপদ, নিখিল, অবিনাশেরা প্রতিদিন জড়ো হয় ভোরে, সূর্য কয়েক হাত উপরে উঠে ভালো করে আলো হলেই তাদের আড্ডা ভাঙ্গে, যে যার বাড়ী যায়, দোকানে সওদা কেনার দরকাব থাকলে কিনে নিয়ে। রামপদ, নিখিল আর অবিনাশ মধ্য ইংরাজী স্কুলের মাষ্টার, অঙ্ক ইংরাজী আর বাংলার। উপার্জন তাদের যথাক্রমে তেইশ, সাড়ে চব্বিশ আর উনিশ। তিনজনকেই অবশ্য কাগজে কলমে লিখতে হয় বেশী, স্কুলের গ্রানট বজায় রাখার জন্য। ভদ্রতা বজায় রেখে বেঁচে থাকতে প্রাণ তিনজনের বেরিয়ে গেছে। আজ তাদের আড্ডা ভাঙ্গতে অনেক দেরী হয়। রামধনের চালা ডিঙ্গিয়ে দাওয়ায় রোদ এসে পড়ার অনেক পরেও তারা ওঠে না। আবদুলের বাইশ বছরের ছেলে রহমান খবর ছড়ানোর

কাজে বেরিয়ে আবেদন জানিয়ে গেছে, স্কুলটা বন্ধ রাখার চেষ্টা যেন মাষ্টারমশায়রা করেন। স্কুলে যেন তাঁরা না যান আর বটতলার সভায় উপস্থিত থাকেন। স্কুল বন্ধ রাখার, এমন কি স্কুলে না যাবার ক্ষমতা রামপদ, নিখিল আর অবিনাশের নেই, হেরম্বের শ্বশুরের সে স্কুল। কিন্তু মনে মনে তাঁরা টের পান, তাঁদের কিছুই করতে হবে না, স্কুল আপনা থেকেই বন্ধ থাকবে। সে দিনকাল তো আর নেই। স্কুলের আট বছরের ছেলে পর্যন্ত আজ দল বেঁধে স্কুল বন্ধ করার কায়দা জানে।

'যাক বাবা, আজ তাহলে ছুটি!' রামপদ বলেন।

'তারকবাবু না খালি স্কুলে আটকে রাখেন চারটে পর্যন্ত।' বলেন অবিনাশ।

'তারকবাবু স্কুলে ঢুকতে পারেন কি দ্যাখো আগে।' নিখিল বলেন।

সুদেব কম্পাউণ্ডার ডাক্তার, হাতযশ মন্দ নয়। কোন গোলমালে সে কখনো যায় না, কিন্তু নিজের ঘরে আর রোগীর বাড়ীতে সে খানিকটা স্বাধীনচেতা আর স্পষ্টবাদী। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কাউকে খাতির করে কথা কয় না।

'তোমরা দেখছি ছুটি পেয়েই খুশী। ছুটিটাই তোমাদের বড় হল, অ্যাঁ?'

'নিশ্চয়! হেরম্ব ব্যাটা অপঘাতে মরলে ওর অনারে কবে ছুটি পাব দিন গুনছি।'

'তোমরাই তো সায় দিয়েছিলে স্কুলে ধর্মঘট করার জন্যে ভূদেবকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিতে।'

'সায় দিইনি। চুপ করে ছিলাম। মনে মনে বলছিলাম, ওরে শালা তারকবাবু, কবে তোর শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন খাব।'

'সভা করবে বলছে। সভা করে কি হবে?' স্কুলের কেরাণী বলাইচরণ বলে, তার শীর্ণ মুখখানি হতাশায় বাঁকা করে।

'সভাতেই কাজ হয়। সবাই একত্র হয়। আজ কি ভাবছ সেরকম সভা হবে, শুধু দুটো বক্তৃতা আর হাততালি? তৈরী হয়ে আসবে সবাই। ছোঁড়াগুলো কেমন পাগলের মত ছুটাছুটি করছে দেখছ না? সবাইকে ক্ষেপিয়ে তুলছে, তৈরী করছে।'

'তৈরী সবাই হয়েই আছে।'

এদের বুদ্ধিমানের মত প্রাণহীন কথায় আজ প্রাণের স্বাদ এসেছে। চোখের চাউনি একটু উজ্জ্বল, চোখের পাতা একটু চঞ্চল। থেমে থাকার বদলে বুকটা আজ টিক টিক করছে। সুদেবের রোগী আসে, নতুন খবর দেয়, ওষুধ নিয়ে চলে যায়। গাঁয়ের ক্রমবর্ধমান উত্তাপ যেন এই শীতল আসরকে আরেকটু গরম করে দেয়। বুড়ো শ্রীধর প্রায় সিধে হয়ে আশ্চর্য রকম দ্রুতপদে চলছিল পা টেনে টেনে, কাছে এসে শ্বাস টেনে টেনে বলে, 'বীরেশ্বরের মেয়েটা বেরিয়েছে। এলো চুল, চোখ রাঙা, আঁচল উড়িয়ে চেঁচাচ্ছে। একেবার মহিষমর্দিনী মূর্তি। পেটটা যেন উঁচু ঠেকল!'

স্কুলে হাজির হতে হলে এবার ওঠা চাই। নেয়ে খেয়ে যাবার দরকার হবে না, জামাটা গায়ে দিয়ে যাবার পথে বীরেশ্বরের মেয়েটাকে একবার দেখে যাওয়া চলবে। স্কুল যে আজ বসছে না তাতে আর কারো সন্দেহ নেই।

ঘনশ্যামের চাল ডাল তেল নুনের দোকানের সামনে জড়ো হয় চাষী মেয়ে পুরুষ। সওদা কিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপ করে।

লোমশ বুকে হাত বুলাতে বুলাতে মদন বলে, 'মতলব আছে, আরও মতলব আছে।

নয়তো কি এমনি ধরিয়ে দিল ওনাদের? শত্তুর সরাবে সব কটাকে এক এক করে, তদ্দিনে রাস্তা শেষ, তারপর মেয়ে চালান দেবে। রাধা আর বিন্তিকে বেচে লাভ করেছে হাজার হাজার টাকা। করেনি? তবে কি! হাঁঃ।'

মাতু বলে, 'ভরত না বিয়ে করেছে রাধাকে?'

রাধার মায়ের দূর সম্পর্কের কুটুম হীরু ঘোষ ঝাঁঝালো হাসি হেসে বলে, 'মাসীর যেমন মাথা খারাপ। চাকরের সাথে বিয়ে দিতে ও ব্যাটা মেয়ে চুরি করে, না? সব ফাঁকি, চালবাজী—কেউ না নালিশ করতে পারে। মেয়ে চুরির মামলা কর, ভরত বলবে আমার বিয়ে করা বৌ, দশটা লোক সাক্ষী দেবে, হাঁ বিয়ে হয়েছে ঠিক, মন্তর পড়া বিয়ে! নইলে দিতাম না নালিশ ঠুকে রাধার মা যখন কেঁদে এসে পড়লো? দেখে নিতাম না কত বড় বামুনের ছেলে?'

'বামুনের ছেলে এমন হয়, মাগো!'

'হয় না? রাবণ কি ছিল? কুম্ভকর্ণ?'

'আর সয় না বলছি মাইতি মামা, মাইরি। রেত-বিরেতে একলাটি পেলে দিতাম মাথায় লাঠি বসিয়ে, যা থাকে অদেষ্টে।'

নাটু গোঁসাই বিজ্ঞের মত বলে, 'আরে নাঃ, মেয়ে চুরি নয়। মেয়ে তো ফের দেখতে ভাল হওয়া চাই, হেথা হোথা দু'চারটে পেল তো নিল, নয় তো নয়। রাস্তা করবে আরেকটা গাঁয়ের বুক দিয়ে। এ রাস্তা থেকে বার করে সিধে টেনে নিয়ে যাবে সা'পুরের রাস্তায়। সড়ক ছোঁবে না, ফসল জমি বসত বাড়ীর ওপর দিয়ে রাস্তা চালাবে। জলের দামে কিনবে সব, দলিল তৈরী হচ্ছে খপর জানি।'

সকলে স্তব্ধ হয়ে যায়। শঙ্কায় ছোট হয়ে যায় চোখ। এ তো অসম্ভব নয়, এই রাস্তা তৈরীর মধ্যেই তার অনেক প্রমাণ মিলেছে।

ইয়াকুব বলে, 'শুধু রাস্তার পেটে জমি ঘরদোর যাবে। দু'পাশের ক্ষেত থেকে, ঘরের উঠোন থেকে মাটি তুলবে। মোর ক্ষেতের কি করেছে দ্যাখোনি? মাটি তুলবি এক জাগা থেকে তোল, তা না, হেথায় হোথায় খাবলে তুলেছে। জমির দিকে চাইলে চোখে জল আসে।' বলতে বলতে ইয়াকুব কেঁদে ফেলে হু হু করে।

নাটু গোঁসাই আবার বলে, 'আর ট্যাক্‌সো তো আছে। তিনগুণ ট্যাক্‌সো করবে। পুলিশ তাই এখন খাতির করছে ওকে। এ সুযোগ কি ও ছাড়ে—এই সুযোগে সব বাগিয়ে নেবে।'

এই আলোচনার মধ্যে এসে পড়ে দুটি ছেলে, বলে, 'দোকান বন্ধ কর ঘনশ্যাম। আজ হরতাল। বটতলার মাঠে সভা হবে ওবেলা, সবাই যাবে। বাঁচতে যদি চাও, দল বেঁধে সভায় হাজির থেকো। বাঁচতে যদি চাও, উঠে পড়ে লাগো এবার, নইলে সবাই মরবে। তোমাদের বাঁচাতে যারা লড়ছিল, তারা নেই, এবার তোমাদের লড়তে হবে...'

আবদুল হাই বলে, 'না কাদের, হিঁদু মোছলমানের বাত এতে উঠবে না। ঢের মোছলমান মার খেয়েছে। জালালুদ্দীন মিঞার ব্যাপারে মোরা চুপচাপ রইলাম, তাতে একটু বিগড়ে আছে সবাই। এবার জবরদস্তি চলবে না, বারণ ভি করা হবে না। যার খুশী যাক।'

হাফিজ আলি সায় দিয়ে বলে, 'ঠিক বাত। হাঙ্গামা হবে তো উপায় কি!'

আবদুল হাই-এর স্নিগ্ধ মোলায়েম মুখের দিকে চেয়ে কাদেরের বুক একটু কেঁপে যায়। জালালুদ্দীনের বিরুদ্ধে সে সাক্ষী দেয়নি সত্য, বীরেশ্বরের বিরুদ্ধে দিয়েছিল। কিন্তু লোকের মনে যেভাবে এক সাথে মিলে গিয়েছে বীরেশ্বর আর জালালুদ্দীনের নাম, ও পার্থক্যটা কি

খেয়াল থাকবে কারো? ধনা ও মনার সঙ্গে কেউ আর তফাৎ করবে না, তার স্বধর্মীরাও নয়। গাঁয়ের মোছলমানরা যদি তার বিপক্ষে যায়, আবদুল হাই কি আর তার পক্ষ নেবে! কাদের বাড়ী যায়। বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হয় সদরের উদ্দেশে।

শম্ভু এসে রম্ভাকে বলে, 'এমন করে বসে কেন তুমি? কাজের সময় মুখ হাঁড়ি করে বসে থাকতে বুঝি শিখিয়েছিল সূর্যদা?'

'আমি কি করব শম্ভু?'

'তুমি কি করবে! কোমর বেঁধে গাঁয়ে এলে বিহিত করতে, এখন কাজের সময় বলছ তুমি কি করবে! সভায় যেতে হবে তোমায়—কোমর বাঁধো।'

'সভা?'

'কেন, কেষ্টবাবু আর মোহন না থাকলে বুঝি সভা হয় না? দেশে আর লোক নেই? ছোট একটা দল বেরোচ্ছে গাঁ ঘুরতে, আসবে তো চলে এসো। ওবেলা সভায় দাঁড়িয়ে বলতে হবে কি ভাবে তোমার বাপ মরেছে, গাঁয়ের সেটা কতবড় কলঙ্ক। বলতে বলতে কেঁদে ফেললে চলবে না কিন্তু।'

সিধে হয়ে বসে দু'হাতে মুখ থেকে এলোমেলো চুল ঠেলে সরিয়ে দিয়ে রম্ভা বলে, 'গাঁয়ের লোক কি আসবে? যা ভীরু সব ছাগল ভেড়ার মত!'

শম্ভু হেসে বলে, 'ওরাই কেমন সিংহ হয়ে ওঠে দেখো। না, সিংহ নয়, বাঘ। সূর্যদা বলত মনে নেই, বাংলার গাঁয়ে বাঘ থাকে?'

'চলো যাই।' বলে সেই বেশে শম্ভুর সঙ্গে যাবার জন্য রম্ভা উঠে দাঁড়ায়।

ঘরের মধ্যে চৌকীতে বসে মুখে ম্লান বিরস রামপাল রম্ভার দিকে চেয়ে ছিল, তাড়াতাড়ি উঠে এসে করুণ সুরে বলে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'তোমার তা দিয়ে দরকার?' রম্ভা বলে পাক দিয়ে তার দিকে ঘুরে, 'তুমি যাও না, মদের পেসাদ পাওগে হেরম্বের।'

রামপাল কাতর হয়ে বলে, 'কেন ওকথা বলছ একশোবার? আমি কি যেচে গিয়েছি? হীরেনবাবু জোর করে নিয়ে গেল তো আমি কি করব।'

'তুমি কি করবে! তোমার জোর নেই? চেহারাটি তো গুণ্ডার মত।'

'নেশার মাথায় আছি, হীরেনবাবু জোর করলেন—'

রম্ভা খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে রামপালের মুখের দিকে। রামপালের মুখে তার হৃদয়-মনের ছাপ রম্ভার চেনা, লজ্জায় অনুতাপে তার মনটা জ্বলছে স্পষ্টই টের পাওয়া যায়।

'এসো মোদের সাথে। রাস্তায় চেঁচাতে হবে, হেরম্ব নিপাত যাক, হেরম্ব নিপাত যাক। হেরম্ব বন্দুক নিয়ে আসুক, পুলিশ এসে ধরে নিক, থামতে পারবেনি। আসবে? বুকের পাটা আছে?'

রামপাল চুপ করে থাকে। কাল রাত্রের দেশী বিলাতীর প্রতিক্রিয়ায় এখনো তার মাথা অনেকটা ভোঁতা হয়ে আছে। রম্ভা কি ক্ষেপে গেছে? এ গাঁয়ে সে বিদেশী, এ গাঁয়ের সে জামাই, পথে পথে সে হল্লা করবে মাতালের মত, হাঙ্গামা বাধাবে, পুলিশের হাতে পড়বে!

রম্ভা ধিক্কার দিয়ে বলে, 'যাও তুমি, কলকাতা ফিরে যাও। কাঠ চেরগে আর তাঁবেদারি করগে হীরেনবাবুর।'

বলে শম্ভুর সঙ্গে রম্ভা গট গট করে চলে যায়।

জীবনলাল ধীরে ধীরে এসে কাছে দাঁড়ায়।

'তুমি যেন কেমন ধারা লোক বাবু? কি বলে যেতে দিলে ওকে?'

'ওকি আমার কথা শোনে যে আটকাব?'

জীবনলাল আপসোস করে বলে, 'পুরুষমানুষ বৌকে শাসন করতে পার না? চুলে ধরে মারতে পার না দু'গালে তিন চড়? মোদের ডুবিয়ে ছাড়বে এবার। এই কাণ্ড চলছে চাদ্দিকে, রাস্তায় উনি হৈচৈ করতে গেলেন।'

রামপাল জানতে চায় ব্যাপার কি। এ পর্যন্ত সে ঘর থেকে বার হয়নি, রম্ভার কাছে শুধু শুনেছিল কৃষ্ণেন্দু ও মোহনলালের গ্রেপ্তারের কথা। গাঁয়ের উদ্যত উপদ্রব অশান্তির লক্ষণগুলির বিবরণ জীবনলাল তাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে। তাদের বাড়ীর কাছে রাঘব মহান্তি গোড়ায় দোকান বন্ধ করতে না চাওয়ায় ঝাঁপ নামিয়ে তাকে সুদ্ধ বাইরে থেকে দোকান বন্ধ করার কাজে উপস্থিত খদ্দেরদের, চিরদিনের শান্তপ্রকৃতি বয়স্ক লোকদের পর্যন্ত, ছেলে ক'জনের সঙ্গে যোগ দিতে দেখে জীবনলাল রীতিমত ভড়কে গিয়েছে।

'এর মধ্যে একে তুমি যেতে দিলে, ছেলাপিলা হবে মেয়েটার? এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান তোমার নেই?' জীবনলাল ঝাঁঝের সঙ্গে মন্তব্য করে।'

রামপাল ভড়কে গিয়ে বলে, 'বটে নাকি! অ্যাঁ?'

দশবারজনের ছোট একটি দল রম্ভাকে সামনে নিয়ে বার হয়, ঝুমুরিয়া ঘুরে পাঁচনিখের দিকে যাবে। মহীউদ্দীনও সঙ্গে থাকে। সকলের সঙ্গে গলা মিশিয়ে রম্ভা চেঁচায় 'অত্যাচারীরা ধ্বংস হোক!' 'হেরম্বেরা নিপাত যাক!' 'চাষী মজুরের জয় হোক!' সভার কথা ঘোষণা করা হয়। রম্ভার গলা সবচেয়ে বেশী খোলে 'হেরম্বরা নিপাত যাক' বলে চেঁচাতে। রুক্ষ চুল তার এলোমেলো হয়ে আছে, রোদের ঝাঁঝে মুখ হয়েছে ঝামা রঙ, কপালে সিঁদুরের টিপ ঘামে গলে হয়েছে সিঁদুরের ফোঁটা, ডান হাতে সে মুঠো করে ধরে আছে আঁচলের প্রান্ত। গ্রামের লোক সভয় বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, রক্তে অনুভব করে হঠাৎ জাগা চাঞ্চল্য। নতুন লোক জুটে ছোট দলটি ক্রমাগত বড় হয়ে পড়বার উপক্রম ঘটে, মহীউদ্দীন তাদের সরিয়ে দেয়, বলে, 'আমাদের সঙ্গে নয়—সভায় আসবেন, সভায়। অন্যদিকে যান—দশজনকে খবর দিন।'

দলটি উত্তরপাড়া ঘোরা শেষ করেছে রামপাল এসে দলে মিশল। রম্ভার পাশে চলতে চলতে বলল, 'আর না, এবার ফিরে চল। তোমার শরীর ভাল না—'

রম্ভা ভ্রূকুটি করে তাকাল, কথা কইল না।

রামপাল আর কিছু বলতে ভরসা পায় না, নানা কথা ভাবতে ভাবতে দলের সঙ্গে চলতে থাকে। হঠাৎ সে বজ্রনাদে চীৎকার করে ওঠে, 'হেরম্বকে খুন করো! হেরম্বকে খুন করো!'

'আরে! আরে! আরে!' মহীউদ্দীন ধমকে ওঠে, 'কি করছ তুমি? কি বলছ পাগলার মত?'

রামপাল অসহায়ের মত রম্ভার দিকে তাকায়। 'তুমি যে বললে?'

'আমি ওকথা বলতে বলছি? আমরা কি বলছি শুনতে পাও না, হেরম্বরা নিপাত যাক?'

'ও, হাঁ। ভুলে গেছিলাম।' রামপাল সলজ্জভাবে হাসে, 'মাথার কি ঠিক আছে ছাই। ছেলাপিলা হবে তোমার, তুমি এ রোদের মধ্যে—'

আবার রম্ভার ভ্রূকুটি দেখে রামপাল থেমে যায়।

পাঁচনিখে পৌঁছে রম্ভার শরীর একটু অস্থির অস্থির করতে থাকে, তলপেটে একটা এই

আছে এই নাই অস্বস্তি পাক দিয়ে ঠেলে উঠতে চায়। মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করে। রোদের তেজ বাড়তে বাড়তে তখন মাথার তালু পুড়িয়ে দিচ্ছে, রাস্তা গরম হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ থেকে জোরালো হাওয়া না বইলে সকলে তারা আরও বেশী কাবু হয়ে পড়ত। পাঁচনিখের থানার কাছাকাছি রস্তার হঠাৎ এত জোরে বমি ঠেলে ওঠে যে সে সামলাতে পারে না। পথের ধারে একটা তেঁতুল গাছের নীচে সে বমি করতে বসে।

চুনকাম করা সাদা দেয়াল থানার, খড়ের পুরু চালা। সামনে কাঁকর বিছানো পথে দু'ভাগ করা ছোটি বাগান, তাতে সযত্নে সাজানো ফুলের গাছ। দু'ঘণ্টা আগে একটা রিপোর্ট লিখতে বসে শৈলেন দাস আর চেয়ার ছেড়ে ওঠেনি। সামনে মাত্র কয়েকলাইন লেখা রিপোর্টটা পড়ে আছে। তার উপরে খোলা ফাউনটেন পেন। পেনটি শৈলেন স্ত্রীকে উপহার দিয়েছিল কিন্তু থার্ড ক্লাসের বিদ্যা নিয়েও কল্যাণী মাসে অতিকষ্টে দু'খানার বেশী চিঠি কখনো লেখে না। কলমটা তাই শৈলেন নিজেই ব্যবহার করে। রিপোর্ট লিখতে আজ তার মন বসছিল না। বিরক্তি আর বিষাদ মেশানো তিক্ততা তাকে উম্মনা করে রেখেছে। মন ভার, বুকে একটা অনির্দিষ্ট নালিশের জ্বালা, কার বা কিসের বিরুদ্ধে জানা নেই। দু'বছর প্রমোশন বন্ধ। জীবনে বুঝি কিছু করা গেল না। কলেজ জীবনের কথা শৈলেনের মনে পড়ে। ভেসে আসে বন্ধুদের কথা, আদর্শের তর্ক, উত্তেজনা, আনন্দ, বিষাদ ও স্বপ্ন। চারিদিক থেকে নানা খবর এসে পৌঁছয়। কল্পনায় অতীত জীবনের বন্ধুরা সারি দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বলে, আয়, খবর নিয়ে খেলা করি।

মহীউদ্দীনের দলের আওয়াজ দূর থেকে কানে আসে। সে উৎকর্ণ হয়ে থাকে। কি করা যায়। হে ভগবান, কি করা যায়। আবার কেন? শেষ হয়ে সব চুকে বুকে যেতে পারে না একেবারে?

জমাদার এসে বলে, 'হুজুর?' নাঃ, চারিদিক বিবেচনা করে কাজ করতে হবে। মন খারাপ করলেও চলবে না, মাথা গরম করলেও চলবে না।

'কেতনা আদমি?'

'পন্দরো হোগা।'

'ঠিক হায়। যানে দেও।'

কাছাকাছি এসে আওয়াজ থেমে যাওয়ায় খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে শৈলেন বাইরে গিয়ে কনেস্টবল ধরণীকে জিজ্ঞাসা করে 'ফিরে গেল?'

'আজ্ঞে না। সঙ্গে একটা মাগী ছিল, বমি করছে। বীরেশ্বরের মেয়ে।'

হঠাৎ কেন রাগ হয়ে গেল শৈলেন জানে না। সজোরে সে এক চপেটাঘাত বসিয়ে দিল ধরণীর গালে।

'মাগী কিরে শূয়ার?'

দুপুরে হেরম্ব এল।

'সভাটার ব্যবস্থা করতে হবে শৈলেনবাবু!'

নোটের তাড়াটা মুঠো করে শৈলেন বলে, 'সে তো এমনিও করব ওমনিও করব। কেন মিছিমিছি—'

হেরম্ব সবিনয়ে হাসে, 'কি যে বলেন!'

একটু সুস্থ হলে রম্ভা বলে, 'তোমরা এগোও। আমি একটু জিরিয়ে—'

শম্ভু জোর দিয়ে বলে, 'বাড়ী ফিরবে। একটা গাড়ী পেলে হত।'

মহীউদ্দীনও সায় দেয়, জোর দিয়ে বলে, 'তোমার আর আসতে হবে না। তুমি বাড়ী ফিরে যাও।'

রম্ভা বলে, 'আচ্ছা। তোমরা তবে এগোও শম্ভু, আমি ওর সাথে ফিরে যাব। গাড়ী দরকার হবে না।'

তেঁতুল গাছের ছায়ায় রম্ভা ও রামপালকে রেখে অন্য সকলে এগিয়ে যায়। দূরের সমুদ্রের বাতাস গাছের পাতায় ঝিরঝির আওয়াজ তুলে বইতে থাকে, রম্ভার শরীর ধীরে ধীরে জুড়িয়ে আসে। রামপাল চুপচাপ বিড়ি টানে, গম্ভীর মুখে মাঝে মাঝে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাব দিকে তাকায়। দেহমনে জুত পেলে রম্ভা একটু হাসে তার দিকে চেয়ে।

'বলিসনি যে আমায়?' গভীর অভিমানে রামপাল অনুযোগ দেয়।

'বলতে হবে কেন? চোখ নেই কো তোমার?'

রম্ভার সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে রামপাল শুধোয়, 'ক' মাস?'

'তিনমাস চারমাস, কে জানে বাবা, অত কে জানে!'

'বললাম এ রোদে বেরোস নি, বেরোস নি। গোঁয়ার মেয়ে বটে তুমি। হল ত এবার?'

রম্ভা তবু হাসে, 'কি হল? একটু বমি হল তো কি। ও সবার হয়।'

শম্ভুরা একটা গরুর গাড়ী পাঠিয়েছিল, গাড়ী এসে পৌঁছবার আগেই দুজনে উঠে চলতে আরম্ভ করে। রামপালের গাড়ী সংগ্রহ করে আনার কথা রম্ভা কানেও তোলে না। চলতে চলতে রম্ভা টের পায়, তাকে নিয়ে চারিদিকে বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে মেয়েলি চোখ উঁকি দেয়, বাইরে পুরুষেরা চোখ বড় বড় করে তাকে দ্যাখে। এ ওর গা টিপে তাকে দেখিয়ে দেয়, আড়দৃষ্টি তার পানে রেখে কথা বলাবলি করে নিজেদের মধ্যে। হাসাহাসিও চলে এখানে ওখানে, তবে তাদের সংখ্যা খুব কম। কৌতূহল, বিস্ময় আর উত্তেজনাই বেশী।

ঝুমুরিয়ার রঘু সামন্তের বাড়ীর সামনে অনাথকে ঘিরে কয়েকজন জটলা করছিল তিরিশ থেকে বিশ বছরের সব ছোকরা। রম্ভাকে দেখেই তাদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়, আরম্ভ হয় অভদ্ররকমের হাসাহাসি আর মন্তব্য—রম্ভা আর রামপাল কাছে এলে তারা যাতে শুনতে পায় এত জোরে। রামপাল থমকে দাঁড়াতে রম্ভা তার হাত চেপে ধরে জোর করে টেনে এগিয়ে যায়। এখানে একজন সুর করে গান ধরে, 'রম্ভা দিদিলো—'

গান তার শুরুতেই আচমকা থেমে যায়।

নরেশের হাতের মস্ত এক মাটির চাপড়া তার মুখে এসে লেগে গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নরেশ যে কখন তাদের পিছু নিয়েছিল রম্ভা বা রামপাল টেরও পায়নি।

নরেশের দিকে তেড়ে যেতে গিয়ে অনাথের দল সামনে পড়ে রামপালের। দু'জনের ঘাড় শক্ত করে ধরে রামপাল অন্যদের দিকে সজোরে ঠেলে দেয়, সেই ধাক্কায় পাঁচজন আছাড় খেয়ে পড়ে রাস্তায়। উঠে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে নাগালের বাইরে গিয়ে তারা গাল দিতে আর শাসাতে শুরু করে।

কিছুক্ষণের মধ্যে চারিদিকে রটে যায় যে ঘোষপাড়ায় দাঙ্গা হয়ে গেছে। হেরম্বের লোকেরা রম্ভাকে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, পাড়ার লোক মিলে তাদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

এত তাড়াতাড়ি গুজবটা ছড়ায় যে রম্ভারা বাড়ী পৌঁছানোর আগেই হাঙ্গামার খবরটা সেখানে পৌঁছে যায়। জীবনলাল রাগে ফোঁস ফোঁস করছিল, রম্ভা বাড়ীতে পা দেওয়া মাত্র সে চীৎকার করে ওঠে, 'বাড়ী ঢুকছিস লজ্জা করে না? বেরো তুই, বেরো বাড়ী থেকে।'

শ্যামলাল ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে, 'আঃ, মাথা গরম করছ কেন?'

জীবনলালের তখন চৈতন্য হয় যে রম্ভার মত বোনকে চটানো সঙ্গত নয়, পিছনে তার অনেক শক্তিশালী লোক আছে। রম্ভার সঙ্গে সে গোলমাল করেছে ফিরে এসে একথা শুনলে মোহনলালও কি করে বসবে ঠিক নেই। রম্ভাও যদি গাঁয়ের কটা গুণ্ডা ছোড়াকে লেলিয়ে দেয় তার পিছনে! একেবারে সুর বদলে সে তাই বড় ভায়ের সস্নেহ অনুযোগ জানায়, 'দ্যাখ দিকি তুই কি আরম্ভ করেছিস। গাঁয়ে মুখ দেখাবার উপায় রাখলি না।'

শ্যামলালের বৌ মন্তব্য করে একটু তফাৎ থেকে, 'কি সব অনাছিষ্টি কাণ্ড বাবু গেরস্ত ঘরে! বাপের জম্মে এমনটি দেখি নি আর!'

রম্ভা নাক সিঁটকে জবাব দেয়, 'বাপের জম্মে দেখবে কিসে, কেমন বাপে জম্ম দিয়েছে সেটা তো দেখতে হবে।'

বৌ গলা ছাড়া মাত্র শ্যামলাল ধমকে তাকে থামিয়ে দেয়, রম্ভাকে মিনতি করে বলে, 'যা না দিদি তুই এবার কলকাতা ফিরে? রেহাই দে মোদের?'

রম্ভা বলে, 'যাব গো, যাব। থাকতে আসিনি তোমাদের বাড়ী। আজ কালের মধ্যেই যাব, তোমাদের বাপের মরণের একটা বিহিত করে!'

দুপুর থেকেই লোক আসতে শুরু করে বটতলার মাঠে। চড়া রোদকে অগ্রাহ্য করে দুক্রোশ পথ হেঁটে এসে মানুষ প্রকাণ্ড বটগাছটার ঘন ছায়ায় বসে ঘাড় মুছে গামছা নেড়ে হাওয়া খায়। গোড়ায় দু'চারজন, তারপর বেলা একটু পড়ে এলে পিলপিল করে চারিদিকের গাঁ থেকে মানুষ আসা আরম্ভ হয়। অপরাহ্নে লোকারণ্য হয়ে ওঠে বটতলার মাঠ। বড় মেলায় এরকম জনতা হয়, ঝুমুরিয়ায় আজ পর্যন্ত কোন সভায় এত লোক জমতে কেউ দ্যাখেনি, উত্তেজিত মানুষের এমন ভিড়। ভীরু ও দুর্বল একক মনে সমধর্মী মানুষের বিরাট সান্নিধ্য তেজস্কর সঞ্জীবনীর কাজ করে, ভীরুতা দুর্বলতা চাপা পড়ে জাগে বেপরোয়া সাহস।

মহীউদ্দীন, শম্ভু এরাও এতটা ভাবতে পারেনি। লোক যথেষ্ট হবে এটা তারা জানত কিন্তু এমন ভিড় হবে আর আগে থেকেই সকলে এত গরম হয়ে থাকবে, এটা তাদের ধারণার বাইরে ছিল! তারা ক'জন সতর্ক হবার প্রয়োজন অনুভব করে। অন্য কর্মীদের সাবধান করে দেয়। দুরন্ত, অদম্য উল্লাসে রম্ভা এবং আরো অনেকের রক্তে যেন আগুন ধরে যায়। রামপালের লড়ায়ের কামনা উগ্র হয়ে ওঠে, কাঠগোলার হাঙ্গামার দিন যতটুকু হয়েছিল তার শতগুণ বেশী।

শৈলেনও এটা ভাবতে পারেনি। জনতার দিকে তাকিয়ে, বিশৃঙ্খলা কমিয়ে জনতাকে সংযত করতে অপটু অনভিজ্ঞ মহীউদ্দীন শম্ভুদের গলদঘর্ম হতে দেখে, তার মুখ শুকিয়ে যায়। সে প্রস্তুত হয়েই এসেছে, কিন্তু এ অবস্থার জন্য নয়। এই জনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসবার ক্ষমতাও তার নেই, আগে জানলে সদরে খবর পাঠিয়ে ব্যবস্থা করতে পারত। তার সময়ও আর নেই। শৈলেন বুঝতে পারে, একেবারে নিষ্ক্রিয় থেকে কোন মতে সভাটা হয়ে যেতে দেওয়াই এখন শ্রেয়, আর কোন উপায় নেই। সমবেত এই জনশক্তিকে একটু ঘাঁটাতে গেলেই আজ বিপদ হবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না। মহীউদ্দীন আর শম্ভুরাই একমাত্র ভরসা,

...পারে ওরাই এদের সামলাতে পারবে।

তাড়াতাড়ি একটা চিঠি লিখে সে হেরম্বের কাছে পাঠিয়ে দেয়। অবস্থা গুরুতর, হেরম্ব ...যেন তৎক্ষণাৎ তার লোকদের সভায় হাঙ্গামা বাধাতে বারণ করে, নির্দেশ পাঠায়, নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

চিঠি পড়ে হেরম্ব মনে মনে হাসে। শৈলেন ভয় পেয়ে গেছে? গুরুতর হাঙ্গামাই তো সে চায়! হাঙ্গামা হোক, লাঠি আর গুলি চলুক, গণ্ডায় গণ্ডায় জখম হোক আর মরুক, শৈলেন ...র দু'চারটে পুলিশ যদি খুন হয় তো আরো ভাল, পুলিশে গাঁ ছেয়ে যাক, দলে দলে ধরা পড়ুক, এমন শিক্ষা পাক যেন চিরদিনের জন্য বাছাধনেরা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, মাথা তুলতে আর সাহস না পায়।

বটতলার মাঠ থেকে হাজার কণ্ঠের জয়ধ্বনি অস্পষ্ট ভেসে আসে। ভরা বন্দুকের মসৃণ ...লে হাত বুলিয়ে হেরম্ব গ্লাস মুখে তোলে।

সূর্য যখন ডুবু ডুবু, হেরম্বেরই গাঁইতি কোদাল শাবল দিয়ে তৈরী রাস্তা খোঁড়া আরম্ভ হল, পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল তার লরী আর তাঁবুতে, বন্দুকের গুলি খেয়ে হেরম্বের হাতের বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে রামপাল মরে গেল, হেরম্বকে বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে পোড়ানো হল তার বাড়ীর দক্ষিণের চালাঘরের আগুনে। সন্ধ্যার অন্ধকারে আগুন ধরল বীরেশ্বরের ও ঝুমুরিয়ার আর পাঁচটি বাড়ীর চালায়। একদল লোক গিয়ে পাঁচনিখের থানা পুড়িয়ে এল। শৈলেন আগেই বটতলার মাঠে মারা গিয়েছিল। সভায় আরও মরেছিল— তেরোজন লোক আর দু'জন পুলিশ। তার মধ্যে ছিল জগৎ দাসের ছেলে শিশু। জখম হয়েছিল বহুলোক।—

দু'দিন পরে আরিফ ও মমতা ঝুমুরিয়া স্টেশনে নামল। নরেশের খোঁজ নিতে পরেশ এবং কৃষ্ণেন্দুর খোঁজ নিতে পূর্ণেন্দু তাদের সঙ্গে এসেছে। ঝুমুরিয়া ও আশেপাশের গাঁয়ের কয়েকজন সদরের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করছিল, বাপ দাদা ভাই ছেলের জামিনের জন্য সদরে গিয়ে চেষ্টা করবে। তাদের মুখ ম্লান, বিষণ্ণ।

'মিছে যাচ্ছেন। বাইরের লোককে গাঁয়ে যেতে দিচ্ছে না।'

আরিফ বলে, 'দেখি চেষ্টা করে।'

কাগজে সংক্ষেপে খবর বেরিয়েছিল, ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ এদের কাছে জানা গেল।

মমতা বলল, 'ইস! কেষ্টদা থাকলে এসব কিছুই হত না, কেষ্টদা সামলে নিতে পারত।'

'আমরাও তাই বলি। কৃষ্ণেন্দুবাবু আর মোহনলাল গাঁয়ে থাকলে এ কাণ্ড হত না। লোক উঠল ক্ষেপে, গাঁয়ে একটা যোগ্য লোক নেই, কে তাদের সামলায়?'

মমতা শুধোয়, 'রম্ভার খবর জানেন কেউ? বীরেশ্বরের মেয়ে রম্ভা?'

'তাকে ধরে নিয়েছে। জেল হবে ক'বছর।'

পরেশ শুধোয়, 'নরেশ বলে একটি ছেলে এসেছিল কলকাতা থেকে—'

'হাঁ, বীরেশ্বরের ঘরে ছিল। তার কোন পাত্তা নেই আজ তক।'

'মারা গেছে?'

'মারা গেলে তো জানা যেত, দেহটা থাকত। ছেলেটা একেবারে নিখোঁজ। সদরের গাড়ী চলে গেলে লাল কাঁকর বিছানো প্ল্যাটফর্মে চারজন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দূরে বাঁক ঘুরে

ট্রেন অদৃশ্য হয়ে যায়। গাড়ী থেকে যে কজন নেমেছিল, স্টেশন থেকে বেরিয়ে তারাও চোখের আড়াল হয়। ওরা কোন্ গাঁয়ে যাবে কে জানে।

গল্প

বর্ষাকালেই ভয়ানক কষ্ট হয়।

ঘরের চালটা একেবারে ঝাঁঝরা হইয়া গিয়াছে।

কিছু নারিকেল আর তাল-পাতা মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়াই কুড়াইয়া সংগ্রহ করা গিয়াছিল। চালের উপর সেগুলি বিছাইয়া দিয়া কোন লাভ হয় নাই। বৃষ্টি নামিলেই ঘরের মধ্যে সর্বত্র জল পড়ে।

বিছানাটা গুটাইয়া ফেলিতে হয়, ভাঙ্গা বাক্স-পেঁটরা কয়টা এ কোণে টানিয়া আনিতে হয়, জামা-কাপড়গুলি দড়ি হইতে টানিয়া নামাইয়া পুঁটলি করিয়া, কোথায় রাখিলে যে ভিজিবে কম, তাই নিয়া মাথা ঘামাইতে হয়।

বড় ছেলেটা কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে। আদর করিয়া তাহার কান্না থামানো যায় না, ধমক দিলে কান্না বাড়ে। মেয়েটা বড় হইয়াছে, কাঁদে না ; কিন্তু ওদিকের দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া এমন করিয়াই চাহিয়া থাকে যে নীলমণির ইচ্ছা হয় চড় মারিয়া ওকেও সে কাঁদাইয়া দেয়। এতক্ষণ ঘুমাইবার পর এক ঘণ্টা জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইল বলিয়া ও কি চাহনি? আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে, ঘরের চাল সাত বছর মেরামত হয় নাই। ঘরের মধ্যে জল পড়াটা নীলমণির এমন কি অপরাধ যে মেয়েটা তাকে ও-রকম ভাবে নিঃশব্দে গঞ্জনা দিবে?

ছোটছেলেটাকে বুকের মধ্যে লুকাইয়া নিভা একবার এধার একবার ওধার করিয়া বেড়াইতেছিল।

হঠাৎ বলিল, ওগো, ছাতিটা একবার ধরো, একেবারে ভিজে গেল যে! লক্ষ্মী, ধরো একবার ছাতিটা খুলে। ওরও কি শেষে নিম্যুনিয়া হবে?

নীলমণি বলিল, হয় তো হবে। বাঁচবে।

নিভা বলিল, বালাই ষাট। —শ্যামা, তুইও তো ধরতে পারিস ছাতিটা একটু?

শ্যামা নীরবে ভাঙ্গা ছাতিটা নিভার মাথার উপর ধরিল। ছাতি মেলিবার বাতাসে প্রদীপের শিখাটা কাঁপিয়া গেল। প্রদীপে তেল পুড়িতেছে। অপচয়! কিন্তু উপায় নাই। চাল-ভেদ-করা বাদলে ঘর যখন ভাসিয়া যাইতেছে তখনকার বিপদে প্রদীপের আলোর একান্ত প্রয়োজন। জিনিসপত্র নিয়া মানুষগুলি একোণ-ওকোণ করিবে কেমন করিয়া?

একছিলিম তামাক দে শ্যামা। নীলমণি হুকুম দিল।

শ্যামা বলিল, ছাতিটা ধর তবে?

নীলমণি আকাশের বজ্রের মত ধমকাইয়া উঠিল, ফেলে দে ছাতি, চুলোয় গুঁজে দে। আমি ছাতি ধরব তবে উনি তামাক সাজবেন, হারামজাদি!

তামাক অবিলম্বেই হাতের কাছে আগাইয়া আসিল। ঘরের পশ্চিম কোণ দিয়া কলের জলের মত মোটা ধারায় জল পড়িয়া ইতিমধ্যেই একটা বালতি ভরিয়া গিয়াছে। সেই জলে হাত ধুইয়া শ্যামা বলিল, তামাক আর একটুখানি আছে বাবা।

দুঃসংবাদ!

এত বড় দুঃসংবাদ-প্রদানকারিণীকে একটা গাল দিবার ইচ্ছা নীলমণিকে অতি কষ্টে চাপিয়া যাইতে হইল।

নীলমণি ভাবিল বিনা তামাকে এই গভীর রাত্রির লড়াই জিতিব কেমন করিয়া? ছেলের

কান্না দুই কানে তীরের ফলার মত বিঁধিয়া চলিবে, মেয়েটার মুখের চাহনি লঙ্কাবাটার মত সারাক্ষণ মুখে লাগিয়া থাকিবে, নিমুনিয়ার সঙ্গে নিভার ব্যাকুল কলহ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে শিহরিয়া শিহরিয়া মনে হইবে বাঁচিয়া থাকাটা শুধু আজ এবং কাল নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে নিষ্প্রয়োজন,—আর ঘরে এখন তামাক আছে একটুখানি!

তামাক আনানো হয় নাই কেন জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া নীলমণি চুপ করিয়া রহিল। প্রশ্ন করা অনর্থক, জবাব সে পরশু হইতে নিজেই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে—পয়সা নাই। ছেলেটা বিকালে এক পয়সার মুড়ি খাইতে পায় নাই—তামাকের পয়সা কোথা হইতে আসিবে! নিজে গেলে হয়তো দোকান হইতে ধার আনিতে পারিত, কিন্তু—

নীলমণি খুশী হয়। এতক্ষণে ছুতা পাওয়া গিয়াছে।

তামাক নেই বিকেলে বলিসনি কেন?

আমি দেখিনি বাবা।

দেখিনি বাবা! কেন দেখোনি বাবা? চোখের মাথা খেয়েছিলে?

তুমি নিজে সেজেছিলে যে? সারাদিন আমি একবারও তামাক সাজিনি বাবা!

তা সাজবে কেন? বাপের জন্য তামাক সাজলে সোনার অঙ্গ তোমার ক্ষয়ে যাবে যে!

নীলমণির কান্না আসিতেছিল। মুখ ফিরাইয়া সহসা উদগত অশ্রু সে দমন করিয়া লইল। না আছে তামাক না থাক। পৃথিবীতে তার কী-ই বা আছে যে তামাক খাইলেই সব দুঃখ দূর হইয়া যাইত!

বাহিরে যেন অবিরল ধারে জল পড়িতেছে না, ঘরের বায়ু যেন সাহারা হইতে আসিয়াছে, নীলমণির চোখ-মুখ এত জ্বালা করিতেছিল। খানিকক্ষণ হইতে তাহার হাঁটুর উপর বড় বড় ফোঁটায় জল পড়িতেছিল—টপ্ টপ্। অঞ্জলি পাতিয়া নীলমণি গুনিয়া গুনিয়া জলের ফোঁটাগুলি ধরিতে লাগিল। সিদ্ধ করা চামড়ার মত ফ্যাকাশে ঠোঁট নাড়িয়া সে কি বলিল, ঘরের কেহই তাহা শুনিতে পাইল না। ছেলেমানুষের মত তাহার জলের ফোঁটা সঞ্চয় করার খেলাটাও কেহ চাহিয়া দেখিল না। কিন্তু হাতে খানিকটা জল জমিলে তাই দিয়া মুখ ধুইতে গিয়া নীলমণি ধরা পড়িয়া গেল।

নিভা ও শ্যামা প্রতিবাদ করিল দুজনেই।

শ্যামা বলিল, ও কি করছ বাবা?

নিভা বলিল, পচা গলা চাল-ধোয়া জল, হ্যাঁগা, ঘেন্নাও কি নেই তোমার?

নীলমণি হঠাৎ একটু হাসিয়া বলিল, হোক না পচা জল। চাল-ধোয়া জল তো! এও হয় তো কাল জুটবে না নিভা!

ইহাকে সূক্ষ্ম রসিকতা মনে করিয়া নীলমণি নিজের মনে একটু গর্ব অনুভব করিল। এমন অবস্থাতেও রসিকতা করিতে পারে, মনের জোর তো তার সহজ নয়। ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া আনিযা নিভার মুখের দিকে পুনরায় চাহিতে গিয়া কিন্তু তার হাসি ফুটিল না। নিভার দৃষ্টির নির্মমতা তাকে আঘাত করিল।

অবিকল শ্যামার মত চাহিয়া আছে! এত দুঃখ, এত দুর্ভাবনা ওব চোখের দৃষ্টিকে কোমল করিতে পারে নাই, উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই, রূঢ় ভর্ৎসনা আর নিঃশব্দ অসহায় নালিশে ভরিয়া রাখিয়াছে।

নীলমণি মুষড়াইয়া পড়িল।

সব অপরাধ তার। সে ইচ্ছা করিয়া নিজের স্বাস্থ্য ও কার্যক্ষমতা নষ্ট কবিয়াছে, খাদ্যের

প্রাচুর্যে পরিতুষ্ট পৃথিবীতে নিজের গৃহকোণে সে সাধ করিয়া দুর্ভিক্ষ আনিয়াছে, ঘরের চাল পচাইয়া ফুটা করিয়াছে সে, তারই ইচ্ছাতে রাতদুপুরে মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে। শুধু তাই নয়। ওদের সমস্ত দুঃখ দূর করিবার মন্ত্র সে জানে। মুখে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া হোক, মনে মনে নিঃশব্দে হোক, ফুস মন্তরটি একবার আওড়াইয়া দিলেই তার এই ভাঙ্গা ঘর সরকারদের পাকা দালান হইয়া যায়, আর ঘরের কোণার ওই ভাঙ্গা বাক্সটা চোখের পলকে মস্ত লোহার সিন্দুক হইয়া ভিতরে টাকা ঝম্‌ঝম্‌ করিতে থাকে, —টাকার ঝমঝমানিতে বৃষ্টির ঝমঝমানি কোনমতেই আর শুনিবার উপায় থাকে না।

কিন্তু মন্ত্রটা সে ইচ্ছা করিয়া বলিতেছে না।

ঘণ্টাখানেক এমনি ভাবে কাটিয়া গেল।

নিভা এক সময় জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁগা, রাত কত?

তা হবে, দুটো তিনটে হবে।

একটা কিছু ব্যবস্থা কর? সারারাত জল না ধরলে এমনি বসে বসে ভিজব?

বসে ভিজতে কষ্ট হয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজো।

নিভা আর কিছু বলিল না। ছেঁড়া আলোয়ানটি দিয়া কোলের শিশুকে আরও ভাল করিয়া ঢাকিয়া রুক্ষ চুলের উপর খসিয়া-পড়া ঘোমটাটি তুলিয়া দিল। স্বামীর কাছে মাথায় কাপড় দেওয়ার অভ্যাস সে এখনো কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

ছাতি ধরিয়া আর দাঁড়াইতে না পারিয়া শ্যামা তার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল, মধ্যে মধ্যে তার শিহরণটা নিভা টের পাইতে লাগিল।

কাঁপছিস কেন শ্যামা? শীত করছে?

শ্যামা কথা বলিল না। একটু মাথা নাড়িল মাত্র।

নিভা বলিল, তবে ভাল করেই ছাতিটা ধর বাবু, খোকার গায়ে ছিটে লাগছে।

আঁচল দিয়া সে খোকার মুখ মুছিয়া লইল। ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া আপন মনে বলিল, কত জন্ম পাপ করেছিলাম, এই তার শাস্তি।

নীলমণি শুনিতে পাইল, কিন্তু কিছু বলিল না। মন তার সজাগ, নির্মম ভাবে সজাগ, কিন্তু চোখের পাতা দিয়া দুই চোখকে সে অর্ধেক আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। দেখিলে মনে হয়, একান্ত নির্বিকার চিত্তেই সে ঝিমাইতেছে।

কিন্তু নীলমণি সবই দেখিতে পায়। তার স্তিমিত দৃষ্টিতে নিভার মুখ তেরচা হইয়া বাঁকিয়া যায়, প্রদীপের শিখাটা ফুলিয়া ফাঁপিয়া ওঠে, দেয়ালের গায়ে ছায়াগুলি সহসা জীবন পাইয়া দুলিয়া উঠিতে সুরু করে। মুখ না ফিরাইয়াই নীলমণি দেখিতে পায়, ঘরের ও-কোণে গুটাইয়া রাখা বিছানার উপর উপুড় হইয়া নিমু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিরক্তির তার সীমা থাকে না। তার মনে হয় ছেলেটা তাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। দুই পা মেঝের জলস্রোতে প্রসারিত করিয়া দিয়া আকাশের গলিত মেঘে অর্ধেকটা শরীর ভিজাইতে ভিজাইতে ওইটুকু ছেলের অমন করিয়া ঘুমাইয়া পড়ার আর কি মনে হয়? এর চেয়ে ও যদি নাকী সুরে টানিয়া টানিয়া শেষ পর্যন্ত কাঁদিতে থাকিত তাও নীলমণির ভাল ছিল। এ সহ্য হয় না। সন্ধ্যায় ও পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই; ক্ষুধার জ্বালায় মাকে বিরক্ত করিয়া পিঠের জ্বালায় চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ঘুমাইয়াছিল। হয়তো ওর রূপকথার পোষা বিড়ালটি এই বাদলে রাজবাড়ির ভাল ভাল খাবার ওকে চুরি করিয়া আনিয়া দিতে পারে নাই। হয়তো ঘুমের মধ্যেই ওর গালে

চোখের জলের শুকনো দাগ আবার চোখের জলে ভিজিয়া গিয়াছিল। এত রাত্রে দুঃখের এই প্রকৃত বন্যায় ভাসিতে ভাসিতে ও তবে ঘুমায় কোন্ হিসাবে?

নিমুকে তুলে দে তো শ্যামা।

নিভা প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কেন, তুলবে কেন? ঘুমাচ্ছে ঘুমোক।

ঘুমোচ্ছে না ছাই। ইয়ার্কি দিচ্ছে। ঢং করছে।

হ্যাঁ, ইয়ার্কি দিচ্ছে! ঢং করছে! যেমন কথা তোমার! ঢং করার মত সুখেই আছে কি না।

আধঢাকা চোখ নীলমণি একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলিল। ওরা যা খুশী করুক, যা খুশী বলুক। সে আর কথাটি কহিবে না।

খানিক পরে নিভা বলিল, দেখো, এমন করে আর তো থাকা যায় না। সরকারদের বাইরের ঘরটাতে উঠিগে চলো।

নীলমণি চোখ না খুলিয়াই বলিল, না।

নিভা রাগ করিয়া বলিল, তুমি যেতে না চাও থাকো আমি ওদের নিয়ে যাচ্ছি।

নীলমণি চোখ মেলিয়া চাহিল।

না—যেতে পাবে না। ওরা ছোটলোক। সেবার কি বলেছিল মনে নেই?

বললে আর করছ কি শুনি? রাতদুপুরে বিরক্ত করলে অমন সবাই বলে থাকে।

নীলমণি ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, বলে থাকে? রাতদুপুরে বিপদে পড়ে মানুষ আশ্রয় নিতে গেলে বলে থাকে,—এ কি জ্বালাতন? ওইটুকু শিশুর জন্য একটু শুকনো ন্যাকড়া চাইলে বলে থাকে কাপড়-জামা সব ভিজে? ময়লা হবার ভয়ে ফরাস তুলে নিয়ে ছেঁড়া সতরঞ্চি অতিথিকে পেতে দেয়?—যেতে হবে না। বাস।

নিভা অনেক সহ্য করিয়াছে। এবার তার মাথা গরম হইয়া গেল।

ছেলে মেয়ে বৌকে বর্ষাবাদলে মাথা গুঁজবার ঠাঁই দিতে পারে না, অত মান-অপমান জ্ঞান কি জন্যে? আজ বাদে কাল ভিক্ষে করতে হবে না?

নীলমণি বলিল, চুপ।

এক ধমকেই নিভা অনেকখানি ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

চুপ করেই আছি চিরটা কাল। অন্য মানুষ হলে—

হাতের কাছে ঘটিটা তুলিয়া নীলমণি বলিল, চুপ। একদম চুপ। আর একটি কথা কইলে খুন করে ফেলব।

কথা কেউ বলছে না! নিভা একেবারে নিবিয়া গেল।

শ্যামা ঢুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, বাপের গর্জনে সে চমকাইয়া সজাগ হইয়া উঠিল। কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল, মা, ভুলু দরজা আঁচড়াচ্ছে।

গরীবের মেয়ে, হা ঘরের বৌ, নিভার মেরুদণ্ড বলিতে কিছু অবশিষ্ট ছিল না, কিন্তু তার বদলে যা ছিল, নিরপরাধ মেয়ের উপর ঝাঁঝিয়া উঠিবার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

আঁচড়াচ্ছে তো কি হবে? কোলে তুলে নিয়ে এসে নাচো!—ভালো করে ছাতি ধরে থাক শ্যামা, মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেব!

নীলমণি বলিল, আমার লাঠিটা কই রে?

শ্যামার মুখ পাংশু হইয়া গেল। সে মিনতি করিয়া বলিল, মেরো না বাবা। দরজা না খুললে ও আপনিই চলে যাবে।

তোকে মাতব্বরি করতে হবে না, বুঝলি? চুপ করে থাক।

বাঁ পাটি আংশিক ভাবে অবশ, হাতে ভর দিয়া নীলমণি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের কোণায় তার মোটা বাঁশের লাঠিটি ঠেস দেওয়া ছিল, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গিয়া লাঠিটা সে আয়ত্ত করিল। উঠানবাসী লোমহীন নির্জীব কুকুরটার উপর তার সহসা এত রাগ হইয়া গেল কেন কে জানে ! বেচারী খাইতে পায় না, কিন্তু প্রায়ই অদৃষ্টে প্রহার জোটে, তবু সে এখানেই পড়িয়া থাকে, সারারাত শিয়াল তাড়ায়। শ্যামা একটু করুণার চোখে না দেখিলে এত দিনে ওর অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া যাইত। কিন্তু নীলমণি কুকুরটাকে দেখিতে পারে না। ধুঁকিতে ধুঁকিতে লাথি ঝাঁটা খাইয়া মৃত্যুর সঙ্গে ওর লজ্জাকর সকরুণ লড়াই চাহিয়া দেখিয়া তার ঘৃণা হয়, গা জ্বালা করে।

শ্যামা আবার বলিল, মেরো না বাবা, আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি।

নীলমণি দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, মারব? মার খেয়ে আজ রেহাই পাবে ভেবেছিস্? আজ ওর ভবযন্ত্রণা দূর করে ছাড়ব।

ভবযন্ত্রণা নিঃসন্দেহ, কিন্তু শ্যামা শুনিবে কেন? পেটের ক্ষুধায় এখনো তার কান্না আসে, ছেঁড়া কাপড়ে তার সর্বাঙ্গ লজ্জায় সংকুচিত হইয়া থাকে.; তার বুকে ভাষা আছে, মনে আশা আছে। ভবযন্ত্রণা সহ্য করিতে তার শক্তির অকুলান হয় না, বরং একটু বাড়তিই হয়। ওইটুকু শক্তি দিয়া সে বর্তমান জীবন হইতেও রস নিংড়াইয়া বাহির করে,—হোক পান্‌সা, এও তুচ্ছ নয়। ভুলুর মত কুকুরটিরও মরিবার অথবা তাকে মারিবার কল্পনা শ্যামার কাছে বিষাদের ব্যাপার। তার সহ্য হয় না।

ছাতি ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়া শ্যামা নীলমণির লাঠি ধরিল। কাঁদিবার উপক্রম করিয়া বলিল, না বাবা, মেরো না বাবা, তোমার পায়ে পড়ি বাবা!

নীলমণি গর্জন করিয়া বলিল, লাঠি ছাড় শ্যামা, ছেড়ে দে বলছি! তোকেই খুন করে ফেলব আজ।

শ্যামা লাঠি ছাড়িল না। তারও কি মাথার ঠিক আছে? লাঠি ধরিয়া রাখিয়াই সে বার বার নীলমণির পায়ে পড়িতে লাগিল।

নিভা বলিল, কি জিদ মেয়ের! ছেড়েই দে না বাবু লাঠিটা।

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে নীলমণি বলিল, জিদ বার করছি!

লাঠিটা নীলমণিকে মেয়ের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইল ; কিন্তু বেড়ার ঘরের বেড়ায় অনেকগুলি বাতাই অলগা ছিল।

মেয়েকে মারিয়া নীলমণির মন এত খারাপ হইয়া গেল বলিবার নয়। না মারিয়া অবশ্য উপায় ছিল না। ও-রকম রাগ হইলে সে কখনো সামলাইতে পারে নাই, কখনো পারিবেও না। মন খারাপ হওয়ার কারণটাও হয়তো ভিন্ন! কে বলিতে পারে? মেয়েকে না মারিয়াও তো মাঝে মাঝে তার মরিতে ইচ্ছা করে!

জীবনে লজ্জা, দুঃখ, রোগ, মৃত্যু, শোকের তো অভাব নাই। মন খারাপ হইবার, দশ বছর জ্বর ভোগ করিয়া যেমন হয় তেমনি মন খারাপ হইবার কারণ জাগিয়া থাকার প্রত্যেকটি মুহূর্তে এবং ঘুমানোর সময় দুঃস্বপ্নে।

কয়েক মিনিট আগে বৃষ্টি একটু ধরিয়া আসিয়াছিল ; হঠাৎ আবার আগের চেয়েও জোরে আরম্ভ হইয়া গেল। নীলমণির মান-অপমান জ্ঞানটা এবার আর টিকিল না।

লণ্ঠনে তেল আছে শ্যামা?

শ্যামা একবার ভাবিল, চুপ করিয়া থাকিয়া রাগ আর অভিমান দেখায়। কিন্তু সাহস পাইল না।

একটুখানি আছে বাবা।

জ্বাল তবে।

নিভা জিজ্ঞাসা করিল, লণ্ঠন কি হবে?

সরকারদের বাড়ি যাব। ফের চেপে বৃষ্টি এল দেখছ না?

যেন সরকারদের বাড়ি যাইতে নিভাই আপত্তি করিয়াছিল।

শ্যামা বলিল, দেশলাই কোথায় রাখলে মা?

নিভা বলিল, দেশলাই? কেন, পিদিম থেকে বুঝি লণ্ঠন জ্বালানো যায় না? চোখের সামনে পিদিম জ্বলছে, চোখ নেই?

নীলমণি বলিল, ওর কি জ্ঞান-গম্যি কিছু আছে?

নিজের মুখের কথাগুলি খচ্ খচ্ করিয়া মনের মধ্যে বেঁধে। এ যেন তোতা-পাখীর মত অভাবগ্রস্তের মানানসই মুখস্থ বুলি আওড়ানো। বলিতে হয় তাই বলা ; না বলিলে চলে না সত্য ; কিন্তু আসলে বলিয়া কোন লাভ নাই।

সাত বছরের পুরানো লণ্ঠন জ্বালানো হইল।

নিভা মাথা নাড়িয়া বলিল, না বাবু, ছাতিতে আটকাবে না। আর একখানা কাপড় জড়িয়ে নি। দে তো শ্যামা, শুকনো কিছু দে তো। আর এক কাজ কর—দুটো তিনটে কাপড় পুঁটলি করে নে। ওখানে গিয়ে সব্বাইকে কাপড় ছাড়তে হবে। আমার দোক্তার কৌটো নিস্!

নীলমণি একটু মিষ্টি করিয়াই বলিল হুঁকোটা নিতে পারবি শ্যামা? লক্ষ্মী মা-টি আমার,—পারবি? জল ফেলেই নে না, ওখানে গিয়ে ভরে নিলেই হবে। জলের কি অভাব! তামাকটুকু ফেলে যাস নে ভুলে।

সব ব্যবস্থাই হইল, নিমুর কান্নায় কর্ণপাত না করিয়া তাকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া দাঁড় করাইয়া দিয়া পিঠে একটা ছেঁড়া চটের বস্তা চাপাইয়া দেওয়া হইল।

দরজা খুলিয়া তারা উঠানে নামিয়া গেল। উত্তরের ভিটার ঘরখানা গত বৎসরও খাড়া ছিল, এবারকার চতুর্থ বৈশাখী ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছে ; সময়মত অন্ততঃ দুটি খুঁটি বদলাইতে পারিলেও এটা ঘটিত না। ভুলু বোধহয় ওই ভগ্ন স্তূপটির মাঝেই কোথাও মাথা গুঁজিয়া ছিল, মানুষের সাড়া পাইয়া বাহির হইয়া আসিল। তখন ঘরের দরজায় তালা লাগানো হইয়া গিয়াছে। দরজা আঁচড়াইয়া ভুলু সকরুণ কান্নার সঙ্গে কুকুরের ভাষায় বলিতে লাগিল, দরজা খোলো দরজা খোলো।

বাড়ির সামনে একহাঁটু কাদা, তার পরেই পিছল এঁটেল মাটি। ছেলে লইয়া আছাড় খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গিয়া নিভা দেবতাকেই গাল দিতে আরম্ভ করিয়া দিল। কষ্ট নীলমণিরই বেশী ; শুকনো ডাঙ্গাতেই বাঁ পায়ের পদক্ষেপটি তাকে চট্ করিয়া ডিঙ্গাইয়া যাইতে হয়,—এখন তাব পা আর লাঠি দুই-ই কাদায় ঢুকিয়া যাইতে লাগিল।

লাঠি টানিয়া তুলিলে পা আটকাইয়া থাকে, পা তুলিলে লাঠি পোঁতা হইয়া যায়। নিভার তাকাইবার অবসর নাই। শ্যামার ঘাড়ে কাপড়ের পুঁটুলি, হুঁকা-কল্কে, লণ্ঠন আর নিমুর ভার। তবু শ্যামাই নীলমণির বিপদ উদ্ধার করিয়া দিতে লাগিল।

ঘোষেদের পুকুরটা পাক দিলে সরকারদের বাড়ি। পুকুরটা ভরিয়া গিয়া পাড় ছাপাইয়া

উঠিয়াছে। পশ্চিম কোণার প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছটার তলা দিয়া তিন-চার হাত চওড়া এক সংক্ষিপ্ত স্রোতস্বিনী সৃষ্টি হইয়াছে। সে গাছটার জমকালো আবছা চেহারা দেখিলে গা ছম ছম করে। ভরপুর পুকুরের বুকে শ্যামার হাতের আলো যে লম্বা সোনালী পাত ফেলিয়াছে, প্রত্যেক মুহূর্তে হাজার বৃষ্টির ফোঁটায় তাহা অজস্র টুকরায় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

নীলমণি থমকাইয়া দাঁড়াইল। কাতর স্বরে বলিল, ও শ্যামা, পার হব কি করে।

শ্যামা বলিল, জল বেশী নয় বাবা, নিমুর হাঁটু পর্যন্ত ওঠেনি। চলে এসো।

সুখের বিষয় স্রোতের নীচে কাদা ধুইয়া গিয়াছিল, নীলমণির পা অথবা লাঠি আঁটিয়া গিয়া তাকে বিপন্ন করিল না। তবু এতখানি সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও, নীলমণির দুচোখ একবার সজল হইয়া উঠিল। বাহির হওয়ার সময় সে কাপড়টা গায়ে জড়াইয়া লইয়াছিল, এখন ভিজিয়া গিয়া গায়ের সঙ্গে আঁটিয়া গিয়াছে। খানিকক্ষণ হইতে জোর বাতাস উঠিয়াছিল, নীলমণির শীত করিতে লাগিল। জগতে কোটি কোটি মানুষ যখন উষ্ণ শয্যায় গাঢ় ঘুমে পাশ ফিরিয়া পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিতেছে,—সপরিবারে অক্ষম দেহটা টানিয়া টানিয়া সে তখন চলিয়াছে কোথায়? যে প্রকৃতির অত্যাচারে ভাঙ্গা ঘরে টিকিতে না পারিয়া তাকে আশ্রয়ের খোঁজে পথে নামিয়া আসিতে হইল, সেই প্রকৃতিরই দেওয়া নির্মমতায় হয়তো সরকাররা দরজা খুলিবে না, ঘুমের ভান করিয়া বিছানা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। না, নীলমণি আর বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তার শক্তি নাই, কিন্তু আক্রমণ চারিদিক হইতে; পেটের ক্ষুধা, দেহের ক্ষুধা, শীত, বর্ষা, রোগ, বিধাতার অনিবার্য জন্মের বিধান,—সে কোন্ দিক সামলাইবে? সকলে যেখানে বাঁচিতে চায়, লাখ মানুষের জীবিকা একা জমাইতে চায়, কিন্তু কাহাকেও বাঁচাইতে চায় না, সেখানে সে বাঁচিবে কিসের জোরে?

স্রোত পার হইয়া গিয়া লণ্ঠনটা উঁচু করিয়া ধরিয়া শ্যামা দাঁড়াইয়া আছে। পাশেই ভরাট পুকুরটা বৃষ্টির জলে টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। নীলমণি সাঁতার জানিত না। কিন্তু জানিত যে পুকুরের পাড়টা এখানে একেবারে খাড়া! একবার গড়াইয়া পড়িলেই অথই জল, আর উঠিয়া আসিতে হইবে না।

নিভা তাড়া দিতেছিল! শ্যামা বলিল, চলে এসো? দাঁড়ালে কেন?

নীলমণি চলিতে আরম্ভ করিল ; ডাইনে নয় বাঁয়েও নয়। সাবধানে, সোজা শ্যামার দিকে।

হঠাৎ শ্যামা চীৎকার করিয়া উঠিল, মাগো, সাপ্!

পরক্ষণে আনন্দে গদ-গদ হইয়া বলিল, সাপ নয় গো সাপ নয়, মস্ত শোল মাছ! ধরেছি ব্যাটাকে। ইঃ, কি পিছল!

তাড়াতাড়ি আগাইবার চেষ্টা করিয়া নীলমণি বলিল, শক্ত করে ধর, দুহাত দিয়ে ধর,—পালালে কিন্তু মেরে ফেলব শ্যামা!

সরকাররা বছর তিনেক দালান তুলিয়াছে। এখনো বাড়িশুদ্ধ সকলে বাড়ি বাড়ি করিয়া পাগল। বলে, বেশ হয়েছে, না? দোতালায় দুখানা ঘর তুললে, বাস্, আর দেখতে হবে না।

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর সরকারদের বড় ছেলে বাহিরের ঘরের দরজা খুলিল। বলিল, ব্যাপার কি? ডাকাত নাকি?

নীলমণি বলিল, না ভাই, আমরা। ঘরে তো টিকতে পারলাম না ভায়া, সব ভেসে গেছে। ভাবলাম, তোমাদের বৈঠকখানায় তো কেউ শোয় না, রাতটুকু ওখানেই কাটিয়ে আসি।

বড়ছেলে বলিল, সন্ধ্যেবেলা এলেই হত!

নীলমণি কষ্টে একটু হাসিল সন্ধ্যেয় কি বৃষ্টি ছিল ভাই? দিব্যি ফুটফুটে আকাশ—মেঘের চিহ্ন নেই। রাতদুপুরে হঠাৎ জল আসবে কে জানত।

নিভা ছাতি বন্ধ করিয়া ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মাসিকের ছবির সদ্যস্নাতার অবস্থায় পড়িয়া শ্যামা লজ্জায় মার অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। নিভার এটা ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু বড়ছেলের সামনে কিছু বলিবার উপায় নাই।

বড়ছেলে বলিল, বেশ থাকুন। কিন্তু চৌকি পাবেন না, চৌকিতে আমার পিসে শুয়েছে। আপনাদের মেঝেতে শুতে হবে।

তা হোক ভাই, তা হোক। ভিজতে না হলেই ঢের। একখানা কম্বলটম্বল—?

ওই কোণে চট আছে।

বড়ছেলে বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল।

নীলমণি ঝাঁঝালো হাসি হাসিয়া বলিল, দেখলে? তখনি বলেছিলাম শুধু জুতো মারতে বাকী রাখবে!

নিভা বলিল, ঘরে যে থাকতে দিয়েছে তাই ভাগ্যি বলে জেনো!

নীলমণি তৎক্ষণাৎ সুর বদলাইয়া বলিল, তা ঠিক।

ঘরে অর্ধেকটা জুড়িয়া চৌকি পাতা, বড়ছেলের পিসে আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া তাহাতে কাত হইয়া শুইয়া আছে। শ্যামা লণ্ঠনটা মেঝেতে নামাইয়া রাখিয়াছিল বলিয়া চৌকির উপরে আলো পড়ে নাই, তবু এ বাড়ীর আত্মীয়কেও ফরাস তুলিয়া লইয়া শুধু শতরঞ্চির উপরে শুইতে দেওয়া হইয়াছে, এটুকু টের পাইয়া নীলমণি একটু খুসী হইল। বড়ছেলের পিসে! —আপনার লোক। সে যদি ও রকম ব্যবহার পাইয়া থাকে তবে তারা যে লাথি ঝাঁটা পায় নাই, ইহাই আশ্চর্য!

চারিদিকে চাহিয়া নীলমণির খুশীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল। সুখশয্যা না জুটুক, নিবাত, শুষ্ক, মনোহর আশ্রয় তো জুটিয়াছে। ঘরের এদিকে একটিমাত্র ছোট জানালা খোলা ছিল, নিভা ইতিমধ্যেই সেটি ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বাস্, বাহিরের সঙ্গে আর তাদের কোন সম্পর্কই নাই। আকাশটা আজ একরাত্রেই গলিয়া নিঃশেষ হইয়া যাক, ঝড় উঠুক, শিল পড়ুক, পৃথিবীর সমস্ত খড়ের ঘরগুলি ভাঙিয়া পড়ুক,—তারা টেরও পাইবে না।

নীলমণির মেজাজ যেন ম্যাজিকে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। তার কণ্ঠস্বর পর্যন্ত মোলায়েম শোনাইল।

ও শ্যামা, দাঁড়িয়ে থাকিস্ নি মা, চটগুলো বিছিয়ে দে চট্ করে। একটু গড়াই। আহা, ভিজে কাপড়টা ছেড়েই নে আগে, মারামারির কি আছে। এতক্ষণই গেল না হয় আরও খানিকক্ষণ যাবে। ওগো, শুনছ? দাও না, খোকাকে চৌকির এক পাশেই একটু শুইয়ে দাও না, দিয়ে তুমিও কাপড়টা ছেড়ে ফ্যালো। গলা নামাইয়া ফিস ফিস করিয়া বলিল, ভদ্রলোক ঘুমোচ্ছেন, আর লজ্জাটা কিসের শুনি? লজ্জা করে তো দরজা খুলে বারান্দায় চলে যাও না!

কাপড় ছাড়া হইল। বাহিরে এখন পুরোদমে ঝড় উঠিয়াছে। ঘরের কোথাও এতটুকু ছিদ্র নাই, কিন্তু বাতাসের কান্না শোনা যায়। চাপা একটানা সাঁ সাঁ শব্দ। তাদের—নীলমণি আর তার পরিবারকে, নাগালের মধ্যে না পাইয়া প্রকৃতি যেন ফুঁসিতেছে।

নীলমণির মনে হইল, এ একরকম শাসানো। পঞ্চভূতের মধ্যে যার ভাষা আছে সে ক্রুদ্ধ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছে, আজ বাঁচিয়া গেলে। কিন্তু কাল? কাল কি করিবে? পরশু? তার

পরদিন? তারও পরের দিন।

শ্যামা চট বিছাইতেছিল, বলিল, মাগো কি গন্ধ!

নিভা বলিল, নে ঢং করতে হবে না, তাড়াতাড়ি কর।

নীলমণি বলিল, ঝেড়ে ঝেড়ে পাত না।

নিভা বলিল, না না, ঝাড়িস নি! ধুলোয় চাদ্দিক অন্ধকার হয়ে যাবে।

নিভা ছেলেকে স্তন দিতেছিল, কথাটা শেষ করিয়াই সে দমক মারিয়া চৌকির দিকে পিছন করিয়া বসিল।

নীলমণি চাহিয়া দেখিল, বড়ছেলের পিসে চাদর ফেলিয়া চৌকিতে উঠিয়া বসিয়াছে। লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় পিসের মূর্তি দেখিয়া নীলমণি শিহরিয়া উঠিল। একটা শব যেন সহসা বাঁচিয়া উঠিয়াছে। মাথার চুল প্রায় ন্যাড়া করিয়া দেওয়ার মত ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, চোখ যেন মাথার অর্ধেকটা ভিতরে চলিয়া গিয়াছে, গালের ঢিলা চামড়ার তলে হাড় উঁচু হইয়া আছে। বুকের সবগুলি পাঁজর চোখ বুজিয়া গোনা যায়। বুকের বাঁ পাশে কি ঠিক চামড়ার নীচেই হৃৎপিণ্ডটা ধুকধুক করিতেছে।

পিসে নিশ্বাসের জন্য হাঁপাইতেছিল। খানিক পরে ক্ষীণস্বরে বলিল, একটা জানালা খুলে দিন।

নীলমণি সভয়ে বলিল, দে তো শ্যামা জানালাটা খুলে দে।

শ্যামা আরও বেশী ভয়ে ভয়ে বলিল, ঝড় হচ্ছে যে বাবা!

হোক, খুলে দে।

শ্যামা পশ্চিমের ছোট জানালাটা খুলিয়া দিল। ঝড় পূর্বদিক হইতে বহিতেছিল, মাঝে মাঝে এলোমেলো একটু বাতাস আর ছিঁটে ফোঁটা একটু বৃষ্টি ঘরে ঢোকা ছাড়া জানালাটি খুলিয়া দেওয়ায় বিশেষ কোন মারাত্মক ফল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু নিভা ছেলের গায়ে আর এক পরত কাপড় জড়াইয়া দিল।

পিসে বলিল, ঘুমের ঘোরে কখন চাদর মুড়ি দিয়ে ফেলেছি, আর একটু হলেই দম আটকাত বাপ্!

নীলমণি জিজ্ঞাসা করিল, আপনার অসুখ আছে নাকি?

পিসে ভর্ৎসনার চোখে চাহিয়া বলিল, খুব মোটা-সোটা দেখছেন বুঝি? অসুখ না থাকলে মানুষের এমন চেহারা হয়? চার বচ্ছর ভুগছি মশায়, মরে আছি একেবারে। যম ব্যাটা কানা, এত লোককে নিচ্ছে, আমায় চোখে দেখতে পায় না। যে-কষ্টটা পাচ্ছি মশায়, শত্রু যেন—

ব্যারামটা কি?

পিসে রাগিয়া বলিল, টের পান না? এমন করে শ্বাস টানছি দেখতে পান না? পাবেন কেন, আপনার কি! যার হয় সে বোঝে।

বোঝা গেল, পিসের মেজাজটা খিটখিটে।

নীলমণি নম্রভাবে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, আহা, সেরে যাবে, ভাল মত চিকিচ্ছে হলেই সেরে যাবে।

পিসে বলিল হুঁ, সারবে। আমকাঠের তলে গেলে সারবে। চিকিচ্ছের কি আর কিছু বাকী আছে মশায়? ডাক্তার কবরেজ জলপড়া কিচ্ছুটি বাদ যায়নি। আর চার বছর ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছি, কোন ব্যাটা সারাতে পারল।

কথাটার মাঝে মাঝে পিসে হাপরের মত শ্বাস টানে, এক একবার থামিয়া গিয়া ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতই চোখ কপালে তুলিয়া খাবি খায়। নীলমণির গায়ে কাঁটা দিতে লাগিল। বাতাস! পৃথিবীতে কত বাতাস! তবুও ফুসফুস ভরাইতে পারে না। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে সে উপবাসী, পঞ্চাশ মাইল গভীর বায়ুস্তরে ডুবিয়া থাকিয়া ওর দম আটকাইল।

পিসে বলিল, কি বলে জানেন? বলে, ভয় কি, সেরে যাবে। বলে, সবাই টাকা নেয় চিকিৎসে করে, শেষে বলে, না বাপু; তোমার সারবে না, এসব ব্যাবাম সারে না। আমি বলি, ওরে চোর ডাকাত ছুঁচোর দল! সারাতে পারবি না তো মেরে ফ্যাল্, দে মরবার ওষুধ দে।

উত্তেজনায় পিসে জোরে জোবে হাঁপাইতে লাগিল। নীলমণি কথা বলিল না, তার বিনিদ্র আরক্ত চোখ দুটি কেবলি মিট্ মিট্ করিয়া চলিল।

তেল কমিয়া আসায় আলোটা দপ্ দপ্ করিতেছে, এখনই নিবিয়া যাইবে! ছেলেকে বুকে জড়াইয়া হাতকে বালিশ করিয়া নিভা দুর্গন্ধ ছেঁড়া চটে কাত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শ্যামা বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে।

নীলমণির হুঁকা-কল্কে শ্যামা জানালায় নামাইয়া রাখিয়াছিল। আলোটা নিবিয়া যাওয়াব আগে নীলমণি বাকী তামাকটুকু সাজিয়া লইল। তারপর ঠেস দিয়া আরাম করিয়া পিসের শ্বাস টানার মত সাঁ সাঁ শব্দ করিয়া জলহীন হুঁকায় তামাক টানিতে লাগিল।

প্রাগৈতিহাসিক

সমস্ত বর্ষাকালটা ভিখু ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছে। আষাঢ় মাসের প্রথমে বসন্তপুরের বৈকুণ্ঠ সাহার গদীতে ডাকাতি করিতে গিয়া তাহাদের দলকে দল ধরা পড়িয়া যায়। এগার জনের মধ্যে কেবল ভিখুই কাঁধে একটা বর্শার খোঁচা খাইয়া পলাইতে পারিয়াছিল। রাতারাতি দশ মাইল দূরের মাথা-ভাঙা পুলটার নীচে পৌঁছিয়া অর্ধেকটা শরীর কাদায় ডুবাইয়া শরবনের মধ্যে দিনের বেলাটা লুকাইয়া ছিল। রাত্রে আরও ন'ক্রোশ পথ হাঁটিয়া একেবারে পেহ্লাদ বাগদীব বাড়ী চিতলপুরে।

পেহ্লাদ তাহাকে আশ্রয় দেয় নাই।

কাঁধটা দেখাইয়া বলিয়াছিল, 'ঘাও খান সহজ লয় স্যাঙ্গাৎ। উটি পাকবো। গা ফুলবো। জানাজানি হইয়া গেলে আমি কনে যামু? খুনটো যদি না করতিস্—'

'তরেই খুন করতে মন লইতেছে পেহ্লাদ।'

'এই জনমে লা, স্যাঙ্গাৎ।'

বন কাছেই ছিল, মাইল পাঁচেক উত্তরে। ভিখু অগত্যা বনেই আশ্রয় লইল। পেহ্লাদ নিজে বাঁশ কাটিয়া বনের একটা দুর্গম অংশে সিনজুরি গাছের নিবিড় ঝোপের মধ্যে তাহাকে একটা মাচা বাঁধিয়া দিল। তালপাতা দিয়া একটা আচ্ছাদনও করিয়া দিল। বলিল, 'বাদলায় বাঘ-টাঘ সব পাহাড়ের উপরে গেছে গা। সাপে যদি না কাটে ত আরাম কইরাই থাকবি ভিখু।'

'খামু কি?'

'চিঁড়া গুড় দিলাম যে? দু'দিন বাদে বাদে ভাত লইয়া আসুম। রোজ আইলে মাইনষে

সন্দ করব।'

কাঁধের ঘা'টা লতা পাতা দিয়া বাঁধিয়া আবার আসিবার আশ্বাস দিয়া পেহ্লাদ চলিয়া গেল। রাত্রে ভিখুর জ্বর আসিল। পরদিন টের পাওয়া গেল পেহ্লাদের কথাই ঠিক, কাঁধের ঘা ভিখুর দূনাইয়া উঠিয়াছে। ডান হাতটি ফুলিয়া ঢোল হইয়া গিয়াছে এবং হাতটি তাহার নাড়িবার সামর্থ্য নাই।

বর্ষাকালে যে বনে বাঘ বাস করিতে চায় না এমনি অবস্থায় সেই বনে জলে ভিজিয়া মশা ও পোকার উৎপাত সহিয়া, দেহের কোন না কোন অংশ হইতে ঘণ্টায় একটি করিয়া জোঁক টানিয়া ছাড়াইয়া জ্বরে ও ঘায়ের ব্যথায় ধুঁকিতে ধুঁকিতে ভিখু দু'দিন দু'রাত্রি সঙ্কীর্ণ মাচাটুকুর উপর কাটাইয়া দিল। বৃষ্টির সময় ছাঁট লাগিয়া সে ভিজিয়া গেল, রোদের সময় ভাপসা গাঢ় গুমোটে সে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া শ্বাস টানিল, পোকার অত্যাচারে দিবারাত্রি তাহার একমুহূর্তের স্বস্তি রহিল না। পেহ্লাদ কয়েকটা বিড়ি দিয়া গিয়াছিল সেগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে তিন চার দিনের মত চিঁড়া আছে বটে কিন্তু গুড় একটুও নাই। গুড় ফুরাইয়াছে, কিন্তু গুড়ের লোভে যে লাল পিঁপড়াগুলি ঝাঁক বাঁধিয়া আসিয়াছিল তাহারা এখনো মাচার উপরে ভিড় করিয়া আছে। ওদের হতাশার জ্বালা ভিখুই অবিরত ভোগ করিতেছে সর্বাঙ্গে।

মনে মনে পেহ্লাদের মৃত্যু কামনা করিতে করিতে ভিখু তবু বাঁচিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল। যেদিন পেহ্লাদের আসিবার কথা সেদিন সকালে কলসীর জলটাও তাহার ফুরাইয়া গেল। বিকাল পর্যন্ত পেহ্লাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া তৃষ্ণার পীড়ন আর সহিতে না পারিয়া কলসীটা লইয়া সে যে কত কষ্টে খানিক দূরের নালা হইতে আধ কলসী জল ভরিয়া আনিয়া আবার মাচায় উঠিল তাহার বর্ণনা হয় না। অসহ্য ক্ষুধা পাইলে শুধু চিঁড়া চিবাইয়া সে পেট ভরাইল। একহাতে ক্রমাগত পোকা ও পিঁপড়াগুলি টিপিয়া মারিল। বিষাক্ত রস শুষিয়া লইবে বলিয়া জোঁক ধরিয়া নিজেই ঘায়ের চারি দিকে লাগাইয়া দিল। সবুজ-রঙের একটা সাপকে একবার মাথার কাছে সিন্‌দুরি গাছের পাতার ফাঁকে উঁকি দিতে দেখিয়া পুরা দু'ঘণ্টা লাঠি হাতে সেদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল এবং তাহার পর দু'এক ঘণ্টা অন্তরই চারিদিকের ঝোপে ঝপাঝপ লাঠির বাড়ি দিয়া মুখে যথাসাধ্য শব্দ করিয়া সাপ তাড়াইতে লাগিল।

মরিবে না। সে কিছুতেই মরিবে না। বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে না সেই অবস্থায়, মানুষ সে, বাঁচিবেই।

•

পেহ্লাদ গ্রামান্তরে কুটুম বাড়ী গিয়াছিল। পরদিও সে আসিল না। কুটুম-বাড়ীর বিবাহোৎসবে তাড়ি টানিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া রহিল। বনের মধ্যে ভিখু কি ভাবে দিন-রাত্রি কাটাইতেছে তিন দিনের মধ্যে সে কথা একবার তাহার মনেও পড়িল না।

ইতিমধ্যে ভিখুর ঘা পচিয়া উঠিয়া লালচে রস গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। শরীরও তাহার অল্প অল্প ফুলিয়াছে। জ্বরটা একটু কমিয়াছে বটে কিন্তু সর্বাঙ্গের অসহ্য বেদনা দম ছুটানো তাড়ির নেশার মতই ভিখুকে আচ্ছন্ন, অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। সে আর এখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভব করিতে পারে না। জোঁকেরা তাহার রক্ত শুষিয়া শুষিয়া কচি পটোলের মত ফুলিয়া উঠিয়া আপনা হইতেই নীচে খসিয়া পড়িয়া যায়, সে টেরও পায় না। পায়ের ধাক্কায় জলের কলসীটা এক সময় নীচে পড়িয়া ভাঙিয়া যায়, বৃষ্টির জলে ভিজিয়া পুঁটুলির মধ্যে চিঁড়াগুলি পচিতে আরম্ভ করে, রাত্রে তাহার ঘায়ের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মাচার আশে

পাশে শিয়াল ঘুরিয়া বেড়ায়।

কুটুম-বাড়ী হইতে ফিরিয়া বিকালের দিকে ভিখুর খবর লইতে গিয়া ব্যাপার দেখিয়া পেহ্লাদ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল। ভিখুর জন্য এক বাটি ভাত ও কয়েকটা পুঁটি মাছ ভাজা আর একটু পুঁই চচ্চড়ি সে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিখুর কাছে বসিয়া থাকিয়া ও-গুলি সে নিজেই খাইয়া ফেলিল। তারপর বাড়ী গিয়া বাঁশের একটা ছোট মই এবং তাহার বোনাই ভরতকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল।

মই-এ শোয়াইয়া তাহারা দুজনে ভিখুকে বাড়ী লইয়া গেল। ঘরের মাচার উপরে খড় বিছাইয়া শয্যা রচনা করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া রাখিল।

আর এমনি শক্ত প্রাণ ভিখুর যে শুধু এই আশ্রয়টুকু পাইয়াই বিনা চিকিৎসায় ও এক রকম বিনা যত্নেই একমাস মুমূর্ষু অবস্থায় কাটাইয়া সে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিত মরণকে জয় করিয়া ফেলিল। কিন্তু ডান হাতটি তাহার আর ভাল হইল না। গাছের মরাডালের মত শুকাইয়া গিয়া অবশ ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িল। প্রথমে অতি কষ্টে হাতটা সে একটু নাড়িতে পারিত কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ক্ষমতাটুকুও তাহার নষ্ট হইয়া গেল।

কাঁধের ঘা শুকাইয়া আসিবার পর বাড়ীতে বাহিরের লোক কেহ উপস্থিত না থাকিলে ভিখু তাহার একটি মাত্র হাতের সাহায্যে মধ্যে মধ্যে বাঁশের মই বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল এবং একদিন সন্ধ্যার সময় এক কাণ্ড করিয়া বসিল।

পেহ্লাদ সে সময় বাড়ী ছিল না, ভরতের সঙ্গে তাড়ি গিলিতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। পেহ্লাদের বোন গিয়াছিল ঘাটে। পেহ্লাদের বৌ ছেলেকে ঘরে শোয়াইতে আসিয়া ভিখুর চাহনি দেখিয়া তাড়াতাড়ি পালাইয়া যাইতেছিল, ভিখু তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিল।

কিন্তু পেহ্লাদের বৌ বাগদীর মেয়ে। দুর্বল শরীরে বাঁ হাতে তাহাকে আয়ত্ত করা সহজ নয়। এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া সে গাল দিতে দিতে চলিয়া গেল। পেহ্লাদ বাড়ী ফিরিলে সব বলিয়া দিল।

তাড়ির লেশায় পেহ্লাদের মনে হইল, এমন নেমকহারাম মানুষটাকে একেবারে খুন করিয়া ফেলাই কর্তব্য। হাতের মোটা বাঁশের লাঠিটা বৌ-এর পিঠে এক ঘা বসাইয়া দিয়া ভিখুর মাথা ফাটাইতে গিয়া নেশার মধ্যেও কিন্তু টের পাইতে তাহার বাকী রহিল না যে কাজটা যত বড় কর্তব্যই হোক, সম্ভব একেবারেই নয়। ভিখু তাহার ধারাল দা'টি বাঁ হাতে শক্ত করিয়া বাগাইয়া ধরিয়া আছে। সুতরাং খুনোখুনির পরিবর্তে তাহাদের মধ্যে কিছু অশ্লীল কথার আদানপ্রদান হইয়া গেল।

শেষে পেহ্লাদ বলিল, 'তোর লাইগ্যা আমার সাত টাকা খরচ গেছে, টাকাটা দে, দিয়া বাইর' আমার বাড়ীর থেইকা,—দূর হ'।'

ভিখু বলিল, 'আমার কোমরে একটা বাজু বাইন্ধা রাখছিলাম, তুই চুরি করছস। আগে আমার বাজু ফিরাইয়া দে, তবে যামু।'

'তোর বাজুর খপর জানে কেডা রে'?'

বাজু দে কইলাম পেহ্লাদ, ভাল চাস ত! বাজু না দিলি সা' বাড়ীর মেজো-কর্তার মত গলাডা তোর একখান কোপেই দুই ফাঁক কইরা ফেলুম, এই তোরে আমি কইয়া রাখলাম। বাজু পালি' আমি অখনি যামু গিয়া।'

কিন্তু বাজু ভিখু ফেরত পাইল না। তাহাদের বিবাদের মধ্যে ভরত আসিয়া পড়ায় দু'জনে মিলিয়া ভিখুকে তাহারা কায়দা করিয়া ফেলিল। পেহ্লাদের বাহুমূলে একটা কামড় বসাইয়া

দেওয়া ছাড়া দুর্বল ও পঙ্গু ভিখু আর বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। পেহ্লাদ ও তাহার বোনাই তাহাকে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া ফেলিয়া বাড়ির বাহির করিয়া দিল। ভিখুর শুকাইয়া-আসা ঘা ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল, হাত দিয়া রক্ত মুছিতে মুছিতে ধুঁকিতে ধুঁকিতে সে [illegible]লিয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারে সে কোথায় গেল কেহই তাহা জানিতে পারিল না বটে, কিন্তু দুপুর রাতে পেহ্লাদের ঘর জ্বলিযা উঠিয়া বাগ্দী পাড়ায় বিষম হৈ-চৈ বাধাইয়া দিল।

পেহ্লাদ কপাল চাপড়াইয়া বলিতে লাগিল, 'হায় সব্বনাশ, হায় সব্বনাশ! ঘরকে আমার শনি আইছিলো গো, হায় সব্বনাশ।'

কিন্তু পুলিশের টানাটানির ভয়ে মুখ ফুটিয়া বেচারী ভিখুর নামটা পর্যন্ত করিতে পারিল না।

সেই রাত্রি হইতে ভিখুর আদিম, অসভ্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল। চিতলপুরের পাশে একটা নদী আছে। পেহ্লাদের ঘরে আগুন দিয়া আসিয়া একটা জেলে ডিঙ্গি চুরি করিয়া ভিখু নদীর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। লগি ঠেলিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না, একটা চ্যাপ্টা বাঁশকে হালের মত কবিয়া ধরিয়া রাখিয়া সে সমস্ত রাত কোন রকমে নৌকার মুখ সিধা রাখিয়াছিল। সকাল হওয়ার আগে শুধু স্রোতের টানে সে বেশীদূর আগাইতে পারে নাই।

ভিখুর মনে আশঙ্কা ছিল ঘরে আগুন দেওয়ার শোধ লইতে পেহ্লাদ হয়তো তাহার নামটা প্রকাশ করিয়া দিবে, মনের জ্বালায় নিজের অসুবিধার কথাটা ভাবিবে না। পুলিশ বহুদিন যাবৎ তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। বৈকুণ্ঠ সাহার বাড়ীতে খুনটা হওয়ার ফলে চেষ্টা তাহাদের বাড়িয়াছে বই কমে নাই। পেহ্লাদের কাছে খবর পাইলে পুলিশ আশেপাশে চারিদিকেই তাহার খোঁজ কবিবে। বিশ-ত্রিশ মাইলের মধ্যে লোকালয়ে মুখ দেখানো তাহার পক্ষে বিপদের কথা। কিন্তু ভিখু তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। কাল বিকাল হইতে সে কিছু খায় নাই। দু'জন জোয়ান মানুষের হাতে বেদম মার খাইয়া এখনো দুর্বল শরীরটা তাহার ব্যথায় আড়ষ্ট হইয়া আছে। ভোর ভোর মহকুমা সহরের ঘাটের সামনে পৌঁছিয়া সে ঘাটে নৌকা লাগাইল। নদীর জলে ডুবিয়া ডুবিয়া স্নান করিয়া গায়ের রক্তের চিহ্ন ধুইয়া ফেলিয়া সহরের ভিতর প্রবেশ করিল। ক্ষুধায় সে চোখে অন্ধকার দেখিতেছিল। একটি পয়সাও তাহার সঙ্গে নাই যে মুড়ি কিনিয়া খায়। বাজারের রাস্তায় প্রথম যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হইল তাহারই সামনে হাত পাতিয়া সে বলিল, 'দু'টো পয়সা দিবান কর্তা?'

তাহার মাথার জটাবাঁধা চাপ চাপ রুক্ষ ধূসর চুল, কোমরে জড়ানো মাটির মত ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া আর দড়ির মত শীর্ণ দোদুল্যমান হাতটি দেখিয়া ভদ্রলোকটির বুঝি দয়াই হইল। তিনি তাহাকে একটি পয়সা দান কবিলেন।

ভিখু বলিল,—'একটা দিলেন বাবু? আর একটা দেন।'

ভদ্রলোক চটিয়া বলিলেন,—'একটা দিলাম, তাতে হল না,—ভাগ্!'

এক মুহূর্তের জন্য মনে হইল ভিখু বুঝি তাহাকে একটা বিশ্রী গালই দিয়া বসে। কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করিল। গাল দেওয়ার বদলে আরক্ত চোখে তাহার দিকে একবার কটমট করিয়া তাকাইয়া সামনের মুড়ি-মুড়কির দোকানে গিয়া পয়সাটা দিয়া মুড়ি কিনিয়া গোগ্রাসে গিলিতে আরম্ভ করিল।

সে-ই হইল তাহার ভিক্ষা করিবার হাতে খড়ি।

কয়েক দিনের ভিতরেই সে পৃথিবীর বহু পুরাতন ব্যবসাটির এই প্রকাশ্যতম বিভাগের আইন-কানুন সব শিখিয়া ফেলিল। আবেদনের ভঙ্গি ও ভাষা তাহার জন্ম-ভিখারীর মত আয়ত্ত হইয়া গেল। শরীর এখন আর সে একেবারেই সাফ করে না, মাথার চুল তাহার ক্রমেই জট বাঁধিয়া বাঁধিয়া দলা-মলা হইয়া যায় এবং তাহাতে অনেকগুলি উকুন-পরিবার দিনের পর দিন বংশ বৃদ্ধি করিয়া চলে। ভিখু মাঝে মাঝে খ্যাপার মত দুই হাতে মাথা চুলকায় কিন্তু বাড়তি চুল কাটিয়া ফেলিতে ভরসা পায় না। ভিক্ষা করিয়া সে একটি ছেঁড়া কোট পাইয়াছে, কাঁধের ক্ষতচিহ্নটা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য দারুণ গুমোটের সময়েও কোটটা সে গায়ে চাপাইয়া রাখে। শুকনো হাতখানা তাহার ব্যবসার সব চেয়ে জোরালো বিজ্ঞাপন, এই অঙ্গটি ঢাকিয়া রাখিলে তাহার চলে না। কোটের ডানদিকের হাতাটি সে তাই বগলের কাছ হইতে ছিঁড়িয়া বাদ দিয়াছে। একটি টিনের মগ ও একটা লাঠিও সে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে।

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজারের কাছে রাস্তার ধারে একটা তেঁতুল গাছের নীচে বসিয়া সে ভিক্ষা করে। সকালে একপয়সার মুড়ি খাইয়া নেয়, দুপুরে বাজারের খানিক তফাতে একটা পোড়ো বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া বটগাছের নীচে ইঁটের উনুনে মেটে হাঁড়িতে ভাত রান্না করে, মাটির মালসায় কোনদিন রাঁধে ছোটমাছ, কোনদিন তরকারী। পেট ভরিয়া খাইয়া বটগাছটাতেই হেলান দিয়া বসিয়া আরামে বিড়ি টানে। তারপর আবার তেঁতুল গাছটার নীচে গিয়া বসে।

সারাটা দিন শ্বাস টানা শ্বাস টানা কাতরানির সঙ্গে সে বলিয়া যায় : 'হেই বাবা একটা পয়সা, আমায় দিলে ভগবান দিবে : হেই বাবা একটা পয়সা—'

অনেক প্রাচীন বুলির মত 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' শ্লোকটা আসলে অসত্য। সারা দিনে ভিখুর সামনে দিয়া হাজার দেড় হাজার লোক যাতায়াত করে এবং গড়ে প্রতি পঞ্চাশ জনের মধ্যে একজন তাহাকে পয়সা অথবা আধলা দেয়। আধলার সংখ্যা বেশী হইলে সারাদিনে ভিখুর পাঁচ ছ'আনা রোজগার হয়, কিন্তু সাধারণতঃ তাহার উপার্জন আট আনার কাছাকাছি থাকে। সপ্তাহে এখানে দু'দিন হাট বসে। হাটবারের উপার্জন তাহার একটা পুরা টাকার নীচে নামে না।

এখন বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। নদীর দু'তীর কাশে শাদা হইয়া উঠিয়াছে। নদীর কাছেই বিনু মাঝির বাড়ীর পাশের ভাঙ্গা চালাটি ভিখু মাসিক আট আনায় ভাড়া করিয়াছে। রাত্রে সে ওইখানেই শুইয়া থাকে। ম্যালেরিয়ায় মৃত এক ব্যক্তির জীর্ণ কিন্তু পুরু একটি কাঁথা সে সংগ্রহ করিযাছে, লোকের বাড়ীর খড়ের গাদা হইতে চুরি করিয়া আনা খড় বিছাইয়া তাহার উপর কাঁথাটি পাতিয়া সে আরাম করিয়া ঘুমায়। মাঝে মাঝে সহরের ভিতরে গৃহস্থবাড়ীতে ভিক্ষা করিতে গিয়া সে কয়েকখানা ছেঁড়া কাপড় পাইয়াছে। তাই পুঁটুলি করিয়া বালিশের মত ব্যবহার করে। রাত্রে নদীর জলো-বাতাসে শীত করিতে থাকিলে পুঁটুলি খুলিয়া একটি কাপড় গায়ে জড়াইয়া লয়।

সুখে থাকিয়া এবং পেট ভরিয়া খাইয়া কিছুদিনের মধ্যে ভিখুর দেহে পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল। তাহার ছাতি ফুলিয়া উঠিল, প্রত্যেকটি অঙ্গ সঞ্চালনে হাতের ও পিঠের মাংস-পেশী নাচিয়া উঠিতে লাগিল। অবরুদ্ধ শক্তির উত্তেজনায় ক্রমে ক্রমে তাহার মেজাজ উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল। অভ্যস্ত বুলি আওড়াইয়া কাতরভাবেই সে এখনো ভিক্ষা চায়, কিন্তু ভিক্ষা না পাইলে তাহার ক্রোধের সীমা থাকে না। পথে লোকজন না থাকিলে তাহার প্রতি উদাসীন পথিককে সে অশ্লীল গাল দিয়া বসে। এক পয়সার জিনিস কিনিয়া

কেউ না পাইলে দোকানীকে মারিতে উঠে। নদীর ঘাটে মেয়েরা স্নান করিতে নামিলে ভিক্ষা চাহিবার ছলে জলের ধারে গিয়া দাঁড়ায়। মেয়েরা ভয় পাইলে সে খুশি হয় এবং সরিয়া যাইতে বলিলে নড়ে না, দাঁত বাহির করিয়া দুর্বিনীত হাসি হাসে।

রাত্রে স্বরচিত শয্যায় সে ছটফট করে।

নারী-সঙ্গহীন এই নিরুৎসব জীবন আর তাহার ভাল লাগে না। অতীতের উদ্দাম ঘটনাবহুল জীবনটির জন্য তাহার মন হাহাকার করে।

তাড়ির দোকানে ভাঁড়ে ভাঁড়ে তাড়ি গিলিয়া সে হল্লা করিত, টলিতে টলিতে বাসির ঘরে গিয়া উন্মত্ত রাত্রি যাপন করিত, আর মাঝে মাঝে দল বাঁধিয়া গভীর রাত্রে গৃহস্থের বাড়ী চড়াও হইয়া সকলকে মারিয়া কাটিয়া টাকা ও গহনা লুটিয়া রাতারাতি উধাও হইয়া যাইত। স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামীকে বাঁধিয়া মারিলে তাহার মুখে যে অবর্ণনীয় ভাব দেখা দিত, পুত্রের অঙ্গ হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিলে মা যেমন করিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিত, মশালের আলোয় সে দৃশ্য দেখা আর সেই আর্তনাদ শোনার চেয়ে উন্মাদনাকর নেশা জগতে আব কি আছে? পুলিশের ভয়ে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পলাইয়া বেড়াইয়া আর বনে-জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়াও যেন তখন সুখী ছিল। তাহার দলেব অনেকেই বার বার ধরা পড়িয়া জেল খাটিয়াছে কিন্তু জীবনে একবারের বেশী পুলিশ তাহার নাগাল পায় নাই। রাখু বাগ্দীর সঙ্গে পাহানার শ্রীপতি বিশ্বাসের বোনটাকে যেবার সে চুরি করিয়াছিল সেইবার সাতবছরের জন্য তাহার কয়েদ হইয়াছিল, কিন্তু দু'বছরের বেশী কেহ তাহাকে জেলে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। এক বর্ষার সন্ধ্যায় জেলের প্রাচীব ডিঙ্গাইয়া সে পলাইয়াছিল। তারপর একা সে গৃহস্থবাড়ীতে ঘবের বেড়া কাটিয়া চুরি করিয়াছে, দিনে দুপুরে পুকুর-ঘাটে একাকিনী গৃহস্থ বধূব মুখ চাপিয়া গলার হার, হাতের বালা খুলিয়া লইয়াছে, রাখুর বৌকে সঙ্গে নিয়া নোয়াখালি হইয়া সমুদ্র ডিঙ্গাইয়া পাড়ি দিয়াছে একেবারে হাতিযায়। ছ'মাস পরে রাখুব বৌকে হাতিয়ায ফেলিয়া আসিয়া পর পর তিনবার তিনটা দল কবিয়া দূরে দূরে কত গ্রামে ডাকাতি করিয়া বেড়াইয়াছে তাহার সবগুলির নামও এখন তাহার স্মরণ নাই। তারপব এই সেদিন বৈকুণ্ঠ সাহার মেজ ভাইটার গলাটা সে দা'য়ের এক কোপে দু'ফাঁক কবিয়া দিয়া আসিয়াছে।

কি জীবন তাহার ছিল, এখন কি হইয়াছে।

মানুষ খুন করিতে যাহার ভাল লাগিত, সে আজ ভিক্ষা না দিয়া চলিয়া গেলে পথচারীকে একটু টিটকারি দেওয়ার মধ্যে মনেব জ্বালা নিঃশেষ করে। দেহের শক্তি তাহার এখনো তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে। সে শক্তি প্রয়োগ করিবার উপায়টাই তাহার নাই। কত দোকানে গভীর রাত্রে সামনে টাকার থোক সাজাইয়া একা বসিয়া দোকানী হিসাব মেলায়, বিদেশগত কত পুরুষের গৃহে মেয়েরা থাকে একা। এদিকে, ধাবালো একটা অস্ত্র হাতে ওদের সামনে হুমকি দিয়া পড়িয়া একদিনে বড়লোক হওয়ার পরিবর্তে বিনুমাঝির চালাটার নীচে সে চুপচাপ শুইয়া থাকে।

ডান হাতটাতে অন্ধকারে হাত বুলাইয়া ভিখুর আপসোসের সীমা থাকে না। সংসারের অসংখ্য ভীরু ও দুর্বল নরনারীর মধ্যে এত বড় বুকেব পাটা আর এমন একটা জোরালো শবীর নিয়া শুধু একটা হাতেব অভাবে সে যে মরিয়া আছে। এমন কপালও মানুষের হয়?

তবু এ দুর্ভাগ্য সে সহ্য কবিতে পারে। আপসোসেই নিবৃত্তি। একা ভিখু আর থাকিতে পারে না।

বাজারে ঢুকিবার মুখেই একটি ভিখারিণী ভিক্ষা করিতে বসে। বয়স তাহার বেশী নয়,

দেহের বাঁধুনিও বেশ আছে। কিন্তু একটা পায়ে হাঁটুর নীচে হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত তাহার থকথকে তৈলাক্ত ঘা।

এই ঘায়ের জোরে সে ভিখুর চেয়ে বেশী রোজগার করে। সে জন্য ঘা'টিকে সে বিশেষ যত্নে সারিতে দেয় না।

ভিখু মধ্যে মধ্যে গিয়া তাহার কাছে বসে। বলে, ঘা'টি সারবো না, লয়?'

ভিখারিণী বলে, 'খুব। অসুদ দিলে অখনি সারে।'

ভিখু সাগ্রহে বলে, 'সারা তবে, অসুদ দিয়া চটপট সারাইয়া ল। ঘা সারলে তোর আর ভিক্ মাগতি অইবো না,—জানস্? আমি তোরে রাখুম।'

'আমি থাকলি' ত।'

'ক্যান? থাকবি না ক্যান? খাওয়ামু পরামু, আরামে রাখমু, পায়ের পরনি পা'টি দিয়া গাঁট হইয়া বইয়া থাকবি। না করস তুই কিয়ের লেগে?'

অত সহজে ভুলিবার মেয়ে ভিখারিণী নয়। খানিকটা তামাকপাতা মুখে গুঁজিয়া সে বলে; 'দুদিন বাদে মোরে যখন তুই খেদাইয়া দিবি, ঘা'টি মুই তখন পামু কোয়ানে?'

ভিখু আজীবন একনিষ্ঠতার প্রতিজ্ঞা ক'রে, সুখে রাখিবার লোভ দেখায়। কিন্তু ভিখারিণী কোন মতেই রাজী হয় না। ভিখু ক্ষুণ্নমনে ফিরিয়া আসে।

এদিকে আকাশে চাঁদ ওঠে, নদীতে জোয়ার-ভাঁটা বয়, শীতের আমেজে বায়ুস্তরে মাদকতা দেখা দেয়। ভিখুর চালার পাশে কলাবাগানে চাঁপাকলার কাঁদি শেষ হইয়া আসে। বিন্নু মাঝি কলা বিক্রির পয়সায় বৌকে রূপার গোট কিনিয়া দেয়। তালের রসের মধ্যে নেশা ক্রমেই ঘোরানো ও জমাট হইয়া ওঠে। ভিখুর প্রেমের উত্তাপে ঘৃণা উবিয়া যায়। নিজেকে সে আর সামলাইয়া রাখিতে পারে না।

একদিন সকালে উঠিয়াই সে ভিখারিণীর কাছে যায়। বলে, 'আইচ্ছা, ল, ঘা লইয়াই চল!'

ভিখারিণী বলে, 'আগে আইবার পার নাই? যা, অখন মর গিয়া, আখার তলের ছালি খা গিয়া।'

'ক্যান? ছালি খাওনের কথাডা কি?'

'তোর লাইগা হাঁ কইরা বইসা আছি ভাবছস তুই, বটে? আমি উই উয়ার সাথে রইছি।'

ওদিকে তাকাইয়া ভিখু দেখিতে পায় তাহারই মত জোয়ান দাড়িওয়ালা এক খঞ্জ ভিখারী খানিক তফাতে আসন করিয়াছে। তাহার ডান হাতটির মত ওর একটি পা হাঁটুর নীচে শুকাইয়া গিয়াছে, বিশেষ যত্নসহকারে এই অংশটুকু সামনে মেলিয়া রাখিয়া সে আল্লার নামে সকলের দয়া প্রার্থনা করিতেছে।

পাশে পড়িয়া আছে কাঠের একটি কৃত্রিম হ্রস্ব পা।

ভিখারিণী আবার বলিল, 'বসস যে? যা, পালাইয়া যা, দেখলি খুন কইরা ফেলাইবো কইয়া দিলাম।'

ভিখু বলে, 'আরে থো, খুন অমন সব হালাই করতিছে। উয়ার মত দশটা মাইন্ষেরে আমি একা ঘায়েল কইরা দিবার পার্তাম, তা জানস? আমি তোরে রাখুম।'

ভিখারিণী বলে, 'পারস্ তো যা না উয়ার সাথে লাগ না গিয়া। আমার কাছে কি?'

'উয়াকে তুই ছাড়ান দে। আমার কাছে চ।'

'ইরে সোনা! তামুক খাবা? ঘা দেইখা পিছাইছিলি, তোর লগে আর খাতির কিরে হালার পুত? উয়ারে ছাড়ুম ক্যান? উয়ার মত কামাস তুই? ঘর আছে তোর? ভাগবি তো ভাগ,

নইলে গাল দিমু কইলাম।'

ভিখু তখনকার মত প্রস্থান করে কিন্তু হাল ছাড়ে না। ভিখারিণীকে একা দেখিলেই কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। ভাব জমাইবার চেষ্টা করিয়া বলে, 'তোর নামটো কি ্যা?'

এমনি তাহারা পরিচয়হীন যে এত কাল পরস্পরের নাম জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও বোধ করে নাই!

ভিখারিণী কালো দাঁতের ফাঁকে হাসে।

'ফের লাগতে আইছস্? হোই ও বুড়ীর কাছে যা।' ভিখু তাহার কাছে উবু হইয়া বসে। পয়সার বদলে অনেকে চাল ভিক্ষা দেয় বলিয়া আজকাল সে কাঁধে একটা ঝুলি ঝুলাইয়া বেড়ায়। ঝুলির ভিতর হইতে একটা প্রকাণ্ড মর্তমান কলা বাহির করিয়া ভিখারিণীর সামনে রাখিয়া বলে, 'খা। তোর লেগে চুরি কইরা আনছি।'

ভিখারিণী তৎক্ষণাৎ খোসা ছাড়াইয়া প্রেমিকের দান আত্মসাৎ করে। খুশী হইয়া বলে, 'নাম শুনবার চাস? পাঁচী কয় মোরে, পাঁচী। তুই কলা দিছস, নাম কইলাম, এবারে ভাগ।'

ভিখু উঠিবার নাম করে না। অত বড় একটা কলা দিয়া শুধু নাম শুনিয়া খুশী হওয়ার মত শৌখীন সে নয়। যতক্ষণ পারে ধুলোর উপর উবু হইয়া বসিয়া পাঁচীর সঙ্গে সে আলাপ করে। ওদের স্তরে নামিয়া না গেলে সে আলাপকে কেহ আলাপ বলিয়া চিনিতে পারিবে না। মনে হইবে পরস্পরকে তাহারা যেন গাল দিতেছে। পাঁচীর সঙ্গীটির নাম বসির। তাহাব সঙ্গেও সে একদিন আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল।

'সেলাম মিয়া।'

বসির বলিল, 'ইদিকে ঘুরাফিরা কি জন্য? সেলাম মিয়া হতিছে। লাঠির এক ঘায়ে শিরটি ছেঁচ্যা দিমু নে।'

দুজনে খুব খানিকটা গালাগালি হইয়া গেল। ভিখুর হাতে লাঠি ও বসিরের হাতে মস্ত একটা পাথর থাকায় মারামারিটা আর হইল না।

নিজের তেঁতুল গাছের তলায় ফিরিয়া যাওয়ার আগে ভিখু বলিল, 'র', তোরে নিপাত করতিছি।'

বসির বলিল, 'ফের উয়ার সাথে বাতচিত করলি, জানে মাইরা দিমু, আল্লার কিরে।'

এই সময় ভিখুর উপার্জন কমিয়া আসিল।

পথ দিয়া প্রত্যহ নূতন নূতন লোক যাতায়াত করে না। একেবারে প্রথমবারের জন্য যাহারা পথটি ব্যবহার করে দৈনন্দিন পথিকদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা দুই মাসের ভিতরেই মুষ্টিমেয় হইয়া আসে। ভিখুকে একবার যাহারা একটি পয়সা দিয়াছে পুনবায় তাহাকেই দান করিবার প্রয়োজন তাহাদের অনেকেই বোধ করে না। সংসারে ভিখারীর অভাব নাই।

কোন রকমে ভিখুর পেট চলিতে লাগিল। হাটবার ছাড়া রোজগারের একটি পয়সাও সে বাঁচাইতে পারিল না। সে ভাবনায় পড়িয়া গেল।

শীত পড়িলে খোলাচালার নীচে থাকা কষ্টকর হইবে। যেখানে হোক চারিদিকে ঘেরা যেমন-তেমন ঘর একখানা তাহার চাই। মাথা গুঁজিবার একটা ঠাঁই আর দুবেলা খাইতে না পাইলে কোন যুবতী ভিখারিণীই তাহার সঙ্গে বাস করিতে রাজী হইবে না। অথচ উপার্জন তাহার যেভাবে কমিয়া আসিতেছে এভাবে কমিতে থাকিলে শীতকালে নিজেই হয়তো সে পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে না।

যে ভাবেই হোক আয় তাহাকে বাড়াইতেই হইবে।

এখানে থাকিয়া আয় বাড়াইবার কোন উপায় সে দেখিতে পায় না। চুরি-ডাকাতির উপায় নাই, মজুর খাটিবার উপায় নাই, একেবারে খুন করিয়া না ফেলিলে কাহারও কাছে অর্থ ছিনাইয়া লওয়া একহাতে সম্ভব নয়। পাঁচীকে ফেলিয়া এই সহর ছাড়িয়া কোথাও যাইতে তাহার ইচ্ছা হয় না। আপনার ভাগ্যের বিরুদ্ধে ভিখুর মন বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। তাহার চালার পাশে বিন্নু মাঝির সুখী পারিবারিক জীবনটা তাহাকে হিংসায় জর্জরিত করিয়া দেয়। এক-এক দিন বিন্নুর ঘরে আগুন ধরাইয়া দিবার জন্য মন ছটফট করিয়া ওঠে। নদীর ধারে খ্যাপার মত ঘুরিতে ঘুরিতে মাঝে মাঝে তাহার মনে হয় । পৃথিবীর সমস্ত পুরুষকে হত্যা করিয়া পৃথিবীর যত খাদ্য ও যত নারী আছে একা সব দখল করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হইবে না।

আরও কিছুকাল ভিখু এমনি অসন্তোষের মধ্যে কাটাইয়া দিল। তারপর একদিন গভীর রাত্রে ঝুলির মধ্যে তাহার সমস্ত মূল্যবান জিনিস ভরিয়া জমানো টাকা কটি কোমরের কাপড়ে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ভিখু তাহার চালা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। নদীর ধারে একদিন সে হাতখানেক লম্বা একটা লোহার শিক কুড়াইয়া পাইয়াছিল। অবসর মত পাথরে ঘষিয়া ঘষিয়া শিকটির একটা মুখ সে চোখা করিয়াছে। এই অস্ত্রটি সে ঝুলির মধ্যে ভরিয়া সঙ্গে লইল।

অমাবস্যার অন্ধকারে আকাশ ভরা তারা তখন ঝিকমিক করিতেছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা। বহুকাল পরে মধ্যরাত্রির জনহীন জগতে মনের মধ্যে ভয়ানক একটা কল্পনা নিয়া বিচরণ করিতে বাহির হইয়া ভিখুর সহসা অকথনীয় উল্লাস বোধ হইল। নিজের মনে অস্ফুটস্বরে সে বলিয়া উঠিল, 'বাঁ-টি লইয়া ডানটিরে যদি রেহাই দিতা ভগমান!'

নদীর ধারে ধারে আধমাইল হাঁটিয়া গিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া সে সহরে প্রবেশ করিল। বাজার বাঁ-হাতি রাখিয়া ঘুমন্ত সহরের বুকে ছোট ছোট অলি-গলি দিয়া সহরের অপরপ্রান্তে গিয়া পৌঁছিল, সহরে যাওয়ার পাকা রাস্তাটি এখান দিয়া সহর হইতে বাহির হইয়াছে। নদী ঘুরিয়া আসিয়া দু মাইল তফাতে এই রাস্তারই পাশে পাশে মাইল খানেক রহিয়া গিয়া আবার দক্ষিণে দিক পরিবর্তন করিয়াছে।

কিছুদূর পর্যন্ত রাস্তার দু'দিকে ফাঁকে ফাঁকে দু'একটি বাড়ী চোখে পড়ে। তারপর ধানের ক্ষেত ও মাঝে মাঝে জঙ্গলাকীর্ণ পতিত ডাঙ্গার দেখা পাওয়া যায়। এমনি একটা জঙ্গলের ধারে খানিকটা জমি সাফ করিয়া পাঁচ-সাতখানা কুঁড়ে তুলিয়া কয়েকটা হতভাগা মানুষ একটি দরিদ্রতম পল্লী স্থাপিত করিযাছে। তার মধ্যে একটি কুঁড়ে বসিরের। ভোরে উঠিয়া ঠকঠক শব্দে কাঠের পা ফেলিয়া সে সহরে ভিক্ষা করিতে যায়, সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে। পাঁচী গাছের পাতা জ্বালাইয়া ভাত রাঁধে, বসির টানে তামাক। রাত্রে পাঁচী পায়ের ঘা'য়ে ন্যাকড়ার পটি জড়ায়। বাঁশের খাটে পাশাপাশি শুইয়া তাহাদের কাটা কাটা কদর্য ভাষায় গল্প করিতে করিতে তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে। তাহাদের নীড়; তাহাদের শয্যা ও তাহাদের দেহ হইতে ভ্যাপসা পচা দুর্গন্ধ উঠিয়া খড়ের চালের ফুটা দিয়া বাহিরের বাতাসে মিশিতে থাকে।

ঘুমের ঘোরে বসির নাক ডাকায়। পাঁচী বিড়বিড় করিয়া বকে।

ভিখু একদিন ওদের পিছু পিছু আসিয়া ঘর দেখিয়া গিয়াছিল। অন্ধকারে সাবধানে ঘরের পিছনে গিয়া বেড়ার ফাঁকে কান পাতিয়া সে কিছুক্ষণ কচু বনেব মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ঘুরিয়া ঘরের সামনে আসিল। ভিখারীর কুঁড়ে, দরজার ঝাঁপটি পাঁচী ভিতর হইতে বন্ধ করে নাই, শুধু ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। ঝাঁপটা সন্তর্পণে একপাশে সরাইয়া দিয়া ঝুলির ভিতর হইতে

শিকটা বাহির করিয়া শক্ত করিয়া ধরিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বাহিরে তারার আলো ছিল, ঘরের ভিতরে সেটুকু আলোরও অভাব। দেশলাই জ্বালিবার অতিরিক্ত হাত নাই; ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভিখু ভাবিয়া দেখিল বসিরের হৃৎপিণ্ডের অবস্থানটি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বাঁ হাতের আঘাত, ঠিক জায়গামত না পড়িলে বসির গোলমাল করিবার সুযোগ পাইবে। তাহাতে মুশকিল অনেক।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বসিরের শিয়রের কাছে সরিয়া গিয়া একটিমাত্র আঘাতে ঘুমন্ত লোকটার তালুর মধ্যে শিকের চোখা দিকটা সে প্রায় তিন আঙ্গুল ভিতরে ঢুকাইয়া দিল। অন্ধকারে আঘাত কতদূর মারাত্মক হইয়াছে বুঝিবার উপায় ছিল না। শিকটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়াছে টের পাইয়াও ভিখু তাই নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। একহাতে সবলে বসিরের গলা চাপিয়া ধরিল।

পাঁচীকে বলিল, 'চুপ থাক।। চিল্লাবি তো তোরেও মাইরা ফেলামু।'

পাঁচী চেঁচাইল না, ভয়ে গোঙাইতে লাগিল।

ভিখু তখন আবার বলিল, 'একটুকু আওয়াজ নয়, ভালা চাস ত একদম চুপ মাইরা থাক।'

বসির নিস্পন্দ হইয়া গেলে ভিখু তাহার গলা হইতে হাত সরাইয়া নিল।

দম নিয়া বলিল, 'আলোটা জ্বাইলা দে, পাঁচী।'

পাঁচী আলো জ্বালিলে ভিখু পরম তৃপ্তির সঙ্গে নিজের কীর্তি চাহিয়া দেখিল। একটি মাত্র হাতের সাহায্যে অমন জোয়ান মানুষটাকে ঘায়েল করিয়া গর্বের তাহার সীমা ছিল না। পাঁচীর দিকে তাকাইয়া সে বলিল, 'দেখছস? কেডা কারে খুন করল দেখছস? তখন পই পই কইরা কইলাম, মিয়াবাই ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার লারবা গো, ছাড়ান দেও। শুইনা, মিয়াবায়ের অইল গোসা? কয় কিনা, শির ছেঁচ্চ্যা দিমু। দেন গো দেন, শিরটা আমার ছেঁচ্চ্যাই দেন মিয়াবাই—' বসিরের মৃতদেহের সামনে ব্যঙ্গভরে মাথাটা একবার নত করিয়া ভিখু মাথা দুলাইয়া হ্যা হ্যা করিয়া হাসিতে লাগিল। সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'ঠ্যারাইন বোবা ক্যান গো? আরে কথা ক' হাড়াহাবাইতা মাইয়া! তোরেও দিমু নাকি সাবাড় কইরা,—অ্যাঁ?'

পাঁচী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'ইবারে কি করবি?'

'দ্যাখ কি করি! পয়সা-কড়ি ক'নে গুইনা রাখছে, আগে তাই ক।'

বসিরের গোপন সঞ্চয়ের স্থানটি পাঁচী অনেক কষ্টে আবিষ্কার করিয়াছিল। ভিখুর কাছে প্রথমে সে অজ্ঞতার ভান করিল। কিন্তু ভিখু আসিয়া চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিলে প্রকাশ করিতে পথ পাইল না।

বসিরের সমস্ত জীবনের সঞ্চয় কম নয়, টাকায় আধুলিতে একশত টাকার উপর। একটা মানুষকে হত্যা করিয়া ভিখু পূর্বে ইহার চেয়ে বেশী উপার্জন করিয়াছে। তবু সে খুশী হইল। বলিল, 'কি কি নিবি পুঁটলি বাঁইধা ফ্যালা পাঁচী। তারপর ল' রাইত থাকতে মেলা করি। খানিক বাদে নওমির চাঁদ উঠবো, আলোয় আলোয় পথটুক্ পার হমু।'

পাঁচী পুঁটুলি বাঁধিয়া লইল। তারপর ভিখুর হাত ধরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় গিয়া উঠিল। পূর্বাকাশের দিকে চাহিয়া ভিখু বলিল, 'অখনই চান্দ উটবো পাঁচী।'

পাঁচী বলিল, 'আমরা যামু কনে?'

'সদর। ঘাটে না' চুরি করুম। বিয়ানে ছিপতিপুরের সামনে জংলার মুদা ঢুইকা থাকুম, রাইতে একদম সদর। পা চালাইয়া চ' পাঁচী, এক কোশ পথ হাঁটন লাগব।'

পায়ের ঘা নিয়া তাড়াতাড়ি চলিতে পাঁচীর কষ্ট হইতেছিল। ভিখু সহসা একসময় দাঁড়াইয়া

পড়িল। বলিল, 'পায়ে নি তুই ব্যথা পাস পাঁচী?'

'হ', ব্যথা জানায় পাঁচী।

'পিঠে চাপামু?'

'পারবি ক্যান?'

'পারুম, আয়।'

ভিখুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচী তাহার পিঠের উপর ঝুলিয়া রহিল। তাহার দেহের ভারে সামনে ঝুঁকিয়া ভিখু জোরে জোরে পথ চলিতে লাগিল। পথের দু'দিকে ধানের ক্ষেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূর গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।

হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংস আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনদিন পাইবেও না।

সরীসৃপ

চারিদিকে বাগান, মাঝখানে প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি। জমি কিনিয়া বাড়িটি তৈরী করতে চারুর শ্বশুরের লাখ টাকার উপর খরচ হইয়াছিল। কিন্তু মোটে তিরিশ হাজার টাকার দেনার দায়ে এই সম্পত্তি চারুর হাত হইতে খসিয়া বনমালীর হাতে চলিয়া গিয়াছে।

প্রথম বয়সে চারু তার টনটনে বুদ্ধির সাহায্যে শ্বশুরের সম্পত্তির এমন চমৎকার বিলি ব্যবস্থাই করিয়াছিল যে, আত্মীয়-পর কেহ কোন দিন কোন দিক দিয়া তাহার একটি পয়সা অপচয় করিতে পারে নাই। কিন্তু বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও বিকারহীনতা বজায় রাখিতে চারুর তিনটি বিশেষ অসুবিধা ছিল। প্রথমতঃ, আজীবন তাহাকে স্ত্রীলোক হইয়াই থাকিতে হইল। দ্বিতীয়তঃ, তাহার আধপাগলা স্বামী বিশ বছরের মধ্যে একদিনও প্রাণত্যাগ করিল না, অথচ এই বিশ বছরের প্রত্যেকটি মুহূর্ত বেশ ভাল মানুষের মতই স্ত্রীর চরিত্রে ভয়ঙ্কর সন্দিহান হইয়া রহিল। তৃতীয়তঃ, বয়স বাড়ার সঙ্গে চারুর একমাত্র পুত্রটিরও স্বাভাবিক বুদ্ধি বিকাশ পাইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

শেষ জীবনে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও ভীরুতাগ্রস্ত চারু তাই সম্পত্তির সুব্যবস্থার নামে নানা রকম মজা করিতে লাগিল। যেদিকে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই সেদিকে সে তার অতি সাবধানী দৃষ্টিতে ব্যাপৃত রাখিল। আর যেদিকে সর্বনাশের পথ খোলা রহিল সে দিকটা লাভ করিল তাহার উদাসীনতা ; যাহাকে বিশ্বাস করার কথা, তাহাকে সে করিল একান্ত ভাবে অবিশ্বাস, আর যাহাকে জেলে দিয়া নিজেকে তাহার বাঁচানোই ছিল উচিত, তাহার মত বিশ্বাসী লোক সংসারে সে আর দেখিতে পাইল না।

ফলে চারুর যাহা রহিল তাহার নাম কিছুই না থাকা।

কোন লাভ হোক বা না হোক সকলের সঙ্গে শুধু গায়ের জ্বালাতেই বিবাদ করিয়া তবে চারু হার মানিয়াছিল। বনমালীর সঙ্গে সে লড়াই করিল কিন্তু বিবাদ করিল না।

চারুর বিবাহ হয় সতের বৎসর বয়সে। বনমালী তখন পনের বৎসরের বালক মাত্র।

চারুর শ্বশুর রামতারণ প্রত্যেক শনিবার বারাকপুরে গঙ্গার ধারে একটা বাগানবাড়িতে স্ফূর্তি করিতে যাইত। বনমালীর বাবা ছিল তাহার প্রতিবেশী, বন্ধু এবং মোসাহেব। তাহাদের ছোট দ্বিতল গৃহের সামনে মোটর থামাইয়া রামতারণ বনমালীর বাবাকে মোটরে তুলিয়া লইত। বনমালীকে হাসিয়া বলিত, 'বৌমাকে পাহারা দিস বুনো।'

হাসিয়া বলিলেও কথাটি পরিহাস নয়। নিজের পাগল ছেলের বৌ বলিয়া নয়, স্ত্রী-জাতির সতীত্বেই রামতারণ অবিশ্বাস করিত। কোথাও যাওয়ার আগে সে তাই বাড়িতে পাহারা রাখিয়া যাইত। কিন্তু রামতারণের বুদ্ধি ছিল। চাকর-দাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাপারটা প্রকাশ করিয়া দিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। মোসাহেবের সরল ছেলেটাকে সে তাই বাড়িতে রাখিয়া যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া নানা কৌশলে নিজের অনুপস্থিতির সময়ে চারুর গতিবিধির ইতিহাস জানিয়া লইত। বনমালীর বাবা সবই বুঝিত কিন্তু কিছু বলিত না। হাসিত এবং কর্তব্যে অবহেলা করিয়া রামতারণের বাড়ি ছাড়িয়া মার জন্য মন কেমন করায় বনমালী নিজের বাড়ি চলিয়া আসিয়াছিল জানিতে পারিলে আচ্ছা করিয়া তাহার কান মলিয়া দিত।

চারুও বুঝিত। কিন্তু অবুঝের মত তাহার রাগটা বনমালীর উপরে গিয়া পড়িত না। বনমালীকে সে যত্ন করিয়া খাওয়াইত, সারাদিন তাহার সঙ্গে গল্প করিত এবং রাত্রে নিজের শোবার ঘরের পাশের ঘরখানায় তাহাকে বিছানা করিয়া দিয়া মাঝখানের দরজাটা খোলা রাখিয়া দিত। স্বামী গোলমাল করিলে সভয়ে বলিত, 'চুপ চুপ। বাবার হুকুম।' এবং রামতারণকে তাহার ছেলে এমনি যমের মত ভয় করিত যে আর কথাটি না কহিয়া সে শান্ত শিশুর মত ঘুমাইয়া পড়িত।

কয়েক বৎসর পরে রামতারণের মৃত্যুর পর এ ব্যবস্থা রহিত হইয়া গেল বটে কিন্তু বনমালীর যাতায়াত বজায় রহিল। যাতায়াত সে কমাইয়া ফেলিল অনেক বয়সে, সহরের ভিতরে একটা বাড়ি করিয়া উঠিয়া যাবিার পর।

আজ বিপদে পড়িয়া বনমালীকে অতিরিক্ত খাতির করিয়া কোন সুবিধা আদায় করিবার চেষ্টার মধ্যে নানা কারণে চারুর যথেষ্ট লজ্জা ও অপমান ছিল। তবু একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া পাখা হাতে কাছে বসিয়া এমনি উত্তপ্ত সমাদরের সঙ্গেই বনমালীকে সে খাওয়াইতে বসাইল যে তাহাতে পাষাণও গলিয়া জল হইয়া যায়।

বলিল, 'ভগবান সুবুদ্ধি দিয়েছিলেন তাই বাগানবাড়ী তোমার কাছে বাঁধা রাখবার কথা মনে হয়েছিল, ভাই। আমার সর্বস্ব গেছে, যাক, কি আর করব ; —সবই মানুষের কপাল। মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু যে রইল, এই আমার ঢের।'

বনমালী একবার মুখ তুলিয়া চাহিল মাত্র। চারুর মাথার চুলের কালিমা ফ্যাকাসে হইয়া আসিয়াছে কেবল এইটুকু লক্ষ্য করিয়া আবার সে আহারে মন দিল।

আসল ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এইবার একটু মিঠা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করিয়া চারু বলিল, 'নিরামিষ কপির ডালনা তোমার বোধ হয় ভাল লাগছে না, না ভাই?'

'বেশ লাগছে।'

চারুর ছোট বোন পরী একমাসের ছেলে-কোলে কাছে বসিয়া ছিল। এতক্ষণ কথা বলিতে না পারিয়া তার ভাল লাগিতেছিল না। এইবার সুযোগ পাইয়া বলিল, 'এটা কিন্তু আপনি ভদ্রতা করে বললেন, বনমালী দাদা। ডালনা নিশ্চয় ভাল হয়নি। দিদিকে কত বললাম, আমি রাঁধি দিদি, আমি রাঁধি, দিদি কি কিছুতে আমাকে রাঁধতে দিলে!'

চারু মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিল, 'না রেঁধেছিস বেশ করেছিস বাবু। ওইটুকু ছেলে

নিয়ে রান্না করলে খেতে মানুষের ঘেন্না হত না?'

পরী উত্তেজিত হইয়া বলিল, 'ঘেন্না হত! আমার রান্না খেতে বনমালীদাদার ঘেন্না হত, স্বয়ং বিধাতা একথা বললেও আমি বিশ্বাস করিনে দিদি!'

চারু একটু হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা নে, না করিস না করিস। একটু চুপ কর। মানুষের সঙ্গে দু'টো কথা বলতে দে।'

'আমিও কথাই বলছি।'

চারু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বোনের দিকে তাকাইল। কুড়ি-বাইশ হাজার টাকা খরচ করিয়া সে যে তাহার বিবাহ দিয়াছিল এমনি রাগের সময় সে কথাটা মনে পড়িয়া আজকাল চারুর মনের মধ্যে খচখচ করিয়া বেঁধে।

পরীর ছেলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। দিদি উপস্থিত থাকিতে বনমালীর কাছে আমল পাওয়ার সুবিধা হইবে না টের পাইয়া ছেলেকে শোয়ানোর প্রয়োজনটা এতক্ষণে সে অনুভব করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'অমন করে তাকাচ্ছ কেন দিদি? মুখে কিছু লেগে আছে নাকি আমার?' বলিয়া বনমালীর দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া সে চলিয়া গেল।

চারু বলিল, 'দেখলে ভাই? শুনলে মেয়ের কথাবার্তা? আমি যেন ওর ইয়ার! আর এই সেদিনও কেঁদে কেঁদে আমায় চিঠি লিখেছে, ও দিদি, আমাকে শ'পাঁচেক টাকা পাঠিয়ে দিও দিদি! টাকার বেলা দিদি দিদি, অন্য সময় সে কেউ নয়।'

বনমালী বলিল, 'ছেলেমানুষ, বোঝে না।'

'বোঝে না? হুঁঃ, কচি খুকী কিনা, বোঝে না! বোঝে ও এমনি করে, এ আর আমি টের পাইনে! দিদিব যে আব টাকা নেই, দিদি যে হুট বলতে পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে দেয়নি!'

বনমালী কিছু বলিল না। চারুও নিজের জ্বালা আব অভিমানে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

উহাদের স্তব্ধতা নিঃসম্পর্কীয়। কারণ আজ একজন প্রৌঢ়া নারী এবং অপরজন মধ্যবয়সী পাটের দালাল।

খানিক পরে চারু বলিল, 'যা বলছিলাম। ভাগ্যে এই বাড়ি আর বাগান তোমার কাছে বাঁধা রাখার কথা মনে হয়েছিল। টাকা দেবার মেয়াদ পার হয়ে গেছে বলে তুমি অবিশ্যি বাড়িটা নিয়ে নেবে না, কিন্তু আর কারো কাছে বাঁধা রাখলে কি সর্বনাশ হত বল তো!'

'তা বৈকি। বাগানবাড়ি পরের হাতে চলে যেত। কিন্তু আমার কাছে বাড়ি তো তুমি বাঁধা রাখোনি চারুদি, বিক্রী করেছিলে।'

'ওমা, সে কি? বাড়ি আমি বিক্রী করলাম কখন?'

বনমালী একটু হাসিয়া বলিল, 'দলিলের নকলটা একবার পড়ে দেখো। তিরিশ হাজার নগদ আর ওই টাকার পাঁচ বছরের সুদের দামে তুমি আমাকে বাড়ি বিক্রী করেছ। বরাবর সুদ দিয়ে এলে বলতে পারতে বাঁধা আছে।'

মুখ পাংশু হইয়া যাওয়াটা চারু সম্পূর্ণ নিবারণ করিতে পারিল না। কি বলিবে হঠাৎ সে ভাবিয়া পাইল না। শেষে বলিল, 'তুমি হাসছ, তাই বল!'

বনমালীর মুখের হাসি অনেক আগেই মুছিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে কিছু বলিল না। জীবনের একটা অভিজ্ঞতাকে বনমালী খুব দামী মনে করিয়া থাকে। তাহা এই যে, বক্তব্য সহজে দুবার মুখ দিয়া বাহির করিতে নাই। পুনরুক্তিতে কথার দাম কমিয়া যায়।

চারু আবার বলিল, 'আমি বলি কি, ত্রিশ হোক বত্রিশ হোক দেনা তো তোমার আমি

শুধতে পারছি না, এ বাড়ি দিয়ে তুমিই বা করবে কি ; তার চেয়ে বিক্রি করে ফেলে তোমার টাকাটা তুমি নিয়ে নাও, বাকীটা আমাকে দাও। তোমার ত্রিশ হাজার কেটে নিলে আমার যা থাকবে তাই দিয়ে দেশে একটা ছোটখাট বাড়ি তুলে বাস করিগে। জমি-জায়গা যা আছে দু'চার বিঘে তার খাজনা পাই না, ফসল পাই না, নিজে থাকলে একটা ব্যবস্থা হবে।'

বনমালী খাওয়া বন্ধ করিল। আজকাল কোন কিছুতেই সে বিস্ময় বোধ করে না, আকাশের একটা বজ্র পাখী হইয়া পাশ দিয়া উড়িয়া গেলেও না। কিন্তু চারুর কথায় সে যেন অবাক হইয়া গিয়াছে এমনি মুখের ভাব করিয়া বলিল, 'তুমি এ বাড়ি বিক্রী করতে চাও? ক্ষেপেছ!'

চারু সভয়ে বলিল, 'কেন? তোমার টাকা তো তুমি পাবে!'

'আমার টাকা চুলোয় যাক।'

চারু আরও ভয় পাইয়া বলিল, 'রাগ ক'রো না ভাই। মেয়েমানুষ, কিছুই তো বুঝিনে!'

বনমালী বলিল, 'ভুবনের বাড়ি বিক্রী করার পরামর্শ তোমাকে দিলে কে? ওসব দুর্বুদ্ধি ক'রো না। সময়টা, কি জান চারুদি, আমারও তেমন সুবিধে যাচ্ছে না। তোমার এই বাড়িটা বন্ধক রেখে কিছু ধার পেয়েছি। একটু সামলে উঠলেই ছাড়িয়ে নেব।'

চারু রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল, 'তারপর?'

'ভুবনের বাড়ি ভুবন ফিরে পাবে।'

গলনালী প্রায় রুদ্ধ করিয়া চারু বলিল, 'কিন্তু তোমার টাকা? তোমার তিরিশ হাজার টাকা?'

'ভুবনের কাছে জমা থাকবে!'

একথা কেহ বিশ্বাস করে! নির্মূল আশার শোকে চারু কাঁদিয়া ফেলিল।

বনবালী বলিল, 'কেঁদো না চারুদি, আমি কি তোমার পর? আগে তুমি আমাকে কত ভালবাসতে।'

শুনিয়া চারুর কান্না থমকিয়া থামিয়া গেল। বনমালী যদি পরিহাস করিয়া থাকে, বিশেষ করিয়া আগের কথা তুলিয়া পরিহাস করিয়া থাকে, তবে সত্য সত্যই আর কোন আশা নাই।

'আমি যদি তোমার মনে কোন দিন ব্যথা দিয়ে থাকি, জেনো—'

বনমালী আবার খাওয়া বন্ধ করিল।

'তুমি আমার মনে ব্যথা দেবে কেন?'

চারু চোর বনিয়া গেল—'যদির কথা বলছি।'

বনমালী একেই গম্ভীর, সে আরও গম্ভীর হইয়া বলিল, 'ভুবন কোথায় চারুদি?'

চারু নিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিল, 'ও ভুবন, ভুবন। একবারটি এদিকে শুনে যাও তো, বাবা।'

ঘরের ভিতর হইতে ভুবন থুপ থুপ করিয়া পা ফেলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে অত্যাশ্চর্য মোটা! তাহার গলায় দুটি খাঁজ আছে, মনে হয় গালেও বুঝি খাঁজ পড়িবে।

বনমালী ভাবিল, এই ছেলেকে অত ভালবাসে, চারু তো আশ্চর্য মেয়েমানুষ!

মাসখানেক পরে পরী শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল। বলিয়া গেল, 'আর আসব না দিদি।'

আরও একমাস পরে বনমালী তার বুড়ো মা, আশ্রিত-আশ্রিতা, দাস-দাসী ও মোটবহর লইয়া শহরের ভিতরের বাড়ি ছাড়িয়া চারুর সহরতলীর বাড়িতে উঠিয়া আসিল। চারুর অনুমান করিতে কষ্ট হইল না যে বনমালীর অবস্থানটা সাময়িক হইবে না।

পাংশু মুখে সে জিজ্ঞাসা করি, 'ওখানে কি তোমাদের অসুবিধে হচ্ছিল ভাই?'

বনমালী বলিল, 'অসুবিধে হলে এতদিন বাস করলাম কি করে, চারুদি? সে জন্য নয়। মনে করছি, বাড়িটা আগাগোড়া মেরামত করব আর দু'খানা ঘর তুলবো ছাদে। মাস দুই তোমার এখানেই আশ্রয় নিতে এলাম।'

চারুকে বলিতে হইল, 'আহা আসবে বৈকি, সেকি কথা, বেশ করেছ।'

তারপর দুই মাসের মধ্যেও বনমালীর বাড়ি মেরামত আরম্ভ হইল না, ছাদে ঘর উঠিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। চারু গোপনে সংবাদ লইয়া জানিতে পারিল, নিজের বাড়ি বনমালী দুইশত দশ টাকায় ভাড়া দিয়াছে। ইতিমধ্যে বনমালীর নিরঙ্কুশ তৈলাক্ত অধিকার সদরের গেট হইতে পিছনের গলিতে খিড়কিব দরজা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গেল। অতিথির আদর ও সম্মান পাইয়া চারু তার নিজের বাড়িতে বাস করিতে লাগিল।

বনমালী বলে, 'অসুবিধে হচ্ছে, চারুদি?'

প্রশ্ন শুনিলে রাগ হয়!

'না ভাই, অসুবিধে কিছু নেই।'

'কিছুদিন যদি দেশে গিযে থেকে আসতে চাও, কেষ্টকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পার। দেশেটেশে মধ্যে মধ্যে যাওয়া দরকার বৈকি!'

'দেশে কি বাড়ি ঘর-দোর কিছু আছে ভাই, যে যাব?'

'হাজার দুই খরচ করলেই দেশে দিব্যি বাড়ি হয়। জমি-জায়গা আছে, খাজনা পাওনা, ফসল পাওনা, সব লুটেপুটে নিচ্ছে ; নিজে থাকলে লোকসানটা রদ হত।'

'জমি! জমি কই দেশে? কিছু কি আর আছে ভাই আমার, সর্বস্ব গেছে!'

বনমালী তখনকার মত চুপ করিয়া যায়।

তাহার মা হেমলতা বলেন, 'হ্যাঁরে, ওরা কি যাবে না?'

'কোথায় যাবে?'

'যে চুলোয় খুশি, আমাদের তা ভাববার দরকার? ক'দিন দ্যাখ, তারপর নিজের পথ দেখে নিতে বলে দে।'

'তাড়িয়ে দিতে পারব না, মা। ওসব আমার ধাতে নেই। নিজে থেকে যায় তো যাবে, নইলে রইল।'

কয়েকদিন পরে বনমালী আবার চারুকে বলে, 'শুনলাম, তুমি নাকি তীর্থে যেতে চাও? আমায় বলনি কেন চারুদি? আমি সব ব্যবস্থা করে দিতাম। তোমার ধর্ম কর্মে আমি বাধা দেব কেন?'

বুদ্ধির ধার পড়িয়া গেলেও চারু এত বোকা হইয়া পড়ে নাই যে ভুবনকে লইয়া এ বাড়ি হইতে নড়িবে। বনমালীর দুর্বলতা সে জানে। বনমালী সোজাসুজি কাহারো প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখাইতে পারে না। সামনে যে উপস্থিত থাকে তাহার মনে বেদনা দেওয়া বনমালীর সাধ্যাতীত। তাহার মনের চলাফেরার প্রস্তরময় পথে সে একপরত মাটি বিছাইয়া ফুল ফুটাইয়া রাখিবারই চেষ্টা করে।

তীর্থদর্শন কামনা রাখার অপবাদ চারু তাই অস্বীকার করে। বলে, 'কই তীর্থে যাওয়ার কথা আমি তো কিছু বলিনি? ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মামাকে বলছিলাম, স্বামী শ্বশুরের এই তীর্থ ছেড়ে আমার একপাও কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না। মাসীমা বুঝি মনে করেছেন, আমি তীর্থে যেতে চাই?

বনমালী একটা হাই তোলে। মেয়েমানুষের এত বুদ্ধি তার ভাল লাগে না।

'তবু, দেশ-বেড়ালে ভুবনের একটু উপকার হ'ত।'

'হায় রে কপাল, ওর আবার দেশ বেড়ানো!'

চারু কাঁদাকাটা করার উপক্রম করে।

বনমালী আর কিছু না বলিয়া বাগানে পায়চারি করিতে যায়। ভাবে, কি আর হইবে, থাক। গ্রামকে গ্রাম ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসিয়া আছে, চারুদি'র ভারটা আর এমন কি গুরু!

কাঁকর-বিছানো পথের ঠিক মাঝখান হইতে দু'টি কচি সবুজ ঘাসের শীষ বাহির হইয়াছে দেখিয়া বনমালী থমকিয়া দাঁড়ায়। পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া যমজ ভাই-এর মত তাদের দু'টিকে সে চাপা দিয়া দেয়। ভাবে, আগে চারুর যদি টাকা না থাকিত!

তারপর একদিন পরী বিধবা হইয়া দিদির কাছে চলিয়া আসিল। ছেলেকে সাবধানে মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে বলিতে লাগিল, 'দিদি গো, আমার কপাল পুড়েছে গো। কে অভিশাপ দিয়ে আমার এমন করলে গো, কে করলে।'

গলায় আঁচল জড়াইয়া পাক দিয়া চারু গলায় ফাঁস দিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু হেমলতা ফাঁস খুলিয়া দেওয়ায় সে চেষ্টা সে ত্যাগ করিল। খানিকক্ষণ মেঝেতে কপাল কুটিয়া হাত কামড়াইয়া চেঁচাইয়া এক বিষম কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল ও ছুটিয়া নিজের ঘরে গিয়া দড়াম করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। গলায় সে যে আর ফাঁস দিতেছে না সেটা বেশ বুঝা গেল, কারণ বাহির হইতে ভগবানের কাছে তাহার একটানা আবেদন শোনা যাইতে লাগিল, 'আমায় নাও ভগবান, এবার আমায় নাও।'

বনমালী পরীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, 'অমন করে কাঁদিসনে পরী ; ছেলের মুখ চেয়ে বুক বাঁধ। নে ওঠ, উঠে মাই দে ছেলেকে, ককিয়ে ককিয়ে গলা যে ওর কাঠ হয়ে গেল রে।'

হেমলতা বনমালীর সান্ত্বনা প্রত্যাহার করিয়া নিলেন।

'ওকে এখন ওসব বলিস নে বনমালী, কাঁদতে দে। শ্বশুর-বাড়ির লোকেরা ওর শুনেছি যে দজ্জাল, প্রাণ খুলে সেখানে কি ও একটু কাঁদতেও পেরেছে রে! এই প্রাণঘাতী শোক জোর করে চেপে রেখে শেষে কি অসুখে পড়বে মেয়েটা? খানিক কেঁদে নিক।'

পরী আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিল। বনমালীর বিপদের আর সীমা রহিল না। কান্না তাহার একেবারেই সহ্য হয় না। অথচ উঠিয়া যাইবার উপায় নাই। পরী মনে করিবে, দ্যাখো কি নির্মম ; আমার এমন শোকটা চোখ মেলে একটু চেয়েও দেখলে না!

ওদিকে চারুর সাড়াশব্দ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খানিকপরে দম নিয়া পরী বলিল, 'ও মাসীমা, দিদি কি করছে দেখুন।'

হেমলতা খোকাকে বনমালীর দিকে আগাইয়া দিলেন।

'ধর তো, দেখেই আসি একবার।'

বনমালী হাত বাড়াইল না।

'আমি দেখে আসছি।'

'তুই এখানে বোস।' পরীর ছেলেকে নিজের ছেলের কোলে এক রকম ফেলিয়া দিয়াই হেমলতা পলাইয়া গেলেন। খোকাকে সঙ্গে নিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহাকে আবার ফিরিয়া আসিতে হইত, সে ইচ্ছা হেমলতার ছিল না। এসব তাঁহার ভাল লাগে না,—সদ্য বিধবার এই কান্নাকাটি। তা ছাড়া কুপিত বায়ুর প্রকোপে সর্বদা তাঁহার মনের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে,

কোন প্রকার উত্তেজনা হওয়া কবিরাজের নিষেধ। পরের মেয়ের কপাল পোড়ার ঝাঁঝে শেষে কি তাঁহার তালু জলিবে!

চারুর ঘরের দরজা ঠেলিয়া বলিলেন, 'দরজা খোলো মা দরজা খোলো, ওসব কি করতে আছে? মাথা ঠাণ্ডা রাখো।'

বলিয়া ওদিকের জানালায় সরিয়া ঘরের ভিতরে তাকাইয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন। শরৎকালের ফাজিল মেঘের মত চারুর শোক ইতিমধ্যেই কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ভুবনকে আদর করিয়া সে তাহার মাথায় মাখাইতেছে কবিরাজী তেল।

হেমলতা চলিয়া গেলে পরী উঠিয়া বসিল। বনমালীর কাছে একা একা কাঁদিতে তাহার লজ্জা করে। মুখ হইতে এলোচুল সরাইয়া সে ভগ্নস্বরে বলিল, 'খোকাকে দিন, হাতটা বোধ হয় ওর ভেঙেই গেল।'

খোকাকে তার কোলে দিয়া বনমালী বলিল, 'তোর ছেলেটা তো বেশ হয়েছে রে!'

'থাক, আপনাকে আর ঠাট্টা করতে হবে না।'

বনমালীর দিকে পিছন করিয়া বসিয়া পরী খোকার মুখে মাই তুলিয়া দিল।

এবার বনমালী উঠিয়া যাইতে পারে, যাওয়াই সঙ্গত ; কিন্তু সে বসিয়াই রহিল। পরীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বনমালীর চেতনা কোনদিন বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ ছিল না। সে তার কাছে চিরদিনই চারুর ছোট বোন। আজ বনমালী লক্ষ্য করিল যে বিধবার বেশ ধারণ করায় পরীকে কমবয়সী চারুর মত দেখাইতেছে। তার ব্যবহার, তার মনোবিকার, তার কথা বলিবার ভঙ্গি যেন চারুর যৌবনকাল হইতে নকল করা। কেবল চারুর চেয়ে সে স্পষ্ট, স্বচ্ছ।

'তোর ঘাড়ে কি লেগে আছে রে, পরী?'

ঘাড়ে হাত বুলাইয়া পরী জবাব দিল, 'কি লেগে থাকবে? কিছু না।'

'তুই পাউডার মেখেছিস?'

পরী জোরে নিশ্বাস নিয়া বলিল, 'মেখেছিই তো, একশবার মেখেছি। আপনি কেন আমায় কালো বলেন?'

পরীর বৈধব্যের আঘাতেই বোধ হয় চারুর মাথা আর একটু খারাপ হইয়া গেল। চল্লিশ বছর বয়সেই তাহার চুলে এবার পাক ধরিল, কোমরে বাত দেখা দিল, পেটে হইল অম্বল। শোক আর অম্বলের মধ্যে কোন্ কারণে তাহার বুক সর্বদা জ্বালা করিতেছে সেটা আর সব সময় ঠিক বুঝিবার উপায় রহিল না।

হেমলতার কাছে সে কাঁদিয়া বলে, 'আমার মত অবস্থা মাসীমা শত্রুর যেন না হয়, দিনরাত ভগবানের কাছে এই কামনা জানাচ্ছি। কোনদিকে কূল-কিনারা নেই মাসীমা, আমি অকূলে ডুবেছি।'

হেমলতা বিরক্ত হন। মুখে বলেন, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখো মা, কি করবে, মাথা ঠাণ্ডা রাখো।'

মাথা চারু ঠাণ্ডা রাখিতে পারে না, ভাবিয়া ভাবিয়া মাথা গরম করে। একটা পেটের ছেলের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, ছেলে নিয়া কচি বোনটাও আসিয়া ঘাড়ে চাপিল। সে কোনদিক সামলাইবে?

পরীকে সে জিজ্ঞাসা করিল, 'কিছু রেখে গেছে?'

'না।'

'কিছু না? পোস্টাপিসে, ব্যাঙ্কে, তোর নামে কিছুই রেখে যায়নি?'

'কি রোজগার করত যে রেখে যাবে দিদি? মাস গেলে হাত খরচের টাকার জন্য বাপের কাছে হাত পাতত, রেখে যাবে!'

'আমি যা দিয়েছিলাম?'

'শ্বশুরের সিন্দুকে ঢুকেছে—খাট-পালঙ্ক ছাড়া।'

চারু কপালে চোখ তুলিয়া বলিল, 'তোর গয়না দেয়নি নাকি? তোকে যে আমি তের চোদ্দ হাজারের গয়না দিয়েছিলাম রে!'

'কিচ্ছুটি আমাকে দেয়নি দিদি, সব আটকে রেখেছে। আঁচল থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে বাক্স খুলে শ্বশুর নিজে সব বার করে নিল। খোকার গয়না পর্যন্ত।'

'এমন চামার! তা, আর দু'টো মাস তুই ধৈর্য ধরে থাকলি না কেন? কেমন করে আদায় করে নিতে হয় আমি দেখতাম।'

'বড় খারাপ ব্যবহার করে দিদি, থাকতে ভাল লাগল না!'

চারু হঠাৎ রাগিয়া উঠিল, 'থাকতে ভাল লাগে না! মেয়েমানুষের অত ভাল লাগা মন্দ লাগা কি লো, যা, কালকেই ফিরে যা তুই,—বুড়ো মরবার সময় খোকাকে তো কিছু দিয়ে যাবে।'

পরী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, 'আছে ছাই, দিয়েও যাবে ছাই! সাত ছেলের একটা রোজগার করে? তাদের দিয়ে যেতে হবে না? ও বাড়ী আমি আর যাচ্ছি না বাবু, হ্যাঁ।'

চারু আগুন হইয়া বলিল, 'ছেলে তবে তোর মানুষ করবে কে শুনি? তোকে খাওয়াবে কে শুনি? আমি! আমার আর সেদিন নেই পরী, বনমালী তাড়িয়ে দিলে নিজের ছেলে আমার খেতে পাবে না।'

'আমার ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না দিদি', বলিয়া মুখ ঘুরাইয়া পরী চলিয়া গেল।

চারু দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, 'আমার ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না দিদি! ভাবতে হবে না তো আমার বাড়িতে এসেছিস কেন লো হারামজাদি?

তিন দিন পরীর সঙ্গে সে কথা কহিল না। কিন্তু তাহাতেও পরীর কিছুমাত্র অনুতাপের লক্ষণ নাই দেখিয়া চারুর নিজের হাত-পা কামড়াইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল।

'দ্যাখ পরী, এত বাড় ভাল নয়।'

'নয় তো নয়, কি হবে?'

'খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করিনি তোকে আমি?'

'সবাই করে থাকে, তুমি একা নও।'

চারু বনমালীর শরণ নিল।

'মেয়েটা নিজের সর্বনাশ করছে ভাই। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এলে তাদেরই সুবিধে, একেবারে বঞ্চিত করবে।'

বনমালী কাজের ভিড়ে ব্যস্ততার ভান করিয়া বলিল, 'আহা, যাবে বৈকি চারুদি, যাবে। দু'দিন জুড়িয়ে গেলে ক্ষতি কি?'

চারু আর কিছু বলিতে সাহস পাইল না।

পরদিন পরী মুখভার করিয়া বলিল, 'লেগেছ তো পেছনে? জগতে কারো ভাল করতে নেই।'

'তুই আবার কবে আমার কি ভাল করলি লো?'

'এখানে আছ কার জন্য? ভেবে দেখেছ একবার?'

চারু চোখ পাকাইয়া বলিল, 'তোর জন্য, না? তুই দয়া করে থাকতে দিয়েছিস!'

'তাই।'

চট করিয়া ঘুরিয়া দম দম পা ফেলিয়া পরী চলিয়া গেল। চারু নিজের ঘরে গিয়া দেয়ালকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল, 'ওর জন্য আমি আর কিছু করব না, করব না, করব না ; এই তিন সত্যি করলাম, নারায়ণ সাক্ষী।'

পরীর ঔদ্ধত্য তার কাছে বেশীদিন অন্ধকার হইয়া রহিল না। ক্রমে ক্রমে ব্যাপারখানা বোঝা গেল।

বনমালীর খাওয়ার সময় চারু উপস্থিত থাকে, কয়েক দিন পরে পরীকেও দেখা যাইতে লাগিল। চারুর চেয়ে সে বনমালীর বেশী কাছ ঘেঁষিয়া বসে, চারুর হাতের পাখা অনেক আগেই দখল করিয়া রাখে, চারুর মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া বলে, 'খান, পেট আপনার ভরেনি। কখ্‌খনো ভরেনি। আমি বুঝি না। ওই খেয়ে মানুষ বাঁচে?'

বলে, 'কাল আপনাকে পেঁপের ডালনা রেঁধে দেব। খেয়ে দেখবেন বেশ রাঁধি।'

চারু এমন করিয়া বলিতে পারে না, এমন স্নেহসিঞ্চিত গাঢ় কণ্ঠে, এমন মনোহব আব্দারের ভঙ্গিমায়। অবাক হইয়া সে বোনের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে।

পরী বলে, 'হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছ দিদি? দুধটা এনে দাও! খাওয়া যে হয়ে এল, উঠে গেলে ভাল হবে?'

পরী যেন বনমালীর ছায়াটিকে বেদখল করিতে চায়। আশেপাশে কোথাও সে সর্বদা আছেই। বনমালীকে কখনো চুরুট খুঁজিতে হয় না, ওষুধ খাইতে ভুলিয়া যাইতে হয় না, দিনের মধ্যে দু'চার মিনিটের জন্য কারো সঙ্গে হাল্কা কথা বলিবার সাধ জাগিলে কেমন করিয়া টের পাইয়া পরী আসিয়া দাঁড়ায়, বলে, 'স্নান করতে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখে যাই আপনি কি করছেন।'

রাত্রে বনমালী বিছানায় শুইলে চুপি চুপি ঘরে আসে।

বলে, 'কি চাই বলুন।'

বনমালী হাসি গোপন করিয়া বলে, 'পা কামড়াচ্ছে—কেষ্টকে ডেকে দিয়ে যা। আর কিছু চাই না।'

পরী বলে, 'কেষ্ট কেন? আমি কি পা টিপতে জানি নে?'

অবশ্য পা সে টেপে না, অত বোকা পরী নয় ; কেষ্টকেই ডাকিয়া দেয়। হুকুম দিয়া যায়, 'যাবার সময় আলো নিভিয়ে দিস কেষ্ট।'

ছেলের দিকে চাহিবার সময় পরীর হয় না। ঝির কোলে পরীর ছেলে প্রায়ই মাতৃস্তন্যের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

বনমালীর চারিদিকে পরী যে বৃত্ত রচনা করিয়া রাখে তার পরিধির বাহিরে চারু পাক খাইয়া বেড়ায় ; কোথাও প্রবেশের ফাঁক দেখিতে পায় না।

ভাবে, কি মেয়ে বাবা! ও দেখছি সর্বনাশ করে ছাড়বে!

একদিন একটু বেশী রাত্রে খুব বাদল নামিয়াছে।

খানিক বর্ষণের পর অবিরত বিদ্যুৎ-চমক আর বজ্রপাত আরম্ভ হইয়া গেল ; প্রকৃতির সে এক মহামারী কাণ্ড।

চারু ভাবিল, অন্য ঘরে একা একা পরী বড় ভয় পাইয়াছে।

উঠিয়া দরজা খুলিয়া সে বাহিরে আসিল। একটু খোঁজ-খবর নিলে পরী খুশী হইবে। বনমালীকে ও যে-রকম বাগ মানাইয়া আনিতেছে ওকে একটু খুশী রাখা দরকার বৈ কি।

নিষুতি রাত, বাড়িটা একবার প্রাণঘাতী আলোয় চমকাইয়া উঠিয়া অন্ধকারে আড়ষ্ট হইয়া যাইতেছে। চারু পা চালাইয়া বারান্দাটুকু পার হইয়া গেল। কি জানি, একটা বজ্র যদি তাহার ঘাড়েই আসিয়া পড়ে।

পরীর ঘরের দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলিতে খুলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে দু'পা আগাইয়া চারু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এ দৃশ্য তাহাকে দেখিতে হইবে চারু তাহা কল্পনাও করে নাই। মেঘ-গর্জনে পরী ভয় পাইবে এ আশঙ্কা কয়েক মিনিটের জন্যও তাহার পোষণ করার প্রয়োজন ছিল না। পরী একা নয়। বনমালীর বুকের কাছে যদিও সে জড়োসড়ো হইয়াই তাহার কথা শুনিতেছে, সেটা ভয়ে নয়।

খোকার ছোট বিছানাটি মেঝেতে নামানো, বিছানা হইতে গড়াইয়া বনমালীর একপাটি জুতা দু'হাতে বুকের কাছে আঁকড়াইয়া ধরিয়া খোকা শান্তভাবে ঘুমাইয়া আছে।

পা হইতে মাথা অবধি চারু একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করিল। একটা ভয়ানক চীৎকার করিয়া বিছানায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরীকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দেওয়ার জন্য, গলা টিপিয়া তাহাকে একেবারে মারিবার জন্য, সে একটা অদম্য অস্থির প্রেরণা অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু সংসারে সব কাজ করা যায় না। কাকে সে কি বলিবে? এটা তাহার বোনের শয়ন-ঘর, কিন্তু ঘরের মালিক বনমালী। বনমালীকে কিছুতে বলা যায়ই না, পরীকে কিছু বলিলে বনমালী নিজে অপমানিত জ্ঞান করিবে। দারোয়ান দিয়া এই রাত্রেই যদি তাহাকে আর ভুবনকে বনমালী বাহির করিয়া দেয়, আটকাইবে কে? ছেলের হাত ধরিয়া এই দুর্যোগে সে যাইবে কোথায়?

চারু আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দরজা যেমন ভেজানো ছিল, তেমনি ভেজাইয়া দিল।

আকাশে এখনো বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, আকাশের একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চিড় খাওয়া বিদ্যুৎ। চারু ভাবিতে লাগিল, একি মহা বিস্ময়ের ব্যাপার যে পরী শেষ পর্যন্ত বনমালীকে জয় করিয়া ছাড়িল, সেদিনকার কচি মেয়ে পরী! এমন মূল্য দিয়াই সে বনমালীকে কিনিয়া নিল যে তাহার ছেলের সমগ্র ভবিষ্যৎটা সোনায় মণ্ডিত হইয়া গেল। বনমালী এইবার সারাজীবন অনুতাপ করিবে আর পরীর ছেলের পিছনে টাকা ঢালিবে।

হয়ত ভুবনকে না দিয়া এ বাড়িটা সে পরীকেই দান করিবে। বলিবে, 'ভুবন আর বাড়ি দিয়ে করবে কি চারুদি? পরীকেই দিয়ে এলাম।'

ঘরে গিয়া খাটে বসিয়া ছেলের গায়ে হাত রাখিয়া চারু অনেকক্ষণ চুপচাপ ভাবিল।

সে জানে উহারা তাহার যাওয়া-আসা টের পাইয়াছে। পাক টের। কাল তার যদি তাহার কাছে লজ্জা বোধ না করে, তাহারও লজ্জা পাইবার কোন কারণ থাকিবে না। পরী তাহার কে? কেউ নয়। ছুঁইতেও ঘৃণায় গা শিহরিয়া উঠিবে বলিয়া সে যাহার চোখ দু'টা উপড়াইয়া আনিল না, সে তাহার বোন হইবে কোন্ দুঃখে? কপাল পুড়িয়া যাওয়ার তিনমাসের মধ্যে এমন কাজ যে করিতে পারে বাড়ির ঝি-এর চেয়েও সে পর, অনাত্মীয়া। ওর অক্ষয় নরকের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

মনে মনে মস্ত এক প্রতিজ্ঞা করিয়া আঠারো বছরের ঘুমন্ত ছেলের মাথায় সস্নেহে চুমা

খাইয়া চারু মেঝেতে তাহার সংক্ষিপ্ত কম্বলের শয্যায় নামিয়া গেল।

এ বাড়িতে পাপের বন্যা বহিয়া যাক, এ ঘরখানাকে সে পবিত্র মনে করিবে।—যতদিন বাঁচে সপুত্র এই ঘরের বায়ু সে নিশ্বাসে গ্রহণ করিবে। বাহিরে এমন বৃষ্টি হইয়া গেল, তাহাদের গায়ে লাগিল কি? বাহিরে যত অন্যায়ই ঘটিয়া চলুক তাহাদের গায়ে ছোঁয়াচ লাগিবে না।

এই কথাটি বার বার ভাবিয়া এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করিয়াও চারু কিন্তু সমস্ত রাত ঘুমাইতে পারিল না। পরীর আদিম শৈশবের ইতিহাস ছায়াছবির রূপ নিয়া তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। বাপের বাড়ির গ্রামে পরী যখন ছেঁড়া ডুরে পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, আর বিবাহের পর এখানে আসিয়া পিঠে বেণী দুলাইয়া স্কুলে যাইত, তখনকার কথা। কত আদরে কত যত্নে তাহাকে সে মানুষ করিয়াছিল। সেই পরী যে আজ তাহার ভুবনের মুখের গ্রাস কাড়িয়া নেওয়ার জন্য এমন ভাবে নিজের সর্বনাশ করিল ইহার আকস্মিকতা ইহার অসামঞ্জস্য সমস্ত রাত চারুকে অভিভূত করিয়া রাখিল।

বনমালীকে ভালবাসিয়া, যৌবনের অপরিতৃপ্ত অসংযত ক্ষুধায় অথবা নেহাৎ ছেলেমানুষী খেয়ালে যে পরী এই নিদারুণ ভুল করিয়া থাকিতে পারে, চারুর মনে ঘুণাক্ষরেও সে কথা উদিত হইল না। যাহার বিবাহ হইয়াছে, যে তিন বছর স্বামীর ঘর করিয়াছে, বিশেষ করিয়া যে তাহার বোন, তাহার মধ্যে ও-সব পাগলামি চারু কল্পনা করিতে পারে না। চল্লিশ বছরের জীবনে কাহারো মধ্যেই আভিজাত্যের চিহ্ন তো সে খুঁজিয়া পায় নাই।

মতলব থাকে। যে দিকে যে ভাবে মানুষ পা ফেলুক, পিছনে মতলব থাকে।

বনমালীর আটত্রিশ বৎসর বয়স হইয়াছে। টাকা ছাড়া তাহার আর কি আছে যে তাহার টানে মেয়েমানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে? মানুষটা একটু অদ্ভুত, একটু গভীর। প্রথম বয়সে মনে মনে সেও তাহাকে একটু ভয় করিত। মনে হইত তাহার ভিতরটা কি কারণে মুচড়াইয়া মুচড়াইয়া পাক খাইতেছে, তাহার বড় যন্ত্রণা। তখন বনমালী যুবক। তাহার মধ্যে সে তো তখনও কোন আকর্ষণ আবিষ্কার করিতে পারে নাই! তাহার নৈকট্যকে, তাহার নির্বাক আবেদনকে, তাহার দু'চোখের গভীর তৃষ্ণাকে, সে যে কতবার অপমান করিয়াছে তাহার হিসাব হয় না।

তাহার সঙ্গে কথা কহিবার সময়ও কি সব সময় সে পাইত!

তাহার কাছে মানুষ হইয়া পরী কি তাহার মনের জোর এতটুকু পায় নাই? অসহায় আক্রোশে থাকিয়া থাকিয়া চারুর মনে হইতে লাগিল, এর চেয়ে সে-ই যদি সে সময় বনমালীর নিকট আত্মসমর্পণ করিত তাহাও ভাল ছিল, এ রকম বিপদ ঘটাইবার সুযোগ পরী আজ তাহা হইলে পাইত না।

চারুর জীবনে অন্ধ আবেগের স্থান ছিল না। সমস্ত জীবন তাহাকে সংসারের এলোমেলো বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। প্রথম জীবনে তাহার লড়াই ছিল অভাবের সঙ্গে আর গ্রামের দু'তিনটি যুবকের স্বভাবের সঙ্গে। বিবাহের পর তাহার লড়াই শুরু হইয়াছিল ধনসম্পদের পলাতক প্রবৃত্তির সঙ্গে আর নিজেকে সামলাইয়া না চলার দুরন্ত ইচ্ছার সঙ্গে। এর কোনটাই সহজ ছিল না। পুরুষ অভিভাবকের অভাবে সম্পত্তির ব্যবস্থা করিতে তাহার যেমন প্রাণান্ত হইত, অবাধ স্বাধীনতার সঙ্গে পাগলা স্বামীকে খাপ খাওয়াইতেও তাহার তেমনি অবিরাম নিজেকে শাসন করিয়া চলিতে হইত। হাতে টাকা, দেহে রূপ, মনে অতৃপ্ত যৌবন —এরকম ভয়ানক সমন্বয় ঘটিয়াছিল বলিয়া সারাজীবন তাহাকে অনেক ভুগিতে হইয়াছে।

চারুর হৃদয়ের কতকগুলি স্থান তাই ভয়ানক শক্ত।

পরদিন সকালে সে নিজে গিয়া পরীকে ডাকিয়া তুলিল, কিছুই যেন ঘটে নাই এমনিভাবে বলিল, 'নে, ওঠ এবার। অনেক বেলা হয়েছে।'

পরী সাড়া দিল না। পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

খোকাকে তুলিয়া নিয়া বাহিরে আসিয়া চারু হাঁফ ছাড়িল।

কিন্তু তখনও আর একজন বাকী।

বনমালীকে চারু আবিষ্কার করিল বাগানে।

একমুহূর্তের জন্য তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিল। এই বাগানে এক স্বপ্নধূসর সন্ধ্যায় বনমালী এক রকম জোর করিয়াই একদিন তাহাকে প্রায় চুম্বন করিয়া বসিয়াছিল। সেদিন যদি সে বাধা না দিত!

গাছের ডাল হইতে টপ টপ জল পড়িতেছিল। কতকগুলি ফুলের গাছ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চারু বলিল, 'কি বৃষ্টিটাই কাল হয়ে গেল।'

বনমালী বলিল, 'বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।'

'হ্যাঁ। ক'দিন গরমে প্রাণটা গেছে—আমি আজ একবার তারকেশ্বর যাব ভাই।'

বনমালী আচমকা বলিল, 'ক্ষেন্তির মা দুশো টাকা চেয়েছে, মেয়েকে নিয়ে কাশী যেতে চায়, তুমি যাবে ওদের সঙ্গে?'

চারু মাথা নাড়িল।

'কাশী মাথায় থাক, তোমাদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না ভাই। ক্ষেন্তির মার কি? হুট বলতে ও যেখানে খুশী যেতে পারে, আমরা পারিনে। আমাদের মায়া-মমতা আছে। বিশ বছর ধরে যার সঙ্গে—'

চারু একটা নিশ্বাস ফেলিল।

তারকেশ্বর রওনা হওয়ার আগে চারু বলিয়া গেল, 'ভুবন রইল ভাই, একটু দেখো। আর শোন, কাল পরীর একাদশী, এই বয়সে ওর একাদশী করাব কি দরকার কে জানে। কথা কি শুনবে মেয়ে! তোমাকে মানে, ফল-টল যদি খাওয়াতে পার একটু চেষ্টা করে দেখো ভাই।'

আগে, চারুর সরকার প্রথমে গিয়া একটা আস্ত বাড়ি ভাড়া করিয়া আসিত তবে চারু তারকেশ্বর যাইত। এবার সে সোজাসুজি যাত্রীনিবাসে গিয়া উঠিল।

প্রত্যেক দিন এই মানত করিয়া সে দেবতার কাছে পূজা দিল যে তাহার ফিরিয়া যাওয়ার আগেই পরী যেন কলেরা হইয়া মরিয়া যায়। পরীর যে আর বাঁচিয়া থাকার দরকার নাই দেবতাকে এই কথাটা সে খুব ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিল।

পরীর ছেলে? পরীর ছেলেকে সে মানুষ করিবে।

তৃতীয় দিন মন্দিরে পূজা দিয়া যাত্রীনিবাসে ফিরিয়া চারু দেখিল, একটি বৌ-এর কলেরা হইয়াছে। তাহাকে বিদায় করিবার ষড়যন্ত্র আর পলায়নপর যাত্রীদের কোলাহলে যাত্রীশালা সরগরম।

সকালে বৌটির সঙ্গে চারুর পরিচয় হইয়াছিল। স্বামীর অম্বলের অসুখের জন্য ছেলেমানুষ দেওরকে সঙ্গে নিয়াই মরিয়া হইয়া সে ধর্ণা দিতে আসিয়াছে। বৌটির নাম কনক, বয়স অল্প ; থুপ থুপ করিয়া পা ফেলিয়া ওর চলার ভঙ্গি অনেকটা পরীর মত।

দেওর শিশুকে দুধ খাইতে দিবে বলিয়া সকালে চারুর কাছে একটি পাথরের বাটি ধার

করিতে আসিয়াছিল। ঘনিষ্ঠতা হইতে মিনিট দশেক লাগিল বৈকি!

'হ্যাঁ মাসীমা, কদিন থাকবেন আপনি?'

চারু হিসাব করিয়া বলিল, 'আজ নিয়ে হ'ল তিনদিন, আরও পাঁচ ছ'দিন থাকবার ইচ্ছে আছে, এখন বাবা যা করেন। পরের কাছে পাগল ছেলে ফেলে এসেছি মা, থাকতে কি মন চায়। কিন্তু দেখি ক'টা দিন, ছেলেটাকে কেমন যত্ন আত্তি করে। আমি চোখ বুজলে ওদের কাছেই তো থাকতে হবে। রোসো বাছা এইখেনে, পা গুটিয়েই বোসো না, বিছানা একটু নোংরা হয়তো হবে। তুমি বুঝি ভাবছ ছেলেকে ওরা কি ভাবে রাখছে ফিরে গিয়ে আমি তা কি করে জানব? এতকাল একটা জমিদারী চালিয়ে এলাম, আমার কি ওসব ভুল হয় বাছা? সে ব্যবস্থা করেই এসেছি, আমাদের পদ্ম ঝিকে দুটো টাকা দিয়ে এসেছি, চোখ দিয়ে সব দেখবে, কান দিয়ে সব শুনবে, ফিরে গেলে আমায় সব বলবে।'

এখানে আসিয়া চারু কথা বলিয়া বাঁচিয়াছে। বাড়িতে থাকিলে ভাষার একটু সংযম দরকাব হয়, কে জানে কে গ্রাম্য মনে করিবে, বুড়ী মনে করিবে!

কিন্তু যে যার হৃদয়-চর্চা নিয়া থাকে।

কনক বলিয়াছিল, 'আপনি তাহ'লে আছেন ক'দিন? আমার দেওরকে একটু দেখবেন মাসীমা। বাবার দয়া হতে দু'দিন লাগে কি তিনদিন লাগে ঠিক তো কিছু নেই, একা কি করে থাকবে এখানে ভেবে বড় ভাবনা হচ্ছিল। আপনি যখন রইলেন তখন অবিশ্যি আর—'

কনক একটু হাসিয়াছিল, শিশুকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, 'মাসীমাকে প্রণাম কর শিশু।'

কাল কনক ধর্ণা দিবে স্থির হইয়াছিল, এখন আজ তাদের এই বিপদ!

ছেলেমানুষ শিশু একেবারে দিশেহারা হইয়া গিয়াছে, যে যা বলিতেছে তাই করিতে গিয়া কিছুই সে করিতে পারিতেছে না।

এদিকে যাত্রীনিবাসের কর্তা একটা গাড়ি ডাকাইয়া আনিয়া ক্রমাগতই বলিতেছে, 'যাও না হে ছোকরা, হাসপাতালে নিয়ে যাও না, সবাইকে মারবে নাকি? আচ্ছা বেয়াক্কেলে লোক বাপু তুমি, কথাটা জানাজানি হবার আগে আমাকে একবার বলতে নেই! দেখুন, আপনারা কেউ যাবেন না, কোন ভয় নেই—আমি বলছি কোন ভয় নেই। রুগী হাসপাতালে পাঠিয়ে এখুনি প্রত্যেক ঘরের চৌকাঠ থেকে চাল পর্যন্ত ডিসেনফিট করে দিচ্ছি।...আপনাদের কিছু হয় তো আমায় বলবেন তখন!'

'হলে আর তোমায় বলে কি হবে বাপু?' এই ধরনের প্রশ্ন করিলে যাত্রী নিবাসের কর্তা চোখ লাল করিয়া একবার তাহার দিকে তাকাইতেছে, কিন্তু কোন জবাব দিবার লক্ষণ দেখাইতেছে না।

চারু সঙ্গের চাকরকে গাড়ি আনিতে পাঠাইয়া দিল।

শিশু এতক্ষণ তাহাকে দেখিতে পায় নাই, এবার তাহার দিকে চোখ পড়ায় সে যেন অকূলে কূল পাইল।

'মাসীমা, দেখুন না এরা জোর করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আপনি একটু বলে দিন না?'

চারু বলিল, 'তা যাও না বাছা, হাসপাতালেই নিয়ে যাও। এখানে কি চিকিৎসে হয়?' তারপর ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, 'এখনো একজন ডাক্তার ডাকনি, করেছ কি? ডাক্তার আনতে পাঠাও বাছা, আগে ডাক্তার আনতে পাঠাও। তারপর অন্য কথা।' বলিয়া নিজের

ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

বাহির হলি গাড়ি নিয়া চাকর ফিরিয়া আসিলে।

শিশুকে ইসারায় কাছে ডাকিয়া বলিল, 'আমার পাথরের বাটিটা?'

'বাটিটা বৌদি নোংরা করে ফেলেছে, মাসীমা।'

চারু বিরক্ত হইয়া বলিল, 'কেন নোংরা করেছে? পরের জিনিস নিলে সাবধানে রাখতে হয় বাবু। আচ্ছা যা করেছে বেশ করেছে, এবার বাটিটা এনে দাও।'

'একটু দাঁড়ান, ধুয়ে দিচ্ছি!'

চারু অনাবশ্যক রূঢ়তার সঙ্গে বলিল, 'দাঁড়াবার আমার সময় নেই বাছা, তোমার বাটি ধোবার জন্য গাড়ি ফেল করব নাকি? যেমন আছে তেমনি এনে দাও।'

শিশু আর কথা না কহিয়া বাটি আনিয়া দিল। চারু তার একখানা পরনের কাপড় মাটিতে বিছাইয়া বলিল, 'এইতে দাও'। অনেক পরত কাপড়ে বাটিটা সন্তর্পণে জড়াইয়া পুঁটলি করিয়া চারু সেটা আলগোছে তুলিয়া নিল। নিজের জিনিস ফিরাইয়া নিয়া চোরের মত কয়েকবার চারিদিকে চাহিয়া শিশুর হাতে দশ টাকার একটা নোট গুঁজিয়া দিয়া সে পলাইয়া আসিল।

বাড়ি ফিরিয়া ধূলাপায়ে সকলের আগে চারু পরীর হাতে পাথরের বাটিতে নির্মাল্য তুলিয়া দিল।

বলিল, 'এক হাতে নয়, দু'হাতে ধর। ছেলের মা তুই, তোর ত সাহস কম নয় পরী! কপালে ঠেকিয়ে খেলে ফেল।'

'দুটো ভাত যে দিদি।'

'ভাত নয় প্রসাদ, খা।'

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে পরীর নির্মাল্য পান চাহিয়া দেখিল। তারপর বাটিটা নিয়া স্নানের ঘরে সাবান দিয়া সোডা দিয়া অনেকবার মাজিল। নিজে একঘণ্টা ধরিয়া স্নান করিয়া আসিয়া বেতের বাস্কেট হইতে দেবতার ফুল বাহির করিয়া ভুবনের কপালে ছোঁয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোকে সকলে ভালবেসেছে ভুবন?'

ভুবন অস্বীকার করিল।

'তোমার কাছে পালিয়ে যাচ্ছিলাম, কেষ্ট আমায় ধরে আনল কেন? আমায় ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল।'

চারু ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কিরে পদ্ম? সকলের ভাবসাব কি রকম দেখলি বল ত!'

পদ্ম জানাইল সকলের ভাবসাব মন্দ নয়। আবার ভালও নয় কিন্তু। দুয়ের মাঝামাঝি। পরী তার বোনপোকে ঠিক সময় মত না হোক ডাকিয়া খাওয়াইয়াছে, মার জন্য হাউ হাউ করিয়া কাঁদিলে ভোলানোর চেষ্টাও যে করে নাই এমন নয়। তবে চোখে চোখে ওকে কেউ রাখে নাই। কাল দুপুর বেলা ভুবন চুপি চুপি পলাইতেছিল, পদ্ম দেখিতে পাইয়া কেষ্টকে দিয়া ধরাইয়া আনিয়াছে। গোলমাল শুনিয়া আসিয়া বনমালী তাকে কয়েক ঘণ্টা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

'কি জান মা, মার মত কেউ কি করে?'

চারু বলিল, 'আমি যে চিরকাল বাঁচব না পদ্ম, তখন কি হবে? মারধর করেনি ত কেউ?'

ধরিয়া আনিবার সময় কাল কেষ্ট বুঝি ভুবনকে একটু মারিয়াছিল, কিন্তু পদ্ম সে কথা গোপন করিয়া গেল।

'না মার-ধর কেউ করেনি।'

চারুর পুরা নাম চারুদর্শনা, পরীর পুরা নাম পরীরাণী। এগুলি কেবল যে নাম তা নয়। মানানসই নাম।

সারাদিন পরীকে চারু আজ বিশেস ভাবে সুন্দরী দেখিল ;—অপরূপ, অভিনব। পরী যতবার তার লাল-করা ঠোঁট দুইটি ফাঁক করিয়া হাসিল, ততবারই চারুর সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ বহিয়া গেল।

ভাবিল, 'না, এত রূপ নিয়ে সংসারে থাকাটা কিছু নয়। চাদ্দিকে আগুন জ্বেলে দিত বৈ ত নয়।'

শরীরটা চারুর ভাল লাগিতেছিল না। সে সকাল সকাল শুইয়া পড়িল। একটা আশঙ্কা সে মন হইতে কোন মতেই দূর করিতে পারিতেছিল না যে, আজ রাত্রেই যদি পরীর কলেরার লক্ষণ প্রকাশ পায় ভুবনকে কোথাও সরানোর সময় পাওয়া যাইবে না। তারকেশ্বরের সেই বৌটির ভেদবমির কথা স্মরণ করিয়া চারুর গা ঘিন ঘিন করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল একটা নোংরামির মধ্যে সে শুইয়া আছে, বিছানাটা অপবিত্র, অশুচি।

সম্ভবতঃ মনের ঘেন্নাতেই খানিক পরে চারুর বমি আসিতে লাগিল।

আর খানিক পরে সে প্রথমবার বমি করিল। একবার বমি করিয়াই তার মনে হইল সমস্ত শরীরের রস তার শুকাইয়া গিয়াছে।

বমির শব্দে পরী উঠিয়া আসিয়াছিল, চারু কাঁদিয়া তাহাকে বলিল, 'ও পরী, আমার কলেরা হয়েছে, বনমালীকে ডাক শীগগির।'

বনমালী উঠিয়া আসিল। ডাক্তারকে ফোন করা হইল।

ডাক্তার আসিল এক ঘণ্টা পরে। ইতিমধ্যে চারুর মাথা একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে। বিড় বিড় করিয়া আপন মনে কি যে সে বকিতে লাগিল কেহ তাহার মানে বুঝিল না। মানে বুঝুক আর না বুঝুক বনমালী বারকতক তাহাকে শুনাইয়া দিল যে ভুবনের জন্য তার কোন ভয় নাই, ভুবনের ভার সে নিল।

পরীর মনে হইল তারও কিছু বলা দরকার।

'ভুবনকে আমি চোখে চোখে রাখব দিদি, চোখের আড়াল করব না কখনো।'

কিন্তু মরিয়া গেলেও চারু কি ইহার একটি কথা বিশ্বাস করে! চল্লিশটা বছর সংসারে বাস করিয়া মানুষের কাছে সে যে শিক্ষা পাইয়াছে শুধু মৃত্যু কেন, মৃত্যু যাহার বিধান তারও বোধহয় ক্ষমতা নাই সে শিক্ষা তাহাকে ভুলাইয়া দেয়।

ক'দিন পরী খুব কাঁদিল। 'দিদি আমায় বড় ভালবাসত', এই কথা বনমালীকে সে কতবার যে শোনাইল তার ইয়ত্তা নাই। বনমালী সভয়ে তাহাকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল।

তখন পরী সভয়ে কান্নাও বন্ধ করিল এবং সুরও বদলাইয়া ফেলিল।

'একদিনের তরে সুখ কাকে বলে জানেনি। তারপর ওই তো ছেলে। গিয়েছে না বেঁচেছে।' বনমালী বলিল, 'শরীরও ভেঙে গিয়েছিল।'

পরী বলিল, 'হ্যাঁ। অম্বলের অসুখটা হবার পর থেকে একরকম মরবার দাখিল হয়েছিল।'

'অথচ একটু যত্ন হয় নি।'

'না। নিলে তো কারো যত্ন! তেমন মানুষই ছিল না দিদি। সকলের সেবাই করেছে প্রাণপণে, পরের জন্য খেটে খেটে প্রাণটা দিয়েছে।'

আড়চোখে চাহিয়া আবার বলিল, 'বড় ঘা খেয়ে গেল। আমাদেব একটু সাবধান হওয়া

উচিত ছিল, কি বল?'

'হলে না কেন?'

পরী হাসিয়া বলিল, 'বাঃ, বেশ ; আমি হলাম মেয়েমানুষ, আমাদের কি অত হিসাব থাকে? তুমি ঘরে এলে আমার বলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুল হয়ে যায়, সাবধান থাকব!'

বনমালী বলিল, 'তাই নাকি!'

চারুর মৃত্যুর পর বনমালী দিনে অথবা রাত্রে কখনো পরীর ঘরে আসে নাই। দুর্ভাবনার পরীর আর সীমা ছিল না। চুলে সেদিন সে অল্প একটু তেল দিল, এলোচুলে একটু স্নিগ্ধ রুক্ষতাই ভালো মানায়। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ভাবিবার পর বাটিতে পাতলা করিয়া আলতা গুলিয়া গালে লাগাইয়া সিল্কের রুমাল দিয়া মুছিয়া নিল। ছোট একটি পান সাজিয়া মুখে নিয়া একটু চিবাইয়া ফেলিয়া দিল।

তারপর বনমালীর বেড়াইতে যাওয়ার সময় সামনে পড়িয়া একটু হাসিল।

'শোন। কাছে সরে এসো, কানে কানে বলি। একটা ফিডিং বোতল এনো, আমি মরুভূমি হয়ে গেছি। আনবে তো?'

'আনব। পদ্মর কাছে খোকা ভারি কাঁদছে পরী।'

'পদ্ম ওকে ইচ্ছে করে কাঁদায়।'

'পদ্মর কাছে না দিলেই হয়।'

'আমাকে সেজেগুজে ফিটফাট থাকতে না বললেই হয়!'

বনমালী তাহার গালে একটা টোকা দিল।

'না সাজলেই তোকে ভাল দেখায় পরী।'

বনমালী চলিয়া গেলে পরী ছুটিয়া গিয়া পদ্ম-ঝির কাছ হইতে খোকাকে ছিনাইয়া নিল। চোখ পাকাইয়া বলিল, 'তোকে না পাঁচশো বার বলেছি বাবুর ধাবে-কাছেও খোকাকে নিয়ে যাবি না?'

পদ্ম একগাল হাসিয়া বলিল, 'বাবু নিজে ডাকলে গো। বললে, খোকাকে আন তো পদ্ম! ভয়ে মরি দিদিমণি।'

'মরণ তোমার। ভয় আমার কিসের?'

'তা যাই বল, বাবুকে আমি বড্ড ডরাই বাপু! দেখলে বুকের মধ্যে টিপ টিপ করতে থাকে দিদিমণি। এই অ্যাদ্দুর থেকে বাবুকে আমি গড় করি।'

পরী হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা আচ্ছা, বেশ করিস। তারপর কি হল বল।'

'ভয়ে ভয়ে খোকাকে তো নিয়ে গেলাম। বাবু কোলে নিলে, আদর করলে, চুমো পর্যন্ত খেলে। তারপর বললে, বেশ ছেলেটা, নারে পদ্ম? লজ্জায় মরি দিদিমণি।'

বনমালী বেড়াইয়া ফিরিলে পরী বলিল, 'আচ্ছা, পরের ছেলেকে তুমি এত ভালবাসলে কি করে বল ত? তোমার হিংসা হয় না?'

বনমালী হাসিয়া বলিল, 'না, দুদিনের জন্য এসেছে, ওকে আবার হিংসে করব কি? বরং তোর ছেলে বলে ভালই বাসি।'

পরীর মুখ শুকাইয়া গেল।

একি পরিণাম! সংক্ষিপ্ত ও সাংঘাতিক!

আর্শি কি প্রত্যহ তাহাকে মিথ্যা বলিয়াছে? বনমালীর সেই উগ্র আবেগময় ভালবাসা এর মধ্যে উপিয়া গেল কি করিয়া? আজন্ম দেখিয়া আসিয়াও আর্শিতে নিজেকে তাহার প্রত্যহ

নূতন মনে হয়, আপনার রূপ ও যৌবনের এক একটা অভিনব ভঙ্গিমা আজও সে প্রত্যহ আবিষ্কার করে। আর বনমালীর কাছেই এর মধ্যে পুরানো হইয়া গেল? মাথায় না তুলিয়া বনমালী তাহাকে কোথায় নামাইয়া দিতে চায়?

পরীর বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। তাহার পাপের সমান অংশীদার তখনো চোখের আড়ালে চলিয়া যায় নাই। তাকাইয়া দেখিয়া পরীর মনে হইল পদ্ম-ঝি বড় মিথ্যা বলে নাই। বনমালীকে সেও কম ভয় করে না।

অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া বনমালীর দিনের স্বভাব। জীবনের কোন স্তরই একটা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ছাড়া তাহাকে নিজস্ব করিয়া রাখিতে পারে নাই। জীবনের বৈচিত্র্যগুলি বনমালী দ্রুত গতিতে সমগ্রভাবে আয়ত্ত করিয়া নেয়। তাহার উপভোগ যেমন প্রখর তেমনি অধীর। স্থূল হোক সূক্ষ্ম হোক জীবনের রস-বস্তুকে সে তাড়াতাড়ি জীর্ণ করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ে।

তাহাকে জব্দ করিয়াছিল চারু।

চারু তাহার প্রথম বয়সের নেশা ; অদম্য, অবুঝ, বহুকাল স্থায়ী। যে বয়সে নারীদেহের সুলভতা সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞান জন্মে, নারীমনের দুর্লভতায় প্রথম হতাশা জাগে চারুকে বনমালী সেই বয়সে দেহ মন দিয়া চাহিয়াছিল। চারু রীতিমত তাহাকে নিয়া খেলা করিত ; ওষুধের ডোজে আশা দিয়া তাহার প্রেমকে বাঁচাইয়া রাখিত এবং প্রাণপণে এই খেলার উন্মাদনা উপভোগ করিত। বনমালীর এক গ্রাসে পেট ভরানোর প্রবৃত্তি ক্ষুধাতুর বন্য জন্তুর মত চারুর দুর্ভেদ্য সাবধানতা ঘেরিয়া পাক খাইয়া মরিত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

পরীর রূপ আছে, চারুর মত প্রতিভা নাই। বনমালীর পাক-খাওয়া মনকে সে একাভিমুখী করিয়া রাখিতে পারিল না। তাহার নদীতে হাঁটু ডুবাইয়া বনমালী পার হইয়া গেল, সে তাহাকে ভাসাইয়া নিতে পারিল না।

পরী তাহার ঘরে সযত্নে শয্যা রচনা করিয়া রাখে, বালিশের নীচে জুঁই আর বেল ফুল রাখিয়া দেয়। কিন্তু যাহার জন্য ফুলগুলি হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া চাপা গন্ধ বিলায়, সে আর আসে না। সোজাসুজি নিমন্ত্রণ করিবার সাহস পরীর নাই, জানালায় বসিয়া সে শুধু কাঁদে। এখন প্রকৃত বর্ষাকাল। প্রতি রাত্রেই প্রায় বাদল নামে। গাঢ় ভিজা অন্ধকারে বিবরবাসিনী নাগ-কন্যার মত পরী ফুলিয়া ফুলিয়া সাশ্রু নিশ্বাস নেয়। খোকা কাঁদে। কঁকায়, তাহার গলা ভাঙিয়া আসে, শ্রান্ত হইয়া এক সময় সে ঘুমাইয়া পড়ে। পরী সাড়াশব্দ দেয় না। খানিক পরে খোকার মুখের উপর ঝুঁকিয়া মন্ত্রোচ্চারণের মত বলিতে থাকে, 'শোধ নিস্, শোধ নিস্ ; তাতেই হবে। ছাড়বি কেন? শোধ নিস্।'

তারপর অদম্য আক্রোশে খোকার দুই কাঁধ ধরিয়া সজোরে ঝাঁকি দিয়া চেঁচাইয়া উঠে, 'কেন তুই এসেছিলি হারামজাদা!'

গভীর রাত্রে দরজা খুলিয়া সে বাহিরে চলিয়া যায়, প্যাসেজের আলো নিভাইয়া অন্ধকারে এ-বারান্দা ও-বারান্দা ঘুরিয়া বেড়ায়, ঘরে ঘরে উঁকি দেয়, বনমালীর ঘরের দরজায় কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

একদিন নৈশ পর্যটনের সময় ভুবনের ঘরে উঁকি দিয়া সে দেখিতে পাইল, বিছানায় উপুড় হইয়া সে হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দৃশ্যটা সে খানিকক্ষণ উপভোগ করিল। সে চিরদিনই দুঃখী, অন্যের দুঃখ দেখিলে সে আনন্দ পায়।

তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া বনমালীকে সে ডাকিয়া তুলিল।

'ভুবন কি রকম করছে দেখবে চলো।'

'কি রকম করছে?'

'কাঁদছে আর ছটফট করছে।' অন্ধকারে পরী বনমালীর গা ঘেঁষিয়া আসিল।

বনমালী বলিল, 'প্যাসেজের আলো নিভিয়েছে কে?'

'আমি।'

বনমালী সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল। পরী সঙ্কুচিতা হইয়া বলিল, 'দ্যাখো তো কি করলে! নিভিয়ে দাও।'

বনমালী তাহার আলো নিভানোর প্রয়োজনটা চাহিয়া দেখিল না।

'ঘরে যাও' বলিয়া ভুবনের ঘরের দিকে আগাইয়া গেল।

রোষে ক্ষোভে আত্মহারা পরী আলোকে লজ্জা দিয়া আলোর নীচে দাঁড়াইয়া রহিল।

বনমালীর পাশের ঘরখানা হেমলতার। তিনি দিনের বেলায় বিছানায় শুইয়া থাকেন বলিয়া রাত্রে বিছানায় শুইয়া আর ঘুমান না, ঝিমান। বারান্দায় কথা শুনিয়া তিনি বাহির হইয়া আসিলেন।

'কে রে? পরী নাকি? বনমালীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তুই কি করছিস পরী?' বলিয়া ঠাহর করিয়া দেখিয়া যোগ দিলেন, 'মরণ তোমার, বেহায়া মেয়ে!'

পরী তখন যে কাজ করিয়া বসিল তাহার অর্থ ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার। চট করিয়া বনমালীর ঘরে ঢুকিয়া সে দড়াম করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল এবং স্তম্ভিতা হেমলতা নড়িবার শক্তি ফিরিয়া পাওয়ার আগেই বনমালীর একটা চাদর গায়ে জড়াইয়া তাহার পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।'

হেমলতা শূন্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'একি কাণ্ড মা! এ্যাঁ?'

পরদিনটা কোনরকম চুপ করিয়া থাকিয়া তার পরের দিন হেমলতা ছেলেকে অনুরোধ করিলেন, 'পরীকে এবার পাঠিয়ে দে বনমালী।'

'দেবো। এখন থাক।'

পরীকে এখন সে অবহেলা করিতেছে। অমন সুন্দর একটা পুতুলের আবোলতাবোল নাচ দেখিতে তার ভারি মজা লাগিতেছে। এ অবস্থাটি অতিক্রান্ত না হইলে বনমালী তাহাকে কোথাও পাঠাইবে না।

হেমলতা অত জানেন না, তিনি আবার বলিলেন, 'না বাবা, পাঠিয়েই দে। স্বামী না থাক, স্বামীর ঘর তো আছে। কেন পরের বোঝা ঘাড়ে করে আছিস?'

বনমালী হাই তুলিয়া বলিল, 'দু'টি খায়, ও আবার বোঝা কি মা?'

হেমলতা আর কিছুই বলিতে সাহস পাইলেন না। ডাইনীর মায়া হইতে ছেলেকে কেমন করিয়া উদ্ধার করিবেন শুইয়া শুইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কবিরাজের মাথা গরম না করিবার উপদেশটা পর্যন্ত তাঁহার স্মরণ রহিল না।

দু'দিন পরে আবার বলিলেন, ' যে রাগী মানুষ তুই, তোকে বলতে সাহস হয় না বাবু। কিন্তু চোখ মেলে এ তো আর দেখা যায় না বনমালী!'

'কি হয়েছে?'

'রাগের মাথায় কিছু করে বসবি না, বল?'

বনমালী হাসিয়া বলিল, 'না। আমার রাগ হবে না, বল।'

হেমলতা গলা নীচু করিয়া বলিলেন, 'পরীর স্বভাব-চরিত্র ভাল নয় বনমালী। মেয়ে মিটমিটে ডান। শ্রীধরের ভাইটা আসে জানিস? ওই যে রোগা লম্বা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল?'

'জানি। আমার চিঠি টাইপ করে।'

'আমি নিজের চোখে দেখেছি, বনমালী। দুপুরবেলা সেদিন চোরের মত পরীর ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক চেয়ে ওদিক চেয়ে নীচে নেমে গেল।'

'কবে?'

'পরশু।'

বনমালী হাসিয়া বলিল, 'পরশু তো? আমি তখন পরীর ঘরে ছিলাম, টাইপ করার জন্য শ্রীধরের ভাই একটা দরকারী চিঠি নিতে এসেছিল। মানুষকে অত সন্দেহ কোরো না মা। পরী সে-রকম নয়।'

হেমলতার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাঁর মিথ্যার পাশে ছেলের মিথ্যা আসিয়া দাঁড়ানো মাত্র মুখোশ গেল খুলিয়া, গোপন সত্য প্রকাশ হইয়া গেল, লজ্জার আর সীমা রহিল না। বনমালী চলিয়া গেলে তিনি ভাবিলেন, বাহাদুরী করিতে যাওয়ার এই শাস্তি। চুপচাপ থাকিলেই হইত! আটত্রিশ বছরের লাখপতি ছেলের ভাল করিতে যাওয়া কি তাঁহার সাজে?

এদিকে, বনমালীর স্বাভাবিক সংযত নির্মমতায় পরী পাগল হইয়া উঠিল। কেন এ রকম হইল, বনমালীর অমন উদ্দাম কামনা তুবড়ির মত জ্বলিয়া উঠিয়া এমন অকস্মাৎ কেমন করিয়া নিভিয়া গেল কিছুই সে বোঝে না, দিনরাত আগের অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার উপায় চিন্তা করে। ভাবে, 'অভিমান করে গম্ভীর হয়ে থাকব? যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে হেসে খেলে দিন কাটাব? আর কারো দিকে একটু ঝুঁকব? একদিন রাতদুপরে ঘরে গিয়ে পাগলের মত বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ব? পায়ে ধরে যে-দোষই করে থাকি তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেব?'

এর মধ্যে শেষ কল্পনা দুটিকে সে কার্যে পরিণত করে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। দিন দিন পরী শুকাইয়া যায়।

ভুবনকে এখন বনমালী খুব ভালবাসে।

অন্ততঃ তার ভাব দেখিয়া তাহাই মনে হয়।

কেষ্টকে সে অন্য কোন কাজ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে, ভুবনকে সর্বদা চোখে চোখে রাখিবে। খাওয়ার সময় বনমালী ভুবনকে কাছে খাইতে বসায়, প্রায়ই তাহাকে সঙ্গে নিয়া মোটর চাপিয়া বেড়াইতে যায়, অবসর সময়ে কাছে ডাকিযা তাহার সঙ্গে কথা বলে, তাহাকে নানান বিষয় শিখাইবার চেষ্টা করে।

তার বুদ্ধির জড়তা বিনষ্ট করিবে এই তাহার ইচ্ছা। কাজের মত একটা কাজ পাইয়া বনমালী ভারী সুখী।

বলে, 'ওকে চারুদি বোকা করে রেখেছিল, আসলে ও বোকা নয়।'

পরী তোষামোদ করিয়া বলে, 'আগে থাকতে তোমার হাতে পড়লে এ্যাদ্দিন ও মানুষ হয়ে যেত। খোকাকেও তুমিই মানুষ করে দিও।'

তারপর হাসিয়া যোগ দেয়, 'যেন মানুষ করবে না, তাই বলে দিচ্ছি।' বনমালীর প্রতি ভুবনের আনুগত্য অদ্ভুত!

হেমলতার জ্বর হইয়াছে। তিনি আর বাঁচিবার আশা করেন না। তাই প্রাণপণে ছেলের

সেবা আদায় করিয়া নিতেছেন।

বনমালী বলে, 'আপিসে কাজ আছে মা, যেতে হবে।'

হেমলতা বলেন, 'আমায় চিতায় তুলে দিয়ে যাস।'

শিয়রে বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া বনমালী বিকালে বাগানে পায়চারি করিতে যায়। এদিকে ভুবন বার বার হলঘরের বড় ঘড়িটার দিকে তাকাইতে থাকে। একবার সে ভয়ানক চমকাইয়া ওঠে। এই মাত্র সে দেখিয়া গেল, পাঁচটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট হইয়াছে, এর মধ্যে সাড়ে নটা বাজিতে চলিল কি করিয়া?

ঘড়ির ডায়ালটা ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টায় ভুবনের প্রকাণ্ড দেহটা বিহ্বল প্রশ্নের ভঙ্গিতে পিছন দিকে হেলিয়া যায়। তারপর এক সময় সে তাহার ভুল বুঝিতে পারে। ঘড়ির বড় কাঁটা আর ছোট কাঁটার মধ্যে গোলমাল করিয়া ফেলিয়া সে যেন ভারী কৌতুক করিয়াছে এমনিভাবে সে হাসিয়া ফেলে। মুষ্টি তুলিয়া ঘড়িটাকে শাসন করিয়া বলে, 'ভেঙে ফেলে দেব, পাজী কোথাকার!'

ঘড়িতে ছ'টা বাজিতে আরম্ভ করামাত্র সে বাগানে ছুটিয়া যায়। বলে, 'ছ'টা বাজল মামা।'

তাহার কথা শেষ হওয়ার আগে অথবা পরে হলঘরের ঘড়িটা নীরব হয় ঠিক বোঝা যায় না।

বনমালীর একপ্রকার অভূতপূর্ব অনুভূতি হয়। ছ'টার সময় হেমলতাকে ওষুধ খাওয়াইতে হইবে, কিন্তু সময়মত ডাকিয়া দিবার কথা ওকে সে কিছুই বলে নাই। যাহাকে বলিয়াছিল সে হয়ত কার সঙ্গে গল্পে মাতিয়াছে, কিন্তু অন্যকে দেওয়া তাহার সে আদেশ ভুবন ভোলে নাই। কাঁটায় কাঁটায় অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করিয়াছে।

কেন করিয়াছে? তাহাকে একটু খুশী করার জন্য। কোন প্রত্যাশা করিয়া নয়, কোন মতলব হাঁসিল করিবার জন্য নয়, তাহাকে খুশী করিবার প্রেরণা মনের মধ্যে ছিল, শুধু এই জন্য।

ভুবনকে সে যে ভালবাসিয়াছে সেটা তাই অকারণ নয়। ভুবনের নিষ্কাম প্রেম ছাড়া আরও একটা গৌণ কারণও ইহার ছিল। চারুর জন্য পরী কাঁদিয়াছে, কিন্তু তাহার কান্নায় বনমালী হইয়াছে বিরক্ত ; চারুর জন্য ভুবনের শোক একটিবার মাত্র দেখিয়া বনমালীর মনে শোকের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। আহত পশুর মত ভুবন মধ্যে মধ্যে মার জন্য ছটফট করিয়া কাঁদে ; বনমালীর শুষ্ক তৃণহীন জগতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়।

পরীর সামনেই একদিন সে ভুবনকে বলিল, 'একটা বাড়ি নিবি, ভুবন?'

'নেব মামা!'

'আচ্ছা, তোকে একটা বাড়ি লিখে দেব।'

এ বাড়ি অবশ্য নয়, শ্যামবাজারের একটা ছোট বাড়ি সম্প্রতি একপ্রকার বিনামূল্যেই বনমালীর হাতে আসিয়াছে! সেই বাড়িটা দান করিবার কথাই সে ভাবিতেছিল। কিন্তু পরী তো তাহার মনের খবর রাখে না, সে ভাবিল ভুবনকে বনমালী এই বাড়িটাই দিয়া দিবে, একদিন মিথ্যা করিয়া চারুকে সে যাহা বলিয়াছিল তাহা পালন করিবে।

পরীর বুকের মধ্যে জ্বালা করিতে লাগিল। খোকাকে অনেকক্ষণ বুকে চাপিয়া রাখিয়াও সে জ্বালা তাহার কমিল না।

সারাদিন তাহার মেজাজ রুক্ষ হইয়া রহিল। বনমালীর আশ্রিতাদের মধ্যে সকলের চেয়ে নিরীহ ক্ষেন্তির মাকে এমন অপমানই সে করিল যে গৃহপালিতা কুক্কুরীর মত অপমান-জ্ঞানহীনা সেই নারীটি কাঁদিয়া ফেলিল।

তারপর পদ্ম-ঝির সঙ্গে পরীর কলহ হইয়া গেল। বিকালে বিনা অপরাধে কেষ্টকে সে তাহার পায়ের ঘাসের চটি ছুঁড়িয়া মারিল।

এবং পঞ্চমী তিথিতে একাদশী করিয়া গভীর রাত্রে উম্মত্তার মত বনমালীর রুদ্ধ দরজার সামনে মাথা-কপাল কুটিয়া আসিয়া ঘুমন্ত ছেলেটাকে হ্যাঁচকা টানে কোলে তুলিয়া নিয়া কয়েক সেকেণ্ডের জন্য তাহার কচি গলাটি সজোরে টিপিয়া ধরিল।

গলা ছাড়িয়া দিবার পর কাসিতে কাসিতে খোকা বমি করিয়া ফেলিল। পরদিন দেখা গেল গলা তাহার লাল হইয়া আছে এবং কাঁদিতে গিয়া সে শব্দ বাহির করিতে পারিতেছে না।

পদ্ম ভয় পাইয়া বলিল, 'কি করে এমন হ'ল দিদিমণি?'

পরী ফিস ফিস করিয়া বলিল, 'বাবুর কীর্তি পদ্ম। অন্ধকারে—'

পদ্ম চোখ মিট মিট করিয়া বলিল, 'সেরে যাবে। আমি ভাবলাম পেলেগ। হুঁদো বেড়ালটার হয়েছিল দেখনি? দেখে আমি তো ঘেন্নায় মরি দিদিমণি, গলা জুড়ে এই ঘা পুঁজে রক্তে—!

কয়েকদিন পরে হেমলতার অসুখ হঠাৎ বাড়িয়া যাওয়ায় তাকে নিয়া বনমালী বিশেষ ব্যস্ত আছে, দুপুর বেলা পরী চুপি চুপি ভুবনকে বলিল, 'মার কাছে যাবি, ভুবন?'

ভুবন উৎসুক হইয়া বলিল, 'যাব।'

'এক কাজ কর তবে। জামা গায়ে চুপি চুপি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গলিতে দাঁড়িয়ে থাকবি যা। আমি যাচ্ছি, গাড়ি চাপিয়ে তোকে মার কাছে নিয়ে যাব।'

ভুবন তৎক্ষণাৎ জামা গায়ে দিল।

'মামাকে বলে যাই?'

'তবেই তুমি গিয়েছ! মামা তোকে যেতে দেবে ভেবেছিস? ছাই দেবে!'

ভুবন আর কথা কহিল না। চটি পায়ে দিয়া মার কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া নিল।

পরী বলিল, 'কাউকে কিছু বলিসনে কিন্তু, খর্বদার বললে নিয়ে যাব না। যা, রাস্তায় দাঁড়াগে।'

ভুবনের এক মিনিট পরে খোকাকে কোলে নিয়া খিড়কির দরজা দিয়া বাড়ির পিছনদিকে গলিতে নামিয়া গিয়া পরী দেখিল, ভুবন তার প্রতীক্ষায় চঞ্চল হইয়া আছে। হাত ধরিয়া পরী তাহাকে হনহন করিয়া টানিয়া নিয়া চলিল। বড় রাস্তায় পড়িয়া ট্যাক্সি ধরিয়া হাজির করিল একেবারে হাওড়া স্টেশনে।

দরাজ হাতে অনেকগুলি নোট কাউন্টারের ওপাশে চালান করিয়া দিয়া বোম্বে পর্যন্ত ফার্স্টক্লাসের একখানা টিকিট কিনিয়া গাড়ি ছাড়ার অল্প আগে পরী ভুবনকে বোম্বে মেলের একটি খালি ফার্স্টক্লাস কামরায় তুলিয়া দিল।

'যা যা বলেছি মনে আছে, ভুবন? কাল বিকেলে ঠিক ছটার সময় যেখানে গাড়ি থামবে সেইখানে নেমে যাবি।'

ভুবন বলিল, 'আমি ঘড়ি দেখতে জানি মাসী।' পকেট হইতে দশ টাকা দামের ঘড়িটা বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, 'মামা দিয়েছে। ক'টা বেজেছে জানো? তিনটে বেজেছে।'

'ঘড়ি দেখে কাল ঠিক ছটার সময় নেমে যাবি। গাড়ি না থামলে লাফিয়ে নেমে যাবি। মার কাছে যাচ্ছিস কিনা, দেখিস তোর কিছু হবে না।'

ভুবন বলিল, 'আচ্ছা।'

'রেলের লোক টিকিট দেখতে চাইলে দেখাবি। খিদে পেলে খাবার কিনে খাবি। টাকা ঠিক রেখেছিস? ওটা পাঁচ টাকার নোট জানিস তো? ভাঙ্গিয়ে কাল খাবার কিনিস।'

'মা স্টেশনে আসবে, মাসী?'

'আসবে।'

ভুবনের মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল।

'খোকাকে দাও না মাসী, একটা চুমু খাই।'

পরী খোকাকে বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিল।

'না না, এখখুনি গাড়ি ছেড়ে দেবে।'

গলির মুখে ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিয়া খিড়কির দরজা দিয়াই পরী বাড়ি ঢুকিল। তাকে অভ্যর্থনা করিল বনমালী স্বয়ং।

'ভুবনকে কোথায় রেখে এলি পরী?'

'ভুবন? ভুবনের আমি কি জানি! বাড়ি নেই?'

বনমালী হাঁকিল, 'কেষ্ট এদিকে আয়।'

কেষ্ট ভয়ে ভয়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

'তোকে ছাড়িয়ে দিলাম কেষ্ট। মাইনে যা জমেছে পাবি না। পালা, দাঁড়িয়ে থাকলে পুলিশে দেব।'

কেষ্ট কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, 'কেন বাবু?'

'রাত দুপুরে তুই দোতলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকিস বলে। আমার ন'শো টাকা চুরি গেছে।'

ঝি, চাকর, আশ্রিত ও আশ্রিতারা চারিদিকে ভিড করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরীর বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতেছিল।

অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভুবন কোথায় গেছে কেষ্ট? পালিয়ে গেছে?'

কেষ্টর হইয়া জবাব দিল বনমালী।

'ও জানে না। তুই ঘরে যা পরী।'

দোতলায় যে ঘরখানায় সে এতদিন ছিল, বনমালী যে সে ঘরখানার কথা বলে নাই ঘরে ঢুকিয়াই পরী তাহা টের পাইল। তার সমস্ত জিনিস অদৃশ্য হইয়াছে। ধোয়া-মোছা শূন্য ঘরের মাঝখানে সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বনমালী আসিয়া বলিল, 'এখানে থাকতে তোর অসুবিধা হচ্ছিল বলে তোকে নীচের একটা ঘর দিয়েছি পরী। ক্ষেন্তির পাশের ঘরখানা।'

নীচে ভাঁড়ারের পাশে একসারিতে খানসাতেক ঘর আছে, বনমালী যাদের খাইতে দেয় ওটা তাদের কলোনি অথবা বস্তি। ক্ষেন্তির পাশের ঘরখানা ওই সারিতেই।

পরীর মুখ পাংশু হইয়া গেল। ইতিমধ্যে শুধু সন্দেহের উপর তার বিচার হইয়া শাস্তির ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে, এটা সে হঠাৎ ধারণা করিয়া উঠিতে পারিল। এ বাড়িতে যাদের স্থান ঝি-চাকরেরও নীচে বনমালী অনায়াসে তাকে তাদের দলে নামাইয়া দিল? সারাদিন ধরিয়া সে যে নিজের অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ রচনা করিয়াছে সেটা একবার শোনাও দরকার মনে করিল না?

সে কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়া বলিল, 'আমি কি করেছি? তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—'

কিন্তু গা সে ছুঁইবে কার? বনমালী আগাইয়া গিয়াছে, বিদায় নিয়াছে।

পরীকে নীচেই যাইতে হইল।

ক্ষেন্তি বলিল, 'কি গো, ওপোর থেকে তাড়িয়ে দিলে? বড়লোকের মর্জি দিদি, কি করবে বল।'

পরী বলিল, 'কি যে বল তার ঠিক নেই। তাড়িয়ে আবার দেবে কে? আমি যেচে এসেছি। ওপোরে যে সব ম্লেচ্ছাচার—বিধবা মানুষ আমি, আমার পোষালো না।'

ক্ষেন্তি বলিল, 'ভাবলে অবাক লাগে বোন, এ বাড়ি তো একদিন তোমার নিজের দিদির ছিল! আজ যে রানী, কাল সে দাসী। হায়রে কপাল!'

ছোট স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া পরী কাঁদিয়া ফেলিল।

ক্ষেন্তি পিছু পিছু আসিয়া বলিল, 'কাঁদছ কেন? সয়ে যাবে।'

বলিয়া সে পরীর বিছানাতে বসিল।

'শোন বলি। কলকাতার সে বাড়িতে আমি যখন কপাল-পুড়িয়ে এলাম—'

পরী বাধা দিয়া বলিল, 'থাক। তুমি যাও।'

'শোনই না। আমি যখন কপাল পুড়িয়ে এলাম, বাড়ির রাজা আমাকে বললে, নীচেটা স্যাঁতসেঁতে, তুই ওপরেই থাক। তোর মার সহ্য হয়ে গেছে কিছু হবে না, তোর অসুখ করবে। আমি—'

ক্ষেন্তির হঠাৎ খেয়াল হইল, পরী সখী নয়, ওকে শুনাইয়া বুক হাল্কা হইবে না।

হঠাৎ গম্ভীর হইয়া ঢোঁক গিলিয়া সে বলিল, 'ব্যাপার বুঝে আমি রাজী হলাম না। নীচে মার কাছেই রইলাম।'

পরী শুইয়া পড়িল। আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া বলিল, 'আমার জ্বর আসছে তুমি যাও ভাই।'

একদিন হেমলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁরে, ভুবনের কোন খোঁজ করলি না?'

বনমালী বলিল, 'আপদ গেছে, যাক।'

ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপরে পৌঁছিয়া গেল, মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় নিয়াছে।

আজ কাল পরশুর গল্প

মানসুকিয়ার আকাশ বেয়ে সূর্য উঠেছে মাঝামাঝি। নিজের রাঁধা ভাত আর শোল মাছের ঝাল খেতে বসেছে রামপদ ভাঙা ঘরের দাওয়ায়। চালার খড় পুরানো পচাটে আর দেয়াল শুধু মাটির। চালা আর দেয়াল তাই টিঁকে আছে, ছ'মাসের সুযোগেও কেউ হাত দেয়নি। আর সব গেছে, বেড়া খুঁটি মাচা তক্তা—মাটির হাঁড়িকলসিগুলি পর্যন্ত। খুঁটির অভাবে দাওয়ার চালাটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কাত হয়ে। চালাটা রামপদ আর তোলেনি। কার জন্য তুলবে? দাওয়ার দু'পাশ দিয়ে মাথা নীচু করে ভেতরে আসা-যাওয়া চলে। অন্ধকার হয়েছে হোক।

হুমড়ি খেয়ে কাত-হয়ে-পড়া চালার নীচে আঁধার দাওয়ায় নিজের রাঁধা শোলের ঝাল

য়ে ভাত খেতে বসেছে রামপদ, ওদিকে খালের ঘাটে নৌকা থেকে নেমেছে তিনটি মেয়েছেলে আর একটি ছেলে।

এদের মধ্যে একজন রামপদ'র বৌ মুক্তা। তার মাথায় রীতিমতো কপাল-ঢাকা ঘোমটা। সুরমার ঘোমটা সিঁথির সিঁদুরের রেখাটুকুও ঢাকেনি ভালো করে। এতে আর শাড়ী-পরার ভঙ্গীতে আর চলনফিরন-বলনের তফাতে টের পাওয়া যায় মুক্তা চাষাভূষো গেরস্থঘরের বৌ, অন্য দু'জন সহুরে ভদ্রঘরের মেয়ে বৌ, যারা বাইরে বেরোয়, কাজ করে, অকাজ কি সুকাজ তা নিয়ে দেশ জুড়ে মতভেদ। নইলে, শাড়ীখানা বুঝি দামীই হবে আর মিহিই হবে মুক্তার, সাধনা আর সরমার কাপড়ের চেয়ে। এর চেয়ে কমদামী ময়লা শাড়ী মুক্তার নেই। নইলে তাই পরে সে গাঁয়ে ফিরত।

তার বুক কাঁপছে, গা কাঁপছে, মুখ শুকিয়ে গেছে। মোটা চট মুড়ি দিয়ে বস্তা হয়ে আসতে পারলে বাঁচত,মানুষ যাতে চিনতে না পারে।

চিনতে পারা হয়তো কিছু কঠিন হত। কিন্তু মানসুকিয়ার কে না জানে মুক্তা আজ গাঁয়ে ফিরছে। বাবুরা আর মা-ঠাকরুণরা রামপদ'র বৌকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে এনে দিচ্ছে রামপদ'র ঘরে।

চারটি বাঁশের খুঁটির ওপরে হোগলার একটু ছাউনি—গগনের পানবিড়ির দোকান। পিছনের বড় গাছটার ডালপালার ছায়া এখন চওড়া করেছে হোগলার ছায়া। গাছের গুঁড়িটা প্রায় নালার মধ্যে ওপাশের ধার ঘেঁষে, নইলে গুঁড়ি ঘেঁষে বসতে পারলে হোগলার ছাউনিটুকুও গগনের তুলতে হত না।

ক'জন ঝিমুচ্ছিল বাঁচবার চেষ্টার কষ্টে, খানিকটা তারা সজীব হয়ে ওঠে। বুড়ো সুদাসের চোয়ালের হাড় প্রকাণ্ড, এমন,ভাবে ঠেলে বেরিয়েছে যে পাঁজরের হাড় না গুণে ওখানে নজর আটকে যায়।

'রামের বৌটা তবে এল?'

'তাই তো দেখি।' নিকুঞ্জ বলে, তার আধ-পোড়া বিড়িটা এই বিশেষ উপলক্ষে ধরিয়ে ফেলবে কিনা ভাবতে ভাবতে। এক পয়সার চারটে বিড়ি কিনেছিল কাল। আধখানা আছে।

ঘনস্যামের টিনের চালার আড়ত থেকে গোকুল চার জনের ঠিক সামনে দিয়ে রাস্তা পেরোবার ছলে ঘনিষ্ঠ দর্শনের পুলক লাভ করে এদের সঙ্গে এসে দাঁড়ায়।

গদার বৌ মারা গেছে ও-বছর। ওরা খানিকটা গাঁয়ের দিকে এগিয়ে গেলে সে মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'রাম নেবে ওকে?'

'না নেবে তো না নেবে। ওর বয়ে গেল।' জোয়ান গোকুল বলে, ঘনশ্যামের আড়তে কাজ করে মোটামুটি পেট ভরে খেতে পাওয়ার তেজে।

সুদাস কেমন হতাশার সুরে বলে, 'উচিত তো না ঘরে নেয়া।'

গোকুলকে সে ধমক দেয় না, 'তুই থাম ছোঁড়া বলে।' তীব্র কুৎসিত মন্তব্য করে না মুক্তাকে ফিরিয়ে নেবার কল্পনার বিরুদ্ধে! গোকুলের কথাতেই যেন প্রকারান্তরে সায় দিয়ে যোগ দেয়, 'ফিরবার কি দরকার ছিল ছুঁড়ির?'

গোকুল ইয়ার্কি দিয়ে কথাটা বলেছিল। কিন্তু ইয়ার্কিতেও বাস্তব যুক্তি টোল খায় না, হাল্কা হয় না।

ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়া-জড়ানো কঙ্কাল ছিল মুক্তা। সকলের মতো সুদাসেরও চোখে পড়েছে মুক্তার শাড়ীখানা। সকলের মতো সে-ও টের পেয়েছে মুক্তার দেহটি আজ

বেশ পরিপুষ্ট।

আঁকাবাঁকা রাস্তা, এপাড়া ওপাড়া হয়ে, পুকুর ডোবা বাঁশবন আমবাগান গাছপালা জঙ্গলে শান্ত। মুক্তা চেনে সংক্ষেপ পথ। যতটা পারা যায় বসতি এড়িয়ে চলতে আরও সে পথ সংক্ষেপ করে প্রায় অগম্য জঙ্গল মাঠ বাগানে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। তবু গাঁ তো অরণ্য হয়নি, পাড়া পেরোতে হয়, ঘন বসতি কোন্‌টা, কোনটা ছড়ানো। ভদ্র-মানুষেরা তাকায় একটু উদাসীন ভাবে, যারা গুজব শুনেছে তারাও, শুধু ভুরুগুলি তাদের একটু কুঁচকে যায় সকৌতুক কৌতূহলে। চাষা-ভূষোদের কমবয়সী মেয়ে-বৌরা বেড়ার আড়াল থেকে উঁকি দেয়, উত্তেজিত ফিসফিসানি কথার আওয়াজ বেশ কানিকটা দূর পর্যন্তই পৌছয়। বয়স্করা প্রকাশ্যে এগিয়ে যায় পথের ধারে, কেউ কেউ মুক্তাকে কথা শোনায় খোঁচা-দেওয়া ছ্যাঁকা-লাগানো কথা। কেউ চুপ করে থাকে, কেমন একটা দরদ বোধ করে, বাছার কচি ছেলেটা মরেছে, কোথায় না জানি বাছা কত লাঞ্ছনা কত উৎপীড়ন সয়েছে ভেবে।

মধু কামারের বৌ গিরির মা একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকায় তার মস্ত ফোলা-ফাঁপা শরীর নিয়ে। মধু কামার নিরুদ্দেশ হয়েছে বছরখানেক, কিছুদিন আগে গিরিও উধাও হয়ে গেছে।

'ক্যান লা মাগি?' গিরির মা মুক্তাকে শুধোতে তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কুৎসিত গালাগালি দিয়ে, 'ক্যান ফিরেছিস গাঁয়ে, বুকের কি পাটা নিয়ে? ঝেঁটিয়ে তাড়াব তোকে। দূর-অ দূর-অ! যা।'

হাঁপাতে হাঁপাতে সে কথা বলে, যেন হল্‌কায় হল্‌কায় আগুন বেরিয়ে আসে হিংসার বিদ্বেষের। সুরমা স্মিতমুখে মিষ্টি কথায় তাকে থামাতে গিয়ে তার গালের ঝাঁঝে একপা পিছিয়ে আসে। মনে হয় গিরির মা শেষ পর্যন্ত আঁচড়ে কামড়েই দেবে মুক্তাকে। মুক্তা দাঁড়িয়ে থাকে নিস্পন্দ হয়ে। এরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

মানুষ জমেছে কয়েকজন। একজন, কোমরে তার গামছা পরা আর মাথায় কাপড়খানা পাগড়ীর মতো জড়ানো, হঠাৎ জোরে হেসে ওঠে। একজন বলে, 'বাঃ বাঃ বেশ।' একজন উরুতে থাপড় মেরে গেঁয়ো ভঙ্গিতে হাততালি দেয়।

একটু তফাতে নালা পেরোবার জন্য পাতা তাল গাছের কাণ্ডটায় এ মাথায় বসেছিল গদাধর, বহু দূরে মানুষকে হাঁক দেবার মতো জোর গলায় এমনি সময়ে সে ডাকে, 'গিরির মা। বলি ওগো গিরির মা!'

গিরির মা মুখ ফিরিয়ে তাকাতে সে আবার বলে তেমনি জোর গলায়, 'গিরি যে তোমায় ডাকছে গো গিরির মা কখন থেকে! শুনতে পাও না?'

গিরির মা থমকে যায়, দুঃস্বপ্ন-ভাঙা মানুষের মতো ক্ষণিক সম্বিৎ খোঁজে বিমূঢ়ের মতো, তারপর যেন চোখের পলকে এগিয়ে যায়।

'ডাকছে? অ্যাঁ, ডাকছে নাকি গিরি? যাইলো গিরি, যাই।'

এতগুলি মানুষ দেখে লজ্জায় সে জিভ কাটে। কোমরে এক-পাক জড়ানো ছেঁড়া কাঁথাখানা চট করে কুলে নিয়ে ঘোমটার মতো চাপিয়ে এগিয়ে যায় ঘরের দিকে।

ঘরের সামনে পুরোনো কাঁটাল গাছের ছায়ায় বসে রামপদ সবে হুঁকোয় টান দিয়েছিল। তামাক সেজেছে একটুখানি, ডুমুর ফলের মতো। তামাক পাওয়া বড় কষ্ট। মুক্তাকে সাথে নিয়ে ওদের আসতে দেখে সে হুঁকোটা গাছে ঠেস দিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়। এমনি পুড়ে যেতে থাকে তার অত কষ্টে যোগাড় করা তামাক।

'আসেন।' রামপদ বলে ক্লিষ্ট স্বরে, দ্বিধা-সংশয়-পীড়িত ভীরু অসহায়ের মতো। তিন জন কাছে এগিয়ে এসেছে, ওদের দিকে না তাকিয়েই সে অনিশ্চিত অভ্যর্থনা জানায়, চোখ সে পেতে রাখে মুক্তার উপর। খানিক তফাতে থাকতেই মুক্তা থেমে গিয়ে হয়ে আছে কাঠের পুতুল।

'তোমার বৌকে দিয়ে গেলাম ভাই। যা বলার সব তোমায় বলেছি। ওর মন ঠিক আছে। যা হবার হয়ে গেছে, ভুলে গিয়ে আবার তোমরা ঘর-সংসার পাতো। আর এক দিন এসে আমরা দেখে যাব।'

'দিয়েতো গেলেন।' বলে উৎসাহহীন বিমর্ষ রামপদ। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে একবাব সে ঢোক গেলে, চোখের পাতা পিট-পিট করে তার। শীর্ণ মুখখানা বসন্তের দাগে ভরা, চুপসানো বাঁ গালটাতে লম্বা ক্ষতের দাগ। তবু এই মুখেও তার হৃদয়ের জোরালো আলোড়নের কিছু কিছু নির্দেশ ফুটেছে তার শিথিল নিস্তেজ সর্বাঙ্গজোড়া ঘোষণার সুস্পষ্ট মানে ভেদ করে।

'যাবে বলেছিলে, গেলে না কেন রামপদ?'

'তাই তো মুস্কিল হয়েছে দিদিমণি।'

সমাজ তাকে শাসিয়েছে, বৌকে ঘরে নেয়া চলবে না। নিলে বিপদ আছে। সমাজ মানে ঘনশ্যাম দাস, কানাই বিশ্বাস, নিধু নন্দী, লোচন কুমার, বিধু ঘোষ, মধু নন্দী এরা ক'জন। ঘনশ্যাম এক রকম সমাজপতি এ অঞ্চলের চাষা-ভূষোদের, অর্থাৎ চাষী গয়লা কামার কুমোর তেলি ঘরামি জেলে প্রভৃতির। সে-ই ডেকে কাল ধমক দিয়ে বারণ করে দিয়েছে রামপদকে। অন্য ক'জন উপস্থিত ছিল সেখানে। একটু ভয় হয়েছে তাই রামপদ'র। একটুভাবনা হয়েছে। একটু!

নৌকাতে পাতবার সতরঞ্চিটা কাঁটাল তলায় বিছিয়ে তিন জন বসে। রামপদকেও বসায়। মুক্তা এতক্ষণ পরে সরে এসে সুরমার পিছনে গা ঘেঁষে মাটিতেই বসে। ঘোমটা তার ছোট হয়ে গেছে। ছোট ঘোমটার মিথ্যে আড়াল থেকে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে থাকে রামপদ'র মুখের দিকে। বৌয়ের চোখে এমন চাউনি রামপদ কোন দিন দ্যাখেনি।

এ সমস্যা তুচ্ছ করার মতো নয়। এক জন বড় মাতব্বর আর তার ধামাধরা ক'জন তুচ্ছ লোক রামপদ'র পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে কর্তালি না করতে এলে এ হাঙ্গামা ঘটত না দু'চার জন হয়তো ঠাট্টা করত কিছু দিন, দু'চার জন হয়তো বর্জনও করত রামপদকে, কিন্তু সাধারণভাবে মানুষ মাথা ঘামাত না। চারিদিকে যা ঘটেছে আর ঘটছে তার কাছে এ আর এমন কি কাণ্ড? না খেয়ে রোগে ভুগে কত মানুষ মরে গেল, কত মানুষ কত পরিবার নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, কোন বাড়ীর দষ জন কোথায় গিয়ে ফিরে এল মোটে দু'জন ধুঁকতে ধুঁকতে, কত মেয়ে-বৌ চালান হয়ে গেলকোথায়, এমনি সব কাণ্ডের মধ্যে কার বৌ কোথায় ক'মাস নষ্টামি করে ফিরে এসেছে, এ কি আবার গণ্য একটা করার মতো ঘটনা? এ যেন প্রলয়ের সময় কে কার ডোবার জল নোংরা করছে তাই নিয়ে ব্যস্ত হওয়া। কিন্তু ঘনশ্যামেরা ক'জন যখন গায়ে পড়ে উস্কে দিতে চাইছে সবাইকে, কি জানি কি ঘটবে।

সুরমা জিজ্ঞেস করে, 'যাই হোক, বৌয়ের জন্য ভাত তো রেখেছ রামপদ?'

'আজ্ঞে আপনারা?'

'আমাদের ব্যবস্থা আছে। বৌকে দু'টি খেতে দাও তো তুমি। চালাটা তোলোনি কেন?'

'তুলব। তুলব।'

সুরমাই বলে কয়ে নিয়ে দু'টি খাওয়ার ছলে মুক্তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দেয় রামপদ'র সঙ্গে। বাইরে যা ঘটুক, ওদের মধ্যে আগে একটু কথা আর বোঝা-পড়া হওয়া দরকার। গ্রামের এক জন কর্মী শঙ্করের বাড়ীতে তাদের এবেলা নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। অনেক আগেই তার এসে পড়া উচিত ছিল। গ্রামের অবস্থা সে ভালো জানে। তার সঙ্গে পরামর্শ করবারও দরকার হবে।

ঝাঁপটা উঁচু করে তুলে দিতে আরেকটু আলো হয় ঘরে।

'নাইবে?' রামপদ শুধোয়।

'মোর জন্যে রেঁধে রেখেছো!' বলে মুক্তা।

'শোলের ঝাল আর ভাত। আলুনি হৈছে কিন্তু?'

এগার মাস আর অঘটনের ব্যবধান আর কিছুতে নেই, শুধু যেন আছে অতি বেশী রয়ে' রয়ে' অল্প দু'টি কথা বলায়, নিজের নিজের অনেক রকম ভাবনার গাদা নিয়ে নিজে নিজে ফাঁপরে পড়লে যেমন হয়। চুপ করে থাকার বড় যন্ত্রণা। ভাবনাগুলি নড়তে নড়তে মুক্তার মনে আসে : ছেলেটা তার ছিল সাত মাসের রামপদ যখন বিদেশ যায়। এটা বলার কথা। মুক্তা বাঁচে।

'খোকন গেল কুপথ্যি খেয়ে। মাই-দুধ শুকিয়ে গেল, এক ফোঁটা নেই। চাল গুঁড়িয়ে বার্লি মতন করে দিলাম ক'দিন। চাল ফুরলে কি দিই। না খেয়ে শুকিয়ে মরবে এমনিতে, শাকপাতা যা সেদ্ধ খেতাম, তাই দিলাম, করি কি! তাতেই শেষ হল।'

না কেঁদে ধীর কথায় বিবরণটা দেবে ভেবেছিল মুক্তা, কিন্তু তা কি হয়। আগে পারত, না খেয়ে যখন ভোঁতা নির্জীব হয়ে গিয়েছিল অনুভূতি। আজ পুষ্ট শরীরে শুধু ক'মাসের অকথ্য অভিজ্ঞতা কেন বোধকে ঠেকাতে পারবে? গলা ধরে চোখে জল আসে মুক্তার।

'শেষ দু'টো দিন যা করলে গো পেটের যন্ত্রণায়, দুমড়ে মুচড়ে ধনুকের মতো বেঁকে—'

মুক্তা এবার কাঁদে।

'কেউ কিছু করলে না?'

'দাসমশাই দুধ দিতে চেইছিল, মোকেও দেবে খেতে-পরতে। তখন কি জানি মোর অদেষ্টে এই আছে? জানলে পরে রাজী হতাম, বাচ্চাটা তো বাঁচতো। মরণ মোর হলই, সে-ও মরল।'

চোখ মুছে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে মুক্তা। এবার কৈফিয়ৎ দিতে হবে। কেঁদে ককিয়ে দরদ সে চায় না, সুবিচার চায় না। সব জেনে যা ভালো বুঝবে করবে রামপদ, যেমন তার বিবেচনা হয়।

'খোকন মরল, তোমার কোন পাত্তা নেই। দাসমশাই রোজ পাঠাচ্ছে নেড়ীর মাকে। দিন গেলে একমুঠো খেতে পাই নে। এক রাতে দু'টো মদ্দ এলে, কামড়ে দিয়ে বাদাড়ে পালিয়ে বাঁচলাম এতটুকুর জন্যে। দিশে মিশে ঠিক রইল না আর, গেলাম সদরে চলে।'

'দাসমশাই তো খুব করেছেন মোদের জন্যে!' রামপদ বলে চাপা ঝাঁঝাঁলো সুরে।—'যা তুই, নেয়ে আয় গা।'

শোলের ঝাল দিয়ে মুক্তা বসেছে ভাত খেতে, বাইরে থেকে ঘনশ্যাম দাসের হাঁক আসে : রামপদ!

'তুই খা।'

বলে রামপদ বাইরে যায়। জন পাঁচেক সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে ঘনশ্যাম এসে দাঁড়িয়েছে সরকারী সমনজারীর পেয়াদারমতো গরম গাম্ভীর্য নিয়ে। শঙ্কর এসেছিল একটু আগে, ঘনশ্যামদের আবির্ভাবে সুরমাদের যাওয়া হয়নি।

'বৌ এসেছে রামপদ?'

'আজ্ঞে।'

'ঘরে নিয়েছিস?'

'আজ্ঞে।'

'বার করে দে এই দণ্ডে। যারা এনেছে তাদের সঙ্গে ফিরে যাক।'

'ভাত খাচ্ছে।'

রামপদ'র ভাবসাব জবাব-ভঙ্গি কিছুই ভালো লাগে না ঘনশ্যামদের। টেকো নন্দী শুধোয়, 'তোর মতলব কী?'

রামপদ ঘাড় কাত করে।—'আজ্ঞে।'

'বৌকে রাখবি ঘরে?'

'বিয়ে করা ইস্তিরি আজ্ঞে। ফেলি কী করে?'

এই নিয়ে একটা গোলমালেব সৃষ্টি হয় মানসুকিয়ার চাষাভূষোর সমাজে। ঘনশ্যামরাই জোর করে জাগিয়ে রাখে আন্দোলনটাকে। নইলে হয়তো আপনা থেকেই ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে থেমে যেত মুক্তার ঘরে ফেরার চাঞ্চল্য। সামাজিক শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা ঘনশ্যামদের নেই, জমিদার দেশে থাকলেও হয়তো তাকে দিয়ে কিছু করানো যেত। তবে সামাজিক শাস্তিই যথেষ্ট। সধাই যদি সব রকমের বর্জন করে রামপদকে, কথা পর্যন্ত বন্ধ করে, তাতেই পরম শিক্ষা হবে রামপদ'র। সমাজের নির্দেশ অমান্য কবলে শুধ্ এক-ঘরে হয়েই যে সে রেহাই পাবে না তাও জানা কথা। টিটকারী, গঞ্জনা, মারধোর, ঘরে আগুন লাগা সব কিছুই ঘটবে তখন। সবাই এসব করে না, তার দরকারও হয় না। সবাই যাকে ত্যাগ করেছে, যার পক্ষে কেউ নেই, হয় বিপক্ষে নয় উদাসীন, যার উপর যা খুশি অত্যাচার করলেও কেউ ফিরে তাকাবে না, মিলেমিশে সেই পরিত্যক্ত অসহায় মানুষটাকে পীড়ন করতে বড় ভালোবাসে এমন যারা আছে ক'জন, তাদের দিয়েই কাজ হয়।

তবে সময়টা পড়েছে বড় খারাপ। প্রায় সকলেই আহত, উৎপীড়িত, সমাজ-পরিত্যক্ত অসহায়েরই মতো। মনগুলি ভাঙা, দেহগুলিও। আজ কী করে বাঁচা যায় আর কাল কী হবে এই চেষ্টা আর ভাবনা নিয়ে এমন ব্যস্ত আর বিব্রত সবাই যে জোট বেঁধে ঘোট পাকাবার অবসর আর তাগিদ যেন জীবন থেকে মুছে গেছে। সকলকে উত্তেজিত করতে গিয়ে এই সত্যটা বেরিয়ে আসে। রামপদ'র কাণ্ডের কথাটা হুঁ হাঁ দিয়ে সেরে দিয়ে সবাই আলোচনা করতে চায় ধান চাল নুন কাপড়ের কথা, যুদ্ধের কথা। পেতে চায় বিশেষ অনুগ্রহ, সামান্য সুবিধা ও সুব্যবস্থা। একটু আশা-ভরসার ইঙ্গিত পেলে যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে, যার চিহ্নটুকু দেখা যায় না, রামপদ'র বিচার থেকে রোমাঞ্চ লাভের সুনিশ্চিত সম্ভাবনায়।

কয়েকজন তো স্পষ্টই বলে বসল, 'ছেড়ে দ্যান্ না, যাক্ গে। অমন্ কত ঘটছে, ক'দিন সামলাবেন? যা দিনকাল পড়েছে।'

আপন জনকে যারা হারিয়েছে দুর্ভিক্ষে মহামারীতে বাঁচবার জন্য সহরে পালিয়ে, আপনজন যাদের হয়ে গেছে নিরুদ্দেশ, বিদেশ থেকে ফিরে যারা ঘর দেখেছে খালি, এ

ব্যাপারে চুপ করে থাকার আর ব্যাপারটা চাপা দেবার ইচ্ছা তাদেরই বেশী জোরালো। এ রকমকিছুই ঘটেনি এমন পরিবারও ক'টাই বা আছে!

ঘনশ্যাম একটু দমে যায়। বোঝার উপর শাকের আঁটি চাপায় গোকুল।

'বাড়াবাড়ি করলেন খানিক।'

'বটে?'

'সাধু হিদে নখাদের দিয়ে মেরে লাল করে দিতেন এক দিন, চুকে যেত, বিচার-সভা ডেকে বসলেন। দশ জনে যদি দশটা কথা কয়, যাবেন কোথা? দুগ'গার কথা যদি তোলে কেউ?'

'তুই চুপ থাক হারামজাদা।' ঘনশ্যাম বলে ধমক দিয়ে, কিন্তু হাত তার উঠে গিয়ে ঘাঁটতে থাকে বুকের ঘন লোম। জ্বালাও করে মনটা রামপদ'র স্পর্ধায়। সে নাকি দাওয়ায় চালা তুলেছে, বেড়া দিয়েছে, গুছিয়ে নিচ্ছে সংসার। বলে নাকি বেড়াচ্ছে, গাঁয়ে না টিঁকতে দিলে বৌকে নিয়ে চলে যাবে অন্য কোথাও। আগের চেয়ে কত বেশী খাতির করছে ঘনশ্যামকে লোকে আজ, তুচ্ছ একটা রামপদ'র কাছে সে হার মানবে! মনটা জ্বালাও করে ঘনশ্যামের।

পরদিন বসবে বিচার-সভা। সদরে জরুরী কাজ সারতে বেরোবার সময় ঘনশ্যাম ঠিক করে যায় সকাল সকাল রওনা দিয়ে বিকাল বিকাল গাঁয়ে ফিরবে, গিরির কাছে আজ আর যাবে না। কাজ শেষ হয় বেলা দু'টোর মধ্যেই, কিন্তু মনের মত হয় না, যেমন সে ভেবেছিল সে-রকম। মনটা তার আরেকটু দমে যায়। সাধ হয় একটু বিলাতী খাবার! গিরির সাথে রাত কাটাবার। সময়ের হিসাবেও আটক পায় না। সভা হবে অপরাহ্নে, সকালে রওনা দিলেও গাঁয়ে সে পৌঁছবে ঠিক সময়ে!

গোকুলকে সবচেয়ে কমদামী বিলাতী বোতল কিনতে দিয়ে সে যায় গিরির ওখানে। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে ঘনশ্যামের চোখ উঠে যায় কপালে, হাত বুকে উঠে লোম খোঁজে জামার কাপড়ের নীচে। মাদুর পেতে ভদ্রঘরের চারটি মেয়ে গিরিকে ঘিরে বসেছে, দু'জন তার চেনা। মুক্তাকে নিয়ে যারা রামপদ'র কাছে পৌছে দিয়েছিল।

নিঃশব্দে সরে পড়বার চেষ্টা করারও সুযোগ মেলে না, 'এই! শোন, শোন।' বলে গিরি লাফিয়ে উঠে এসে চেপে ধরে গলাবন্ধ কোটের প্রান্ত।

'ভাগছো যে? দাঁড়াও, কথা আছে অনেক।'

'ওনারা কারা?'

'তা দিয়ে কাজ কি তোমার?' গিরি ফুঁসে ওঠে। জামা সে ছাড়ে না ঘনশ্যামের, পিছন ছেড়ে সামনেটা ধরে রাখে। কটমটিয়ে তাকায় বিষণ্ণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে। ঢোঁক গিলে দাঁতে দাঁত ঘষে।

'মা না কি ভালো আছে, বেশ আছে, মোর মা?'

'আছে না?'

'আছে? মাথা বিগড়েছে কার তবে, মোর? ক্ষেপেছে কে, মুই! তা ক্ষেপেছি, মাথা মোর ঘুরতে নেগেছে। ওরে নক্ষীছাড়া, ঠক, মিথ্যুক—'

'ও গিরিবালা!' সুরমা ভিতর থেকে বলে মৃদু স্বরে।

গাল বন্ধ করে নিজেকে গিরি সামলায়, গলা নামিয়ে বলে, 'মোর বাপকে টাকা দিয়ে বিভুঁয়ে মরতে পেঠিয়েছিল কে?'

'ওনারা বলেছে বুঝি?'

'মিছে বলেছে?' গিরি ডুকরে কেঁদে ওঠে বাপের শোকে, 'ও বাবা! মোর নেগে তুমি খুন হলে গো বাবা। এ নচ্ছার মেয়্যার ধড়ে প্রাণ কেন আছে গো বাবা।' ভেতর থেকে আবার সুরমা ডাকে : 'ও গিরিবালা! তোমার বাবা মরেচে কে বললে? খবর তো পাওয়া যায়নি কিছু ! বেঁচেই হয়তো আছে, মরবে কেন?'

'নিখোঁজ তো হয়েচে আজ দশ মাস।' গিরি বলে নিজেকে সামলে গলা নামিয়ে।

অন্য ঘরের মেয়েরা জানালা - দরজায় উঁকি দেয়, কেউ কাজের ছুতোয় ঘর থেকে বেরিয়ে এদিকে -ওদিক চলাচল করে তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে। অঙ্গন ঝকঝকে পরিষ্কার, নালা ছিটাল থেকে উঠে আসছে অশ্লীল গন্ধ। এঁঠো বাসনগুলির অখাদ্যের গন্ধটাও কেমন বদ। সুরমারা চার জনে বেরিয়ে আসে। তাদের দিকে না তাকিয়েই সদর দরজার দিকে যেতে যেতে বলে যায়, 'সকালে আমরা আসব গিবিবালা, তৈরী থেকো।'

'সকালে আসবে কেন?'

'মোকে গাঁয়ে পৌঁছে দিতে, মার কাছ। ঘরে এস, বসবে।'

গিরি তাকে টেনেই নিয়ে যায় ঘরে। ঘনশ্যামের দিশেহারা অবস্থা, শত উপায় শত মতলবের এলোমেলো টুকরো পাক খেতে থাকে তার মাথার মধ্যে, কি করা যায় কি করা যায় এই অন্ধ আতঙ্কের চাপে।

মাদুরে বসে বিড়ি ধরিয়ে কেসে বলে, 'গাঁয়ে গিয়ে কী করবি গিরি? আমি বরং—'

'বরং টরং রাখ তোমার। মার চিকিচ্ছে করাব। সব খরচা দেবে তুমি যত টাকা নাগে। নয়তো কি কেলেঙ্কারী করি দেখো।' ঘনশ্যামের পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে গিরি ফস করে একটা সিগারেট ধরায়। ধপাস করে বসে পা ছড়িয়ে পিছনে একটা হাত রেখে পিছু হেলে। কয়েক মাসের মধ্যেই মুখের স্নিগ্ধ লাবণ্য উপে গেছে অনেকখানি, মাজা রঙের সে আভাও নেই তেমন, কিন্তু গড়নশ্রী হয়েছে আরও অপরূপ, মারাত্মক। সাধে কি ওকে পাবার জন্য অত করেছে ঘনশ্যাম, ছেড়ে দেবে দেবে করেও ছাড়তে পারছে না। কায়স্থের মেয়ে না হলে ওকে সে বিয়েই করে ফেলত এখানে টেনে না এনে।

ছেড়ে দেবে ভাবছিল কিছুদিন থেকে, যদি ছেড়ে দিত। আজ তাহলে এ হাঙ্গামায় তাকে পড়তেও হত না ভদ্রঘরের এই ধিঙ্গি মাগিগুলোর কল্যাণে।

'এত পয়সা করেছে, বিড়ি টানে।' গিরিবালা বলে, মুখ বাঁকিয়ে। বলে সোজা হয়ে বসে, 'রামপদ'র পেছনে নাকি নেগে তুমি একঘরে করবে? সাধুপুরুষ আমার! মোর ঘরে ফেরার পথে কাঁটা দেবার মতলব, না? ওর বৌকে ঘরে ফিরতে না দিলে, মোকে কে ঘরে ফিরতে দেবে শুনি? মোকে একঘরে করবে না সবাই?'

গোকুল মদের বোতল নিয়ে এলে গিরি একদৃষ্টে বোতলটার দিকে তাকিয়ে থাকে। জিভ দিয়ে ঘন ঘন ঠোঁট ভেজায়। মুখের ভাব পলকে পলকে বদলে গিয়ে ঘনিয়ে আসে রুগ্নের যাতনাভরা লোলুপতা, নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি বিকারগ্রস্তের তীব্র কাতরতা।

'বিলাতী?'

গোকুল সায় দেয়!

গিরি যেন শিথিল হয়ে ঝিমিয়ে যায়। অতি কষ্টে বলে, 'যাক, এনেছ যখন, খাও শেষ দিনটা। ভোর ভোর উঠে চলে যাবে কিন্তু ।'

মদের গ্লাসে দু'চার বার চুমুক দিয়ে একটু স্থির হয়ে ঘনশ্যাম ভাবে, না, কোন উপায় নেই। ভয় দেখানো, জবরদস্তি, মিষ্টি কথা, লোভ দেখানো, বানানো কথায় ভোলানো কিছুই

খাটবে না। সে গিরি আর নেই, সেই ভীরু লাজুক বোকা হাবা সরল গেঁয়ো মেয়ে। পেকে ঝানু হয়ে গেছে।

কিছু পেসাদ পেয়ে গোকুল বিদায় হয়। খুব ভোরে এসে সে ঘনশ্যামকে ডেকে তুলে নিয়ে যাবে।

রাত বাড়লে গিরি জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, 'কি করি বল? কাল একবার যেতে হবে। মার জন্য আঁকু পাঁকু করছে মনটা। তা ভেবো না তুমি। মার একটা ব্যবস্থা করে ফিরে আসব ক'দিন পরে। মাঝে সাঝে গাঁয়ে যেতে দিও মোকে, এ্যাঁ? ভেবো না, ফিরে আসব

গেলাস থেকে উছলে পড়ে শাড়ী ভিজে যায় গিরির। খিল-খিল করে হাসতে হাসতে রাগের চোটে গিরি গেলাসটা ছুঁড়ে দেয় ঘরের কোণে।

বিচার-সভায় লোক খুব বেশী হল না মানসুকিয়ার ঘেঁষাঘেঁষি পাঁচ-ছ'টা গাঁ ধরলেও লোক কমেই গেছে দেশে। রোগে শয্যাশায়ী হয়ে আছে বহু লোক। অনেকে আসতে পারেনি আসবে ঠিক করেও, কাঁপতে কাঁপতে জ্বরে পড়ায়। অনেকে ইচ্ছা করে আসেনি। সমাবেশটাও কেমন ঝিম-ধরা নিরুত্তেজ, প্রাণহীন। ক্ষীণ শীর্ণ অবসন্ন সব দেহগুলি, চোখে উদ্দেশ্যহীন ফাঁকা চাউনি। সভার বাক্‌গুঞ্জনও স্তিমিত। কথা কইতে ভাল লাগার দিন যেন নেই। বছর দুই আড়াই আগে, ঘনশ্যামের এই সদর দাওয়া আর সামনের ফাঁকা জমিতে শেষ সামাজিক বিচার-সভা বসেছিল এই চাষা-ভুষো শ্রেণীর, পদ্মলোচনের বোনের ব্যাপার নিয়ে। কি চাঞ্চল্য আর উত্তেজনা ছিল সে জমায়েতে, মানুষের কলরবে গম্‌গম্‌ করছিল। কি ঔৎসুক্য ফুটেছিল সকলের মুখে এক বিবাহিত নারীর কলঙ্কের আলোচনা আরম্ভ হওয়ার প্রতীক্ষায়। তার তুলনায় এ যেন সরকারী জমায়েত ডাকা হয়েছে বর্তমান অবস্থায় গ্রামবাসীদের কি করা উচিত বুঝিয়ে দিতে।

দাওয়ায় বসেছে মাথারা, মাঝ-বয়সী আর বুড়ো মানুষ। ঘনশ্যাম বসেছে মাঝখানে, একেবারে চুপ হয়ে, অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে। তার ভাব দেখে মাথাদের অস্বস্তি জেগেছে— উপস্থিত মানুষগুলির ভাব দেখেও। দাওয়ার এক প্রান্তে মোড়ায় বসেছে শঙ্কর, সে এসেছে অযাচিত ভাবে। কেউ কেউ অনুমান করেছে তার উপস্থিতির কারণ, অনেকেই বুঝে উঠতে পারেনি। অঙ্গনের দক্ষিণ কোণে জন-সাতেকের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে রামপদ, এদের সঙ্গে আগে থেকে তার ভাব ছিল, বিশেষ করে করালী ও বুনোর সঙ্গে। মেয়েদের মধ্যে বসেছে মুক্তা, গিরির গায়ে লেগে! সে অবশ্য গিরিকে খুঁজে তার গা ঘেঁষে বসেনি, গিরিই তাকে ডেকে বসিয়েচে। পুরুষের অনুপাতে মেয়েদের সংখ্যা বড় কম হয়নি সভায়।

ঘনশ্যামের দৃষ্টি বার বার গিরির ওপর গিয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ সরিয়ে নেয়।

বিচারের কাজে গোল বাধে গোড়া থেকেই। পূর্ব-পরামর্শ মতো বুড়ো টেকো নন্দী গৌরচন্দ্রিকা সুরু করলে জমায়েতের মাঝখান থেকে রুক্ষ চুলে, খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়িতে আর একটা হাতছেঁড়া ময়লা খাকি শার্ট গায়ে পাগলাটে চেহারার বনমালী উঠে চেঁচিয়ে বলে, 'কিসের বিচার? কার বিচার? রামপদর বৌ কোন দোষ করেনি।'

সবাই জানে, বনমালীর বৌকে সদরের দত্ত-বাবু ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘর ছাড়িয়ে চালান দিয়েছে ব্যবসা করার জন্য। প্রথমে সদরে রেখেছিল বৌ-টাকে, বনমালী হন্যে হয়ে খুঁজে খুঁজে তাকে যখন প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছিল তখন আবার তাড়াতাড়ি কোথায় চালান করে দিয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও বনমালী আর হদিস পায়নি। এখনো সে মাঝে মাঝে

সদরে গিয়ে সন্ধান করে।

টেকো নন্দী বলে, 'আহা, দোষ করেছে কি করেনি তাই তো মোরা বিচার করব।'

বনমালী রুখে বলে, 'বটে? কোন দোষ করেনি, তবু বিচার হবে দোষ করেছে কি করেনি? এ তো খুড়ো ঠিক কথা নয়। গাঁয়ের কোন ছেলেমেয়ে গাঁ ছেড়ে কদিন বাইরে গেলে যদি তার বিচার লাগে, তবে তো বিপদ।'

করালী বসে থেকেই গলা চড়িয়ে বলে 'ঠিক কথা, গাঁয়ে খেতে পায় নি, সোয়ামী কাছে নেই, তা সদরে খেটে খেতে গেছে। ওর দোষটা কিসের?'

কে একজন মাথাটা নামিয়ে আড়াল করে বলে, 'সে-বেলা তো কেউ আসেনি, দু'টি খেতে-পরতে দিতে?'

কানাই বিদেশে তিন ছেলে আর দুই মেয়ে হারিয়ে শুধু নিজের বৌ আর বড় ছেলের বৌকে নিয়ে গাঁয়ে ফিরেছে। সে বলে, তাদের তিন জনের কইমাছের প্রাণ সহজে যাবার নয়, যায়ও নি তাই। তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখা যায়, সে থর থর করে কাঁপছে, মুখে এক অদ্ভুত উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদনার ভাব। কথা তার এলোমেলো হয়ে যায়, 'প্রাণে বেঁচে ফিরেছে মেয়েটা, ভগবান ছিল না তো কি? ভগবান বাঁচত কি, মেয়েটা ফিরেছে তো মরে এসে। তা ভগবান আছেন।'

কেউ হাসে না। সভায় ভগবান এসে পড়ায় শঙ্করের মতো অযাচিত আবির্ভাবের কৌতূহলমূলক একটা অনুভূতি জাগে অনেকের মনে।

জমায়েত স্তব্ধ হয়ে থাকে খানিকক্ষণ। শুধু মেয়েদের মধ্যে গুজ-গাজ ফিস-ফাস চলতে থাকে অবিরাম। মুক্তার মত মেয়েরা আবার গাঁয়ে ফিরুক এটা যারা ঠিক পছন্দ করে না তারাও চুপ করে থাকে।

শেষে দাওয়া থেকে ভুবন বলতে যায়, 'কথা হল কি, ও যদি সদরে সত্যি খেটে খেতে যেত, খেটেই খেত—

গিরি তড়াক করে ঘাড় উঁচু করে গলা চিরে ফেলে, 'খেটে খায়নি তো কি? মোরা এক সাথে খেটে খেয়েছি। এ পাড়ায় দু'বাড়ী ঝি-গিরি করেছি, এক দোকানে মুড়ি ভেজেছি। কোন্ মুখপোড়া বলে খেটে খাইনি মোরা, শুনি তো একবার?'

প্রায় সকলেই জানে একথা সত্য নয় গিরির। কয়েকজন স্বচক্ষে মুক্তাকে দেখেছে সদরে। কিন্তু কেউ কথা বলে না। কিছুকাল আগে গাঁয়ে লজ্জাবতী লতার মতো কাঁচা মেয়ে গিরির পরিবর্তনটা সকলকে আশ্চর্য করে দেয়—খুব বেশী নয়। যে দিন-কাল পড়েছে। দাওয়ার নাছোড়বান্দা মাথা টেকো নন্দীই শুধু বলে, 'কিন্তু বহু লোকে যে চোখে দেখেছে। ফণি বলেচে সে নিজের চোখে—

মাঝবয়সী বেঁটে ফণি চট করে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানায়, 'না না, আমি তা বলিনি। আমি কেন ও-কথা বলতে যাব?'

এতক্ষণ পরে ঘনশ্যাম মুখ খোলে। জমায়েতে টুঁ শব্দ নেই কারো মুখে মেয়েদের ফিসফিসানি ছাড়া, তবু নেতাদের সভার কলরব থামাবার ভঙ্গিতে দু'হাত খানিক্ষণ তুলে রেখে সে বলে, 'যাক, যাক্। ভাই সব, আজকালকার দিনে অত সব ধরলে মোদের চলে না। আমি বলি কি, কথাটা যখন উঠেছে, রামপদ'র ইস্তিরি নামমাত্র একটা প্রাচিত্তির করুক, চাপা পড়ে যাক ব্যাপারটা।'

বনমালী ফুঁসে ওঠে, 'কিসের প্রাচিত্তির? দোষ করেনি তো প্রাচিত্তির কিসের?'

গিরি গলা চেরে, 'মোকেও প্রাচিত্তির করতে হবে নাকি? তবে?'

তারপর বিশৃঙ্খলার মধ্যে জমায়েত শেষ হয়। কানাইয়ের বৌ চোখ-ভরা জল নিয়ে মুক্তার ঝাপসা মুখখানি দেখে তার চিবুক ধ'রে চুমো খেতে গিয়ে গালটা টিপে দেয়। কয়েকটি স্ত্রীলোক মুখ বাঁকিয়ে আড়-চোখে মুক্তার দিকে চাইতে চাইতে চলে যায়। শঙ্কর নিঃশব্দে মোড়া থেকে উঠে যেমন অযাচিত ভাবে এসেছিল তেমনি অযাচিত ভাবে বিদায় না নিয়ে বনমালীর সঙ্গ ধরে।

বলে, 'যদি খুঁজে পেতে এনে দিই, ফিরিয়ে নেবে ভাই?'

বনমালী আশ্চর্য হয়ে যায়।—'ফিরে নেবে না তো খুঁজে মরছি কেন?'

একটা কথা বলতে গিয়ে শঙ্কর থেমে যায়। ফিরিয়ে আনার মতো অবস্থা যে সকলের থাকে না, মন এমন বিগড়ে যায় যে ঘরসংসার আর যোগ্য থাকে না তার, সেও যোগ্য থাকে না ঘরসংসারের। কিন্তু কি হবে ও-ক-থা বলে বনমালীকে? মহামারীতে লক্ষ লক্ষ দৈহিক মৃত্যু ঘটানোর মতো লোঁকে যদি তার বৌয়ের নৈতিক মৃত্যু ঘটিয়েই থাকে, ওকে সে সম্ভাবনার কথা জানিয়ে লাভ নেই। বৌ হিসাবে ওর বৌয়ের মরণ হয়েছে, মনের এমন রোগ হয়েছে যা চিকিৎসার বাইরে অথবা চিকিৎসা করে সুস্থ করে তাকে আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব কিনা মানুষের জগতে সেটা আগে জানা দরকার।

'চেষ্টা করে দেখি কি হয়।' বলে সহানুভূতির আবেগে বনমালীর হাতটা শঙ্কর চেপে ধরে হাতের মধ্যে, কলেজের বন্ধুর হাত যেমন ভাবে চেপে ধরত।

সিকিখানা চাঁদের আলো ছাড়া মানসুকিয়া অন্ধকার সন্ধ্যা থেকে। বেলতলায় ভূতের ভয়—বছরখানেক বছর-দুই আগেও খুব প্রবল ছিল। আজ-কাল বেলতলায় ভূতের ভয়ের প্রসঙ্গই যেন লোপ পেতে বসেছে মানসুকিয়ায়। এই বেলতলায় দাঁড়িয়ে গিরি বলে ঘনশ্যামকে, 'তুমি যদি না বলতে ব্যাপারটা, চাপা দিতে—'

ঘনশ্যাম বলে, 'চোখ-কান নেই? দ্যাখোনি, আমি কি বলি না বলি তাতে কী আসত যেত? আমি শুধু নিজের অবস্থাটা সামলে নিলাম লোকের মন বুঝে।'

গিরির বাড়ী বেলতলার কাছেই। বেলতলায় সে ভয় পায়নি, বাড়ী যেতে পথের পাশে নালার ওপর তালের পুলটার মাথায় একটা মানুষকে বসে থাকতে দেখে তার বুক কেঁপে যায়।

'কে গা?'

'আমি গা গিরি, আমি।'

'অঃ! এত রাতে এখানে বসে আছ?'

'এই দেখছিলাম, গাঁয়ে তো এলো, গাঁয়ে গিরির মন টিঁকবে কি টিঁকবে না।'

'কী দেখলে?'

'টিঁকবে না। গিরি, গাঁয়ে মন তোর টিঁকবে না। মোর সাথে যদি তোর বিয়েটা হয়ে যেত, মুক্তার মতো একটি ছেলেপিলে যদি হত তোর, ক'বছর ঘর-সংসার যদি করতিস, তবে হয় তো—না, গাঁয়ে মন তোর টিঁকবে না।'

কখন সে উঠে দাঁড়িয়েচে কথা বলতে বলতে, কখন সে তালের পুল ডিঙ্গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে কথা শেষ না করে আর গিরির দু'টো ভারি কথা না শুনেই, ভাল-মতো টের পায় না গিরি। মুখ বাঁকিয়ে সিকি চাঁদের আলোর আবছাতে অজানাকে সে অবজ্ঞা জানায়। পরক্ষণে মনে হয় বুকের কাছে কিসে যেন টান পড়ে টন টন করে উঠেচে বুকের

শিরা-টিরা কিছু, তাই ব্যথায় গিরি আরেকবার মুখ বাঁকায়।

গিরির মা শুয়েছিল কাঁথা-মুড়ি দিয়ে।

গিরি ডাকে, 'মা? ওমা?'

গিরির মা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। গিরির মুখের দিকে চেয়ে বিরক্তির সুরে বলে, 'কে গো বাছা তুমি? হঠাৎ ডেকে চমকে দিলে?'

দুঃশাসনীয়

আগে, কিছুকাল আগে, বেশীদিনের কথা নয়, গভীর রাতেও হাতিপুর গ্রামে এলে লোকালয়ের বাস্তব অনুভূতিতে স্বস্তি মিলত। মানুষের দেখা না মিলুক, মাঠ, ক্ষেত, ডোবাপুকুর, ঝোপঝাড়, জলা অপরিসীম রহস্যে ভরাট হয়ে থাক, হুতোম প্যাঁচা ডেকে উঠুক হঠাৎ, জঙ্গলের আড়ালে শুকনো পাতা মচমচিয়ে হাঁটুক রাত্রিচর পশু, বটপুকুরের পূর্বোত্তর কোণের তালবন থেকে খোনা কান্না ভেসে আসুক আবদেরে শকুন ছানার, দীপচিহ্নহীন ছায়ান্ধকারে নিঝুম হয়ে ঘুমিয়ে থাক সারাটি গ্রাম—এসবই যোগাত ভরসা, রাত দুপুরে ঘুমন্ত গ্রামের এই সমস্ত লাগসই পরিবেশ ও পরিচয়। গ্রাম তো এই রকমই বাংলার, রাতে সব গ্রাম। গা ছম-ছম করত ভয়ের সংস্কারে, ভয় পাবার ভয়ে, সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে নয়।

আজ তারা হাতিপুরে এলে ভয় পাবে, সন্ধ্যার পর বাংলার গাঁগুলির স্বাভাবিক পরিবেশ আজ কি দাঁড়িয়েছে যারা জানে না। বাংলার গাঁয়ের কথা ভেবে বসে যেসব ভদ্রলোকের মাথা চিন্তায় ফেটে যাচ্ছে তাদের কথাই ধরা যাক। বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে যে অভূতপূর্ব ভৌতিক কাণ্ডকারখানা চলছে সে বিষয়ে একান্ত অনভিজ্ঞ এইরকম কোন ভদ্রলোক আজকাল একটু রাত করে হাতিপুরে এলে ভয়ে দাঁতকপাটি লেগে মূর্ছা যাবে। এরা বড়ই সংস্কার-বশ, মন প্রায় অবশ। অতএব দুর্ভিক্ষে গাঁয়ের অধিকাংশের অপমৃত্যু—নিরুদ্ধার, এ জ্ঞান জন্মেই আছে। তারপর সেই গাঁয়ে চারিদিকে ছায়ামূর্তির সঞ্চরণ চোখে দেখে এবং মর্মে অনুভব ক'রে তাদের কি সন্দেহ থাকতে পারে যে জীবিতের জগৎ পার হয়ে তারা ছায়ামূর্তির জগতে এসে পৌঁছে গেছে।

গাছপালার আড়ালে একটা ছনের বাড়ী। বাড়ীর সামনে ভাঙ্গা বেড়া কাত হয়েও দাঁড়িয়ে আছে। বেড়ার ওপাশ থেকে নিঃশব্দে ছায়া বেরিয়ে এসে হনহন করে এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে জমকালো কতকগুলো গাছের ছায়ার গাঢ় অন্ধকারে, নয়তো কাছাকাছি এসে পড়ে থমকে দাঁড়াবে, চোখের পলকে একটা চাপা উলঙ্গিনী বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ফিরে যাবে বেড়ার ওপাশে। ডোবাপুকুরে বাসন মাজবে ছায়া, ঘাট থেকে কলসী কাঁখে উঠে আসবে ছায়া। ছায়া কথা কইবে ছায়ার সঙ্গে, দিদি, মাসী, খুড়ী বলে পরস্পরকে ডেকে হাসবে কাঁদবে অভিশাপ দেবে অদেষ্টকে, আর কথা শেষ না করেই ফিরে যাবে এদিকে ওদিকে এ-কুঁড়ে ও-কুঁড়ের পানে বিড়বিড় করে বকতে বকতে। বিদেশীর সামনে পড়ে গেলে চকিতে ঝোপের আড়ালে অন্তরাল খুঁজে নিয়ে ভীত করুণ প্রতিবাদের সুরে ছায়া বলবে, 'কে? কে গো ওখানে?'

কোন ছায়ার গায়ে লটকানো থাকে একফালি ন্যাকড়া, কোন ছায়ার কোমরে জড়ানো

থাকে গাছের পাতার সেলাই করা ঘাঘরা, কোন ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার, কুরুসভায় দ্রৌপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় রূপক বস্ত্রের মতো।

সারাটা দিন সূর্যের আলো যতক্ষণ উলঙ্গিনী করে রাখে, ছায়াগুলি বাড়ীর ভিতরে বা ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। কোন কোন ছায়া থাকে একেবারে অন্ধকার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে, বাপ ভাই স্বামী শ্বশুরের সামনে বার হতে পারে না—স্ত্রীলোক-সুলভ লজ্জায়। কোন বাড়ীতে কয়েকটি ছায়া থাকে এক সঙ্গে—মা, মাসী, খুড়ী, পিসী, মেয়ে, বোন, শাশুড়ী, বৌ ইত্যাদি বিবিধ সম্পর্ক সে ছায়াগুলির মধ্যে—এক একজন তারা পালা করে বাইরে বেরোয় কারণ, বাইরে বেরোবার মতো আবরণ একখানিই তাদের আছে।

ভোলা নন্দী কোমরের ঘুন্সীর সঙ্গে দু' আঙ্গুল চওড়া পট্টি এঁটে তার পাঁচহাতী ধুতিখানা বাড়ীর মেয়েদের দান করেছে। কাপড়খানা যে কোন সাধারণ গতরের স্ত্রীলোকের কোমরে একপাক ঘুরে বুক ঢেকে কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে—কাঁধে সর্বক্ষণ অবশ্য ধরে রাখতে হয় হাত দিয়ে, নইলে বিপদ। ভোলার বৌ ঘাটে যায়। ঘাট থেকে ঘুরে এসে ভিজে কাপড়টি খুলে দেয়। ভোলার মেজ ছেলে পটলের বৌ পাঁচী বা ভোলার মেয়ে শিউলি কাপড়টি পরে ঘাটে যায়।

'কৎকাল এমনি কয়েদ হয়ে থাকবো মা?'

পাঁচী হু হু করে কেঁদে ওঠে।

'আর সয় না।'

বলে' শাল কাঠের মোটা খুঁটিতে মাথাটা ঠকাস্ করে ঠুকে দেয়, 'আর সয় না, আর সয় না গো!' বলতে বলতে মাথা ঠুকতে থাকে খুঁটিতে, গড়াগড়ি দেয় আগের গোবর-লেপা গুঁড়ো গুঁড়ো মাটিতে, ধূলায় ধূসর হয়ে যায় তার অপুষ্ট দেহ ও পরিপুষ্ট স্তন। হায়, ধুলো মাটি ছাই কাদা মেখেও যদি আড়াল করা যেত মেয়েমানুষের লজ্জাজনক পোড়া দেহের লজ্জা!

বৈকুণ্ঠ মালিক মাঠে মাঠে ভীষণ খাটে, নিজেকে আর বৌটাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে। সন্ন্যাসীবাবুর দালানের পর আমবাগান, তার এপাশে রাস্তা এবং ওপাশে ঘুপচিমারা পথের ইয়ার্কি, তার কাছে দু'বিঘে বিচ্ছিন্ন ধান জমির লাগাও বৈকুণ্ঠের মোট আড়াইখানা কুঁড়ে নিয়ে তিন পুরুষের বসতবাটি। আড়াইখানা কুঁড়ের মধ্যে ঘর বলা যায় একটাকে। তার ঝাঁপের দরজা, বাঁশের দেয়াল, বাঁশের খিল। ঝাঁপে থপ থপ থাপড় মেরে বৈকুণ্ঠ প্রায় পিত্তি-ফাটা তেতো গলায় বলে, 'বাড়াবাড়ি করছিস বড়। মোর কাছে তোর লজ্জাডা কি?'

তার বৌ মানদা ভেতর থেকে বলে, 'মুখপোড়া বজ্জাত! বোনকে কাপড় দিয়ে বৌয়ের সাথে মস্করা? যমের অরুচি, লক্ষ্মীছাড়া।'

সুন্দর সকাল, সুন্দর সন্ধ্যা—কচুর পাতায় শিশির ফোঁটায় মুক্তা হীরা। সকাল থেকে সন্ধ্যা তক ঝাঁপের দু'পাশে এমনি গালাগালি চলে দু'জনের মধ্যে। বাড়ীর তিনদিকে মাঠ ভরে শন উঁচু হয়ে আছে আড়াই থেকে তিন হাত। ছুটে গিয়ে ডুব দিলে লজ্জাশরম সব ঢাকা পড়ে যায়—আকাশের দিকে চেয়ে প্রাণভরে কাঁদা যায় নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে। শনের বনের মাঝখানের পায়ে-হাঁটা পথ ধরে বেনারসী শাড়ী পরা গোকুলের বোন মালতী বিপিন সামন্তের পিছু পিছু ছ'কুনের ছাউনির দিকে চলতে থাকে গর্বে ফাটতে ফাটতে, তাই তাকিয়ে দ্যাখে মানদা ঘরের বেড়ার ফোকর-জানালায় চোখ রেখে। দাসু কামারের মেয়েটা আজ ওদের সঙ্গে

যাচ্ছে। ও-ও তো রাতের ছায়া ছিল কাল রাত্রি তক, সারা দিন ঘরে লুকিয়ে থেকে চুপি চুপি ঘাটে আসত দুটোচারটে বাসন আর কলসী নিয়ে। ধোপদুরস্ত সাদা থান কাপড়টা কোথা পেল ও সধবা মাগী?

শনক্ষেতের রঙ্গমঞ্চে রঘু একটু মস্‌করা করে বেনারসী পরা মালতীর সঙ্গে, তা দেখে যেন যাত্রাদলের মেয়ে সাজা ছেলে সখীর মতো ভড়কে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় দাশুর হাপুসকাঁদা ষোল বছরের কাঁচা মেয়ে। এদিক ওদিক চায়। হঠাৎ পিছু ফিরে হাঁটতে থাকে হনহনিয়ে, ফাঁদ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে হরিণী যেন পালাচ্ছে যেদিকে পালান চলে। ইস্! কি সাদা ওর পরনের ধুতিটা।

'অ বিন্দু! দাঁড়া!' রঘু ডাকে।

বিন্দী দাঁড়ায়। ফাঁদছাড়া হরিণী তো নয়, আসলে মানুষের মেয়ে। দাঁড়িয়ে মুখ ফেরায়। বলে, 'কাল--কাল যাব সামন্ত মশায়। বড় ডর লাগছে আজ।'

বেনারসী পরা মালতী বলে, 'ইহিরে, খুকী মোর, ডর লাগছে। দে তবে, দে কাপড় খুলে। খোল্ কাপড়। যাবি তো চ', নয় কাপড় খুলে দিয়ে যা।'

বৈকুণ্ঠ বলে, 'ঝাঁপ ভাঙ্গব ছোটবৌ।'

মানদা বলে, 'ভাঙো.........মাথা ভাঙব তোমার আমি।'

সন্ধ্যার পর মানদা ঝাঁপ খোলে। সন্ধ্যার পর সোয়ামীর কাছে মেয়েমানুষের লজ্জা কি?

ভূতির ছেলে কানুর বয়স বছর বার। ভূতির স্বামী গদাধর কাজ আর কাপড়ের খোঁজে বেরিয়েছে আজ এগার দিন। খিদেয় কাতর হয়ে কানু ভূতির কয়েদখানার বাইরে থেকে কেঁদে বলে, 'মা, ওমা! খিদে পায় যে?'

ভূতি বলে ভেতর থেকে, 'শিকেয় হাঁড়িতে পান্তো আছে, খে-গে যা নিয়ে।'

'পাড়তে পারি না যে। তুই দে।'

ভূতি দিশেহারা হয়ে ভাবে, 'যাবো? ছেলে মাকে ন্যাংটো দেখলে কি আসে যায়? মা কালীও তো ন্যাংটো। ওমা কালী, তুই-ই বল মা, যাবো? বল মা, মোর হৃদয়ে থেকে একটা কিছু বল!'

কিন্তু সেদিন হঠাৎ তাকে উলঙ্গ দেখে কানু যেমন হি হি করে হেসেছিল, আজও যদি তেমনি করে হাসে? চোখ ফেটে জল আসতে চায় ভূতির, জল পড়ে না। জল শুকিয়ে গেছে চোখের। চোখ শুষ্ক, জ্বালা করে আজকাল কাঁদতে চাইলে।

হঠাৎ ছেঁড়া মাদুরটা চোখে পড়ে।

'দাঁড়া একটু।'

মাদুরটা সে নিজের গায়ে জড়ায়। একহাতে শক্ত করে ধরে থাকে গায়ে জড়ানো মাদুরটা, আর এক হাতে দুয়ার খুলে রসুই ঘরে গিয়ে শিকে থেকে নামাতে যায় পান্তার হাঁড়িটা। পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে যায় হাঁড়িটা, পান্তা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। তখন মাদুরটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে ভূতি এঁটো ভাত আর ভাত ভেজানো এঁটো জলের মধ্যেই ধপ করে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে শুরু করে কান্না। আর এমনি আশ্চর্য কাণ্ড, এবার তার শুকনো চোখ থেকে জল বেরিয়ে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে ফোঁটা ফোঁটা মিশতে থাকে মেঝের ভাত ভেজানো জলে।

রাবেয়া বলে আনোয়ারকে, 'আজ শেষ। আজ যদি না কাপড় আনবে তো তোমায় আমার কসম। পুকুরে ডুবব, খোদার কসম।'

রাবেয়া ক'দিন থেকেই এ ভয় দেখাচ্ছে, তবু তার বিবর্ণ মুখ, রুক্ষ চুল আর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে আনোয়ারের বুক কেঁপে যায়। চাষীর ঘরের বৌ দুর্ভিক্ষের দিনগুলি না খেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে কাটিয়ে দিয়েছে, কথা বলেনি, শাক পাতা কুড়িয়ে এনে খুদ-কুঁড়োর সাশ্রয় করে তাকে বাঁচিয়ে লড়াই করেছে নিজে বাঁচবার জন্য। আজ কাপড়ের জন্য সে কামনা করছে মরণ! খেতে দিতে না পারার দোষ ও গ্রাহ্য করেনি, পরতে দিতে না পারার দোষ ও সইতে নারাজ, দিনভর ফুঁসে ফুঁসে গঞ্জনা দিচ্ছে। বিবিকে যে পরনের কাপড় দিতে পারে না সে কেমন মরদ, তার আবার সাদি করা কেন?

অনুনয় করে আনোয়ার বলে, 'আজিজ সায়ের খবর আনতে গেছেন। হাতিপুরের কাপড়ের ভাগ মিলবে আজকালের মধ্যে। একটা দিন সবুর কর আর।'

'সবুর! আর কত সবুর করব? কবরে যেয়ে সবুর করব এবার।'

সেমিজ না পরলে দু'ফেরতা শাড়ী পরা রাবেয়ার অভ্যাস। এক-ফেরতা কাপড় জড়িয়ে মানুষের সামনে সে বার হয়নি কোন দিন। পায়খানার চটের পর্দাটা গায়ে জড়িয়ে নিজেকে তার বিবসনা মনে হচ্ছে। কাপড় যদি নেই, ঘোষ বাবুর বাড়ীর মেয়েরা এবেলা ওবেলা রঙীন শাড়ী বদলে নিয়ে পরে কী করে? আজিজ সায়েবের বাড়ির মেয়েরা চুমকি বসানো হাল্‌কা শাড়ীর তলায় মোটা আবরণ পায় কোথায়? সবাই পায়, পায় না শুধু তার স্বামী। আল্লা, এ কোন্ মরদের হাতে সে পড়েছিল!

রাত্রের ছায়ামূর্তি হয়ে রাবেয়া গিয়ে দেখে আমিনা জ্বরে শয্যাগত হয়ে পড়ে আছে, তার গায়ে দুটো বস্তা চাপানো, চুণের বস্তা! বস্তার নিচেই আমিনার গায়ের চামড়া জ্বরে যেন পুড়ে যাচ্ছে।

আমিনা বলে ফিসফিসিয়ে, 'গা জ্বলছে—পুড়ে যাচ্ছে! আজ ঠিক মরব। এ বস্তা মুড়ে কবর দেবে মোকে।'

আবদুল আজিজ আর সুরেন ঘোষ হাতিপুরের একুশ শ' চাষী ও কামার কুমার জেলে জোলা তাঁতি আর আড়াইশ' ভদ্র স্ত্রীপুরুষের কাপড় যোগাবার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে। মাস দেড়েক আগে উলঙ্গ হাতিপুর সোজাসুজি সদরে গিয়ে মহকুমা হাকিম গোবর্ধন চাকলাদারকে লজ্জিত করেছিল। এভাবে সিধে আক্রমণের উস্কানি যুগিয়েছিল শরৎ হালদারের মেজ ছেলে বঙ্কু আর তার সতের জন সাঙ্গপাঙ্গ। সতের মাইল দূরে স্বদেশসেবক তপনবাবুর কাপড়ের কল কয়লার অভাবে অচল হয়েও সাড়ে তিনশ' তাঁত কী করে সচল আছে, আর খালি গুদামে কেন অনেক শ' গাঁট ধুতি শাড়ী জমে আছে, এসব তথ্য আবিষ্কার করায় বঙ্কু আর তার সাতজন সাঙ্গপাঙ্গ মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামার দায়ে হাজতে আছে সোয়ামাস। মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা তারা না করে থাকলে অবশ্য বিচারে খালাস পাবে, মিথ্যা হয়রানির জন্য ক্ষতিপূরণের পাল্টা নালিশও রুজু করতে পারবে আইন অনুসারে কিন্তু গুরুতর নালিশ যখন হয়েছে ওদের নামে, হাজতে ওদের থাকতে হবে। জামিন দেওয়ার অনেক বাধা। গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে জামিনের কথা।

ঘোষ আর আজিজ সভা ডেকে ঘোষণা করেছে হাতিপুরের জন্য কাপড়ের 'কোটা' তারা যা আদায় করেছে, এবার কাপড়ের ভাবনা কারো ভাবতে হবে না। মনোহর শা'র প্রস্তাবে

নিজেদের তারা হাতিপুরের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে। বিশ্বাস না করেও হাতিপুরের লোক ভেবেছে, দেখা যাক। আশা ছেড়ে দিয়েও হাতিপুরের নরনারী ভেবেছে, উপায় কি।

দু'জনে আজ সদরে গিয়েছিল, কবে হাতিপুরে এসে পৌঁছবে হাতিপুরের জন্য নির্দিষ্ট করা কাপড়ের ভাগ, তারই খবর জানতে। গাঁয়ের লোক উন্মুখ হয়ে পথ চেয়ে আছে তাদের। ছায়ারা ঘরে ঘরে লুকিয়ে আছে। কিন্তু তাদের মধ্যেও আগ্রহ ও উত্তেজনার শেষ নেই।

বিকালে ছোটখাট একটি জনতা জমে উঠল গ্রামের পূর্ব প্রান্তে কাঁথি সড়কের বাস-থামা মোড়ে।

ঘোষকে একা বাস থেকে নামতে দেখে জনতা একটু ঝিমিয়ে গেল। ভিড় দেখে ঘোষও গেল একটু ভড়কে।

'কী হল ঘোষমশায়, কাপড়ের কী হল?'

গোলমাল হয়েছে একটু।'

'গোলমাল? কিসের গোলমাল?

'কলকাতা থেকে মাল আসে নি। ভাই সব, আমরা জীবনপাত করে—'

বঙ্কু'র সাঙ্গপাঙ্গদের একজন, সরকারদের অবিনাশ, সে সময়টা কলেরায় মরমর হয়ে থাকায় মারপিটের নালিশ হাজতে যেতে পারেনি। সে বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'শনিবার ক্ষেত্র সামন্তের চালান এসেছে, সাত ওয়াগন! আমি দেখেছি, পুলিস দাঁড়িয়ে গাঁট নামিয়ে গুণে গুণে চালান দিল।'

'ও সদরের জন্যে। হাতিপুরের 'কোটা' আসেনি।'

'কবে আসবে?'

'আসবে। আসবে। ছুটোছুটি করে মরছি দেখতে পাচ্ছ তো ভাই তোমাদের জন্যে?'

হতাশ ম্রিয়মাণ জনতা গাঁয়ে ফিরে যাবার উপক্রম করছে, কাপড়ের গাঁট বোঝাই প্রকাণ্ড এক লরী রাস্তা কাঁপিয়ে এসে থামবার উপক্রম করে তাদের সামনে রাস্তার সেই মোড়ে। ড্রাইভারের পাশে বসে আছে আজিজ, তার পাশে সুরেন ঘোষের ভাই নরেন ঘোষ। সুরেন ঘোষ মরিয়া হয়ে পাগলের মতো হাত নেড়ে ইসারা করে, আজিজ জনতার দিকে তাকিয়ে তার ইসারা দ্যাখে, ড্রাইভারকে কি যেন বলে, থামতে থামতে আবার গর্জন করে লরীটা জোরে এগিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় অল্প দূরে পথের বাঁকের আড়ালে। লাল ধূলায় সৃষ্টি হয় মেঘারণ্য।

জনতা ঘুরে দাঁড়ায়, একপা দু'পা এগিয়ে এসে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। বাস তখনো ছাড়েনি। বাস থেকে নেমে এসেছে খাকি পোযাক-পরা সুদেব, কোমরে চামড়ার চওড়া বেল্টটা তার কী চকচকে। লালপাগড়ী আঁটা একজন চা আনতে যায় সুবলের দোকান থেকে—চা এবং একটা কিসের যেন চ্যাপ্টা শিশি আর সোডার বোতল। ঘোষের হাত থেকে সিগারেট নিয়ে সুদেব ধরায়, টান মেরে ধোঁয়া ছাড়ে, যেন ভেতরে কাঁচা কয়লার আগুন ধরেছে মানুষের ভিড় দেখার উত্তেজিত রাগে।

'কিসের ভিড়?'

'কাপড় চায়।'

'হাঃ হাঃ। পরশু পচেটপুরে সার্চে গেছলাম নন্দ জানার বাড়ী। বাড়ীর সামনে যেতেই হাত জোড় করে বললে, কী করে ভেতরে যাবেন হুজুর, মেয়েরা সব ন্যাংটো। ওরা রসুই ঘরে যাক্ সারা বাড়ী তল্লাস করুন। আমায় যেন বোকা পেয়েছে! রসুই ঘরে ফেরারী

ছোঁড়াটাকে সরিয়ে সারা বাড়ী সার্চ করাবে। আমি বললাম, বেশ। তারপর সোজা রসুই ঘরের দরজা ভেঙ্গে একদম ভেতরে। আরে বাপরে বাপ, সে যেন লাখ শালিকের কিচিরমিচির সুরু হয়ে গেল মশাই। সব কটাই প্রায় বুড়ী, কিন্তু একটা যা ছিল মিঃ ঘোষ, কি বলব আপনাকে। পাতলা একটা উড়নি পরেছে একদম জালের মতো, গায়ের রঙ দেখে তো আমি মিস্টার—'

হাতিপুরের মানুষ হাতিপুরে ফিরে যায় ধীরে ধীরে। এদিকের আশা ফুরিয়ে যাওয়ায় হতাশার চেয়ে চিন্তা সকলের বেশী। এভাবে যখন হল না তখন এবার কী করা যায়। কেউ যদি উপায় বাৎলে দিত।

'জান্ নয় দিলাম রে আব্বাস,' আনোয়ার বলে ভুরু কুঁচকে, 'কী জন্যি জানটা দিব তা বল্?'

ভোলা বলে, 'লুঠ করে তো আনতে পারি দু'এক জোড়া, কিন্তু তারপর?'

তারপর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। আকাশে ছোট চাঁদটি উঠেই আছে, দিন দিন একটু একটু বড় হবে। ক'দিন পরে জ্যোৎস্নার তেজ বাড়লে বন্দিনী ছায়াগুলির কী উপায় হবে কে জানে। চাঁদ ডুবলে তবে যদি বাড়ীর বাইরে যাওয়া চলে, রোজ পিছিয়ে যেতে থাকবে শেষরাত্রির দিকে চাঁদ ডুববার সময়। বিলের ধারে বাঁধানো সড়কে নানারঙা শাড়ী পরা মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বাবুরা ক'জন হাওয়া খাচ্ছেন। কাপড় তৈরীর কলেই যে হাতিপুরের লোক কাজ করে ওই তার প্রমাণ। কিন্তু আরও কত লোকেও তো কাজ করে সতের মাইল দুরে কাপড় তৈরীর কলে, তবে কেন এ অবস্থা তাদের? সবাই ভাববার চেষ্টা করে!

হাতিপুরের ঘরে ঘরে খবর রটে যায়, কাপড় পাওয়া যাবে না।

'তবে যে ঢেঁঢরা দিয়ে গেল কাপড় পাওয়া যাবে?' সকলে প্রশ্ন করল সন্ত্রস্ত হয়ে।

রসুল মিয়ার দালানের সামনের রোয়াকে এক ঘণ্টা ধন্না দিয়ে পড়ে থেকে আনোয়ার বাড়ী গেল সন্ধ্যার পরে। শাড়ী না পাক, কথা সে আদায় করেছে। বাড়তি শাড়ী ঘরে ছিল কিন্তু রসুল মিয়াও একটু ভয় পেয়ে গেছেন। অবস্থাটা একটু ভাল করে বুঝতে চান আগে। কদিন পরে তিনি একখানা শাড়ী অন্ততঃ আনোয়ারকে দেবেন, আজ হবে না। তাই হোক্, তাও মন্দের ভাল। রসুল মিয়ার কথার খেলাপ হবে না, আশা করা যায়। রাবেয়াকে এই কথাটা অন্ততঃ বলা যাবে।

রাবেয়া খানিক পরে ঘাট থেকে ফিরে আসে। অদ্ভুত রকম শান্ত মনে হয় আজ তাকে। আনোয়ার গোড়ায় তাকে দুঃসংবাদটা দেয়।

রাবেয়া বলে, 'জানি।' তারপর আনোয়ার রসুল মিয়ার কাছে দু'চারদিনের মধ্যে শাড়ী পাবার ভরসার খবরটা জানায়।

এবারও রাবেয়া বলে, 'জানি।'

দাওয়ায় এসে রাবেয়া তার কাছেই বসে। তেল নেই, দীপহীন অন্ধকার বাড়ী। অন্ধকার বলেই বুঝি পায়খানার ছেঁড়া চটের পর্দা জড়িয়ে নিজের কাছে রাবেয়া লজ্জা কম পায়। তাই বোধ হয় সে শান্ত হয়ে বসে কথা বলে আনোয়ারের সঙ্গে, ফুঁসে না, শাসায় না, খোঁচায় না। মনে মনে গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আনোয়ার কয়েকদিন পরে সাহস করে হাত বাড়িয়ে রাবেয়ার হাত ধরে।

রাবেয়া বলে, 'খাবেনি? চল।'

'চল।'

দাওয়ার গাঢ় অন্ধকার থেকে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় উঠানের আবছা অন্ধকারে নেমে রাবেয়া একটু দাঁড়ায়। তারপর আনোয়ারকে অবাক করে গায়ে জড়ানো চটটা খুলে ছুঁড়ে দেয় উঠানের কোণে।

'ঘিন্না লাগে বড়। গা কুটকুট করছে।'

আনোয়ারের একটু ধাঁধা লাগে, একটু ভয় করে।

'ফের নেয়ে নিই।'

ঘরে থেকে ভরা কলসী এনে রাবেয়া মাথায় উপুড় করে ঢেলে দেয়। গায়ের ছেঁড়া কুর্তিটা খুলে চিপে নিয়ে চুল ঝেড়ে গা মোছে।

'পানি ঢেলে দিলি সব?'

'ফের আনব।'

আনোয়ারকে খাইয়ে নিজে খেয়ে সানকি আর কলসি নিয়ে রাবেয়া ঘাটে গেল, আর ফিরল না। কাপড় যে দিতে পারে না এমন মরদের পাশে আর শোবে না বলে রাবেয়া একটা বস্তায় কতকগুলি ইট-পাথর ভরে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে গলায় বস্তার মুখটা দড়ি জড়িয়ে এঁটে বেঁধে পুকুরের জলের নীচে, পাঁকে গিয়ে শুয়ে রইল।

শিল্পী

সকালে দাওয়ার বসে মদন সারা গায়ে শীতের রোদের সেঁক খাচ্ছিল, হঠাৎ তার পায়ে খিঁচ ধরল ভীষণভাবে।

একেবারে সাত-সাতটা দিন তাঁত না চালিয়ে হাতে-পায়ে কোমরে-পিঠে কেমন আড়ষ্ট মত বেতো ব্যথা ধরেছিল, তাতে আবার গাঁটে গাঁটে ঝিলিকমারা কামড়ানি। সুতো মেলে না, তাঁত চলে না, বিনা রোগে ব্যারাম ধরার মত হদ্দ করে ফেলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা ধরাবাঁধা নড়ন চড়ন তাঁত চালানোর কাজে, তার অভাবে শরীরটা মিইয়ে ঝিমিয়ে ব্যথিয়ে ওঠে দু'দিনে রাতে ঘুম আসে না, মনটা কেমন টনটন করে একধরনের উদাসকবা কষ্টে, সব যেন ফুরিয়ে গেছে! যাত্রা শুনতে গিয়ে নিমাই সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবার সময় যেমন লাগে তেমনি ধারা কষ্ট, তবে ঢের বেশি জোরালো আর অফুরন্ত। শরীর মনের ওসব উদ্বেগ সয়ে চুপচাপ থাকে মদন। যা সয় তা সইবে না কেন।

সকালে উঠেই মা গেছে বৌকে সাথে নিয়ে বাবুদের বাড়ি। বাড়ির মেয়েদের ধরবে, বাবুর ছোট মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে দু'একখানা ভাল, মদন তাঁতির নাম করা বিশেষ রকম ভাল, কাপড় বুনে দেবার ফরমাস যদি আদায় করতে পারে। বাবুর বাড়ির বায়না পেলে সুতো অনায়াসে যোগাড় হয়ে যাবে বাবুদেরই কল্যাণে। বাড়িতে ছিল শুধু মদনের মাসি। তার আবার একটা হাত নুলো শরীরটি প্যাকাটির মত রোগা। মদনের হাউমাউ চীৎকার শুনে সে ছুটে আসে মদনের দু'বছরের ছেলেটাকে কোলে নিয়ে, সাথে আসে মাসির চার বছরের মেয়ে। মাসির কি ক্ষমতা আছে এক হাতে টেনে খিঁচধরা পা ঠিক করে দেয় মদনের! মাসিও চেঁচায়। মদনের চিৎকারে ভয় পেয়ে ছেলে মেয়ে দুটো আগেই গলা ফাটিয়ে কান্না জুড়েছিল।

তখন রাস্তা থেকে ভুবন ঘোষাল এসে ব্যাপারটা বুঝেই গোড়ালির কাছে মদনের পা

ধরে কয়েকটা হ্যাঁচকা টান দেয় আর উরুতে জোরে জোরে থাপড় মারে। যন্ত্রণাটা সামালের মধ্যে আসে মদনের, মুচড়ে ভেঙ্গে পড়ার বদলে বশে আসে পা'টা।

বাঁচালেন মোকে।

মুখে শুষতে শুষতে মদন পায়ে হাত ঘসে। খড়িওঠা ফাটা গায়ে হাতের কড়া তালুর ঘষায় শব্দ হয় শোষেরই মত।

ভুবন পরামর্শ দেয় ঃ উঠে হাঁটো দু'পা। সেরে যাবে।

মদন কথা কয় না। এতক্ষণে আশে পাশের-বাড়ির কয়েকজন মেয়ে পুরুষ ছুটে এসে হাজির হয়েছে হুল্লোড় শুনে। শুধু উদি আসেনি প্রায় লাগাও কুঁড়ে থেকে, কয়েকটা কলাগাছের মোটে ফারাক মদন আর উদির কু'ড়ের মধ্যে। ঘর থেকেই সে তাঁতিপাড়ার মেয়ে পুরুষের পিত্তি জ্বালানো মিষ্টি গলায় চেঁচাচ্ছে ঃ কি হল গো? বলি হল কি?

ভুবন রাস্তা থেকে উঠে এলেও এটা জানা কথাই যে উদির কুঁড়ে থেকেই সে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে এসেছে। উদিই হয়তো তাড়া দিয়ে পাঠিয়েছে তাকে। সাতদিন তাঁত বন্ধ মদনের, বৌটা তার ন'মাস পোয়াতি, না খেয়ে তার ঘরে পাছে কেউ মরে যায় উদির এই ভাবনা হয়েছে, জানা গেছে কাল। কিছু চাল আর ডাল সে চুপি চুপি দিয়েছে কাল মদনের বৌকে, চুপি চুপি শুধিয়েছে মদনের মতি গতির কথা, সবার মত মজুরি নিয়ে সাধারণ কাপড় বুনতে মন হয়েচে কিনা মদনের। কেঁদে উদিকে বলেছে মদনের বৌ যে, না, একগুঁয়েমি তার কাটেনি।

পাড়ার যারা ছুটে এসেছিল, ভুবনকে এখানে দেখে মুখের ভাব তাদের স্পষ্টই বদলে যায়। ইতিমধ্যে মাসি পিঁড়ি এনে বসতে দিয়েছিল ভুবনকে। বারবার সবাই তাকায় মদন আর ভুবনের দিকে দু'চোখে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা নিয়ে। সেও কি শেষে ভুবনের ব্যবস্থা মেনে নিল, রাজী হল প্রায় বেগার খাটা মজুরি নিয়ে সস্তা ধুতিশাড়ি গামছা বুনে দিতে? মদন অস্বস্তি বোধ করে। মুখের খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি মুছে ফেলে হাতের চেটোতে।

সবার নিঃশব্দ জিজ্ঞাসার জবাবেই যেন বুড়ো ভোলাকে শুনিয়ে সে বলে, পায়ে খিঁচ ধরল হঠাৎ। সে কি যন্তনা, বাপ, একদম যেন মিত্যু যন্তনা, মরি আর কি। উনি ছুটে এসে টেনে টুনে ঠিক করে দিলেন পা'টা, বাঁচালেন মোকে।

গগন তাঁতির বেঁটে মোটা বৌ-অদ্ভুত আওয়াজ করে বলে, অ! কাছেই ছিলেন, তা এলেন ভাল, তাইতো বলি মোরা।

তাঁত না চালিয়ে গা'টা ঠিক নেই। তাড়াতাড়ি বলে মদন। গগন তাঁতির বৌয়ের মুখকে তার বড় ভয়।

বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে, অপরাধীর মত। তার কুঁড়েও মদনের ঘরের প্রায় লাগাও উত্তরে একটা আম গাছের ওপাশে যার দু'পাশের ডালপালা দু'জনের চালকে প্রায় ছোঁয় ছোঁয়।

বুড়ো ভোলার চেয়ে বৃন্দাবনের বয়স অনেক কম কিন্তু শরীর তার অনেক বেশি জরাজীর্ণ। একটি তার পুরানো জীর্ণ তাঁত, গামছা আর আটহাতি কাপড় শুধু বোনা যায়। তাঁতে সে আর বসে না, ক্ষমতা নেই। তার বড় ছেলে রসিক তাঁত চালায়। সুতোর অভাবে তাঁতি পাড়ায় সমস্ত তাঁত বন্ধ, অভাব ও আতঙ্কে সমস্ত তাঁতি পাড়া থম থম করছে ঃ শুধু তাঁত চলছে কেশবের আর বৃন্দাবনের।

ভুবন অমায়িক ভাবে বৃন্দাবনকে জিজ্ঞেসা করে, ক'খানা গামছা হয়েছে বৃন্দাবন?

বৃন্দাবন যেন চমকে ওঠে। এক পা পিছিয়ে যায়।

জানি না বাবু, মোর ছেলা বলতে পারে।

কেশবকে বোলো বোনা হলে যেন পয়সা নিয়ে যায়।

বাঁকা মেরুদণ্ডটা একবার সোজা করবার চেষ্টা করে বৃন্দাবন, অসহায় করুণ দৃষ্টিতে সবার দিকে একবার তাকায়।

ছেলাকে শুধোবেন বাবু। ওসব জানি না কিছু আমি।

পিছু ফিরে ধীরে ধীরে চলে যায় বৃন্দাবন!

গগনের বৌ বলে মুখ বাঁকিয়ে ঝাঁজের সঙ্গে, আমি কিছু জানি না গো, মোর ছেলা জানে! কত ঢং জানে বুড়ো।

বুড়ো ভোলা বলে, আহা থাম না বুনোর মা? অত কথায় কাজ কি । যন্ত্রণা গেছে না মদন? মোরা তবে যাই।

কেশব গেলেই পয়সা পাবে, গামছা কাপড় বুনে দিলেই পয়সা মেলে, এসব কথা—এসব ইঙ্গিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে তারা ভয় পায়। সব ঘরে রোজগার বন্ধ, উপোস।

ভুবন বলে, তোমার গাঁয়ের তাঁতিরা, জানো মদন, বড় বোকা।

মদন নিজেও সাতপুরুষে তাঁতি। রাগের মাথায় সে ব্যঙ্গই করে বসে, সে কথা বলতে! তাঁতি জাতটাই বোকা।

ভুবন নিজের কথা বলে যায়, সুতো কিনতে পাচ্ছিস না, পাবিও না কিছুকাল। তাঁত বসিয়ে রেখে নিজে বসে থাকে লাভ কি? মিহিরবাবু সুতো দিচ্ছেন, বুনে দে, যা পাস তাই লাভ। তা নয়, সুতো না কিনতে দিলে কাপড়ই বুনবে না, একি কথা? তোমার কথা নয় বুঝতে পারি, সস্তা কাপড় বুনবেই না তুমি, কিন্তু ওরা—

পোষায় না ওদের। সুতো কি সবাই কেনে, না কিনতে পারে? আপনি তো জানেন, বেশীর ভাগ দাদন কর্জে তাঁত চালায়। পড়তা রাখে দিবারাত্রি তাঁত চালিয়ে, মুখে রক্ত তুলে। আপনি তাও আদ্দেক করতে চান, পারব কেন মোরা?

নইলে ইদিকে যে পড়তা থাকে না বাপু। কি দরে সুতো কেনা জানো? ভুবন আপসোসের শ্বাস ফেলে, যাক গে. কি করা যাবে। কত্তাকে কত বলে তোমাদের জন্য সুতো বরাদ্দ করিয়েছিলাম, তোমরা না মানলে উপায় কি। বুঝি তো সব কিন্তু দিনকাল পড়েছে খারাপ, তাঁত রেখে কোনোমতে টিকে থাকা! নয়তো দু'দিন বাদে তাঁত বেচতে হবে তোমাদের। ভাল সময় যখন আসবে, সুতো মিলবে আবার, তখন মনে পড়বে এই ভুবন ঘোষালের কথা বলে রাখছি, দেখো মিলিয়ে। তখন আপসোস করবে আমার কথা শুনলে তাঁতও বজায় থাকত, নিজেরাও টিকতে।

তাঁত বাঁধা দিতে বেচতে হলে মিহিরবাবুর হয়ে ভুবনই কিনবে। সেই ভরসাতেই হয়তো গ্যাঁট হয়ে বসে আছে লোকটা। কিন্তু সে পর্যন্ত কি গড়াবে? তার আগে হয়তো ভুবনের কাছে সুতো নিয়ে বুনতে শুরু করবে তাঁতিরা।

মাসি এসে ঘুর ঘুর করে আশে পাশে। বামুনের ছেলে পায়ে হাত দিয়েছে মদনের, গড় হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে ভুবনকে যতক্ষণ সে প্রণাম না করছে মাসির মনে স্বস্তি নেই। মদনের বুঝি খেয়াল হয়নি, ভুলে গেছে। মদনের পা দুটো টান হয়ে ভুবনের পিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলে মাসির আর ধৈর্য থাকে না। মদনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রণামের কথাটা মনে করিয়ে দেয়।

মদন একেবারে খিঁচড়ে ওঠে, মেয়েটাকে নে না কোলে, কেঁদে মরছে? মরগে না হেথা থেকে যেথা মরবি?

ছেলে মেয়ে দুটোকে নিয়ে মাসি পালায়। মদনের এ মেজাজ চেনে মাসি। মেয়ে কাঁদছে বলে বকুনি মিছে, ওটা ছুতো। ছেলে পিলে কানের কাছে চেঁচালে মানুষের অশান্তি কেন হবে মাসিও জানে না মদনও বোঝে না। ছেলে-মেয়ের কান্না মদনের কানে লাগে না। তাঁতের ঠকঠকি, মেয়েদের বকাবকি, ঝিঁঝির ডাকের মত। মেজাজটাই বিগড়েছে মদনের। না করুক প্রণাম সে বামুনের ছেলেকে। মদনের ওপর মাসির বিশ্বাস খাঁটি। রামায়ণ সে পড়তে পারে সুর করে, তাঁতের কাজে বাপের নাম সে বজায় রেখেছে। সেরা জিনিস তৈরীর বায়না পায় মদন তাঁতি। মদনের মার সাথে কচি বয়সে এ বাড়িতে এসে মাসি শুনেছিল, বাবুদের বাপের আমলে বেনারসী বুনে দেবার বায়না পেয়েছিল মদনের বাপ। বিয়ের সময় জালের মত ছিষ্টিছাড়া শাড়ি বুনে পরতে দিয়ে তার সঙ্গে যে মস্করা করেছিল মদনের বাপ সে কথা কোনোদিন ভুলবে না মাসি। আজ আকাল, বায়না আসে না, সুতো মেলে না, তাঁত চলে না, তবু মদন ওঁচা কাপড় বোনে না। ওর জন্য কষ্ট হয় মাসির , ওর বাপের কথা ভেবে। মা বৌ যেন কেমন ব্যাভার করে ওর সঙ্গে।

মদনের বাপ যদি আজ বেঁচে থাকত, মাসি ভাবে। বেঁচে থাকলে সাড়ে চার কুড়ির বেশি বয়স হত তার। মাসি তা ভাল বোঝে না। শুধু শ্রীধরের চেয়ে সে বেশি বুড়ো হয়ে পড়ত ভাবতে মনটা তার মুষড়ে যায়। শ্রীধর তাঁতির বেঁচে থাকার দুর্ভাগ্য দেখে সে নিজেই যে কামনা করে, এবার বুড়োর যাওয়াই ভাল।

না থাক মদনের বাপ। মদন তো আছে!

মদনের মা বৌ ফিরে আসে গুটি গুটি, পেটের ভারে মদনের বৌ থপ থপ পা ফেলে হাঁটে, হাত পা তার ফুলছে ক'দিন থেকে। পরনের জীর্ণ পুরানো শাড়িখানা মদন নিজে বুনে দিয়েছিল তাকে বিয়ের সময়। এখনো পাড়ের বৈচিত্র্য, মিহি বুননের কোমল খাপি উজ্জ্বলতা সব মিলে এমন সুন্দর আছে কাপড়খানা যে অতি বিশ্রীভাবে পরলেও রুক্ষ জট বাঁধা চুল, চোক্‌লা-ওঠা ফাটা চামড়া এসব চিহ্ন না থাকলে বাবুদের বাড়ির মেয়ে মনে করা যেত তাকে।

মদনের মা বিড় বিড় করে বকতে বকতে আসছিল লাঠি ধরে কুঁজো হয়ে, ভুবনের সামনে সে কিছু না বললেই মদন খুশি হত। কিন্তু বুড়ীর কি সে কাণ্ডজ্ঞান আছে। সামনে এসেই সে শুরু করে দেয় মদন তাঁতির এয়োতি বশীকরণ বসন্ত শাড়ির বায়নার কথা শুনেই বাবুর বাড়ির মেয়েদের হাসি টিটকারি দিয়ে তাদের বিদেয় করার কাহিনী। ওসব কাপড়ের চল আছে নাকি আর, ঠাকুমা দিদিমারা ঝিরা আর চাষার ঘরের মেয়েরা পরে ওসব শাড়ি।

মদন তাঁতি! মদন তাঁতির কাপড়! বনগাঁয় শ্যাল রাজা মদন তাঁতি!

বলল? বলল ওসব কথা? পা গুটিয়ে সিধে হয়ে বলে মদন, বেড়েছে—বড় বেড়েছে বাবুরা। অতি বাড় হয়েছে বাবুদের, মরবে এবার।

দাওয়ায় উঠতে টলে পড়বার উপক্রম করে মদনের বৌ। খুঁটি ধরে সামলে নিয়ে ভেতরে চলে যায়, ভেতর থেকে তার উগ্র মন্তব্য আসে ঃ এক পয়সার মুরোদ নেই গর্বো কত!

ভুবন সান্ত্বনা দিয়ে বলে, মেয়েরা অমন বলে মদন, ওসব কথায় কান দিতে নেই। তা বলে, বাবুদের মেয়েরাও বলে, তার মা বৌও বলে, উদিও বলে। কিন্তু সব মেয়েরা বলে না। এই তাঁতিপাড়ার অনেক মেয়েই বলে না। মদন তাঁতিকে সামনে খাড়া করিয়ে তারা বরং ঝগড়া করে ঘরের পুরুষদের সঙ্গে। মদনও তাঁত বোনে তারাও তাঁত বোনে, পায়ের

ধুলোর যুগ্যি নয় তারা মদনের। এক আঙ্গুল গোঁপদাড়ির মধ্যে ভাঙ্গা দাঁতের হাসি জাগিয়ে মদন শোনায় ভুবনকে। একটা এঁড়ে তাঁতির তেজ আর নিষ্ঠায় একটু খটকাই যেন লাগে ভুবনের। একটু রাগ একটু হিংসার জ্বালাও যেন হয়। সম্প্রতি মিহিরবাবুর তাঁতের কারবারে জড়িয়ে পড়ার পর সে শুনেছিল এ অঞ্চলের তাঁতি মহলে একটা কথা চলতি আছে : মদন যখন গামছা বুনবে। গোড়ার কথাটার মানে ভাল বোঝেনি, পরে টের পেয়েছিল, সূর্য পশ্চিমে উঠবে—এর বদলে ওই কথাটা এদিকের তাঁতিরা ব্যবহার করে। সে জানে, মদন যদি তার কাছ থেকে সুতো নিয়ে কাপড় বুনে দিতে রাজী হয় আজ, কাল তাঁতি পাড়ার বেশির ভাগ লোক ছুটে আসবে তার কাছে সুতোর জন্য। বড় খামখেয়ালী একগুঁয়ে লোকটা, এই রাগে, এই হাসে, হাহুতাশ করে, এই লম্বাচওড়া কথা কয় যেন রাজামহারাজা !

উঠবার সময় ভুবনের মনে হয় ঘর থেকে যেন একটা গোঙ্গানির আওয়াজ কানে এল।

তার পরেই মাসির গলা : ও মদন, দ্যাখসে বৌ কেমন করছে।

ভুবন গিয়ে উদিকে পাঠিয়ে দেয় খবর নিতে। বেলা হয়েছে তার বেরিয়ে পড়া দরকার, কাজ অনেক। কিন্তু মদনের ঘরের খবরটা না জেনে যেতে পারে না। তেমন একটা বিপদ ঘাড়ে চাপলে মদন হয়তো ভাঙ্গতে পারে। উদির জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে ও ছুঁড়ির বড় বাড়াবাড়ি আছে সব বিষয়ে, খবর আনতে গিয়ে হয়তো সেবা করতেই লেগে গেছে মদনের বৌয়ের। কি হয়েছে মদনের বৌয়ের? কি হতে পারে? গুরুতর কিছু যদি হয়..

উদি ফেরে অনেক্ষণ পরে। অনেকটা পথ হেঁটে মদনের বৌয়ের শরীরটা কেমন কেমন করছিল, একবার মূর্ছা গেছে। মনে হয়েছিল বুঝি এই পর্যন্তই থাকবে, কিন্তু পরে মনে হচ্ছে প্রসব ব্যথাটাও উঠবে। ,

পেসব হতে গেলে মরবে মাগী এবার। একবেলা একমুঠো ভাত পায় তো তিন বেলা উপোস। এমনি চলছে দু'মাস। গাল দিয়ে এলাম তাঁতিকে মরণ হয় না?

আখায় কাঠ গুঁজে নামানো হাঁড়িটা চাপিয়ে দেয়। বেঁটে আঁটো দেহটা পর্যন্ত তার পবিচয় দেয় দুর্জয় রাগের। বসাতে গিয়ে মাটির হাঁড়িটা যে ভাঙ্গে না তাই আশ্চর্য।

এখনো গেলে না যে?

যাবো। আলিস্যে লাগছে।

ভাত খাবে. মোর রাঁধা ভাত? উদি আব্দার জানায়।

ভুবন রেগে বলে, তোর কথা বড় বিচ্ছিরি।

মদন দাওয়ায় এসে বসেছে উঁকি মেরে দেখে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে ভুবন আবার যায়। সকালের পিঁড়িটা সেইখানে পড়েছিল, তাতে জাঁকিয়ে বসে।

কেমন আছে বৌ?

ব্যথা উঠেছে কম কম। রক্ত ভাঙ্গছে বেশী, ব্যথা তেমন নয়। দুগ্‌গা বুড়ীকে আনতে গেছে।

মদনের শান্ত নিশ্চিন্ত ভাব দেখে ভুবন রীতিমত ভড়কে যায়। একটা বিড়ি ধরিয়ে ভাবে, ভেবে মদনকেও একটা বিড়ি দেয়।

মদন বলে হঠাৎ : ভাল কিছু বোনান না, একটু দামী কিছু ? নেই বুঝি?

মনটা খুশি হয়ে ওঠে ভুবনের।

সামান্য আছে। কিন্তু বেনারসী ছাড়া তুমি কি কিছু বুনবে?

বেনারসী? বেনারসী না বোনা যেন তারই অপরাধ, তারই অধঃপতন এমনি আপসোসের সঙ্গে বলে মদন, বেনারসী জীবনে বুনিনি।

একঘণ্টার মধ্যে সুতো এসে পড়ে। ভুবন লোক দিয়ে সুতো পৌঁছে দেয় মদনের ঘরে। সুতো দেখে কান্না আসে মদনের। এই সুতো দিয়ে তাকে ভাল কাপড়, দামী কাপড় বুনে দিতে হবে! এর চেয়ে কেশবের মত গামছাই নয় সে বুনত, লোকে বলত মদন তাঁতি গামছা বুনেচে দায়ে পড়ে কিন্তু যা-তা ওঁচা কাপড় বোনেনি। সকালে পায়ে যেমন খিঁচ ধরেছিল তেমনি ভাবে কি যেন টেনে ধরে তার বুকের মধ্যে। ট্যাঁকে গোঁজা দাদনের টাকা দুটো যেন ছ্যাঁকা দিতে থাকে চামড়ায়। কিন্তু এদিকে তাঁত না চালিয়ে চালিয়ে সর্বাঙ্গে আড়ষ্টমত ব্যথা পেটে খিদেটা মরে মরে জাগছে বারবার. বৌটা গোঙ্গাচ্ছে একটানা।

কি করবে মদন তাঁতি?

সেদিন রাত্রি যখন গভীর হয়ে এসেছে, শীতের চাঁদের ম্লান আলোয় গাঁ ঘুমিয়ে পড়েছে, চারিদিক স্তব্ধ নিঝুম হয়ে আছে মাঝে মাঝে কাছে ও দূরে কুকুর শিয়ালের ডাক ছাড়া, মদন তাঁতির তাঁত ঘরে শব্দ শুরু হল ঠকাঠক, ঠকাঠক। খুব জোর তাঁত চালিয়েছে মদন, শব্দ উঠছে জোরে। উদির ঘরে তো বটেই, বৃন্দাবনের ঘরে শব্দ পৌঁছতে থাকে তার তাঁত চালানোর।

ভূষন বলে আশ্চর্য হয়ে, এর মধ্যে তাঁত চাপাল? একা মানুষ কখন ঠিক করল সব?

উদিও অবাক হয়ে গিয়েছিল—ও খাঁটি গুণী লোক ও সব পারে—সে বলে ভয়ে ও বিস্ময়ে কান পেতে থেকে।

বুড়া বৃন্দাবন ছেলেকে ডেকে বলে, মদন তাঁত চালায় নাকি রে?

তা ছাড়া কি আর? কেশব জবাব দেয় ঝাঁঝের সঙ্গে, রাতদুকুরে চুপে চুপে তাঁত চালাচ্ছেন, ঘাট শুধু মোদের বেলা।

ভুবনের সুতো না হতে পারে।

কার সুতো তবে ? কার আছে সুতো ভুবন ছাড়া শুনি?

মদনের তাঁত কখন থেমেছিল উদি জানে না। ভোরে ঘুম ভেঙ্গেই সে ছুটে যায় মদনের কাছে। মদনকে ডেকে তুলে সাগ্রহে বলে, কতটা বুনলে তাঁতি?

আয় দেখবি।

মদন তাকে নিয়ে যায় তাঁত ঘরে। ফাঁকা শূন্য তাঁত দেকে থ বনে থাকে উদি। সুতোর বাণ্ডিল যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে।

সুতো মদন উদির হাতে তুলে দেয়, টাকা দুটোও দেয়। বলে, নিয়ে যা ফিরে দে গা ভুবনবাবুকে। বলিস, মদন তাঁতি যেদিন গামছা বুনবে--

একটু বেলা হতে তাঁতি পাড়ার অর্ধেক মেয়ে পুরুষ দল বেঁধে মদনের ঘরের দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখ দেখলেই বোঝা যায় তাদের মনের অবস্থা। রোষে ক্ষোভে কারো চোখে জল এসে পড়বার উপক্রম করেছে। গগন তাঁতির বৌটা পযন্ত নির্বাক হয়ে গেছে।

বুড়ো ভোলা শুধোয় ঃ ভুবনের ঠেঁয়ে নাকি সুতো নিয়েছ মদন? তাঁত চালিয়েছে দুকুর রাতে চুপি চুপি?

দেখে এসো তাঁত।

তাঁত চালাওনি রাতে?

চালিয়েছি। খালি তাঁত। তাঁত না চালিয়ে খিঁচ ধরল পায়ে, রাতে তাই খালি তাঁত চালালাম

এটুটু। ভুবনের সুতো নিয়ে তাঁত বুনব? বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে? মদন তাঁতি যেদিন কথার খেলাপ করবে—

মদন হঠাৎ থেমে যায়।

হারাণের নাতজামাই

মাঝরাতে পুলিশ গাঁয়ে হানা দিল।

সঙ্গে জোতদার চণ্ডী ঘোষের লোক কানাই ও শ্রীপতি। কয়েকজন লেঠেল।

কনকনে শীতের রাত। বিরাম বিশ্রাম ছেঁটে ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে তিনটি দিনরাত্রি একটানা ধান কাটার পরিশ্রমে পুরুষেরা অচেতন হয়ে ঘুমোচ্ছিল। পালা করে জেগে ঘরে ঘরে ঘাঁটি আগলে পাহারা দিচ্ছিল মেয়েরা। শাঁখ আর উলুধ্বনিতে গ্রামের কাছাকাছি পুলিশের আকস্মিক আবির্ভাব জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সমস্ত গাঁ ঘিরে ফেলবার আয়োজন করলে হারাণের ঘর থেকে ভুবন মণ্ডল সরে পড়তে পারত, উধাও হয়ে যেত। গাঁ শুদ্ধ লোক যাকে আড়াল করে রাখতে চায়, হঠাৎ হানা দিয়েও হয়ত পুলিশ সহজে তার পাত্তা পায় না। দেড়মাস চেষ্টা করে পারেনি, ভুবন এ-গাঁ ও-গাঁ করে বেড়াচ্ছে যখন খুশি।

কিন্তু গ্রাম ঘেরবার, আটঘাট বেঁধে বসবার কোন চেষ্টাই পুলিশ আজ করল না। সটান গিয়ে ঘিরে ফেলল ছোট হাঁসতলা পাড়াটুকুর ক—খানা ঘর যার মধ্যে একটি ঘর হারাণের। বোঝা গেল আটঘাট আগে থেকে বাঁধাই ছিল।

ভেতরের খবর পেয়ে এসেছে।

খবর পেয়ে এসেছে মানেই খবর দিয়েছে কেউ। আজ বিকালে ভুবন পা দিয়েছে গ্রামে, হঠাৎ সন্ধ্যার পরে তাকে অতিথি করে ঘরে নিয়ে গেছে হারাণের মেয়ে ময়নার মা, তার আগে পর্যন্ত ঠিক ছিল না কোন্ পাড়ায় কার ঘরে সে থাকবে। খবর তবে গেছে ভুবন হারাণের ঘরে যাবার পরে! এমনও কি কেউ আছে তাদের এ গাঁয়ে? শীতের তে-ভাগা চাঁদের আবছা আলোয় চোখ জ্বলে ওঠে চাষীদের, জানা যাবে সাঁঝের পর কে গাঁ ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল। জানা যাবেই, এ বজ্জাতি গোপন থাকবে না।

দাঁতে দাঁত ঘষে গফুর আলী বলে, দেইখা লমু কোন হালা পিঁপড়ার পাখা উঠছে। দেইখা লমু।

ভুবন মণ্ডলকে তারা নিয়ে যেতে দেবে না সালিগঞ্জ গাঁ থেকে। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছে ভুবন এতদিন গ্রেপ্তারী ওয়ারেন্টকে কলা দেখিয়ে, কোনও গাঁয়ে সে ধরা পড়েনি। সালিগঞ্জ থেকে তাকে পুলিশ নিয়ে যাবে? তাদের গাঁয়ের কলঙ্ক তারা সইবে না। ধান দেবে না বলে কবুল করেছে জান, সে জানটা দেবে এই আপনজনটার জন্যে।

শীতে আর ঘুমে অবশপ্রায় দেহগুলি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। লাঠি সড়কি দা' কুড়ুল বাগিয়ে চাষীরা দল বাঁধতে থাকে। সালিগঞ্জে মাঝরাতে আজ দেখা দেয় সাংঘাতিক সম্ভাবনা!

গোটা আষ্টেক মশাল পুলিশ সঙ্গে এনেছিল, তিন চারটে টর্চ। হাঁসখালি পাড়া ঘিরতে ঘিরতে দপ্‌দপ্ করে তারা মশালগুলি জ্বেলে নেয়। দেখা যায় সব সশস্ত্র পুলিশ, কানাই ও শ্রীপতির হাতেও দেশী বন্দুক।

পাড়াটা চিনলেও কানাই বা শ্রীপতি হারাণের বাড়ীটা ঠিক চিনত না। সামনে রাখালের

ঘর পেয়ে ঝাঁপ ভেঙ্গে তাকে বাইরে আনিয়ে রেইডিং পার্টির নায়ক মন্মথকে তাই জিজ্ঞেস করতে হয়, হারাণ দাসের কোন্ বাড়ী?

তার পাশের বাড়ীর হারাণ ছাড়াও যেন কয়েক গণ্ডা হারাণ আছে গাঁয়ে। বোকার মত রাখাল পাল্টা প্রশ্ন করে, আজ্ঞা, কোন্ হারাণ দাসের কথা কন?

গালে একটা চাপড় খেয়েই এমন হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে রাখাল, দম আটকে আটকে এমন সে ঘন ঘন উকি তুলতে থাকে যে তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাই অনর্থক হয়ে যায় তখনকার মত। বোকা হাবা চাষাগুলো শুধু বেপরোয়া নয়, একেবারে তুখোড় হয়ে উঠেছে চালাকীবাজিতে।

এদিকে হারাণ বলে, হায় ভগবান।

ময়নার মা বলে, তুমি উঠ্লা কেন কও দিকি?

বলে কিন্তু জানে যে তার কথা কানে যায়নি বুড়োর। চোখেও যেমন কম দেখে, কানেও তেমনি কম শোনে হারাণ। কি হয়েছে ভাল বুঝতেও বোধহয় পারেনি, শুধু বাইরে একটা গণ্ডগোল টের পেয়ে ভড়কে গিয়েছে। ছেলে আর মেয়েটাকে বুঝিয়ে দেওয়া গেছে চটপট, এই বুড়োকে বোঝাতে গেলে এত জোরে চেঁচাতে হবে যে, প্রত্যেকটি কথা কানে পৌঁছবে বাইরে যারা বেড় দিয়েছে। দু'এক দণ্ড চেঁচালেই যে বুঝবে হারাণ তাও নয়, তার ভোঁতা ঢিমে মাথায় অত সহজে কোন কথা ঢোকে না। এই বুড়োর জন্য না ফাঁস হয়ে যায় সব।

ভুবনকে বলে ময়নার মা, বুড়া বাপটার তরে ভাবনা!

ভুবন বলে, মোর কিন্তু হাসি পায় ময়নার মা।

ময়নার মা গম্ভীর মুখে বলে, হাসির কথা না। গুলিও করতে পারে। দেখন মাত্তর। কইবো হাঙ্গামা করছিলেন!

তাড়াতাড়ি একটা কুপি জ্বালে ময়নার মা। হারাণকে তুলে নিয়ে ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে হাতের আঙ্গুলের ইসারায় তাকে মুখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলে। তারপর কুপির আলোয় মেয়ের দিকে তাকিয়ে নিদারুণ আপসোসে ফুঁসে ওঠে, আঃ! ভাল শাড়ীখান পরতে পারলি না?

বলছ নাকি? ময়না বলে।

ময়নার মা নিজেই টিনের তোরঙ্গের ডালাটা প্রায় মুচড়ে ভেঙ্গে তাঁতের রঙ্গীন শাড়ীখান বার করে। ময়নার পরণের ছেঁড়া কাপড়খানা তার গা থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এলোমেলো ভাবে জড়িয়ে দেয় রঙ্গীন শাড়ীটি।

বলে, ঘোমটা দিবি। লাজ দেখাবি। জামায়ের কাছে যেমন দেখাস। ভুবনকে বলে, ভাল কথা শোনেন, আপনার নাম হইল জগমোহন, বাপের নাম সাতকড়ি। বাড়ী হাতীনাড়া, থানা গৌরপুর—

নতুন এক কোলাহল কানে আসে ময়নার মার। কান খাড়া করে সে শোনে। কুপির আলোতেই টের পাওয়া যায় প্রৌঢ় বয়সের সুরুতেই তার মুখখানাতে দুঃখ দুর্দশার ছাপ ও রেখা কি রুক্ষতা ও কাঠিন্য এনে দিয়েছে। ধুতি-পরা বিধবার বেশ আর কদম ছাঁটা চুল চেহারায় এনে দিয়েছে পুরুষালি ভাব।

গাঁ ভাইঙ্গা রুইখা আইতেছে। তাই না ভাবতেছিলাম ব্যাপার কি, গাঁর মাইনষের সাড়া নাই!

ভুবন বলে, তবেই সারছে। দশবিশটা খুন-জখম হইব নির্ঘাৎ। আমি যাই, সামলাই গিয়া।

থামেন আপনে, বসেন, ময়নার মা বলে, দ্যাখেন কি হয়।

শ' দেড়েক চাষী চাষাড়ে অস্ত্র হাতে এসে দাঁড়িয়েছে দল বেঁধে। ওদের আওয়াজ পেয়ে মন্মথও জড়ো করেছে তার ফৌজ হারাণের ঘরের সামনে—দু'চার জন শুধু পাহারায় আছে বাড়ীর পাশে ও পিছনে, বেড়া ডিঙ্গিয়ে ওদিক দিয়ে ভুবন না পালায়। দশটি বন্দুকের জোর মন্মথের, তার নিজের রিভলভার আছে। তবু চাষীদের মরিয়া ভাব দেখে সে অস্বস্তি বোধ করছে স্পষ্টই বোঝা যায়। তার সুরটা রীতিমত নরম শোনায়—স্রেফ হুকুমজারির বদলে সে যেন একটু বুঝিয়ে দিতে চায় সকলকে উচিত আর অনুচিত কাজের পার্থক্যটা, পরিমাণটাও।

বক্তৃতার ভঙ্গিতে সে জানায় যে, হাকিমের দস্তখতী পরোয়ানা নিয়ে সে এসেছে হারাণের ঘর তল্লাস করতে। তল্লাস করে আসামী না পায়, ফিরে চলে যাবে। এতে বাধা দেওয়া হাঙ্গামা করা উচিত নয়, তার ফল খারাপ হবে। বে-আইনী কাজ হবে সেটা।

গফুর চেঁচিয়ে বলে, মোরা তল্লাস করতি দিমু না।

প্রায় দুশো গলা সায় দেয়, দিমু না!

এমনি যখন অবস্থা, সংঘর্ষ প্রায় সুরু হয়ে যাবে মন্মথ হুকুম দিতে যাচ্ছে গুলি চালাবার, ময়নার মার খ্যানখেনে তীক্ষ্ণ গলা শীতার্ত থমথমে রাত্রিকে ছিঁড়ে কেটে বেজে উঠল, রও দিকি তোমরা, হাঙ্গামা কইরো না। মোর ঘরে কোন আসামী নাই। চোর ডাকাইত নাকি যে ঘরে আসামী রাখুম? বিকালে জামাই আইছে, শোয়াইছি মাইয়া জামাইরে। দারোগাবাবু তাল্লাস করতে চান তাল্লাস করেন।

মন্মথ বলে, ভুবন মণ্ডল আছে তোমার ঘরে?

ময়নার মা বলে, দ্যাখেন আইসা, তাল্লাস করেন। ভুবন মণ্ডল কেডা? নাম তো শুনি নাই বাপের কালে। মাইয়ার বিয়া দিলাম বৈশাখে, দুই ভরি রূপা কম দিছি ক্যান, জামাই ফির‍্যা তামায় না। দুই ভরির দাম পাঠাইয়া দিছি তবে আইজ জামাই পায়ের ধুলা দিছে। আপ্নারে কমু কি দারোগাবাবু, মাইয়াটা কাইন্দা মরে। মাইয়া যত কান্দে, আমি তত কান্দি—

আচ্ছা, আচ্ছা।—মন্মথ বলে, ভুবনকে না পাই, জামাই নিয়ে তুমি রাত কাটিও।

গৌর সাউ হেঁকে বলে, অত চুপে চুপে আসে কেন জামাই ময়নার মা?

গা জ্বলে যায় ময়নার মা-র। বলে, সদর দিয়া আইছে! তোমার একটা মাইয়ার সাতটা জামাই চুপে চুপে আসে, মোর জামাই সদর দিয়া আইছে।

গৌর আবার কি বলতে যাচ্ছিল, কে যেন আঘাত করে তার মুখে। একটা আর্ত শব্দ শুধু শোনা যায়, সাপে—ধরা ব্যাঙের একটি মাত্র আওয়াজের মত।

ময়নার রঙীন শাড়ী ও আলুথালু বেশ চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয় মন্মথের, পিছুটির মত চোখে এঁটে যেতে চায় ঘোমটা পরা ভীরু লাজুক কচি চাষী মেয়েটার আধপুষ্ট দেহটি। এ যেন কবিতা। বি. এ. পাশ মন্মথের কাছে, যেন চোরাই স্কচ হুইস্কির পেগ, যেন মাটির পৃথিবীর জীর্ণক্লিষ্ট অফিসিয়াল জীবনে এককোঁটা টসটসে দরদ। তার রীতিমত আপসোস হয় যে জোয়ান মর্দ মাঝবয়সী চাষাড়ে লোকটা এর স্বামী, ওর আদরেই মেয়েটার এই আলুথালু বেশ!

তবু মন্মথ জেরা করে, সংশয় মেটাতে গাঁয়ের দু'জন বুড়োকে এনে সনাক্ত করায়। তার পরেও যেন তার বিশ্বাস হতে চায় না! ভুবন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে গায়ে চাদর জড়িয়ে যতটা সম্ভব নিরীহ গোবেচারী সেজে। কিন্তু খোঁচা খোঁচা গোঁপদাড়ি ভরা মুখ, রুক্ষ এলোমেলো

একমাথা চুল, মোটেই তাকে দেখায় না নতুন জামায়ের মত। মন্মথ গর্জন করে হারাণকে প্রশ্ন করে, এ তোমার নাতনীর বর?

হারাণ বলে, হায় ভগবান!

ময়নার মা বলে, জিগান মিছা, কানে শোনে না, বদ্ধ কালা।

অ! মন্মথ বলে।

ভুবন ভাবে এবার তার কিছু বলা বা করা উচিত।

এমন হাঙ্গামা জানলে আইতাম না কর্তা। মিছা কইয়া আনছে আমারে। সড়াইলের হাটে আইছ, ঠাইরেণ পোলারে দিয়া খপর দিলেন, মাইয়া নাকি মর মর, তখন যায় এখন যায়।

তুমি অমনি ছুটে এলে?

আসুম না? রতিভরি সোনা-রূপা যা দিব কইছিল, তাও ঠেকায় নাই বিয়াতে। মইরা গেলে গাও থেইকা খুইলা নিলে আর পামু?

ওঃ! তাই ছুটে এসেছ? তুমি হিসেবী লোক বটে। মন্মথ বলে ব্যঙ্গ করে, আর কিছু করার নেই, বাড়ীগুলি তাল্লাস ও তছনছ করে নিয়ম রক্ষা করা ছাড়া। জামাইটাকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া চলে সন্দেহের যুক্তিতে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু হাঙ্গামা হবে। দু'পা পিছু হটে এখনো চাষীর দল দাঁড়িয়ে আছে, ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যায় নি। গাঁয়ে গাঁয়ে চাষাগুলোর কেমন যেন উগ্র মরিয়া ভাব, ভয় ডর নেই। ঘরে ঘরে তল্লাস চলতে থাকে। একটা বিড়াল লুকানোর মত আড়ালও যে ঘরে নেই, সে ঘরেও কাঁথা বালিস হাঁড়িপাতিল জিনিসপত্র ছত্রখান করে খোঁজা হয় মানুষকে।

মন্মথ থাকে হারাণের বাড়ীতেই। অল্প নেশায় রঙীন চোখ। এ সব কাজে বেরোতে হলে মন্মথ অল্প নেশা করে, মাল সঙ্গে থাকে কর্তব্য সমাপ্তি পর টানবার জন্য,—চোখ তার রঙীন শাড়ীজড়ানো মেয়েটাকে ছাড়তে চায় না। কুরিয়ে কুরিয়ে তাকায় ময়নার দিকে। ময়নার কুড়ি বাইশ বছরের জোয়ান ভাইটা উসখুস করে ক্রমাগত। ভুবনের চোখ জ্বলে ওঠে থেকে থেকে। ময়নার মা টের পায়, একটু যদি বাড়াবাড়ি করে মন্মথ, আর রক্ষা থাকবে না!

মেয়েটাকে বলে ময়নার মা, শীতে কাঁপুনি ধরেছে, শো' না গিয়া বাছা? তুমিও শুইয়া পড় বাবা। আপনে অনুমতি দ্যান দারোগাবাবু, জামাই শুইয়া পড়ুক। কত মানত কইরা, মাথা কপাল কুইটা আনছি জামাইরে,—ময়নার মা'র গলা ধরে যায়, আপনারে কি কমু দারোগাবাবু—

ময়না ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ভুবন যায় না।

আরও দু'বার ময়নার মা সস্নেহে সাদর অনুরোধ জানায় তাকে, তবু ভুবনকে ইতস্ততঃ করতে দেখে বিরক্ত হয়ে জোর দিয়ে বলে, গুরুজনের কথা শোন, শোও গিয়া। খাড়াইয়া কি করবা? ঝাঁপ বন্ধ কইরা শোও!

তখন তাই করে ভুবন। যতই তাকে জামাই মনে না হোক, এরপর না মেনে আর কি চলে যে সে জামাই? মন্মথ আস্তে আস্তে বাইরে পা বাড়ায়। পকেট থেকে চ্যাপ্টা শিশি বার করে ঢেলে দেয় গলায়।

পরদিন মুখে মুখে এ গল্প ছড়িয়ে যায় দিগদিগন্তে, দুপুরের আগে হাতীপাড়ার জগমোহন আর জোতদার চণ্ডী ঘোষ আর বড় থানার বড় দারোগার কাছে পর্যন্ত গিয়ে পৌছায়। গাঁয়ে গাঁয়ে লোকে বলাবলি করে ব্যাপারটা আর হাসিতে ফেটে পড়ে, বাহবা দেয় ময়নার মাকে!

এমন তামাশা কেউ কখনো করেনি পুলিশের সঙ্গে, এমন জব্দ করেনি পুলিশকে। ক'দিন আগে দুপুরবেলা পুরুষশূন্য গাঁয়ে পুলিশ এলে ঝাঁটা বঁটি হাতে মেয়ের দল নিয়ে ময়নার মা তাদের তাড়া করে পার করে দিয়েছিল গাঁয়ের সীমানা! সে যে এমন রসিকতাও জানে, কে তা ভাবতে পেরেছিল?

গাঁয়ের মেয়েরা আসে দলে দলে, অনিশ্চিত আশঙ্কা ও সম্ভাবনায় ভরা এমন যে ভয়ঙ্কর সময় চলেছে এখন, তার মধ্যেও তারা আজ ভাবনা-চিন্তা ভুলে হাসিখুশিতে উচ্ছল।

মোক্ষদার মা বলে একগাল হেসে গালে হাত দিয়ে, মাগো মা, ময়নার মা, তোর মদ্যি এত?

ক্ষেন্তি বলে ময়নাকে, কিলো ময়না, জামাই কি কইলো? দিছে কি?

লাজে ময়না হাসে।

বেলা পড়ে এলে, কাল যে সময় ভুবন মণ্ডল গাঁয়ে পা দিয়েছিল প্রায় সেই সময় আবির্ভাব ঘটে জগমোহনের। বয়স তার ছাব্বিশ সাতাশ, বেঁটে খাটো জোয়ান চেহারা, দাড়ি কামানো, চুল আঁচড়ানো। গায়ে ঘরকাচা শার্ট, কাঁধে মোটা সুতির সাদা চাদর। গাঁয়ে ঢুকে গটগট করে সে চলতে থাকে হারাণের বাড়ীর দিকে, এপাশ ওপাশ না তাকিয়ে, গম্ভীর মুখে।

রসিক ডাকে দাওয়া থেকে, জগমোহন নাকি? কখন আইলা?

নন্দ বলে, আরে শোন শোন, তামুক খাইয়া যাও।

জগমোহন ফিরেও তাকায় না।

রসিক ভড়কে গিয়ে নন্দকে শুধোয়, কি কাণ্ড বুঝলা নি?

কেমনে কমু?

অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে দু'জনে।

পথে মথুরের ঘর। তার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা আছে জগমোহনের। নাম ধরে হাঁক দিতে ভেতর থেকে সাড়া আসে না, বাইরের লোক জবাব দেয়। ঘরের কাছেই পথের ওপাশে একটা তালের গুঁড়িতে দু'জন মানুষ বসে ছিল নির্লিপ্তভাবে, একজনের হাতে খোঁটা শুদ্ধ গরু-বাঁধা দড়ি।

তাদের একজন বলে, বাড়ীতে নাই। তুমি কেডা, হারামজাদারে খোঁজ ক্যান?

জগমোহন পরিচয় দিতেই দুজনে তারা অন্তরঙ্গ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

অ! তুমিও আইছ ব্যাটারে দুই ঘা দিতে?

তা ভয় নেই জগমোহনের, তারা আশ্বাস দেয়, হাতের সুখ তার ফসকাবে না। কাল সন্ধ্যায় গেছে গাঁ থেকে, এখনো ফেরেনি মথুর, কখন ফিরে আসে ঠিকও নাই, তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না জগমোহনকে! মথুর ফিরলে তাকে যখন বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে বিচারের জন্য, সে খবর পাবে। সবাই মিলে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলার আগে তাকেই নয় সুযোগ দেওয়া হবে মথুরের নাক কানটা কেটে নেবার, সে ময়নার মা'র জামাই, তার দাবী সবার আগে।

শাউড়ী পাইছিলা দাদা একখানা!

নিজের হইলে বুঝতা। জগমোহন জবাব দেয় ঝাঁঝের সঙ্গে। চলতে আরম্ভ করে। শুনে দুজনে তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে অবাক হয়ে!

আচমকা জামাই এল, মুখে তার ঘন মেঘ। দেখেই ময়নার মা বিপদ গণে। ব্যস্ত-সমস্ত না হয়ে হাসি মুখে ধীরে শান্তভাবে অভ্যর্থনা জানায়, তার যেন আশা ছিল, জানা ছিল, এ

সময় এমনিভাবে জামাই আসবে, এটা অঘটন নয়। বলে, আস বাবা আস। ও ময়না, পিঁড়া দে। ভাল নি আছে বেবাকে? বিয়াই বিয়ান পোলামাইয়া?

আছে!

আরেকটুকু ভড়কে যায় ময়নার মা। কত গোঁসা না জমা আছে জামাই-এর কাটা-ছাঁটা এই কথার জবাবে। ময়নার দিকে তার না-তাকাবার ভঙ্গিটাও ভাল ঠেকে না। পড়ন্ত রোদে লাউমাচার শাদা ফুলের শোভা ছাড়া আর কিছুই যেন চোখ চেয়ে দেখবে না শ্বশুরবাড়ীর, পণ করেছে জগমোহন! লক্ষণ খারাপ।

ঘর থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় হারাণ হাঁকে, আসে নাই? হারামজাদা আসে নাই? হায় ভগবান!

নাতিরে খোঁজে, ময়নার মা জগমোহনকে জানায়, বিয়ান থেইকা দ্যাখে না, উতলা হইছে।

ময়নার মা প্রত্যাশা করে যে, নাতিকে হারাণ সকাল থেকে কেন দ্যাকে না, কি হয়েছে হারাণের নাতির, ময়নার ভায়ের, জানতে চাইবে জগমোহন, কিন্তু কোন খবর জানতেই এতটুকু কৌতূহল দেখা যায় না তার।

খাড়াইয়া রইলা ক্যান? বসো বাবা, বসো।

জগমোহন বসে। ময়নার পাতা পিঁড়ি সে ছোঁয় না, দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে উবু হয়ে বসে।

মুখ হাত ধুইয়া নিলে পারতা।

না, যামু গিয়া অখনি।

অখনি যাইবা?

হ। একটা কথা শুইনা আইলাম। মিছা না খাঁটি জিগাইয়া যামু গিয়া। মাইয়া নাকি কার লগে শুইছিল কাইল রাতে?

শুইছিল? ময়নার মার চমক লাগে, মোর লগে শোয় মাইয়া, মোর লগে শুইছিল, আর কার লগে শুইব?

ব্রহ্মাণ্ডের মাইনষে জানছে কার লগে শুইছিল। চোখে দেইখা গেছে দুয়ারে ঝাঁপ দিয়া কার লগে শুইছিল।

তারপর বেধে যায় শাশুড়ী-জামাইয়ে। প্রথমে ময়নার মা ঠাণ্ডা মাথায় নরম কথায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু জগমোহনের ওই এক গোঁ! ময়নার মাও শেষে গরম হয়ে ওঠে। বলে, তুমি নিজে মন্দ, অন্যেরে তাই মন্দ ভাব। উঠানে মাইনষের গাদা, আমি খাড়া সামনে, একদণ্ড ঝাঁপটা দিছে কি না দিছে, তুমি দোষ ধরলা! অন্যে তো কয় না?

অন্যের কি? অন্যের বৌ হইলে কইতো।

বড় ছোট মন তোমার। আইজ মণ্ডলের নামে এমন কথা কইলা, কাইল কইবা জুয়ান ভায়ের লগে ক্যান কথা কয়।

কওন উচিত। ও মাইয়া সব পারে।

তখন আর শুধু গরম কথা নয়, ময়নার মা গলা ছেড়ে উদ্ধার করতে আরম্ভ করে জগমোহনের চোদ্দপুরুষ। হারাণ কাঁপা গলায় চেঁচায়, আইছে নাকি? আইছে হারামজাদা? হায় ভগবান, আইছে? ময়না কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ছুটে আসে পাড়াবেড়ানি নিন্দাছড়ানি নিতাই পালের বৌ আর প্রতিবেশী কয়েকজন স্ত্রীলোক।

কি হইছে গো ময়নার মা? নিতাই পালের বৌ শুধায়, মাইয়া কাঁদে ক্যান?

তাদের দেখে সম্বিৎ ফিরে পায় ময়নার মা, ফোঁস করে ওঠে,—কাঁদে ক্যান? ভাইটারে ধইরা নিছে, কাঁদব না?

জামাই বুঝি আইছে খবর পাইয়া?

শুনবা বাছা, শুনবা। বইতে দাও, জিরাইতে দাও।

ময়নার মার বিরক্তি দেখে ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক পদে মেয়েরা ফিরে যায়। তাকে ঘাঁটাবার সাহস কারো নেই। ময়নার মা মেয়েকে ধমক দেয়, কাঁদিস না। বাপেরে নিয়া ঘরে গেছিলি, বেশ করিছিলি, কাঁদনের কি?

বাপ নাকি? জগমোহন বলে ব্যঙ্গ করে।

বাপ না? মণ্ডল দশটা গাঁয়ের বাপ। খালি জম্মো দিলেই বাপ হয় না, অন্ন দিলেও হয়। মণ্ডল আমাগো অন্ন দিছে। আমাগো বুঝাইছে, সাহস দিছে, একসাথ করছে, ধান কাটাইছে। না তো চণ্ডী ঘোষ নিত বেবাক ধান। তোমারে কই জগু, হাতে ধইরা কই, বুইঝা দ্যাখো, মিছা গোসা কইরো না।

বুইঝা কাম নাই। অখন যাই।

রাইতটা থাইকা যাও। জামাই আইলা, গেলা গিয়া, মাইনষে কি কইব?

জামাইয়ের অভাব কি। মাইয়া আছে, কত জামাই জুটবো।

বেলা শেষ হতে না হতে ঘনিয়ে এসেছে শীতের সন্ধ্যা। অল্প অল্প কুয়াসা নেমেছে। ঘুঁটের ধোঁয়া ও গন্ধে নিশ্চল বাতাস ভারি। যাই বলেই যে গা তোলে জগমোহন তা নয়। ময়নার মারও তা জানা আছে যে শুধু শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করে যাই বলেই জামাই গট গট করে বেরিয়ে যাবে না। ময়নার সাথে বোঝাপড়া, ময়নাকে কাঁদানো, এখনো বাকী আছে। যদি যায় জামাই, মেয়েটাকে নাকের জলে চোখের জলে এক করিয়ে তারপর যাবে। আর কথা বলে না ময়নার মা, আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে। ঘরে কিছু নেই, মোয়ামুড়ি কিছু যোগাড় করতে হবে। খাক বা না খাক সামনে ধরে দিতেই হবে জামাইয়ের।

চোখ মুছে নাক ঝেড়ে ময়না বলে ভয়ে ভয়ে, ঘরে আস।

খাসা আছি। শুইছিলা তো?

না, মা কালীর কিরা, শুই নাই। মার কওনে খালি ঝাঁপটি দিছিলাম, বাঁশটাও লাগাই নাই।

ঝাঁপ দিছিলা, শোও নাই। বেউলা সতী!

ময়না তখন কাঁদে।

তোমার লগে আইজ থেইকা শেষ।

ময়না আরও কাঁদে।

ঘর থেকে হারাণ কাঁপা গলায় হাঁকে, আসে নাই? ছোঁড়া আসে নাই? হায় ভগবান!

থেমে থেমে এক একটা কথা বলে যায় জগমোহন, না থেমে অবিরাম কেঁদে চলে ময়না, যতক্ষণ না কান্নাটা একঘেয়ে লাগে জগমোহনের। তখন কিছুক্ষণ সে চুপ করে থাকে। মুড়িমোয়া যোগাড় করে পাড়া ঘুরে ময়নার মা যখন ফিরে আসে, ময়না তখন চাপা সুরে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। বেড়ার বাইরে সুপারি গাছটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ময়নার মা। সারাদিন পরে এখন তার দু'চোখ জলে ভরে যায়। জোতদারের সাথে, দারোগা পুলিশের সাথে লড়াই করা চলে, অবুঝ পাষণ্ড জামাইয়ের সাথে লড়াই নেই!

আপন মনে আবার হাঁকে হারাণ, আসে নাই? মোর মরণটা আসে নাই? হায় ভগবান!

জগমোহন চুপ করে ছিল, এতক্ষণ পরে হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করে শালার খবর। —উয়ারে ধরছে ক্যান?

ময়নার কান্না থিতিয়ে এসেছিল, সে বলে, মণ্ডলখুড়ার লগে গোঁদলপাড়া গেছিল, ফিরতি পথে একা পাইয়া ধরছে।

ক্যান ধরছে?

কাইল জব্দ হইছে, সেই রাগে বুঝি।

বসে বসে কি ভাবে জগমোহন, আর কাঁদায় না ময়নাকে। ময়নার মা ভেতরে আসে, কাঁসিতে মুড়ি আর মোয়া খেতে দেয় জামাইকে, বলে, মাথা খাও, মুখে দাও।

আবার বলে, রাইত কইরা ক্যান যাইবা বাবা? থাইকা যাও।

থাকনের যো নাই। মা দিব্যি দিছে।

তবে খাইয়া যাও? আখা ধরাই? পোলাটারে ধইরে নিছে, পরাণডা পোড়ায়। তোমারে রাইখা জুড়ামু ভাবছিলাম।

না, রাইত বাড়ে।

আবার কবে আইবা?

দেখি।

উঠি-উঠি করেও দেরি হয়। তারপর আজ সন্ধ্যারাতেই পুলিশ হানার সেইরকম সোর ওঠে কাল মাঝরাত্রির মত। সদলবলে মন্মথ আবার আচমকা হানা দিয়েছে। আজ তার সঙ্গের শক্তি কালের চেয়ে অনেক বেশী। তার চোখ সাদা।

সোজাসুজি প্রথমেই হারাণের বাড়ী।

কি গো মণ্ডলের শাশুড়ী, মন্মথ বলে ময়নার মাকে, জামাই কোথা?

ময়নার মা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এটা আবার কে?

জামাই। ময়নার মা বলে।

বাঃ, তোর তো মাগী ভাগ্যি ভাল, রোজ নতুন নতুন জামাই জোটে। আর তুই ছুঁড়ি এই বয়সে—

হাতটা বাড়িয়েছিল মন্মথ রসিকতার সঙ্গে ময়নার থুতনি ধরে আদর করে একটু নেড়ে দিতে। তাকে পর্যন্ত চমকে দিয়ে জগমোহন লাফিয়ে এসে ময়নাকে আড়াল করে গর্জে ওঠে, মুখ সামলাইয়া কথা কইবেন!

বাড়ীর সকলকে, বুড়ো হারাণকে পর্যন্ত, গ্রেপ্তার করে আসামী নিয়ে রওনা দেবার সময় মন্মথ দেখতে পায় কালকের মত না হলেও লোক মন্দ জমেনি। দলে দলে লোক ছুটে আসছে চারিদিক থেকে, জমায়েত মিনিটে মিনিটে বড় হচ্ছে। মথুরার ঘর পার হয়ে পানা পুকুরটা পর্যন্ত গিয়ে আর এগোনো যায় না। কালের চেয়ে সাত আটগুণ বেশী লোক পথ আটকায়। রাত বেশী হয়নি, শুধু এগাঁয়ের নয়, আশেপাশের গাঁয়ের লোক ছুটে এসেছে। এটা ভাবতে পারেনি মন্মথ। মণ্ডলের জন্য হলে মানে বুঝা যেত, হারাণের বাড়ীর লোকের জন্য চারদিকের গাঁ ভেঙে মানুষ এসেছে! মানুষের সমুদ্র, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না।

ময়না তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়েই রক্ত মুছিয়ে দিতে আরম্ভ করে জগমোহনের। নব্বই বছরের বুড়ো হারাণ সেইখানে মাটিতে মেয়ের কোলে এলিয়ে নাতির জন্য উতলা হয়ে কাঁপা গলায় বলে, ছোঁড়া গেল কই? কই গেল? হায় ভগবান্!